# শারদীয়
# সংখ্যা
# ১৩৭০

সম্পাদক শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ


জিগ-জাগ অটোমেটিক

স্বাতন্ত্র্য

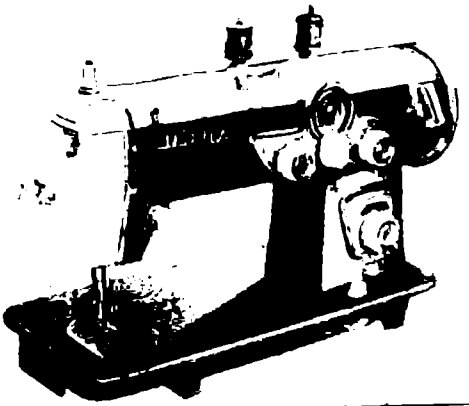

ফ্রি আর্ম

স্প্রিং প্লেটার

রিপু

স্ট্রেইট সেলাই

ছাপা ইণ্ডিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-

এমন সুন্দর কেশগুচ্ছের অধিকারী হলে
আপনিও শুনবেন

# "বাঃ সত্যই সুদর্শন"

রুক্ষ অবাধ্য চুলকে সংযত সুন্দর ও মসৃণ করে এবং কেশমূলে সতেজ সজীব রেখে চুলের সৌন্দর্য বাড়াতে কেয়ো- কার্পিন অদ্বিতীয়।
কেশ পরিচর্যায় এই তেল ব্যবহারে চুল দিনে দিনে ঘন, চিক্কণ ও সুন্দর হয়।

## কেয়ো-কার্পিন

মহাফলপ্রদ ভেষজ কেশ তৈল

ফেজ মেডিকেল স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ পাটনা গৌহাটী কটক

P 240538
Code-H04286 - 1 - P240538

# যুগলমূর্ত্তি
# ত্রিগুণ তৈল

**এজেন্ট - বটকৃষ্ণ পাল**

শতাব্দীর
ঐতিহ্যমণ্ডিত
সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদোক্ত
কেশ তৈল

* বিশেষ দ্রষ্টব্য :
জাল নিবারণী সীলের উপর
তৈল আবিষ্কারকের
ফটো দেখিয়া লইবেন

**জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোঃ প্রাইভেট লিঃ**
**কলিকাতা - ৩৪**

গান্ধী স্মারক নিধির বই

# মহাত্মা গান্ধী

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

গান্ধীজীর একখানি অনবদ্য জীবনী। রাজনৈতিক ও গঠনমূলক এই উভয় দিকেরই পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বইটিতে বিধৃত হয়েছে। লেখক গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ সহযোগীদের অন্যতম ছিলেন বাপুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠগত সান্নিধ্যের স্মৃতিও এই জীবনী-গ্রন্থের বিশিষ্ট উপাদান হয়েছে। বাংলা ভাষার জীবনী-সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন। আজই একখণ্ড সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হোন।

মূল্য ঃ ৬·৫০ (আগাগোড়া থদ্দরে মোড়া)
৫·৫০ (সাধারণ বাঁধাই)

গান্ধী-নিধির প্রকাশিত অন্যান্য বই

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত

| | |
|---|---|
| **সর্বোদয় (সদ্য প্রকাশিত)** | ২·৫০ |
| **সত্যই ভগবান** | ৩·৫০ |
| **পল্লী-পুনর্গঠন** | ৩·০০ |
| **নারী ও সামাজিক অবিচার** | ৪·০০ |
| **গীতাবোধ** | ১·৫০ |
| **পঞ্চায়েত রাজ** | ০·৭৫ |

রিচার্ড বি গ্রেগ প্রণীত

| | |
|---|---|
| **কর্মের সন্ধান** | ০·৭৫ |

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

| | |
|---|---|
| **সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ** | ২·৫০ |

**দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং**

৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
প্রকাশন বিভাগ, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
১২ডি, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-১২



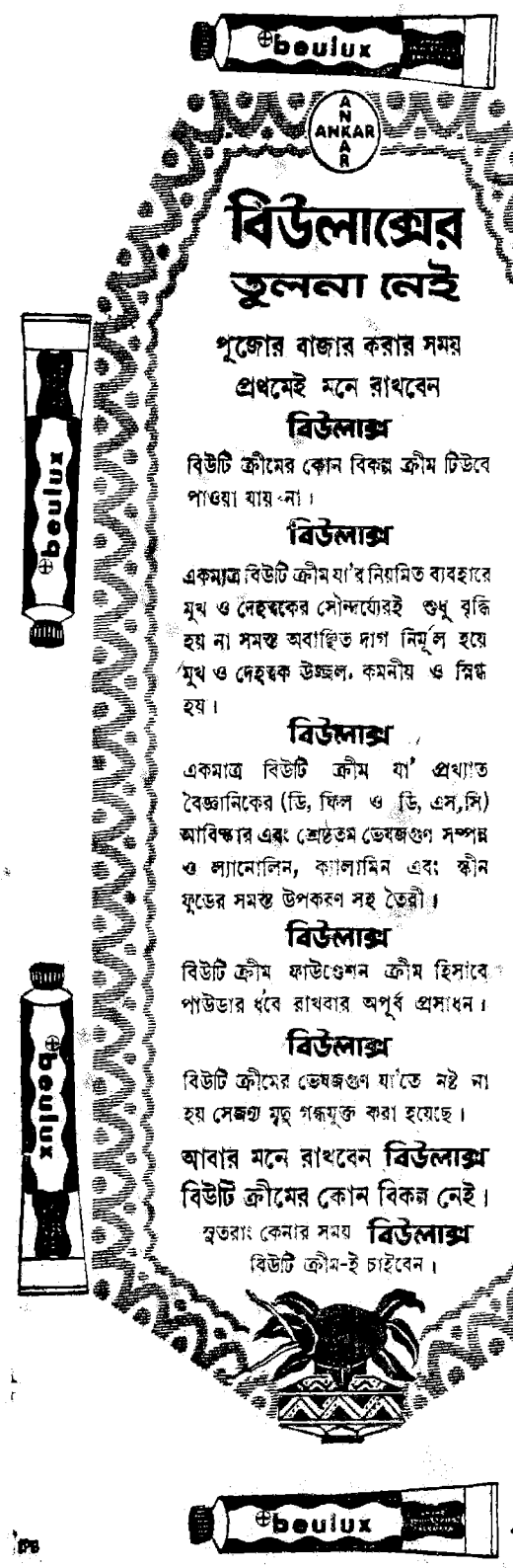

# ইষ্টবেঙ্গলক্লাবের ইতিহাস

পণ্ডিতমশাই লিখিত এই ইতিহাস পাড়াপত্তন থেকে বর্তমান পর্যন্ত অনেক নতুন তথ্য, প্রচুর দুষ্প্রাপ্য ছবি এবং অসংখ্য খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পড়ে আনন্দ পাবেন। দাম ৪৲ টাকা।

# কালাপাহাড়

(যন্ত্রস্থ)

কালাপাহাড়কে কে না জানে? কিন্তু কতটুকুইবা জানে? আর যা জানে তাই কি সব? তাই অতীতের বিভিষিকাময়, তমিক, মানবদরদী কালাপাহাড়কে সম্যক জানতে হলে রমেশচন্দ্র গোস্বামীর এই ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

**বুক গার্ডেন**

৩৩এ, হাতীবাগান রোড, কলি-১৪।


১৩৭৩

শারদীয় অমৃত

# সূচীপত্র


15 3
001/66



| বিষয় | | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | | | ১ |
| ঘোড়াহাটের পালা | | অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২ |
| অভিনয় | (গল্প) | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ৮ |
| বর | (গল্প) | শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় | ২৫ |
| আধুনিক ভারতবর্ষে ও চীনে বিজ্ঞানের স্থান | | শ্রীহুমায়ুন কবির | ৩৩ |
| দুই উকিল | (গল্প) | শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩৬ |
| আত্মস্মৃতির হীরক জয়ন্তী | (স্মৃতিচারণ) | শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত | ৪২ |
| মনু দ্বাদশ | (বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস) | শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র | ৪৮-৭০ |
| দিল্লী সেণ্ট্রাল হল | (আলোচনা) | শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য | ৭১ |
| কার্বন কপি | (গল্প) | শ্রীআশাপূর্ণা দেবী | ৭৫ |
| শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী | (আলোচনা) | শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় | ৮০ |
| দেবীকল্পনার উৎস | (প্রবন্ধ) | শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত | ৮১ |
| গোঁজ | (গল্প) | শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী | ৮৪ |
| অভিরতি | (গল্প) | শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় | ৮৮ |
| কবিতা | | | ৯১-৯৮ |

শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশ দাশ, শ্রীউমা দেবী,



"জাগো সুন্দর,
জাগো নির্মল,
জাগো আনন্দময়ী"।
—রবীন্দ্রনাথ

**মার্কি রেডিও**

**দেবসনস্ প্রাইভেট লিমিটেড**

কলিকাতা * পাটনা

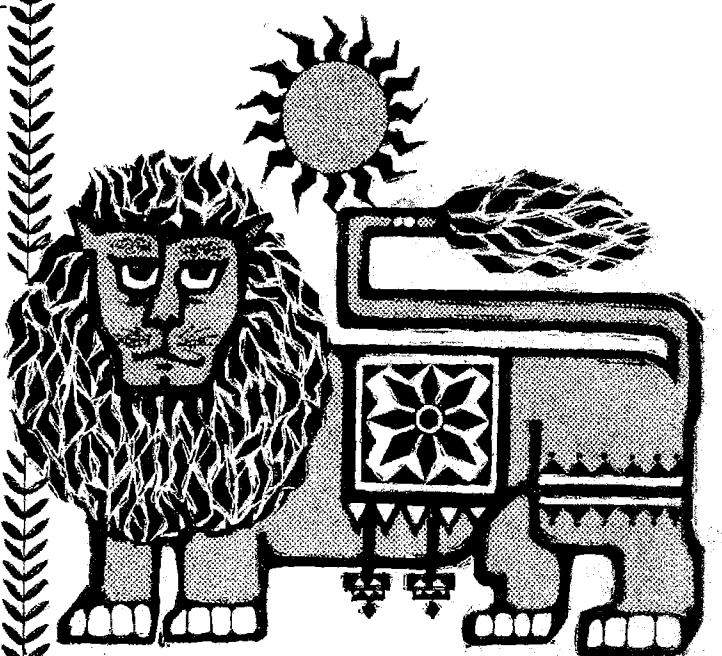

DP/PA/2-43

এবার পূজার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

॥অমলেন্দু ভট্টাচার্য ॥

**রক্তরাগ**

॥ হরেন ঘোষ ॥

**শিখর স্বপ্ন** ২·৫০

॥ দেবাচার্য ॥

**ধর্মদত্তা** (মহাকাব্য) ৮·০০

॥ ঊষাদেবী সরস্বতী ॥

**ধূলির ধরায়** ২·৫০

॥ মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

**পরপূর্বা** ২·৫০

**মধ্যাহ্নের গান** (যন্ত্রস্থ)

॥ শক্তিপদ রাজগুরু

**মন মানে না** ৩·০০

**পথ বয়ে যায়** ৩·৭৫

**অবাক পৃথিবী** ৩·৫০

॥ চিত্রগুপ্ত ॥

**আমি চঞ্চল হে** ৩·০০

॥ মনোজিৎ বসু ॥

**বেলাভূমি** ২·৫০

॥ শিবদাস চক্রবর্তী ॥

**মেঘ মেদুর** ২·৫০

॥ শান্তি দাসগুপ্তা ॥

**অগ্নিসম্ভবা** ৩·৭৫

॥ শ্রীশ্রীমাধব রায় ॥

**কিংবদন্তী** (যন্ত্রস্থ)

॥ প্রভাত দেবসরকার ॥

**আকাশপ্রদীপ** ৩·০০

॥ মনোজ সান্যাল ॥

**শ্বেত চন্দন** ৩·৭৫

অনুবাদ সাহিত্য

আলবার্টো মোরাভিয়ার
**WOMAN OF ROME**
এর বাংলা অনুবাদ

**রোমের রূপসী**

১ম খণ্ড ৪·০০

**রোমের রূপসী**

২য় খণ্ড ৫·০০

**THE WAYWARD WIFE**
-এর বাংলা অনুবাদ

**স্বৈরিনী** ৪·৫০

এমিল জোলার
**HUMAN BEAST** -এর বাংলা অনুবাদ

**পাশবিক** ৫·৫০

অনুবাদক ঃ—প্রবীর ঘোষ

**চলন্তিকা প্রকাশক**

২১২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬



## ● কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই।

কার্ল মার্কস্, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্

**প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ** ১·৫০

**উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে** ১·৫০

ভি আই লেনিন

**প্রাচ্য জনগণের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন** ১·১২

**সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রসঙ্গে** ০·৮০

মিখাইল শলোখফ

**ধীর প্রবাহিনী ডন** ৯·০০

**সাগরে মিলায় ডন** (১ম খণ্ড) ৬·০০

**সাগরে মিলায় ডন** (২য় খণ্ড) ৭·০০

ইলিয়া এ রেনবুর্গ

**পারীর পতন** ৮·০০

**নবম তরঙ্গ**
১ম খণ্ড ৪·৫০। ২য় খণ্ড ৬·০০
৩য় খণ্ড ৭·৫০

॥ লোক-বিজ্ঞানের বই ॥

আন্দ্রেই বাখারেভ

**ইভান মিচুরিন ঃ প্রকৃতির রূপান্তরের মহান সাধক** ০·৮৭

আলেক্সান্দ্র ভলকভ

**পৃথিবী ও আকাশ** ৩

এল লান্দাও ঃ ওয়াই রুমার

**আপেক্ষিকতার তত্ত্ব** ১·৫০

এম ভি বিয়েলিয়াকফ

**বায়ুমণ্ডল** ১

এম ইলিন

**শত সহস্র জিজ্ঞাসা** ২·২৫

তিয়ের-ওগালিয়েজফ্

**সূর্যগ্রহণ**

রুশ বিজ্ঞানকাহিনীকারদের

**চাঁদে অভিযান** ৩·০০

এফ আই চেস্তনভ

**আয়নোস্ফিয়ারের কথা**

* শারদীয় বিক্রয় অভিযান উপলক্ষে নিম্নলিখিত বইগুলির দাম কমানো
পিয়তর পাভলেঙ্কো ঃ **জীবনের জয়গান**—(সুলভ সংস্করণ ১·০০) আজে
তলস্তয় ঃ **অগ্নিপরীক্ষা** ঃ তিন খণ্ডে (৩ খণ্ড একত্রে ১৫, পরিবর্তে
আলেকজাণ্ডার কুপরিন ঃ **রত্নবলয়** (৫·৫০ পরিবর্তে ২·৭৫)
সলোভিয়েভ ঃ **বুখারার বীর কাহিনী** (৬·৫০ পরিবর্তে

**ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি**

১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ ১২ ॥ ১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর ৪

বিশ্বের অমর সাহিত্যিকদের
অসাধারণ গল্পের অনুবাদ সংকলন।

# কি বিচিত্র এই প্রেম

॥ আর্যভট্ট ॥

(১) ফর এ নাইট অফ্ লাভ—এমিল জোলা। (২) লেসনস্ ইন লাভ—গিয়োভানি ফিয়োরেনতিনো। (৩) দ্যাট পিগ্ অফ্ এ মারিন্—গি দা মোঁপাসা। (৪) ওয়ান অফ্ ক্রিওপেত্রাস্ নাইট্—থিওফিল গতের। (৫) দি স্টোরি অফ্ এ ফার্ম গর্ল্—গি দ্য মোঁপাসা।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় দৈনিক বসুমতী: এই বিচিত্র প্রেমের গল্পের বোধ হয় তুলনা নেই। গভীরতা, আবেগ, পটভূমিকা, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এবং তীব্র অনুভূতি ও passion একত্র হয়ে যেন এক একটি হীরের মত জ্বলজ্বল করছে।

— মূল্য তিন টাকা ২৫ —

## প্রতিমা বুক ষ্টল

২৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

# সূচীপত্র


| বিষয় | | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| কবিতা | | শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ, শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণ ধর, শ্রীরাম বসু, শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীমৃগাঙ্ক রায়, শ্রীসুনীলকুমার নন্দী, শ্রীআলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীতরুণ সান্যাল, শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়, অনিল ভট্টাচার্য, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্র রায়। | |
| স্বর্ণসন্ধ্যা | (উপন্যাস) | শ্রীমনোজ বসু | ১০০-১২৭ |
| ভালুক শিকার | (কাহিনী) | শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় | ১২৮ |
| আমি বৈজ্ঞানিক হলাম না | (গল্প) | শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় | ১৩০ |
| ইউরোপের জিপ্‌সি সমাজ | (প্রবন্ধ) | শ্রীদিলীপ মালাকার | ১৩৬ |
| দেওয়া নেওয়া | (গল্প) | শ্রীপরিমল গোস্বামী | ১৩৯ |
| সুখ | (গল্প) | শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ১৪২ |
| শহীদস্তম্ভ | (গল্প) | শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত | ১৪৭ |
| শাস্তি | (গল্প) | শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | ১৪৯ |
| পলাতকার প্রত্যাবর্তন | (গল্প) | শ্রীদীপক চৌধুরী | ১৫৪ |
| দোঁহে ডাকে দোঁহারে | (গল্প) | শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক | ১৫৮ |
| দুই বউ | (গল্প) | শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু | ১৬২ |
| প্রবেশ ও প্রস্থান | (গল্প) | শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র | ১৬৫ |
| চলতি বাজার | (রম্যরচনা) | শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | ১৭২ |
| দেহ ও মন | (গল্প) | শ্রীসুমথনাথ ঘোষ | ১৭৪ |
| মাদুলি | (গল্প) | শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল | ১৮১ |
| দুই লেখকের স্ত্রী | (আলোচনা) | শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় | ১৮৭ |
| বাবা | (গল্প) | শ্রীবনফুল | ১৯০ |



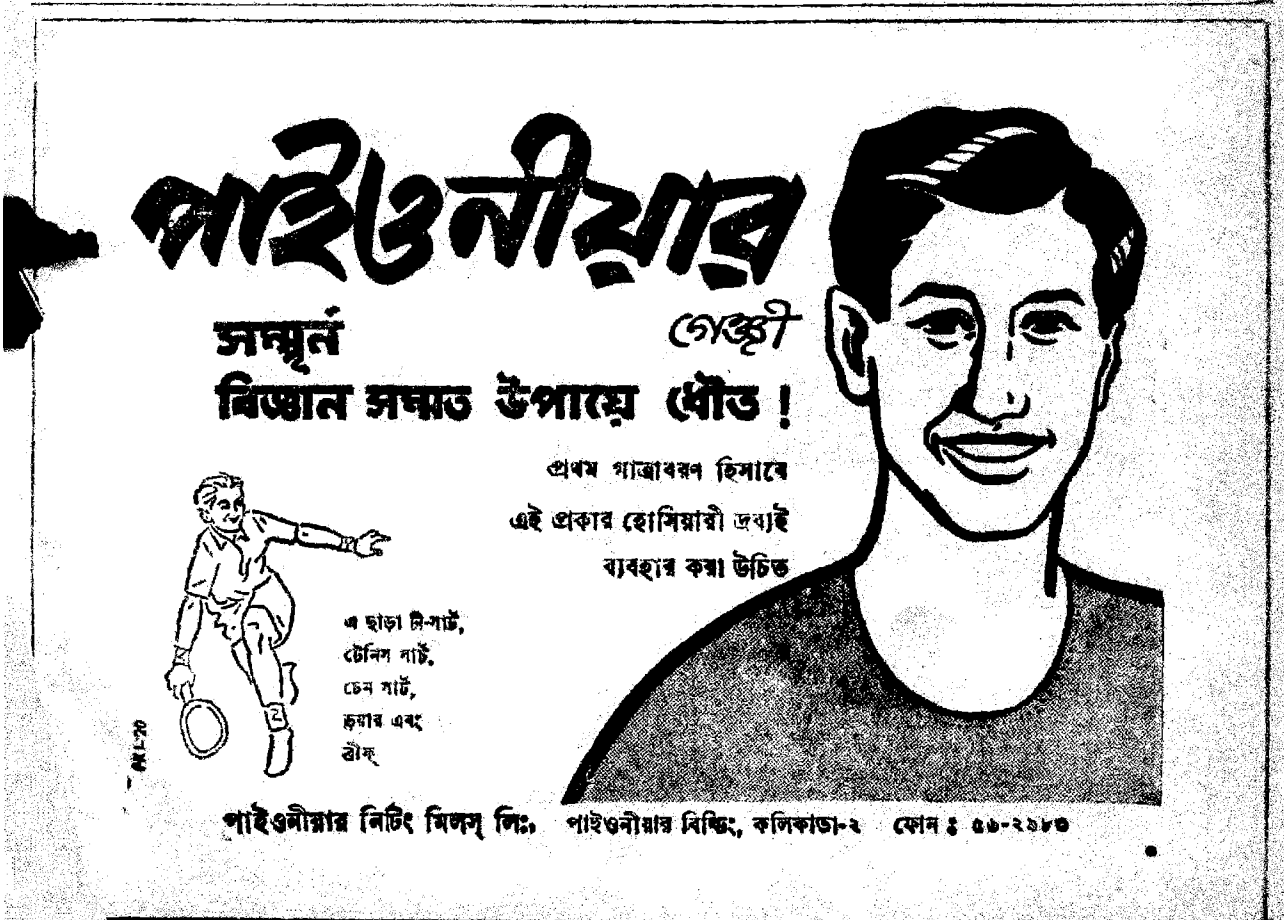

# পূজার আনন্দ উৎসব

## প্রতিশ্রুতি

বিনামূল্যে উপহার

**এখানে এসে জিনিষ কিনতে আপনার গায়ে লাগবে না।**

সহজ এবং সামান্য টাকার প্রতি মাসে কিস্তিতে নিয়ে আপনি আপনার সখের জিনিষ কিনতে পাবেন, আর সেই সঙ্গে বিনামূল্যে আপনি হয়ত কোন না কোন দামী উপহার পেতে পারেন।

১৯৬৩ সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে যাঁরা এখান থেকে জিনিষ কিনবেন তাঁদের 'লাকি' কুপনমেমো এবং 'লাকি' সর্তাবলীর সই করা কাগজে নিম্নলিখিত যে কোন একটি উপহার লাভ কোরতে পারেন। এগুলি সবই প্রয়োজনীয়। ফলাফল ঘোষণা হবে, ১লা নভেম্বর।

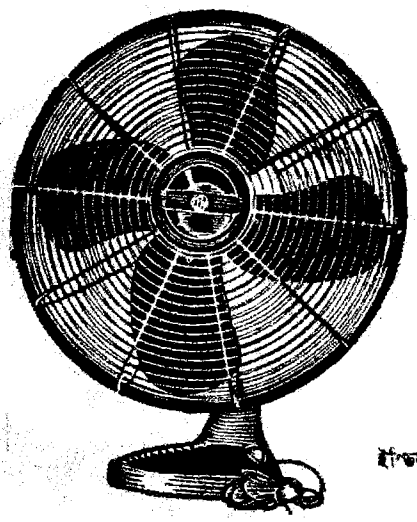

ইণ্ডিয়া ইলেকট্রীক ফ্যান

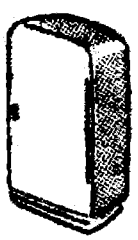

হিমালায়

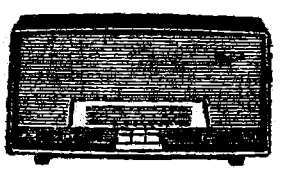

মারফি ট্রানজিস্টার রেডিও

১) হিমলায় রেফ্রিজারেটর
২) মারফি ট্রানজিসটার রেডিও
৩। ইণ্ডিয়া ইলেকট্রীক ফ্যান
৪) অলউইন ষ্টীল আলমারী
৫) হাই-ডেন প্রেশ্চিজ কুকার

**ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং**

২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।
২২-৩০৯৬ • ২২-৩৯৩৮

• মাত্র ২৫৲ টাকা অগ্রিম আদায় দিয়ে একটি জনপ্রিয় অলওয়েভ রেডিও সেট ভোগ করুন।

স্নিগ্ধ কোমল শারদ-সমারোহে !

**শিশু-ভারতী**

॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ॥
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মণি-মঞ্জুষা
দশ খণ্ড : মূল্য : ১০০·০০

**সচিত্র মহাভারত**

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত
মহাভারতের পুণ্য কাহিনী
অসংখ্য ছবি। মূল্য ১৬·০০

**বিজ্ঞান-গ্রন্থমালা**

জগদানন্দ রায় (১৬ বই)
বিজ্ঞানের তথ্য-নির্ভর আলোচনা
॥ ছোটদের কাখানা অনুপম বই ॥

বিদ্রোহী বালক ... ২·২৫
রূপকথার দেশে ... ২·৫০
যাদুপুরী ... ১·২৫
যোগেন্দ্র গুপ্ত
তরুণ রবি ... ৪·০০
বীরসিংহের সিংহ শিশু ২·৫০
নয়ন মুখোপাধ্যায়
রাজ্যের রূপকথা ... ৫·০০
সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রূপদেশের উপকথা ... ২·২৫
অরুণ ঘোষ
শুধু হাসি ভেবোনা ১·৫০
পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

**ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস**
২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

# সূচীপত্র


| বিষয় | | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| একটি শাপগ্রস্ত ঐতিহাসিক হীরকের কাহিনী | (রহস্য কাহিনী) | শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় | ১৯২ |
| কর্মখালি/মেন্টারী | (গল্প) | শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় | ১৯৫ |
| কলেজ ষ্ট্রীট | (আলোচনা) | শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার | ১৯৭ |
| হারিয়ে পাওয়ার গল্প | (গল্প) | শ্রীশেফালী চট্টোপাধ্যায় | ২০০ |
| পাগল | (গল্প) | শ্রীঅনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় | ২০২ |
| ধূমপান | (প্রবন্ধ) | শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য | ২০৫ |
| কাঁটার ফুল | (স্মৃতিচারণ) | শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী | ২০৭ |
| আগামী দিনের বাঙলা ছবি | (আলোচনা) | শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ (এন-কে-জি) | ২১২ |
| ছবির ছন্দ | (আলোচনা) | শ্রীঋত্বিক ঘটক | ২১৫ |
| দর্শকের দর্পণে | (সাক্ষাৎকার) | শ্রীআশীষতরু মুখোপাধ্যায় | ২১৮ |
| সেন্সর ও ভারতীয় চলচ্চিত্র | (আলোচনা) | শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় | ২২০ |
| পর্দার অন্তরালে : নেপথ্যভাষণ | (সাক্ষাৎকার) | | ২২৩-২৪৫ |
| | | শ্রীআশাপূর্ণা দেবী, শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য, শ্রীসত্যজিৎ রায়, শ্রীসুব্রত মিত্র, শ্রীবাণী দত্ত, শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন রায়চৌধুরী, শ্রীঅর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন ঘোষাল, শ্রীকানন দেবী। | |
| একাই একশো ! | (প্রবন্ধ) | শ্রীঅজয় বসু | ২৪৬ |
| কবেকার কলকাতা | (প্রবন্ধ) | শ্রীকণাদ চৌধুরী | ২৫০-২৬২ |
| একটি চরিত্রহীন গল্প | (গল্প) | শ্রীমিহির আচার্য | ২৬৩ |
| রমণীয় যুগে যুগে | (আলোচনা) | শ্রীসন্দিতা বসু | ২৭০ |
| অঙ্গসজ্জা : | | শ্রীশৈল চক্রবর্তী, শ্রীসমর দে, শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ, শ্রীসূর্য রায়, শ্রীসুধীর মৈত্র, শ্রীঅজিত গুপ্ত, শ্রীধ্রুব রায়, শ্রীশ্যামল সেন, শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী, শ্রীস্বপন রায় ও শ্রীধ্রুবজ্যোতি সেন। | |


[ দাম : তিন টাকা ]

॥ আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
**অনিমিষা** ৪·৫০

আশাপূর্ণা দেবীর
**দিনান্তের রঙ** ৬·৫০
বুদ্ধদেব বসুর
**শোণপাংশু** ৪·০০
**যেদিন ফুটলো কমল** ৪·০০
প্রাণতোষ ঘটকের
**রাজায় রাজায়** ৯·০০
সুশীল রায়ের
**ত্রিনয়না** ৫·০০
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
**প্রেমতারা** ৪·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
**মেঘের উপর প্রাসাদ** ৭·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের
**মনে রেখ** ৬·৫০
প্রতিভা বসুর
**অতল জলের আহ্বান** ৩·৫০
দীপক চৌধুরীর
**মালদা থেকে মালাবার** ৩·০০
**ঝড় এলো** ৫·০০
**পাতালে এক ঋতু** ৬·০০
নির্মল সরকারের
**ছায়া দিগন্ত** ৪·০০
বিনয় চৌধুরীর
**বেত্রবতী মরানদী** ৩·৫০

বিমল মিত্রের
**অন্যরূপ** ৫·৫০
সুষমা দেবীর
**স্বাহা** ৫·০০
রোমাঞ্চ ৩·৫০
**শঙ্খবিষ** ৫·৫০
**এই গ্রহের ক্রন্দন** ৬·০০
ধীরাজ ভট্টাচার্যের
**মন নিয়ে খেলা** ৫·০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট; কলিকাতা—১২

উৎসবের
দিনগুলি
আনন্দমুখর
করে

# লিলি বিস্কুট

*দুইটি জনপ্রিয় বিস্কুট*

**কার্নিভ্যাল**
**ও**
**থিন এরারুট**

লিলি বিস্কুট কোং, প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

# ঘোড়া হাটের পালা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

।। চিত্রকর চিত্র দর্শন ।।

ও দেখেন দেখেন চিত্রে দেখেন
রথের ঘোড়া কাঠের ঘোড়া,
জলকলের জল পী পী ঘোড়া,
বাজি ঘোড়া তাজি ঘোড়া,
বর্মা পনি আরবী ঘোড়া,
হুকড়া গাড়ির নেংড়া ঘোড়া
জোড়া জোড়া জুড়ে আছেন,
খেংরাপটির অলি গলি—
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি।

।। হরিশ, হাটুরে ও বাটুরের প্রবেশ ।।

হাটুরে। ঘোড়া-হাট জমলো কেমন?
বাটুরে। ওহে হরিশ ঐ!
হরিশ। ঘোড়া কিনতে এলো ময়রা বুড়ো
রথ টানাবে তের চুড়ো।
রথ-তলায় ভারি কান্ড রৈ রৈ,
ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, লোক হাঁকে
পথ চলায় কার সাধ্য কৈ কৈ।

হাটুরে। এই মরেছে, নায়েব এয়েচে।
বাটুরে। লাভের কড়ির মাথা খেয়েছে।
হাটুরে। নে কলকেটা ফুঁকে নে
হরিশ। বানরে শুনেছি ধরবে ধ্বজা
চল দেখি গা রথের মজা।

।। নায়েব মশায়ের প্রবেশ ।।

নায়েব। উঃ উপরে সূর্যের তাপ নীচে মুর বালি
সর্ষে ফুল দেখিতেছে চক্ষের পুতলী।
বেম্মোতেলোটা গরম হয়ে উঠল, বলি ও হরিশ, হাট জমলো কেমন? কও তো কে কে আসলো?
হরিশ। গোমসামুখো গোরে ওঝা
রোলো বিকোয় পয়সা জোড়া।
ঘোমটা তোলা বামন বৌ
নিলে ক্ষোয়া-ক্ষীর দেড় পোয়া,
আটগাছা গালায় চুড়ি রাং মোড়া,
সিঁদুর কৌটো দুটো জোপালিস নক্সাতোলা,
শাড়ি দশহাত মাছি বুটি,

পিলে। একটা জ্যান্ত ঘোড়ার চেষ্টায় আছি। মস্ত রথ কিনা ঘোড়া না হলে—

ওমেশ। দেখ না, জ্যান্ত ঘোড়া একটা যদি পাও তো ঐ কৈলেসের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়।

ভোলা। একটা ঘোড়া পেয়েছি, কিন্তু একটা পা কুকুরে কাটা।

ওমেশ। সে কিছু নয়। খুব ভালো ওষুধ পেয়েছি—এই দেখ। কথামালা উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন—কুকুর-দষ্ট মনুষ্য—এক ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াইয়া দিল—তারপর, যাক গে, হাঁ—যদি ভাল হইতে চাহ, আমি যাহা বলি তাহা কর।

ভোলা। পিলে শুনে থাক।

ওমেশ। যদি ভাল চাহ—ক্ষতের রক্তে রুটির টুকরা ভিজাইয়া যে কুকুর কামড়াইয়াছে তাহাকে খাইতে দাও।

ভোলা। চাপাটি না পাঁউরুটি?

ওমেশ। নিশ্চয় পাঁউরুটি। হিন্দু হয়ে বিদ্যাসাগর কি আর ওটা খুলে লিখবেন?

ভোলা। এই তো ভাবনাতে ফেল্লেন—কোন কুত্তোতে কাটলে জানি কি প্রেকারে?

দালাল। কাচারির চেনা কুকুর একপাল, তারি মধ্যে ওটাও আছে।

ভোলা। দেড় কুড়ি কুকুর—রুটি যোগাতে নিজের আহার মাটি।

পিলে। তারপর রুটির লোভে সব কটা এসে ঘিরে ধরুক তখন ঘোড়াশুদ্ধ সবংশে নিপাত।

ওমেশ। আহা লিখেছেন, তুমি নিঃসন্দেহে ভাল হইবে। বিদ্যাসাগর যা তা লেখেন নি। রুটির ভাবনা নেই, রুটিওলা আমার হাতে আছে, আমাদের সমসুর চাচা সে।

ভোলা। মানুষকে কাটার কথা লিখেছে, ঘোড়াকে সে ওষুধ খাটবে কেন?

ওমেশ। ঘোড়াতে মানুষে কি তফাৎ আছে গো—ঘোড়া ধরে পিঠে জিন, মানুষ ধরে পেটে জিন। মন-এ অশ্ব জোড়ো হবে মনুষ্য। মনুষ্য থেকে মন বাদ দাও বাকি রইলো অশ্ব। হিসেব বোঝো না? এই দেখ সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা কথামালায় অশ্ব বলছে অশ্বরোহীকে—ভাই! হরিণ আমার বড় অপকার করিতেছে। জাত-ভাই না হলে এ কথা কেউ বলে থাকে? মানুষ যে নানা রকমের আছে গো—যত প্রকার জানোয়ার তত প্রকার মনুষ্য। 'প্রতাপসিংহ' 'রমসিং' 'হংসরাজ'। অত কথায় কাজ কি—'পশুপতি'—আর চাই কি! চলি এখন কাজে।

দালাল। চলেন—আমিও চলি নায়েব মশায় বাসায়।

ভোলা। পিলে, একগাছ কথামালা নিয়ে চল ঘোড়াটা ডাকাডাকি করা যাক্‌গা।

[সকলের প্রস্থান

॥ কৌশল দাঁ ও নায়েব মশায়ের প্রবেশ ॥

নায়েব। এস একটু চালাটার তলে বসা যাক। আষাঢ় মাসের ধুপ বড়ই তেজস্কার। পেয়াসের জোরে প্রাণ করে হাহাকার। ঘোড়াটার কি হল হে কৌশল?

কৌশল। এই এখনি ডাকাডাকি শুরু হবে। এই যে মোড়ল মশাই আসছেন।

॥ ওমেশ মণ্ডলের প্রবেশ ॥

নায়েব। এদিককের কত দূর?

মোড়ল। মাছ ঠুকরেছে। কুকুর-কাটা শুনে ভড়কেছিল, এক কথামালা, রসমঞ্জরী আর নামাবলীতে কাজ হাসিল পনের আনা। এখন আমার ছাওয়ালটার কাজটা যাতে—

নায়েব। সে হয়েই আছে জানো। ঘোড়াটা গছাতে পারলেই হয়, দুকুল নেওয়াই আছে।

মোড়ল। পিলে গোবিন্দটা বাগড়া দিচ্ছে, না-হলে এতক্ষণ গেঁথে তুলতেম। বেন্দাবনকে কৌলেস গোঁসায়ের কাছে পাঠায়ে তবে আসছি।

॥ বিন্দাবনের প্রবেশ ॥

কৌশল। কি হল বিন্দাবন?

বিন্দাবন। আসছেন, টোপ গিলেছে।

নায়েব। দেখ, টোপ গিলে না ছেড়ে যায়!

বিন্দাবন। তার যো কি? এক গান আছে।

নায়েব। গাও শুনি।

॥ গীত ॥

তবে কি বঁড়শি খেতো, টোপ গিলিত
মাছের যদি মন থাকিত।
ও সে একবার টোপ গিলিয়ে ছুটে গিয়ে
আবার এসে না গিলিত।
গলাতে বঁড়শি হানে ছিপের টানে
ছটফটানি অবিরত
কাঙ্গাল কয় মানুষ হয়ে মন হারায়ে
হলেম আমি মাছের মতো
হয়ে লাভের অনুগত।

মোড়ল। ওউ ভিস্তি, বড় ধুপ চলারে। সামনেটায় জল ছিটারে দেও।

॥ ভিস্তির প্রবেশ ॥

ভিস্তি। মুশয়, আস্তাবোলমে পানি দিয়া, বাগিচামে পানি দিয়া, বৈঠকখানামে পানি দিয়া। মুশয় মুশয় পানি বিনা ঘোড়া মর যাতা। বেগর পানি ফুলবাগিচা শুকাই যাতা।

নায়েব। এখানটায় একটু জল। তোমার ফুল-কপির বাগিচায় পরে জল দিও শীতকালে। ঠাণ্ডা হয়ে আমরা বাঁচি, দাও জল ছিটান।

॥ ভিস্তির গীত ॥

শীতল শীতল পানি ছিটল
মিঠল মিঠল লহর পানি।
গঙ্গা পানি ভরল নিল
বম্বা পানি ছিটল দিল,
মোশক মোশক মুছয় মুছয়।

নেপথ্যে। ঘোড়া পালালো—ধর ধর ও ধর ধর ধর!

॥ যদু মাষ্টারের দ্রুত প্রবেশ ॥

যদু। আই কম্ বাই-কম্ তাড়াতাড়ি
যদু ডাক্তার তাড়াতাড়ি
হর্স রাণ পাকড়ান
কম্ কম্ কম্ কম্ জলদি কম্
পা পিছলে পচাৎ দম।

॥ মোণ্ট সহিসের প্রবেশ ॥

মোণ্টা। এঃ জল ছিটায়ে কাদা করচে।

মোড়ল। ও রে ও মোণ্টা, ঘোড়া পালালো কি দৌড়ে ধর।

কৌশল। হ্যাঁ দেখ, কথা কয় না—হল কি তোর?

মোণ্টা। নায়েব মশয়, বিচার করেন ঐ যদু মাষ্টর—

যদু। ডাক্তার বল! বলি আমার দোষটা কি হল? ঘোড়া নিয়েছি ভাড়া, তার পিঠে বসবো, ছাঁওয়াতে বসবো এর আবার বিচার কিসের?

মোণ্টা। গোরাই নেলেন ভাড়া। এক পিঠ চড়লেন ভাড়া দেলেন, কিন্তাম ছাঁওয়া তো ভাড়া দেই নাই। গোরার প্যাটের তলায় বৈসেন কি হেছাবে? দ্যান এহন, ডবল ভাড়া।

যদু। তোমার ঘোড়া? ভাড়া দিতে হয় কাছারিকে দেবো—কাছারির ঘোড়া, সবাই জানে!

নায়েব। তকরার রাখ, ঘোড়া ধর গিয়া, নয়তো দুই জনকেই দায়িক করছি।

॥ পিলে ও ভোলার প্রবেশ ॥

পিলে। ঘোড়া ছেড়ে ভাড়া নিয়ে দুজনে ধুন্ধুমার বাধালে হাটের

এখন সে চলতে এলে মাথা চালে
অনিচ্ছাতে ঘাড় বাঁকায়।

।। হাটুরের প্রবেশ ।।

হাটুরে। টানা হেঁচড়া কর কেন? চড়িয়ে দাও সওয়ারি। পেটে কিছু নাই, পিঠে চাপ পড়লেই সোজা চলবে, হেলবে না দুলবে না।

ভোলা। পিলে, আমি চাপি, তুই লেজ মোড় দিতে দিতে চল তালতলী ঘুরে।

।। গীত ।।

সেই তালতলী বাঁধ অল্প জল
ছাপা ছৈ নাল ফুলে,
খেজুর গাছে লেজঝুড় পাখী
ডাক দিয়ে দিয়ে দোলে।
বলেরে সই ঘাটে কে ঐ—

।। শৈল ও হৈমর প্রবেশ ।।

শৈল। বলি ও হৈম!

হৈম। কি লা শৈল!

শৈল। দেখ্ দেখ্ বুড়োটা চলেছে ঘোড়ায়, আর ছেলেটাকে হাঁটাচ্ছে। দয়া মায়া নেই গা?

হৈম। বুড়ো বয়েসে পাটের থোক
হেসে মলো পাড়ার লোক।

শৈল। আহা কি বা মুখের ছাঁই
তবু হলুদ মাখে নাই।

হৈম। আবার বুড়োর দাঁত বার করে হাসি দেখ্!
দাদার বয়েসে খান্ না পান
দাঁত বার করে গেল পরাণ

শৈল। ওলো ও যে ভোলানাথ আর প্যালারাম। কুটুম্ব মানুষ চুপ্ চুপ্!

হৈম। চুপ করবো কেন? বলি
ভেয়ের নাইকো মনে
বুবু কাঁদে বেত সাগরের বনে।

[প্রস্থান

ভোলা। ওরে পিলে বড় লজ্জা দিয়ে গেল। আয় বাপু তুই সোয়ার হ আমি হেঁটেই চলি।

।। পিলে সোয়ারির গীত ।।

দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি হামি চলি যাও রে
সমরে চলিনু আজি হামে না ফেরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণ রঙ্গে
ঝাঁপ দিবে প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে।
ওই শুন বাজে ঘন রণ জয় বাজনা
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা।
উড়িল আমার ঘোড়া, এরে না থামাও রে
দাও দুই কানে মোড়া কসে চাবকাও রে।

[প্রস্থান

।। পাঠশালার ছেলেদের প্রবেশ ও গীত ।।

অগ্গদ পাঁড়ে লগ্গট সিং
দাঁও প্যাঁচ ঝাড়ে।
ধরে মেড়ার শিং,
চলে ত্রিং ভুং
তাল পাতার সেফাই নড়ে,
লাফালাফ গপ্পা ফাড়িং।

প্রথম। ও দেখ্ সত্যিই তালপাতায় সেফাই আসছে রে।

দ্বিতীয়। ওরে পিলেটা ঘোড়ায় চড়েছে।

তৃতীয়। ও তারকদাস, পিলে তো বড় বেইমান—দাদাকে দিয়েছে ঘোড়ার রাস, নিজে হয়েছে সওয়ার।

চতুর্থ। তাই নয় নিজেও হাঁটো! চলেছে যেন কল্কি অবতার!

।। এক হাতে কাঠের ঘোড়া অন্য হাতে
দড়ি লইয়া ভোলার প্রবেশ, পিছনে তারক ।।

ভোলা। বলি ও ছেলেরা—দড়াগাছ একবার ধর। দেখো পিছলি হটতে দিও না। আমি থকে গেছি, একটু সামলে নিই! এঃ কাঠের ঘোড়াটা ভারি তো কম নয়! তারক—এটাকে ধরো একবার দাদা!

তারক। এ সব বুঝি রথের সরঞ্জাম খরিদ হল! ঘোড়াটা একটু ছোট হল না?

ভোলা। দমে ভারি আছে। জ্যান্ত ঘোড়া থাকবে একদিকে, এটা থাকবে একদিকে জোতা রথ আর হেলতে পাবে না।

।। পিলের প্রবেশ ।।

ভোলা। ঘোড়া থেকে নাবলি কেন?

পিলে। লোক হাসাহাসি করছে, নানান কথা উঠেছে।

ভোলা। কেন, কেন? আবার কি কথা উঠল? অ্যা?

পিলে। লোকে বলছে একালে বুদ্ধের সম্মান নেই—ছোট চলে ঘোড়ায়, বড় চলে হেঁটে।

তারক। এ তো ঠিক কথাই বলেছে। এমনিই তো হয়েছে কলিকালে!

।। গীত ।।

কাল হয়েছে কলি দুঃখের কথা বলি কায়?
আসল যা তা নকল হল, আদরে নকল বিকায়।
পুরাতন চাল কেউ পোঁছে না,
মুখে রোচে না নতুন বিনা।
মান্যমান পথে হাঁটে
কান-কাটা চাপে শিবিকায়!

ভোলা। যখন খালি ঘোড়াটা দুজনায় তাড়িয়ে চল্লেম, তখন লোকে বল্লে, নির্বোধ ঘোড়া থাকতে হেঁটে চলে, ঘর থাকতে বাবুই ভেজে। চড়লাম নিজে ঘোড়াতে—শৈল আর হৈম বল্লে—বুড়োর আক্কেল দেখ, ছোট ছেলেটিকে হাঁটাচ্ছে, নিজে যাচ্ছে মজায়। চড়ালাম পিলেকে, নামলাম নিজে—এখন বলে ওতেও দোষ। কার মন রাখি বল?

পিলে। অ্যা করতে ও চটে, স্যা করতে হুঃ চটে!

ভোলা। দোকর সমিস্যে—আন্ ঘোড়া, দুজনেই চড়ি। যা থাকে কপালে!

তারক। বুড়ো খোঁড়া ঘোড়াটাকে কি হত্যে করতে চাও. অত ভার চাপিয়ে?

ভোলা। কি করি তাই বল—শ্যাম রাখি না কুল রাখি?

।। গীত ।।

শুনরে ভাই আমারে সবাই—
যা নয় তাই কইলে কি হবে
মিছে দাও লাজ, করেছি যে কাজ
তার কি উপায়, বল আজ সবে।
গোসা করোনা আমার কি দোষ
এরে তুষিলে ওর হয় রোষ
রাখি কার মন, ভাবি তা এখন
মানিব কখন যেমনি করে!

বলি ও তারক, তুমি লেখাপড়া শিখেচো—কথামালা পড়ে বলতো দাদা দেড়টানায় কিসে পরিত্রাণ পাই।

পিলে। টানা-হেঁচড়াতে ঘোড়ার সঙ্গে আমরাও মরি বুঝি।

তারক। বলি, ঘোড়াটি কার শুনি।

# অভিনয়

## তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোড়শী সংঘ ইংরিজীতেও তাই লেখে তবে ফুলমুন ক্লাব নামটাও আছে। ওইটেই প্রথম ছিল—পরে ওটা বাতিল হয়েছে, নামের তাৎপর্যটাকে বড় করবার জন্যে। ষোলজন নিয়ে ক্লাব—ষোল কলায় পূর্ণেও বলা যায় কিন্তু পূর্ণিমা বা ফুলমুন এটা চলে না। এখন শুধু ষোড়শী। সভ্যদের বয়স বত্রিশের বেড়ায় গণ্ডিতে ঘেরা। তবুও সময় বিশেষে নাটকের খাতিরে হয়তো বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কঠিন পার্ট করতে কখনও কখনও বাইরে থেকে নামজাদা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিতে হয়। ওখানে বলতে গেলে বলতে হয় বত্রিশের বেড়ার মধ্যে বেমালুম জোড় দেওয়া একটা আগড় আছে সেটা খুলে দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম রঙ্গমঞ্চের নামকরা নাটকে ওদের যাত্রা শুরু হয়েছিল—তারপর কর্ণধারের ইচ্ছায় এখন রঙ্গমঞ্চের পাড়ি দেওয়া স্রোত বন্ধ দিয়ে নতুন নাটকের অনাবিষ্কৃত স্রোত ধরে চলতে শুরু করেছে।

এরই টানে ওই আগড়ের প্রবেশপথে ষোড়শীর মধ্যে পঁয়ত্রিশের জন্মদিন পার হয়েও প্রবেশ করলে নাট্যকার-নট-সাহিত্যিক অংশু রায়। নাট্যকার এবং নট হিসেবে সে অংশু রায় কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে সে তার পুরো নাম অংশুমান দেবরায় নামে পরিচিত। নাটক সে কমই লিখেছে—অভিনয়ও কমই করছে—সাহিত্যিক হিসেবে সে উদীয়মান থেকে উদ্বেল উঠেছে। এবং

একটু বিশিষ্টও বটে। বৈশিষ্ট্য তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে। ডানপন্থী বামপন্থীর কোন দলের কোন ধার ধ'রে চলে না, মাঝখান ধ'রে চলে। তারপর কাগজের দলের মধ্যেও থাকে না। একটু একাকিত্বই তার বিশেষত্ব। নামও তার আছে। হয়েছে। ওকে র‍্যাবিশ বলে ফেলে দেবার জন্যে আলোচনার মুখরতা সত্ত্বেও ফেলে দেওয়া যায় না। কোন পুরস্কার সে পায়নি কিন্তু পুরস্কার যারা পেয়েছে প্রবীণ তারা তাকে সমাদর করে। কাগজওয়ালাদের দলের যে মতই হোক না কেন তার লেখার অনাদর করে না। সমাদর করেই ছাপে। বইয়ের বাজারে চাহিদা আছে সুনামও আছে, বই বিক্রী হয় বলেই নয়—অগ্রিমের দাবী নেই বলেও বটে। মিটিংয়েও ডাক পড়ে কিন্তু অংশুমান বড় যায় না। গেলে নিজের উপস্থিতির দাগ রেখে আসে। নিরিবিলি একাকী থাকতে থাকতে তার খেয়াল হল নাটক লিখতে। সেটা রেডিয়োর জন্যে প্রথম। প্রথম নাটকই খুব সাফল্যমণ্ডিত হল। তারপর পর পর কয়েকখানাই একাঙ্কিকা সে লিখে ফেললে। কয়েকটা রেডিয়োতে হল। কয়েকটা হল না কারণ রেডিয়োর সরকারী বাধানিষেধ সেখানে অনেক। যেমন অবৈধ প্রেম পর্যন্ত সেখানে চলে কিন্তু সেই প্রেমের পরিণামে যদি কোন নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয় তা হলে তার কান্না উঠলে বায়ু-তরঙ্গে কালবৈশাখীর ঝড় উঠে ট্রান্সমিশন বন্ধ হয়। তারপর সরকারবিরোধী কিছু থাকলেই মুস্কিল। সে যাক। আবার তাদের মতে যোগ্যতা বিচারের রায়টা অংশুমানের বিচারের সঙ্গে না মিলতেও পারে। এমনি একটা একাঙ্কিকা নিয়েই অংশুমান হটকারিতাবশে একটা দলের সঙ্গে নায়কের ভূমিকায় নিজেই নেমে পড়ে নট হিসেবে খ্যাতিলাভ করলে। প্রথম, যারা অভিনয় করছিল বইখানা —তারা তাকে নায়কের ভূমিকা দিতে খুঁতখুঁত করেছিল, কারণ হলেনই বা নামকরা সাহিত্যিক তা' বলে অভিনয় ভাল করবেন তার কি মানে আছে। কিন্তু মানে আছে—সেটা অংশুমান জানত বলেই সে এগিয়েছিল। অভিনয়ের প্রথম স্তর হ'ল দর্শক। একসঙ্গে এতগুলো চোখ আর কালো কালো মাথা যেন একটা বিভীষিকার সৃষ্টি ক'রে সব গুলিয়ে দেয়। বক্তৃতা করা সোজা কিন্তু অভিনয় করবার সময় নিজের জ্ঞানের কথা কিংবা পরকে পেঁচিয়ে গাল দেওয়ার ব্যঞ্জন চাটনী পরিবেশন করা চলে না, আমি অমুকচন্দ্র অমুক এ কথাও মনে রাখলে চলে না—বলতে হয় মুখস্ত করা কথা এবং গোঁফদাড়ি পরে নিজের অমুকত্ব ঢাকা দিতে হয়। নিজেকে ভুলতে গিয়ে সব ভুলে যায় মানুষ এমন কি কানেও কি হয় প্রমটিং শোনা যায় না। এ বিষয়ে অংশুমান অবহিত ছিল। তার উপর নিজের লেখা নাটক সুতরাং রিহারশ্যালে অন্যদের সন্দেহ অপনোদন করেই ক্ষান্ত হল না—একেবারে ঘোড়দৌড়ের শেষ জায়গায় ওদের থেকে গোটা দেহটাকে বেশ হাত কয়েক এগিয়ে দৌড় শেষ করলে। ওদের সঙ্গে আরও কয়েকটা একাঙ্কিকা সে অভিনয় করলে ঝোঁকের বশে এবং অংশু রায় নাট্যকার ও নট বলে খ্যাতিলাভ করলে। এ সব অবশ্য বছর পাঁচেক আগেকার কথা। তারপর সে নিজেকে সম্বরণ করেছিল। এই সময়ের মধ্যে খানদুয়েক ভাল বই লিখে সাহিত্যিক খ্যাতিতে ভারী হয়ে উঠল। কেউ সচরাচর অভিনয়ের অনুরোধ নিয়ে আসত না। হঠাৎ এল ষোড়শী সংঘ।

তারা প্রবীণ প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক শিবনাথবাবুর একটি একাঙ্কিকা 'কালরাত্রি' অভিনয় করবে। অনুমতির জন্য তারা শিবনাথবাবুর কাছে গিয়েছিল কিন্তু শিবনাথবাবু অনুমতি দেন নি। কারণ নাটকটি রেডিয়োর জন্য লেখা, শোনার নাটক—তাকে দৃশ্যনাট্য করতে গেলে জমানো মুস্কিল হয়। একবার একটি প্রতিষ্ঠান এই একাঙ্কিকাখানি করতে গিয়ে এমন ব্যর্থ হয়েছিল যে তিনি দেখতে গিয়ে দুঃখ পেয়েছিলেন। ষোড়শী সংঘের এবারের পরিচালক রঞ্জন অংশুমানের ভক্ত এবং প্রায় বন্ধু বটে। প্রায় অংশুমানের কাছে আসে—তার প্রশংসা করে, তার কথা শোনে—অংশুমানের জন্মদিনে যে অল্প কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আসে, তাদের মধ্যে সে-ই নিয়ে আসে সব থেকে ভাল ফুল, ভাল মিষ্টি এবং ভাল উপহার। শুধু তাই নয়, সে নিজে রান্না করে ভাল—মধ্যে মধ্যে অংশুমানের গৃহিণীহীন গৃহে মাংস কিনে এনে রান্না ক'রে অংশুকে খাওয়ায় নিজে খায়। ১৯৬০ সালে অংশুমান পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক সুতরাং তার গৃহ গৃহিণীহীন কেন এ নিয়ে প্রশ্ন কেউ করে না—কিন্তু গবেষণা স্বাভাবিক ভাবে অনেকই হয়। ভবিষ্যতে পত্র-সাহিত্যে অংশুমানের পত্রসঞ্চয় থেকে হয়তো ভাল কিছু পাওয়াও যেতে পারে—কোন অজ্ঞাতনাম্নী নারী সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি-লাভ করবেন এ অনুমানও করে; কিন্তু রঞ্জন বলে—সে নিশ্চিন্ত জানে অংশুবাবু পত্রগুলি কিছুদিন অন্তর বহ্নিমুখে সমর্পণ করেন। তবে এটুকু বলতে পারি লোকটি মদ খেলেও মাতাল নয়, প্রেমপত্রের উত্তর দিলেও প্রেমিক নয়, গৃহিণী না-থাকলেও গৃহ-খানি পরিপাটী ও গৃহস্বামী হিসেবে শক্ত পোক্ত! মানুষ হিসেবে মডার্ন—ভগবান মানেন না; সমাজ তাঁর কাছে মৃত—ডেড, রাষ্ট্রের আইনকে মানেন কিন্তু কংগ্রেস সম্পর্কে ধারণায় নিজে সুখী নন, বলেন ফেলকরা ছাত্র; তবে জীবন নিয়ে ভাবেন। সে ঠিক বুঝি না। লোকের পাওনা সম্পর্কে সচেতন—শোধ দেবেনই। ভিখিরী-দের ভক্তিমতী গৃহিণী পরিচালিত গৃহের মত ভিক্ষে দেবার ব্যবস্থা রেখেছেন। বড়লোক বন্ধু আছে কিন্তু সদ্ভাব নেই, কিন্তু কম্যুনিষ্ট নন।

এই রঞ্জন অংশুমানের কাছে এল শিবনাথবাবুর কাছে একখানা পত্রের জন্য। অংশুমানকে শিবনাথ স্নেহ করেন, অংশুমান যদি লেখে যে এরা অভিনয় ভাল করে এবং করবে তাহ'লে শিবনাথ অনুমতি দেবেন। অংশুমান লিখে দিয়ে বিপদে পড়ল। শিবনাথ অনুমতি দিলেন এবং লিখলেন—"তুমি যদি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় কর তবে খুব খুশী হব। আমি যাব দেখতে এবং কালরাত্রির সার্থক অভিনয় দেখে খুশী হব। তোমার অভিনয় আমি দেখেছি। এবং তুমিও আলোচনা-প্রসঙ্গে কাল-রাত্রির প্রশংসা করেছ আমার কাছে!"

রঞ্জনও পেয়ে বসল—ষোড়শী সংঘের সভ্যরাও—আজকের দিনে যা বলি আমরা তাই হল—ভী-ষণ ভয়ঙ্কর খুশী ও উৎসাহিত হল। অংশুমান না বলতে আর পারলে না। কালরাত্রি নাটকখানি তাঁর ভাল লাগে। ভারী রোমাণ্টিক। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আদৌ টেকে না, অবাস্তব। কিন্তু রূপকথার মত মনোহারী মিষ্টি। শেষটিতে যে বেদনা আছে তার রেশ ধরে রাখতে ইচ্ছে করে।

নাটকটির আরম্ভ একটি নার্সকে নিয়ে। সুন্দরী চটুল এবং প্রগল্‌ভা মেয়ে। তরুণ ডাক্তারেরা তার প্রতি মুগ্ধ। কিন্তু সে আমল বড় দেয় না। একজন তরুণ দুঃসাহসী কুটিল-চরিত্র সুদর্শন ডাক্তার কিন্তু অগ্রসর হল। তাতে ফল হ'ল এই যে—মেয়েটি ডাক্তারের একখানা ডায়রী এবং চিঠি হস্তগত করলে—যাতে ডাক্তারটির মারাত্মক কুকর্মের স্বীকৃতি আছে। ধরাও সে দিয়েছিল। ডাক্তারটি জানতেন না চুরির কথা। এরপর তিনি তাকে ফেলে যে মুহূর্তে স'রে যেতে চাইলেন—সেই মুহূর্তে সে হস্তগত-করা ডায়রী এবং চিঠি প্রকাশ ক'রে দিতে উদ্যত হল। ডাক্তার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু অন্য সব ডাক্তারেরা তার উপর বিরূপ এবং প্রায় খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। মেয়েটি চাকরী করত একটি ক্লিনিকে। সেখানকার যিনি প্রধান—তিনি প্রৌঢ় খ্যাতনামা চিকিৎসক; তিনি কিন্তু মেয়েটিকে স্নেহ করতেন কন্যার মত। অন্য ডাক্তারেরা ইঙ্গিত করত যে, মেয়েটির পিতৃত্বের দায়িত্ব তাঁর। অথবা যৌবনে যে নার্সটিকে তিনি ভালবেসেছিলেন—যে নার্সটি এই মেয়েটির

চেয়েও স্বৈরিণী ছিল—এ তারই মেয়ে। স্নেহটা সেই হেতু। তবুও তিনি নার্সটিকে ডেকে বললেন—তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। অবশ্য বিচার করবেন কয়েকজন ডাক্তার। যদি মেয়েটির অন্যায় প্রমাণিত হয় তবে তার নার্সবৃত্তির ডিপ্লোমা ক্যান্সেল করে দেওয়া হবে। এইখানেই নাটকের আরম্ভ। পিছনের ঘটনাগুলি বাদানুবাদের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। এই মুহূর্তেই একটি লোক এল প্রবীণ ডাক্তারের কাছে। —তাঁরই চিকিৎসাধীন এক রোগীর বাড়ী থেকে। কেসটি বাইরে থেকে সাধারণ কেস। কিন্তু ভিতরে অনেক জটিলতা। একটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। সুদর্শন তরুণ। এক বছর আগেও তার হাসি-উল্লাসের সীমা ছিল না। বাঁশী বাজাত, আর ছদ্মনামে গান রচনা করত সুরও দিত। যা রেকর্ডও হয়েছিল এবং অল্পদিনের মধ্যে তরুণ-সমাজে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সে কিন্তু তার ছদ্মনামটি এমন সযত্নে গোপন রেখেছিল যে, বন্ধু-বান্ধবেও জানত না। এক বৎসর আগে—ঠিক আজকের তারিখে ছিল তার বিয়ের কালরাত্রি। অর্থাৎ বিবাহের ঠিক পরের দিনের রাত্রি। এই রাত্রিতে হিন্দু সমাজের বিধিমতে বর ও বধূর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। এর পরদিন হয় ফুলশয্যা। কলকাতার দক্ষিণে নদীর ধারে গ্রাম; অবস্থাপন্ন ঘর। ঘরে ওই এক ভাই আর তার বড় বিধবা বোন নিয়ে সংসার। বড় দিদিই তাকে মানুষ করেছেন। আর দুচার জন পোষ্য আত্মীয় আছে। রূপসী মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন দিদি। সে নিজেও তাকে দেখে এসেছিল। মুগ্ধ হয়েছিল বিশেষ করে এই কারণে যে, মেয়েটি ভাল গান গায় এবং কনে দেখার আসরে—মধুকরের (তার ছদ্মনাম) গানই সে গেয়েছিল। সকৌতুকে সানুরাগে সে তার পরিচয় গোপন রেখে মধুকরের নিন্দা করেছিল। তাতে মেয়েটি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ছেলেটি ঠিক করেছিল, প্রথম মিলনরাত্রির আগে পর্যন্ত সে এ পরিচয় গোপনই রাখবে। অর্থাৎ ফুলশয্যার রাত্রি পর্যন্ত।

আরও ঠিক করেছিল যে, ওই দিন লোকসমাজেও সে প্রকাশ করবে যে, সেই মধুকর। বিবাহের পরদিন বর-কন্যা এসে নৌকায় করে যখন ঘাটে পৌঁছুল—তখন ঝড় বৃষ্টি—দুর্যোগ। অবশ্য খুব বিপদের মত নয়। তবে তার মধ্যে দিদির অনেক সাধ করে ব্যবস্থা-করা শোভাযাত্রা পণ্ড হল। আলো-বাজনাসহযোগে দুই পাল্কীতে বর ও কন্যাকে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে আতসবাজী পুড়িয়ে ঘরে তোলা গেল না। দিদি ব্যবস্থা করলেন, বর-কন্যা সেদিন ওই ঘাটেই দুখানা স্বতন্ত্র নৌকায় রাত্রিবাস করবে। পরের দিন সকালে শোভা-যাত্রা সাজিয়ে বর-কনেকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে ঘরে তুলবেন—বধূবরণ করবেন; সারা গ্রামের লোক দেখবে।

সেই ব্যবস্থায় বর-কনে দুই পাশাপাশি নৌকোয় গ্রামের ঘাটে রাত্রিযাপন করছিল; নৌকোর মাঝিরা ঘুমিয়েছে, বরের চাকর, কনের ঝি সকলে ঘুমিয়েছে, প্রায় মধ্যরাত্রি; আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে; বরের ঘুম হয় নি—সে বাঁশী হাতে এসে নৌকোর ছইয়ের বাইরে বসে সুর তুলেছিল। মধুকরের গানের সুর। হঠাৎ তার মনে হয়েছিল, বাঁশীর সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কে গান গাইছে। তারপর বধূ এসেছিল বাইরে। সে বাজিয়েছিল বাঁশী—সে গেয়েছিল গান। মাঝিরা জেগে উঠেও আবার চোখ বন্ধ করেছিল, ক্লান্ত দেহ—নদীর বাতাস ঘুমিয়েও গিয়েছিল। হঠাৎ বর বলেছিল—রাত্রিটা কি এমনিই যাবে।

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আমি যাই—আমাকে ধর—।

সে বারণ করতেও সময় পায় নি—বলতে পায় নি—আমি যাই—; বধূও নৌকো থেকে পাশের নৌকোয় আসবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। খুব কাছাকাছি নৌকো, তবু নৌকো দুলে উঠে গিয়েছিল সরে, বধূ পড়ে গিয়েছিল জলে। সঙ্গে সঙ্গে বরও দিয়েছিল ঝাঁপ। মাঝি-মাল্লারাও জেগেছিল। তারাও এর পর ঝাঁপ দিয়েছিল। গঙ্গায় তখন জোয়ার। পারনি তাদের সহজে। বরকে পেয়েছিল অচেতন অবস্থায়। বুকে আঘাত লেগেছে। কনেকে পরদিন পেয়েছিল—চড়ার উপর বধূবেশিনী কন্যাটি—ফুলশয্যার বদলে বালির শেষশয্যায় শুয়ে শেষঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বরের অসুখ তখন থেকে। তখন কলকাতার হাসপাতালে এনে রাখা হয়েছিল। বুকের আঘাতও সেরেছিল; কোমরে আঘাত লেগেছিল—তাও সেরে এসেছিল, ডাক্তারদের মতে কিন্তু ছেলেটি নিজে সারে নি। শুধু ক্লান্ত আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। ভাল সে হয় নি। ভাল হতে সে চায় না। ভাল সে হবে না। তার শেষদিন আসবে আগামী বৎসরে ওই কালরাত্রির তারিখে, সেদিন তার দৃঢ় ধারণা মৃত্যু বধূ আসবে, তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াবে, সেও হাত বাড়াবে, বধূর মতই সে পড়বে মরণ-সমুদ্রে, বধূও ডুব দিয়ে তার হাত ধরবে গিয়ে—এবং চলে যাবে তারা নিরুদ্দেশের দেশে।

এই চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন এই বিখ্যাত প্রবীণ চিকিৎসকটি। হাসপাতাল থেকে এনে মাস দুয়েক ক্লিনিকে রেখে তিনি তাকে বাড়ীতেই রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। রোগীদের মধ্যে না রেখে তার নিজের ঘরে স্বাভাবিক অবস্থার মত রেখেছিলেন। তার বই—গ্রামোফোন—রেডিয়োর ব্যবস্থার মধ্যে রেখে চেয়েছিলেন ধীরে ধীরে ছেলেটি জীবনের আকর্ষণ ফিরে পাবে। নার্স ছিল। নার্স ছেলেটি পছন্দ করে না। রাখতে চায় নি। কিন্তু এই প্রবীণ ডাক্তারটি তাকে মিষ্টি কথায় রাজী করিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তোমার কথা অন্যে যে অবিশ্বাস করে করুক, আমি করি না। আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি ওই দিন নিশ্চয় সে আসবে। কিন্তু সে দিনটা পর্যন্ত তোমার রোগশয্যায় সেবার জন্য তো লোক চাই। তার জন্য নার্সরাই সব থেকে পারঙ্গম—তারাই এ কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষা নিয়েছে। সুতরাং নার্সে আপত্তি করবে কেন? সে রাজী হয়েছিল কিন্তু তরুণী নার্স পাঠাতে নিষেধ করেছিল। প্রৌঢ়া নার্স রাখা হয়েছিল একজন।

তাতেও কিন্তু সমস্যা মেটে নি। কোন নার্সকেই সে এক সপ্তাহ দু-সপ্তাহের বেশী সহ্য করে নি। উত্তেজিত হয়েছে সামান্য ত্রুটিতে। কটু কথা বলেছে। তাকে সরিয়ে আবার অন্য নার্স এসেছে।

আজ সেই দিন। সকাল থেকেই রোগী উত্তেজনায় অধীর। সে আসবে। তার জন্য বিছানায় শুয়ে শুয়েই নির্দেশ দিচ্ছে। ঘর সাজাচ্ছে চাকরে। কাপড় কোঁচাতে বলেছে—সে পরবে। মালা গাঁথাচ্ছে। বাঁশী নিয়ে বসে আছে। আজ সে বাজাবেই। এসব দেখে নার্স একটু বিরক্তি প্রকাশ করেছিল—সে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। রোগীর দিদি কাঁদছেন। তিনি বৃদ্ধ কর্মচারীকে পাঠিয়েছেন ডাক্তারের কাছে—আজ তাঁকে যেতেই হবে। রোগীকে যদি কোন মতে শান্ত করতে পারেন!

ডাক্তার শুনে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর সহকারীকে ডেকে পরামর্শ করলেন। স্থির করলেন বিচিত্র পন্থা। তারপর দুজনে গেলেন রোগীকে দেখতে। দেখলেন—বৃদ্ধের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রোগী বরের সাজে সেজে হাতে বাঁশী নিয়ে বসে আছে। বাঁশীর সুর না উঠলে অশরীরিণী বধূ কায়াময়ী হয়ে তো আসতে পারবে না। তার বাঁশীর সুরই হবে অসীম শূন্যলোকে তার পথের সূত্র। বাঁশী তাকে বাজাতেই হবে। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখলেন। কথা কইলেন। বুঝলেন—উন্মাদ, সে তার বিশ্বাস থেকে নড়বে না। এই বিশ্বাসে এমনি দৃঢ় সে যে, প্রতিনিবৃত্ত করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। তিনি ভেবে নিয়ে বললেন—বেশ তাই হবে।

নির্দেশ দিলেন—কেউ যেন তার কথার প্রতিবাদ না করে। অমান্য না করে। তবে রোগীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, অশরীরিণী বধূ কায়াময়ী হয়ে না আসা পর্যন্ত সে রোগী।

রোগী বললে—সেই নির্দিষ্ট সময়ে বারোটার সময় বাঁশী বাজাবে সে।

—নিশ্চয় কিন্তু বারোটার আগে নয়।

তাই স্থির করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রোগীর দিদিকে বললেন—কোন প্রতিবাদে লাভ নেই। যা বলছে তাই করে যান। দেখুন না—কি হয়! হয়তো বউয়ের আত্মা আসবে।

# পূজার দিনে

## উৎসব অনুষ্ঠানে

অভ্যাগতগণকে পরিতিপ্ত করুন

খাদ্য-দ্রব্য সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত ও পুষ্টিকর করিতে

## লক্ষ্মী ঘি অপরিহার্য্য

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী - ভারতে বৃহত্তম আগমার্ক ঘি প্রস্তুতকারক

এই নাটক। নাটকে ওই বরের পার্ট করতে হবে অংশুমানকে। রিহারশ্যালে এসে অংশুমান খুশী হল। বেশ পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। বেশ মাঝারি গোছের ঘরে মেঝে জোড়া শতরঞ্জের উপর ধবধবে চাদর পাতা —কয়েকটা তাকিয়া। দেওয়ালে কখানি ভাল ছবি। এবং ষোড়শী সংঘের সভ্যগুলি সকলেই বেশ রুচিসম্পন্ন আধুনিক। প্রায় সকলেই শিক্ষিত। প্রবীণ ডাক্তারের পার্ট করবে বিমল গুপ্ত—ভাল চাকরী করে। তার স্ত্রীও এর সভ্যা। সে করবে দিবির পার্ট। এ ঘর তাদেরই ফ্ল্যাটের ঘর। নরেন বোস—সে করবে ডাক্তারের এ্যাসিস্ট্যান্টের পার্ট, বোসও লেখাপড়া-জানা ছেলে—একটু-আধটু লেখে—সে দালালী করে। এমনি ভাবে সকলেরই অন্তত একটি আধুনিকতা ও সংস্কৃতির ছোঁয়াচ এবং ছাপ আছে। অর্থাৎ ছবির বাজারে তারা হাটবাজারের ছবি নয়, কোন না একজিবিশনের মডার্ন ছবি-আঁকিয়ের ছবি। দশ জন পুরুষ ছ জন মেয়ে। ছ জনের মধ্যে চার জনই চার জন সভ্যের স্ত্রী। পঞ্চম ও ষষ্ঠ জন সংস্কৃতিবতী মহিলা—যৌবন অতিক্রম করেছেন—কিন্তু প্রৌঢ়া নন। পার্টি-টার্ট করেন না, ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করেন; উৎসাহ খুব; একজনের গাড়ী আছে। একজন বড়দি, অন্যজন মিনু-মাসীমা।

রঞ্জন সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে—হিরোইন কে? ইয়ার পার্ট করবে কে? বললে না তো?

রঞ্জন বললে—একটি নতুন মেয়ে। অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি। কিন্তু আপনি নামবেন শুনে ভড়কেছে। এখনও আসে নি।

—নতুন মেয়ে?

—খুব স্মার্ট—আর ভারী সুন্দর চেহারা। নরেনবাবু বলছিলেন—বলুন না নরেনবাবু!

—আপনিই বলুন।

—বলছিলেন এইরকম স্ত্রী পেলে ডিপ্লোম্যাটিক কোরের চাকরীর দরখাস্ত করতাম। ওয়াণ্ডারফুল মেয়ে।

থেমে গেল রঞ্জন। বিমল গুপ্ত বললে—নরেনবাবু নিজে ব্যাচেলার অবশ্য। রঞ্জন খোলা দরজার দিকে মুখ করে বসেছিল। রঞ্জন বললে—ওই—ওই এসে গেছেন সীতা সেন।

ঢুকল একটি মেয়ে। সত্যি চমৎকার দেখতে। রঙে গৌরী নয়, মাজা রঙ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের চেয়েও একটু উজ্জ্বল, ত্বকে একটি কোমল লাবণ্যের মসৃণতা আছে। পার্টে যেমন দরকার তেমনিই একটু দীর্ঘাঙ্গী; ছোট কপাল—চোখ দুটি বেশ টানা-ডাগর, ঠোঁট আর চিবুক ভারী সুন্দর, সবচেয়ে সুন্দর দাঁতগুলি, হাসলে মেয়েটি মনোহারিণী হয়ে ওঠে; চুলগুলি কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠের সিকিখানা পর্যন্ত এসে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বাকীটা কেটে ছোট করে নিয়েছে। সামনের দিকে সোজা সিঁথির দুপাশে একটু ফুলিয়ে সাজানো। লাগে খুবই সুন্দর কিন্তু প্রসাধন করেছে বলে অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। কানে দুটি গোল রিং। মেয়েটি হেসে নমস্কার করলে। বাঁ হাতে ঘড়ি, ডান হাত খালি। আঙুলগুলি লম্বা-ধরনের। গলায় পলা বা লাল বিড আর সোনার মটরদানার একগাছি হার যা মালা কিম্বা মালাহার যাই হোক না নাম মেয়েদের কাছে।

বিস্মিত হয়ে গেল অংশুমান। চেনা মুখ—অত্যন্ত চেনা! হ্যাঁ, এই কিছুদিন আগে—। তার আগেই সীতা সেন তাকে নমস্কার করলে—আপনি ভালো আছেন? চিনতে পারছেন আমাকে?

এই কিছুদিন আগেই একদিন সকালে অংশুমানের বাসার সামনের পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে এসে ফটক ধরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—নমস্কার, ভেতরে আসব?

অংশুমান একলা বসে চিন্তায় মগ্ন ছিল। সে তার দিকে তাকিয়ে প্রথমদৃষ্টিতেই প্রসন্ন হয়েছিল। সুন্দর একখানি মুখ এবং বেশ সপ্রতিভ সুমার্জিত ভঙ্গি। একটু হাসি মুখে লেগে আছে। সে বলেছিল—আসুন।

মেয়েটি ভিতরে এসে বলেছিল—একটু ভেতরে যাব—মেয়েদের সঙ্গে দেখা করব।


রাজশেখর বসুর
রামায়ণ (৫ম সং) ১০·০০
মহাভারত (৪র্থ সং) ১২·৫০
চলন্তিকা (১ম সং) ৮·৫০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩·৫০
লঘুগুরু (৩য় সং) ৩·০০

সুধীরচন্দ্র সরকার-প্রণীত
পৌরাণিক অভিধান
পরিবর্ধিত ২য় সং ॥ দাম ঃ ১০·০০

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির
পৌরাণিক উপাখ্যান ৩·৫০

মৈত্রেয়ী দেবীর
ঋগ্বেদের দেবতা ও মানুষ ২·৫০

ডঃ সত্যনারায়ণের
হিমালয়ের অন্তরালে ৪·০০

নুলেখা সরকারের
টক ও মিষ্টি রান্না ১·৫০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পথের দাবী ৬·৫০
দত্তা ৩·৫০ ॥ বিপ্রদাস ৫·০০
শেষের পরিচয় ৫·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ
১ম খণ্ড ঃ ৫·০০ ॥ ২য় খণ্ড ঃ ৫·০০

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
জাপানে (২য় সং) ৭·০০

বিশু মুখোপাধ্যায়ের
বিখ্যাত বিচার কাহিনী ৩·৫০

ডঃ নীহারকণা মুখোপাধ্যায়ের
সঙ্গীত ও সাহিত্য ৭·০০

অমলেন্দু চক্রবর্তীর
ভারতে শক্তি-সাধনা ৭·০০

তারকচন্দ্র রায়ের
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য ৪·০০

পরশুরাম-বিরচিত
গড্ডলিকা ৩·০০
ধুস্তুরীমায়া ৩·০০
নীলতারা ৩·০০
হনুমানের স্বপ্ন ২·৫০
আনন্দীবাঈ ৩·০০
চমৎকুমারী ৩·০০
কৃষ্ণকলি ২·৫০

ঋত্বিদেব বসুর সাম্প্রতিক গল্প-সঙ্কলন
ভাসো আমার ভেলা
দাম ঃ ১২·০০

বিশু মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-সাগর সঙ্গমে ১০·০০
শুভ গুহঠাকুরতার
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা ৬·০০
কণিকা ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভূমিকা ২·০০
অমল হোমের
পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ৩·৫০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট; কলিকাতা—১২

অংশুমান কৌতুক এবং বিস্ময় দুইই বোধ করেছিল একসঙ্গে। বিস্ময় এই যে, সাধারণত মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক যারা আসে তারা তার কাছেই আসে। মেয়েটি তার কাছে আসে নি। আর কৌতুক এইজন্য যে, বাড়ীতে তো কোন মেয়ে নেই! সে বলেছিল—আমাকে বলতে পারেন না?

মেয়েটি অত্যন্ত সপ্রতিভ, বলেছিল—লেখাটেখার কথা হলে আপনাকে বলতাম। কিন্তু তা নয়। এবং ব্যাপারটা আপনার জুরিসডিকসনের একবারে বাইরে।

—আমাকে চেনেন।

—তা চিনি।

—কিন্তু—

মেয়েটি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল—তারপর বলেছিল—আপত্তির কারণ আছে?

—না—তা নেই। তবে মেয়ে বলতে তো কেউ নেই!

—ও। কখন আসবেন?

—আমি একা মানুষ। সংসারে মেয়ে-ছেলে তো নেই।

—ও। বলে মেয়েটি অপ্রতিভ হয়ে ছোট্ট একটি হাঁ করেছিল। তারপর বলেছিল—আমি এসেছিলাম ইলেকট্রিক কুকার নিয়ে। দেখাতাম তাদের। তারপর হেসে বলেছিল—কয়লার ধোঁয়ার অপকারিতা, তার অপরিচ্ছন্নতা এই সবগুলো বুঝিয়ে কুকার জ্বেলে ডেমনেস্ট্রেশন দিয়ে দেখাতাম। ইলেকট্রিক কুকার কোম্পানীর ওখানে কাজ করি। আপনাকে চিনি কিন্তু আপনি এখানে একলা থাকেন তা জানতাম না!

এতক্ষণ ধরে একটা হিন্দুস্থানী রাস্তার উপর একটা ঝুড়িতে কয়েকটি কাগজের বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অংশুমান ঠিক অর্থটা ধরতে পারে নি। ভেবেছিল—সে লোকটা বোধ হয় কোন একটা বাড়ী খুঁজছে; মেয়েটি তার সামনেই বাড়ীতে ঢুকেছে—কথাবার্তা কইছে, সম্ভবতঃ এ বাড়ী ঢুকলেই বা কথা বলে চলে গেলেই এগিয়ে এসে বলবে—সেলাম বাবু, পতাটা টো দেখিয়ে তো। এবার বুঝতে পারলে এ লোকটা ওই কুকার-বাহক।

অংশুমান একটু বেশী করুণা করলে নিশ্চয়। অথবা এই বেশীটুকু তার অবশ্য দেয়। নইলে কোম্পানী বেছে বেছে এমন মিষ্টি চেহারার এজেন্ট-ক্যানভাসার রাখবে কেন? তারা ব্যবসায়ী—তারা সাহিত্যিক শাস্ত্রকার থেকে অনেক বেশী বাস্তবসত্য বোঝে এতে কোন সন্দেহ নেই। বাস্তবের উপরে উঠতে পারে না—এইটেই তাদের ক্ষুদ্রতা বল ক্ষুদ্রতা অন্ধতা বল তাই।

এই নাটকটায় বাস্তব মূল্য নেই—এইটেই নাটকটার বড় দাম। যাক, সেদিন সে করুণা না—করুণা নয়—এমনি একটি মিষ্টি চেহারার শ্রীময়ী মেয়ে যে জিনিসই এনে থাক—তা ফিরিয়ে না দিয়ে নিয়েছিল। বলেছিল—মেসে কেউ নেই বলে আমার রান্নাঘর নেই এমন তো নয়। রান্নাঘর আছে রান্নাও হয়—উনোনে কয়লাও জ্বলে ধোঁয়াও হয়। বেশ তো আমাকেই দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে যান। আমি নেব না কে বললে?

সে হিন্দুস্থানীটাকে ডেকেছিল—এই ইধর লাও।

লোকটি জিনিসগুলি এনে নামিয়েছিল। মেয়েটি বলেছে—এখানেই দেখবেন? এই বারান্দায়। আর রান্নার লোক কই আপনার। একজন আছে নিশ্চয়। আপনি নিজে রাঁধেন এ নিশ্চয় ঠিক নয়।

—ঠিক কথা। চলুন ঘরের মধ্যে চলুন। বলে অংশুমান তার চাকর-রাঁধুনী-বাজার-সরকার-ম্যানেজার-সেক্রেটারী সব — একমাত্র দুলালকে ডেকেছিল।

বিচিত্র মেয়েটি এরপর আশ্চর্যভাবে শান্তে গিয়ে যেন ওই বস্তুগুলি সম্পর্কে একজন টেকনিক্যাল এক্সপার্ট হয়ে কথা বলতে শুরু করেছিল। সুন্দর করে সব গুছিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিল—এর এ-সি-ডি-সি নেই। শকও লাগবে না। খুব ভাল ব্যবস্থা আছে। আর্থ করে দেওয়ার ব্যবস্থা এর মধ্যে ক'রে দেওয়া আছে। সব থেকে বড় সুবিধে রান্না হবে ঘড়ির কাঁটা ধরে, এবং সুন্দর সিদ্ধ হবে। ধোঁয়া নেই, উনোনের পাশে পাহারা নেই। প্লাগ লাগিয়ে সুইচ দিয়ে যা খুশি করুন, ঘড়ির কাঁটায় সময়টি হলেই একটা সিগন্যাল হবে—তখন নামিয়ে নিন।

তারপর বললে—আপনার তো খুব


বিশ্ববিখ্যাত
জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্যোতিষার্ণব, সামুদ্রিকরত্ন এম-আর-এ-এস (লণ্ডন), ৫০-২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রবেশপথ ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট), কলিকাতা — ১৩। ফোন : ২৪-৪০৬৫ প্রেসিডেন্ট, অল ইণ্ডিয়া এস্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি (স্থাপিত ১৯০৭ খৃঃ)।

জ্যোতিষ-সম্রাট

ইনি দেখিবামাত্র মানব জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও দুষ্ট গ্রহাদি প্রতিকার-কল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদির অত্যাশ্চর্য শক্তি পৃথিবীর সর্বশ্রেণী কর্তৃক প্রশংসিত। প্রশংসাপত্রসহ ক্যাটালগের জন্য লিখুন। বহু পরীক্ষিত কয়েকটি অত্যাশ্চর্য কবচ ধনদাকবচ—সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতির জন্য—৭৷৷৶০, শক্তিশালী বৃহৎ—২৯৶০। বগলামুখী কবচ—প্রবল শত্রুনাশ ও সর্ব-প্রকার মামলায় জয়লাভ এবং কর্মোন্নতি হয়—৯৶০, বৃহৎ—৩৪৶০। মোহিনী কবচ—ধারণে চিরশত্রুও মিত্র হয়।—১১৷৷০, বৃহৎ—৩৪৶০। সরস্বতী কবচ—৯৷৷৶০, বৃহৎ-৩৮৷৷৶০



"আনন্দধারা বহিছে ভুবনে"

পূজা উৎসব আনন্দময় কোরে তুলবে

MRP

ট্রানজিস্টার রেডিও

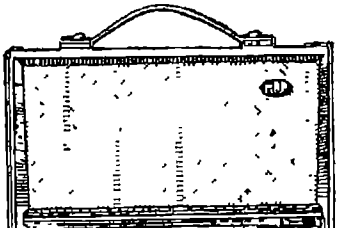

জি, ই, সি ও ন্যাশনাল একো অনুমোদিত বিক্রেতা

মুনি রেডিও প্রোডাক্টস

৫৫।১বি, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ফোন-২৪-৫৭৪৯

সুবিধে। আপনারা দুজন। আপনি বরং একটা কুকার নিন—আর একটা কেটলী নিন।

তাই নিয়েছিল অংশুমান কিন্তু অর্থ-মূল্য দিয়ে জিনিস নিয়েই শান্ত হয়নি, মেয়েটিকে আরও একটুক্ষণ ধরে রেখেছিল, বলেছিল—কেটলীতে চা করে খাইয়ে এবং খেয়ে যাবেন না?

—নিশ্চয়!

চা করবার সময় সে এক্সপার্টের মতই কথা বলেছিল দুলালের সঙ্গে, একেবারে ঘড়ি ধরে দেখিয়ে কেটলীর জল টিপটে ঢেলে চা দিয়ে বলেছিল—বাস।

চা তৈরী ক'রে অংশুমানের সামনে নামিয়ে দিয়েছিল—খান!

—আপনার কই?

—আমাকেও খেতে হবে?

—নিশ্চয়! দেখুন ভাল হল কি মন্দ হল—নিজে দেখুন!

—ভাল হবেই।

—তা হ'লে আর একদফা করবেন!

মেয়েটি হেসে ফেলেছিল। তারপর কথা শুরু হয়েছিল। পরিচয়ে যে-কথা হয় সেই কথা। নাম বাড়ী বাড়ীতে কে আছে এ থেকে আরম্ভ। সে বলেছিল নাম সীতা সেন। বাড়ীতে মা আছেন বাপ নেই বড় ভাই ভাই-বউ আছে তার কটি বাচ্চা আছে। বছরখানেক ঢুকেছে এদের এখানে। ডাঃ রায়ের ক্লীন ক্যালকাটা—স্মোক নুটসেন্স বন্ধ পরিকল্পনার পর আরম্ভ হয়েছে এদের এই কর্মব্যস্ততা। গ্যাস আসবে, এখন থেকে কোম্পানী গ্যাসের নানা ধরনের উনোন-টুনোন নিয়ে নানান কাজ করছে। সে আই-এ পড়তে পড়তে ঢুকেছে এখানে। বেশ সপ্রতিভভাবে বললে—দুবার ফেল করলাম—বাবা মারা গেলেন। পেনসন বন্ধ হল। দাদা চাকরী ক'রে, ছোট চাকরী। কি করব? ঢুকে পড়লাম চাকরীতে।

অংশুমান এর পর আর প্রশ্ন করতে পারে নি। মাইনে কত? বা বিয়ের কথা! তবে হঠাৎ খুঁজে পেয়েছিল একটা প্রশ্ন? কেমন লাগে এ চাকরী আপনার?

—প্রথম বাধোবাধো লাগত; আমরা জন ছয়েক মেয়ে আছি—আর সবই তো পুরুষ। এখন সে সব কেটে গেছে। বেশ লাগে।

নিজেই বলেছিল—মাইনে খারাপ দেয় না—একশো পঁচিশে শুরু। তারপর বাড়ে বছরে পাঁচ টাকা। তা ছাড়া বিক্রির উপর একটা কমিশন আছে। এর উপর এই কাপড়চোপড়। বছরে এক সেট।

কাপড়-ব্লাউসের সেট সত্যিই বেশ ঝলমলে এবং ভাল ছিল। বিশেষত্ব ছিল—লাল নাইলনের শাড়ী লাল সাটিনের ব্লাউস। পায়ের চটির স্ট্র্যাপসুদ্ধ লাল। সেটা অংশুর চোখে ধরাও পড়েছিল এবং মানেও বুঝেছিল। বলেছিল—লাল রংটা কি হাঁটারের বিজ্ঞাপন।

কৌতুকে তার চোখ ভুরু নেচে উঠেছিল। হেসে সে বলেছিল—ঠিক ধরেছেন! এ নইলে সাহিত্যিক বলবে কেন? এই বুদ্ধির ঝলমলানি পাই বলেই আপনার বই ভালবাসি। আচ্ছা! অনেক ধন্যবাদ! এবার উঠি—অনুমতি করুন।

ইঙ্গিত বুঝে অংশু বলেছিল—চেক দেব তো?

—কেন দেবেন না?

অংশু চেক লিখে তার হাতে দিয়ে বলেছিল—কোন গোলমাল হলে ফ্রি সার্ভিস তো?

সে হেসে বলেছিল—নিশ্চয়। কিন্তু সে মিস্ত্রী এসে দিয়ে যাবে। আমি নয়!

তারপরও একদিন মেয়েটি পথ দিয়ে যেতে যেতে তার বাসায় উঠেছিল। দুলালকে জিজ্ঞাসা করেছিল—বাবু কই?

—ভিতরে লিখছেন।

—একবার খবর দাও না। মেয়েটা সে দিনের অভিজ্ঞতায় ভেবেছিল—অংশুমান সহাস্যে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু দুলাল এসে তাকে নিয়ে গিয়েছিল অংশুমানের লেখার ঘরে। অনেক বইয়ের মধ্যে চেয়ারে ব'সে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে লিখেই যাচ্ছিল অংশুমান—সে ঘরে ঢুকে বলেছিল—নমস্কার।

মাথা না তুলেই অংশুমান বলেছিল—নমস্কার! বসুন। দেওয়াল ঘেঁষে একখানা সোফা এবং সেটের চেয়ার দুখানা রাখা ছিল; তার উপর বসে সে অপেক্ষা করেছিল; অংশুমান কলম রেখে মাথা তুলবে, এবং উঠে এসে হয়তো একখানা চেয়ারে বসবে। সীতার এটা দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু অংশুমান তখন অন্য মানুষ। সব লেখকই হয়, তার নিজের জগতের বিধাতা হয়ে যখন বসে তখন তার সে ধ্যান বা তার সে আসন থেকে সহজে সে চ্যুত হয় না। তার উপর অংশুমান একটু শক্তও বটে। জীবনে খেলা মানুষ করে, কিন্তু খেলার আনন্দও আছে, তবু মানুষ বিচিত্র—সে খেলা নিয়ে থাকতে পারে না। কাজে কর্মে অনেক ক্লেশ অনেক

রচনায় দীর্ঘ আশী বছর পরে স্বতন্ত্র গ্রন্থকারে প্রকাশিত

শতাব্দীর নাট্যকার, রঙ্গালয়ের স্রষ্টা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা

মহাকবি গিরিশ চন্দ্র ঘোষ রচিত উপন্যাস

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসখানি বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় অবদান।

চন্দ্রা

ভূমিকা ও সম্পাদনা অধ্যাপক অনিল সেনগুপ্ত

॥ দাম—৫·০০ ॥

রুশ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস অ্যাশ্টন চেসডের

বেদনাহত

অনুবাদ করেছেন কবি ও সাহিত্যিক গোপাল ভৌমিক

॥ দাম—৪·০০ ॥

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

কবি ও সাহিত্যিক গোপাল ভৌমিকের

সাহিত্য সমীক্ষা

॥ দাম ৪·০০ ॥

রাজাপতি বসুর :—

অনেক সোনালী দিন

॥ দাম ৩·০০ ॥

জ্ঞানতীর্থ ১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
অন্যান্য পুস্তকের তালিকার জন্য লিখুন

বন্দনা তার কাছে আনন্দের খেলাকে ছোট করে ফেলে। অংশুমান তার লেখার মধ্যে কল্পনা করছে—এ লেখা তার আলোড়ন সৃষ্টি করবে; এ লেখার মধ্যে সে খেলা-কাজ সব কিছুর মর্মচ্ছেদ করে তার স্বরূপটি আবিষ্কারের চেষ্টায় আছে। সে মুখ তুলে-ছিল কলমও রেখেছিল কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে আসে নি। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে-ছিল—বলার মধ্যে একটু বিস্ময়ও ফুটে উঠেছিল—ওগুলো তো ঠিকই আছে। ঠিক চলছে তো! দুলাল ফোনটোন করেছিল না কি?

মেয়েটি—অংশু তখন তার নামও ভুলে গেছে;—মেয়েটি প্রগল্‌ভা—সে বলেছিল—

"নিশ্চয়। কিন্তু সে মিস্ত্রী এসে দিয়ে যাবে। আমি নয়"...

না—না—খারাপ হবে কেন? খারাপ জিনিস তো দিই নি।

অংশু বলেছিল—তবে? অর্থাৎ তাহলে আপনি হঠাৎ?

মেয়েটি এবার একটু অপ্রতিভ হয়েছিল, বলেছিল—এ পাড়াতে অর্ডার ছিল দিয়ে এলাম। ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই!

—ও। বসুন। বসুন। দুলাল! চা আন।

—না—চা আমি খাব না!

—সে কি?

—হ্যাঁ। আমি উঠলাম। নমস্কার।

—নমস্কার। প্রতিনমস্কার করেই অংশু কলম তুলে নিয়েছিল। লেখাটা তখন মনের ভিতর থেকে কলম বেয়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে বেশ বেগের সঙ্গে। ওদিকে আছে কাগজের তাগিদ। এবং টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়তে পড়তে দেখলে লাল ঝলমলের শাড়ীর ঢেরগুলো বারেকের জন্য থমকাচ্ছে; সে মাথা তুললে না—চলে গেল চোখের সামনে থেকে—লালচে আভা একটা নরে গিয়ে রৌদ্রালোকের শুভ্রতা ফুটে উঠল।

আজ এখন মেয়েটির পরনে সব সাদা। আর একটু প্রভেদ আছে। সেদিন বাঁ হাতে রিস্টওয়াচ ছিল—ডান হাতে সোনার রুলি ছিল, আজ রিস্টওয়াচ আছে—রুলি নেই। আর একটা প্রভেদ আজ খাটো চুলগুলি শ্যাম্পু করা এলানো। সে দুদিনই চুলে ঈষৎ তেলের স্পর্শের চিক্কণতা ছিল আর দুই বেণী করে ঘাড়ের উপর সুন্দর একটি খোঁপা ছিল।

আজ মেয়েটিকে অন্যরকম লাগছে। আশ্চর্য মনোহারিণী এবং এলানো শ্যাম্পু-করা চুলের মধ্যে একটা এলো মেলো নেশা রয়েছে! মেয়েটি বসেছে সামনেই। তার বিপরীত দিকে। বেশ মৃদু একটি গন্ধ আসছে।

সীতা সেন। সীতা সেন তাকে প্রশ্ন করলে—চিনতে পারছেন আমাকে?

সে ঠিক ধরতে পারলে না—খোঁচা আছে কিনা। কিন্তু সঙ্কুচিত বিনয়ের অভাব ছিল না এটা নিশ্চিত। সে প্রতিনমস্কার করে হেসে বলেছিল—এঁরা বলেছিলেন—হিরোইন সীতা সেন একটি আশ্চর্য নতুন মেয়ে। আমি সীতা সেনে ধরতে পারি নি—কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি—সে রত্নত্রয়া থেকে শুভ্র পদ্মরাগের রূপান্তর সত্ত্বেও! তারী চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে আজ!

সীতা সেন ঠকে না। সে বললে—আজও হিটারের বিজ্ঞাপনবাহিনী নই আজ তো মধুকরমোহিনী হিরোইন!

প্রগল্‌ভতার একটু সংযত হল অংশু। তার মর্যাদা আছে খ্যাতি আছে। তবু বললে—তা বটে! তারপরই বললে—তা হলে রঞ্জন—আর দেরী না করে আরম্ভ করে দাও! ওদিকে দেরী করে লাভ কি?

রঞ্জন বললে—আজ আপনি একটা রিডিং দিন আমরা শুনি। আমি নামে পরি-চালক হলে কি হবে—আপনিই সব করবেন। আমি খাটব।

তাই হল। অংশুমান নাটকখানি আগা-গোড়া নিজের মত করে রিডিং দিয়ে গেল। সে নিজে লেখক এবং এ্যাকটিংও ভাল করে—তবে তার এ্যাক্টিংয়ে একটু ইমোশন আছে। একলের মত বাস্তবতার জন্যে শুকনো নয়; কিন্তু ইমোশনের আমেজের ফলও আছে। সে যখন পড়া শেষ করল—তখন সকলে অভিভূতই হয় নি—চোখও সকলের সজল হয়ে গেছে। বই রেখে সে চুপ করলে। গোটা ঘরটা স্তব্ধ হয়ে রইল। মেয়েরা চোখ মুছছিল। সীতা সেন শুধু দুই হাঁটুর উপর চিবুকটা রেখে স্তব্ধ হয়েই বসেছিল—চোখের জল সে মোছেনি।

অংশুমান একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—বই ভাল—তবে শক্ত!

রঞ্জন বললে—শক্ত না হলে ভাল হয় কি করে?

বিমল গুপ্ত বললে—দ্যাটস্ ইট!

মাসীমা বললেন—আমার খু—ব ভাল লেগেছে। খু—ব ভাল।

বড়দি চোখ তখনও মুছছিলেন। বল-লেন—বড় লেখকের লেখা! তাছাড়া জানো লেখাটা ট্রানস্লেশন হয়েছে ইউরোপে! ওই যে গুরুসদয় দত্ত রোডে মিসেস সিনহা থাকেন, নরওয়ের মেয়ে—উনি ওদের ভাষায় ট্রানস্লেশন করছেন। উনিই তো আমাকে বললেন। রেডিয়োতে শোনা শেষ করেছেন—আমি গেলাম—আমাকে বললেন—কি সুন্দর একটা ওয়ানএ্যাক্ট প্লে হল রেডিয়োতে কড়দি কি বলব! আমি ট্রানস্লেশন করব আমাদের ভাষায়। আমি তখন এসে বিমলকে বললাম। বিমল পড়ে রঞ্জনকে ধরলে!

অংশুমান বললে—আমি উঠব রঞ্জন।

—দাঁড়ান, ট্যাক্সি আনাই।

সীতা সেন বললে—আমি যাব রঞ্জন-বাবু?

—নিশ্চয়! ওঁকে অংশুদা—। উনি আপনার ওদিকে যাবার মাঝপথেই থাকেন।

—বেশ তো।

গাড়ীতেও মেয়েটি চুপ করে বসে রইল। এবং চুপ করে নেমে গেল মাঝপথে ওর বাড়ীর কাছে।

রঞ্জন অংশুর বাসাতেই নামল। বললে—একটু তেষ্টা আছে দাদা। খেয়ে যাব।

—বেশ তো!

অংশু মদ্যপান করে। তবে বাড়ীতে। বারে যায় না। দলেও না। রাত্রে বাড়ীতে বসে খায়। পার্টিতেও সে যায় না। গেলেও সেখানে খায় না। দু চারজন বন্ধু আছে তারা

বাত্রে থাকলে তাদের সঙ্গে খায়। রঞ্জন তাদের মধ্যে একজন। বাড়ীতে বসে মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বললে অংশু—ওকে কোথায় পেলে রঞ্জন ? ও—পারবে ?

রঞ্জন বললে—আপনি তো জানেন ওকে।

—জানি। প্রগল্‌ভা বটে। ইলেকট্রিক কুকার কোম্পানীর বেশ সাকসেসফুল ক্যানভাসার বটে। মেয়েটির মোহ আছে। এই জানি। ও পারবে ?

—পারবে বলেই মনে হয়। ওকে প্রথম দেখি—কফি হাউসে। তারপর দেখি মেট্রোর বারে; তারপর দেখি চিড়িয়াখানায় একদল ওরা হৈ হৈ ক'রে ঘুরছে। সিঙ্গাবেট খাচ্ছে। গ্রুপ ছয়-সাত ছোকরা তিন-চারটি মেয়ে। একটা এ্যাংলো মেয়েও ছিল। ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে পরিচয় ছিল। সবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। সব গডার্ন ছেলে। চাকরী করে অধিকাংশই ওই কুকার কোম্পানীতে। সবাই অবিবাহিত। নামহীন ক্লাব। তবে eat drink and be merry বলতে পারেন। এই সেদিন। মেয়েটির চেহারায় বেশ ফ্রি ভাব ভাল লাগল। এ পার্টটা বিমল গুপ্তের বউয়ের করবার কথা। অবিশ্যি অগত্যা। বিমলের স্ত্রী নিজে একটু মোটা তা জানে। পার্টটাও কঠিন। যে সব মেয়েরা পয়সা নিয়ে অভিনয় করে—তাদের সবাইকে চিনি, কাউকে ঠিক মনে লাগছিল না। তা ছাড়া ওরা সব এমন বুলি-শেখা ময়না হয়ে গেছে-না যে যতই শেখান—সে শেখানো বুলির সুর ছাড়বে না। হঠাৎ মনে খেলল, একে নিলে কি হয় ? বললাম। প্রথমে বললে—ও হবে না। তারপর পাঁচদিন লেগে রইলাম। বললাম—ভাল পার্ট করবে—সিনেমায় নেমে যাবে। বললে—দেখুন, প্রেজুডিস কিছু নেই আমার। তবে এই বেশ আছি। এর বেশী কি করব ? কি হবে ? তখন বললাম—আমাদের ক্লাবে ভাল লোক—সম্ভ্রান্ত লোক সব। তাতে ও হাসলে। তখন কথায় কথায় আপনার কথা বললাম—রাজী হল! বললে—সত্যি? বললাম—চল দেখতে পাবে। তখন বললে—তা হ'লে রাজী। কিন্তু আগে থেকে আপনারা চেনেন তা কি জানি ?

অংশু গ্লাসের পানীয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—হুঁ।

একটু পর আবার বললে—কিন্তু ও পারবে কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে।

—কেন ?

—প্রগল্‌ভতা আর এ্যাক্টিং এক নয়। গলা শুকোয়। তুমি তো আমার থেকে ভাল জান!

কথাটা অংশুমানের মিথ্যে হল না—সত্যি হল! পরেরদিনই রিহারশ্যালে এসে সীতা রিহারশ্যাল দিতে দিতে থমকে গেল। প্রথম দিকটা যেখানে সে ডাক্তারের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর দিচ্ছে সেখানটা বেশ দিলে। খাসা বললে। সেখানটা অংশুমানের পার্ট ছিল না—সে বসে শুনছিল—তার আঙুলে ধরা সিগারেট পুড়ে যাচ্ছিল—ভুলে গেছে সে টানতে। কি চমৎকার বলছে মেয়েটি। রঞ্জনের দৃষ্টি আছে—অনুমান আছে। প্রবীণ ডাক্তার বললে—এ তুমি কি করছ ? কোন পথে চলেছ ?

—যা আমার মন করায় তাই করছি ডাক্তারবাবু! আমার কাছে তো তা অন্যায় মনে হয় না। হলে করব কেন ? এবং অন্যে বললেই বা মানবে কেন ?

—অন্যায় মান না ?

—না। আর পথ ? কোন পথে মানুষ কোথায় কবে কোন স্বর্গে পৌঁচেছে বলুন ? সেই তো মাটির ধুলোতেই সে চোখের জল ফেলে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর মাটির ধুলোতেই মিশিয়ে যায়। তারপর কে তার ছবি টাঙিয়ে রাখলে, নিত্য একটি ক'রে মালা দিলে, তাতে কি কিছু আসে যায় যে মরে তার? যায় না। আমার কাছে তো যাবে না। বরং তার চেয়ে এই চিঠিপত্র দেখুন। বিচার করুন আমি তাকে ঠকাতে চেয়েছি—অন্যায় ক'রে ব্ল্যাকমেলিং করেছি—না তিনিই প্রতিশ্রুতি ভেঙে আমাকে জব্দ করতে চেয়েছেন। যার উত্তরে এগুলি জাল নয়—সত্য আমি প্রকাশ করে দিয়েছি। বিচার করুন। পাপ-পুণ্যের বিচার লোকে বলে ভগবানের হাতে। তিনি নেই বলেই আমার ধারণা। থাকলে তো এমনিই আমার সাজা হবে তাঁকে না-মানার জন্যে। এটা না হয় বোঝার উপর শাকের আঁটির মত তার উপর চাপবে। ফাঁসির হুকুমের পর পাঁচ বছর কারাবাসের ব্যবস্থা হবে।

সুন্দর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বললে সীতা। সকলে তারিফ করে উঠল। অংশুমানও বলে উঠল—চমৎকার। সুন্দর হচ্ছে। এই স্পিরিট বজায় রেখে চললেই বাস আর কিছু লাগবে না।


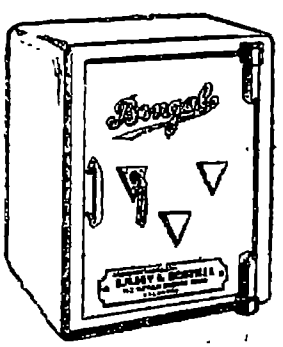

চোর ডাকাতের হাত হইতে মূল্যবান জিনিষপত্র এবং টাকাকড়ি রক্ষা করিবার জন্য "বেঙ্গল" ব্রাণ্ড লোহার সিন্দুক ও কেবিনেট-ই নির্ভরযোগ্য।

—প্রস্তুতকারক—

শচীন্দ্রনাথ দে এণ্ড ব্রাদার্স

১১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

শারদীয়ার অভিনন্দন জানাই

দিনের শেষে —গণেশ সিংহ

সীতা সিনটা সেরে অংশুর সামনেই বসল, বললে—এক গ্লাস জল খাব! বাবাঃ। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! গেছেতে এমন একটি বিস্ময়ের টান ছিল—যে সকলেই হেসে উঠল। তাতে সে অপ্রতিভ হল না। বললে—তবে এমন কিছু নয়—ফাঁসির আসামীর প্যাটাতনের উপর দাঁড়ানো নয়।

অল্পক্ষণ পরেই এল সেই সিন। অংশুমানের সঙ্গে তার অভিনয়। স্থির হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে সে ওই বিচিত্র কল্পনায় বিভোর রোগীর চরিত্রে অংশুমানের অভিনয়ের মহলা দেখতে লাগল। ভরাট গলায় বলে যাচ্ছে অংশুমান। চোখ তার স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। সে বলছে—রাত্রে যখন সবাই ঘুমোয় তখন সে জেগে থাকে—সে যেন দূর দূর অতিদূর কোন লোক থেকে ডাক শুনতে পায়—ওগো—ওগো—আমায় ধর—আমায় টেনে নাও! পাতার খসখসানি ভেসে আসে, সে বুঝতে পারে—অসহায় ভাবে বায়ুস্তরে তার অশরীরী কায়াখানি ভেসে বেড়াচ্ছে। সে দু হাত বাড়িয়ে সেদিন সেই জলের তলায় যেমন তার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল—তেমনি ভাবেই এই শূন্যতার সমুদ্রের মধ্যে তার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে। বিল্লী ডেকে যায়—তার মধ্যে সে শোনে তার জীবন-জোড়া কান্না! কিন্তু আজ সে আসবে। সে আসবে। নিঃশব্দ পদপাতে এসে দাঁড়াবে সেই লগ্নে—আমি বাঁশী বাজাব—তার সুরের সূত্র ধরে সে এসে দাঁড়াবে—ওই জানালার ধারে—

—উঠুন। সীতা দেবী—উঠুন।

—আমি?

—হ্যাঁ। জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি। ডাকছেন—মধুকর! ক্যাচ ধরে ডাকতে হবে। মানে ওর অসমাপ্ত কথা আপনার কথায় সমাপ্ত হবে।

সীতা সেন উঠে দাঁড়াল। রঞ্জন পরিচালক—সে বললে, অংশুদা আর একবার শেষটা বলুন। অংশু চোখ দুটি উপরের দিকে তুলে বিষণ্ণ-উদাস অথচ প্রত্যাশাভরা কণ্ঠে বললে—রাত্রে বিল্লী ডেকে যায় আমি শুনতে পাই তার জীবনজোড়া কান্না বেজে চলেছে। একটু থেমে সে আবার শুরু করলে, কণ্ঠস্বর পাল্টালো—একটু দীপ্ত হয়ে উঠল। অংশুমান বললে—কিন্তু আজ সে আসবে। নিঃশব্দ পদক্ষেপে আসবে। আমি বাঁশী বাজাব—বাঁশীর সুরের সূত্রোটি ধরে সে এসে দাঁড়াবে হয়তো ওই জানালার ধারে আমাকে ডাকবে—

ইসারা করলে রঞ্জন বলুন-বলুন।

একটু চেষ্টা করলে সীতা সেন—কিন্তু বলতে পারলে না। কেমন যেন নর্ভাস হয়ে গেছে মুখ দেখেই বোঝা যায়। পারলে না বলতে—সময় পার হয়ে গেল।

অংশু বললে—আচ্ছা, আবার আমি বলছি। সে শুরু করলে। কিন্তু তবুও বলতে পারলে না সীতা সেন— মুহূর্তে মুহূর্তে তার মুখখানা ফ্যাকাসে ক্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি কেমন অসহায় ভয়ার্ত হয়ে উঠছে। চুপ ক'রে সে দাঁড়িয়ে আছে।

অবশেষে সে বললে—এ আমি পারব না। বলে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে এসে বসে পড়ল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে বসে রইল। গোটা ঘরখানাই নিস্তব্ধ। সকলে চুপ হয়ে গেছে। চোখে তারা দেখতে পাচ্ছে যেয়েটির অবস্থা। এ অবস্থায় কি বলবে—কি বলতে পারে?

নীরবতা ভঙ্গ করে অংশু বললে—কি হ'ল? আসছে না?

মুখ মাথা নেড়ে সে বললে—না।

—এক কাজ করুন। বইখানার ওই সিনটা রিডিং পড়ুন। বেশ উঁচু গলায়। অবশ্য এ্যাকটিংয়ের মত করে। পড়ুন।

সীতাকে বইখানা এগিয়ে দিল রঞ্জন। সীতা কিন্তু স্পর্শ করল না। অংশু বললে—পড়ুন। সীতা এবার ঘাড় তুলে মাথা নেড়ে বললে—আমি পারব না!

—কেন পারবেন না?

—না। আমি কেমন হয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনি এত ভাল পার্ট করছেন—আপনার পরে আমার কথা আসছে না। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। হাত পা কাঁপছে। আপনারা অন্য কাউকে দিন।

—বেশ তো একবার পড়ুন না।

—কি হবে পড়ে? পারব না যা—।

—লজ্জা লাগছে?

—লজ্জা? একটু ভেবে সীতা বললে—লজ্জা কেন হবে? প্রথম সিনে যে কথাগুলো বললাম—লজ্জা পেলে ওই কথাগুলোই আটকাতো!

—বেশ, আপনি পড়ুন। কথাটাই রাখুন না।

বইখানা টেনে নিয়ে পড়ে গেল সীতা। সবটাই পড়লে। অর্থাৎ রিডিং পড়ে সে বরবধূ যুগলের কথাই বলে গেল। পড়ার মধ্যে অভিনয়ভঙ্গির রেশ ছিল না কিন্তু পড়ে গেল। অংশু বললে—ঠিক আছে। আমি এখানে রিহারশ্যালের মত করে বলে যাই আমার পার্ট, আপনি পড়ে যান বই দেখে।

সেটা সে পারলে। অংশু বললে—আজ থাক। খুব ভাল হবে আপনার। দেখবেন।

অংশু সেদিন ট্যাক্সিতে শুধু সীতাকে নিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে নিজে বাসায় ফিরল। ট্যাক্সিতে চড়বার সময় সীতাকে ডাকলে—আসুন। পৌঁছে দিয়ে যাব। রঞ্জন তুমি চলে যেয়ো।

ট্যাক্সিতে চড়ে সীতাকে বললে—শাই কেন আপনি?

—শাই? শাই কেন হব? আপনিই বলুন না আমি শাই? আমি ক্যানভাসারের কাজ করি, আমি শাই? হাসলে সীতা।

অংশু বিস্মিত হয়ে গেল। সীতা পাল্টে গেছে। এ সেই মেয়ে। ক্যানভাসার। রঞ্জন বলেছিল—তাকে সে কফি হাউসে দেখেছে, মেট্রোর বারে দেখেছে, চিড়িয়াখানায় দলের মধ্যে হৈ হৈ করতে দেখেছে—অংশু তাকে নিজের চোখে না দেখলেও তার আভাস পাচ্ছে।

অংশুমান বললে—তা হলে? অভিনয়ে লাভ সিন। এতে নার্ভাস হচ্ছেন কেন?

একটু ভাবল সীতা। বললে—দেখুন,—কারণ ঠিক একটা নয়। আমি বসে বসে ভাবছিলাম।

—কারণগুলো কি বলুন দেখি?

সীতা তার কপালের চুল সরিয়ে বললে—প্রথম কারণ আপনার সামনে। আপনি খুব ভাল অভিনয় করেন শুনেছিলাম—রিহার-শ্যালে দেখছি। আমি বলব কথাগুলো, কিন্তু লোকে বোধহয় হাসবে।

—না, হাসবে না। একটু প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে হবে। নিজেকে একটু ভুলতে হবে। দেখবেন আমার চেয়ে—

সীতা সেন বললে—সেই হয়েছে বিপদ! কিছুতেই ভুলতে পারছি না নিজেকে। আমি—। কিছু মনে করবেন না তো?

—কেন, মনে করব কেন?

এগুলো রোমান্টিক ননসেন্স মনে হচ্ছে আমার। আমি মডার্ন-টডার্ন বুঝিনে। হাল-ফ্যাসান জানি। সাজতে-গুজতে পারি। কথাও বলতে পারতাম, এখন ক্যানভাসারি করে প্রায় টেপ রেকর্ডারের মত বেজে চলি। বাবা ছিলেন রিটায়ার্ড গভর্নমেণ্ট সারভেণ্ট—বাড়ীতে এককালে সায়েবিয়ানা ছিল, রিটায়ারমেণ্টের পর অনেক খাটিয়ে-ছিলেন, কিন্তু উঠিয়ে দেননি। ছেলে-বেলা মিশনারী ইস্কুলে পড়েছি। বড় হয়ে কিছুদিন লরেটো তারপর অর্থাভাবে দেশী ইস্কুলে।

হেসে বললে—অবিশ্যি আজকাল আর লরেটো আর দেশীতে তফাৎ নেই। সবখানে এক হাওয়া এক জল। পড়াশুনোয় ভাল ছিলাম না। ইস্কুলে হৈ হৈ করেছি; কিছুই গ্রাহ্য করিনি ভাবিনি। বাবা বলতেন—বিয়ে marriage is sort of liscensed prostitution; তবু বিয়ের কথা বলতেন। বলতেন বিয়ে দিতে হলে খুব ভালো ঘরে ভালো পাত্রে দাও। নয় তো দিয়ো না। মেয়েকে লেখা-পড়া শেখাচ্ছ খেটে খাবে। বিয়ের রেমান্স দশদিন। বামুনদের অশৌচের মত। মাথা কামিয়ে শ্রাদ্ধ সেরেই উইল প্রবেট সাক-সেশন সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বিষয়ের হিসেবে বসতে হবে। না বসে উপায় নেই। বাইরের জগৎ বাধ্য করবে এবং তামার অন্তর একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে like a hungry dog বপের পরিত্যক্ত মাংসখণ্ড—বা—আধখানা খাওয়া গরু-শুয়োর যাই বল তার উপর। আমার বিয়ের কথায় বাবা মাকে বলতেন এসব। এমনিও বলতেন।

একটু থেমে সীতা বললে—অবাক হচ্ছেন না?

অংশু বললে—একটুও না। অত্যন্ত নগ্ন সত্য!

—ওই। নাটকের সত্যটা ওই নার্সের বধূবেশের মত ছদ্মবেশ একেবারে মিথ্যে!

—তা না-হতে পারে। তবুও একটি মেয়ে পুরুষের মধ্যে প্রেম হতে পারে। তার উপর ছেলেটির মনে অনুশোচনা রয়েছে!

—তাই কি? সীতা প্রশ্ন করলে!

—কেন? এটাকে অসত্য বলবেন কি করে?

সীতা বললে—যদি বলি আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। আমার উপলব্ধি


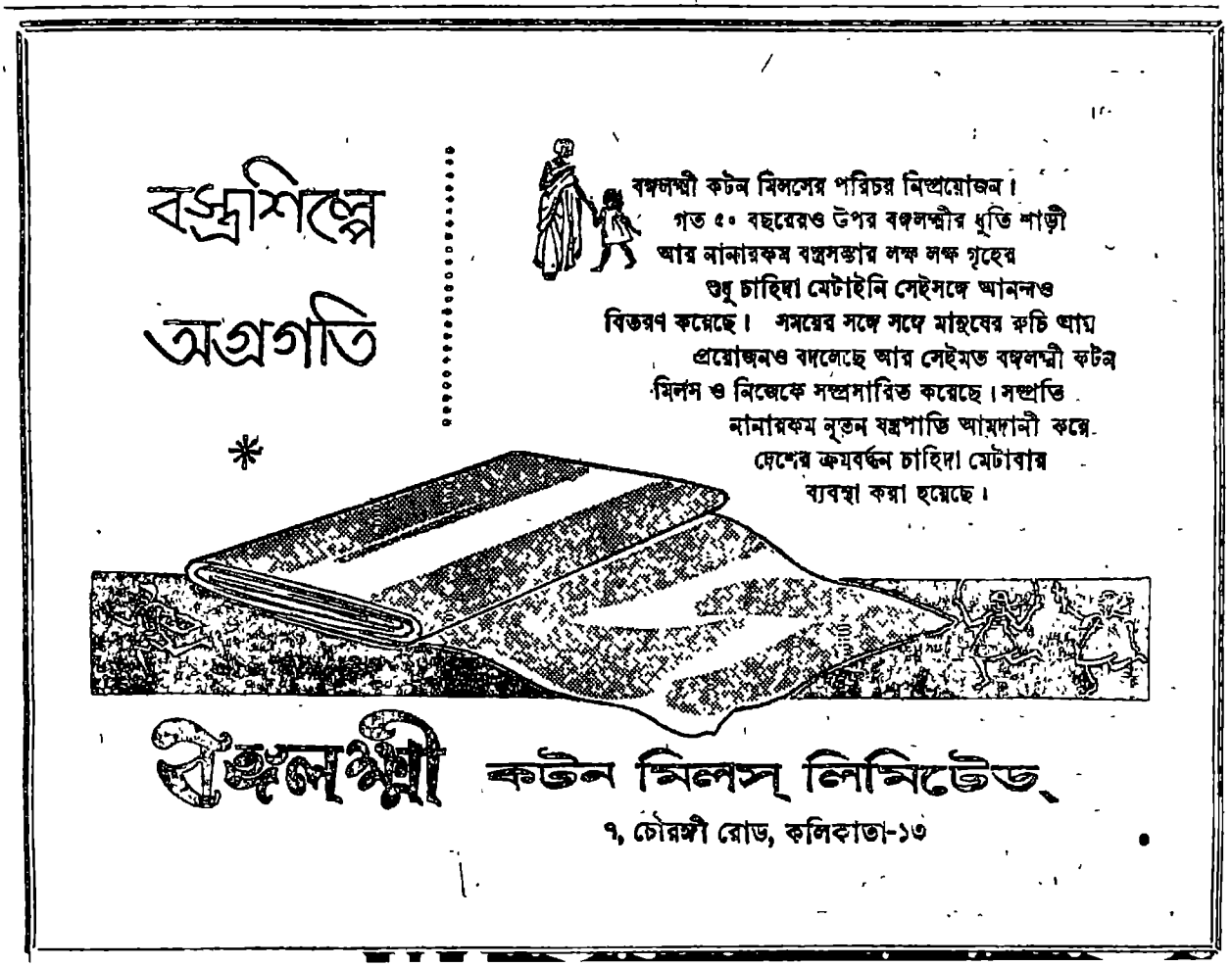

সুগৃহিনী জানেন মন্ত্রটা

গৃহিণীরা অনেক সময় শুনে থাকেন, আমি কি টাকার গাছ যে নাড়া দিলেই টাকা পড়বে? কিন্তু সুগৃহিণীরা জানেন মন্ত্রটা। তাঁরা অনেক আগে থেকেই প্ল্যান করে ব্যাঙ্কে একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা জমানো শুরু করেন। এবার তাই ভাবতে হল না পুজোর খরচ নিয়ে। মনের আনন্দ মিলল পুজোর আনন্দে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ অফিসঃ
৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

থেকে। শুধু একলা আমার নয়। সব মানুষেরই তাই!

—না।

—আমিও না বলছি। আপনি লেখক। এই সেন্টিমেন্টগুলো নিয়ে ভাঙ্গিয়ে কিম্বা এই কাঁচা মাটি নিয়েই নানান পুতুল গড়েন। বাস্তবকে স্বীকার করেন না। আমার নিজের জীবনের বাস্তব একেবারে পাথুরে মাটির বাস্তব। পলিমাটির সমতল নয়।. তবুও স্বীকার করবেন যে পৃথিবী বলতে শুধু মাটি বোঝায় না মাটি পাথর দুই বোঝায়। আমার জীবনে আই-এ দুবার ফেল করলাম —বাবা মারা গেলেন। শেষের দিকে তিনি আমার বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছিলেন। চেহারা খারাপ নয় আমার দুচার ঘরে সম্বন্ধ হচ্ছিল। কিন্তু টাকা প্রবলেম, আমার শুধু ম্যাট্রিক কোয়ালিফেকেশন প্রবলেম। বাবা সার্কেল অফিসার ছিলেন—বড় বাড়ীতে ভাল চাকরে ছেলের কাছে সেটা প্রবলেম। বাবার প্রবলেম—গেরস্তঘর। সাধারণ ছেলে, শুধু কেরানী!

হেসে উঠল সীতা। তারপর বললে—সুতরাং বিয়ে হল না। বাবা মারা গেলেন। দাদা শুধু কেরানী—তিনটে ছেলে—বউদি বড় চাকুরের মেয়ে। নতুন প্রবলেম। বাবার পেনসেন বন্ধ। বাবার দেনা। প্রবলেমের উপর প্রবলেম। বাবার বন্ধু একজন এই চাকরী করে দিলেন। পলিটিক্যাল পার্টীতে বিষের সুযোগ আছে। অবশ্য ডাইভোর্সের পথ খোলা রেখে বিয়ে। এই চাকরীর মধ্যেও সেটা আছে। অনেক অল্পবয়সী ছেলে আমাদের সঙ্গে কাজ করে। তাদের সঙ্গে মিশছি-হাসছি-খেলছি এবং এটা একেবারে দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে—দেহের তাড়নায় ছেলেতে মেয়েতে কিছুকাল হয়তো দু' মাস এক বছর—বড়জোর একটা বাচ্চা হওয়া অবধি বেশ একটা গাঢ় উত্তপ্ত আবেগ থাকে সেটাকে আমরা প্রেম বলি। তারপর ওই অশৌচের মত কালটা কাটে। তখন হিসেব আসে। এবং দেখা যায় সাপের বিষ দেহে ঢোকার জন্য জিভে যা মিষ্টি ঠেকছিল সেটা বিষের ক্রিয়াটা কাটতেই তেতো নিম হয়ে গেছে। যাদের বিষ কাটে না তারা মরে সাপে কাটা রোগীর মত। সুতরাং ওই যে নাটকের এ্যাক্টিং ওটাকে সত্য বলে মানি কি ক'রে?

হেসে অংশুমান বললে—এইখানেই হেরে গেলেন। নিজেকে নিজেই কনট্রাডিক্ট করলেন!

—কেন? আপনার সাহিত্যিক প্যাঁচটা শুনি?

—প্যাঁচ একটুও দিচ্ছি না। প্যাঁচে আপনিই পড়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমাল ক'রে ফেলেছেন।

সীতা তার দিকে সবিস্ময়ে তাকালে।

অংশু বললে—ওটা সত্যিকারের লাভ সিন? না নাটকেই বলে দেওয়া আছে, ওটা অভিনয়?

চমকে উঠল সীতা।

অংশু বললে—নয়?

সীতা এবার ধীরে ধীরে বললে—যেন ভেবে বুঝতে বুঝতে বলছে— কিন্তু মেয়েটা অভিনয় করতে গিয়ে তো প্রেমে পড়েছে। বিষ খেয়ে মরেছে।

—তা মরেছে! সেখানটায় তো আপনি শুধু শুয়ে থাকলেন চোখ বুজে। আপনার নিশ্বাস পড়বে—সেটা নাট্যশাস্ত্র অনুসারে আপত্তিজনক হবে না!

হেসে উঠল সীতা।

অংশু বললে—আপনার নামবার জাবগ্য কিন্তু পেরিয়ে চলে এসেছি।

—ও মা। তাই তো। ওঃ বউদি যা ঝাঁ-ঝাঁ করবে! সব তেতো হয়ে যায়।

অংশু বললে—সাপের বিষের ক্রিয়াটা কাটিয়ে দেন। সীতা খিলখিল করে হেসে উঠল!

অংশু ট্যাক্সিওলাকে গাড়ী ঘোরাতে বললে।

* * *

পরেরদিন সীতা এল এবং ওই সিনটার রিহারশ্যাল দিতে দাঁড়াল। প্রথমেই বললে—আজ আর একবার দেখি! না পারি তো মাপ চাইব কিন্তু।

রিহারশ্যাল কিন্তু ভালো হল না। প্রানহীন হয়ে গেল। কথাগুলো বলে যাওয়াই হ'ল। সে কিছু বলবার আগেই অংশু বললে—গুড!

সীতা বললে—এই গুড?

—তার সূচনা!

—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে হবে না!

—হবে! আমি বলছি!

অংশুর অনুমান পুরো সত্যিও হল না—মিথ্যেও হ'ল না। সীতা সেন অনেকটা উন্নতি করলে কিন্তু সেটা অংশুর বিপরীতের উপযুক্ত নয়। এবং কেমন একটা খামতি যেন রয়ে গেল।—প্রতিদিনই অভিনয় শেষে বেশ একটু হেসে নিয়ে বলত—বাবা, একেই বলে নাটক। রীতিমত নাটক!

ষাড়শী সংঘের সভ্যেরা প্রত্যেকেই মর্যাদাবান লোক। অন্তত সমাজে সেটা স্বীকৃত এবং তাঁরা নিজেরাও সে সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা বেশ খুশী হচ্ছিলেন না। সন্ত্রস্ত বোধ করছিলেন এই রূপসচেতন মেয়েটির অতি-আধুনিকতা ও উগ্র প্রগল্‌ভতার জন্য। এই কয়েকদিনেই সে স্বরূপে প্রকাশিত করেছে নিজেকে। দু-একদিন তার প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে একটি ক্ষীণ কটুগন্ধ পাওয়া গেছে! সে হাসছে উচ্চগ্রামে। আসে যায় তার পদক্ষেপ অতি চঞ্চল এবং একটু বেশী শব্দ করছে তাঁদের চেয়ে।

রঞ্জন নিজেও একটু অস্বস্তি বোধ করছে এবং মনের মধ্যে একটু অপ্রীতি জমে উঠেছে। অংশুমান যেন ওকে নিয়ে খেলা করছেন। কেউ কিছু বলতে পারছে না।

বিপদ বাধল ষ্টেজ বিহারশ্যালের দিন। এতদিনের পর ওই সিনে অংশুমানের কথা ধরে কথা বলতে গিয়ে কথা বলতে পারলে না। প্রথম দিনের মত।

—কি হল?

বলতে সে কিছু পারলে না কিন্তু থরথর করে কাঁপতে লাগল।

সকলে বলে—কি হল?

সে অসহায় ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ঘামছে; দরদর ধারে ঘামছে। একটু একটু হাঁপাচ্ছে। রঞ্জন এসে বললে—মিস সেন, কি হল?

অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে—পারছি না। এ আমি পারব না রঞ্জনবাবু!

—সে কি?

—না! আমি পারব না! আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে! দেখুন!

ষোড়শী সংঘের সকলে রাগে অধীর হয়ে উঠল। বিমল গুপ্ত বললে—রাবিশ! শেল বন্ধ ক'রে দিন! রঞ্জনবাবু আর অংশুবাবু এর জন্যে দায়ী!

মাসীমা বললে—এ যে দারুণ ন্যাকামি। আমরা পারিনে।

অংশু উঠে এল, সে ষ্টেজে তার জায়গায় বসে ছিল। বললে—সরুন তো সব!—সকলে স'রে দাঁড়াল। অংশু এসে সামনে দাঁড়াল সীতার। বললে—কি হয়েছে তোমার? এক মুহূর্তে সে তুমি বললে। কণ্ঠস্বর তার রূঢ়।

সে কণ্ঠস্বর শুনে সীতা সকরুণভাবে তার মুখের দিকে তাকালে।

অংশু বললে—কি হয়েছে বল?

সীতা বললে—আমি পারছি না। আমি কাঁপছি! ঘামছি!

—না কাঁপছ না। ঘামছ ঘাম। পার্ট করতেই হবে!

সীতা এবার বললে—না, আমি পারব না!

খপ ক'রে তার হাত ধরে অংশু তাকে টেনে গ্রীনরুমের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে! সীতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—কি? পারবে না কেন?

সীতা এবার একলা অংশুমানকে পেয়ে দীপ্ত হয়ে উঠল এবং বললে—না। পারব না। আমি পারছি না! করব না আমি অভিনয়!

—কি ভেবেছিলে কি?

—কি?

—সাহিত্যিক অংশুমান তোমার প্রেমে পড়েছে? এবং ভয় হচ্ছে অভিনয় করতে গিয়ে তার প্রেমে তুমি পড়ে যাবে? নির্বাক স্তব্ধ হয়ে গেল সীতা। তার সুন্দর মুখ পেন্টের রঙে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল—সে মুখ যেন কালো হয়ে গেল। দুটি অশ্রুর ধারা তার চোখের কোল বেয়ে নেমে এল!

অংশু বললে—কাঁদছ কেন? কেঁদে কি ফল? এঁদের কথা ভাবছ না তুমি?

চোখ মুছে সীতা উঠে দাঁড়াল। বললে—চলুন।


এবারের শারদীয়া

চতুষ্পর্ণা

৪ খানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন

- সন্তোষকুমার ঘোষ
- বিমল কর
- সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
- কবিতা সিংহ

তা ছাড়া আছে বহু তরুণ ও প্রবীণ লেখকের গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধাবলী।

দাম মাত্র দু' টাকা

চতুষ্পর্ণা

২০-এ, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলি-১২।



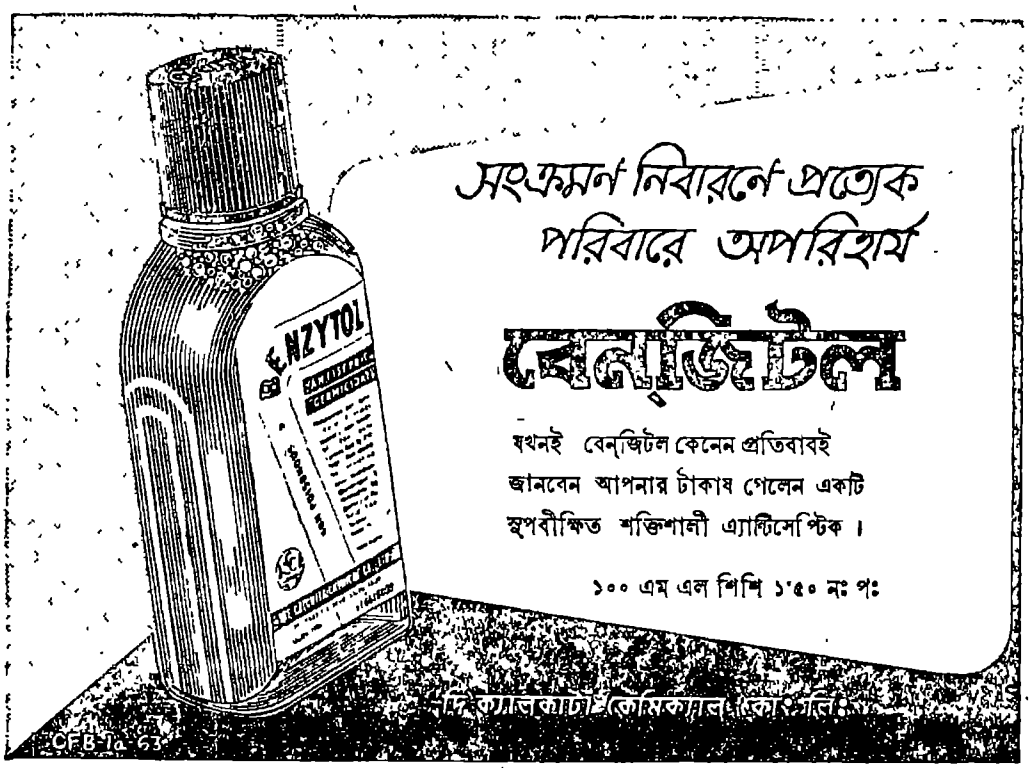

উৎসবের আনন্দে
প্রিয়জনকে তৃপ্তি দিতে হলে
চাই রবীনের সন্দেশ ও দধি
শ্রীরবীন্দ্র নাথ আস
১৫৭, বিবেকানন্দ রোড, ফোন ৩৪-১৭১০

কোন উৎসাহবাক্য বললে না অংশু—কোন সান্ত্বনা না—দরজা খুলে বললে—এস!

ষ্টেজে এসে বললে—আরম্ভ কর! গোড়া থেকে। এই সিনের গোড়া থেকে। বিকেল থেকে সিন আরম্ভ। বিকেলের আলো—। বিকেলের আলো দাও! প্রমটার—!

আরম্ভ হয়ে গেল। একপাশে উইংসের ধারে মাটির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সীতা। মাটির দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ তার কানে এল—কিন্তু আজ সে আসবে। নিঃশব্দ পদক্ষেপে আসবে। আমি আমার বাঁশীর সুর ছড়িয়ে দিয়েছি। তারই সুতো ধরে এসে—সে হয়তো ওই জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে ডাকবে—

—মধুকর—! সীতা এসে ঠিক দাঁড়িয়ে ডাকলে।

কে একজন বললে—লাউডার।

অংশু বিরক্তিভরে বললে—না! ঠিক ডাক হয়েছে। লাউডার হবে না। প্রেমের অভিনয় চীৎকার করে ঢাক বাজিয়ে হয় না। ডিস্টার্ব করবেন না। শ্লিজ! তবে একটু ড্রাই হয়েছে।

আবার এই জায়গাটা থেকে আরম্ভ করতে হল।—সীতা আবার ঠিক এসে ডাকলে মধুকর! তারপর চলল অভিনয়ের মহলা। আগামীকালের জন্য প্রস্তুতি। ঠিক চলছে, শুধু সীতা প্রাণহীন! শুধু বলেই যাচ্ছে। বলেই যাচ্ছে যেমন প্রমটার বলাচ্ছে। কিন্তু সে এখনও কাঁপছে—এখনও ঘামছে। মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। তবু সে পার্টটা চালিয়ে যাচ্ছে।—সিন শেষ করে বাইরে এসে সে বসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে সে।

রঞ্জন এসে পাখাটা খুলে দিলে। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে সীতা। সম্ভবত কাঁদছে! অংশুমান দৃশ্য বদল হতে এসে দাঁড়াল সেখানে। বললে—মরে শুয়ে থাকার সিনে আজকে ওঁকে শুতে হবে না। এমনি করতে বল।

রঞ্জন চলে গেল। অংশুমান বললে—এখন ভাল বোধ করছেন?

মুখ তুলে তাকিয়ে সে একটু হেসে বললে—অভালো বোধ করেছি কে বললে আপনাকে? এখন দয়া করে একখানা গাড়ী আনিয়ে দিন। ভাববেন না—কাল ঠিক সময় আসব।

—ধন্যবাদ। গাড়ী ঠিক আছে। দেখি দাঁড়ান।

নিঃশব্দে সে চলে গেল। ষোড়শী সংঘের সভ্যদের মধ্যে অসন্তোষ অতৃপ্তির গুঞ্জন উঠল। প্রাণহীন শুষ্ক অভিনয়ের জন্য কোন ক্রিয়া হয় নি দর্শকদের মনে। অংশুমান বললে—কি করব? আর তো উপায় নেই। তবে—। কাল এর চেয়ে ভাল করবে তা বলতে পারি। আজ আমি ওকে খুব মানে বাক্যে যতখানি কশাঘাত হয় করেছি।

পরদিন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রবীণ লেখক শিবনাথের সামনে অংশুমানের কথাটা পরিমাণে অতি সত্য হয়ে উঠল। আশ্চর্য! সীতা এল যথাসময়ে। নীরব স্বল্প। এবং

শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস
কথা ও সুর : সলিল চৌধুরী
JNG 6156 | আমার প্রতিবাদের ভাষা · দেশাত্মবোধক
চল চল রে মুক্তি সেনানী "

শ্রীমতী মাধুরী চট্টোপাধ্যায়
কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়
JNG 6158 | ওগো শুনি তব বাঁশী - আধুনিক
আমি না আজ প্রাণে ঘোর - আধুনিক

শ্রীমতী রমা গুহঠাকুরতা
কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : ডাঃ কুশেন হালদারিকা
JNG 6164 | সবার তাঁর আশা করে - আধুনিক
আর ঘরে কেউ থাকবো না "

শ্রীঅখিল বন্ধু ঘোষ
কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সুর : শিল্পী
JNG 6163 | তোমার ভুবনে ফুলের মেলা - আধুনিক
আমি কথা দিলে কথা রাখি "

শ্রীবিষ্ণু পদ দাস
কথা : সংগ্রহ সুর : শিল্পী
JNG 6160 | পরপের ওকারে - পল্লী-গীতি
আমি মন চোরারে "

শ্রীমতী শর্মিলা ঘোষ
কথা : শ্যামল গুপ্ত
সুর : জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ
JNG 6159 | কে আমাকে ডাকে আধুনিক
শুন বকুলা দোলে "

শ্রীঅনুপ শর্মা
ELECTRIC GUITER
JNG 6166 | সুর : এসো আমার ঘরে - রবীন্দ্রনাথ
" : মনে কি দ্বিধা "

শ্রীমতী সীতা সেন
কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সুর : শিল্পী
JNG 6165 | আলোক অন্ধকারে - আধুনিক
ঐ দূর পলাতকা পাখীর "

শ্রীরবীন পাল
ELECTRIC GUITAR
JNG 6157 | দুর্গম গিরি কান্তার মরু - সুর :
ধন ধান্যে পুষ্প ভরা "

শ্রীঅপরেশ লাহিড়ী
কথা : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর : ভি, বালসারা
JNG 6161 | আমি যদি কালো হলেম আধুনিক
লাইন লাগাও "

শ্রীজহর রায়
কৌতুক-নক্সা
JNG 6167 | ষ্টেজে বিচিত্র দর্শন · ১ম খণ্ড
ঐ ২য় খণ্ড

রাজকন্যা কলা মন্দিরের পলাতক ছবির গান
শ্রীমতী রমা গুহঠাকুরতার কণ্ঠে শুনুন
JNG 6154 | মন যে আমার কেমন কেমন করে
চিনিতে পারিনি বঁধু

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় (খুকু)
কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় • সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়
JNG 6168 | কাজুন বলে এ গান কোথা
ওই মত অমন চাঁদ মুকি ঘুমালো

GRAMOPHONE CALCUTTA

চোখ দুটি অত্যন্ত ধারালো মনে হল। কিছু পান করেছে কিনা সে নিয়ে মহিলারা একটু কানাকানি করলেন। কিন্তু কোন ব্যতিক্রম বৈলক্ষণ্য কেউ দেখতে পেলে না গন্ধ পেলে না। ওদিকে সীতা প্রথম দৃশ্যে ধারালো ছুরির দীপ্তি নিয়ে প্রবেশ করলে। সে যখন বক্র তির্যক হেসে বললে—যা আমার মন করায় আমি তাই করি ডাক্তারবাবু। আমার কাছে তো তা অন্যায় মনে হয় না! মনে হলে করব কেন? আর অন্যে তাকে অন্যায় বললে মানব কেন?

—মানবে না?

—না। আর পথ? কোন পথে মানুষ কোথায় কবে কোন্ স্বর্গে পৌঁচেছে বলতে পারেন? সেই তো মাটির ধুলোতেই সে চোখের জল ফেলে শেষনিঃশ্বাস ফেলে। তারপর ছাই হয়ে কিম্বা পচে মাটির ধুলোতেই মিশে যায়।.....। পাপ-পুণ্যের বিচার লোকে বলে ভগবানের হাতে। তিনি নেই বলেই আমার ধারণা। আমি মানি না। থাকলে তো এমনিতেই আমার সাজা হবে তাঁকে না-মানার জন্যে। তার উপর এই সব যদি পাপই হয়—তবে তার সাজাটা বোঝার উপর শাকের আঁটিই হবে। ফাঁসির হুকুমের পর পাঁচ বছর কারাবাসের ব্যবস্থা হবে।

সে কথা শুনে লোকে শিউরে উঠল। স্তম্ভিত হল। কি প্রখরা, কি উদ্ধত—উগ্র মেয়ে! তারপর কিন্তু শেষ দৃশ্যে সে যখন বধূবেশে এল, তখন তার কণ্ঠ যেন বিরহ-বিধুরা চক্রবাকীর মত করুণ। এবং অভিনয়ের মধ্যে মনে হল—অংশুমানের কাছে বসে থাকলেও একটি অদৃশ্য নদী তাদের মধ্যে বয়ে যাচ্ছে। যার অপর পারে সে বসে রয়েছে। কিন্তু সে আজও কাঁপছিল। থর-থর করে কাঁপছিল। মুখের পেন্টের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। পার্ট শেষ করে সে টলতে টলতেই বেরিয়ে গেল। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকেরা কাঁদছে। মাসীমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। বড়দিদি চুপ করে বসে আছেন। দুটি জলের ধারা তাঁর চোখের উপর চিক্‌চিক্ করছে—তিনি মোছেন নি। মুছতে ভুলে গেছেন। লেখক শিবনাথবাবুর চোখেও জল।

শেষ দৃশ্যে প্রবীণ ডাক্তার চিঠিখানা পড়লে। নাটক শেষ হল।

ছুটে গেলেন মাসীমা ষ্টেজের ভিতর। বড়দিদি এবং অন্য সভ্য ও কিছু নিমন্ত্রিতেরা গেলেন ষ্টেজের মধ্যে। শিবনাথ-বাবুও গেলেন। বিমল গুপ্ত ষ্টেজের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—মেয়েটি এসেই অজ্ঞান হয়ে গেছে। এখন—একটু—।

অর্থাৎ ভিতরে যাবেন না।


সুপার হিট

## বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

লেখক—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অমূল্য অবদান এবং বিশ্বের সাহিত্য সৃষ্টির অদ্বিতীয় নিদর্শনস্বরূপ। শিল্পকলা-সংক্রান্ত যাবতীয় সংজ্ঞা, তত্ত্ব-কথা, রসবোধ ও বিচার-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও রয়েছে অপরূপ কথাচিত্র। দাম বারো টাকা

## নৈরাজ্যবাদ

লেখক—ডঃ জতীন্দ্রনাথ বসু। নৈরাজ্যবাদের কল্পনা বহু প্রাচীন। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চৈনিক দার্শনিক লাওৎসে থেকে শুরু করে গান্ধী পর্যন্ত অনেকেই নিরাজ সমাজের কল্পনা করেছেন। বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদের চেয়ে আত্মিক নৈরাজ্যবাদের (Spiritual Anarchism) শ্রেষ্ঠতাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং এই ইঙ্গিত তাঁর গ্রন্থে রয়েছে। এই নব নৈরাজ্যবাদ বিত্ত ও ক্ষমতার উন্মাদ কামনার বিরুদ্ধে মানবাত্মার সার্বধান বাণী। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত নৈরাজ্যবাদের বিস্তার এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদী-দার্শনিকের চিন্তা-ভাবনা সম্বলিত এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষার একটি অমূল্য সম্পদ। দাম : দশ টাকা

## ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন

লেখক—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পলাশী যুদ্ধের পনেরো বছর বাদে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এমন একটি পুরুষ জন্মালেন বাংলাদেশে যিনি শুধু বাংলার জীবনে নয়, ভারতবর্ষের জীবনে নবজাগরণের ও নব বসন্তের সব সম্ভাবনা বহন করে নিয়ে এলেন। এই অসাধারণ প্রজ্ঞাবান পুরুষ হচ্ছেন রামমোহন রায়। ধর্ম, সমাজ এবং দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারে, প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষায় ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন প্রভৃতি ব্যাপারে রাম-মোহনের সর্বতোমুখী বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে অক্লান্তভাবে সচেষ্ট ছিল। ভারতের শিল্প-বিপ্লবের পুরোধা হিসেবে ভারতপথিক রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। দাম : দুই টাকা

## জীবন-জিজ্ঞাসা

লেখক—আইনস্টাইন। অনুবাদক—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকা—সত্যেন্দ্রনাথ বসু। মানুষ আইনস্টাইনের পরিচায়ক এই গ্রন্থে তাঁর সাধারণ অভিমত ছাড়াও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্র এবং শান্তিবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আইনস্টাইনের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংকলন করা হয়েছে। দাম : আট টাকা

## বাঙালী

লেখক—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। বাঙালীর ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ, বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছেই অনুশীলনের বস্তু। সারা ভারতের পটভূমিতে সেই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। দাম : দুই টাকা

## ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ

বিভিন্ন ফরাসী বুদ্ধিজীবি লিখিত এবং পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। বিশ্বমানবের কবি রবীন্দ্রনাথকে ভালবেসে, বিদেশীরা নতুন করে ভালবাসতে শেখেন শাশ্বত এই ভারতবর্ষকে।...স্যাঁ-জন পার্স, আঁদ্রে জিদ্, আঁদ্রে মোরোয়া থেকে শুরু করে হাল আমলের অগণ্য ফরাসী গুণীর চোখে রবীন্দ্রনাথের যে-রূপ ধরা পড়েছে, তারই কয়েকটি এখানে সংকলিত হল মূল ফরাসী প্রবন্ধ থেকে। দাম : পাঁচ টাকা

## আমার ঘরের আশেপাশে

লেখক—ডঃ তারকমোহন দাস। ভূমিকা—সত্যেন্দ্রনাথ বসু। নিজেদের দেশের ফুল ফল, গাছপালার ওপর এক স্বাভাবিক আত্মীয়তা বোধ মানুষের বয়সের সঙ্গে মিশে আছে। এই সব দেশজ গাছপালা জীবনের বিচিত্র সম্ভার নিয়ে দিগন্তে রঙীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের নির্নিমেষ দৃষ্টির সম্মুখেই। —কি তাদের নাম? কি তাদের জীবন-বৈশিষ্ট্য? আমাদের জাতীয়-মানস ও ভাবধারার সঙ্গে কোথায় তাদের সংযোগ? —সেই কাহিনী পরিবেশনই এই বই-এর মূল লক্ষ্য। দাম : পাঁচ টাকা

রূপা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

পেটেন্ট

মোহন কুকার

এন. ব্রাদার্স

৩৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা



মাণিকা হেয়ার অয়েল

কেশপতন নিবারক ও কেশবর্দ্ধক

ভেষজ সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রকৃত গুণসম্পন্ন কেশ তৈল

নগেন্দ্রলাল হোমিও লেবরেটরী

কলিকাতা-১৪


শিবনাথবাবু বললেন— একদিন আমার ওখানে সব নিমন্ত্রণ তোমাদের বলো অংশুকে।

ষ্টেজ থেকে বেরিয়ে গ্রীণ-রুমে সীতা টলতে টলতেই এসেছিল এবং এসেই মরা নার্সের ভূমিকার জন্য তন্য সেটে যেতে যেতে পথেই লুটিয়ে পড়েছে—জ্ঞান হারিয়ে। রঞ্জন তাকে তুলে পাখার তলায় শুইয়ে মুখে-চোখে জল দিয়েও জ্ঞান ফেরাতে পারে নি। ডাক্তার ডাকতে হয়েছে। এর মধ্যে অংশুমানও এসেছে। সে দেখেই দুবার ডেকে ওর পাশে ঝুঁকে বসে আছে। ডাক্তার বলেছেন অত্যন্ত স্ট্রেন হয়েছে। খুব ইমোশনের সঙ্গে পার্ট করার জন্যে হয়েছে। এখন বিশ্রাম—ফুল রেষ্ট। অন্ততঃ ঘন্টাখানেক শুইয়ে রাখুন। জ্ঞান অবশ্য একটু পরই হবে। একটু গরম দুধ—না হলে জল দিন। ওই চোখের পাতা কাঁপছে। চোখ মেলবেন।

—কিন্তু ভিড় করবেন না। না।

আধঘণ্টা পর রঞ্জন সীতাকে বললে—গাড়ী আনতে বলি?

সীতা বললে—হ্যাঁ।

রঞ্জন বেরিয়ে গেল—অংশুমান সামনে চেয়ারে বসে সিগারেট টানছেন। সে বললে—সীতা!

সীতা তার মুখের দিকে তাকালে।

অংশুমান বললে—তোমাকে আমি ভালবাসি সীতা।

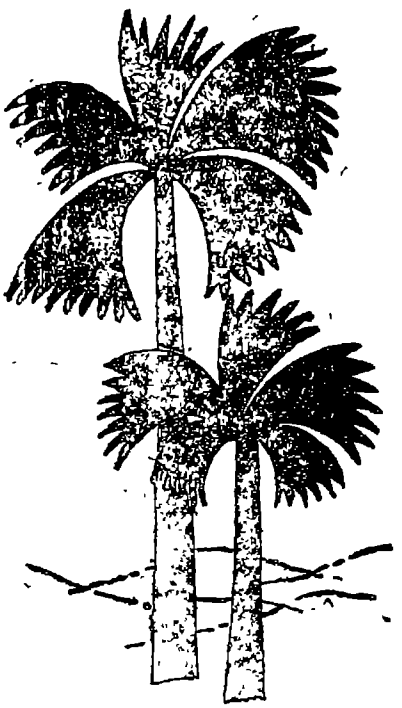

সীতা একটু হাসলে। কিন্তু কিছু বললে না।

রঞ্জন ফিরে এসে দাঁড়াল।—গাড়ী এসেছে!

সীতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমার মনকে আমি বুঝে দেখব অংশুবাবু। পরে—

—পরে?

—আজকেই এখুনি উত্তর চান?

—হ্যাঁ।

একটু চুপ ক'রে থেকে সীতা বললে—না। তারপর বললে—অভিনয়—অভিনয় অংশুবাবু। ভুলে যান। অভিনয় শেষ হয়ে গেছে।

অংশুমান দৃঢ় কণ্ঠে বললে—না। অভিনয়ও সত্য হয়। জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি হারিয়ে মানুষ লুটিয়ে পড়ে ধুলোয়।

সীতা মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। অকারণে বা সাধারণের অগোচর কোন কারণে টপটপ করে চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল।

অংশু বললে—চল!

সীতার সঙ্গে অংশুর কিন্তু বিবাহ হয় নি। দেখাও বিশেষ হয় না। কখনও কখনও রবিবার দিন সীতা আসে—কুকারে রান্না করে—খায় দায়—সারাদিন বালুচরে দুটি ছেলেমেয়ের মত খেলা করে চলে যায়।

তবে চিঠি লেখে। অজস্র চিঠি দুজন দুজনকে লেখে। রঞ্জনের কথা মিথ্যে হয়েছে। অংশুমান চিঠি পোড়ায় না সযত্নে সঞ্চয় করে। সীতা এখন ক্যানভাসারি করে না সে এখন শিবনাথবাবুর সুপারিশে একটি আধা-সরকারী নারী প্রতিষ্ঠানে ভাল চাকরী করে। কফি হাউসে—মেট্রোয়, চিড়িয়াখানাতেও আর দেখা যায় না। অভিনয়ও করে না, সে অংশুমানও না, সীতাও না। জীবনে অভিনয় শেষ হয়ে গেছে!


হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

একমাত্র বঙ্গভাষায় মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ পচাত্তর হাজার।

একবিংশ সংস্করণ সোনালী অক্ষরে কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৮·০০ মাত্র।

প্রত্যেক শিক্ষার্থী এবং গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় পুস্তক। ভাষা সরল, সুধীবৃন্দ অল্পায়াসে ঔষধ নির্বাচন করিতে সমর্থ হইবেন। এই পুস্তকের—

উপক্রমণিকা অংশে "হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মতবাদ" এবং "হোমিওপ্যাথির মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি" প্রভৃতি বহু গবেষণাপূর্ণ তথ্য আলোচিত হইয়াছে।

চিকিৎসা-প্রকরণে যাবতীয় রোগের ইতিহাস, কারণতত্ত্ব, রোগনিরূপণ, ঔষধ নির্বাচন এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রভৃতি সরল ও সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট অংশে—ভেষজ সম্বন্ধে তথ্য, ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ, রেপার্টরী, খাদ্যের উপাদান ও খাদ্যপ্রাণ, জীবাণুতত্ত্ব বা জীবাণুরহস্য এবং মল-মূত্র-ধাতু পরীক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সুধীবর্গ এই গ্রন্থ পাঠে অনেক নূতন তথ্য অবগত হইবেন।

এই জনপ্রিয় বহির নিপুণ প্রচারে প্রলুব্ধ কোন কোন ব্যবসায়ী "পারিবারিক চিকিৎসা" নামের সামান্য অদল-বদল করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রাহকগণ মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এণ্ড কোম্পানীর প্রকাশিত "পরিবারিক চিকিৎসা" সযত্নে দেখিয়া লইবেন।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

ইকনমিক ফার্মেসী, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১।

# বর

## অন্নদাশঙ্কর রায়

"পাবন সেন-হাজরা! পাবন! তুমি লণ্ডনে!" বেণুদির জন্মদিনের উৎসবে ওই ছন্নছাড়া যুবককে আবিষ্কার করে রাঙাদি বিস্মিত ও সস্মিত হন।

করমর্দনের পর ওর হাতখানি ধরে ওকে বসিয়ে দেন আপনার একপাশে। "তোমার কথা আমি এত শুনেছি যে তুমি আমার নিম চেনা হয়ে রয়েছ। বাকী ছিল শুধু মুখ চেনা। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। বলব। পার্টির পরে।"

পাবন কিন্তু ভদ্রমহিলার নামটিপর্যন্ত জানত না। বেণুদির দিকে তাকাতেই তাঁর খেয়াল হয়। "ওমা। তাও জান না? মিসেস বরাট আমাদের দেশের বিখ্যাত—"

বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিস্টার পি এল বরাটের সহধর্মিণী। রাঙাদি কথা কেড়ে নিয়ে নিজের গায়ে পেতে নিলেন। "দূর! বিখ্যাত কিসের! বিখ্যাত যদি বল তো আমার বন্ধু সরোজিনী নাযডু। এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।"

তা শুনে চারদিকে হাসাহাসি পড়ে গেল। অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা নিয়ে ছুটোছুটি করছিলেন বেণুদিব স্বামী। এইচ গোস্বামী। ইনিও একদিন বিখ্যাত ব্যারিস্টার হবেন। আপাতত উকীল পরিচয়টা খণ্ডাতে

বিলেত এসে মিডল টেম্পলে ভর্তি হয়েছেন। বেণুদিও নিষেছেন বাংলা আর সংস্কৃত পড়ানোর কাজ। গোস্বামী—তার চেয়ে ভালো শোনায় বেণুস্বামী—এক সেকেন্ড থমকে দাঁড়িয়ে একটু ফিক করে হেসে বললেন, "রাঙাদি, শুধু কি দেশে, বিদেশের ইংরেজমহলেও আপনার নাম অনেকদূর ছড়িয়েছে। অবাক কাণ্ড। ওরাও বলে, রাঙ্গাডি!"

তা শুনে আবার একচোট হাসি। উৎসাহিত হয়ে বেণুস্বামী আরেক কদম এগিয়ে গেলেন। আক্ষরিক অর্থে নয়। "কে না জানে আপনারা ফর্ভাগিনী কী একটা গোপনীয় মিশন নিয়ে এদেশে এসেছেন। একটি ছোট পাখী আমার কানে ফিসফিসিয়ে বলছিল মোতিলাল নেহরু—"

রাঙাদি ভর্জনী মুখে তুললেন। "চুপ চুপ! ও কী যা তা বকতে শুরু করলে, হেমেন্দর! তুমি কি জান না, সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। মন্টেগু যখন সেক্রেটারি অফ স্টেট আর সিন্‌হা আণ্ডার সেক্রেটারি তখন ওঁকেও একটা পদ অফার করা হয়েছিল। উনি ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, আমি নাম চাইনে, দাম চাইনে, পদ চাইনে, পদবী চাইনে, আমি চাই শুধু এইটুকু, আমার দেশের শাসনসংস্কার আইনের খসড়ার যেন আমারও কিছু হাত থাকে।"

সকলে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে লক্ষ করে তিনিও আরেক কদম এগিয়ে গেলেন। অবশ্য স্বস্থানে আসীন থেকে। "তা বলে নেহরু কন্‌স্টিটিউশনে ওঁর কোনো হাত নেই। কেন যে ও রকম রটে! উনি এবার

এসেছেন প্রিভি কাউন্সিলে হিয়ারিং উপলক্ষে। বছর খানেক থাকতে হবে। বাড়ী নেওয়া হয়েছে। উনি ন্যাশনাল লিবারল ক্লাবের পুরোনো মেম্বর। সন্ধ্যাবেলা হয় ক্লাবে যান, নয় হাউস অফ কমন্‌সে গিয়ে ডিবেট শোনেন। যার যা নেশা। তাই আজকের মতো প্রীতিকর অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে অক্ষম বলে ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছেন।"

"ছি ছি। ও কী বলছেন, রাঙাদি! ওঁর মতো মান্য ব্যক্তির স্নেহ আশীর্বাদই পরম সৌভাগ্য।" বেণুদি দুই হাত একত্র করলেন।

"আমার কথা যদি বল" রাঙাদির কথা তখনো শেষ হয়নি, "আমি একজন সেকেলে ফেমিনিস্ট। মিসেস প্যাঙ্কহার্স্টের অনুচর হয়ে লড়েছি। এই যে মেয়েরা আজ ভোটের অধিকার পেয়েছে এর জন্যে সমস্তটা ধন্যবাদ কি বল্‌ডুইনের পাওনা?"

পাবন ততক্ষণ পাশে বসে উলখুস করছিল। অমন একজন জাঁদরেল মহিলার পাশে কি ও বেচারাকে মানায়? কোথাকার কে এক পাবন সেন-হাজরা। লন্ডনে নবাগত বললেও চলে। পরনে সস্তা কন্টিনেন্টাল পোশাক। একঘর অতিথির ঈর্ষাকাতর চাহনি তাকে সংকোচের মতো বিঁধছিল। সে উঠি উঠি করে না পারে উঠতে, না পারে বসে থাকতে।

"গুড ইভনিং রাঙাদি" বলে উদয় হলেন এক ইংরেজ মহিলা, তাঁর পিছনে ব্যস্তবাস্ত গৃহস্বামী বেণুস্বামী। পাবন বুঝতে পারল যে এইবার স্বর্গ হইতে বিদায়। মানে মানে সরে পড়াই শ্রেয়। ইংরেজ মহিলাকে সে তার আসন অফার করতেই তিনি একবার আলগোছে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ।" তার পর রাঙাদির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। সেকালের গল্প।

এর পরে প্লেটে করে মিষ্টান্ন পরিবেশন। স্বদেশী বিদেশী দুই রকমই ছিল। সাহায্য করছিল পাবনের বন্ধু শ্যামল ও কান্তিমান এবং আরো কয়েকজন। তারা বাঙালীর মেয়ে। পরিবেশনের মাঝখানে কখন একসময় আরম্ভ হয়ে গেল রবীন্দ্রসংগীত। সকলে জমজমাট হয়ে বসলেন। ওটা যেন উপাসনাগৃহ। আহার যাদের সারা হয়নি তাঁরাও প্লেট সরিয়ে রাখলেন।

স্মৃতি রায়চৌধুরীর কণ্ঠ। শুনতে শুনতে পাবনের মন চলে যায় কোন্ রূপের জগতে। যেখানে গুণী বসে তাঁর সুরের জাল বুনছেন। হঠাৎ কী এক আবেগে এসে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। সে যেখানে বসেছিল সেটা দরজার একধারে। দরজাটা একটু ফাঁক করে সে চকিতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। বেশীর ভাগেরই তখন ভাবে ঢুলু ঢুলু আঁখি। যাঁদের তা নয় তাঁরা গায়িকার দিকে তাকিয়ে। কেউ টের পায় না।

নিচের তলায়—দোতলায়—শ্যামল আর কান্তিমান দুই বন্ধুর ফ্ল্যাট। তারই ছোট একখানা পাশের ঘরে পাবনের লন্ডনের ডেরা। লন্ডনে সে মনের মতো বাসা খোঁজার আয়াস স্বীকার করতে চায় না বলে এইখানেই আপাতত থাকে ও খরচের অংশ বহন করে। খাওয়াদাওয়া বেণুদিদের সঙ্গে।

পাবনের ঘরখানা ছোট হলেও তার কাচের জানালাটা বেশ বড়। সেটা রাস্তার দিকে। বাতায়নের ধারে আসন পেতে বসে চোখ কান দুই খোলা রাখে পাবন। কান পেতে শোনে গানের পর গান। একবার মনে হলো রাঙাদিও কণ্ঠক্ষেপ করলেন। আশ্চর্য গলা, কিন্তু দম রাখতে পারেন না। "ভাবনা আমার পথ ভোলে।" পথ ভুলতে ভুলতে কোথাকার ভাবনা কোথায় গড়ায়।

সৌন্দর্যের সরোবরে নিয়ত নিমগ্ন থাকতে চায় সে এ সরোবর সতত পূর্ণ। "পূর্ণ চাঁদের মায়ায়।" অদৃশ্য উৎস হতে নিত্য ঘটে এর পুনঃপরিপূর্ণতা। মনে মনে প্রার্থনা করে, "তুমি চিরসুন্দর। তুমি সৌন্দর্যঘন। তোমার সৌন্দর্য সেই অদৃশ্য উৎস যা এই রূপের সরোবরকে রস দিয়ে নিত্য ভরে রাখে। আমি ডুব দিই, তলিয়ে যাই, তল পাইনে, উঠে আসি। যতক্ষণ ডুবে থাকি ততক্ষণ অনুভব করিনে আমার ব্যথা। হয়তো ব্যথাও ব্যথার মতো লাগে না। সৌন্দর্যের রসায়ন তাকেও রূপান্তরিত করে।"

পাবন চুপচাপ একা থাকতে ভালোবাসে। আহত সাখী যেমন নিভৃতে থেকে আপনাকে সারিয়ে তুলতে চায়। কাউকে জানতে দেয় না কোন্‌খানে তার জখম। লাইট হাউসের মতো তার মুখশ্রী বার বার আঁধার হয়ে যায়, বার বার জ্বলে ওঠে। অন্ধকারটা আলোর অভাব নয়। অবগুণ্ঠন। তার এই বিষাদ কতকাল দীর্ঘ হবে কে জানে!

বাইরে টোকা পড়তেই পাবনের হুঁশ হয়। "আঁত্রে" বলে সে তৎক্ষণাৎ শুধরে নেয়। "কাম ইন" বলার আগেই হেমেনদা প্রবেশ করেছিলেন। বললেন, "শীগগির। রাঙাদি বাইরে দাঁড়িয়ে।"

"বেশ ছেলে যা হোক।" ঝঙ্কার শোনা গেল। "গান ভালো লাগে না এমন মানুষ এই প্রথম দেখছি জীবনে। চল এখন, লক্ষ্মীটি। দিদিকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

গায়ে ওভারকোট চড়িয়ে পাবন চলল তাঁর সঙ্গে পায়ে হেঁটে। দূরত্ব এমন কিছু নয়। কীটস যে বাড়ীতে থাকতেন তারই কাছাকাছি বরাবরা বাড়ী নিয়েছেন। হ্যাম্পস্টেড হীথের ধারে।

"শুনেছি ইউরোপের মিউজিয়ামগুলো তুমি গুলে খেয়েছ। আর ক্যাথিড্রালগুলো নাকি তোমার নখদর্পণে।" পথে যেতে যেতে রাঙাদি বললেন।

"কার কাছে ওসব শুনেছেন, রাঙাদি?" পাবন বলল সানন্দে অথচ সসঙ্কোচে। "কিন্তু অভয় দেন তো আপনাকে দিদি না বলে মাসিমা বলে ডাকি।"

"কেমন করে জানলে যে তোমার মা আমাকে দিদি বলে বোন সম্পর্ক পাতিয়েছেন? হাঁ। সেই কথাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলুম। আমি তাঁকে চিনতুম না। তিনি অবশ্য আমার নাম জানতেন। কাগজে বেরিয়ে যায় যে আমরা প্রিভি কাউন্সিলে অ্যাপিয়ার করার জন্যে আবার বিলেত আসছি। তখন তোমার মা এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। বলেন, ছেলে চিঠিপত্র লেখে না। কোথায় থাকে, কী করে, কেউ জানে না। শোনা যায় মস্কো আর্ট থিয়েটারে যোগ দিয়েছে। বোধহয় দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই। আমরা যদি লন্ডনের হাই-কমিশনারকে ধরে এর একটা বিহিত করতে পারি।"

পাবন কী বলবে ভেবে পায় না। নীরবে শুনে যায়। পূর্ণিমা রাত্রি। কিন্তু লন্ডনের আকাশ মেঘে আর ধোঁয়ায় অন্ধকার। বৃষ্টি টিপ টিপ পড়ছে। প্রখর শীত। অথচ বেশ তাজা লাগে হ্যাম্পস্টেড অঞ্চলে বেড়াতে। রাস্তা ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে গেছে। হাওয়া আসছে বনস্থলী দিয়ে।

"এদেশে এসে অবধি তোমার খোঁজ বড় কম করিনি।" রাঙাদি বলতে থাকলেন। "কিন্তু কন্টিনেন্টে তো যাইনি। খাঁটি খবর পাব কার কাছে? সবই দোসরা হাতের দোসরা হাতের উড়ো খবর। কেউ বলে তুমি নাকি এক অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েছ, কেউ বলে তাকে বিয়ে করেছ, কেউ বলে সে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে, কেউ বলে তোমারি দোষ। আবার এমনও বলে যে তোমার বরাত ভালো তুমি ওর মতো একটি দুষ্প্রাপ্য রত্ন জয় করে নিতে পেরেছিলে। কিন্তু পারবে কেন রাখতে?"

এর উত্তরে পাবন শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রাঙাদি আঁধারে দেখতে পেলেন না তার মুখখানা আকাশের মতোই অন্ধকার। যদিও সে আকাশ পূর্ণিমার আকাশ।

পাবন ভাবছিল, ওই যে পূর্ণিমা ওকে যেন আমি অবিশ্বাস না করি। চাঁদ যদিও দেখতে পাচ্ছিনে তবু তার জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আভাস তো দেখতে পাচ্ছি। যদিও একটুখানি জায়গা জুড়ে ফুটে বেরোচ্ছে তবু তো জ্যোৎস্না। আর-কোনো তিথির জ্যোৎস্না নয়, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। পূর্ণতার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যদিও, তবু তো পূর্ণতা। আমি যেন বিশ্বাস না হারাই। বিশ্বাস না হারাই।

"পাবন", রাঙাদি বললেন, "তোমার খবর তোমার মুখেই শুনব এখন। আজ নাই বা শোনা গেল। কিন্তু আমাকে না বলে আবার কন্টিনেন্টে পালিয়ে যেয়ো না।"

এতক্ষণে ও ছেলের সাড়া পাওয়া গেল। "তেমন কোনো অভিপ্রায় নেই, রাঙা মাসিমা। বি-এতে আশাতীত ভালো করেছিলুম, বন্ধুরা বলল, চল অক্সফোর্ডে। এসে দেখি ঠাঁই নেই। এক বছর সবুর করতে বলে। সময় আর অর্থ নষ্ট করতে হলে বিলেতে কেন? ওই টাকায় স্ট্রাসবুর্গে ফরাসী ও জার্মান শেখা যায় ও ফাঁকে ফাঁকে দেশ দেখা যায়। সেটাও তো শিক্ষার অঙ্গ। পরের বছর অক্সফোর্ড আমাকে স্মরণ করে। কিন্তু আমার জীবনে তখন এক ক্রাইসিস চলছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। হ্যামলেটের মতো দোদুল্যমান অবস্থা। ফলে অক্সফোর্ড হাতছাড়া হয়। এর জন্যে সবাই আমাকে দোষ দিয়েছে, আমিও

দিয়েছি। কিন্তু বেটা হাতছাড়া হয় সেইটেই কি সবচেয়ে কাম্য।"

রাঙ্গাদি চিন্তান্বিত হলেন। শুধু বললেন, "ক্লাইসিসটা কী তা তো জানলুম না।"

"সেটা আরেক দিন শুনবেন। যদি শুনতে চান।" পাবন প্রতিশ্রুতি দেয়। "আমার জীবনের গতি বদলে গেল। কিন্তু না গেলেই ভালো হতো এটা আর আমার মনে হয় না। এই তিন বছরে আমি আমার আপনাকে জেনেছি। এখন যদি কোনো আক্ষেপ থাকে সেটা কেরিয়ার ঘটিত নয়। কিন্তু সেটাও আরেক দিনের জন্যে তোলা রইল, মাসিমা।"

মিস্টার বরাট বাড়ী ফিরে মামলার কাগজপত্র নিয়ে বসেছিলেন। পাবনের পরিচয় পেয়ে বললেন, "ওঃ তুমিই সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষ। এস, এস। তোমাকে একটা মজার কথা শোনাবার জন্যে কবে থেকে ছটফট করছি।"

ওদিকে মিসেসের চোখে নিষেধ। তিনি কফি তৈরি করে আনার ছলে প্রস্থান করলেন। পাবন তো মহাকৌতূহলী হয়ে কাঠের মতো বসে রইল।

"হাইকমিশনারের পার্টিতে," বরাট সাহেব বলতে লাগলেন, "তাঁর এডুকেশনাল অ্যাডভাইজারের সঙ্গে আলাপ। কথায় কথায় বলি, অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে আজকাল আমাদের ছেলেরা কেমন করছে? তার পরে জানতে চাই, আচ্ছা, সেন-হাজরা বলে একটি ছেলে অক্সফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজে জায়গা না পেয়ে কন্টিনেন্টে চলে যায়। তার পরে তার কী হলো বলতে পারেন? ভদ্রলোক এক মিনিট ভেবে হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠেন।"

বরাট নিজেও হাসি চাপতে পারলেন না। তার পর ভদ্রলোকের উক্তির পুনরুক্তি করলেন।

"He is the only fellow who ever rejected the advances of Magdalen".

অপরের কাছে যা পরিহাস ভুক্তভোগীর কাছে তা হুল ফোটা। পাবন আগেও সয়েছে। এবারেও সইল।

বরাট এর পরে গম্ভীর হয়ে বললেন, "ও রকম সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার আসে না। অধিকাংশের জীবনে প্রথমবারও আসে না। পেলে কি কেউ ছাড়ে? তুমি সেই দুর্লভ একজন। তোমার বাবা তো আহত হবেনই। লোকের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবেন? তুমিও তো তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দাওনি। দেশে ফিরে গিয়ে তুমি যদি সত্যি সত্যি কিছু করতে চাও তো এখনো সময় আছে। আইন পড়। এই আমার পরামর্শ। তোমার পিতাকেও।"

সেদিন কফির পেয়ালায় চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে পাবন বলল মেসোমশায়কে, "দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন দেখবেন অক্সফোর্ডের চেয়ে স্ট্রাসবুর্গের আদর কিছু কম নয়। আর ব্যারিস্টারদের চেয়ে আর্ট ক্রিটিকদের মর্যাদা বরং বেশী। তা নিয়ে কিন্তু আমার ভাবনা নেই। আমার ভাবনা অন্য কারণে। আর তার কোনো প্রতিকারও নেই।"

"দেশ স্বাধীন হলেও" মেসোমশায় হাসলেন, "তোমাকে না খেয়ে স্বর্গে যেতে হবে পাবন। সেইজন্যেই বলছি মর্ত্যে থাকার একটা অবলম্বন চাই। আর্ট বলতে ওরা বোঝে প্রাচীন ভারতেরই রকমফের। আর ক্রিটিসিজম বলতে তারই সমর্থন।"

"তা হলে," পাবন বলল, "দেশে ফিরে যাওয়া আমার হবে না। গেলে এমনি বেড়াতে যাব।"

"সেই আশঙ্কাই তোমার মা বাবা করছেন।" এবার বললেন রাঙ্গাদি।

তাঁরা কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন না, সেও খুলে বলল না, কী নিয়ে তার ভাবনা। অন্য কী কারণে। কেন তার কোনো প্রতিকার নেই।

সে অনেক কথা। কাকেই বা বলবে! কেই বা বুঝবে?

## দুই

দেবযানীর কী হলো তা তো সকলেই জানে। কচের কী হলো তা মহাভারতে নেই।

কচকে পাঠানো হয়েছিল অসুরদের দেশ থেকে মৃতসঞ্জীবনী শিখে আসতে। যাতে দেবপক্ষের মৃতরা বেঁচে ওঠে। কচ তো সহস্রবর্ষ পরে মৃতসঞ্জীবনী নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল মৃতদের একজনকেও প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারলেন না।

বললেন, বিদ্যাটা আমি জানি, শিখিয়ে দিতেও পারি, কিন্তু প্রয়োগ করতে অক্ষম। আমাকে গুটি কয়েক শিষ্য দেওয়া হোক। আর দেওয়া হোক একশ বছর সময়। তার পরে দেখবেন একজনও বিনষ্ট হবে না।

কিন্তু এই একশ বছর কী হবে? সৈন্য অসহায়, বৈদ্য অসহায়, কিছুই করবার নেই। অসুরগুলো এন্‌তার মারছে আর জিতছে। কোনদিন স্বর্গে ঢুকে পড়ে। একশ বছর সবুর করছে কে?

দেবতারা অতীব অসন্তুষ্ট হলেন। বৃহস্পতিপুত্র, তুমি তা হলে এতদিন করলে কী?

দেবযানীর অভিশাপের কথা বলতে হলো সবাইকে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলেন না। আর করলেই বা কী? একটি নারীর অভিশাপে একটি পুরুষ এমন শক্তিহীন যে তার সামনে হাজার হাজার সৈনিক মরছে, সে জানে কেমন করে বাঁচাতে হয়, অথচ সাক্ষীগোপাল। এর চেয়ে ঢের ভালো হতো সে যদি আদৌ না জানত বাঁচাতে।

নারীর অভিশাপে এটাও একপ্রকার পুরুষত্বহীনতা।

দেবযানী এমন এক প্রতিশোধ নিল যা আর কোনো নারী কোনো দিন নেয়নি। এমন কি উর্বশী যে অভিশাপ দিয়েছিল অর্জুনকে সেও তেমন মারাত্মক নয়। মাত্র একটা বছর বৃহন্নলা হয়ে থাকতে হলো তাঁকে। সারা জীবন নয়। কিন্তু দেবযানীর অভিশাপে বেচারা কচ চিরটা কাল অসমর্থ হয়ে রইলেন। তাঁর শিষ্যরাও তাঁকে ছাড়িয়ে গেল। বেচারা কচ! বেচারা পুরুষ!

পাবনের বেলাও কি তাই হবে? নারীর অভিশাপ কি অব্যর্থ?

স্ট্রাসবুর্গ যখন সে যায় তখন জানত না সেখানে তাকে আটকা পড়তে হবে। মাস দশেক বাদে সেখানে তার কাজ সারা হলে সে প্যারিস ইত্যাদি ঘুরে অক্সফোর্ডে ফিরবে। তার বিশ্বাস অক্সফোর্ড তাকে ডাকবে। সত্যি একদিন ডাকল। কিন্তু ততদিনে তার জীবন আর একজনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিতে হলে আর একজনের মত নিতে হয়। আর একজন বলে বসল, যেতে নহি দিব।

সেই অবুঝ নারীর জেদই জয়ী হলো। পাবন থেকে গেল। যাকে ভালোবাসত সে মেয়েটি আর্টিস্ট। তাকে দিল আর্টের দীক্ষা। তার রূপদৃষ্টি খুলে গেল। সে যেদিকে তাকায় সেদিকেই রূপ। সেদিকেই সৌন্দর্য। দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়ে। ক্যাথিড্রাল। মিউজিয়াম। স্টুডিও। শুধু একটি শহরের নয়। ফ্রান্সের, জার্মানীর, ইটালীর, বেলজিয়ামের, হলাণ্ডের, অস্ট্রিয়ার। মেয়েটি আঁকে। পাবন দেখে, ধ্যান করে, স্কেচ করে। ধীরে ধীরে আপনাকে জানে। হাতের পাঁচ হিসাবে একটা

ডিগ্রী বা ডক্টরেট তার চাই। সেটা অক্সফোর্ডের হলে আরো কাজে দিত। তা বলে স্ট্রাসবুর্গেরটাও ফেলনা নয়। কিন্তু তার সত্যিকার লক্ষ্য হলো সৌন্দর্যে স্থিতি। চিরকালের মতো।

এরিকা মেয়েটির নাম। দেখতে সুশ্রী। তার শ্রী তার অন্তরের প্রতিফলন। নিজের সাধনা তাকে বিভোর রাখে। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সে উদাসীন। তার মা নেই। বাবা আবার বিয়ে করেছেন। হোম বলতে পিসীর বাড়ী। পিসেমশায় পাবনের অধ্যাপক। পাবনকেও তাঁরা স্নেহ করেন। ভাই বোনের মতো মিশতে দেন। ওরাও তাঁদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে। কেউ কাউকে মুখ ফুটে বলে না যে ভালোবাসে। ব্যবহারেও পরিচয় দেয় না। শুধু চোখের আলোয় দেখতে পায় প্রেমের অশরীরী অস্তিত্ব। কোনো দিক থেকে কোনো অঙ্গীকার নেই। স্বীকৃতি-টুকুও নেই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে এরিকা বলে পিসেমশায়ের ছাত্র। পাবন বলে, অধ্যাপকের নীস।

প্রথম বছরটা অর্থাভাব হয়নি। বাড়ী থেকে সাহায্য নিয়মিত পৌঁছত। দেশ থেকে টাকা আসা দ্বিতীয় বছর থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। বাবার আলটিমেটাম হলো, হয় অক্সফোর্ড, নয় লণ্ডনের ইন্ না টেম্পল। অক্সফোর্ডের সঙ্গে আই সি এস সংযুক্ত থাকলে সোনায় সোহাগা। না থাকলেও চলবে। কিন্তু কন্টিনেন্টের ডক্টরেট? নৈব নৈব চ। ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে অচল। পাবন তাঁর আলটিমেটাম উপেক্ষা করায় তিনিও তার মাসোহারা আটক করেন। কী করে যে পড়ার খরচ জোটাতে হলো/সে অনেক কথা। মাঝে মাঝে এরিকার কাছে ধার নিতে হয়েছে, পরে সে ধার শোধ করতে হয়েছে। ফরাসী ও জার্মান পত্রিকায় পর্যটনকাহিনী লিখে মন্দ পাওয়া যায়নি। তার পরে আর্টের উপর লিখে যশও কিছু হয়। এ সবেরই পিছনে এরিকার হাত। ফরাসী ও জার্মান রচনামাত্রেই তার দ্বারা সংশোধিত। থীসিস লিখতেও পদে পদে তার সাহায্য নিতে হয়েছে। তিনটি বছর কেটে যায় স্ট্রাসবুর্গে।

ডক্টরেট পাবার পর আর ওখানে থাকার কোনো মানে হয় না। পাবন চলে আসে প্যারিসে ভাগ্যপরীক্ষা করতে। তাই নিয়ে এরিকার সঙ্গে মনোমালিন্য। সে বলে, "আমি ভাবতেই পারছিনে তোমাকে ছেড়ে কেমন করে আমার দিন কাটবে।" পাবন বলে, "আমিও কি ভাবতে পারছি? কিন্তু প্যারিসে গেলে আমি আরো কিছু শিখব। শিল্পই এখন থেকে আমার জীবন। আমার জীবনে আর কী আছে, বল?"

"আর কী আছে, পাবন?" এরিকা তার চোখে চোখ রেখে বলে, "আর কী আছে, তা কি মুখ ফুটে বলে দিতে হবে? কেন তুমি প্রপোজ করছ না?" পাবন এর উত্তরে বলে, "কোন্ সাহসে করব? দেশে আমাদের অবস্থা ভালো, কিন্তু বাবা চটে রয়েছেন। আরো রাগ করবেন। ইউরোপে যে থাকব তারই বা উপায় কী? লিখে যা পাই তাতে বড়জোর একজনের চলে। তা ছাড়া," পাবন আরো ভেবে বলে, "আমার একটা সংকল্প আছে। একদিন না একদিন আমি দেশে ফিরে যাব ও মরা গাঙে জোয়ার আনব। আমি তো ইউরোপে তেমন কিছু ঘটাতে পারব না।"

তখন এরিকা বলে, "বুঝেছি। তুমি মা-বাপের অমতে বিয়ে করবে না। করবে কেবল একটার পর এক্টা অ্যাফেয়ার। প্যারিসে তার অশেষ সুযোগ। ওইসবই হবে, হবে না শুধু মরা গাঙে জোয়ার আনা। তার জন্যে চাই আমার মতো একজনকে। তোমার কোন্ শুভকর্মে না আমি সহায় হয়েছি, পাবন? কেন তুমি এই পার্টনারশিপ ভঙ্গ করতে চাইছ?"

পাবন আঘাত পায়। এতদিন সে যা করেছে তা অ্যাফেয়ার নয়। একটার পর একটা তো অভাবনীয়। প্যারিসে না গিয়ে মিউনিকে বা রোমে গেলেও এরিকা ওই কথাই বলত। তা বলে কি সে আর কোনো-খানে যাবেই না? সৌন্দর্যের সঙ্গে তার পরিচয় প্রগাঢ় হবে কী করে? একাধিক বার ওরা দু'জনায় প্যারিস ঘুরে এসেছে। কিন্তু প্যারিসকে অমন করে চেনা যায় না। আপনার করতে হয়।

প্যারিসের আকর্ষণ আর এরিকার আকর্ষণ। কোন্‌টা বেশী দুর্বার, কোন্‌টা কম? সেবার অক্সফোর্ডের সঙ্গে আকর্ষণ-পরীক্ষায় এরিকার জয় হয়েছিল। এবার তার হার হলো। সে ক্ষমা করল না। আর পাবনও তো অক্সফোর্ড যেতে না পেয়ে ভিতরে ভিতরে অভিমান পুষছিল। বিদায়ক্ষণে ঘটে গেল একটা বিস্ফোরণ।

"তুমি! তুমি আনবে মরা গাঙে জোয়ার!" এরিকা বলল তির্যক হেসে। "তুমি জান তুমি তা পার না। একদিন একটা রেখাও কি এঁকেছ যা শুদ্ধ হয়েছে, সাবলীল হয়েছে? সৃষ্টি তোমাকে দিয়ে হবে না। সৃষ্টিশীলতাই তোমার মধ্যে নেই।"

পাবন চমকে উঠে কাতরভাবে বলল, 'ও কী বলছ, এরিকা। ও যে অভিশাপ!" তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল, "ওতে কি আমার ভালো হবে? তুমি যদি আমাকে সত্যি ভালোবাস তো ও অভিশাপ ফিরে নাও।"

"না, না, অভিশাপ কেন দেব? তা কি আমি পারি?" এরিকা নরম হয়ে বলল, "সৃষ্টি তোমার হাত দিয়ে হবে না, কিন্তু সৃষ্টিরহস্য তুমি ভেদ করবে। তোমার সংস্পর্শে যারা আসবে তারা সৃষ্টির প্রেরণা পাবে।"

প্যারিসে গিয়ে পাবন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। সেখানে যেমন অষ্টপ্রহর মেলা বসেছে। মেলামেশার অন্ত নেই। কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না। আলাপী মিলে যায় বিস্তর, কাজকর্মেরও সুবিধা হয়, রোজ থিয়েটার কিংবা কাবারে, যখন খুশি কাফে। স্টুডিওগুলো চষে বেড়ায়, মিউজিয়ামগুলো মুখস্থ হয়ে যায়। শিল্পী ও শিল্পরসিক মহলে তার নামের কার্ডই তার পরিচয়পত্র। দুনিয়ার তামাম বিষয়ে কথায় কথায় ইশ্‌তেহার বার করা চাই। কবি ও কলা-বিদ্‌রা তাতে স্বাক্ষর দেন। পাবন ধন্য হয়ে যায় যখন ইশ্‌তেহারগুলোতে তাকেও স্বাক্ষর দিতে বলা হয়। দেখ দেখি, প্যারিসে না এলে এমন ভাগ্য হতো কখনো?

একটু থিতিয়ে যাবার সময় যখন এলো তখন পাবন হৃদয়ঙ্গম করল যে সে আর্টিস্ট নয়। তার আঁকা ছবি কেউ কোনোদিন আর্ট গ্যালারিতে বা মিউজিয়ামে দেখবে না।

প্রদর্শনীতে দেখলেও সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাবে। প্রদর্শনী তো একটা দুটো নয়। শত শত। একের পর এক পরিদর্শন করতে করতে স্মরণশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছয়। কপাল ঠুকে একবার সে একটা প্রদর্শনী করেছিল। জনসমাগমও মন্দ হয়নি। বিক্রীও যা হলো তা খরচ ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পাবন স্বয়ং বুঝতে পারল ওসব এরিকার সঙ্গে ও এরিকার পরামর্শে আঁকা বলেই কোনো মতে জলচল। দ্বিতীয় বার প্রদর্শনী করতে তার হাত উঠল না। প্রদর্শন করার মতো কিছু থাকলে তো!

ল্যাটিন কোয়ার্টারে তার প্রিয় ভোজনাগার ছিল একটি রাশিয়ান রেস্তোরাঁ। শ্বেত রাশিয়ানদের। সেইখানেই আলাপ হয়ে যায় মস্কো আর্ট থিয়েটারের ভাঙা দলের শিল্পীদের সঙ্গে। তাঁদের সৌজন্যে সে থিয়েটার ক্লিটিকের পাশ পায়। থিয়েটারে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে যেখানেই আসন নিক না কেন তার মনে বিভ্রম জন্মায় যে, সেও মঞ্চের জীবনের অংশীদার। সে শুধু দর্শক নয়। অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে সে একপ্রকার আত্মীয়তা অনুভব করে।

সদর অন্দর দুই মহলেই তার প্রবেশ। গ্রীনরুমে গিয়ে সে সাজসজ্জা নিরীক্ষণ করে। দুটো একটা ইঙ্গিত দেয়। মেক-আপে ভীরুভাবে হাত লাগায়। বিরতির সময় মঞ্চে উঠে সেখানকার সেট নাড়াচাড়া করে। সেখানেও দুটো একটা ইঙ্গিত দেয়। এর পরে সে গিয়ে রিহার্সলে হাজির হয়। সেখানেও গায়ে পড়ে হস্তক্ষেপ করে।

সে যে আর্টিস্ট, কেবলমাত্র আর্ট ক্রিটিক নয়, এইভাবে সেটা জাহির করেই তার পৌরুষ। মনে মনে বলে, এরিকা, তুমি যদি এখানে এখন থাকতে তা হলে দেখতে আমি এখনো যথেষ্ট শক্তি রাখি। মস্কো আর্ট থিয়েটারেও আমার খোদকারী খাটে। স্টানিস্‌লাভ্‌স্কি যদি জানতেন আমাকে ধন্যবাদ দিতেন।

এমনি করে সে একদিন মাদাম কর্সাকোভার সুনজরে পড়ে। সম্পর্কটা বিশুদ্ধ ভদ্রতার। তার থেকে একটু এগিয়ে বন্ধুতার। তার চেয়ে গভীর কিছু নয়। কিন্তু ঈর্ষাকাতর ভারতীয়দের মতে ওটা প্রেম। তাই যদি না হবে তবে পাবন কেন মাদামের গায়ে ফারকোট পরিয়ে দেয়? কেনই বা ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে? এক একদিন ভিতর থেকেও? পাশাপাশি বসে আহার করেই বা কোন্ সুবাদে? কী এত বলবার আছে মাদামের কানে কানে? প্রায়ই তো বোকে উপহার দিচ্ছে।

তার জীবন ধন্য হয়ে যায় মাদাম যেদিন তাকে বলেন, "আপনি আর্ট ক্রিটিক বলে পরিচয় দিলে হবে কী? আপনি আর্টিস্ট। রূপকথার বীস্ট যেমন ছিল ছদ্মবেশী রাজপুত্র আপনিও তেমনি ছদ্মবেশী শিল্পী।"

"তা হলে রূপকথার বিউটি কে?" কথাটা বলি বলি করে বলা হয় না। যদি আর কারো কানে যায়। তা ছাড়া সে এই সম্পর্কটিকে প্রেমে পরিণত হতে দিতে চায় না। দিলে শিকলির টানে ভালুকের মতো ঘুরবে ইউরোপের এক রাজধানী থেকে আরেক রাজধানীতে। মস্কো আর্ট থিয়েটার কোনো এক স্থানে স্থিতিবান নয়।

সেই দলটির সঙ্গে পাবনও এলো লন্ডনে, কিন্তু তাদের সঙ্গে লন্ডন ছাড়ল না। সে তো ইংরেজীতেও লেখে। এদেশেও তার চেনা মহল ছিল। বন্ধুরা বলল, থেকে যাও। কর্সাকোভা তার হাতে চাপ দিয়ে নীরবে বিদায় নিলেন।

## তিন

এসব কথা কি মা মাসীকে বলা যায়? না বোঝানো যায়? পাবন তাই এতদিন তার মাকেও লেখেনি। দিদিকেও না। রাঙাদিকে একদিন বলল রেখেঢেকে।

তিনি বিমর্ষ হলেন। "এই তো! প্রেমে না পড়ে থাকতে পারলে না তো! কেন যে আমাদের ছেলেদের এ দুর্মতি হয়! কী আছে এদের মেয়েদের যা আমাদের মেয়েদের নেই? রূপযৌবন কি এদেশেই আছে? ওদেশে নেই? না, বাপু। ভাবালে।"

এর পরে একদিন তিনি বললেন, "আইন পড়তে নারাজ শুনে তোমার মেসো-মশায় চুপ করে বসে থাকেননি। মহারাজা গাএকবাড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। মহারাজার মিউজিয়ামের জন্যে তোমার মতো একজন জহুরীর দরকার। ইউরোপে মাঝে মাঝে আসবে, দেখে শুনে ছবি কিনবে, শিল্পদ্রব্য কিনবে। ভারতেও ঘুরে ঘুরে তাই করবে। কেমন সুখের চাকরি! মহারাজা তোমাকে ইন্টারভিউতে ডেকেছেন। নামমাত্র ইন্টারভিউ। সব ঠিকই আছে।"

আর কেউ হলে লাফিয়ে উঠত। বলত, "আঁচাব কোথায়?" কিন্তু পাবন শুধু বলল, "ভেবে দেখব।"

তার পর তার সেই ভেবে-দেখা আর ফুরোয় না। কয়েক সপ্তাহ গা-ঢাকা দেবার পর আবার তার উদয়। "কি হে, ভেবে দেখলে?"

"রাজা মহারাজাদের মনমেজাজকে আমি বড় ভয় করি, রাঙামাসী। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ। আমার পছন্দ হয়তো ওঁর পছন্দ হবে না। অমনি চাকরিটি যাবে। মুণ্ডুটি যে যাবে না সেইটুকু প্রোগ্রেস হয়েছে।" পাবন অনেক মাথা খাটিয়ে এই জবাবটি বানিয়েছিল।

প্রস্তাবটা লোভনীয়। আর সয়াজী রাও তো অতি সজ্জন। সে রকম কোনো আশংকাই ছিল না। বরং ছিল মানবসৃষ্ট সৌন্দর্যের নিত্য সাহচর্য। সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার পাথেয়। স্বদেশের জন্যে কিছু করার সুযোগও। কিন্তু তা হলে তো দেবযানীর অভিশাপ প্রকারান্তরে মেনে নেওয়া হলো। ও যে আত্মিক পুরুষত্বহানি। রাজরোষের চেয়েও ভয়াবহ।

যেমন অক্সফোর্ডের আহ্বানের বেলা তেমনি বড়োদার প্রস্তাবের বেলা পাবনের কাজ হলো হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয়। "টু বি অর নট টু বি"। দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা কেটে যায়। সিদ্ধান্ত নেওয়া আর হয় না।

রাঙাদি হাল ছেড়ে দেন। "তোমায় দেখছি কিসে নিজের ভালো হবে সে জ্ঞানটাই নেই। তোমার জন্যে কিছু করতে যাওয়া মিছে।"

তা বলে তিনি তাকে একেবারে বর্জন করলেন না। যখনি পার্টি দিতেন আর পাঁচজনের মতো তাকেও ডাকতেন। ইতিমধ্যে সে পাড়াবদল করে চেলসীতে উঠে গেছল। আর্টিস্টদের সংসর্গ যাতে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পায়। আর্ট বই সম্পাদনার ভার তার উপর পড়েছিল। ভূমিকা ও টীকা লিখতে হয় তিনটে ভাষায়। এই নিয়ে চলে যাচ্ছিল একরকম।

রাঙাদির ওখানেই একবার এক পার্টিতে দেখা। মল্লিকার সঙ্গে। "পাবন, এদিকে এসো। এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। পতিতপাবন সেন-হাজরা। মল্লিকা সিন্‌হা।"

"উঁহু। হলো না, হলো না।" বেণুদি বলে উঠলেন। "বিশিষ্ট শিল্পরসিক তথা বিদ্যানাগরিক ডক্টর সেন-হাজরা। বিখ্যাত অধ্যাপক পি কে সিন্‌হার রূপসী ও গুণবতী কন্যা মিস সিন্‌হা।"

পাবন যে মল্লিকার সঙ্গে দুটো কথা কইবে তার বন্ধু শ্যামলের ওটা সহ্য হলো না। সে ছোঁ মেরে পাবনকে নিয়ে গেল ও কানে কানে বলল, "তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ। আর বাড়াতে যেয়ো না। মল্লিকে আমি চিনি। ও ধরা দেবার পাত্রী নয়।"

"তুমি ভুল করেছ, শ্যামল।" পাবন হেসে বলল, "আমিই ধরা দেবার পাত্র নই।"

এমনিতেই ব্যাপারটা একটুখানি সামাজিকতার ঊর্ধ্বে উঠত না। মল্লিকাও ভুলে যেত পাবনকে। পাবনও মল্লিকাকে! কিন্তু শ্যামল যে অভিনয়টি করল তার ফল হলো বিপরীত। ওটা নাকি সে বেণুদির শিক্ষায় করেছিল। রাঙাদিও ছিলেন ওই চক্রান্তের মধ্যে। কেউ যদি পাবনকে ভুলিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে মল্লিকা। দেশে একবার যদি ফেরে তা হলে বাকীটা লজিক অনুসারে অনুসরণ করবে।

পার্টি থেকে বিদায় নেবার সময় পাবন বলল মল্লিকাকে, "আবার কবে আমাদের দেখা হচ্ছে?"

"ইচ্ছা করলে কালকেই।" মল্লিকা আশ্বাস দিল।

"ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কাল আমি দশটার সময় দাঁড়িয়ে থাকব। গেটে।"

"আচ্ছা। আমার ভয়ানক কৌতূহল ভিতরে গিয়ে দেখতে।"

"বেশ তো। আমি দেখাব।"

শুনেও না শোনার ভান করলেন বরাটরা। গোস্বামীরা। শ্যামল ও কান্তিমান। আর পাবন প্রস্থান করল কোনো দিকে না তাকিয়ে। মল্লিকা তো বরাটদের অতিথি।

এরিকার অভিশাপের পর থেকে একটু একটু করে পাবনের মনে লালিত হচ্ছিল নবজাত একটি আইডিয়া। দেবযানীর শাপ মোচন করতে পারে দেবযানী স্বয়ং। তা যখন এ জীবনে সম্ভব নয় তখন তার একটিমাত্র বিকল্প আছে। আর একজন

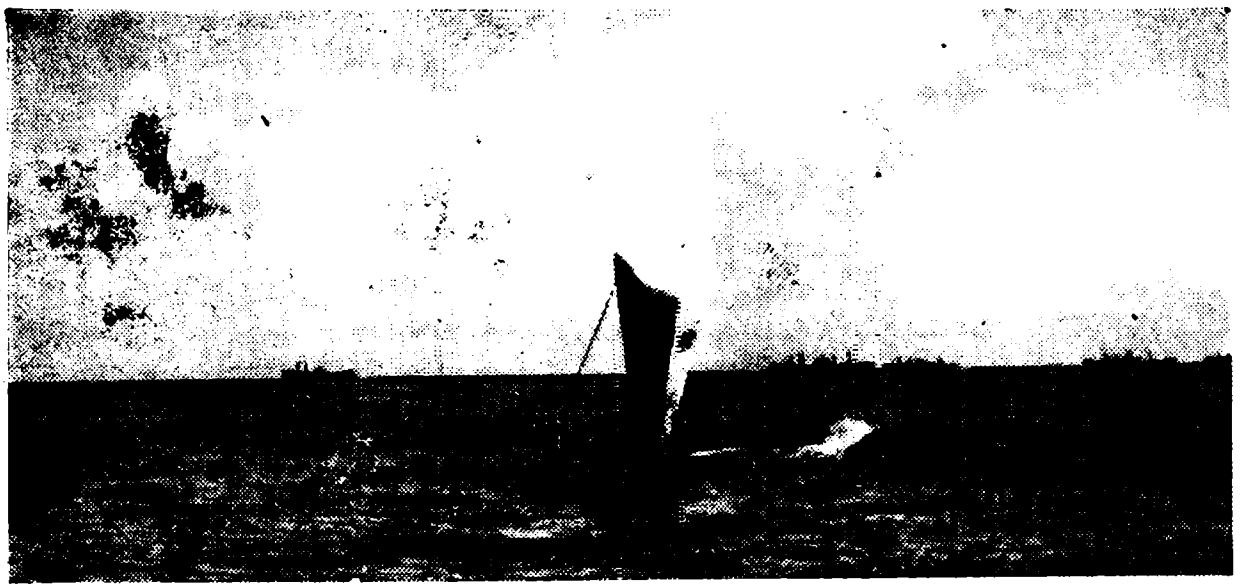

অভিযান

ফটো : নেপাল মুখোপাধ্যায়

নারী আসবে, সে দেবে বর। তার বরও হবে অবার্থ। সে বলবে, তুমি সৃষ্টি কর। অমনি পাবন সৃষ্টি করবে।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম কি এক আধঘণ্টায় দেখা হয়? একটা দিন লেগে গেল শুধু গ্রীক রোমান ভাস্কর্য ও বাস্তুকলা পরিদর্শন করতে। মাঝখানে একঘণ্টা মধ্যাহ্নভোজন। কাছেই প্লেন ট্রী রেস্টোরাণ্ট। তার দেয়ালে একটা প্লেন গাছ আঁকা। সেখানে বেশী লোক যায় না। নিরিবিলি পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম কি একদিনে দেখা হয়? পরের দিনও দেখতে এলো মল্লিকা। আবার সেই রেস্টোরাণ্ট। তার পরের দিন। তারও পরের দিন। তার পরে শনিবার। মধ্যাহ্নভোজনের পর ওরা চলল কিউ গার্ডনস দেখতে। পরের দিন রবিবার। সেদিনও তাই। মল্লিকা এসেছে দেশ দেখতে। এই তার কাজ। দেশ দেখা হচ্ছে। রূপ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচার কথাও ছিল। মন্টেসরি ট্রেনিং নেওয়া। সেটার জন্যে মাথাব্যথা নেই।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম শেষ করতে তিন সপ্তাহ লাগা বিচিত্র নয়। এটাও তো শিক্ষা। তার পর ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়াম। আরো তিন সপ্তাহ। শিক্ষা বইকি। এর পরে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি। আরো দু' সপ্তাহ। তারপর টেট গ্যালারি। আধুনিক চিত্রকলা। এমনি করে মাস তিনেক কোনখান দিয়ে কেটে গেল।

"আচ্ছা, ডক্টর সেন-হাজরা," মল্লিকা একদিন জিজ্ঞাসা করল, "আপনি যে আমার জন্যে এত সময় নষ্ট করছেন এর প্রতিদান আমি দেব কী করে? কী আছে আমার যা আপনার গ্রহণযোগ্য হবে?"

"তা যদি জানতে চান তবে আপনাকে সমস্তটা শুনতে হবে।" পাবন উত্তর দিল।

যে কথা সে মা মাসীকে বা দিদিকে বলতে সাহস পায়নি, চায়নিও, সেই কথাই আগাগোড়া শুনিয়ে গেল এই মেয়েটিকে। কিছুই গোপন করল না, হাতে রাখল না। সে জানত যে মল্লিকা ধরা দেবার পাত্রী নয়। সেও নয় ধরা দেবার পাত্র। সম্পর্কটা বিশুদ্ধ বন্ধুতার।

"ওঃ এইটুকু আপনি চান! দুটি অক্ষরের একটি শব্দ! বর!" মল্লিকা বলল মৃদু হেসে।

"হাঁ, দেবী!" পাবন বলল শ্রদ্ধাভরে।

"আর আমি কী চাই সেটা জানতে চাইলেন না যে?" আরক্ত হয়ে সুধালো মল্লিকা।

"আপনি? আপনার কোনো অভাব আছে নাকি? শুনি?" বিস্মিত হলো পাবন।

"সেটিও দুটি অক্ষরের একটি শব্দ।" পাবন বোকার মতো ভাবছে দেখে মল্লিকা বলল, "পারলেন না তো অনুমান করতে? সেটি আপনার ওই শব্দটিরই প্রতিধ্বনি।"

"বর!" অবাক হলো পাবন। "আপনাকে কে আবার অভিশাপ দিল?"

"দূর! বর শব্দের কি এতটাই অর্থ?" মল্লিকা রেগে উঠল।

"ওঃ বুঝেছি!" ডক্টর যারা হয় তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি একটু দেরিতে হয়।

"কী বুঝলেন?" মল্লিকা হাসতে হাসতে ঢলে পড়ল।

"আমি কিন্তু শুনেছিলুম," পাবন বলল সবিস্ময়ে, "আপনি নাকি বিয়েই করবেন না।"

"কথাটা মিথ্যা নয়। যা পোহাতে হয়েছে আমাকে, তারপরে আমার দশা হয়েছে যেন ঘরপোড়া গোরুর। আর একটু হলেই আমি মরেছিলুম।" মল্লিকা শিউরে উঠল।

পাবনের আগ্রহ দেখে মল্লিকা শোনায় তার গল্প।

ছেলেবেলা থেকেই সে একটু উদাসীন প্রকৃতির। শাড়ী কিংবা জামা, গয়না কিংবা সেণ্ট, পাউডার কিংবা রং কোনো দিন তাকে আকর্ষণ করেনি। কিন্তু সিঁথির সিঁদুর সম্বন্ধে তার একটা মোহ ছিল। শিবের কাছে সে মনে মনে বর প্রার্থনা করত। শিবের মতো বর। যাকে অন্তর থেকে ভক্তি করতে পারবে। কালের মতো নয়। দেখতে সুন্দর নাই বা হলো। নাই বা হলো ধনবান। কেই বা জানত শিবের বংশ-পরিচয়?

বাবার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ছাত্ররা আসত। তিনি তাদের বুঝিয়ে দিতেন। বলে দিতেন কী কী পড়তে হবে। কারো কারো সঙ্গে তর্কও করতেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল একটি ছেলে। যখন-তখন আসত। বাবার কাছে এমন সব বই ছিল যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেসব বই বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। সেসব বই সে চেয়ে নিয়ে পড়ত। বাবা তাকে ঢালা অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন যে, সে লাইব্রেরীতে বসে যতক্ষণ ইচ্ছা, যে বই ইচ্ছা পড়তে পারবে। পরে তিনি তাকে বাজিয়ে দেখতেন যে, সে সত্যি পড়েছে ও মনে রেখেছে। বাবাকেও সে বাজিয়ে দেখত। তিনি পড়েছেন, না শুধু সাজিয়ে রেখেছেন।

বাবা একদিন বললেন, ওই যে জগৎ ওই আমার ইস্পাতের উপযুক্ত। ওর সঙ্গে লড়ে সুখ আছে। বাবা ওকে ডাকতে আরম্ভ করলেন জগৎসিংহ বলে। ঠাকুমা বললেন, মল্লীর জন্যে আর পাত্র খুঁজতে হবে না। জগতের সঙ্গেই সম্বন্ধ কর। মা একটু 'কিন্তু' 'কিন্তু' করেন। কে ও? কাদের ছেলে? কোথায় ওদের দেশ? ভালো করে খোঁজখবর নিয়েছ? জগতের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল বাবার। ও যা পরিচয় দিয়েছিল তাই বেদবাক্য। এমনিতেই বাবা আত্মভোলা মানুষ। ইতিহাস নিয়ে মত্ত। জগৎ যেদিন এম-এ'তে ফার্স্ট হয়, সেদিন উল্লাসে উদ্বাহু হন। হাঁ, জগৎসিংহ একদিন তাঁর চেয়ারে বসবে।

মাসকয়েক পরে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে যায়। মল্লিকার বি-এ পরীক্ষাটার

জন্যেই যা দেরি। যথাকালে নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপা হয়ে বিলি হয়। ডাকে দেওয়া হয়। আজ বাদে কাল রাম রাজা হবে, এমন সময় বাদ সাধল কৈকেয়ী। পুরুলিয়া বারের নামজাদা উকীল রসময়বাবু বাবার সহপাঠী ছিলেন। তিনি ছুটে এলেন কলকাতায়। বাবার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে কথা বললেন। বাবা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর চোখে আগুন জ্বলছে। জগৎটাকে পেলে তিনি খুন করবেন।

মল্লিকা তখন গায়ে হলুদের জন্যে তৈরি হচ্ছে। তার মা এসে গাছের মতো ভেঙে পড়লেন। জগৎ যে এমন করে দাগা দেবে, কে জানত। এত ভালো ছেলে, তলে তলে এত কপট। কোনো দিন কি বলেছে যে, চার বছর আগে তার বাবা তার বিয়ে দেন, কিন্তু বৌকে ঘরে নেন না। ছেলেকেও যেতে দেন না শ্বশুরবাড়ী। রসময়বাবুকে আরো টাকা দিতে হবে, আরো গয়না দিতে হবে, আরো হেঁট হতে হবে। কারণ ছেলে যে আরো যোগ্য হয়েছে ও দিন দিন হচ্ছে। অমন জামাই কি অত সস্তায় বিকোবে? রসময়বাবু তাঁর ক্ষমতার শেষ সীমায় যান। বলে দেন যে, আর পারবেন না। তখন তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে এই দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন করা হয়। একেবারে কলকাতায়।

মল্লিকাও বজ্রাহত। কিন্তু আপনাকে সে সামলে নেয়। রসময়বাবুকে বলে, কাকা, আপনি বিজলীকে আসতে টেলিগ্রাম করে দিন। তার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। তার আসা চাই-ই। রসময়বাবু তো অবাক। কিন্তু তাঁকে কিংবা কাউকে ভেঙে বলে না মল্লিকা কী আছে তার মনে।

কন্যাকে সভাস্থ করার সময় বর-বাবাজী আবিষ্কার করে যে, এ মল্লিকা নয়, এ বিজলী। সে ভয়ানক চমকে ওঠে। কিন্তু গোলমাল করে না। কন্যাকর্তা অসুস্থ বলে "কাকা" রসময়বাবু সম্প্রদান করেন। তারপর দানসামগ্রীর বেলা জগৎ নিজেই দাগা পায়। ওসব তো তার জন্যে নয়। ওসব মল্লিকার অনাগত বরের জন্যে তোলা থাকবে। শেষে রসময়বাবু কথা দেন যে, তিনি তাঁর জামাতার মনে কোনোরকম আফসোস রাখবেন না। বরকর্তাকে ঢেঁকি গিলতে হলো। ও ছেলেকে তৃতীয়বার বর সাজাবার সাহস তাঁর ছিল না।

এর পরে মল্লিকা একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে হরিদ্বার যাত্রা করে। তার মা-বাবা অনুমতি দেন। বেচারি কী নিয়ে থাকবে? পড়াশুনায় তো মন নেই। পাগল হয়ে যায়নি এই রক্ষা। বিয়ের কথা তোলে কার সাধ্যি। কুম্ভমেলার ভিড়ে এক দিন হরিদ্বার থেকে সে হারিয়ে যায়। খবর পেয়ে তার বাবা রওনা হন তাকে খুঁজতে। অনেকদিন বাদে তার সন্ধান মেলে। তখন সে সন্ন্যাসিনী। মা শয্যা নিয়েছেন শুনে অবশেষে বাড়ী ফেরে। ইতিমধ্যে সে হয়েছিল সন্ন্যাসিনীদের সম্বন্ধে মোহমুক্ত। আর পুরুষজাতির যে পরিচয় সে ঘরের বাইরে গিয়ে পেয়েছিল, তার ফলে বীতশ্রদ্ধ। কেউ শিব নয়। কোথাও সে টিকতে পারে না। না ঘরে, না বাইরে। সে এখন না ঘরকা না ঘাটকা।

তাই তাকে জাহাজে তুলে দিয়ে রপ্তানী করা হয়েছে সরাসরি কলকাতা থেকে লন্ডনে। রাঙাদি তার ভার নিয়েছেন। বিলেতে যদি তার মন ফেরে। ভালো লাগে তো মণ্টেসরি ট্রেনিং নেবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সে খুব ভালোবাসে।

পাবনের চোখ কখন এক সময় ঝাপসা হয়ে এসেছিল। সে চশমা খুলে নিয়ে চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, "উদাসিনী রাজ-কন্যা, তোমার গুপ্ত কথা তো শুনলুম। তোমার জন্যে কী করতে পারি, তাই ভাবছি।"

"আর যাই করু," মল্লিকা হেসে বলল, "উপকার করতে চেয়ো না। দুঃখে-তাপে আমার মূল্য আমি বুঝেছি। আমার জন্যে যে আমাকে চাইবে, আমার রূপগুণ কুলশীলের জন্যে নয়, আমার পিতার ধনমান প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যেও নয়, তেমন কেউ যদি থাকে, তবে আমিও ভেবে দেখব।"

"তুমি কি জগৎকে—" পাবন বলতে বলতে থেমে গেল।

"ভুলে গেছি কিনা জানতে ইচ্ছা কর? না, ভুলে যাইনি। তবে সে ভালোবাসা আর নেই। হৃদয় এখন আমার হাতে ফিরে এসেছে। আমি ফ্রি।" মল্লিকা গম্ভীর।

"তুমি কি আশা কর তোমার জন্যে কেউ একজন তপস্যা করবে?" পাবন শুধায়।

"নিশ্চয়। এবার গৌরীর জন্যে তপস্যা।" মল্লিকা উত্তর দেয়।

তখন বসন্তকাল। শীতের মেঘবৃষ্টি কুয়াশার যবনিকা সরে গেছে। আকাশ অন্তহীন নীল। আলো ঝরে পড়ছে শতমুখে। বাতাসে হাজার ফুলের গন্ধ আর হাজার পাখীর কণ্ঠ। নতুন পাতায় পুরোনো গাছের ডাল ছেয়ে গেছে। বোঝা যায় না যে, এই সেই রিক্তপত্র ছায়াশূন্য তরু। কত বড় একটা রূপান্তর ঘটে গেল ক'টা দিনে।

কেনউডে বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে ঘাসের উপর আসন নিয়েছিল মল্লিকা ও পাবন। "ওই যে রূপান্তর," পাবন নীরবতা ভঙ্গ করল, "ওর সঙ্গে ম্যাচ করবে তোমার-আমার দু'জনারই রূপান্তর। বসন্ত আসবে আমাদেরও জীবনে।"

মল্লিকা একবার পাবনের চোখে চোখ রেখে নামিয়ে নিল। তার অন্তরে দোলা লেগেছে। সে অনুভব করছে একটি পরম লগ্ন আসন্ন।

পাবন ভয়ে বলবে কি নির্ভয়ে বলবে? ইতস্তত করতে করতে হঠাৎ জোর করে বলে বসল, "উদাসিনী রাজকন্যা, তুমি কি স্বর্গের দেবকন্যার মতো অভিশপ্ত কচকে বর দিয়ে ত্রাণ করতে পার না?"

"সানন্দে।" মল্লিকা বলল আবেগভরে, "নাও, নাও, যে বর চাও সে বর নাও।"

মন্ত্রপাঠের মতো পাবন তার প্রতি-ধ্বনি করল। "নাও, নাও, যে বর চাও সে বর নাও।"

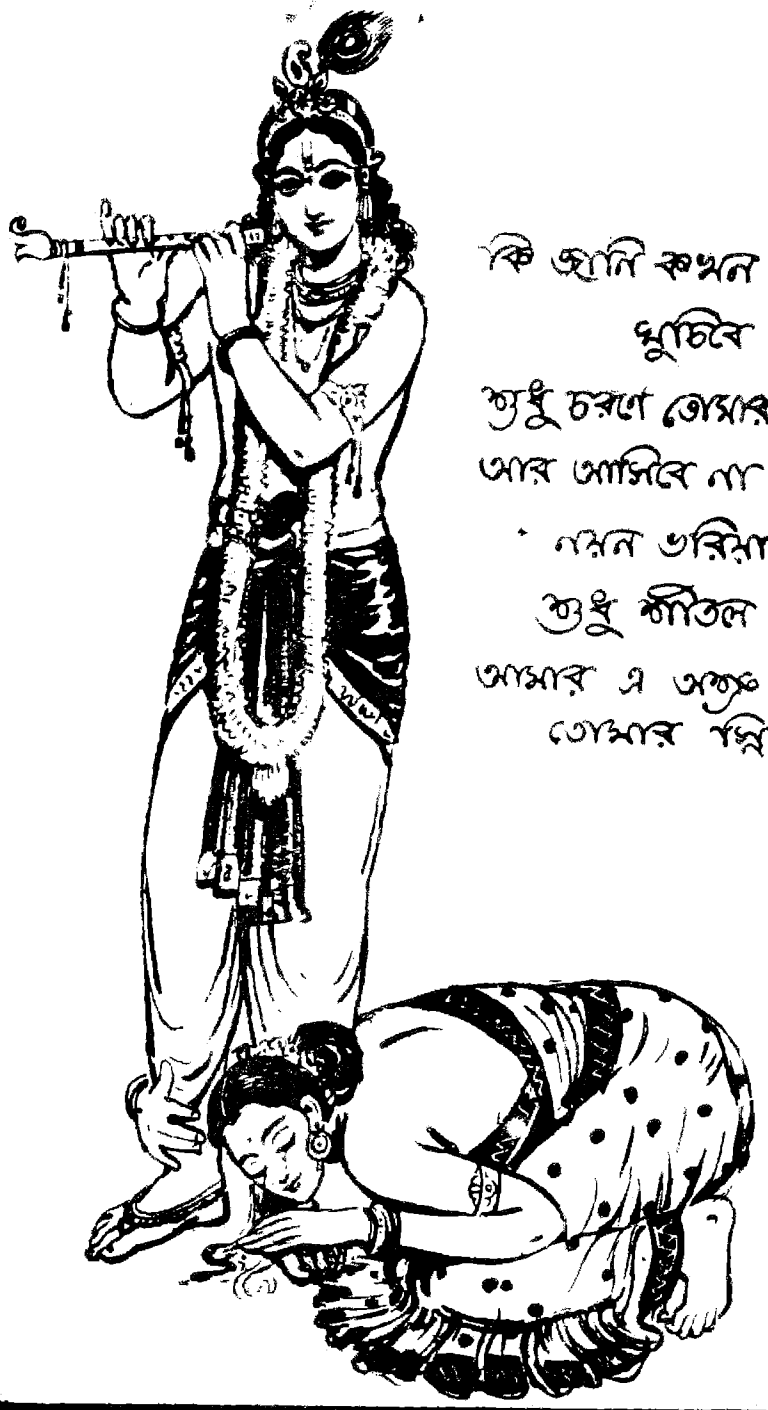

কি জানি কখন নিদ্রা টুটিবে
ঘুচিবে সুপ্ত রজনী,
শুধু চরণে তোমার পড়িয়া রহিব
আর আসিবে না দিবা যামিনী,
নয়ন ভরিয়া অশ্রু ঝরিবে
শুধু শীতল করিবে তপ্ত ধরনী
আমার এ অশ্রু স্পর্শিবে না কভু
তোমার স্নিগ্ধ চরণ তরনী,

সুধীর চাটার্জ্জী

সুধীর চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ · কলিকাতা-১৩

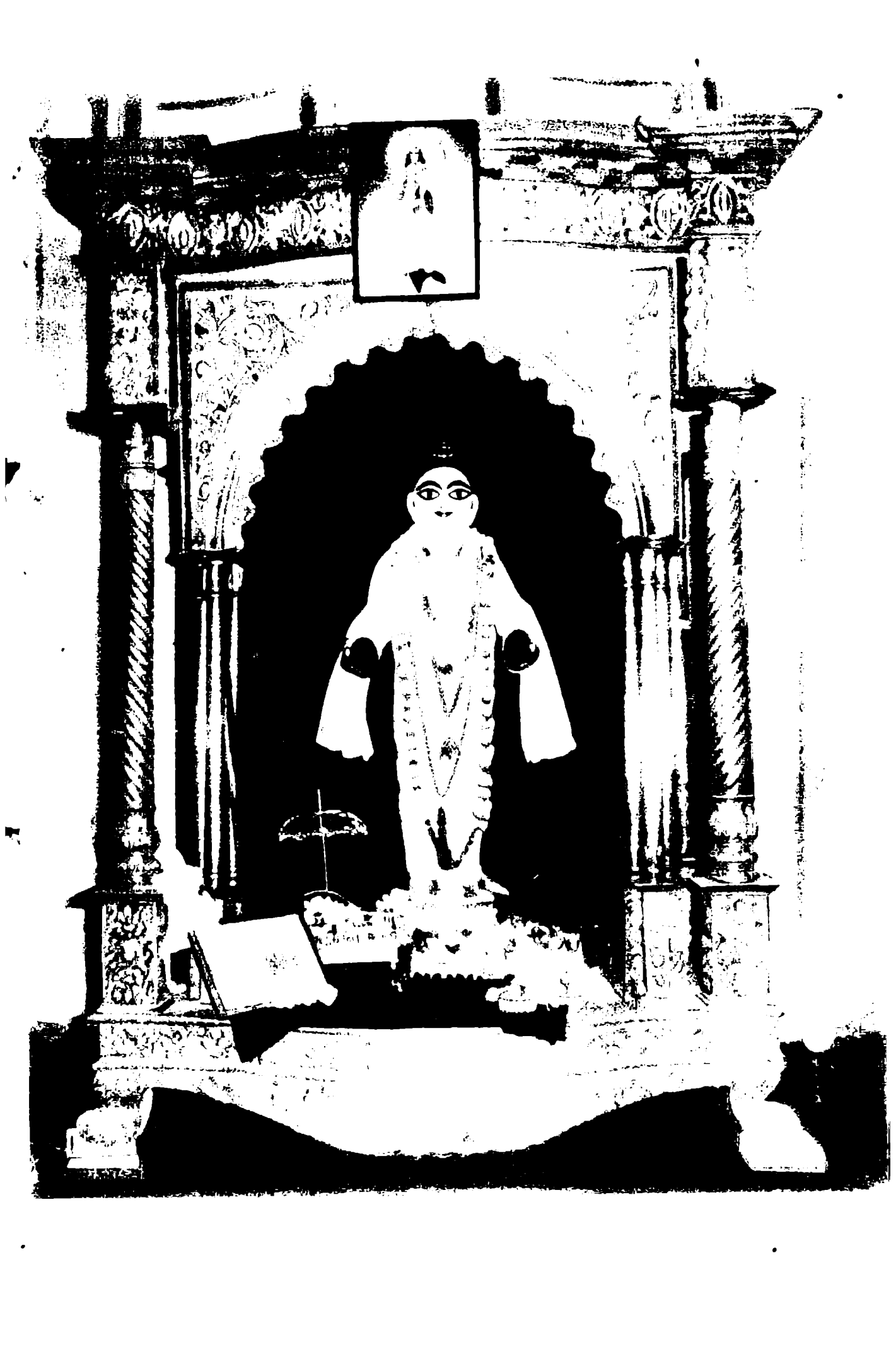

# আধুনিক ভারতবর্ষে ও চীনে বিজ্ঞানের স্থান

## হুমায়ুন কবির

১৯৫৮ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে ভারত সরকার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নীতি ঘোষণা করে এক প্রস্তাব পার্লামেণ্টের সামনে উপস্থিত করেন। এ দেশে বিজ্ঞানের বিকাশে সে এক স্মরণীয় দিন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগে জনসাধারণের জীবিকার মান বাড়াবার চেষ্টা গত দেড়শো দুশো বছরে বহু দেশেই হয়েছে, কিন্তু বোধহয় পৃথিবীতে কোন দেশই ইতিপূর্বে বিজ্ঞান সম্বন্ধে সরকারী নীতি এ-ভাবে ঘোষণা করে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি।

এ নীতি সাড়ে পাঁচ বছর পূর্বে গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাব গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের এক সম্মেলন আহ্বান করে কার্যপন্থা নির্ধারণের চেষ্টা হয়। গত পাঁচ বৎসরে সে সম্মেলনের বহু প্রস্তাবকে কার্যকরী রূপ দেওয়া হয়েছে। নানা বিষয়ে নানাদিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও গবেষণা প্রসারের চেষ্টাও সুস্পষ্ট, কিন্তু বৈজ্ঞানিক নীতি প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেশের সামনে যে আদর্শ উপস্থিত করেছিলেন, সে আদর্শ দেশ আজো পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে পারেনি।

জমার খাতায় অনেক জিনিস নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। ১৯৫৮ সালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ভারত সরকার পনের কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, তার মধ্যে সি এস আই আর অর্থাৎ কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ পেয়েছিল সাড়ে চার কোটি টাকারও কম। এবছর ভারত সরকার বিজ্ঞানের জন্য চল্লিশ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে, তার মধ্যে সি-এস আই আর দশ কোটি টাকা পাবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার সংখ্যা ও মানও বেড়েছে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

এ পাঁচ বছরে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল শিক্ষার সম্প্রসারণ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আন্দাজ ৬০০০ ও পলিটেকনিকে দশ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। এবছর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ১৯০০০ এবং পলিটেকনিকে প্রায় ৩৩০০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। বি এস সি এবং এম এস সি ক্লাসেও ছাত্রভর্তির সংখ্যা পাঁচ বছরে দ্বিগুণের চেয়ে বেশী বেড়ে গিয়েছে।

মেধাবী অথচ গরীব ছাত্রছাত্রীর জন্য নানা ধরণের স্কলারশিপ স্টাইপেণ্ডও অনেক বেড়েছে। প্রত্যেক রাজ্যসরকার ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়েই নতুন নতুন ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছে। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রণালয় ও সি এস আই আর ১৯৫৮ সালে যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য হাজারের কম ফেলোশিপ দিত, এবছর তারা ২৩০০ ফেলোশিপ দিচ্ছে। টেকনিকাল শিক্ষার জন্য মন্ত্রণালয় ১৯৫৮ সালের হাজারটি স্কলারশিপের জায়গায় ১৯৬২ সালে ৩৫০০ স্কলারশিপ দিয়েছিল। এ বছর সে সংখ্যা আরো বাড়বে। ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশনের তরফ থেকেও অনেক ফেলোশিপ এবং স্কলারশিপের ব্যবস্থা হয়েছে এবং সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যোগ্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষার জন্য কর্জে হাসিনা রূপে ক্রমবর্ধমানভাবে বৃত্তির এমন ব্যবস্থা করতে হবে যে মেধাবী একটি ছাত্রও যেন উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল শিক্ষার প্রসার বেড়েছে, স্কলারশিপ ফেলোশিপের সংখ্যা বেড়েছে, অন্যদিকে সেই সব শিক্ষিত ব্যক্তির কাজের জন্যও নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক নীতি প্রস্তাব গ্রহণের পরে যে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান সুপারিশ অনুসারে মেধাবী বৈজ্ঞানিকদের জন্য সায়ন্টিফিক পুল, অথবা বৈজ্ঞানিক নিয়োগকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। মেধাবী ও উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের যদি স্থায়ীভাবে কাজ পেতে দেরী হয়, তাঁদের সায়ন্টিফিক পুলে নেওয়া হয়। শিক্ষা ও গুণ অনুসারে তাঁরা সম্মানী পান এবং যতদিন স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা না হয়, যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা লেবরেটরীতে নিজের ইচ্ছা অনুসারে তাঁরা কাজ করতে পারেন। প্রথমে এই নিয়োগ কেন্দ্রে একশ'জন বৈজ্ঞানিকের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে সেই সংখ্যাকে বাড়িয়ে পাঁচশ' করা হয়। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে তাঁদের সংখ্যা আর নির্দিষ্ট থাকবে না, উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত সমস্ত বৈজ্ঞানিককেই এ নিয়োগ কেন্দ্রে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হবে। সত্তের'শয়েরও বেশী বৈজ্ঞানিক এ নিয়োগ কেন্দ্রের সুবিধা পাঁচ বছরে পেয়েছেন।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই গত পাঁচ বছরে বিজ্ঞানের প্রসার ও বৈজ্ঞানিকের জন্য


• অধ্যাপিকা কৃষ্ণা হাজরা
**উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস** [বি-এ পরীক্ষার্থীদের বিশেষ উপযোগী] ২·৫০
• কবিশেখর কালিদাস রায়
**কুমারসম্ভব** [সচিত্র উপহারযোগ্য সংস্করণ] ৪·৫০
**চালচিত্র** [উপহারযোগ্য শিক্ষামূলক রম্যরচনা] ৪·০০
• অধ্যাপক অমরেন্দ্র গনাই
**বীরাঙ্গনা কাব্য** [সটীক সংস্করণ] ৩·০০
**বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ** ২·০০
• শংকরপ্রসাদ রায়
**জেনারেল ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস** [বাংলা] ৬·৫০
• ডাক্তার শান্তিলাল রায়
**সার্জারি ফর নার্সেস** [বাংলা] ৬·০০
• অধ্যাপক গৌরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
**মহান শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্ত্ব** ৪·৫০

**অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স**
১১, পঞ্চানন ঘোষ লেন—কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৫-৩৩৩৮

উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র তৈরীর জন্য যে চেষ্টা হয়েছে, পাঠক-পাঠিকা তার খানিকটা পরিচয় পাবেন। প্রগতি হয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে এখনো অনেক কিছু করতে হবে সে কথাও সমান নিঃসন্দেহ। বিশেষ করে চীনের আক্রমণের পরে আমাদের বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতির খতিয়ান নেওয়া আরো প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশরক্ষার জন্য আজ বিজ্ঞানের প্রয়োজন সবাই মানেন। কৃষিই হোক অথবা শিল্প উদ্যোগ হোক, সমস্ত ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রয়োগ উন্নতির একমাত্র পথ। দেশরক্ষার জন্য যে হাতিয়ার দরকার, তাও বিজ্ঞাননির্ভর। দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য একদিকে যেমন অস্ত্রশস্ত্র চাই, অন্যদিকে চাই অধিক খাদ্যশস্য এবং উন্নততর শিল্পব্যবস্থা। এক কথায়, বিজ্ঞানই বর্তমান যুগে দেশরক্ষা এবং দেশের উন্নতির সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

স্বভাবতই চীনদেশের সঙ্গে এ সমস্ত ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের তুলনা হবে, তুলনা প্রয়োজন। অন্যান্য ক্ষেত্রের আলোচনা আজ করব না। সমস্ত ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান আমাদের ভবিষ্যত নির্ণয় করবে, তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলনা করলেই ভবিষ্যত সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা করা যাবে।

ভারতবর্ষ এবং চীনদেশের মধ্যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় তফাৎ দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মিলবে। চীনদেশে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উপরেই ঝোঁক, বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধান বা বিশুদ্ধ গবেষণার দিকে বর্তমানে দৃষ্টি নাই বল্লেই চলে। দেশে উৎপন্ন নানা ধরণের কাঁচামাল আবিষ্কার এবং তাদের যথাযথ ব্যবহার আজ চীনদেশের বৈজ্ঞানিকের একমাত্র লক্ষ্য। সে তুলনায় ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিকদের সাধনার ক্ষেত্র অনেক বেশী ব্যাপক। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তার মধ্যে নিজের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধও রাখেন নাই।

চীনদেশে মৌলিক গবেষণার প্রতি অবহেলা অন্যভাবেও দেখা যায়। বহুক্ষেত্রে বিদেশী উৎপাদন পদ্ধতির অনুকরণ করেই চীনা বৈজ্ঞানিক তুষ্ট, এবং তাতে অবশ্য আশু ফল লাভও হয়েছে। ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক কেবলমাত্র ব্যবহারিক গবেষণায় তুষ্ট নন, বরং কোন কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক সন্ধানের জন্য ব্যবহারিক গবেষণাকে অবহেলাই করেছেন। শিল্পউদ্যোগের অনেক ক্ষেত্রে তাই বর্তমানে ফল মেলে নাই। অল্পদিনের বিচারে তাই চীনদেশ বেশী লাভ করেছে, কিন্তু যদি এতদিনের মৌলিক গবেষণার ভিত্তিতে আজ ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে মনোযোগ দেন, তবে চীনের সে লাভ দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে না।

বর্তমান ফললাভের আগ্রহ চীনদেশের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও স্পষ্ট। মৌলিক বিজ্ঞান শিক্ষার চেয়ে টেকনিকাল শিক্ষার উপরই চীন বেশী জোর দিয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার চেয়ে উচ্চস্তরের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা চীনদেশে ১৯৫০ সালে আন্দাজ সোওয়া লাখ ছিল। তাদের মধ্যে একুশ হাজার ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাধারী অর্থাৎ ১৯৫০ সালে উচ্চশিক্ষিতের এক-পঞ্চমাংশেরও কম ইঞ্জিনীয়ার। ১৯৬০ সালে এ ধরণের উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু তাদের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ার হয় ২১০,০০০। উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে ছয়গুণ কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা বেড়েছে দশগুণ, ফলে ১৯৬০ সালে সমস্ত উচ্চশিক্ষিতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল ইঞ্জিনীয়ার।

১৯৫০ সালে ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল প্রায় চার লাখ এবং তাদের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ার প্রায় ৬০০০০ অর্থাৎ সাত ভাগের এক ভাগ। দশ বছর পরে ১৯৬০ সালে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বারো লাখেরও বেশী এবং তাদের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ার ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে তিনগুণ, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা বেড়েছে চারগুণ। আজো ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা চীনের প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে চীন ভারতবর্ষের প্রায় সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রতি চীনদেশে যে ঝোঁক, বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা করলেই তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ১৯৫০ সালে চীনদেশে বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল ১১০০০ এবং দশ বছরে তা চার গুণ বেড়ে ৪৪০০০ হয়েছে। ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা ছিল ১৯৫০ সালে ৮০০০০ এবং ১৯৬০ সালে তা বেড়ে দুই লক্ষে দাঁড়ায়। চীনদেশে দশ বছরে ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা বেড়েছে দশ গুণ, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বেড়েছে চার গুণ। ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বেড়েছে আড়াই গুণ এবং ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা চার গুণ। আরো লক্ষ্য করা উচিত যে ১৯৫০ সালে চীনদেশে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা ছিল ইঞ্জিনীয়ারের অর্ধেক কিন্তু ১৯৬০ সালে মাত্র এক পঞ্চমাংশ। ভারতবর্ষে কিন্তু দশ বৎসরে অনুপাত সে পরিমাণে বদলায় নি। এ দেশে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা পূর্বে ছিল ইঞ্জিনীয়ারের দেড় গুণ এবং বর্তমানে প্রায় সমান সমান।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে চীনের তুলনায় ভারতবর্ষের বর্তমান অগ্রগতি আরো স্পষ্ট। ১৯৫৭ সালে চীনদেশের একাডেমী অফ সায়েন্সের অধীনে ১৭০০০ লোক কাজ করত, তাদের মধ্যে মাত্র ৭৪৬ জন ছিলেন উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক। সি এস আই আর-এ কর্মচারীর সংখ্যা বর্তমানে এগারো হাজার, কিন্তু তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা দু'হাজারের বেশী। সমস্ত স্তরের বৈজ্ঞানিক কর্মীর সংখ্যা

বিচার করলে চীনদেশের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে তাদের সংখ্যা সমস্ত কর্মচারীর এক তৃতীয়াংশেরও কম. ভারতবর্ষে সি এস আই আর-এ তাদের সংখ্যা অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশী। আণবিক শক্তি, কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক দফতরের সংখ্যা যোগ করলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে চীনের তুলনায় ভারতের অধিকতর বিকাশ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে। চীনদেশে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ১৯৪৬ সালেই একনায়কত্ব স্থাপন করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিল, আজো আছে কিন্তু গত পাঁচ-ছয় বৎসরে চীনদেশ ভারতবর্ষকে পিছনে ফেলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই সেকথা পরিষ্কার বোঝা যাবে। বর্তমানে ভারতবর্ষে বিভিন্ন টেকনিকাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা আন্দাজ দুই লক্ষ, কিন্তু চীনদেশে তাদের সংখ্যা প্রায় আট লক্ষ। চীনের এ চ্যালেঞ্জ পরাজিত করতে হলে জনবল এবং অর্থবল উভয় ভাবেই আমাদের প্রয়াস অনেক বাড়াতে হবে। কেবলমাত্র অর্থ দিয়ে কোনক্ষেত্রেই প্রগতির বিচার করা চলে না একথা সত্য, কিন্তু অর্থ ভিন্ন যে প্রগতি হয় না সেকথাও সমান সত্য। তাছাড়া কোন্ দেশ বা রাষ্ট্র কোন ব্যাপারে জাতীয় সম্পদের কি পরিমাণ অংশ ব্যবহার করে, তার দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রের রাষ্ট্রীয় মূল্যায়ণ বোঝা যায়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মোট ১৩০ কোটি টাকার বরাদ্দ হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় যে দশ হাজার কোটির বেশী অর্থব্যয় হবে, তার শতকরা দেড় টাকাও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় খরচ হবে না। পরিকল্পনার বাইরে এ পাঁচ বছরে আরো প্রায় ৭০ কোটি টাকা নানান বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে। সমস্ত মিলিয়ে তাই পাঁচ বছরে আন্দাজ ২০০ কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে গড়পড়তায় ৪০ কোটি টাকা ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক বাজেট। সে তুলনায় চীনদেশ বৎসরে প্রায় ২০০ কোটি টাকা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বরাদ্দ করেছে। কাজেই আমরাও যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য অধিক অর্থের ব্যবস্থা না করি, তবে আজ না হোক কাল এ বৈজ্ঞানিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের পরাজয়ের আশংকা রয়েছে। ভারতবর্ষের বর্তমান জাতীয় আয় বৎসরে প্রায় ১৫০০০ কোটি টাকা, তার শতকরা একভাগ, অর্থাৎ বছরে অন্তত দেড়শো কোটি টাকা যদি আমরা বিজ্ঞানের জন্য খরচ করি, তবে চীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আতঙ্কিত হবার কারণ থাকবে না।

গত পাঁচ বছরে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যে কাজ হয়েছে, তার বিচারের জন্য সম্প্রতি দিল্লীতে যে সম্মেলন হয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান সিদ্ধান্ত যে আগামী পাঁচ বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় ১৫০০০ বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে নিযুক্ত, পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০০০০ করা প্রয়োজন। সেজন্য অর্থের বরাদ্দও বাড়াতে হবে এবং জাতীয় আয়ের অন্তত এক শতাংশ বিজ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। পাঁচ বছরে জাতীয় আয় বেড়ে বৎসরে ২০,০০০ কোটিরও বেশী হবে, কাজেই তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বছরে অন্তত ২০০ কোটির ব্যবস্থা করতে হবে।

কেবলমাত্র গবেষণার জন্য অর্থবরাদ্দ এবং বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বাড়ালে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার মান ও বেগও বাড়াতে হবে। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষার ও গবেষণার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নতি। অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে একপক্ষে ন্যাশনাল লেবরেটরী ও বেসরকারী গবেষণাগারগুলি ও অন্যপক্ষে দেশের শিল্প ও উদ্যোগের ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। পারস্পরিক আলোচনা ও বিচার না হলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি হতে পারে না, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে, লেবরেটরীগুলিতে এবং সমস্ত বৈজ্ঞানিক সংস্থায় আলোচনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। প্রবীণ ও তরুণ বৈজ্ঞানিকের পারস্পরিক সম্বন্ধ যদি সক্রিয় সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থাপিত হয়, তবে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কাজ অবশ্য প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষে বহু খ্যাতনামা লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক রয়েছেন। কিন্তু তবু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়—যে আজো দেশে বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়নি। সেই আবহাওয়া নাই বলেই বহুক্ষেত্রে প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকও গবেষণায় আশানুরূপ ফল পান না। সেই আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হলে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যম ভিন্ন তা সম্ভব নয়। কিন্তু মাতৃভাষায় দুচারখানি পাঠ্য-পুস্তক লিখে সে উদ্দেশ্য সাধন করা যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু সাধারণ পাঠ্য বই, পত্রিকা, গল্প, উপন্যাস। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকেরা আজো জনসাধারণের জন্য সহজপাঠ্য বিজ্ঞানের বই লেখার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। বাঙলায় জগদানন্দ রায় বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর আগে যে সব বই লিখেছিলেন, আজো তার চেয়ে খুব বেশী অগ্রসর আমরা হইনি। সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায়ও বিজ্ঞানের স্থান আজো নগণ্য। সে তুলনায় চীনদেশে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা অনেক বেশী প্রবল। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও লেখক এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে অধিক সংখ্যায় নানা ধরণের বিজ্ঞানের বই লিখবেন। সাপ্তাহিক ও মাসিকের মাধ্যমে তরুণ ও প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান ছড়িয়ে দেবেন। আজ দেশের এই অন্যতম দাবী।

# দুই উকিল

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'আরে, আপনি?' চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এল প্রশান্ত : 'আপনি কবে এলেন?' নিচু হয়ে প্রণাম করল আগন্তুককে। একটু বা উচ্ছ্বসিত হয়েই ফেলল।

মুখের মত তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোকের হাতে একটা কাগজের বাণ্ডিল। গোলাপী ফিতে দিয়ে বাঁধা।

এ রকম রমণীয় দৃশ্য বুঝি আর হতে নেই। ঐ গোলাপী ফিতেটাই বুঝি আশার আভাস।

বেরালের যেমন শিকে উকিলের তেমনি ফিতে।

যা ভেবেছে তা না-ও হতে পারে। কখনো-কখনো গোলাপী ফিতে একটা বিশুদ্ধ ছলনা।

চারদিকে তাকিয়ে আগন্তুক বললেন, 'বাড়িটা তো ভালোই পেয়েছ।'

'ছোটর মধ্যে মন্দ নয়।'

'বাড়ির পজিশনটাও ভালো। ট্রাম রাস্তার কাছে। বেশি ঘুরতে হবে না মক্কেলদের।'

প্রশান্ত সামান্য হাসল।

'তা বই-টইও বেশ জোগাড় করে নিয়েছ দেখছি।'

'বই কোথায়? শুধু নজিরের স্তূপ।'

'আজকাল আইন তো বইয়ে নয়, নজিরে।' মাঝখানে টেবিল, মুখোমুখি বসলেন আগন্তুক। ঘনতর সুরে জিগগেস করলেন : 'হাইকোর্টে কেমন হচ্ছে?'

'ঠিক হচ্ছে না এখনো', এবার প্রশান্ত সশব্দে হাসল : 'হব-হব হচ্ছে।'

'বা, নিশ্চয়ই হবে।' ভদ্রলোক উৎসাহ-ভরা উদার সুরে বললেন, 'তুমি এত বড় একটা ব্রিলিয়ান্ট স্কলার, তোমার বিদ্যে-বুদ্ধি প্যাণ্ডিত্য বৃথা যাবে না।'

'এর আগে দু বছর যে মফস্বলে ছিলাম কিচ্ছু হয়নি।'

'তুমি মফস্বলের পক্ষে বেমানান', ভদ্রলোক আরো উত্তপ্ত হলেন : 'তোমার ফিল্ড হচ্ছে হাইকোর্টে।'

'ঐ যে কানুনগো হিসেবে ফেইলিউর হবার পর তাকে সাবডিপটি করে দিল আর সাবডিপটি হিসেবে ফেইলিউর হবার পরই ডিপটি—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আগন্তুক বললেন, 'আজকাল হলে কানুনগো হিসেবে ফেইলিউর হবার পরই মিনিস্টার—'

'তেমনি মফস্বলে ফেইলিউর হবার পরে হাইকোর্টে।' আবার হাসল প্রশান্ত।

'যারা মফস্বল থেকে আসে তারা নাকি খুব চেঁচায়?'

'মামলা পেলে তো চেঁচাবে।'

'না, তুমি চেঁচিও না। আস্তে-সুস্থে ধীরে-ধীরে আর্গুমেন্ট করবে। যে যত সম্ভ্রান্ত, শুনেছি, সে তত নিস্তেজ।'

'যদি এমন হয় আপনার কথা জজেরা শুনতে পাচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে আপনি না-জানি কী অমূল্য বস্তু পেশ করলেন—'

'হ্যাঁ, আনহার্ড মেলডিই বেশি মধুর।'

ভদ্রলোক ব্যাণ্ডিলের ফিতে খুলতে লাগলেন।

বেরালের ভাগ্যে শিকে কি তবে ছিঁড়বে?

বড় আস্তে-সুস্থে ধীরে-ধীরে ফিতেটা খুলছেন ভদ্রলোক। ভঙ্গিটা বড় বেশি সম্ভ্রান্ত।

'কী ওটা?' জিগগেস না করে পারল না প্রশান্ত।

'একটা সেকেন্ড আপিল—'

'কী মামলা?' হাত বাড়িয়ে প্রশান্ত ব্রিফটা টেনে নিল।

'খাস দখলের। আমাদের গ্রামের শরৎ সমাদ্দারকে মনে আছে? তারই জমি।'

ব্রিফ ওলটাতে-ওলটাতে প্রশান্ত বললে, 'দু কোর্টেই হেরেছে?'

'মুন্সেফের জাজমেন্ট তো আগাগোড়া ভুল। আর সাবজজ অকালে বুড়ো হয়েছে, খাটতে চায় না। আপিল ওলটাতে হলেই বেশি লিখতে হয়, যেতে হয় এভিডেন্সের মধ্যে, রুলিং-এর মধ্যে, তাহলেই তো বেশি খাটনি। তাই নমো-নমো করে সাবধার তালে থেকে নিচের রায়টা বহাল রেখেছে। 'আই হ্যাভ নো রিজন টু ডিস্টার্ব দি ফাইণ্ডিং—'

কতক্ষণ চুপ করে থেকে নথিটা পড়ল প্রশান্ত। জিগগেস করলে, 'আপনি নিচে ছিলেন?'

'দু কোর্টেই ছিলাম।'

উপর-উপর দেখেই একটা শর্ট-পয়েন্ট আবিষ্কার করল প্রশান্ত। বললে, 'এ পয়েন্টটা আর্গু করেছিলেন?'

'করেছি বৈকি। কিন্তু তোমাকে বলব কী, মুন্সেফটা গোঁয়ার আর সাবজজটা তালকানা।'

আরো কতক্ষণ নীরবে নথি পড়ল প্রশান্ত।

ভদ্রলোক বোধ হয় প্রশান্তের কপালে রাজটীকা দেখলেন। বললেন, 'আমি তখনই বলেছি এত কুইক গ্র্যাস্প সচরাচর দেখা যায় না। শরৎ সমাদ্দারের ইচ্ছে ছিল একজন সিনিয়র দেয়, আমি বললাম, না, প্রশান্তই যথেষ্ট।'

'শরৎবাবু কোথায়?' নথির থেকে ক্ষণিক চোখ তুলল প্রশান্ত।

'কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়েছে।' অনুকম্পা মিশিয়ে হাসলেন ভদ্রলোক।

'আপিল ফাইল করবার আগেই কালীঘাট?'

'হ্যাঁ, আদ্যেই আদ্যাশক্তি। কালীই হাই-কোর্টেশ্বরী।' ভদ্রলোক দার্শনিকের মত ঔদাস্য আনলেন ঃ 'কিছুই বলা যায় না। কখনো পারে এসে তরী ডোবে, কখনো বা ডাঙাতেই নৌকো চলে।'

'তা তো ঠিকই।' বিনয় মিশিয়ে বললে প্রশান্ত।

'নানা মুনির নানা মত। ক্ষণে-ক্ষণে নানা মত। সমস্ত অনিশ্চয়। তাই শুধু প্রার্থনা, মা, তোমার আইন তোমাতে থাক, তুমি শুধু রায়টুকু আমার করে দাও—'

'তা হলে—' প্রশান্ত নির্ভুল সুরে সেই বজ্রগর্ভ ইঙ্গিত করল ঃ 'তা হলে—'

অলক্ষ্যে জামার পকেটে হাত রাখলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'তা হলে তুমি একাই পারবে মনে করছ?'

'না-পারার তো কারণ দেখি না। বেশ তো, আপিলটা আগে য়্যাডমিটেড হোক, পরে ফাইন্যাল হিয়ারিং-এর সময় যদি দরকার হয়, একজন সিনিয়র নেওয়া যাবে না-হয়—'

'আমিও তাই বলি। সমাদ্দারই শুধু দোনা-মোনা করে। আমি বলি, প্রশান্ত আমাদের গ্রামের ছেলে, সাত রাজার রাজ্যে এমন মানিক মেলে না, ও একাই এক হাজার। জানো', ভদ্রলোক আরো সন্নিহিত হলেন, 'কাল তো এসেছি, স্টেশনে নামতেই এক টাউটের সঙ্গে দেখা। সমাদ্দারকে বললাম অমন উদোমাদা চেহারা করে নেমো না, পেছনে লোক লাগবে, বাঙাল ভাববে। ঠিক যা বলেছিলাম—'

'লোক লাগল?'

'আর বলো কেন, প্রথম ভেবেছিলাম প্রাইভেট গাড়িকে ট্যাক্সি করতে এসেছে বুঝি। পরে মনে হল হোটেলের দালাল। শেষকালে, স্বরূপে প্রকাশিত হল, উকিলের টাউট। ঠিক ধরেছে সমাদ্দারকে। যে গরু হারিয়েছে তার হাতে যেমন খুঁটো আর দড়ি দেখে চেনা যায়, তেমনি সমাদ্দারের হাতের কাগজপত্র দেখে লোকটা চিনল এ মামলায় হেরেছে। বললে, উকিল চাই? চলুন ফার্স্ট ক্লাশ উকিল দিচ্ছি।'

'ফার্স্ট ক্লাশ!' প্রশান্ত হাসল ঃ 'যেন ফার্স্ট ক্লাশ হোটেল।'

'আমি ধমকে উঠলাম।' বললেন ভদ্রলোক, 'বললাম আমাদের উকিল ঠিক আছে। আপনাকে দালালি করতে হবে না। লোকটা নাছোড়। বললে, কে উকিল? শরৎটা যা নাল্যাখ্যাপা, বললে, আমাদের উকিল প্রশান্ত সরকার, এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ। রাখুন, লোকটা টিটকিরি দিল, ক-অক্ষর জ্ঞান নেই, তার ব্রহ্মবিচার। বলি এম-এ দিয়ে কী হবে, আইনে কদ্দুর? আমি থাকাতে লোকটা আর বেশি দূর সুবিধে করতে পারল না, কেটে পড়ল। নইলে শরতের মুণ্ডু প্রায় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আমিই আজ ভোর হলে তাকে ঠেলেঠুলে কালীঘাটে পাঠালাম। বললাম, মাকে পুজো দিয়ে এস, মনটা ভালো হবে, মনে জোর পাবে, প্রশান্তকেও পারবে আস্থা রাখতে—'

'ঠিক আছে। তবে এখন—' আরেকটা বজ্রগর্ভ ইঙ্গিত ছুঁড়ল প্রশান্ত।

'হ্যাঁ, খরচের একটা এস্টিমেট করো—'

'এর আবার এস্টিমেট কী—' তবু প্রশান্ত কাগজে আঁক পাতল।

খসড়ার দিকে এক নজর তাকিয়েই ভদ্র-

কী সুন্দর ঘন কালো মসৃণ কেশগুচ্ছ!

এরা নিয়মিত ব্যবহার করেন 'কিংকো'-র আণিকা হেয়ার অয়েল

কিং অ্যাণ্ড কোং
কলিকাতা-৭
PRO'KING-1

লোক উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার ফি-টা আরো দশ টাকা বাড়িয়ে নাও।'

'বাড়িয়ে নেব?' যেন কোন অভাবনীয়কে দেখছে এমনি চোখ বড় করল প্রশান্ত।

'হ্যাঁ, বাড়িয়ে নাও।' ভদ্রলোক আরো উত্তপ্ত হলেন। 'শরৎ অবশ্য বলছিল, গ্রামের লোক, ফি-টা একটু কম করতে বলবেন। আমি বললাম, ঠিক উলটো, গ্রামের লোক বলেই ফি-টা বাড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামের লোককে যদি পেট্রোনাইজ না করো তো কাকে করবে? এ তো আর চিরকেলে বটকৃষ্ণ ঘোষ পাওনি যে এক পয়সায় অক্রূরসংবাদ শোনাতে বলবে। তাই তোমাকে বলছি এই তক্কে বাড়িয়ে নাও ফি-টা—'

'বেশ, যা হয় দেবেন। কিন্তু টাকা কি—'

'সব শরতের কাছে। ও কি কালীঘাট থেকে এ বাড়ি চিনে নিতে পারবে?' একটু বুঝি উন্মনা হলেন বটকৃষ্ণ : 'তাই ওকে কোর্টে যেতে বলেছি। কোর্টেই পেমেন্টটা করে দেব।'

'বেশ, আমি গ্রাউন্ডস তৈরি করছি।' কাগজ-কলম টেনে নিল প্রশান্ত : 'একটা স্টে-র দরখাস্তও করতে হবে। শরৎবাবুকে দিয়ে একটা এফিডেভিট করিয়ে নিতে হবে। আমার মুহুরি এসে পড়বে এখুনি। হ্যাঁ, কোর্টেই সব হবে। আমার মুহুরিই ঠিক-ঠাক করে দেবে সমস্ত। আজ বুধবার—শুক্রবারই আর্জেন্ট য়্যাপ্লিকেশন শোনার দিন।' ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠল প্রশান্ত, যেন ফাঁকা মাঠে বল পেয়ে ছুটছে গোলের দিকে। 'আজই আপিল ফাইল করে মুভ করে নিতে হবে যেন পরশু শুক্রবারটা না মিস হয়।'

'ঠিক আছে। অতি সুন্দর।' উঠে পড়লেন বটকৃষ্ণ।

'আপনি শরৎবাবুকে নিয়ে যত শিগগির পারেন চলে যান কোর্টে। এই যে—এই যে মুহুরিবাবু এসে গিয়েছেন। তবে আর কী, চিনে রাখুন মুহুরিবাবুকে—' মুহুরির দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বললে, 'এদের একটা সেকেন্ড আপিল—স্টে-র দরখাস্ত—এফিডেভিট—'

বটকৃষ্ণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সাড়ে আটটা। মুহুরিকে লক্ষ্য করে মুরুব্বিয়ানা করে বললেন, 'আপনার বোধ হয় আরো কিছু আগে আসা উচিত। হাই-কোর্টের উকিলের সকাল বলতে আর কতক্ষণ। যেন পদ্মপাতায় শিশিরের জলটুকু—সুতরাং—' আবার ঘড়ি দেখলেন বটকৃষ্ণ।

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন, দেরি করবেন না।'

'এখন ট্যাক্সি পাব আশা করি। সব কাঁটায়-কাঁটায় চলছে। চলা উচিত। শুধু মোকদ্দমার ফলটাই—' শূন্যের দিকে এক-বার চোখ তুলে বেরিয়ে পড়লেন বটকৃষ্ণ।

চারদিকে ত্বরার বিদ্যুৎ খেলতে লাগল।

শার্টে বোতাম নেই কেন, এ ময়লা কলারটা আবার দিয়েছ কেন, অন্তঃপুরেও ঝলস লাগল।

মধুশ্রী জিগগেস করলে, 'নতুন মোকদ্দমা পেয়েছ বুঝি?'

'হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ের বটকৃষ্ণবাবু নিয়ে এসেছেন। সিনিয়র উকিল, সদরে-মফস্বলে খুব নাম-ডাক। আর আমার উপরে তাঁর খুব বিশ্বাস। তুমিই শুধু আমাকে মানতে চাও না—'

'টাকা দিয়েছেন?'

'জানো আমার যা ফি তার উপরে আরো দশ টাকা বেশি দেবেন। জেনে রাখো সে দশ টাকা তোমার।'

'দশ টাকা বেশি কেন?' স্বামীর পরা-শার্টে বোতাম লাগাতে-লাগাতে জিগগেস করলে মধুশ্রী।

'ওদের দেশের আমি রত্ন সেই পুরস্কার।'

'রতনেই রতন চিনেছে।' সুতোর শেষ গিঁটটা দাঁত দিয়ে কাটল মধুশ্রী।

কোর্টে গিয়ে প্রশান্ত দেখল সব কাঁটায়-কাঁটায়। এভিডেভিট হয়ে গিয়েছে! ফাইলড হয়েছে আপিল। মুভ করা হয়েছে বেঞ্চকে। আগামী শুক্রবারই দিন হয়েছে শুনানির। আপিল য়্যাডমিটেড হবে কিনা। আর য়্যাডমিটেড হলেই স্টে। প্রতিপক্ষ শরৎ সমাদ্দারের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে যে ডিক্রিজারি করেছে তা আপাতত বন্ধ।

'কিন্তু মক্কেল কই? প্রশান্ত আর শান্ত থাকতে পারল না।

'এদিকেই তো ছিল।' খুঁজতে বেরুল মুহুরি।

আনাচে-কানাচে সিঁড়িতে-বারান্দায় কোথাও পাওয়া গেল না।

'একবার বুড়ো বলেছিল বটে রাতে আপনার বাড়িতে যাবে।'

'দুটোই তো বুড়ো। কোনটা বলেছিল?'

মুহুরি মাথা চুলকে বললে, 'উকিল-বুড়ো। বটকৃষ্ণবাবু।'

'তোমাকে খরচের টাকা দিল কে?'

'মক্কেল। শরৎ সমাদ্দার।'

'তখনই আমার টাকাটা নিয়ে নিলে না কেন?'

'আমি কি জানি যে ফি বাকি আছে? আমাকে তো তখন বলেন নি।'

'যাক, রাত্রে আসবে বলেছে? তাই আসুক।' চিরদিন আশায় বাসা বাঁধা উকিলের, প্রশান্ত তাই সুতো ছাড়ল।

'না-এসে যাবে কাথায়?' মুহুরি বললে, 'মামলা তাহলে টেঁসে যাবে না? দু-দু কোর্টে হেরেছে। যদি প্রতিকার চায় আসতে হবেই।'

রাত্রেও কেউ এল না। না শরৎ না বটকৃষ্ণ।

একটা শব্দ নেই রেখা নেই, বৃহস্পতি-বারের রাত্রি ভোর হল।

শুক্রবার সকালে প্রশান্ত বললে, 'নট-প্রেস্‌ড বলে রিজেক্টেড হয়ে যাক।'

"এ কী অসম্ভব কথা, ফি দেবে না মামলা চালাবে? কিন্তু', মুহুরি মুখ-চোখ চিন্তিত করল : 'হঠাৎ কোনো বিপদ হয় নি তো?'

'তা হলে একটা খবর দেবে তো?'

'হয়তো সকালে কোর্টে টাকা নিয়ে উপস্থিত হবে।' মুহুরি আশ্বাস দিল।

শুক্রবার সকালেও নিষ্কলঙ্ক। বটমূলে কৃষ্ণও নেই আর শরৎশশীরও উদয় হল না।

কিন্তু তাই বলে পিটিশনটা মুভ না করার কোনো পয়েন্ট নেই। আইনের এমন


কুটির শিল্প

বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে
শুধু চাকুরীর সন্ধানে না ঘুরে
ছোট ছোট কুটির শিল্পে
নিজেদের নিয়োজিত করুন।
কুটির শিল্পের
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন—

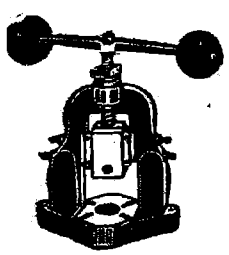

বল প্রেস

ফ্লাই প্রেস, এমবসিং ডাইপ্রিন্টিং প্রেস,
টালি প্রেস, পাওয়ার প্রেস ইত্যাদি
আমরা তৈরী করে থাকি।

নন্দী এণ্ড কোং

৬২৫, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া
ফোন : ৬৬-২০৬১



মডার্ণ ডেকরেটরস

৬৫ এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন ৩৫ ২৫৪৯

একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট সে আবিষ্কার করেছে যেটা প্রত্যক্ষে জজেদের সামনে বলবার জন্যে মুখটা ভীষণ কুটকুট করছে।

বলবার জন্যেই তো উকিল হওয়া। মনের কথা মনে চেপে রেখে গোঁজ হয়ে বসে থাকবার জন্যে নয়।

টাকা না দিয়ে যাবে কোথায়? অন্য ব্যবসায় পারিশ্রমিক না দিক মামলা করে আদায় করা যাবে না কিন্তু ওকালতির পারিশ্রমিক মামলা করে উশুল করা চলবে। যেহেতু ওকালতি সবচেয়ে সাধু ও সম্মানিত ব্যবসা।

কে পক্ষ কে উকিল কোনো দিকে তাকাল না প্রশান্ত। মুভ করল দরখাস্ত। আইনের পয়েন্টটা একটু বিবৃত করতেই আপিল য়্যাডমিটেড হয়ে গেল। মঞ্জুর হল স্টে। নথি-তলব।

বিশুদ্ধ প্রবক্তার মুখে উচ্চারিত মন্ত্র অলৌকিক কাজ করল—সমস্ত দিন এমনি একটা ঝঙ্কার অনুভব করল প্রশান্ত। টাকার কথাটা মনের কোণেও উঁকি মারল না। না বা দশ টাকার আশায় উজ্জ্বল মধুশ্রীর মুখটা।

শনিবার সকালে চিঠি এল বটকৃষ্ণের ঃ

বুধবার সন্ধেয় তোমার বাড়ি যাবার কথা ছিল কিন্তু হোটেলে ফিরে এসেই টেলিগ্রাম পাই, স্ত্রীর কলেরা। রাত্রের ট্রেনেই রওনা হয়ে চলে এসেছি। অবস্থা এখন ভালোর দিকে, চিন্তার কারণ নেই। শরৎ সমাদ্দারকে বলে এসেছি বৃহস্পতিবারের মধ্যেই যেন তোমার টাকাটা পৌঁছে দেয়। আশা করি আপিল য়্যাডমিটেড করিয়ে নিতে পারবে। তোমার অল্পদিনের প্র্যাকটিস হোক কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার হাতেই জয়-লক্ষ্মী বাঁধা পড়ে আছে।

প্রশান্ত লিখল ঃ

শরৎ সমাদ্দারের আপিল য়্যাডমিটেড হয়েছে। ডিক্রিজারি বন্ধ আনটিল ফারদার অর্ডারস। লোয়ার কোর্টে চলে গিয়েছে নির্দেশ। আমার ফি এখনো পাইনি। টাকা নিয়ে কেউ আসেনি আমার কাছে। মক্কেলকে বলবেন আমার প্রাপ্য টাকা যেন অবিলম্বে পাঠিয়ে দেয় মনি-অর্ডার করে।

অনেক দিন কোনো উত্তর নেই।

ফার্স্ট—সেকেন্ড রিমাইন্ডার পাঠাল প্রশান্ত।

বটকৃষ্ণ লিখলেন ঃ

'শরৎ সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বললে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। তোমার পরের চিঠি পেয়ে আবার তাকে ধরলাম, সে আমাকে টাকা পাঠাবার পোস্ট্যাল রিসিট দেখাল—তোমার ওদিকে টাকাটার কোনো গোলমাল হয়নি তো? তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার বাড়ির কোনো লোক টাকাটা রাখেনি তো? পরে তোমাকে বলতে হয়তো ভুলে গেল—'

পাল্টা জবাব পাঠাল প্রশান্ত ঃ

'আমার টাকা অন্য লোককে দেবার কোনো অথরিটি নেই পোস্টআপিসে। পোস্ট্যাল রিসিট না দেখিয়ে শরৎবাবুকে য়্যাকনলেজ-মেন্ট রসিদ দেখাতে বলুন। টাকা না পাঠিয়ে মিথ্যার অবতারণার কী হেতু বুঝতে পাচ্ছি না।'

এর উত্তরে বটকৃষ্ণ শরতের উদ্দেশে গালাগালের ফোয়ারা ছোটালেন।

'লোকটা মহা হারামজাদা। য়্যাকনলেজ-মেন্ট দেখানো দূরের কথা, দেখাও দিচ্ছে না। লোক পাঠালে ভাগিয়ে দিচ্ছে। এখন শুনতে পাচ্ছি তীর্থে গিয়েছে। যে লোক এমন শঠ, প্রতারক, পরস্বাপহারী তার তীর্থে কী হবে? তার বিষয়সম্পত্তির ভরাডুবি তো হবেই, সে নিজেও নিপাত যাবে।'

এর পরে আর করবার কী আছে, প্রশান্ত হাল ছেড়ে দিল।

কিন্তু নৌকো তক্ষুনি ডোবে কই?

"দশ টাকা বেশি কেন?"

শরৎ সমাদ্দারের আপিল মাল্থলি থেকে ডেইলি লিস্টে উঠেছে।

বটকৃষ্ণকে লিখল প্রশান্ত ঃ

'এবার আপিলের ফাইন্যাল হিয়ারিং হবে। মক্কেলকে বলুন আমার দুবারের ফি পাঠিয়ে দিতে। নইলে আমি য়্যাপিয়ার করব না। আপিল যদি ডিসমিসড ফর ডিফল্ট হয়ে যায়, আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।'

"না, তোমার দোষ কী।' লিখলেন বটকৃষ্ণ ঃ 'ঐ হারামজাদা আমাকে ছেড়েছে। শুনছি তোমাকেও। শুনছি ফাইন্যাল হিয়ারিং-এ অন্য উকিল দেবে। তোমাকে যদি না রাখে, তোমার ন্যায্য ফি তোমাকে না দেয়, তুমি দাঁড়াবে কেন? মামলা যা হবার তা হবে, তোমার কী মাথাব্যথা! যে বিনা পয়সায় এত উপকার করল, এক কথায় আপিল য়্যাডমিট করিয়ে নিল তাকে শেষ সময়ে বর্জন করার অকৃতজ্ঞতা ঈশ্বর কখনোই ক্ষমা করবেন না। হতভাগাকে বিষয়বিষে ধরেছে, ওর ক্যান্সার না হয় তো কী বলেছি!'

খোঁজ নিয়ে জানল আপিলেন্টের পক্ষে আর কারু য়্যাপিয়ারেন্স নেই। যে-কে-সে, প্রশান্তই একমাত্র উকিল।

রেসপন্ডেন্ট য়্যাপিয়ার করেছে। আর তাদের পক্ষে জাঁদরেল সিনিয়র উকিল অবিনাশ বিশ্বাস।

'আমার ফি নেই, আমি দাঁড়াব কোন সুবাদে? বলে দেব, নো ইনস্ট্রাকশানস।' বললে প্রশান্ত।

'তার আর কী করা?' সায় দিল মুহুরি।

কিন্তু, যাই বলো, ল-পয়েন্টটা ভারি ইনটারেস্টিং। আর্গুমেন্টে আনন্দ আছে। রাত্রে ভালো করে ঘুমুতে পারল না প্রশান্ত। এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। এ পয়েন্টটা ওকে ছেড়ে দিতে হবে? আপিল এডমি-শানের সময় তো প্রতিপক্ষ আসেনি, এক তরফা ভাসা-ভাসা একটু বলেই প্রাথমিক কাজ হাসিল করেছে। কিন্তু এখন প্রতি-পক্ষ যুদ্ধসাজে সেজে এসেছে, সশস্ত্র হয়ে

। কিলম নদীর তীর (কাশ্মীর) ফটো : কুমারেশ বিশ্বাস

এসেছে, এখন লড়তেই তো মজা, জিততে পারলে পরম রোমাঞ্চ। সামান্য কটা টাকার জন্যে এ রোমাঞ্চ ও ছেড়ে দেবে?

কিন্তু হতচ্ছাড়া মক্কেল ফি দেবে না, আর আমি বোকার মত আর্গুমেন্ট করব ওকে জেতাবার জন্যে—আমার কি মান-সম্মান বলতে কিছু নেই? আমাকে তো জীবিকার্জন করতে হবে, আর এই তো আমার একমাত্র পথ। আমাকে ঠকাবে, আমাকে শোষণ করবে?

কিন্তু, রোমাঞ্চটা ঠিক একটা কবিতার মত, গানের মত, নিটোল শিল্পসৃষ্টির মত মনে হতে লাগল প্রশান্তর। সে পয়েন্টটার ব্যাখ্যায় বর্ণনায় বিস্তারে বিশ্লেষণে যেন গানেরই সেই আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগের আস্বাদ। এ কি কখনো ছাড়া যায়? তার উপরে ও পক্ষের ব্যাখ্যা-বর্ণনাকে নিরস্ত করে দেবার স্বপ্নের যে সুখ, বর্ণের যে ঝলক, তা সে আর পাবে কোথায়?

ফি না-পাই তো না-পাই, মামলায় দাঁড়িয়ে গেল প্রশান্ত।

প্রাণ ঢেলে আর্গুমেন্ট করল। কে শরৎ সমাদ্দার, কে বা বটকৃষ্ণ ঘোষ, পকেট তার ফাঁকা না বোঝাই, মধুশ্রীর পাতা হাতে দশ টাকা আছে কি নেই, কিছুই তার ভাবনার মধ্যে রইল না, সে গ্রন্থির পর গ্রন্থি উন্মোচন করে মন্ত্রপাঠ করতে লাগল—প্রতিপক্ষ দাঁড়াতে পারল না।

দু-দু কোর্টের হারা মামলা ডিক্রি হয়ে গেল।

একটা আগুন-লাগা গানের মত হয়ে বাড়ি ফিরল প্রশান্ত।

মুহুরি বললে, মামলা জিতেছে, এবার পাঠাতে পারে টাকাটা। আবার একবার লিখুন বটবাবুকে।

না, আর লেখার মানে হয় না। অন্তত এর পরে আর নয়। লিখল না প্রশান্ত।

কত দিন পরে শরৎ সমাদ্দারের চিঠি এল।

বক্তব্য বিশেষ কিছুই নয়, মামলার যে ব্রিফটা প্রশান্তর কাছে ছিল তা যেন সত্বর পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পত্রপাঠ ব্রিফ পাঠিয়ে দিল প্রশান্ত।

ব্রিফ দেখে শর্ত টুকরো হয়ে ফেটে পড়ল শরৎ। 'আমি টাকা দিই নি? দু-দুবারের টাকা বাড়তি-বাবদ বাড়তি-টাকা, সিনিয়রের টাকা—সমস্ত আমি বটকেষ্টর হাতে দিয়েছি। প্রশান্তবাবুকে না দিয়ে সিনিয়র না রেখে সমস্ত টাকা ও নিজে মেরেছে, আত্মসাৎ করেছে। কী ভয়ঙ্কর কথা! তারপর আবার আমাকেই গালাগাল দিয়েছে। আমি যদি হারামজাদা হই ও কিসের জাদা? আমার তো ক্যান্সার হবে, ওর কী হবে?'

বটকৃষ্ণের কাছে খবর পৌঁছুল।

শুকনো মুখে বললেন, 'জানতাম প্রশান্ত খুব সতর্ক ছেলে, ওকে লেখা আমার চিঠিগুলো মামলার ব্রিফের মধ্যে রেখেছে কেন? আমার চিঠি তো মামলার বিষয়ের সম্পর্কে ইররেলিভ্যান্ট। এত বড় একটা আইনজ্ঞ লোক, আমার চিঠি কেন নথিভুক্ত করে? ও সব তো ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার, ও সব তো ওর ছিঁড়েখুঁড়ে নষ্ট করে দেওয়া উচিত ছিল। ওরা ব্রিফের পার্ট হয় কী করে?'

'ব্রিফেরই তো পার্ট।' বললে আরেক উকিল, 'মামলার থেকেই তো এ চিঠির জন্ম। আর বুদ্ধি করে ব্রিফের সামিল করেছিল বলেই তো চোর ধরা পড়ল।'

শরৎ সমাদ্দার সমস্ত কথা খুলে জানাল প্রশান্তকে। লিখলে, আমি বটার বিরুদ্ধে ফৌজদারি করব, আপনি সাক্ষী হবেন। আমার থেকে নিয়েছে এ আমি বলব আর আপনাকে যে দেয়নি এ আপনি বলবেন।

তাগিদের পর তাগিদ আসতে লাগল, প্রশান্ত রাজি হয় না।

'এ পাপকে শাসন না করলে ঘোরতর অন্যায় হবে সমাজের। মিথ্যাবাদের পিরামিড এ লোকটাকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া নয়। ক্যান্সার ছেড়ে গ্যাংগ্রিন হলেও নয়। চুরিও করবে আবার গালাগালও দেবে এ অসহ্য। আপনি যদি রাজি না হন—'

প্রশান্ত লিখল : 'আমার এখানে নিত্য কাজ, আমি ভীষণ ব্যস্ত। সাক্ষ্য দেবার সময় নেই, সুবিধেও হবে না।' তারপরে যোগ করল : 'আপনি তো মামলা জিতেছেন। তাই সব কিছুকে জয়ের চোখে আনন্দের চোখে দেখুন—'

শুনে বটকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন। বললেন, 'কাকের মাংস যে কাকে খায় না, তা শরৎ সমাদ্দার জানবে কী করে? তা ছাড়া প্রশান্ত এখন উঠতি উকিল, তার অত টাকার খাঁই নেই। আর আমি জানি, আমাকে সে লিখেওছে, সে যে ল-পয়েন্টে আর্গুমেন্ট করে মামলা জিতেছে সে রোমাঞ্চ একটা গানের মত, কবিতার মত। তার কাছে টাকা কী। এ আমি জানতাম বলেই এ মামলা আমি প্রশান্তকে দিয়েছি, সিনিয়র পর্যন্ত রাখি নি। আজ তার কত নাম, কত প্রসার! শরৎ সমাদ্দার, একটা মক্কেল, এ সিক্রেট বোঝে এমন সাধ্য কী! এ একেবারে টপ-সিক্রেট।'

আবার হাসতে লাগলেন বটকৃষ্ণ।

# এই যে নতুন
# টিনোপাল প্যাক
# এটি আপনিই কেবল
# খুলতে
# পারবেন !

টিনোপাল এখন
রঙিন চমৎকার নতুন প্যাকে
সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে।

এর নতুন অ্যালুমিনিয়ামের
প্যাক এমনভাবে সীল করা
যে কেবল আপনিই
খুলতে পারবেন···

*সামান্য একটু টিনোপাল*
*ব্যবহার করলে সাদা*
*জামাকাপড় সবচেয়ে*
*বেশী সাদা হ'য়ে ওঠে।*

টিনোপাল গ্রুপ অফ কম্পানীজ ট্রেডমার্ক
রেজি. আর এ্যাণ্ড সি. এ. বাসল, সুইজারল্যাণ্ড

ভারতে প্রস্তুতকারক: সুহৃদ গায়গী লিমিটেড, ওয়াডী এয়ারপোর্ট, বরোদা
বিক্রয় কার্যালয়: এক্সপ্রেস্ বিল্ডিং, চার্চগেট, বোম্বে-১—বি.আর.

# আত্মস্মৃতির হীরকজয়ন্তী

## নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

আমার কাহিনীর শুরু হবে অর্ধ-শতাব্দীর কয়েক বছর আগে—উনবিংশ শতকের শেষভাগে। একটি ঘটনা তখন ঘটেছিল আমাদের জ্ঞাতসারে যা বাঙলা সাহিত্যের প্রচারের ইতিহাসের একটা স্মরণীয় ঘটনা।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তখনকার বাংলা সাহিত্যের অবিসম্বাদী সম্রাট। তিনি তার কিছুকাল আগেই গত হ'য়েছে। তারপরও বাংলা সাহিত্যে কাব্য ও উপন্যাস বেশ কতকগুলি বই লেখা ও প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের প্রচার ছিল সামান্য। তখনকার অনেক জনপ্রিয় লেখকের নামও হয়তো আজকাল কেউ জানেন কিনা সন্দেহ। যথা দামোদর মুখোপাধ্যায় যিনি লিখেছিলেন দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার দু'খানি পরিশিষ্ট, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যিনি অনেকগুলি ছোট ছোট উপন্যাস লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন কতকগুলি উপন্যাস যেমন দীপনির্বাণ, হুগলীর ইমাম বাড়ী, স্নেহলতা প্রভৃতি। তাছাড়া তিনি ভারতীর সম্পাদিকাও ছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির সৌষ্ঠব ছিল, তবে সেগুলির প্রচার খুব বেশী ছিল না। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি এবং সমাজ ও সংসার দুটি পারিবারিক উপন্যাস লিখেছিলেন, তবে এগুলি দলছাড়া হ'লেও প্রচারের দিক থেকে খুব বেশী ভিন্ন ছিল না। তাছাড়া সংখ্যার দিক থেকেও এই বইগুলি খুব বেশী ছিল না। সেকালে যে কয়েকটি পাবলিক লাইব্রেরী ছিল তার মধ্যে এসব বই ছিল বড়জোর দুইটি ছোট আলমারী ভরত কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ তখন আসরে নেমেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তিনি এক সভায় মাল্যদানেও সম্বর্ধিত হ'য়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠা তখনও গানে। তাঁর কতকগুলি গান ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেছিল। আর তাঁর প্রেমের গান বেশীর ভাগই যুবকদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতো। কবিতার বই কয়েকখানি ছাপা হ'য়েছিল। কিন্তু তার প্রচার খুব বেশী ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প প্রকাশিত হ'য়েছিল এবং তার আদরও হ'চ্ছিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট বটবৃক্ষের ছায়ায় সেসব বেশী প্রসার পায় নি।

আমি যখন এম-এ ক্লাসে পড়ি (১৯০১—২ সালে) তখন আমার সহপাঠীর মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র পুরেন্দু-সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। ক্লাসে অল্পসংখ্যক সহপাঠীর মধ্যে এবং ক্লাসের বাহিরেও প্রধানতঃ পুরেন্দুর বাড়ীতে, যেখানে শেষ-জীবনে বঙ্কিমবাবুর বাসস্থান ছিল, আমাদের অনেক বৈঠক বসত।

এই সময়ে একদিন পুরেন্দুর মুখে একটা খবর শুনলাম। পুরেন্দুরা তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের কপিরাইটের মালিক ছিলেন। বসুমতী কাগজের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত বইয়ের কপিরাইট কিনে নেবার প্রস্তাব ক'রেছেন, সব বই একসঙ্গে গ্রন্থাবলী আকারে ছেপে সস্তায় বিক্রি করবার জন্য। শুনলাম যে, সব বইয়ের কপিরাইটের দাম দেবেন তাঁরা পাঁচ হাজার টাকা। পুরেন্দুরা সেই প্রস্তাব বিবেচনা ক'রছেন। শুনে আমি চমকে উঠলাম—মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় বঙ্কিমচন্দ্রের সব বই নিয়ে নেবে! আমি অত্যন্ত আপত্তি করে পুরেন্দুকে এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে বারণ করলাম। উত্তরে পুরেন্দু যা বললে তা শুনে আরেক দফা মাথা ঘুরে গেল। সে বলল যে, এখন আর বইয়ের কোনো বিক্রী নেই। বঙ্কিমবাবুর সমস্ত বই বিক্রী করে বছরে যে আয় হয় সে সম্বন্ধে, ঠিক সংখ্যাটা আমার মনে নেই, তবে যে সংখ্যা দিলে পুরেন্দু সে অতিশয় তুচ্ছ। আমি মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই এই অকথা যদি হয়ে থাকে তবে বাংলা সাহিত্যে নতুন বই লেখায় বিশেষ উৎসাহ হবার কথা নয়। তখন মনে পড়ল ইংল্যাণ্ডের গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি লেখকের বইগুলির যৎসামান্য মূল্য দিয়েছিল তৎকালীন প্রকাশকেরা।

যাই হোক, এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হল এবং কিছুদিন পরেই বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হল। আশার কথা, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীও হল বসুমতী অফিস থেকে।

গ্রন্থাবলী প্রকাশের এই চেষ্টা উপেন্দ্রনাথের পক্ষে এই প্রথম নয়। যখন প্রথম বসুমতী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন উপেন্দ্রবাবু, সে সময়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে, প্রথম বৎসরে মাত্র ডাকমাশুলের পয়সা দিলেই গ্রাহকগণ সমস্ত বছরের বসুমতী


রূপার বই

স্মৃতিকথা

ছায়াময় অতীত—মহাদেবী বর্মা ৪·০০
অনুবাদ : ললিতা রায়

বিচিত্র কাহিনী

যাদু-কাহিনী—অজিতকৃষ্ণ বসু [ অ, কৃ, ২ ] ৮·০০

ভ্রমণ কাহিনী

শৈলপুরী কুমায়ুন—চিত্তরঞ্জন মাইতি ৫·০০

নাটক

বসন্ত বিলাপ—চিত্তরঞ্জন মাইতি [ কাব্য-নাটিকা ] ৪·০০
জনতার কোলাহল—গোপীনাথ নন্দী ২·৫০

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২

পাবেন। তার ওপর পাবেন কতকগুলি উপহার। যে সব বই উপহার দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে কতকগুলো বাজে নাটক, যথা অতুল গ্রন্থাবলী প্রভৃতি ছিল। কিন্তু একখানি বই আমার কাছে খুব মূল্যবান বোধ হয়েছিল। সেটি প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী। তাতে বিদ্যাপতি থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ প্রভৃতি পর্যন্ত সব কবির লেখা ছিল।

আমি তখন এণ্ট্রান্স স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে (অর্থাৎ ম্যাট্রিকের ক্লাস টেনে) পড়ি। মাত্র ছয় আনার ডাকটিকিট পাঠিয়ে দিয়ে আমি এক বৎসরের জন্য বসুমতীর গ্রাহক হয়ে পড়লাম এবং এই সব উপহার পেলাম। প্রাচীন কবির কাব্যের সঙ্গে তাঁদের এই গ্রন্থাবলী দিয়েই আমার প্রথম পরিচয় হল। তাতে আমি অত্যন্ত উপকৃত হলাম। উপেন্দ্রবাবু তার পূর্বে কোনো সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। আমার যতদূর মনে হয় তখন তাঁর কারবার ছিল কাগজ বিক্রী এবং কতক বই বিক্রী। তাঁর বসুমতী প্রকাশের উদ্‌যোগ সেই কারবারেরই আঙ্গিকস্বরূপ ছিল।

তখন বাংলা ভাষায় কোনো দৈনিক কাগজ ছিল না। এর আগে 'দৈনিক' নামে একখানা কাগজ বেরিয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সেই কাগজ ছিল না। বসুমতীর প্রকাশের সময়ে যে বাংলা কাগজ চলতি ছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী' ও 'হিতবাদী'। আরো কয়েকখানি কাগজ কিছুকাল আগে কিংবা সেই সময়ে চলছিল যথা 'বঙ্গ নিবাসী', 'সমর', ইত্যাদি। এর মধ্যে বঙ্গবাসী ছিল বোধ হয় সবচেয়ে পুরোনো এবং সেকালের হিসেবে বহুল প্রচারিত। বলাবাহুল্য 'বঙ্গবাসী'ও সাপ্তাহিক ছিল। বসুমতী বের হওয়ার আগে আমি স্কুলের খুব নীচু ক্লাসে পড়ি তখন বঙ্গবাসীতে আগ্রহ সহকারে পড়েছিলাম, মণিপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের অভিযানের বিবরণ। আমার যতদূর মনে হয় সে অভিযানের যে বিবরণ বঙ্গবাসীতে বেরোত, তাতে মণিপুরের রাজা টিকেন্দ্রজিৎ-এর পক্ষ বিশেষ সমর্থিত হত। এর কয়েক বৎসর পরে বঙ্গবাসীতে একটি প্রবন্ধ বের হয়েছিল, আমার মনে হয়, তার নাম ছিল 'ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা'। সে প্রবন্ধ ঠাট্টা-তামাসা করে লেখা হয়েছিল। কিন্তু তাতেই তখনকার গভর্ণমেণ্ট বিচলিত হয়ে বঙ্গবাসীর বিরুদ্ধে সিডিশনের অভিযোগ আনেন। পিনাল কোডের যে ধারায় সেই অভিযোগ আনা হয়, ১২৪ (ক) ধারা, সেটা এর কিছুদিন পূর্বে প্রবর্তিত হয়েছিল এবং বঙ্গবাসীর মোকর্দমা বোধ হয় সেই ধারায় সর্বপ্রথম অভিযোগ ও বিচার। সে মোকর্দমায় বঙ্গবাসীর পক্ষে নিযুক্ত হয়েছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার জ্যাকসন-সাহেব। সেই মোকর্দমাটি বোধহয় সম্পাদকের পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করায় শেষ পর্যন্ত উঠে যায়। তার পরে এই ধারায় মোকর্দমা হয় বোম্বাইয়ের বালগঙ্গাধর তিলকের নামে এবং সেই মোকর্দমায় তিলকের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর তার প্রচার ক্রমে যথেষ্টই বেড়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত বই আলাদা কিনতে লাগত আঠারো-উনিশ টাকা। সেই সমস্ত বই বসুমতীর সংস্করণে বিক্রী হতে লাগল ছয় টাকায়। বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যতই থাকুক, আঠারো-উনিশ টাকা দিয়ে সমস্ত বই কিনে পড়বার মত আগ্রহশীল পাঠক সে সময়ে বেশী ছিল না। পক্ষান্তরে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার পর অল্পখরচে সেই সমস্ত বই পড়বার আগ্রহে দলে দলে খরিদ্দার এসে পড়ল। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পথ-প্রদর্শন করল এবং এর পর অন্যান্য গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে স্থাপিত হল বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

এই সময়ের কাছাকাছি, কিছু আগে পরে, হিতবাদীর প্রকাশিত হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী এবং তারপর রবীন্দ্রনাথের গানা গ্রন্থাবলীরও প্রচার ভালই হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-রচনা ও তার প্রকাশ হচ্ছিল ক্রমে ক্রমে। আমি যখন ১৮১৭ সালে কলেজে পড়তে আসি, তখন তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী' ও 'সোনার তরী' পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া কয়েকখানি নাটক, যেমন 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'মায়ার খেলা' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল সেই সময়। অনেকগুলি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত ছোটগল্পের সংখ্যাও কম ছিল না। তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রচনা যা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। যুবকেরা এবং সম্ভবতঃ যুবতীরাও এসব রচনা আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন। একবার এক সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বালক রবীন্দ্রনাথ যে সম্মান পেয়েছিলেন তার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখে গেছেন।

পূর্বেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমাদর হয় তাঁর গানে। তাঁর গান যুবকদের কণ্ঠে কণ্ঠে বহুদূর প্রচার হয়ে গিয়েছিল। সে সময় পর্যন্ত রবীন্দ্র-পূর্বযুগী যে কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ সবচেয়ে বেশী সমাদৃত ছিল সে হল হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রে প্রচলিত ধারা থেকে এত বিশিষ্ট ভাবে পৃথক যে তাতে পাঠকের মনে একটা সাড়া না দিয়ে পারে না। সে সাড়াটা যে সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল তা নয়। তাঁর অনেক সমালোচনা হত, গালাগালিও কম হয় নি। আর তাঁর একখানি বই কড়ি ও কোমল নিয়ে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বাঙ্গ করে একখানি ছোট বইও লিখে ফেলেছিলেন, তার নাম 'মিঠে কড়া'। 'রাহু' ছদ্মনামে লিখিত হয়েছিল বইটি। গান বাজনা কিংবা কবিতাপাঠের জন্যে লোকেরা বিশেষতঃ যুবকেরা সমবেত হলে,

প্রায় কথা উঠত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ-এর মধ্যে কে বড় কবি। এ নিয়ে তর্কও হত বিস্তর। তার মধ্যে আমার এক সমপাঠী বন্ধু অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল কলেজ স্ট্রীটের ওপরে। তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করে ঠিক করলেন যে, তাঁর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পথচারীদের এক এক করে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, কে বড়—হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র না রবীন্দ্রনাথ। এই উপায়ে পথচারীদের মত গ্রহণ করে তবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এটা হাসির কথা হলেও এক হিসেবে একে আধুনিক সাংবাদিকদের গ্যালপ পোলের অগ্রবর্তী বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের গান কিন্তু সকল বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করে বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের কণ্ঠে খুব চলতি হয়েছিল। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ তখনি অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এখনকার চলতি গান ধ্রুপদ এবং ধামার ইত্যাদি থেকে তখন সবচেয়ে নতুন নিধুবাবুর টপ্পা পর্যন্ত যা সব বৈঠকে গীত হত সেগুলির সুর ও তাল শাস্ত্রীয় মতে বিশুদ্ধ করবার চেষ্টা হত। রবীন্দ্রনাথের গান তখন যা বেরিয়েছিল তার মধ্যে ধ্রুপদাঙ্গ গান বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজে গীত হত। তা ছাড়া বেশীর ভাগ গান সুরে তালে অর্থডক্সি মানত না। কিন্তু তার মাধুর্য ছিল অসাধারণ। তাই প্রবীণ সুরজ্ঞদের অসন্তুষ্টি অগ্রাহ্য করে, ভাবের ঝোঁকে নিত্যনতুন সুরে ও তালে প্রচারিত হচ্ছিল সে সব গান। এতে যাঁরা সুরজ্ঞ বলে স্পর্ধা করতেন তাঁরা যে সে সময়ে নাসিকাকুঞ্চন করবেন, এ কিছু বিচিত্র নয়। আমার যে বালক-বন্ধুটি অভিনব পন্থার গ্যালপ পোল করে কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করতে চেয়েছিলেন, তিনি তখনই তবলা-বাদনে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কাছে গানের তালটাই ছিল প্রধান জিনিস। তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের বিচার করতেন ওস্তাদি মাপকাঠিতে, সুর-তালের বিশুদ্ধতা দিয়ে। যাঁরা সেকালে সঙ্গীতের চর্চা করতেন তাঁরাও ছিলেন এই দলে। কাজেই তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রতিষ্ঠা পায় নি। প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল যুবক-যুবতীদের কণ্ঠে। তাদের কোনো অনুষ্ঠানে গানের আয়োজন হলেই বেশীর ভাগ স্থলে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়া হত। তাঁর কবিতার সমাদরও সেই মাপে হয়েছিল। তাঁর কাব্যের ছন্দ, তখন পর্যন্ত প্রচলিত গাঁট বাঁধা ছন্দ ও মাত্রার নিয়ম পদে পদে লঙ্ঘন করে স্বচ্ছন্দ-বিচরণ করত। সেটা প্রাজ্ঞেরা পছন্দ করতেন না। কিন্তু সেই ছন্দের সাবলীলতা মুগ্ধ করেছিল বহুতর পাঠককে। রবীন্দ্রনাথ কি ছন্দে, কি গানে সুর, তাল ও ছন্দ সৃষ্টি করতে এসেছেন। কোনো শাস্ত্র বা বাঁধা নিয়মের দাস তিনি ছিলেন না। তাই তাঁর 'বরজ-লালে'র দল চলতি সুর-তাল ও ছন্দের মাপকাঠিতে তাঁর কাব্যের বিচার করতে গিয়ে তাঁর কাব্য-প্রতিভার রসগ্রহণ করতে অক্ষম ছিল। আর সেইজন্যেই নিন্দা ও বিরুদ্ধ সমালোচনার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাঁকে পথ তৈরি করে অগ্রসর হতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার লৌকিক সমাদর মুখে মুখে যতই হোক, তাঁর বইয়ের বিক্রী কিন্তু সে অনুপাতে প্রায় কিছুই হত না।

রবীন্দ্রনাথের তখনকার লেখা কবিতার বই বোধহয় সবগুলি তাঁদের পরিবারের নিজস্ব ব্রাহ্ম-মিশন প্রেসে ছাপা হোত এবং তখনকার মুষ্টিমেয় বইয়ের দোকানে দু-চার-খানা বিক্রী হত। তবে তা বেশী নয়, কেননা তখনকার দিনের লোকের বই কিনে পড়বার মানসিকতা বলতে গেলে ছিলই না। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রচার-সৌভাগ্য তখন কমই ছিল। তাঁর কোনো কবিতার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ তখন হয়েছে বলে আমার স্মরণ হয় না। গল্পের বই তাঁর তখনই অনেকখানি বেরিয়েছিল, কিন্তু তাও বেশী বিক্রী হয়নি। তাঁর গদ্যগ্রন্থ সমস্ত এক-সঙ্গে করে ছেপেছিল হিতবাদী অফিস থেকে। সে বইয়ের প্রচার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়েছিল, ঠিক যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের বেশী প্রচার হয়েছিল বসুমতী গ্রন্থাবলী প্রকাশের পর।

এইরকমই সস্তা সংগ্রহ-পুস্তক লভ্য হওয়ার ফলে বাংলা সাহিত্যের বই অত্যন্ত মন্থর-গমনে বেশী প্রচার হতে লাগল।

এরপরে ক্রমে বাঙালী পাঠকের বই পড়বার আগ্রহ বেড়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।

বাংলা সাহিত্যের এই অগ্রগতিতে সাময়িক সাহিত্যের কিছু হাত ছিল, বসুমতী ও হিতবাদীর বই-প্রচারে হাত দেওয়ার অনেক আগে থেকেই বঙ্গবাসী এবং তার সংশ্লিষ্ট 'জন্মভূমি' পত্রিকার দ্বারা অনেকগুলি বাংলা বই প্রচারিত হয়েছিল। বঙ্গবাসীর উদ্যোগে পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদনায় বহু শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদ ও মূল প্রকাশিত হয়েছিল। এক সময় কেবলমাত্র এই বঙ্গবাসী সংস্করণেই বাংলাদেশে সে-সব বই পাওয়া যেত। এরপরে আরো নতুন নতুন মাসিক সাহিত্য প্রকাশিত হতে লাগল। সুরেশ সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা পূর্ব-প্রচারিত পত্রিকাগুলির চেয়ে অনেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিল। তাতে লিখতেন যাঁরা তার মধ্যে ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি। উমেশচন্দ্র বটব্যাল বাংলায় বৈদিক গবেষণার পথিকৃৎ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' বোধহয় মাসিক সাহিত্যের সর্বপ্রথম উচ্চাঙ্গ পত্রিকা। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন ছেড়ে দেওয়ার পর বের হয়েছিল তাঁর জামাই রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রচার' পত্রিকা। যে-কদিন রাখাল-চন্দ্র চালক ছিলেন তখন 'প্রচারে' বঙ্কিম-চন্দ্রের অনেক লেখা বের হত। কিন্তু সে-কাগজ উঠে যাওয়ার পর সাহিত্য

পত্রিকার মত আর কোন কাগজ ছিল না। এরপরে সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত 'বান্ধব', বঙ্গবাসী অফিস থেকে প্রচারিত 'জন্মভূমি' কতকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু বাংলা মাসিক সাহিত্যে নতুন পথ দেখালেন এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রথমে সম্পাদনা করতেন দাসাশ্রমের মুখপত্র 'দাসী'। আমার সঙ্গে 'দাসী'র সংযোগ হয়েছিল যখন আমি স্কুলে পড়ি। সেই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের 'আবাসিক' ব্রাহ্মপ্রচারক ছিলেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তখন সাহিত্য পত্রিকায় উমেশচন্দ্র বটব্যাল একটি প্রবন্ধ লেখেন, 'রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল'। তাতে রামজয় বটব্যালের সঙ্গে রামমোহন রায়ের এক মামলার ফয়সালা বের হয়। সেই প্রবন্ধে বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে রামমোহন রায় রামজয় বটব্যালের নামে এক মামলা করে বটব্যালকে বিব্রত করেন। এই প্রবন্ধে রামমোহন রায়ের উপর দোষ চাপিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে, রামমোহন রায় ধর্ম-প্রবর্তক হিসেবে ধার্মিক ছিলেন না, ছিলেন সাধারণ মামলাবাজ একটি জমিদার। 'দাসী' পত্রিকায় 'সাহিত্যে'র এই প্রবন্ধের একটি উত্তর প্রকাশ করেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। আগেই বলেছি, আমি তখন স্কুলের ছাত্র। এই দুটি প্রবন্ধ পড়ে আমি একটা প্রত্যুত্তর লিখি, এর আগেও আমি শৈশব কাল থেকেই অনেক লেখা লিখে ছাপাবার জন্য সম্পাদকদের কাছে পাঠিয়ে দিতাম। বলা-বাহুল্য সে সব লেখা কোনো সম্পাদকই প্রকাশযোগ্য মনে করেন নি। আমি যখন মুঙ্গেরে ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি তখন ঐ প্রবন্ধটি 'দাসী'তে ছাপা হয়। আমার এই প্রবন্ধ হঠাৎ 'দাসী'তে প্রকাশিত হ'ল দেখে সেই শহরে বেশ একটু আলোড়ন হয়েছিল। সেই প্রবন্ধে আমি এ-কথাই প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলাম যে উমেশচন্দ্র বটব্যাল যে ফয়সালা লক্ষ্য করে রামমোহন রায়ের চরিত্রের উপর একটু কালিমা লেপন করবার চেষ্টা করেছেন তা ঠিক হয়নি, পক্ষান্তরে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ফয়সালার সত্যতা সম্পর্কে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তাও ঠিক নয়। সম্পাদক মহাশয়, আমি যে একজন আইনজ্ঞ বা পণ্ডিত লোক নই, মাত্র তেরো বছরের ছেলে এ সন্দেহ করেন নি। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে উত্তর লিখেছিলেন তাতে তিনি ধরেছিলেন হয় আমি উকিল নয়তো পণ্ডিত। আমার উপর শ্লেষ বর্ষণ করতে ত্রুটি করেন নি। সেই আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা। এ-রকম ভাবে প্রকাশিত হওয়ায় আমি বেশ একটু গর্ব অনুভব করেছিলাম।

'দাসী' উঠে যাওয়ার কিছুদিন পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আবার আবির্ভূত হলেন 'প্রদীপ' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদকরূপে, রামানন্দবাবু তখন কিংবা তার কিছুকাল পরে এলাহাবাদে অধ্যাপক হয়ে যান। 'প্রদীপ' তারপর কিছুকাল চলে বৈকুণ্ঠনাথ দাশের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে। এই সময় এলাহাবাদ থেকেই রামানন্দবাবু 'প্রবাসী' নামে এক মাসিকপত্র বের করেন। মাসিক সাহিত্যে 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী' সম্পূর্ণ নতুন। রামানন্দবাবু এই উন্নততর ধারার প্রবর্তন করেন ও বিশেষ প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেন। পরে এই প্রবাসী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ক্রমশ প্রকাশিত হওয়ায় তার প্রতিষ্ঠা ও প্রচার অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

প্রবাসী প্রকাশের আগে আর একখানি কাগজ বের হয়েছিল, বঙ্গদর্শন নব-পর্যায়। প্রকাশক ছিলেন শৈলেশচন্দ্র মজুমদার-পরিচালিত মজুমদার লাইব্রেরী। শৈলেশবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু এবং তাঁকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'মানসী'তে আছে। তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর সাহিত্য রচনার দিকেও ঝোঁক ছিল। রবীন্দ্রনাথের সহযোগে তিনি বৈষ্ণব কবিতা নিয়ে একখানা কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন। শৈলেশচন্দ্র নিজে একখানা গল্পের বই লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের পরিবারের খুবই হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। তাঁদের এই উদ্যমে রবীন্দ্রনাথ শুধু উৎসাহই দেন নি, তাঁর সহযোগিতাও দিয়েছিলেন। নব-পর্যায়

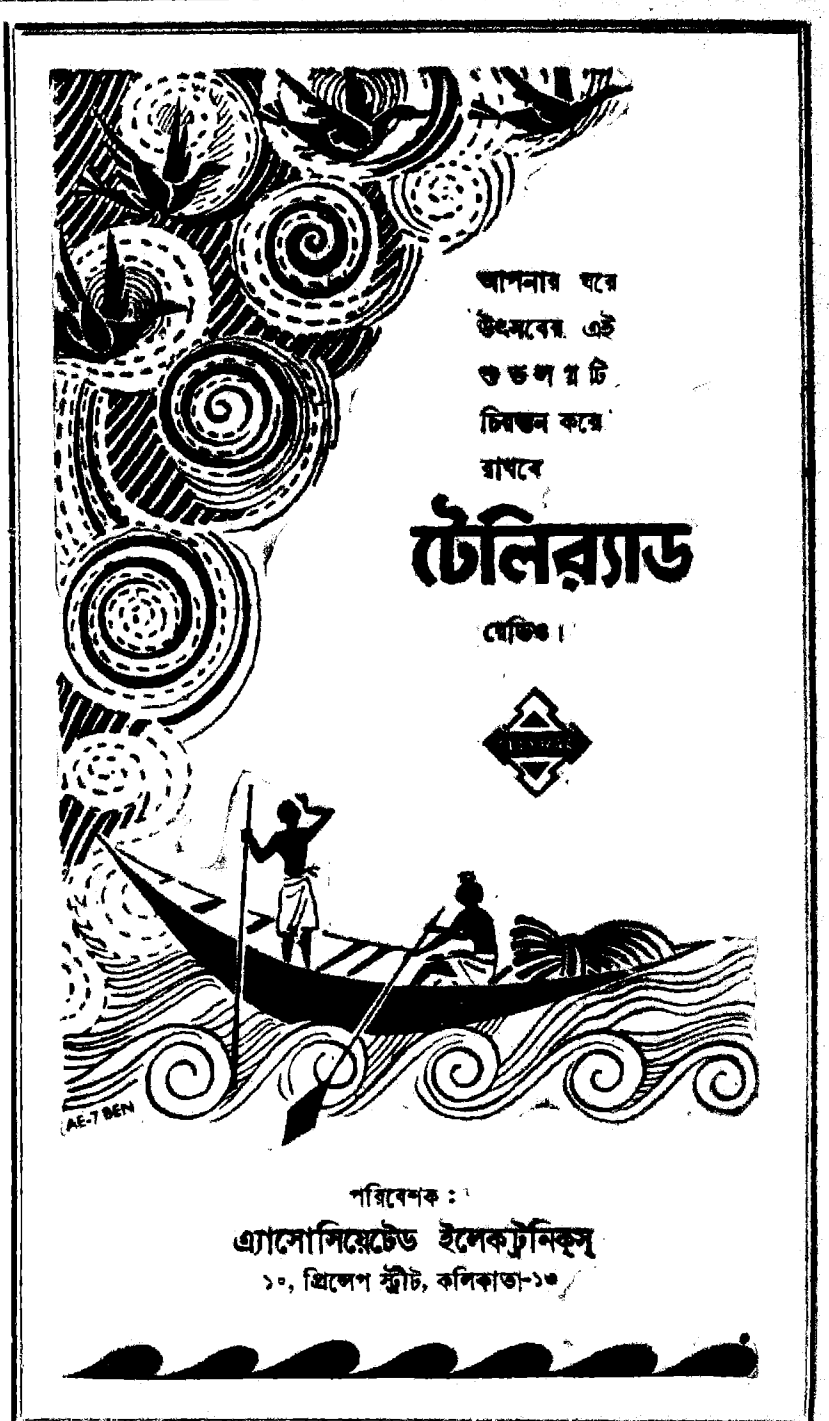

জলপথে চল্

ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

বঙ্গদর্শনে প্রধান আকর্ষণ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের এই সহযোগ। তিনি হলেন এই মাসিকের সম্পাদক এবং এতে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর নতুন লেখা উপন্যাস 'চোখের বালি' আর 'নৌকাডুবি'। এ-দুখানি বই রবীন্দ্র-রচনায় একটি নতুন ধারার প্রবর্তক। চোখের বালি এবং নৌকাডুবি বাঙালী পাঠককে বেশ চমক দিয়েছিল এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এই নতুন আবির্ভাব তখনকার পাঠকদের বেশ উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিশেষ করে যুবকদের। যদিও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বইয়ের মতন এ-বইয়েরও বিরুদ্ধ সমালোচনা ছিল। নারী-চরিত্রের যে নতুন পরিচয় এই বই দুটিতে পাওয়া গেল, তা নিয়ে বেশ কিছু বিরূপ সমালোচনা হল। নীতি-বিরুদ্ধতা নিয়ে একাধিক কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত হল। তখনও আমি ছাত্র-পর্যায়েই ছিলাম। আমাদের সহপাঠী ও বন্ধুদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই নতুন সৃষ্টি নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হ'ত। বিরুদ্ধ আলোচনা কিছু ছিল বটে, কিন্তু এ-বই দুটি তখনকার যুবকদের খুব প্রশংসাভাজন হয়েছিল।

নব বঙ্গদর্শনের সঙ্গে আমার একটু সংযোগ ছিল। শৈলেশবাবুর অনুরোধে আমি সে কাগজের জন্য একটি গল্প লিখেছিলাম। 'মুগ্ধা' নাম দিয়ে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেইটেই ছিল আমার প্রথম প্রকাশিত গল্প। নব বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের লেখায়ও কিছু ছেদ পড়ল। তাঁর এর পরের বই হ'ল 'গোরা'। সে-কথা আগেই বলেছি।

প্রবাসী ইতিমধ্যে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন রামানন্দবাবু। এক বৎসর ধারাবাহিকভাবে চলে, বৎসরের শেষেও গোরা সম্পূর্ণ না হওয়ায় এর অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী বৎসরে ধারাবাহিকভাবে চলতে লাগল। প্রবাসী পত্রিকার পর বৎসরের সংখ্যার সঙ্গে গোরার পূর্বমুদ্রিত অংশ একটা পুস্তকাকারে ছাপিয়ে গ্রাহকদের কাছে বিক্রী করা হল। তখন প্রবাসীর অফিস ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশে ছোট একটি ঘরে। পুনর্মুদ্রিত গোরার সঙ্গে পরবৎসরের প্রবাসী পাওয়ার জন্য গ্রাহকেরা যে ভিড় করে সেই ঘরে যেতেন সে কথা আমার খুব স্পষ্ট করে মনে আছে। আমিও ছিলাম সেই ভিড়ের মধ্যে একজন। এর পূর্বে কোনো বই সংগ্রহ করবার জন্য এত লোকের ভিড় বোধহয় কখনো হয়নি।

এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ বেশ নিয়মিতভাবে তাঁর অন্য রচনাও লিখে যেতে লাগলেন এবং তাঁর রচনায় প্রবাসীর পরবর্তী লোকপ্রিয়তার মাত্রা অনেক পরিমাণে বেড়ে গেল।

প্রবাসী আরো অন্য একটা বৈচিত্র্য এনেছিল—তা উচ্চস্তরের প্রবন্ধাদি এবং চিত্রাবলী। তার আগে কোন কাগজ এতগুলি ভালো ছবি নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে নি। সেরকম ছবি প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। আগে বাংলা বইয়ে যে-সমস্ত ছবি ছাপা হোত, তার সৌন্দর্য কিছুই ছিল না। আগে ছবি ছাপবার একমাত্র উপায় ছিল Wood Block, কাঠ-খোদাই করে। আর সে কাঠ-খোদাইও বিশেষ সুন্দর হ'ত না। সেকালের মুদ্রিত 'রামায়ণ-মহাভারত' কিংবা পাঠ্য-পুস্তকে যে-সব ছবি ছাপা হত তার বেশীর ভাগই ছিল অত্যন্ত কদর্য। রঙীন ছবি কেবলমাত্র 'লিথোগ্রাফ' করে ছাপা হত। সেই প্রণালীতে ঠাকুর-দেবতা বা পৌরাণিক কাহিনীর ছবি Arts Studio তৈরী করতেন। বাংলাদেশে তা' ছাড়া অন্য কোনো ভালো রঙীন ছবি হ'ত না। প্রবাসীর জন্মের কয়েক বৎসর আগেও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রথম বাংলাদেশে 'হাফটোন' ছবি বের করেন। ক্রমে তিন বা তার চেয়ে বেশী রঙয়ে হাফটোন ছবি তৈরী হতে লাগল। প্রবাসী কাগজে প্রথম উপেন্দ্রকিশোর রায়ের রঙীন হাফটোন ছবি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল এবং এই চেষ্টায় 'প্রবাসী' প্রচুর সফলতা অর্জন করল। অজন্তা ইত্যাদি স্থানের প্রাচীন রঙীন ছবি, যা এখনো পৃথিবীর বিস্ময়, তার সঙ্গে বাঙালী পাঠক পরিচিত হলেন প্রথম প্রবাসীর মাধ্যমে। ক্রমেই অন্যান্য উৎকৃষ্ট চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হওয়ার ফলে ভারতের এবং অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ চিত্র-সম্পদের সঙ্গেও বাঙালী পাঠকের পরিচয় হল।

এর আগেও বাংলায় এবং ভারতে রঙীন ছাপানো ছবি বিক্রী হ'ত। সেগুলি প্রায় সবই বিলেতী, ফরাসী দেশের ওলিওগ্রাফই প্রধানতঃ। বাঙালী ও ভারতীয় সকলেই সেইগুলি দিয়ে নিজেদের চিত্র-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করত। ভারতীয় প্রাচীন চিত্রে যে-বিশেষ সৌন্দর্য আছে সে-সম্বন্ধে তখনো এ-দেশে বিশেষ জ্ঞান হয়নি। তাই এর কিছুদিন পরেও লর্ড কার্জন যিনি ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন—তিনি আক্ষেপ করে বলেন যে, তিনি অনেক রাজা-রজরার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে দেখেছেন যে তাঁদের বাড়ীতে গৃহসজ্জার মধ্যে ভারতীয় আর্টের কোন নিদর্শন নেই। তিনি দেখেছিলেন Flaming brussels, French-made oliograph এবং Tanghtenhum court road furniture। দেশীয় লোকের ভারতীয় আর্ট-এর প্রতি এই ঔদাসীন্য ও বিদেশী নিকৃষ্ট আর্টের প্রতি আদর তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। বাংলাদেশে কিংবা কলকাতাতেও ভালো আর্টের পরিচায়ক চিত্রাবলীর যে একান্ত অভাব ছিল তা' নয়, কলকাতায় ছিল Indian Arts School-এর সম্পৃক্ত একটা Art গ্যালারী। তাতে ছিল ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পগুরুদের আঁকা ছবি। তাছাড়া কলকাতার বড় বড় লোকদের বাড়ীতেও ছিল কতকটা এমনি ইউরোপীয় আর্টিস্টদের আঁকা ছবি। কিন্তু কোথাও ভারতীয় কিংবা পূর্বদেশীয় আর্টিস্টদের শ্রেষ্ঠ আর্টের কোনো নমুনা ছিল না।

এই সময় হ্যাভেল ছিলেন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। আমরা একদিন খবরের

কাগজে দেখলাম যে আর্ট গ্যালারীতে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টদের যেসব ছবির নমুনা ছিল সেগুলি অধ্যক্ষের আদেশে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই নিয়ে খবরের কাগজে গালাগাল দেওয়া হয়েছিল। আমরা বাইরে থেকে আমাদের প্রচুর অজ্ঞতা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এই কার্যের নিন্দা করলাম। আমাদের প্রথম চোখ খুললে রবীন্দ্রনাথের এক প্রবন্ধে। তাতে ভারতীয় চিত্রকলার উৎকর্ষ এবং তার সঙ্গে আমাদের দারুণ অপরিচয় নিয়ে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে তিনি ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শন আর্ট গ্যালারীতে টাঙাবার জন্য বিদেশী চিত্রগুলি সরিয়ে ফেলার প্রশংসাও করেছিলেন।

এই সময় থেকে ভারতীয় চিত্রকলার প্রসার ও প্রশংসা ক্রমশ বেড়ে গেল। একদিকে হ্যাভেল-সাহেবের ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি তীব্র অনুরাগ, অন্যদিকে লর্ড কার্জনের ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি বিশেষ পক্ষপাতের ফলেই এই অবস্থা ঘটেছিল তা স্বীকার করতে হবে।

এই সময়ে ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তাঁর অনুরাগী শিষ্যদলের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলার চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ নিজে এবং নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পানুরাগীর দল সেইখানে বসেই অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন, যা আর্টিস্টদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। (আমার যতদূর মনে পড়ে, অবনীন্দ্রনাথ তখনো আর্ট কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হননি।) প্রবাসীতে এইসব ছবি এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের তৎকালীন ও প্রাচীন চিত্র রঙে ছাপা হয়ে ক্রমাগত প্রকাশিত হতে লাগল। অজন্তার গুহা-চিত্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, এবং অনেকেরই প্রথম পরিচয়, হয়েছিল প্রবাসীর মাধ্যমে। তা' ছাড়া মুঘল-চিত্র, রাজপুত-চিত্র বহুল পরিমাণে প্রবাসীতে বের হয়েছিল। হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলা প্রসারের জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন তার পাশে প্রবাসী পত্রের এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ফলবতী হয়েছিল। প্রবাসীর সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দবাবুর সম্পাদিত মডার্ণ রিভিয়ুতেও এ-সব চিত্র ছাপা হ'ত। এর ফলে তখন লোকসমাজে ভারতীয় ও পূর্বাঞ্চলের চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ বিপুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল।

প্রবাসীর পরে বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে অনেক মাসিক পত্রিকা বের হয়েছিল। সেগুলি সব ব্যাঙের ছাতার মত অসার্থক সৃষ্টি ছিল না, কিন্তু যা কিছু সার্থক পত্রিকা দেখা দিচ্ছিল তার প্রবর্তন হচ্ছিল প্রবাসীর আদর্শেই। তার মধ্যে একটু বেশী সাড়া জাগিয়েছিল 'ভারতবর্ষ'। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স এই পত্রিকা প্রকাশ করবেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পাদক হবেন একথা আগের থেকেই প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হবার আগেই দ্বিজেন্দ্রলাল মারা যান। তাঁর জায়গায় জলধর সেন সম্পাদক হন। জলধর-বাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এই কাজ তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই পরিচালনা করেছেন।

ভারতবর্ষ কাগজ বের হবার সময় থেকেই আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। খুব গোড়ার দিকেই আমি প্রবন্ধ লিখি, এবং তার মধ্যে একটি প্রবন্ধে আমার বেশ একটু খ্যাতি হয়েছিল। সেই প্রবন্ধ পড়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমাকে বিশেষ প্রশংসা করেন ও উৎসাহ দেন। বলাবাহুল্য এর পরে তাঁর সংকল্পিত সবুজ পত্রে আমাকে লিখতে বলেন। আমি তখন ঢাকায়। সেখান থেকে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতাম সবুজপত্রে।

সবুজ পত্র যে সেকালে কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সেকথা এখনো সকলেই স্মরণ করতে পারবেন। তা'তে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁর নিজের ভাষায় যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার ফলে বাংলা ভাষায় এক নতুন ধারা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। এর ফলে নিশ্চয়ই সবুজ পত্রের প্রসার অনেক বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার প্রতিপত্তির প্রধান কারণ ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা। রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন পর সবুজ পত্রে লিখতে আরম্ভ করলেন। প্রথম উদ্বোধন করলেন "ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা" কবিতায়। তখন তিনি অল্পদিন আগে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে ইউরোপ-ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেছেন। তখনকার লেখায় একটা সম্পূর্ণ নতুন ধারা ফুটে উঠল। 'চোখের বালি' থেকে 'গোরা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গতি দেখে অনেকে ভেবেছিল যে তিনি বোধহয় সাধারণ হিন্দু-সমাজের চিন্তাধারার অনুবর্তী হয়ে পড়ছেন। কিন্তু সবুজ পত্রে যে লেখা বেরুল তাতে সে সন্দেহ একেবারে দূর হয়ে গেল। সবুজ পত্রে যেসব গল্প প্রকাশিত হয় তার অনেকগুলি ইউরোপীয় সাহিত্যের নবতম চিন্তার অনুকূল ছিল। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিতে ইবসেনের ডল্‌স্ হাউস-এর প্রচুর ছায়াপাত আছে। পরে 'চতুরঙ্গে'র চারটি গল্প সে সময়ের ইউরোপের সা মা জি ক স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত। তারপর এল 'ঘরে-বাইরে'। এটা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উপন্যাস, যা পাঠকসমাজকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। এই সময়কার অন্যান্য অনেকের লেখার মধ্যে একটা তীব্র প্রগতির চেষ্টা আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে অবশ্য সর্বাগ্রগণ্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমবাবু মারা যাবার পর কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটা জড়তা এসে গিয়েছিল। উপন্যাস ও গল্প প্রকাশিত হ'য়েছিল অনেকগুলি, মাঝে রবীন্দ্রনাথও ভালো বই লিখলেন। কিন্তু জনসাধারণের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর মতো সাহিত্য-সম্রাট পদবীর যোগ্য কেউ হননি, রবিবাবুর লেখা যারা পছন্দ করতো, তারা তাঁকে ভালোই মনে করতো। কিন্তু বঙ্কিম-চন্দ্রের মত উত্তুঙ্গ গৌরব কেউ পাননি। নব-পর্যায়ে বঙ্গদর্শনের আগে রবীন্দ্রনাথও কোন পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখেন নি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সগৌরবে প্রতিষ্ঠা হবার আগে পর্যন্ত অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যের ছায়াপুষ্ট গল্প। তার মধ্যে দু'চারজনের বেশ একটু বৈশিষ্ট্যও ছিল। আমার নিজের অন্তত তখনকার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখক ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ লিখতেন খুব কম এবং ধীরে ধীরে। কিন্তু যখন তিনি লিখতেন, তখন কারো সন্দেহ থাকত না তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে। গত পঞ্চাশ বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি ছিলেন এক বিরাট মূর্তি। তাঁর হাতেই বাংলাভাষা, কাব্য ও প্রবন্ধাদি অসাধারণ পরিপুষ্টি লাভ করেছে। এই পরিপুষ্টি ও প্রতিষ্ঠা শুধু একদিকে নয়, সকল দিক দিয়েই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে সাহিত্য চলিত ছিল তা যতই ভালো হোক, সে ছিল আংশিক। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুকারীগণ তাকে একটা সর্বাঙ্গীণ পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছেন। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে একটা তীব্র প্রগতির স্রোত বয়ে গিয়েছে। এর ফলে আমরা পেয়েছি, অপূর্ব পরিণত ভাষা ও সাহিত্য যা প্রতিদিনই উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

বিজ্ঞান ভিত্তিক রহস্যোপন্যাস

# মনু দ্বাদশ

## সুরেন্দ্র মিশ্র

পিতামহ ব্রহ্মার অহোরাত্রে এক কল্প
এক কল্পে চতুর্দশ মনু
দ্বাদশ মনু
রুদ্রসাবর্নি

## প্রথম উল্লাস
### অন্ধচটক

গহন অরণ্যই বলা যায়।

লতায় পাতায় পুঁড়িতে শিকড়ে ঝুরিতে জড়াজড়ি মৃত্যুর ফাঁদ।

অরণ্য আর জলা। সন্ধ্যার লোহিতাভ আকাশ ঘন অরণ্যের পত্রজাল ভেদ করে তার ওপর প্রতিফলিত। মনে হয় যেন অরণ্যের গা বেয়ে ফিকে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে ওখানে জমা হয়ে আছে।

অরণ্যের আবছা অন্ধকার থেকে একটা প্রাণীকে ছুটে এসে একটা জলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেল।

যেখানে জলা সেখানে আলোর তেমন অভাব এখনো নেই।

প্রাণীটার আকার দেখে প্রথমে বোঝা যায় দ্বিপদ জীব কোনো। তারপর চেনা যায় মানুষ বলে। মানুষের প্রায় আদিম নগ্ন চেহারা, শুধু পশুচর্মের জায়গায় হাতে-বোনা একপ্রকার বস্ত্রে যৎসামান্য কটিদেশ আবৃত। হাতে তার একটা হাতিয়ার গোছেরই আছে মনে হয়।

অগভীর জলা। মানুষটা তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কখনো সাঁতরে কখনো জল ঠেলে নিচের কাদার ওপর দিয়ে যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সভয়ে এগিয়ে যায়।

সে কিছুদূর গিয়ে একবার ফিরে তাকায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফাঁস দেওয়া একটি রজ্জু তার ওপর অব্যর্থ লক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। চক্ষের নিমেষে সে ফাঁস তার মাথা দিয়ে গলে তার দুটি বাহু সমেত দেহটাকে সুদৃঢ় বন্ধনে বন্ধন করে।

তারপর চলে টানাটানি।

মানুষটা প্রাণপণে কাদার মধ্যে পা দিয়ে চেষ্টা করছে সে প্রচণ্ড আকর্ষণের বিরুদ্ধে যোঝবার। কিন্তু কাদায় পা বসাবার মত দৃঢ় আশ্রয় নেই, ক্রমাগতই পিছলে যায়। হাত দুটি তার উপরন্তু দড়ির ফাঁসে বাঁধা পড়ে অকর্মণ্য। ধীরে ধীরে বঁড়শিতে গাঁথা মাছের মত দেখা যায় সে অসহায়ভাবে তীরের দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে। সন্ধ্যার রঙে রাঙা জলার জল ঘোলাটে কর্দমাক্ত হয়ে উঠছে তার নিষ্ফল সংগ্রামে।

এমন নির্মম দড়ির ফাঁসে কে তাকে টানছে?

কে নয় কারা?

জঙ্গল যেখানে জলার ধার পর্যন্ত নেমে এসেছে সেখানে দুটি মূর্তিকে দেখা যায়। বলিষ্ঠ হাতে তারা অমোঘভাবে শিকারকে একটু একটু করে তাদের কাছে টেনে আনছে।

চারটি বলিষ্ঠ হাত কিন্তু পেশীবহুল কর্কশ নয়। কেমন যেন একটু পেলব। সৌষ্ঠবের আভাস সে বাহুতে আছে। থাকা অস্বাভাবিক নয়, কারণ বলিষ্ঠ হাতে ফাঁস দেওয়া রজ্জুতে শিকারকে যারা টানছে তারা স্পষ্টই পুরুষ নয় স্ত্রীলোক।

নারীমূর্তি দুটিও যেন আদিম। লজ্জা নিবারণের মত সামান্য দেহবাস আছে মাত্র। তাতে সুগঠিত নারীদেহের রূপ আরো ভালো করে ফুটে উঠেছে।

এ রূপ বিস্ময়কর, কোমলে কঠিনে মিলে অপরূপ।

দুই নারীমূর্তি একদিক দিয়ে যেন পরস্পরের বিপরীত। একজনের চুল স্বর্ণাভ, দেহবর্ণও সুগৌর আর একজনের মাথার কালো কেশ মেষলোমের মত কুঞ্চিত, গায়ের রঙও নিকষকৃষ্ণ। কোন কবি উপস্থিত থাকলে হয়ত ভাবতে পারত একজন যেন ঊষা ও অন্যজন রাত্রি।

এই দুই নারীকে একত্র দেখবার মত একটি মাত্র যে পুরুষ সেখানে উপস্থিত তার মধ্যে কবি-কল্পনা যদি থাকত, তবু উপমা ভাবার মত তখন তার অবস্থা নয়। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তখন তার বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ব্যস্ত।

শেষ পর্যন্ত মুক্তি সে পেল। পেল তার হাতের হাতিয়ার-টুকুর কল্যাণে। হাতিয়ারটা ছোরাও নয় তলোয়ারও তাকে বলা যায় না। মাঝামাঝি একটা হ্রস্ব-কৃপাণ জাতীয় অস্ত্র। নারী শিকারীরা যখন তাকে সবলে টানছে তখন কোনরকমে হাতের হাতিয়ারটা শুধু কব্জির জোরে খাড়া করে রেখে ফাঁসের দড়িতে সে ঘর্ষণ করবার চেষ্টা করে গেছে। দড়িটার দু-একটা বুনন কেটে যেতেই দেহের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে বাধনটা সে ছিঁড়ে ফেললো। তারপর উন্মত্তের মত হাত-পা ছুড়ে দাঁতরে জলার অপরপারের দিকে এগিয়ে গেল।

কাটা ছেঁড়া ফাঁস নতুন করে তৈরী করে আর তখন ছোড়বার বোধ হয় সময় নেই। শিকারী মেয়েদুটিকে কিন্তু শিকার ফসকে যাওয়ায় তেমন রুষ্ট বা হতাশ বলে মনে হল না। ছেঁড়া ফাঁসের

দড়ি গুটিয়ে নিতে নিতে দুজনেই তখন হাসছে খিল খিল করে।

ফাঁসের দড়িটা গোটানো অবস্থায় কৃষ্ণা মেয়েটিই কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে নিয়ে বললে, এটাও ফসকালো তাহলে!

ফসকাবে না! শুভ্রা মেয়েটি হেসে বললে, বেরুবার সময় ওই অপয়া নিকিটাকে দেখলাম না!

এ তোর অন্যায় নাশা! মেয়েটি ভৎর্সনার স্বরে বললে, নিকি যদি অপয়া হয়ত আমরা কি? পেরেছি এ পর্যন্ত একটা কাউকে ধরতে?

আমরা ধরতেই পারিনি। আর নিকি যে ধরেও ফক্কা! গৌরাঙ্গী নাশা হাসতে হসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, আমি তোকে বলে রাখছি লুনা, এই নিকি যে কি সাংঘাতিক মেয়ে নেতামাও একদিন বুঝবেন। ওকে কিরকম আস্কারা দেন নেতামা দেখেছ ত। অথচ ওকে আখড়াইতে জায়গা দেওয়াই উচিত নয়। ওর গায়ে গামা-ঘা বেরোয়নি কখনো জানিস ত।

কৃষ্ণকায়া লুনা কৌতুকভরে নাশার দিকে তাকিয়ে হাসল শুধু।

সেটা ওর কলঙ্কর বদলে সৌভাগ্যও ত হতে পারে। হাতের ধারালো কিরিচের মত অস্ত্র দিয়ে জঙ্গলের জড়ানো একটা লতায় কোপ দিয়ে লুনা পথ পরিষ্কার করে নিলে। তারপর হেসে বললে, নেতামার কাছে ওই জন্যেই হয়ত ওর আদর।

আবোল-তাবোল বকস্‌নি লুনা। মাঝে মাঝে তোকেও আমার কেমন বেজাত লাগে। গামা-ঘা যার নেই তার ত সমাজেই জায়গা হওয়া উচিত নয়। সে অচ্ছুত। কাফ্রামদের কার গামা-ঘা নেই বা হয়নি বলতে পারিস! শুনেছি ইউরুশ প্রভারদেরও গামা-ঘা না থাকলে মান থাকে না।

লুনা হেসে বললে, আর নেতামার কাছে এও কি শুনিস নি যে এককালে গামা-ঘা কাকে বলে মানুষ জানত না।

ও সবও গাঁজাখুরী উপকথা! নাশা বিরক্তই হয়ে উঠল, তাহলে ত মানুষ একদিন সব জায়গায় গিজগিজ করত, পাহাড়ের মত কুঁড়ে বেঁধে থাকত, পাখিদের মত আকাশে উড়ত, এসব ছেলেভুলোন গল্পও সত্যি বলে মানতে হয়, বিশ্বাস করতে হয় যে আমাদের মত আখড়া করে নয়, মেয়ে-পুরুষ একদিন জোড়ায় জোড়ায় থাকত।

তোর এসব বিশ্বাস হয় না নাশা!

তোর হয়?

না, ঠিক হয় না। তবে ভাবতে ভাল লাগে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ইতিমধ্যে গাঢ় হয়ে এসেছে। আকাশে মেঘের রক্তিমা গেছে মিলিয়ে। অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ চিনে যাবার চেষ্টাতেই কালা-ধলা দুই সখীর আনন্দে ছেদ পড়ল।

## দ্বিতীয় উল্লাস
## অশোকবনিকা

ফাঁস-দেওয়া দড়ির বাঁধন ছাড়িয়ে যে মানুষটা জলা পার হয়ে গেছল। তাকেও সন্ধ্যার অন্ধকারে জলার ওপারে ছুটতে দেখা গেল।

জলর এপারে অরণ্য আর ততো ঘন নয়। কিন্তু ক্রমশঃ ঘনায়মান রাত্রি আকাশ ও মাটি একাকার করে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই।

এরকম অন্ধকারে বনপথে চলাফেরায় লোকটা যে অনভ্যস্ত নয় তা তার প্রায় স্বচ্ছন্দ দ্রুতগতিতেই বোঝা গেল। কিন্তু এ অঞ্চলটা তার বোধহয় অপরিচিত।

অন্ধকারের মধ্যে অদূরে একটা ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠতেই চমকে থেমে যাওয়ায় তা প্রমাণিত হ'ল।

আলোটা দেখে দ্বিধাগ্রস্তভাবে কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল। একবার আলো যেদিকে দেখা গেছে তার বিপরীত দিকে কয়েক পা ছুটেও গেল সে। কিন্তু সেখানে আবার থেমে পড়ে কৌতূহল-বশেই বোধ হয় সন্তর্পণে আলোর দিকেই আবার অগ্রসর হ'ল।

আলো যেখান থেকে দেখা গেছল কাছে যেতে সেটা ছোট-খাট একটা বসতি বলেই মনে হ'ল। অন্ধকারে কয়েকটি কুটীরের আয়তন শুধু বোঝা যায়। কুটীর কটির চারিধারে নিচু জংলী গাছের বেড়া।

আলোটা একটি কুটীরের ফাঁক দিয়েই আসছে। লোকটা কিছুক্ষণ বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে জায়গাটা ঠাহর করবার চেষ্টা করলে। তারপর ফিরে যাবার জন্যে দু'পা বাড়িয়েই ভয়ে একেবারে যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কে একজন বাইরে থেকে এদিকেই আসছে। জঙ্গলের লতাগুল্মে তারই পায়ের শব্দ।

নিঃশব্দে রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও আগন্তুক তার উপস্থিতি টের পেয়েছে বোঝা গেল।

জিজ্ঞাসা করলে, কে ওখানে?

গলার স্বরে পুরুষ বলেই বোঝা গেল। শুধু তাইতে নয় পরিচয় জিজ্ঞাসার অনুগ্রধরণেও লোকটা আশ্বস্ত হ'ল কিনা কে জানে!

তার জবাবে অন্ততঃ রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের আভাস আর পাওয়া গেল না।

প্রাভার বুবন। সে অকম্পিত কণ্ঠে জানালে।

বুবন! আগন্তুকের কণ্ঠে বিস্মিত আনন্দই প্রকাশ পেল এবার।

দ্রুতপদে সে কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

বুবন নিজের অনিচ্ছাতেও স্বাভাবিক সাবধানতায় একটু পিছিয়ে গেছল কিন্তু আগন্তুকের পরের কথায় তারও আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল।

ভয় পাবার কিছু নেই বুবন। আমি দুরু!

দুরু! তুমি এখানে? বুবন এগিয়ে গিয়ে সবিস্ময়ে দুরুকে জড়িয়ে ধরলে।

আলিঙ্গনবদ্ধ দুরু বললে,—সে কথা আমিই ত তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই। কিন্তু এখানে নয়, ভেতরে চল। আমার নিবাসে।

তোমার নিবাস এখানে! দুরুর সঙ্গে বাইরের বেড়ার একটি আগড় সরিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বুবন বিস্ময় প্রকাশ করলে।

উত্তর না দিয়ে দুরু তাকে যে কুটীরটি থেকে আলো দেখা গেছল তারই ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটি কাষ্ঠাসনে বসতে ইঙ্গিত করলে।

বুবন কিন্তু বসল না। চারিদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে মাটি ও জংলীগাছের তৈরী সুনির্মিত ঘরটিকে পর্যবেক্ষণ করে বললে, বসব কি! এ তোমার নিবাস কি বলছ! প্রাভার শিবির থেকে তুমি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছ আজ প্রায় পঞ্চদশ পূর্ণিমা। তুমি জঙ্গলে কোন দুর্ঘটনায় মারা গেছ বা কাফ্রামরা তোমায় ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে বা বন্দী করেছে—এই ত আমরা সবাই ভেবেছি! তোমার পর অবশ্য আজিব আর নন্দকও জঙ্গলে হারিয়ে যায়। শিবির থেকে দূরে কোথায় যেতেই আজকাল কেউ সাহস করে না।

দুরু বাধা দিয়ে হেসে বললে,—তাহলে তুমি এতদূর আজ এসেছ কোন সাহসে!

সে কথা সবই বলছি পরে। কিন্তু শিবির থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে আর সেখানে ফিরে যাওনি কেন? এখানেই বা নিবাস নির্মাণের মানে কি?

মানে শিবিরে আর ফিরে না যেতে চাওয়া। দুরু একটি কাষ্ঠাসনে বুবনকে একরকম জোর করেই বসিয়ে তার পাশে জায়গা নিয়ে বললে, যারা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে ভেবেছ সেই আজিব ও নন্দকও আমার সঙ্গেই এখানে আছে।

তারাও এখানেই আছে! আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না দুরু। শিবিরে তোমাদের ওপর কোন অত্যাচার কি উৎপীড়ন ত হয় নি। তবু কোন দুঃখে বা আক্রোশে এখানে এসে তোমরা লুকিয়ে আছ!

লুকিয়ে আছি বলতে পারো অবশ্য! দুরু হাসল, কিন্তু দুঃখে বা আক্রোশে নয়। শুধু নিজেদের কাজ নির্বিঘ্নে করবার অবসর পাবার জন্যে। শিবিরে আমাদের ওপর কোন অন্যায় শাসন অবশ্য ছিল না। এখানে যা করছি তা সেখানেও করা যেত না এমন নয়। কিন্তু এমন নির্বিঘ্ন নিরুদ্বেগ শান্তি সেখানে পেতাম না। শিবিরে থাকবার একটা গোষ্ঠীগত দায়িত্ব আছে। আমাদের পরমায়ু কতটুকু আর। সে দায়িত্ব পালনের সময়টুকুও আর নষ্ট করতে চাই না।

তা চাও না বুঝলাম! বুবন অস্থিরভাবে এবার উঠে দাঁড়াল,—কিন্তু নির্বিঘ্নে যে কাজ করবার কথা বলছ সেটা কি?

সেটা কি তা তোমার অনুমান করা উচিত ছিল। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তাই আমার নেশা।

ওঃ তোমার সেই ইতিহাস-উদ্ধার! বুবনের গলায় বিস্ময়ের সঙ্গে অবজ্ঞার আভাসটুকুও পাওয়া গেল।

হ্যাঁ তাই। আমাদের প্রাভার শিবিরে এ নেশা হাস্যকর। একমাত্র ইওসোভেদের কারুর কারুর এই নিরর্থক খেয়াল আছে বলে জানি। তাদের একজনের সঙ্গে ছাড়া আমার কোনদিন এ বিষয়ে আলাপ করার সৌভাগ্য হয় নি। শিবিরে থাকলে এ নেশায় একাগ্র হয়ে থাকতে পারতাম না। আমার নিজেরই কর্তব্যবুদ্ধিতে বাধত। তাই এমন করে চলে এসেছি।

তুমি না হয় ইতিহাস খোঁজবার নেশায় এসেছ কিন্তু আজিব ও নন্দক! তাদের শিবির ছাড়বার কারণ?

কারণ এক না হলেও একই জাতের। তবে আমার চোখ পেছনে আর আজিব ও নন্দকের দৃষ্টি সামনে। আজিব চায় কাফ্রাম প্রাভার আর ইওসোভ এই তিন শিবিরের মধ্যে ঘৃণা সন্দেহ শত্রুতা ঘুচিয়ে এক মিলিত সমাজ তৈরী করতে আর নন্দক সে সমাজকে চায় বিলুপ্তি থেকে বাঁচাতে।

একই হোক আর আলাদাই থাক বিলুপ্তি ঠেকাতে পারবে না কেউ। প্রাভার শিবিরে গত পোনেরো বৎসরে একটা শিশু নেখেনি তা জানো। কাফ্রাম আর ইওসোভদের অবস্থা আরো শোচনীয়। শিশু একটা দুটো সেখানে জন্মেছে কিন্তু তাদের বাঁচন যায় নি। সুতরাং আর পোনেরো কি বড় জোর কুড়ি বছর বাদেই মানুষ নামে কোন প্রাণী আর থাকবে না।

দুরুর মুখে বুঝি একটু হাসি ফুটে উঠেছিল। তা দেখে একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বুবন আবার বললে, হাসছ যে! আমাদের পরমায়ু আর কত, বড় জোর ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বছর। এখন সবচেয়ে যারা ছোট তাদের বয়স পোনেরো ষোল। যদি আর নতুন জন্ম না হয় তাহলে আর বেশী হলে কুড়ি বছর এদের জীবনের মেয়াদ।

তা হবে কেন? ষাট সত্তর এমন কি আশি বছরই বা বাঁচতে আপত্তি কি!

আপত্তি কিছু নেই। দিনগুলো আরো বড় হয়ে রাতগুলো ছোট হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু তা হয় না।

হবে না কেন? তাও হয়! দুরু আবার হাসল। আমরা কিছুই জানি না। এই কুয়োর ব্যাঙের মত যেখানে পড়ে আছি শুধু সেই জায়গাটুকু দেখেই সব বিচার করি। এখান থেকে অনেক অনেক দূরে এমন জায়গা

থাকতে পারে,—পারে কেন আছে বলেই আমার ধারণা, সেখানে সারা বছরে কখনো দিন কখনো রাত ফুরোতে চায় না।

এবার বুবন হো হো করে হেসে উঠল। বললে,—এও তোমার ইতিহাস হাতড়াতে পাওয়া ধারণা নাকি! স্বপ্ন দেখতে চাও ত দেখো। কিন্তু কে না জানে এই জঙ্গলের চারিদিকে প্রাকার-গিরি আর তারপরে শুধু অনন্তসলিল। সে এমন সলিল যে, কোন নৌকো সেখানে ভাসে না। নুড়ির মত ডুবে যায়। তাছাড়া দিনরাত্তির সেখানে প্রলয়ের ঝড় বইছে।

হয়ত তাই, দুরু এবার গম্ভীর হয়ে বললে, কিন্তু আমাদের জানা কোন মানুষ ত তা দেখে আসে নি। সুতরাং এ কল্পনায় যদি বিশ্বাস করতে পারি, ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে যা পাই তাই বা একেবারে উড়িয়ে দেব কেন।

কি পাও তোমরা ইতিহাসে?—বুবনের গলা বেশ চড়া।

যা পাই তা শুনলে আমাদের শিবির আমি বিদায় হয়ে গেছি বলে খুশীই হবে। ইতিহাসে যা পাচ্ছি তাতে বুঝতে হয় আমরা যেখানে আছি সেটা গোলাকার একটা বিরাট বস্তুপিণ্ডের অতিসামান্য একটু ছিটে-ফোঁটা মাত্র। এ বিরাট গোলককে মানুষ বলত পৃথিবী। এ পৃথিবী যে কত বড় তা আমাদের কল্পনারও বাইরে। তার এক জায়গা থেকে আর এক জায়গার তফাৎও আকাশ-পাতাল। তবু এ পৃথিবীর যে দিকেই যাও গোলাকার বলে আবার উল্টো দিক দিয়ে ফিরে আসা যায়। কোন এক যুগে মানুষ নাকি তাও গেছে!

তাও গেছে! বুবনের হাসি এবার যেন থামতেই চায় না, কিন্তু মানুষ ত পিপীলিকা কি ফড়িঙ্গলাস নয়। পৃথিবী যদি গোল বস্তুপিণ্ড হয়, তাহলে অন্য পিঠে গেলে নিচে মাথা ওপরে পা করে হাঁটবে নাকি? পড়ে যাবে না?

যা জেনেছি তাই তোমায় বললাম। ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে এ কথাও জেনেছি যে, মানুষের পরমায়ু সত্তর আশি এমন কি শতাধিক হ'ত।

কোন দিন বলবে মানুষের দুধারে পাখিদের মত দুটো করে পাখাও থাকত। দেখো দুরু, তুমি ত' জানো, আমি যাকে বলে শুদ্ধিবাদী। যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তার কোন দাম আমার কাছে নেই। অবাস্তব গল্প নিয়ে মাথাঘামানো আমি পছন্দ করি না। এখন বলো, তোমাদের এ নিবাসের খবর পঞ্চায়েৎকে জানাবো কিনা!

ইচ্ছে করলে জানাতে পারো। তাহলে আবার কোথাও চলে গিয়ে ডেরা বাঁধতে হবে। কারণ শিবিরে আমরা ফিরব না। এখন অন্ততঃ নয়।

বেশ ফিরো না। আর ফিরেই বা হবে কি! এখানেও যা হবে সেখানেও তাই, পিছনে তাকিয়ে যাই কল্পনা করোনা সামনে সব অন্ধকার!

দুরু খানিক চুপ করে রইল। তারপর একটু হেসে বললে, তবু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে ত পারব না। তুমি ত পারছ না। এখন হঠাৎ নিজেদের এলাকা ছেড়ে এ অঞ্চলে চু মেরেছিলে কেন বল ত? বাচ্চা চুরিটুরির আশায়?

বাচ্চা চুরি? বুবন আতঙ্কের ভাব দেখাল, বাচ্চা যদি কোথাও থাকেও তবু কাফ্রামদের আখড়া থেকে চুরি করতে আসবে এতবড় বুকের পাটা প্রাভারদের কারুর অন্ততঃ নেই। তুমি ত জানো আমাদের শিবিরে যেমন পুরুষ বেশী ওদের আখড়ায় তেমনি সবই প্রায় মেয়ে। কিন্তু চেহারাতেই মেয়ে, আসলে কালনাগিনী। না, বাচ্চার লোভে নয়, এসেছিলাম পরজের কোন খোঁজ পাই কিনা দেখতে। প্রায় আশি পূর্ণিমা আগে পরজকে কাফ্রামরাই অরণ্য থেকে ধরে নিয়ে যায় বলে আমাদের বিশ্বাস। নদীতে যেখানে সে জাল ফেলতে গেছল সেখানে তার পাদুকা ও কৃপাণ পাওয়া গেছে। কাফ্রামদের আখড়ার আশপাশে ঘুরে তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তাই দেখতে গেছলাম। কিন্তু আরেকটু হলে নিজেই বন্দী হচ্ছিলাম তাদের হাতে। নেহাৎ বরাত জোরে তাদের ফাঁদদড়ি ছাড়িয়ে এসেছি।

ছাড়িয়ে এলে কেন? দুরু হাসল, বন্দী হয়ে ওদের আখড়ায় গেলে ত পরজের খবর আরো ভালো করে পেতে! ওদের সম্বন্ধেও অনেককিছু জানতে পারতে!

কাফ্রামদের বন্দী হতাম সাধ করে? বুবনের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। ওরা কি অকথ্য যন্ত্রণা দেয় তা জানো। ওদের মধ্যে পুরুষ নেই বললেই হয়। বাইরের পুরুষ ধরে নিয়ে গিয়ে তার সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে নিজেদের পুরুষদের গায়ে চালান করে। তারপর শুখনো ছোবড়ার মত মানুষটাকে দশে দশে মেরে আরকে জারিয়ে রাখে!

শুদ্ধিবাদীর মতই কথা বলছ নিশ্চয়ই?

দুরু হেসে আরো কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ বাইরে থেকে ব্যস্তভাবে আর দুটি মানুষ ঘরে ঢুকল।

বুবন সবিস্ময়ে বললে, আরে এই ত আজিব আর নন্দক! যাক্ তোমাদের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল।

আজিব ও নন্দককে কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হ'ল, বুবনকে দেখে চিনতে পেরেও সামান্য একটু মাথা নেড়ে সম্ভাষণ জানাবার পর প্রথমে আজিব বললে, শুনতে পাচ্ছ দুরু!

বহু দূরের একটা পটহধ্বনি তখন কুটীরের ভেতরও অস্পষ্ট ভাবে শোনা যাচ্ছিল।

কান পেতে একটু শুনে বুবনই প্রথম উৎসাহভরে বলে উঠল—এ ত কাফ্রামদের ডঙ্কা! নিশ্চয় কোন বন্দী ওদের পালিয়েছে। হয়ত পরজই হবে!

দুরু মাথা নাড়লে। সঙ্গে সঙ্গে নন্দক বললে—না, এ সে ডঙ্কানিনাদ নয় এ ডঙ্কার আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে কাফ্রামদের আখড়ায় যা অবিশ্বাস্য তাই ঘটেছে।

সে অবিশ্বাস্যটা কি? কাফ্রামদের খপ্পর থেকে বন্দী পালানই কি কল্পনাতীত ব্যাপার নয়? বুবন জিজ্ঞাসা করলে অস্থির ভাবে।

হ্যাঁ, ওরা যাদের ধরে নিয়ে যায় তাদের পালাবার খবর পাওয়া যায় না বললেই হয়। আজিব বুঝিয়ে বললে, কখনো-সখনো আখড়ার বাইরের জঙ্গলে আমরা প্রাভাররা বা ইওসোভেরা নিজেদের শিবিরের লোককে ওদের কাছ থেকে ছলেবলে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে মাত্র। কিন্তু তার জন্যে যে ডঙ্কা ওদের আখড়ায় বাজে এ ধ্বনি তা থেকে আলাদা।

কি বোঝাচ্ছে তাহলে এ ডঙ্কানিনাদে? বুবন সশঙ্ক ঔৎসুক্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে।

বোঝাচ্ছে যে ওদেরই কেউ স্বেচ্ছায় আখড়া ছেড়ে পালিয়েছে না অপহৃতা সে বিষয় ওরা নিঃসন্দেহ নয়।

তাহলে ত' আবার সেই হানাহানি কাটাকাটি শুরু!—নন্দক হতাশায় নিশ্বাস ফেললে।

হ্যাঁ। দুরু গম্ভীর স্বরে বললে, ওদের সমাজের এই একটি অলঙ্ঘ্য নির্দেশ। ওদের দল ছেড়ে কেউ কোথাও যেতে পারবে না। যদি যায় ত তার নিস্তার নেই। সমস্ত আখড়া এক প্রাণ এক দেহ হয়ে যেমন করে হোক তাকে খুঁজে আনবেই চরম শাস্তি দিতে। মরে গেলেও পার পাবে না কেউ। জীবিত কি মৃত হোক তার দেহের শেষ বিশ্রাম ওদের নিজস্ব সমাধিক্ষেত্রে। ওদের কেউ এই নির্বুদ্ধিতা করেছে কিনা জানি না, কিন্তু নিজেকে শুধু নয়—আমাদের সকলকে সে বিপন্ন করেছে। প্রাভার আর ইওসোভেদের ওপরই ওদের সন্দেহ ও আক্রোশ প্রথম গিয়ে পড়বে। চলবে ক্ষমাহীন ক্ষান্তিহীন সংগ্রাম যতদিন না পলাতকের সন্ধান মেলে।

পলাতক নয় বলো পলাতকা। নন্দকের স্বর বেশ তিক্ত। ওদের মধ্যে পুরুষ আর কজন। আর তাদের পালাবার মত পৌরুষ নেই। যে পালিয়েছে সে নারী নিশ্চয়। সেজন্যেই ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। শিবিরবাসের স্মৃতিতে এ ব্যাপার কখনো হয়নি। কি কারণে ওদের আখড়ার কেউ পালাতে পারে তাই বুঝতে পারছি না।

তার চেয়ে নিজেদের বিপদের পরিমাণটা বোঝবার চেষ্টা করো। আজিব চিন্তিত মুখে বললে—এতদিন নির্বিবাদে আমরা এখানে থাকতে পেরেছি। কিন্তু এখন ওদের আক্রোশের আগুন আমাদের মূল শিবিরকেই রেহাই দেবে না। আমরা ত শুখনো উড়ো পাতা মাত্র।

তার মানে কি বুঝতে পারছ ত! প্রাণী হিসাবে মানুষ এমনিতেই লুপ্ত হতে বসেছে। হঠাৎ দৈবের কৃপা না হ'লে কি আমাদের গবেষণায় কোন উপায় খুঁজে না বার করতে পারলে আর কুড়ি কি বড় জোর ত্রিশ বছরের মধ্যেই মানুষ বলে কেউ থাকবে না। এই অতর্কিত হিংসার বন্যা সেই সমাপ্তিই আরো দ্রুত এগিয়ে দেবে। দুঃখ এই যে, মানুষের বিলুপ্তি রোধ করবার জন্যে যারা ইতিহাসের লুপ্তবিদ্যা উদ্ধার করে নতুন উপায় আবিষ্কারের তপস্যা করছে তারা তাদের সাধনা শেষ করবার সময়টুকুও পাবে না।

সময় পেলে সত্যিই কোন উপায় আবিষ্কৃত হতে পারে বলে তোমরা আশা করো? বুবন ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

নিশ্চয় করি! দৃঢ়স্বরে জানালো নন্দক, অন্ততঃ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওই আশা নিয়েই কাজ করে যেতে চেয়েছিলাম।

শুধু আমরা তিনজনা নয়, আজিব গাঢ় বিষণ্ণ স্বরে বললে, আমি জানি ইওসোভেদেরও কয়েকজন সাধক এই একই সাধনায় তন্ময় হয়ে আছে। সে সাধনা আর শেষ করবার সুযোগ হবে না।

কেন হবে না! উত্তেজিত হয়ে উঠল বুবন, তোমাদের সব কথা আমি ভালো করে বুঝি না। তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন নিয়ে পরিহাসই করেছি এতদিন। কিন্তু এতটুকু দাম যদি তোমাদের সাধনার থাকে তাহলে তা কিছুতেই ব্যাহত হতে দেওয়া হবে না। যে আত্মঘাতী সংগ্রামে মানুষের ভবিষ্যৎই বিপন্ন তার মূল কারণই দূর করতে হবে আগে। যে পলাতককে ফিরে পাওয়ার জন্যে কাফ্রা-মদের এই ক্ষিপ্ততা তাকে আমরাও খুঁজব। খুঁজে পেলে নিজেরাই বন্দী করে ফিরিয়ে দেব ওদের কাছে। এ সংগ্রাম তাহলে ত থামবে।

তা থামবে! হতাশ স্বরে বললে নন্দক, কিন্তু অনেকগুলো যদি তার আগে কাটাতে হবে। তাছাড়া আমাদের কি ইওসোভ শিবিরের মনোভাব ত তোমার অজানা নেই। কাফ্রামদের ঢিলের বদলে পাটকেল ছোড়বার জন্যে সবাই ক্ষেপে উঠবে। তাদের আখড়া-পালানো মেয়ে খুঁজে ফিরিয়ে দেবার জন্যে একটা আঙুলও নাড়বে না কেউ।

তাহলে আমি একাই খুঁজব। বুবনের গলা ধীর অথচ কঠিন। আমার চেয়ে সেরা শিকারী কোন শিবিরে আছে বলে আমি মানি না। আমি সমস্ত পাহাড় জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজব। দরকার হলে তিমির-কন্দরের ভেতরে গিয়েও সন্ধান করব। যেমন করে হোক সে সর্বনাশিনীকে আমি জীবন্ত বা মৃত ওদের হাতে তুলে দেবই। এই আমার মৃত্যুপণ প্রতিজ্ঞা আজ এই মুহূর্ত থেকেই।

বুবন নিজের প্রতিজ্ঞার অটলতা প্রমাণ করতেই তৎক্ষণাৎ কুটীর থেকে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল।

তার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদূরে ডঙ্কাধ্বনি দ্রুত ও স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন আরো। মনে হ'ল ডঙ্কাধ্বনি নয় ও যেন শঙ্কিত বিহ্বল রাত্রিরই উদ্দাম হৃদস্পন্দন।

একাগ্রভাবে তিনজনে কিছুক্ষণ সে ধ্বনি-তরঙ্গ শোনবার পর আজিব বললে, তুমি ত ওদের ডঙ্কাধ্বনির ভাষা আমাদের চেয়ে ভালো করেই জানো। এখন কি বলছে ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। তুমি পারছ?

পারছি। দুরুর মুখ গম্ভীর। যে নির্দেশটা তার উদ্দেশে প্রথমে বলছে, যেখানেই তুমি থাকো অনন্যা নেতামার আহ্বান তুমি শুনতে পাচ্ছ। স্বেচ্ছায় তুমি যাওনি আমরা জানি। তবু যদি সত্যিই তা গিয়ে থাকো তাহলে চরম শাস্তি এড়াতে হলে সূর্যোদয়ের আগে তোমার আখড়ায় ফেরা চাই। সূর্যোদয়ের পর আর তোমার এখানে জায়গা হবে না। স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যেখানেই তুমি গিয়ে থাকো তোমায় আমরা জীবিত কি মৃত খুঁজে আনবই। তারপর আমাদের দুই শিবিরকে শুনিয়ে বলছে, কাফ্রামদের এ অপমান যারা করেছে তাদেরও সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় দেওয়া হচ্ছে। সূর্যোদয়ের মধ্যে যদি অপহৃতাকে ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি না দেওয়া হয় তাহলে কাফ্রামদের সঙ্গে আমৃত্যু সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হও।

তিনজনেই নীরবে খানিক দাঁড়িয়ে রইল একথা শোনবার পর।

কয়েক মুহূর্ত বাদে নন্দকই প্রথম কথা বললে। সমস্ত উত্তেজনা পার হয়ে এসে তার কণ্ঠ এখন শান্ত ও দৃঢ়।

নিরীহ অসহায় দুর্বল বলে কাফ্রামরা আমাদের পরীক্ষা করে নিয়ে এতদিন তাচ্ছিল্য ভরে এখানে থাকতে দিয়েছে। তাদের অবহেলা অবজ্ঞায় আমাদের নিজেদের কাজ আমরা করে যেতে পেরেছি নির্বিঘ্নে। কিন্তু আর তা সম্ভব নয়। শিবিরে ফিরে গিয়েও আর আমরা নিরাপদ হব না। যে উন্মত্ত সংগ্রাম এবার শুরু হবে তাতে দয়া মায়া ক্ষমা কোন পক্ষেরই তাতে থাকবে না। আমাদের সামনে এখন দুটি মাত্র পথ খোলা। এক এতদিনের সমস্ত সাধনা জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের শিবিরের সঙ্গে এই সর্বনাশা সংগ্রামে যোগ দেওয়া, আর এক, কোথাও নিজেদের সম্পূর্ণ গোপন করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অসাধ্য সাধনের ব্রতে একনিষ্ঠ থাকা।

বুঝলাম তোমার কথা। আজিব বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু কাফ্রামদের দৃষ্টি এড়িয়ে লুকিয়ে থাকবার মত কোন জায়গা কোথাও আছে কি?

আছে বলে মনে করি। নন্দক দৃঢ়-স্বরে জানালে, বুবনই তার ইঙ্গিত দিয়ে গেছে।

তার মানে তিমির-কন্দর!

দুরু ও আজিব দুজনের কণ্ঠেই শঙ্কিত বিস্ময় ফুটে উঠল।

হ্যাঁ, তিমির-কন্দরই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। এ কন্দরে মানুষের পা কখনো পড়েছে বলে কেউ জানে না। কাফ্রামদের উন্মত্ত আক্রোশও কন্দরের নিষেধ-সংস্কার অতিক্রম করতে সাহস করবে না। আমাদের যেটুকু উপকরণ সম্ভব সঙ্গে নিয়ে আজ রাত্রেই সেখানে রওনা হতে হবে।

কিন্তু—আজিব তার শেষ কুণ্ঠিত প্রতিবাদ বুঝি জানাতে গেছল।

যেন তার প্রত্যুত্তরেই জ্বলন্ত বহ্নি তীর হয়ে দূরের একটি কুটীরের ওপর এসে পড়ল।

দেখতে পাচ্ছ! নন্দক তীব্রস্বরে বললে, এ সংগ্রামে প্রতিশ্রুতি কি নীতির কোন মূল্য নেই। আশ্বাস দিয়েও কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে কাফ্রামরা প্রস্তুত নয়।

দূরের কুটীর-চূড়ায় আরেকটা জ্বলন্ত তীর নন্দকের কথা সমর্থন করতেই এসে পড়ল।

## তৃতীয় উল্লাস
## সন্দংশঘটিত

উত্তেজিত হলেও মনে মনে একটা অটল সঙ্কল্প নিয়ে বুবন অন্ধকারে বেরিয়ে এসেছিল।

এ অঞ্চলটা তার তেমন চেনা নয়। কাফ্রামদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে প্রাভার বা ইওসোভেরা পারতপক্ষে এদিকে আসে না। বহুকাল আগে—কৈশোর তখনও সে পার হয় নি আহত একটা ঝাঁকাল হরিণের অনুসরণ করে একবার এদিকে এসে পড়েছিল। এদিকের অরণ্যভূমির সঙ্গে সেইটুকুই ছিল তার পরিচয়। তারপর এই দ্বিতীয়বার এসেছিল পরজ-এর সন্ধান করতে। এ সন্ধান শিবির-সভার নির্দেশে নয়। শিবির-সারথিরা বরং এই সন্ধান নিরর্থক জেনেই সাব্যস্ত করেছিল। বুবন এসেছিল তার নিজের গরজে।

শিবির-জীবনে সকলেই বন্ধু। তবু পরজের প্রতি তার যেন বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী কিছু ছিল। পৌরাণিক কাহিনীতে পিতৃস্নেহ বলে যে দুর্বলতার কথা শুনেছে অনেকটা তারই মত। অথচ পরজের সে পিতা নয় এমনকি সহোদর ভ্রাতাও নয়। দুজনে প্রায় একই বয়সী। পিতৃ-পরিচয় তাদের শিবিরে বহুকাল অচল। মাতৃ-পরিচয় নিয়েও কেউ মাথা ঘামায় না। শিশুর জন্ম বহুকাল তাদের শিবিরে হয় নি। যখন হ'ত তখন বছর তিনেক মাত্র মাতৃ-নিলয়ে শিশু ও মাতা একত্র স্থান পেত। তারপর থেকেই কৈশোর না পার হওয়া পর্যন্ত বালক-বালিকাকে থাকতে হ'ত মন্ডলাবাসে বয়স্কদের থেকে পৃথক-ভাবে। শিবির-জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা জীবন-রহস্যের পাঠগ্রহণ সব সেইখানে। প্রাভার শিবিরে বহুকাল থেকে নারী ক্রমশঃ বিরল হয়ে আসছে। তাদের সময়ে মন্ডলা-বাসে বারোটি কিশোরের মধ্যে তিনটি মাত্র কিশোরী ছিল। মন্ডলাবাসের নীতি অনু-যায়ী তাদের বারোজনেরই এই তিনটি কিশোরীর সঙ্গে যৌবন-লীলার অভিনয় করার কথা। পরজ কিন্তু সেই কিশোর বয়সেই বিরূপ ছিল এ সবের প্রতি। মন্ডল-মুখ্যের ভৎর্সনা ও শাসনের ভয় সে অগ্রাহ্য করত। বুবন তখন থেকেই নিজের চেয়ে পরজের জন্যেই চিন্তিত হ'ত বেশী। পরজকে পক্ষপুটে রক্ষা করবার মত একটা অদম্য ব্যাকুলতা সে তখনই অনুভব করেছে। মন্ডলাবাসে থাকতেই তার এবং পরজের মাতা যে ভিন্ন তা সে জেনেছিল। পিতার সঙ্গে ত নয়ই মন্ডলাবাসে মাতার সঙ্গেও দেখাশোনার কোন রীতি নেই। তবু কোন কোন জননী আদিম বাৎসল্যের প্রেরণায় সন্তানকে দেখবার আশায় মন্ডলা-বাসের আশেপাশে ঘোরাঘুরি না করে পারত না। পরজের জননীকেও সে আসতে দেখেছে এইভাবে এবং সে উপস্থিত থাকলেও শুধু পরজকেই আদর

করাতে বুঝেছে পরজের মাতার সংগে তার কোন সম্পর্ক নেই।

পরজ অবশ্য নিজের জননীর এই স্নেহের উচ্ছলতাতেও কেমন যেন অস্বস্তি-বোধ করত। যথাসম্ভব এড়িয়েও চলতে চাইত তাই।

মাতৃস্নেহের এ ধরণের উচ্ছ্বাস শিবির-জীবনে একান্ত বিরল। পরজের তাতে অস্বস্তি অনুভব করা তাই হয়ত ঠিক অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আরো বহু ব্যাপারে পরজ একটু দলছাড়া অদ্ভুত প্রকৃতির ছিল সেই বয়স থেকেই।

বুবনের তার প্রতি মমতা ও আকর্ষণের কারণ তাই কিনা কে জানে।

সেই মণ্ডলাবাসে শৈশব কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে শিবির-সেবক হওয়া পর্যন্ত পরজ ও তার সৌহার্দ্য বেশীর ভাগ একতরফা হলেও অটুট থেকেছে। বুবন শিবির-সমাজের শ্রেষ্ঠ শিকারী হয়ে উঠেছে দিনে দিনে, সকল দিকেই সহজাত ক্ষমতার পরিচয় দিলেও পরজ কোন বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেনি শুধু যেন আগ্রহেরই অভাবে।

দুরু নন্দক কি আজিবের মত উদ্ভট কোন নেশাও তার মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। দুরুর ইতিহাস-উদ্ধারের তন্ময়তা, আজিব ও নন্দকের দুর্বোধ্য সব খেয়াল শিবিরে তখন পরিহাসের খোরাক জুগিয়েছে। এক ধরণের নির্দোষ অপ্রকৃতিস্থতা বলেই ধরে নিয়ে সবাই এদের প্রতি করুণাই অনুভব করেছে মনে মনে। পরজ তা করেনি। বহু সময় পরজকে এদের সংগে গভীর আলোচনায় ব্যয় করতে দেখে বুবন বিস্মিত হয়েছে তখনই। কিন্তু এই কৌতূহলটুকুর পরিচয় দেওয়া ছাড়া পরজ তাদের পথের পথিক হওয়ার কোন লক্ষণ দেখায়নি।

দুরু নন্দক ও আজিব যখন নিরুদ্দেশ হয় তখন অবশ্য ব্যাপারটাকে স্বেচ্ছা-অপসারণ বলে শিবিরে কেউ সন্দেহ করেনি। দুর্ঘটনা বলেই ধরে নিয়েছিল। এমন দুর্ঘটনা যার মধ্যে ভিন্ন গোষ্ঠীর হাত থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রাভারারা কাফ্রাম নয়। শিবির-সেবক কেউ নিরুদ্দেশ হলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিশোধ খোঁজে না। ইওসোভদের সংগে এ বিষয়ে তাদের মিল আছে। পুরুষ বা নারী হরণ তারা স্বাভাবিক বলেই মেনে নেয়। তিন তিন জন শিবির-সেবক পর পর নিখোঁজ হবার পর তাদের শঙ্কিত সতর্কতা শুধু কিছুদিন বেড়েছিল।

পরজের নিরুদ্দেশ হওয়া কিন্তু সেটুকু ক্ষীণ চাঞ্চল্যও যেন জাগায়নি। শিবির-জীবনে ক্লান্তি ও হতাশা ক্রমশঃই গাঢ় হয়ে আসছে। শিবির-সমাজই অমোঘ বিলুপ্তির পথে। দু'চারজনকে অকালে হারালে অস্থির হবার বুঝি কিছু নেই।

অস্থির হয়েছিল শুধু একা বুবন। প্রথম প্রথম পরজ যে নদীতীর থেকে নিরুদ্দেশ হয় তারই ধারা অনুসরণ করে যতদূর সম্ভব তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। নদীটি কিন্তু এমন কিছু বড় নয়। তাছাড়া তার অগভীর জলের স্রোত এমন প্রবল নয় যে পরজের মত দক্ষ সাঁতারুর সেখানে বিপদের সম্ভাবনা। তবু আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা ভেবে কয়েকদিন দুই তীরের কোথাও সে সন্ধান করতে বাকি রাখেনি।

এ সন্ধানে বিফল হয়ে ইওসোভদের শিবির-এলাকাতেও সে ঘুরে বেড়িয়েছে কয়েকদিন পরজের খোঁজ পাবার আশায়। ইওসোভ ও প্রাভারদের মধ্যে নারীপুরুষ-হরণের প্রতিযোগিতা এককালে খুবই প্রবল ছিল। ইদানীং তা প্রায় থেমে গেলেও পরজের সেখানে বন্দী হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। ভাগ্যক্রমে ইওসোভদের শর্ভের সংগে দেখা না হয়ে গেলে আরো কতদিন সেখানে নিষ্ফল সন্ধানে কাটাতে হত কে জানে!

শর্ভ ইওসোভদের এক ব্যতিক্রম, দুরু আর তার সাথীরা এমন কি পরজও যেমন ব্যতিক্রম প্রাভারদের। শিবির-জীবনে তারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিতে কিছুতেই পারে না। ইওসোভ আর প্রাভারদের শিবির-সারথিদের মতে তাদের মধ্যে নাকি সুদূর পৌরাণিক যুগের বিকৃতি কিছুটা প্রতিফলিত। শিবির-সমাজে তাই তারা অনেকখানি অচল।

শর্ভকে বুবন ভালো করে জানবার সুযোগ পেয়েছিল বহুদিন আগে। প্রাভারদের হাতে বন্দী হয়ে শর্ভকে কিছুকাল তাদের শিবিরে কাটাতে হয়। প্রাভাররা শেষ পর্যন্ত প্রচলিত রীতি লংঘন করে তাকে যে মুক্ত করে দেয় তার আসল কারণ শর্ভের অদ্ভুত অপ্রকৃতি-স্থতা। দুরু বা পরজের সংগে সে বিকৃত মনোভংগির কোন মিল নেই। প্রজননের দিক দিয়ে তার অক্ষমতা প্রমাণিত হবার পরও শিবির-বিধিঅনুসারে তার প্রাভারদের মধ্যে থাকবার কথা। কিন্তু প্রাভারদের শিবির-সারথিরাই শর্ভের আচরণে ও কথায় উদ্ভ্রান্ত উত্যক্ত হয়ে স্বেচ্ছায় তাকে বিদায় দিয়েছে।

সত্যিই শর্ভকে নিয়ে যেন হাসা-পরিহাসও ঠিক জমত না। অদ্ভুত অকম্পিত তার সব জিজ্ঞাসা ও জল্পনা। কেন এ সৃষ্টি, কি অর্থ জীবনের, জন্মমৃত্যুর এ দুর্বোধ প্রবাহ কোথায় ধাবমান। মৃত্যুই কি সমাপ্তি, সত্য কি শ্রেয়ই বা কি, এসব প্রশ্ন শুনতে ও তার বিচার করতে কোন শিবিরেরই কেউ অভ্যস্ত নয়। এসব অবান্তর নিরর্থক বিচার নিয়ে হাসাহাসি করতে গিয়েও অনেকেই কেমন যেন যন্ত্রণা-তীব্র অস্বস্তি অনুভব করেছে। শিবির-সারথিরা শর্ভের সংগে এসব আলোচনা অনুচিত বলে ঘোষণা করেছে। তবু বয়স্করা শর্ভকে এড়িয়ে চললেও মন্ডল-মুখ্যদের শাসন অগ্রাহ্য করে বয়ঃসন্ধিগত কিশোর-কিশোরীরা শুধু অদ্ভুত কিছুর উত্তেজনাতেই তাকে অনুসরণ করেছে সময় অসময়ে। বয়স্কদের মধ্যে দুরু আজিব ও নন্দককে শর্ভের সংগে আলোচনা করতে দেখে কেউ অবশ্য তেমন কিছু মনে করেনি। বিস্মিত হয়েছে বুঝি পরজকেও মাঝে মাঝে শর্ভের সংগী হতে দেখে। পরজ ও শর্ভ মিলিত হলে অবশ্য তর্কের ঝটিকাই উঠেছে সর্বক্ষণ। বুবন উপস্থিত থাকলে সে তর্কের বিশেষ কিছু বোঝেনি। কিন্তু এই নিরর্থক বাক্যব্যয় তার কাছে ক্লান্তিকর হলেও কি যেন একটা দুর্বোধ যন্ত্রণা জাগিয়েছে তার মনে।

শেষ পর্যন্ত শর্ভকে শিবির থেকে বিতাড়িত করার পর অনেকেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। দুরু ও তার সংগীদের অদ্ভুত সব নেশা সম্বন্ধে অন্ততঃ উদাসীন হয়ে থাকা যায়, তাদের নিজের খেয়ালে থাকতে দিলে কারুর কোন লাভ-লোকসান নেই। কিন্তু শর্ভের বেলা নির্লিপ্ত নির্বিকার থাকা যেন কঠিন। শর্ভের সংগে আলাপ করবার চেষ্টা না করলেও তার উপস্থিতিই যেন মনের মধ্যে অস্বস্তিকর জিজ্ঞাসার ঢেউ তোলে।

ইওসোভ শিবিরের আশেপাশে ঘোরা-ঘুরির সময় এই শর্ভের সংগেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেছল।

ইওসোভরা সমতল প্রান্তরের সীমায় পার্বত্যভূমির একটি নাতিউচ্চ টিলার ওপর প্রস্তর-শিবির নির্মাণ করে থাকে। তাদের টিলার পাদদেশের দুর্গম অরণ্যভূমির এক প্রান্তে সেদিন সন্ধ্যায় শর্ভকে নিশ্চিন্তমনে একটি বৃক্ষের কর্তিত কান্ডের ওপর বসে থাকতে দেখে বুবন বিস্মিত হয়েছিল। প্রথমে শর্ভবলে দূর থেকে চিনতে পারেনি। মনে করেছিল ইওসোভদের কোন অরণ্য-প্রহরী ওখানে বুঝি বসে আছে। পরে অরণ্য-প্রহরীর হাতে বা কাছাকাছি ধনুবাণ না দেখে সংশয়ান্বিত হয়ে আরো একটু কাছে অগ্রসর হয়ে শর্ভ বলে চিনতে পেরেছিল।

শর্ভের এইভাবে ঘনায়মান সন্ধ্যায় বসে থাকাও অবশ্য একটু অদ্ভুত। বিশেষ কোন প্রয়োজন না হলে কিংবা পাহারায় না থাকলে সূর্যাস্তের আগেই শিবিরে প্রত্যাবর্তনের নিয়ম সকলের পক্ষেই অবশ্যপালনীয়।

শর্ভকে চিনতে পেরে সাহস করে সে কাছে এগিয়ে গিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,—শর্ভ তুমি এখানে! শিবিরে যাওনি?

কোন উত্তর না দিয়ে শর্ভ কিছুক্ষণ তার দিকে যেন কৌতূকদৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছিল। তারপর হেসে বলেছিল, আমায় আবার বন্দী করতে এসেছ নাকি! চলো আমি প্রস্তুত।

বুবন অপ্রস্তুত বোধ করে বলেছিল, না না, তোমায় বন্দী করতে আসব কেন? সন্ধ্যা হয়ে গেছে তবু শিবিরে না ফিরে গিয়ে বসে আছ দেখে বিস্ময় লাগছে।

তাহলে তোমায় দেখেও আমার বিস্মিত হওয়া উচিত। আগেকার মতই কৌতুক-কুঞ্চিত মুখে বলেছে শর্ভ, তোমার শিবির আমার চেয়েও দূর মনে হচ্ছে।

মনে হবার কি আছে? কতদূর তা তো তুমি জানো। তুমি কি আমায় চিনতে পারনি? বুবন সংশয়ভরে জিজ্ঞাসা করেছে।

না। আমি কাউকে চিনি না। তোমাকেও চিনতে পারিনি। তাই বিস্মিতও হইনি তোমায় এখানে আসায়। বিস্মিত হওয়া আমি ভুলে গেছি।

এই আবার সেই অপ্রকৃতিস্থতা শুরু হল ভেবে উদ্বিগ্ন হয়েছিল বুবন। শর্ভের সংগে দৈবাৎ সাক্ষাৎ হওয়া সৌভাগ্য সন্দেহ নেই। তার কাছে পরজের সংবাদ পাওয়া এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু একবার এই ধরণের বাতুলতা শুরু করলে আর তার মুখ থেকে সঠিক সংবাদ কিছু বার করা যাবে কি?

তবু শর্ভকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আসল প্রসংগে নিয়ে যাবার আশায় বুবন বলেছিল, তুমি এখন শিবিরে ফিরে যাবে নিশ্চয়?

শর্ভ মাথা নেড়ে বলেছিল, না ফিরে যাব

না, এগিয়েও যাবো না কোথাও। যাওয়া-আসার এই করুণ প্রহসনেরই আমি শেষ দেখতে চাই।

বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল শর্ভ,—গতি! গতি! গতি! যেদিকে চাও যা কিছু ছোঁও সবই চলছে, শুধু চলছে। কেন? ভাবতে পারো না একবার, যে সব কিছু থেমে গেছে? সূর্য অস্ত যেতে গিয়ে অনড় হয়ে আছে দূর পাহাড়ের ওপর লম্বমান। পাহাড়ের নির্ঝর গুহামুখে আছে থমকে থেমে, পাখির পাখা বাতাসে অচল। বাতাস বইতে ভুলে গেছে তুমি আমি সবাই স্থির অপরিবর্তীয়, সৃষ্টিময় অনন্ত নিশ্চলতা! সব কিছুর ওপর শেষ চিরন্তন দাঁড়ি।

হঠাৎ আবার উচ্চস্বরে হেসে উঠেছিল শর্ভ। তার দিকে যেন অনুকম্পাভাবে তাকিয়ে বলেছিল তারপর, না এ চরম নিশ্চলতা ভাবতেও পারো না! কারণ তুমি আমি চলা দিয়েই তৈরী। কিন্তু কেন? কোথায় চলা? কেন চলা?

তখনই বুবনের মনে হয়েছিল শর্ভের অপ্রকৃতিস্থতা আগের চেয়ে অনেক বেশী বেড়েছে।

কার কাছে কোন সংবাদ সংগ্রহের আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়ে সরে যাবে কিনা ভাবছে তখন শর্ভ নিজে থেকেই হঠাৎ যেন সম্পূর্ণ সুস্থভাবে বলেছিল, আমার কথা গ্রাহ্য কোরো না বুবন। এ সব আমার নিজেকেই নিজের জিজ্ঞাসা। শুধু সরবে কখনো বলে ফেলি বলে কেউ তা শুনে ভয় পায় কেউ বিরক্ত হয়। আমি শুধু উত্তরই খুঁজছি না বুবন প্রশ্নও খুঁজছি। আমার ধারণা প্রশ্নটা ঠিকমত ধরতে পারলে উত্তর হয়ত আপনিই মিলে যাবে।

একটু থেমে শর্ভ আবার বলেছিল, এখন এ শত্রুরাজ্যে কি উদ্দেশ্য নিয়ে হানা দিয়েছ বল দেখি! আমার অদর্শনে কাতর হয়ে ছুটে আমাকেই দেখতে এসেছ বলে ত মনে হচ্ছে না।

উৎসাহ পেয়েও সরাসরি তখনই প্রশ্নটা করতে বুবন ভরসা পায়নি।

বুবনের দ্বিধা দেখে শর্ভ আবার বলেছে, ভয় নেই। ইওসোভ শিবিরে আমি তোমায় ধরিয়ে দেব না। ও শিবিরের আমি কেউ নই—ভাবতে পারো। ওখানে অন্ততঃ থাকি না।

শিবিরে থাকো না। তবে থাকো কোথায়? বুবন প্রশ্ন করেছিল সবিস্ময়ে।

যেখানে দেখছ সেইখানেই। হেসে বলেছিল শর্ভ, এখান থেকে কোথাও যাবারও দরকার হয় না। ফিরে আসবারও। এ সেই অচলতার অভিমুখে প্রথম একটা ধাপ।

আবার পাগলামি শুরু হবার উপক্রম দেখে বুবন উদ্বিগ্নভাবে নিজের কথাটা এবার না তুলে পারে নি। বলেছিল, তোমাদের শিবিরের একটা খবর জানাবার জন্যেই এদিকে এসেছি। কিন্তু তুমি যে বলছ শিবিরেই থাকো না...

বাধা দিয়ে শর্ভ বলেছিল, শিবিরে থাকি না বলে তার খবরও রাখি না ভাবছ কেন! হয়ত বেশী করেই রাখি। শিবিরের কোন্ প্রাচীর দুর্বল সে খবর অবশ্য তোমায় জানলেও দেব না।

না, সে খবর নয়। বুবন আসল প্রশ্নটা এবার করেছিল, পরজকে তোমাদের ইওসোভরা কি ধরে নিয়ে এসেছে জানো?

পরজ তাহলে তোমাদের শিবিরে নেই! শর্ভ যেন উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠেছিল, আমি জানতাম!

কি বলছ কি? বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করেছিল, কি তুমি জানতে? তাকে ধরবার ফন্দির কথা? ইওসোভরাই তাহলে তাকে ধরে নিয়ে এসেছে?

না, না ইওসোভরা তাকে ধরে আনেনি। আমার কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো। কেউ তাকে ধরেনি। সে নিজেই তোমাদের শিবির ছেড়ে গেছে। যে ঝরনার মুখ আমি তার মধ্যে খুলে দিয়ে এসেছিলাম তাই একদিন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমি জানতাম।

এসব কথা পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হয়েছিল বুবনের। শুনতে তার আর ভালো লাগেনি। ইওসোভেদের শিবিরে পরজ যে বন্দী নয় সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে শুধু সে আর একবার জানতে চেয়েছিল, পরজ তাহলে তোমাদের এখানে নেই ঠিক জানো?

জানি জানি। ইওসোভেরা তার কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি যেমন জানি, তেমনি জানি একদিন যে আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছে সেই আজ কোন্ দুর্গম নিভৃতে আমারই ধ্যানের অচলতায় নিথর হবার জন্যে ব্যাকুল। আমাকে পরাস্ত করতে যে-তর্কের তুফান সে তুলেছে তাতে তার নিজের মনের মোহাবরণই গেছে সরে।

শর্ভকে তার উচ্ছ্বসিত প্রলাপের মধ্যেই ফেলে এসেছিল বুবন। পরজ ইওসোভ শিবিরে নেই শর্ভের এই খবরটুকুকে বিশ্বাস করা যেতে পারে সে তখন বুঝেছে।

কিন্তু পরজ তাহলে কোথায়? কোন অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় নিশ্চিহ্নভাবে সে নিহত একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। শর্ভের অর্থহীন প্রলাপে যে ইঙ্গিত আছে তাই কি তাহলে সত্য হওয়া সম্ভব? পরজের এই নিরুদ্দেশ হওয়া আত্মনির্বাসন ছাড়া কিছু নয় এ কথা ভাবতে মন চায় না। পরজকে সম্পূর্ণ সে কখনও ঠিক বোঝেনি, কিন্তু এত বড় পরিবর্তনের কোন আভাস পরজ তাকে দেবার চেষ্টাও করেনি মনে হলে একটা অভিমানও জাগে।

তবু পরজের এ পরিণতিও বুঝি ভালো। ভালো কাফ্রামদের হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে।

শর্ভের কথা ঠিক না হলে একমাত্র সেই সম্ভাবনা ত' বাকি থাকে।

সেই নিদারুণ সম্ভাবনার সত্য-মিথ্যা যাচাই করতেই চরম দুঃসাহসে নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করে কাফ্রামদের এলাকায় নিঃশব্দে কয়েকদিন কাটিয়েছিল। গতিবিধির গোপনতার জন্যে ধনুর্বাণ পর্যন্ত সঙ্গে রাখেনি।

এ সন্ধান নিষ্ফলই হয়েছে।

অন্য সমস্ত শিবিরে আসন্ন অবলুপ্তির ক্লান্তি ও শৈথিল্য ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। কাফ্রামরা কিন্তু সারাক্ষণ হিংস্রভাবে সজাগ। তাদের বিনিদ্র পাহারার বেষ্টনী গোপনে ভেদ করে যাওয়া অসম্ভব বলেই বুঝেছে বুবন।

কাফ্রামদের সঙ্গে আর সকলের এ প্রভেদের কারণ কি?

প্রাভার ও ইওসোভদের মধ্যে অবশ্য পুরুষেরই আধিক্য। কাফ্রামরা যেন এ অসামাজস্যের পাল্লা ঠিক রাখতে অতিমাত্রায় নারীপ্রধান। ইওসোভদের মধ্যে পুরুষ নারীর তবু কিছুটা ধরবার মত অনুপাত আছে। প্রাভার আর কাফ্রামরা সম্পূর্ণ বিপরীত এ দিক দিয়ে। প্রাভারদের মধ্যে নারী যেমন অতি বিরল হয়ে এসেছে কাফ্রামদের মধ্যে তেমনি পুরুষ প্রায় অনুপস্থিত।

প্রধানতঃ নারীসমাজ বলেই কি কাফ্রামদের বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি এখনো এমন অক্ষুণ্ন?

কি বলেছিল দুরু? কাফ্রামদের হাতে স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে দেখলেও পারত! কি দেখত সেখানে? দেখবার কোন সুযোগই কি আর পেত! পরজের সন্ধান বাইরে থেকে পাওয়ার যদি বা ক্ষীণতম আশা থাকে একবার কাফ্রামদের হাতে বন্দী হলে একেবারে নিরন্ধ্র কারাজীবন। বিলুপ্তি-রোধের দুঃসাধ্য দুর্বোধ কোনো সাধনা যে দুরুরা সত্যই করছে এ বিষয়ে এখন আর তার মনে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সাধনার যত মূলোই থাক বাস্তববোধ এই প্রকৃতির মানুষের কত অল্প তা সে ভালো করেই জানে। কাফ্রামদের হাতে বন্দী হওয়া মানে যদি শুধু সমজদ্দারী হওয়া হ'ত তাহলেও তেমন আতঙ্কের বুঝি কিছু ছিল না। পুরুষপ্রধান বলে তাদের প্রাভারদের মধ্যেও শিবিরবন্ধু আছে। তাদের জীবন

শুধু মুক্ত স্বাধীন নয়, মর্যাদাতেও তারা অদ্বিতীয়া। শিবিরকন্যা বা অপহৃতা যাই হোক তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। কিন্তু কে না জানে কাফ্রামদের হাতে বন্দী যারা হয় তাদের জীবন পিঞ্জরাবদ্ধ পশুরও অধম। কাফ্রামদের নিজেদের পুরুষ ছাড়া আর কাউকে সেখানে সমাজভুক্ত করা হয় না। বন্দী হয়ে যারা আসে তারা সেই সমাজভর্তাদের কল্যাণে বলির প্রাণীর মত ব্যবহৃত হয় মাত্র।

কে জানে পরজ ইতিমধ্যে তেমনি হয়ে জীবন্মৃতরূপে দিন কাটাচ্ছে কিনা!

এখন সমস্যা কিন্তু পরজের উদ্ধারের চেয়ে আরো অনেক বড় কিছুর। সমস্ত মানব-জাতির ভবিষ্যৎ সংকট-শিখরে দুলছে।

মানব জাতির ভবিষ্যৎ কথাটা মনে আসতেই একটা বিহ্বল বেদনা জাগে। সত্য মিথ্যা জানে না কিন্তু একদিন শিবিরে থাকতে এই দূরের কাছেই যেন পুরাণ-কল্পনা শুনেছিল। মানব জাতি বলতে শুধু বিবদমান তিনটি নগণ্য শিবিরের কথা কেউ নাকি ভাবতে পারত না। বল্মীক-স্তূপে যত কীটধরণীময় মানুষের বসতি নাকি তার চেয়ে জনবহুল হত। রাত্রির আকাশে যত তারা তত যোদ্ধা এক এক পক্ষে সাজত সংগ্রামের জন্যে।

তখন শুনে হেসেছিল। উপহাস করেছিল দূরুকে। এখন কেন যেন সে ইচ্ছে করে না। তিন শিবিরে সবসুদ্ধ মানব-প্রতিনিধি কতজন এখন বর্তমান? বড় জোর বিংশ বিংশতি। এই সংখ্যাও প্রতিদিন হ্রাস পাচ্ছে। যারা যাচ্ছে তাদের স্থান পূরণ হচ্ছে না নবজন্মে। এই অন্তর্বিরোধ যত তীব্র হয়ে উঠবে মানব জাতির শেষ প্রতিনিধিদের সংখ্যা হ্রাস পাবে তত দ্রুত। বহুকাল কোন নবজাতক কোথাও দেখা যায়নি। নবজন্ম যদি আর না হয় তাহলে বিশ ত্রিশ বৎসরও আর কাটবে না। তার আগেই ধরণী মনুষ্যহীন হয়ে যাবে। দূরুদের সাধনা সার্থক কিনা তা জানবার অবসরও মিলবে না।

না, আশার সেই ক্ষীণ দীপটুকুকে কিছুতেই অকালে নিভতে দেওয়া চলবে না। যেমন করে হোক এ সংগ্রাম বন্ধ করতেই হ'বে। সম্ভব হ'লে নিজেদের ও অন্যদের শিবিরে গিয়ে জনে জনে প্রতিটি শিবিরসেবককে বোঝবার চেষ্টা করত। কিন্তু এখন সে চেষ্টা বৃথা। আঘাতের বদলে প্রতিঘাতের সংস্কার এমন মজ্জাগত, পরস্পরের হিংসা ঘৃণার ইতিহাস এত দীর্ঘ, যে বিলুপ্তি নিশ্চিৎ জানলেও কেউ সংগ্রামে ক্ষান্ত হবে না। আর প্রাভার বা ইওসোভদের যদি বোঝানো সম্ভবও হয়, কাফ্রামদের নিরস্ত করা অসম্ভব। তাদের সমাজজীবনের ভিত্তিই হল এই প্রতিহিংসার শপথ।

একমাত্র অপহৃতা বা পলাতকা কাফ্রাম নারীকে প্রত্যর্পণ করতে পারলে এ হিংসার তাণ্ডব বন্ধ করা যেতে পারে।

তাই সে করবে।

প্রাভারদের শিবিরে কাফ্রাম নারী বন্দিনী হয়েছে এ কথা তার বিশ্বাস হয় না। ইওসোভদের সম্বন্ধে একেবারে সন্দেহ-মুক্ত সে নয়। এই দুই শিবিরের কোথাও যদি সে বন্দিনী সত্যিই থাকে তাহলে কোন অজুহাত বানিয়ে শিবির-সারথিরা তাকে ফিরিয়ে দেবে বলে বিশ্বাস হয় না। এ প্রত্যর্পণ শিবির-ধর্মের বিরোধী। সুতরাং বুবনকে অসাধ্যসাধনের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। যদি অপহৃতা হওয়ার অনুমান সত্য হয় তাহলে নিজেদের বা ইওসোভদের শিবির থেকে বন্দিনীকে সে নিজেই হরণ করবে। তার শিকার-নৈপুণ্যের এই হবে চরম পরীক্ষা।

মনে মনে এই সব কথাই পর্যালোচনা করতে করতে বুবন অন্ধকারে অপরিচিত বন-পথের বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আপাততঃ তার গন্তব্য ইওসোভদের শিবির-প্রান্ত বলেই সে স্থির করেছে।

প্রাভারদের চেয়ে সেই শিবিরে অপহৃতাকে পাবার সম্ভাবনা কিছু বেশী।

তা ছাড়া এই সংকটে শর্ভের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কিছু লাভ হয়ত হ'তে পারে। তার প্রলাপ-ভাবনা যত বিক্ষিপ্তই হোক তার কাছে ইওসোভ শিবিরের মনোভাব কিছুটা জানতে পারা সম্ভব। কোন কোন বিরল সুস্থ মুহূর্তে আশ্চর্য পথনির্দেশও তার কাছে পাওয়া যায়।

অরণ্যপথে বেশীদূর কিন্তু তার অগ্রসর হওয়া হল না।

রাত্রির আকাশ যেন রক্তাক্ত ছুরিকায় বিদীর্ণ করে একটির পর একটি বহ্নিতীর তার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল।

এ তীর কারা ছুড়ছে তা বুঝতে দেরী হল না। কিন্তু কোথায় কাদের লক্ষ্য করে সংগ্রামের এই সূচনা?

দূরুদের বসতি ছাড়া আর কোন লক্ষ্য ত এ তীর-বর্ষণের হতে পারে না। কিন্তু এই নিরীহ নিরুপদ্রব তিনজন অসহায় সাধকের ওপরই এ প্রথম আক্রোশের আঘাত কেন? প্রতিশ্রুতি দিয়েও সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করবার ধৈর্য যাদের নেই, এতকাল দুর্বল নির্বিরোধী বলে অবজ্ঞার পাত্র হিসাবে যারা বিবেচিত হয়েছে তাদের ওপরেই প্রথম অতর্কিত নির্মম আঘাত হানতে যারা দ্বিধা করে না, কোন পাশবিক জিঘাংসায় তারা উন্মত্ত?

সমস্ত অরণ্যভূমিই যেন সশব্দে তার প্রশ্নের উত্তর দেয়।

আকাশ-ধরণীতে আতঙ্কের শিহরণ তোলে কাফ্রামদের তীব্র তীক্ষ্ণ যুদ্ধোল্লাস-ধ্বনি।

কাফ্রামরা তাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে। শিকার অনুসরণের নিঃশব্দ সন্তরণ নয়, কল্লোলিত হিংসার প্রবাহ।

দূরুরা এই দুর্বার স্রোত এড়িয়ে কোথায় পালাবে, কোন আশ্রয় তাদের নেই জেনেও বুবন তাদের বসতির দিকে ছুটতে শুরু করে। পদে পদে অরণ্যের বাধা। কিন্তু কোন কিছুতে যেন তার ভ্রূক্ষেপ নেই। যেমন করে হোক এই কাফ্রামবাহিনীর আগে তাকে দূরুদের বসতিতে পৌঁছোতে হবে। দূরু, আজিব বা নন্দক কেউই সবল স্কন্ধধর নয়। হলেও কোন সুবিধা অবশ্য হত না। তাদের একমাত্র রক্ষা পাবার উপায় কোথাও অন্ধ-গোপন করে থেকে এই দুর্বার প্রবাহের সামনে এগিয়ে যেতে দেওয়া। বুবন যদি সেইটুকু সাহায্য তাদের করতে পারে শুধু! কিন্তু সময়মত তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারলেও আত্মগোপন করবার মত কোন আশ্রয় তাদের জন্যে খুঁজে পাবে কি?

খুব বেশী দূরে বুবনকে যেতে হয় না। জ্বলন্ত কুটীরের অগ্নিশিখায় রক্তিম আকাশই তাকে দূরুদের বসতির পরিণাম জানিয়ে দেয়।

এদিকের বনভূমির অনেকখানি সেই আগুনে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

স্তম্ভিত হতাশায় সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বুবন চমকে ওঠে।

দূরের জ্বলন্ত বসতির রক্তাক্ত আলোকে দুটি দ্রুত ধাবমান মূর্তি ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়েই আবার অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওরা কারা? একটি ত স্পষ্টতই নারী-মূর্তি। এত দূর থেকেও তাকে পিঙ্গলকেশা বলে বোঝা যায়। কিন্তু তার সঙ্গী ওই পুরুষটি কে?

ক্ষণিকের দেখাতেও তার গতিভঙ্গি যে পরিচিত বলে মনে হ'ল সে কি চোখের বিভ্রম?

## চতুর্থ উল্লাস
## শৃঙ্গ গ্রহিতা

আরো এক পূর্ণিমা গত হয়েছে তারপর।

মুষ্টিমেয় মানবগোষ্ঠীর সংগ্রাম তবু থামেনি। কাফ্রামদের প্রথম আক্রমণের বন্যায় হতাহতের সংখ্যা খুব বেশীই হয়েছিল। তারপর তিন ভিন্ন গোষ্ঠীই স্বতন্ত্র সতর্ক সশস্ত্র দুর্গ-শিবিরে পরিণত হয়েছে। কাফ্রামদের বিরুদ্ধে প্রাভার ও ইওসোভরা হয়ত মিলিত প্রতিরোধে সংঘবদ্ধ হতে পারত। কিন্তু পরস্পরের প্রতি সন্দেহে অবিশ্বাসে তা সম্ভব হয়নি। ইওসোভ শিবিরপতিদের ধারণা প্রাভাররাই এ সংগ্রামের সূচনার জন্যে দায়ী। তারা কাফ্রামদের কোন সেবিকাকে অপহরণ করে এখন তা স্বীকার করতে সাহস করছে না এই ইওসোভদের অভিযোগ। প্রাভারদের অভিযোগও অনুরূপ।

প্রাভাররা গোপনে তীর-বার্তায় কাফ্রামদের কাছে নিজেদের নির্দোষ বলে জানিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার প্রস্তাব করেছে। ইওসোভরাও অনুরূপ উপায়ে স্পষ্টই জানিয়েছে যে প্রাভারদের অপরাধ সম্বন্ধে তারা নিঃসংশয়। কিন্তু কাফ্রামরা এ সব কথায় উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেনি। তাদের প্রতিজ্ঞা অচল অটল। অপহৃতাকে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম তারা চালিয়ে যাবে ফলাফল যাই হোক।

এই অবিরাম যুদ্ধমত্ততার তিন গোষ্ঠীরই শিবির-জীবন বিপর্যস্ত।

প্রকাশ্য সংঘর্ষ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তার পরিবর্তে নিরন্তর গুপ্ত আক্রমণের আশঙ্কায় সমস্ত শিবির ত্রস্ত।

শিবির-পরিধি ছাড়িয়ে কোথাও যাবার উপায় নেই। সে পরিধির মধ্যে থেকেও কেউ নিরাপদ নয়। আহার-অন্বেষণের জন্যে প্রাণ হাতে নিয়ে যারা শিবির প্রাকার থেকে বার হয়, অনেকেই তাদের ফেরে না। আহার্য ও

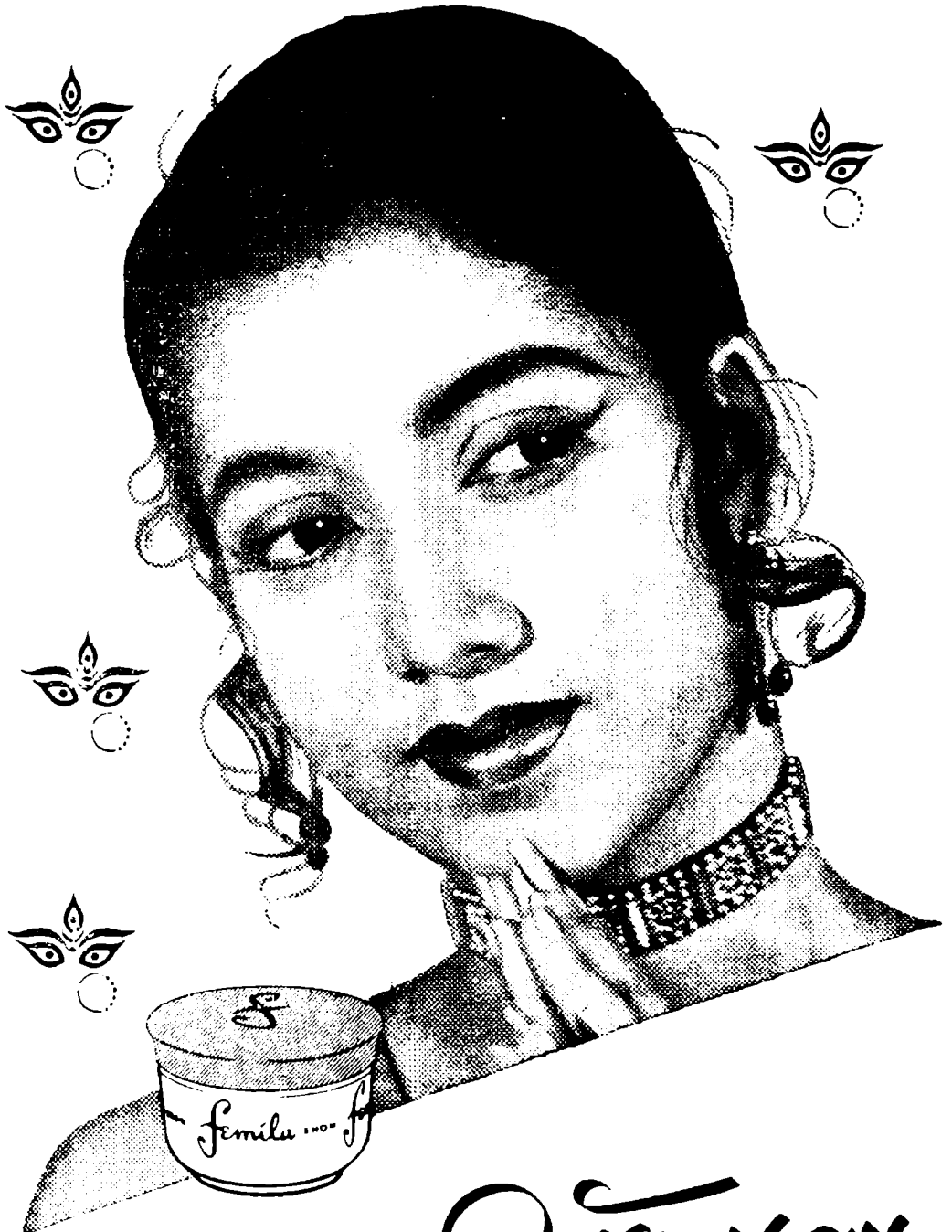


পূজোর শ্রেষ্ঠ নিবেদন...

ফেমিলা স্নো

জি. ভির অবদান

পানীয় দুর্লভ হয়ে আসছে ক্রমে। শত্রুর আক্রমণে শিবিরসেবকের সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ না হলে খাদ্যসংকট আরো নিদারুণ হয়ে উঠত নিশ্চয়। এ সংগ্রাম সমাপ্ত হবার কোন আশাই আর কেউ করে না। হিংসার বিষে জর্জর হয়েই মানব-সমাজের অনিবার্য বিলুপ্তি ঘনিয়ে আসছে—এই নিয়তিই সকলে মেনে নিয়েছে।

বুবন কি করেছে এতদিন? সেও কি এই নিয়তির বিরুদ্ধে সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল বুঝে হাল ছেড়ে দিয়েছে?

না, তা সে দেয়নি। এ পর্যন্ত সমস্ত চেষ্টায় বিফল হলেও তার সংকল্প এখনো অটুট।

সেই ভয়ংকর সংগ্রাম-সূচনার রাত্রে প্রথমে সে ক্ষণিকের দেখা যুগলমূর্তিকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বনপথে বহু দূর অন্বেষণ করেও তাদের সাক্ষাৎ আর পায়নি। কাফ্রামবাহিনী তখন সমস্ত অরণ্য-প্রান্তর প্লাবিত করে চলেছে। কোন-রকমে এক বৃক্ষচূড়ায় আশ্রয় নিয়ে সে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

তারপর প্রভাতে ফিরে গেল দুরুদের বসতিতে।

বসতির ভস্মাবশেষই সেখানে পড়ে আছে। দুরু ও তার দুই সঙ্গীর কোন চিহ্ন সেখানে নেই। সে চিহ্ন না থাকা সে শুভলক্ষণ বলে মনে করতে পারেনি। মৃত্যুর চেয়ে যা শোচনীয় কাফ্রামদের হাতে তাদের সেই বন্দীত্বই ঘটেছে বলে ধারণা করতে বাধ্য হয়েছে।

দুরুদের বন্দী হওয়ার অর্থ বিলুপ্তি-রোধের শেষ ক্ষীণ আশাও নির্বাপিত হওয়া। কিন্তু তবু নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারেনি বুবন।

গোপনে প্রথমে নিজেদের শিবিরে গিয়ে সন্ধান নিয়ে জেনেছে কাফ্রামদের অপহৃতা সেবিকা সেখানে নেই।

নির্মম বিরোধের আবহাওয়ায় সমস্ত অরণ্য-প্রান্তরই বিপদসংকুল। তবু সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে বুবন ইওসোভদের শিবির-সীমান্তে গিয়ে সন্ধান করেছে।

সেখানে গিয়ে প্রথমে শর্ভের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার দেখা পায়নি। অন্ধকার এক রাত্রে জীবন তুচ্ছ করে ইওসোভদের প্রস্তর-প্রাকার ডিঙিয়ে তাদের শিবিরও খুঁজে দেখে এসেছে তারপর। সেখানেও কাফ্রামদের কেউ বন্দিনী হয়ে আছে বলে প্রমাণ পায়নি।

প্রবেশ যতটা সহজ হয়েছিল নিষ্ক্রমণ হয়নি ততটা। রাত্রির অন্ধকারে গোপনে প্রাকার অতিক্রম করলেও বুবন ইওসোভদের বেশ-বৈশিষ্ট্যটুকু অনুকরণ করে গেছে। সে ছদ্মবেশ সত্ত্বেও ফিরে আসবার সময় সন্দিগ্ধ একজন প্রহরীর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তাকে শেষ পর্যন্ত নিহত করেই পালিয়ে আসতে হয়েছিল। শিবির-জীবনে এরকম করে হত্যা আগে তাকে কখনো করতে হয়নি এমন নয়। কিন্তু এবারে সমস্ত মন গ্লানিতে অনুশোচনায় ভরে গিয়েছিল। জাতির বিলুপ্তিরোধের ব্রত নিয়েছে বলেই এ হত্যার অধিকার তার আছে কিনা এই প্রশ্নের দ্বিধাদ্বন্দ্বে উঠেছিল জর্জর হয়ে।

মনের এই অবস্থাতেই ইওসোভদের শিবির-সীমা ছাড়িয়ে ফিরে যাবার পথে শর্ভের সঙ্গে দেখা।

আত্মগ্লানিতে অস্থির হয়ে শর্ভের কাছে অকপটে সমস্ত বৃত্তান্ত সে না বলে পারে নি।

শর্ভ হয়ত কৌতুক-প্রলাপে সবকিছু হেসে উড়িয়ে দেবে—এ আশঙ্কা থাকলেও অপরাধ-স্বীকারের এ সুযোগ সে নিয়েছিল অন্তরের অসহ্য যন্ত্রণায়।

শর্ভ কিন্তু কৌতুক করে নি। সমস্ত কথা নীরব মনোযোগের সঙ্গে শুনে গাঢ় গম্ভীর স্বরে বলেছিল, আমি শুধু ইওসোভ হলে রক্তের বদলে রক্ত নিতাম, প্রাণের বদলে প্রাণ। কিন্তু আর আমি ইওসোভ নই, শুধু মানব-জাতির এক প্রতিনিধিও নয়। আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে কিনা জানি না। তবু বলি আজ তোমাকে এ অন্তরের যাতনায় অস্থির হ'তে দেখে আমি উল্লসিত। তুমি শুধু প্রাভার ছিলে একদিন, তারপর মানুষ হয়েছিলে। আজ তার চেয়ে আলাদা কিছু হয়েছে, হয়েছে খোঁজার আর না বোঝার যন্ত্রণা। জ্বলে মরো বুবন, জ্বলে মরো। চরম অস্থিরতার পর অচলতার উদ্দেশ আপনি পাবে।

বুবন বোঝে নি কিছুই। বোঝবার কিছু ছিলও না বোধ হয় এই অসম্বন্ধ প্রলাপে। তবু এই এলোমেলো অর্থহীন ধাঁধার মত কথায় কেমন যেন একটু সান্ত্বনার প্রলেপ লেগেছিল তার জ্বালায়।

বিশেষ কোন লাভ হবে না জেনেও সংগ্রাম থামাবার যে উপায় সে ভেবেছে তাও এবার শর্ভকে জানিয়েছিল তার পরামর্শের আশায়।

সমস্যাটা বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিল, প্রাভার বা ইওসোভদের কেউ কাফ্রামদের কন্যা যে চুরি করেনি সে প্রমাণ আমি পেয়েছি শর্ভ। এখন কাফ্রামদের সে কথা বিশ্বাস করাবার উপায় কি?

বিশ্বাস করাতে অত ব্যস্তই বা কেন? এবার কৌতুককুঞ্চিত মুখে বলেছিল শর্ভ।

তা না করাতে পারলে এ যুদ্ধ থামবে না যে!

যুদ্ধ থামলে মানুষ বদলাবে কি? শর্ভ হেসে উঠেছিল। মানুষ না বদলালে আজ যুদ্ধ থামিয়ে কাল আবার তার ছুতো খুঁজে বার করতে কতক্ষণ। না বুবন, যুদ্ধ থামিয়ে কোন লাভ নেই।

কিন্তু যুদ্ধ না থামলে মানুষ বলতে আর কেউ থাকবে না! বুবন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে বলেছিল।

নাই বা রইল! মানুষকে যেমন করে হোক টিকিয়ে রাখতেই হবে এমন কি কথা আছে। থাকার যোগ্যতা যার নেই তাকে চলে যেতে হবে এই ত নিয়ম। সত্যমিথ্যা কল্পনায় মেশানো কত পুরাণ, কত কাহিনী কত ইতিহাসই ত শুনলাম। অনেক কীর্তি ছিল তার অনেক ঐশ্বর্য অনেক ক্ষমতা, কিন্তু সে ত শুধু নিজেকে ধ্বংস করতেই চেয়েছে চিরদিন। সেই ধ্বংসই সে হোক না। এ পরিণামে এই অরণ্যের একটা বেশী পাতাও তার দুঃখে খসে পড়বে না জেনো।

শেষ কথাগুলো বলবার সময় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল শর্ভ।

আবার তার সেই বাতুলতা শুরু হয়েছে বুঝে বুবন বিদায় নেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শর্ভ তাকে ছাড়ে নি।

ধরে রেখে বলেছিল, আমাকে তুমি উন্মাদ ভাবছ জানি বুবন। আমার কথায় তোমার সংকল্প তুমি ত্যাগও করবে না নিশ্চয়। এ যুদ্ধ যদি সত্যিই থামাতে চাও তাহলে যা বলি শোন। আমরা বা তোমরা যে নির্দোষ এ কথা কাফ্রামদের বোঝাবার আশা ছেড়ে দাও। তারা একমাত্র যা বুঝবে সেই হারানো কন্যা ফিরিয়ে দাও তাদের।

না পেলে ফিরিয়ে দেব কি করে? হতাশভাবে বলেছিল বুবন। আমাদের কোন শিবিরে সে নেই। কোথায় সে আছে জানলে তিমির-কন্দর হলেও গিয়ে ধরে বেঁধে আনতাম।

সেই তিমির-কন্দরেই তাহলে গিয়ে দেখলে ত' পারো। প্রাচীন প্রবাদ কি বলে জানো ত? প্রাণ হারালেও তিমির-কন্দরে খুঁজলে মেলে।

কিন্তু সে ত কথার কথা! অবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল বুবন,—সত্যি তিমির-কন্দর কোথাও আছে কি?

আছে! আছে! আবার প্রলাপ শুরু হয়েছিল শর্ভের। নইলে সূর্য উঠতে না উঠতে কোথায় গিয়ে লুকোয় সব অন্ধকার! কোথা থেকে মৃত্যু আসে নিঃশব্দে হিম-শীতল অহিরাজের মত সকলের অগোচরে।

বলতে বলতে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠে শর্ভ তাকে ছেড়ে চলে গেছল।

## পঞ্চম উল্লাস
## তৃণারণ্যনিবাসী

তাদের কুটীর ভস্মীভূত হলেও দুরু, আজিব ও নন্দক তাতে মারা পড়ে নি। তাদের বসতির কাছে একটি লতাগুল্মাচ্ছাদিত অর্ধ-শুষ্ক নালায় আত্মগোপন করে কাফ্রামদের প্রথম আক্রমণ থেকেও তারা রক্ষা পায়।

তারপর দুর্গম পার্বত্য অরণ্যের ভেতর দিয়ে সাধারণ চলাচলের সমস্ত পথ সযত্নে পরিহার করে দিনের পর দিন তারা সুদূর পর্বতবেষ্টনীর দিকে অগ্রসর হয়েছে। এ পর্বতমালায় কেউ কখনো যায় নি। এ গিরিবেষ্টনী ঘন নীল মেঘপুঞ্জের মত সুদূর দিগন্তে চাক্ষুষ দেখা গেলেও পুরাণ ও কিংবদন্তীর জগতের বস্তুর মতই তাদের কাছে অবাস্তব।

দিনের পর দিন অজানা অরণ্যভূমিতে পথ হারিয়ে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত-কাতর হয়ে তাদের মনে এই অভিযানের সার্থকতা সম্বন্ধেই সংশয় জেগেছে।

সে সংশয় প্রথম প্রকাশ করেছে, আজিব।

ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে, যে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় চলেছি সে তিমির-কন্দর সত্যিই কি কোথাও আছে? উপকথা রচনা যাদের বিলাস এ তাদেরই অলীক কল্পনা নয় ত?

তিমির-কন্দরে আশ্রয় নেবার পরামর্শ প্রথম নন্দকেই দিয়েছিল। কিন্তু তারও আত্ম-বিশ্বাস বুঝি শিথিল হয়ে এসেছে। সে কোন উত্তর না দিয়ে নীরব থেকেছে।

উত্তর দিয়েছে দুরু। দৃঢ়স্বরে বলেছে, না, তিমির-কন্দর অলীক কল্পনা হতে পারে না। ওই দূর গিরিমেখলা যদি দৃষ্টিবিভ্রম না হয় তাহলে তিমির-কন্দর ওখানে আছে-ই।

কিন্তু সে কন্দর খুঁজে পাবে কেমন করে? তা যে নিরাপদ হবে তারই বা স্থিরতা কি?

নিরাপদ যে হবেই কোন প্রমাণ দিতে পারবে না এখন, কিন্তু যে অঞ্চল আমরা ছেড়ে যাচ্ছি তার চেয়ে বেশী বিপদ সেখানে আছে বলে ভাবতে পারছি না। আর খুঁজে পাওয়ার কথা যদি বলো তাহলে তার নিশানা যা জানি তা খুঁজে যদি না পাই তবে বৃথাই এতদিন ইতিহাস-উদ্ধারে জীবনপাত করেছি।

কি বলে তোমার ইতিহাস? ইতিহাস থেকে যে সঠিক নির্দেশ পাবে তারই বা নিশ্চয়তা কি! নন্দকই এবার জিজ্ঞাসা করেছে।

কয়েকটি শমীবৃক্ষবেষ্টিত একটি বৃহৎ বেদীসদৃশ প্রস্তরখণ্ডের ওপর তখন তারা পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করবার জন্যে বসেছে।

কটা শুখনো বিবর্ণ শমীগাছের পাতা এদিকে-ওদিকে পড়েছিল। তারই কয়েকটা কুড়িয়ে নিয়ে দুরু বলেছে, অরণ্যের লতা-গুল্মতরু নিয়ে যে সারাজীবন কাটিয়েছে, সে এই কটি জীর্ণপত্র থেকেই শমীবৃক্ষের ধারণা মনের মধ্যে গড়ে তুলতে পারে নাকি? এমনি যে সব স্মৃতির টুকরো আর নিদর্শন কালপুরুষ এধারে-ওধারে তার যাত্রাপথে ছড়িয়ে রেখে যায় তাই কুড়িয়েই ইতিহাসের উপাদান গড়ে ওঠে। যে চেনে বোঝে তার কাছে এই শুষ্ক পত্র যেমন শমীবৃক্ষের রূপ, সেই উপাদানে তেমনি ইতিহাসের সত্য প্রচ্ছন্ন।

আজিব এবার একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলেছে, এসব কথা অস্বীকার করছি না দুরু। কিন্তু তিমির-কন্দর সম্বন্ধে বিশেষ এমন কি পেয়েছ যাতে তার অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্বন্ধে তুমি নিঃসন্দেহ, তাই জানতে চাইছি।

যা পেয়েছি তা ইঙ্গিত ও উল্লেখ মাত্র। কিন্তু তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। দুরু দীর্ঘ আলাপের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বলতে সুরু করেছে, মানবসমাজ বলতে আমরা আমাদের তিনটি ভিন্ন গোষ্ঠীর কথাই এখন জানি। কিন্তু মুষ্টিমেয় এই কটি প্রাণী নয়—এই অরণ্যের পশুপক্ষীর মত একদিন অগণন মানুষ সমস্ত ধরণীকে ছেয়েছিল এ বিষয়ে তোমাদেরও নিশ্চয় কোন সন্দেহ নেই। আমাদের এ ধরণী অনন্তসলিলঘেরা অলঙ্ঘ্য পর্বত-প্রাকারবেষ্টিত সমতল এক খণ্ড আরণ্য-প্রদেশ মাত্র যে নয় তাও তোমাদের বলতে হবে না। এ ধরণী এক শূন্যে ভাসমান গোলক সূর্য-চন্দ্র-তারকারা যাকে নিত্য প্রদক্ষিণ করে। প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের দুচারটি যে বাণী পুরাণ কিংবদন্তীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে পাই তাতে এমন কথাও আছে যে, এ মহাগোলক মহাকাশের কেন্দ্রবিন্দু নয়, এই ধরণীই সূর্যের চারিদিকে বিশাল বৃত্তপথে নিত্য ভ্রাম্যমাণ। সে যাই হোক যে ধরণী-গোলকে একদিন মানব স্থানের জন্য কাড়াকাড়ি করেছে, তাতে শেষ কটি মানব-প্রতিনিধি কেন যে আজ লুপ্ত হতে চলেছে সে সম্বন্ধে অনুমান কল্পনা ও প্রমাণ মিলিয়ে কিছু ধারণা আমরা করতে পেরেছি। বহু কল্প আগে আজকের দিনের মরীচির পরিবর্তে পুলহ কি পুলস্ত্য যখন উত্তরাকাশের ধ্রুবজ্যোতি তখন মানবসমাজ শক্তি ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছোয়। মানুষের পরমায়ু তখন কিঞ্চিতোর্ধ্ব ত্রিংশতিই ছিল না, যৌবনকালই স্থায়ী হত দুই বিংশতি বৎসর। সেই মহাযুগের ঋষি-তাপসেরা কিন্তু ভ্রষ্ট হ'য়েছিলেন তাঁদের স্বধর্ম থেকে। তাঁরা কেমন

চেয়ে ক্ষমতাকেই আরাধ্য করে অসাধ্য সাধন করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সিদ্ধি থেকেই মানবসমাজের সর্বনাশ। সেই তাপসেরা সূর্যকেও হীন করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের আশ্চর্য সাধনায় এই ধরণীতেই অগণন সূর্যশাবক সৃষ্টি করেছিলেন। মানবের হাতে নির্মিত হয়েও এই সূর্যশাবকেরা কিন্তু মানুষের শাসন মানে নি, সমস্ত ধরণী দগ্ধ ও বিধ্বস্ত করে তারা পিতৃলোকেই প্রস্থান করেছে। এই মহা-প্রলয় একবার নয় বহুবার ঘটেছে। প্রতি মন্বন্তরে ধরণীর মানবগোষ্ঠী ক্রমবিলুপ্ত হতে হতে শেষ এই তিনটি শিবিরে সীমাবদ্ধ হয়েছে। এই তিন শিবির-গোষ্ঠীর সুদীর্ঘ পর্যটনের কিছু কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়। মানবসমাজের ক্রমবিলুপ্তির কারণ সূর্যতাপ্তিলোম এক অভিশাপ। সে অভিশাপ সমস্ত ধরণীর সলিল মৃত্তিকা ও বাতাসে মেশানো, কোথাও অল্প কোথাও বেশী। যে গামা-রশ্মি আমরা কুসংস্কারবশে অপেয় ভূষণ বলে গণ্য করতে অভ্যস্ত, তা সেই অভিশাপেরই স্মারকচিহ্ন। এ অভিশাপ পুরুষের পৌরুষ হরণ করে, নারীর নারীত্ব। যুগে যুগে শিশুজন্ম তাই ক্রমশঃ এত বিরল হয়ে এসেছে। আজ আমরা যে তিন স্বতন্ত্র গোষ্ঠী এই যৎকিঞ্চিৎ ভূখণ্ড-টুকুতে পরস্পরের শত্রুতা করছি কোন এক সুদূর ভূত-কল্পাংশে ধরণীর অন্য কোথাও তাদের ভিন্ন ভিন্ন জনবহুল বসতি ছিল। গোষ্ঠী-নামের মধ্যে সেই অতীতের মিলন-বিচ্ছেদের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকলেও থাকতে পারে। এই ভিন্ন সব গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও অভিশাপ মুক্ত স্থানের সন্ধানে বহু যুগব্যাপী বিচরণে শেষ পর্যন্ত এই-খানে এসে যে সমবেত হয়েছে, তাতেই প্রমাণ হয় ধরণীর আর সমস্ত অংশই বর্তমানে জনশূন্য। এ ভূখণ্ডে এসে শেষ আশ্রয় নিয়েও কোন গোষ্ঠীই কিন্তু সম্পূর্ণ অভিশাপমুক্ত হতে পারে নি। ক্রমে ক্রমে নবজাতকের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে আজ শূন্যতায় পৌঁছেছে। গোষ্ঠী-বিলোপের উদ্ভ্রান্ত আতঙ্কেই নিশ্চয় আমাদের নীতি-ধর্ম-সমাজবিধি সব কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন কালের চিরাচরিত সব প্রথার সঙ্গে আমাদের বর্তমান শিবির-রীতির কোন মিলই নেই। কোন সুদূর অতীতে এ সব পরিবর্তন কি ভাবে হয়েছে তা কেউ জানে না। শুধু এইটুকু পুরাণ-কথা থেকে পাই যে, আজ আমাদের গোষ্ঠীজীবনে যে শিবিরবধূ ও সমাজভর্তার সবচেয়ে বেশী সমাদর, আদিম কালে তা নাকি অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু রীতি-নীতির এ আমূল রূপান্তরও নিষ্ফল। দু-একটি নতুন রীতি-নীতিও শিবিরজীবনের স্মরণকালের মধ্যে প্রবর্তিত হয়েছে, যেমন প্রজনন সার্থক করার আশায় ভিন্ন গোষ্ঠীর নারী ও পুরুষ হরণ। এ প্রথা খুব দীর্ঘকালের নয়। শিবিরগাথাতেই পাই যে, আমাদের তিন জীবনকাল আগে কাফ্রামরাই প্রথম নারী সংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিকারে আমাদের ও ইওসোভদের পুরুষ হরণ করে নিয়ে যায়। তার প্রতিশোধ নিতে কাফ্রামদের কয়েকটি নারী অপহৃতা হবার পরই এই ভূখণ্ডের সবচেয়ে সাংঘাতিক সংগ্রামের আগুন জ্বলে উঠেছিল। সে আগুন তারপর স্তিমিত হয়ে এলেও একেবারে নির্বাপিত হয়নি। আজ আবার তার উন্মত্ত আস্ফালন শুরু হয়েছে। তিমির-কন্দরের অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে এ দীর্ঘ ভূমিকা করার কারণ এইবার বলছি শোন। আজ আমরা যার মধ্যে নিমগ্ন তার চেয়ে আরো ভয়ংকর এক প্রলয়তাণ্ডবের দিনে এই তিমির-কন্দরই তখনকার এক বিশাল মানবগোষ্ঠীর শেষ আশ্রয় হয়েছিল বলে আমি সারা জীবনের সন্ধানে আবিষ্কার করেছি। মরীচিরও পূর্বে যখন উত্তর গগনের ধ্রুবজ্যোতি তখন শেষ মন্বন্তরের ধ্বংস-লীলায় সমস্ত ধরণী শ্মশান হবার উপক্রম হয়। এই ভূখণ্ডের একটি মানব-সম্প্রদায় তখন কৃত্রিম সূর্যের অভিশাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পর্বত-প্রাচীর লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করে। তাতে বিফল হয়ে তারা নগদেবের শরণ নিয়ে তাঁর করুণাভিক্ষার্থী হয়। নগদেব তাদের আকুল প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করে তাদের সেখানে আশ্রয় দেন।

নগদেবের সেই বিদীর্ণ বক্ষই তিমির-কন্দর।

সে তিমির-কন্দরে কত যুগ সেই মানব-সম্প্রদায়ের কাটে জানা নেই। কোন এক সময়ে তাদেরই একটি ক্ষুদ্র শাখাদল এই ভূখণ্ডে কোনো অজ্ঞাত কারণে আবার ফিরে এসেছিল বলে মনে হয়। তারা সেই কন্দরেই আবার ফিরে গেছে না এইখানেই আমাদের শিবির-উপনিবেশগুলি স্থাপিত হবার আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তা বলা যায় না। তাদের দু-একজন শেষ প্রতিনিধি আমাদের আদি শিবির-সমাজের সঙ্গে মিশে গেছল এমনও হতে পারে। তিমির-কন্দরের কিংবদন্তীর উৎস সম্ভবতঃ তারাই।

শুধু কিংবদন্তীতে নয়, তিমির-কন্দরের অস্তিত্বের আরো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এই ভূখণ্ডের নানাস্থানে ছড়ানো আছে। অজ্ঞতায় ও ঔদাসীন্যে তার মূল্য আমাদের কোন শিবির-সমাজই এতদিন বোঝেনি।

ইতিহাস-উদ্ধারের সাধনায় বহু তুচ্ছ প্রস্তরখণ্ড আমায় তোমরা সংগ্রহ করতে দেখেছ। সে সব প্রস্তরখণ্ড কিন্তু সত্যই তুচ্ছ নয়। তিমির-কন্দর থেকে যে শাখাদল এই ভূখণ্ডে ফিরে আসে নিজেদের স্মারক হিসাবে কন্দরের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ তারা বহু শিলাফলকে খোদিত করে নানাস্থানে রেখে যায়। কালক্রমে সে সব শিলাফলকের অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। আমি যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা তার বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ মাত্র। এ সব ভগ্নফলকের সত্যকার মূল্য আমিও কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বুঝিনি কারণ আমি যা পেয়েছি তা শুধু মূল শিলাফলকের ভগ্নাংশ নয়, তাতে যে লিপি খোদিত তাও আমাদের অজ্ঞাত।

মাত্র কিছুদিন আগে দৈবাৎ একটি ফলকাংশে আমি অজ্ঞাত-লিপির পাশে আমাদের শিবির-সমাজের আদি লিপিতে খোদিত কিছু লিখন দেখতে পাই।

কন্দর-প্রত্যাগতদের কেউ কেউ যে আমাদের সুদূর অতীতের পূর্বপুরুষদের সান্নিধ্যে এসেছিল—এ শ্বেতলিপি তারই আভাস দেয়।

এই শ্বেতলিপির সাহায্যে বহু চেষ্টায় আমি মূল খণ্ডগুলির অনেকখানি পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি। তাই তিমির-কন্দর যে আছে এ বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই।

মাঝে মাঝে দু-একটি প্রশ্ন করার ইচ্ছা হলেও নন্দক ও আজিব এতক্ষণ নীরবে দুরুর কথা শুনেছে।

আজিব এবার উৎসুকভাবেই প্রশ্ন করলে, গুপ্ত কন্দর খুঁজে বার করার কি নির্দেশ পেয়েছ ওই শিলাফলকের লিপিতে?

যা পেয়েছি তার ভাষাও অবশ্য সাংকেতিক। পর্বতদুহিতা নিষ্ক্রান্ত হয়েও সভয়ে যেখানে পিতৃক্রোড়ে ফিরে গেছেন সেইখানেই নগদেবের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে জানবে, শিলাফলকে খোদিত লিপির এই নির্দেশ।

এ সাংকেতিক ভাষার অর্থ তুমি বুঝেছ? জিজ্ঞাসা করলে নন্দক।

বুঝেছি বলেই আমার বিশ্বাস। দুরু স্মিতমুখে জানালে, পর্বতদুহিতা বলতে প্রস্রবণ বা নদীর উৎস বোঝাচ্ছে নিশ্চয়। কোন গুহামুখ থেকে নির্গত হয়েই এক পর্বত্য জলধারা যেখানে আবার নিকটস্থ কোন গহ্বরে প্রবেশ করেছে সেই বিচিত্র ঘটনাস্থলেই কন্দরের সন্ধান আমাদের করতে হবে।

তাহলে সমস্ত পর্বতমালাই আমাদের পর্যটন করে খুঁজে দেখতে হবে নাকি?

আজিবের কণ্ঠে শঙ্কিত বিস্ময়।

না, আরো কিছু সঠিক নির্দেশও আছে। দুরু কৌতুকস্মিত মুখে জানালে, যেমন, যুগশিরা নগদেবকে প্রণাম না জানালে তিমির-কন্দর গোচর হবে না। তার অর্থ, পর্বতমালার দুটি সমান্তরাল ও সন্নিহিত চূড়া লক্ষ্য করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। সে যুগল-শৃঙ্গ আশা করি তোমরাও লক্ষ্য করেছ।

তা করেছি! আজিবকে এবার চিন্তিত মনে হ'ল। কিন্তু তিমির-কন্দর খুঁজে পেলেও সেখানে আশ্রয় পাওয়া ত সম্ভব না হতে পারে! সেই প্রাচীন সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন যদি না হয়ে থাকে?

তারচেয়ে বড় সৌভাগ্য ত কিছু আর হতে পারে না। দুরু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল। নন্দকের বিলুপ্তি-রোধের সাধনায় তাহলে ত আর প্রয়োজনই হয়ত থাকবে না। কন্দরবাসীদের কাছ থেকেই সে সমস্যার সমাধান আমরা পেয়ে.....

কথার মাঝখানে হঠাৎ সচকিত হয়ে থেমে দুরু ব্যস্তভাবে উঠে বসল। তারপর উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলে, শুনতে পেয়েছ কিছু!

নন্দক এবং আজিবও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। শমীবৃক্ষের বেষ্টনীর ওপর

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে তারা জানালে যে শুধু শব্দ নয় চকিতে কি যেন একটা চলে যেতেও তারা দেখেছে। সেটা কোন বন্য মৃগ বা বরাহ নয়।

এ অরণ্যে আর কোন বৃহৎ প্রাণী আছে বলে ত জানা নেই! দুরুর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল দুর্ভাবনায়।

বন্য কোন পশু কিনা তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে। সংশয়জড়িত স্বরে বললে নন্দক।

বন্য পশু না হলে আর কি হতে পারে?—দুরু রীতিমত উদ্বেগের সঙ্গে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলে,—মানুষ? কাফ্রামদের কেউ আমাদের অনুসরণ করে এসেছে এতদূর পর্যন্ত?

না, তা সম্ভব বলে মনে হয় না। কাফ্রামদের কেউ হলে আমরা এতক্ষণ অক্ষত থাকতাম কি? শত্রুর সন্ধান পেয়েও তীর নিক্ষেপ না করে পলায়ন করা তাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলেই ত জানি।

তবু অত্যন্ত সাবধানে গোপনে এবার আমাদের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। তিমির-কন্দরের সন্ধান আমাদের অনুসরণ করে কাফ্রামরা যেন কিছুতে না পায়। তা পেলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না।

সেই সর্বনাশই যেন মনশ্চক্ষে দেখবার চেষ্টা করে দুরু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে আবার নিম্নস্বরে বললে, যুগল-শৃঙ্গ যে আমাদের লক্ষ্য তা আমাদের গোপন রাখতে হবে এদিকে-ওদিকে গতিপথ পরিবর্তন করে। কখনো কখনো রাত্রির অন্ধকারেরও সুযোগ নিতে হবে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার জন্যে।

## ষষ্ঠ উল্লাস
## খলেকলোকিকা

শমীকাননে দুরু ও তার সঙ্গীরা চকিতে যাকে দূর থেকে দেখেছিল, সে আর যেই হোক কাফ্রামদের কেউ নয়।

কারণ কাফ্রামদের সেই দ্বিপ্রহরেই মহা-চক্রের অধিবেশন বসেছে।

এ মহাচক্রে নিতান্ত অক্ষম পঙ্গু ও মুমূর্ষু ছাড়া কারুর অনুপস্থিত থাকবার উপায় নেই।

কাফ্রামদের মহাচক্র নিয়মিতভাবে আহূত হয় না। অতিবিরল এ সমাবেশ আয়োজিত হয় গোষ্ঠীসমাজের নিদারুণ কোন সংকটে কিংবা মৌলিক কোন বিধির যুগান্তকারী প্রবর্তন বা প্রত্যাহারের জন্যে।

বর্তমান গোষ্ঠীর নেতামা ছাড়া আর কেউ কখনও মহাচক্রের অধিবেশন দেখেনি। নেতা-মাই একমাত্র এ সমাবেশ দেখেছেন তাঁর কৈশোর-জীবনে।

কাফ্রামদের বিস্তৃত বসতির চারিধারে খর্জু আরণ্য পাদপের সুউচ্চ প্রাকার। প্রত্যেকটি পাদপের শীর্ষদেশ ভল্লচূড়ার মত সুচল ও তীক্ষ্ণ। মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ-নির্মিত তাদের গোলাকার কুটীরগুলির চূড়াও এমনি ভল্লশীর্ষ। বসতির মধ্যদেশে যে বিশাল প্রান্তর ঘিরে কুটীরগুলি সাজানো সেদিন তাইতেই সমস্ত কাফ্রামগোষ্ঠী নেতামাকে ঘিরে সমবেত হয়েছে। নেতামা নাতিউচ্চ একটি বেদীর ওপরে কাষ্ঠাসনে আসীন। তাঁর দুপাশে সশস্ত্র ভল্লশীর্ষ শিরোভূষণে সজ্জিতা দুই মণ্ডলনেত্রী।

কাফ্রামদের মধ্যে জনকয়েক সমাজভর্তা ছাড়া প্রায় সকলেই রমণী এবং সকলেই সশস্ত্র। শরীরের গঠনসৌষ্ঠবে প্রত্যেককেই যুবতী বলে মনে হয়। প্রায় নিরাবরণ সবল সুঠাম নারীদেহে কোমলতার চেয়ে কাঠিন্যের প্রাধান্যই যেন নূতন এক আকর্ষণের উৎস সৃষ্টি করেছে। ঘন কৃষ্ণ থেকে স্বর্ণাভ গৌর পর্যন্ত তাদের বর্ণবৈচিত্র্যও বিস্ময়কর।

এই যুবতী-সমাজে নেতামাকেই একমাত্র জরাজীর্ণ বলে বোঝা যায়। কাফ্রামদের কেশ-চর্চার রীতি অনুযায়ী তাঁর শুভ্র বিবর্ণ কেশও ভল্লশীর্ষ শিরোভূষণে সজ্জিত। মুখের চর্ম তাঁর লোল। দীর্ঘকালব্যাপী নেতৃত্বের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সেখানে অসংখ্য বলিরেখা অঙ্কিত করে দিয়ে গেছে। বয়সের ভারে দেহ তাঁর ন্যুব্জ। শুধু দুই চোখে যেন অনির্বাণ বহ্নির দীপ্তি।

এই মহাচক্র তিনি নিজেই আহ্বান


দি ফিনিস্ পেপার মিলস্ এসোসিয়েশন

হেলসিন্‌কি, ফিনল্যাণ্ড

১,৩০০,০০০ টন ফিন্ দেশীয় কাগজের বিক্রয় প্রতিষ্ঠান

FINLAND

এজেণ্টস্ :

জেমস্ ফিনলে এণ্ড কোং লিমিটেড

বম্বে — মাদ্রাজ — কলিকাতা — নিউদিল্লী

করেছেন। কেন করেছেন তা তাঁর নিত্য-সহচরী মণ্ডল-নেত্রীরাও জানে না।

সমাজের অধিকাংশের অনুমান বিপক্ষ-শিবিরের সঙ্গে যে সংগ্রাম চলছে তাতে বিস্ময়কর কোন নূতন রণকৌশল প্রয়োগের কথা জানাতেই এ মহাচক্রের অধিবেশন।

অভিজ্ঞতা যাদের বেশী তাদের অনুমান কিন্তু ভিন্ন। অনুমান নয় আশঙ্কা। নেতামা তাঁর পরিচালন-দণ্ড ত্যাগ করে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করতে চান—এই সম্ভাবনাই তাদের উদ্বিগ্ন করেছে।

শুধু নেতামার বেলা নয় জরাগ্রাসে পতিত হলে সমাজ-বসতি থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে যাওয়ার প্রথা অবশ্য কাফ্রামদের সকলের পক্ষেই পালনীয়। শক্তি সামর্থ্য ও যৌবন থাকতে সমাজ ছেড়ে চলে যাওয়া যেমন ক্ষমাহীন অপরাধ, বার্ধক্যে অশক্ত অক্ষম হবার পর বসতি ছেড়ে না-যাওয়া তেমনি লজ্জাকর। এ নির্মম প্রথা অতীতের কোন দীর্ঘ দুর্দিনের স্মৃতি সম্ভবতঃ বহন করছে। আহার্যের অভাব ও তা সংগ্রহের দুঃসাধ্যতার দরুণ সুস্থ ও সবলকে বাঁচিয়ে জাতির জীবনধারা রক্ষার জন্যে দুর্বল অসমর্থ বৃদ্ধদের আত্মত্যাগের এ প্রথা বোধ হয় প্রবর্তিত হয়েছিল।

বর্তমান ভূখণ্ডে কাফ্রামদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে বহু যুগ পূর্বে। এখানে আর যত সমস্যাই থাক খাদ্যের অপ্রতুলতা নেই। প্রয়োজন বহু পূর্বে লোপ পেলেও, প্রথা কিন্তু এখনও সমানভাবে প্রচলিত।

নেতামা সেই প্রথানুযায়ী নির্বাসন চাইবার জন্যেই এই মহাচক্র আহ্বান করেছেন এ ধারণা অবশ্য ভুল। নেতামার ভাষণেই তা ভালো করে বোঝা যায়।

নেতামা সে প্রসঙ্গ তোলেন না।

ঈষৎ ক্ষীণ হলেও সুস্পষ্ট দৃঢ় ও গাঢ়স্বরে তিনি বলতে শুরু করেন, আজ এই মহাচক্র কেন ডেকেছি তা জানতে সকলেই নিশ্চয় উৎসুক। মহাচক্র হেলা-ফেলার ব্যাপার নয়। মহাচক্র আহ্বান করবার দায়িত্ব নেবার আগে দীর্ঘকাল কঠিন আত্ম-জিজ্ঞাসায় আমায় অস্থির থাকতে হয়েছে। আমাদের কাফ্রাম-সমাজের ইতিহাস কোন সুদূর কাল থেকে শুরু আমিও জানি না। সময়ের দুর্ভেদ্য কুজ্ঝটিকায় আমাদের আদি কাহিনী হারিয়ে গেছে। এই সুদীর্ঘ ইতিহাসেও মাত্র পাঁচবার মহাচক্রের অধি-বেশনের কথা আমি জানি। প্রথম মহাচক্র আহূত হয় কাফ্রামদের প্রায় জন্মকালে। উপকথার আকারে সে বিবরণ আমরা পেয়েছি। সেদিন নাকি আমাদের জাতির প্রথম নিদারুণ মহাসঙ্কট দেখা দিয়েছিল। আমাদের পুরাণে বলে দিন ও রাত্রির সন্তানদের মিলনে আমাদের কাফ্রাম জাতির সৃষ্টি। দিন ও রাত্রির সন্ততিরা তখন এক মহাভূখণ্ডে একত্র হয়েছে কিন্তু মিলিত হতে পারেনি। কে তাদের শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে তাদের দ্বন্দ্বের তখন আর বিরাম নেই। রাত্রির সন্ততিদের অন্তরের গভীরতা ও ঐশ্বর্য তারকাখচিত মহাকাশের মতই অসীম, দিনের সন্তানদের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার

দীপ্তি সূর্যালোকের মতই প্রখর। এ দুই-এর মিলনে আশ্চর্য জাতিসত্তার জন্ম হতে পারে। কিন্তু অবিশ্বাসে ঈর্ষায় ঘৃণায় সংকীর্ণতায় পরস্পরকে আঘাত করবার জন্যেই তারা এমন উন্মত্ত যে সে ভূখণ্ডের আকাশ-বাতাস পর্যন্ত হিংসায় তখন বিষাক্ত। সেই মহাসঙ্কটের দিনে রাত্রির যিনি দেখা দেন এবং প্রতি রজনীতে যাঁর আকাশে এখনো সবচেয়ে উজ্জ্বল দীপ্তিতে অবস্থান পরিবর্তিত হয় সেই নক্ষত্রশ্রেষ্ঠা সূর্যকন্যা তিনসা এক প্রদোষে ধরণীতে নেমে আসেন এই দুই দলের বিরোধ মেটাতে। সেই সুদূর অতীতে সূর্যকন্যা প্রভাতে ও সন্ধ্যাতেই নাকি মহাকাশে দেখা দিতেন। প্রথম মহাচক্র আহ্বান করে দিন ও রাত্রির মিলনে—কাফ্রাম জাতির তিনিই সৃষ্টি করেন এবং তিনিই আমাদের প্রথম নেতামা তিনসা।

নেতামা কয়েক মুহূর্ত নীরব হন। প্রায় সপ্তগুণক বিংশতি কাফ্রাম যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁর কথা শোনবার জন্যে একাগ্র হয়ে আছে মনে হয়।

নেতামা এবার দ্বিতীয় মহাচক্রের কথা বলেন। সেই সূত্রে প্রথম মন্বন্তরের তিনি যা বিবরণ দেন তা দূরের ইতিহাসের অনুরূপ হলেও এক নয়। সুদূর অতীতে কাফ্রামরা তখন তাদের গৌরবের চরম শিখরে পৌঁছেছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূত জয় করে তারা অসীম শক্তির অধিকারী হয়ে তখন ব্যোম-বিজয়ে অগ্রসর। ধূলিকণাকেও সূর্যপ্রমাণ করবার দুর্লভ বিদ্যা তাদের আয়ত্ত। কিন্তু সেই বিদ্যাই সমস্ত ধরণীর চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। সূর্যস্ফুরণবিদ্যা কাফ্রামদের মত আরো বহু মানবসম্প্রদায় তখন অর্জন করেছে। ব্যোম-বিজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও তারা অগ্রসর। পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা সত্ত্বেও একদিন কোনো এক সম্প্র-দায়ের অনবধানতায় সূর্যস্ফুরণবিদ্যার নির্দোষ পরীক্ষা নিষিদ্ধ সীমা ছাড়িয়ে যায়। সমস্ত ধরণীর ধ্বংসলীলার তাইতেই সূত্রপাত। মন্বন্তরের সেই মহাপ্রলয়ের দিনে দ্বিতীয় মহাচক্র আহূত হয়, সূর্য-বিকৃতিতে বিষাক্ত ভূখণ্ড ত্যাগ করে ধ্বংসাবশিষ্ট কাফ্রামদের অন্যত্র প্রয়াণের সঙ্কল্প গ্রহণের জন্যে। কাফ্রামদের যুগ-যুগ-ব্যাপী পরিব্রাজন তখন থেকেই শুরু। দেশ থেকে দেশান্তরে নিরাপদ নির্বিষ আশ্রয়ের আশায় তারা নব নব উপনিবেশ স্থাপন করে, কিন্তু তাদের সংখ্যা ক্রমশঃই ক্ষয় পেতে থাকে। যত ক্ষীণই হোক জাতির ধারা প্রবাহিত রাখবার আশায় যুগান্তকারী সমাজরীতি সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করে আহ্বান করা হয় তৃতীয় মহাচক্র। সেই মহাচক্রেই সমাজভর্তা প্রথার প্রবর্তন। নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা তখনই বংশানাশা হয়ে এসেছে। নবজন্ম ক্রমশঃই বিরল। আর তারই সঙ্গে সূর্যবিকৃতির প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত ধরণী হিমশীতল হয়ে গভীর তুষারে আবৃত। সে তুষারাবরণ কত যুগ যে ধরণী থেকে অপসারিত হয়নি তার কোন হিসাব নেই। সংখ্যায় অগণন কাফ্রাম জাতি তখনই হ্রাস পেতে পেতে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীতে দাঁড়িয়েছে। তুষার যুগের কঠোর জীবন-সংগ্রাম থেকেই উদ্ভব হয়েছে দুটি নির্মম নীতির। অক্ষম অযোগ্য রুগ্ন, জরা-গ্রস্ত বা বার্ধক্যপীড়িতের গোষ্ঠীতে যেমন স্থান নেই, তেমনি সুস্থ সক্ষম সবলের স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীত্যাগ অমার্জনীয় অপরাধ। সমগ্র সমাজের মৃত্যুপণ প্রতিহিংসা এই অপরাধীকে যেমন অনুসরণ করে তেমনি গোষ্ঠী থেকে কাউকে বাইরের যে শত্রু অপহরণ করে তাকেও।

চতুর্থ মহাচক্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে নেতামার। তখন তিনি কৈশোরে পদার্পণ করেছেন মাত্র। কাফ্রামগোষ্ঠী তুষার যুগের পর বহুকালের সুদীর্ঘ পর্যটনে এই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভূখণ্ডের সন্ধান পেয়েছিল। এ রাজ্যে আসার পরই আরও দুটি মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথা প্রথম তারা জানতে পারে। কিছু আগে বা পরে তারাও দীর্ঘ পর্যটনের পর এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিরোধ ও সঙ্ঘর্ষ হলেও কাফ্রামরা এ ভূখণ্ডে অন্যান্য বহুদিক দিয়ে অনেক নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে বহু যুগ ধরে। শিকারের ক্ষেত্র এখানে সুবিস্তৃত, খাদ্য আহরণের মত আরণ্য সম্পদও পর্যাপ্ত।

কিন্তু এ সব সুবিধা সত্ত্বেও, বিলুপ্তির করাল ছায়া গোষ্ঠীজীবনে ক্রমশঃই গাঢ় হয়ে উঠেছে যুগের পর যুগে।

অবশেষে চতুর্থ মহাচক্রে ভিন্ন শিবিরের পুরুষ হরণ প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয়েছে। ফল তার শুভ কিছু হয়নি। আঘাত প্রতিঘাতের তীব্রতায় তিন শিবিরই আরো জনশূন্য হয়ে এসেছে। বিলুপ্তিরোধের সমস্যার সমাধান হয়নি।

নেতামা সংক্ষেপে এ ইতিহাস বিবৃত করে গাঢ় আবেগকম্পিত স্বরে এবার বলেন, —তারপর এই পঞ্চম মহাচক্র আমি আজ আহ্বান করেছি কাফ্রামগোষ্ঠীর রীতি-নীতি ও প্রথার চরম এক সংস্কারের প্রস্তাব জানাতে। প্রায় বিংশতি বর্ষ ধরে সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও কোন নবজাতককে আমরা জীবিত রাখতে পারি নি। বিলুপ্তি আমাদের অদূর ভবিষ্যতে অনিবার্য। যে কয় বৎসর এ গোষ্ঠীর পরমায়ু আর আছে হিংসার হানাহানিতে তা কলঙ্কিত রক্তাক্ত করে লাভ কি? প্রথম নেতামা সূর্যকন্যা ভিনসা আমাদের জাতির জন্মলগ্নে পরম প্রীতির যে দীক্ষা দিয়েছিলেন, আজ তার অবশিষ্ট অন্তিম কালটুকু সেই দীক্ষাই অনুসরণ করে কাটাবার সংকল্প জাতিকে আমি গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। বিরোধ সংঘর্ষ আর নয়। তার বদলে সকলের প্রতি মৈত্রী। প্রতিহিংসা নয় ক্ষমা ও প্রেম। কাফ্রামগোষ্ঠীর অলঙ্ঘ্য অনুশাসন উপেক্ষা করে আমাদের জাতীয় অভিমানে সবচেয়ে বড় আঘাত যে দিয়েছে তাকেও যেন আমরা ক্ষমা করি। জানি আমাদের সমাজের ইতিহাসে স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীত্যাগের এ নিদারুণ কলঙ্ক একান্ত বিরল। এ বিচ্যুতি যখন ঘটেছে তখন তার চরম শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত কাফ্রাম-সমাজ ক্ষান্ত হয়নি। আজ কিন্তু এ অপরাধও ভিন্নদৃষ্টিতে দেখবার সময় এসেছে। শুধু সংঘের স্বার্থই নয় ব্যক্তির স্বাধীনতার মূল্যও আজ আমরা যেন বুঝি। তা ছাড়া যে প্রয়োজনে এ বিধি রচিত হয়েছিল তা আজ আর নেই। গোষ্ঠীকে রক্ষা করার প্রশ্নই আজ অর্থহীন সুতরাং তার নির্মম শাসন স্নেহ ও সহানুভূতিতে শিথিল করবার সময় কি আসেনি? একথা আমি অস্বীকার করি না যে তনিকা বা নিকির ওপরই কাফ্রামদের শেষ আশা নিবদ্ধ ছিল। জাতির জীবনধারা যদি প্রবাহিত থাকে তাহলে তার মধ্য দিয়েই থাকবে। সে আশা সফল হয়নি। নিকি আমাদের ছেড়ে না গেলেও হত বলে আর বিশ্বাস হয় না। নিকি কেন স্বেচ্ছায় আমাদের ছেড়ে গেছে জানি না। হয়ত সকলের এত নির্ভরতা সত্ত্বেও জাতির জননী হবার অক্ষমতার লজ্জায়। হয়ত আমাদের সমাজবিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। নিকির মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা যে ছিল, আর তা তোমাদেরও আলোচনার বস্তু যে হয়েছে তা আমি জানি। যে ক্ষত আমরা গৌরবচিহ্ন বলে গণ্য করতে অভ্যস্ত নিকি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তোমাদের কাছে আজ স্বীকার করছি এই অস্বাভাবিকতাই তাকে আমার কাছে মূল্যবান করে তুলেছিল। আজ এ ক্ষতের যত বড় মর্যাদাই থাক একদিন মানবসমাজ এ ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল—এ কিংবদন্তীতে আমি বিশ্বাস করি। নিকির মধ্যে একটা উগ্র স্বাতন্ত্র্যকে তাই আমি খুব বেশী শাসন করবার চেষ্টা করিনি। তার মুখে আমাদের সমাজবিধির সমালোচনা মাঝে মাঝে তোমরাও নিশ্চয় শুনেছ। তারই কৃতিত্বে বন্দী বিপক্ষ শিবিরের যে পুরুষকে সমাজভর্তা করা হয় অকস্মাৎ একদিন তাকে মুক্তি দেবার অনুমতি নিকি আমার কাছে চেয়েছিল। কাফ্রামদের অলঙ্ঘ্য নীতি অনুসারে সে অনুমতি আমি দিতে পারিনি। তারপর বন্দী সমাজভর্তার পলায়নের মধ্যে নিকির হাত আছে সন্দেহ করে আমি তাকে তিরস্কার করে, শিরোভূষণ কেড়ে নেওয়ার শাস্তিও দিয়েছিলাম। আমার সন্দেহ ভুল কিনা জানি না। হয়ত সেই অন্যায় শাস্তি ও তিরস্কারের প্রতিবাদেই নিকি স্বেচ্ছায় আমাদের সমাজ ছেড়ে গেছে। হয়ত কারণ তার পূর্বে যা বলেছি তাই। কারণ যাই হোক প্রতিশোধ নেবার চেষ্টার ত্রুটি আমরা করিনি। কিন্তু এইবার তাতে ক্ষান্ত হতে চাই। নিকি হয়ত জীবিতই আর নেই। তার দেহাবশেষ কোনো দূর দুর্গম নির্জনতায় একদিন কেউ খুঁজে পাবে। যদি সে জীবিত থাকে তাহলে কাফ্রাম সমাজের অন্তিম নিঃশ্বাসের ক্ষমা আর করুণাই তাকে জানাতে চাই, সেই সঙ্গে সংগ্রামের অবসানের কথা সমস্ত বিপক্ষ শিবিরে। বলো কাফ্রাম মহাচক্র, আজ ডঙ্কাধ্বনিতে এই বার্তাই কি ঘোষিত হবে?

কয়েক মুহূর্ত সমস্ত জনতা স্তব্ধ নিস্পন্দ।

যেন শিলামূর্তি সব সারি সারি সজ্জিত হয়ে আছে।

তারপরই সমস্ত জনতা যেন এক দেহে ভল্ল আস্ফালন করে এক কণ্ঠে আকাশবিদীর্ণকরা উত্তর দিলে—না!

না? নেতামার কণ্ঠ এবার ক্ষীণ। জীর্ণ জরা যেন এই মুহূর্তটার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিল। দেহের ওপর তার অধিকার আগেই বিস্তৃত হয়েছে, এবার কণ্ঠের সঙ্গে সেই অনির্বাণ দীপ্তিও মুছে নিল এক নিমেষে।

ক্লান্ত ভগ্ন দুর্বল কণ্ঠে নেতামা বললেন, তবে এই মহাচক্রের কাছে আমার স্বেচ্ছানির্বাসনের সুযোগ আমি ভিক্ষা করছি!

কিন্তু জনতার উন্মত্ত কল্লোলে সে ক্ষীণ কণ্ঠ কোথায় ভেসে গেল।

চারিদিকে ক্ষিপ্ত অস্ত্র আস্ফালনের সঙ্গে তখন হিংসাতীব্র রণোল্লাসের ধ্বনি উঠছে।

অপরাধীর চরম দণ্ড চাই!

কাফ্রামরা শত্রুর শেষ রাখে না!

## সপ্তম উল্লাস

### সন্ধুকন্দুত

দুরু ও তার সঙ্গীরা তিমির-কন্দরেই এখন আশ্রয় পেয়েছে।

প্রাচীন শিলাফলকের নির্দেশ মিথ্যা নয়। শুধু পর্বতদুহিতা বলতে যে নির্ঝরিণী-স্রোত তারা অনুমান করেছিল তার পরিবর্তে শুষ্ক সংকীর্ণ পরিখা জাতীয় একটি খাতই দেখা গেছে। হয়ত সেই শুষ্ক খাতই দূর অতীতের নির্ঝরিণী স্মৃতিচিহ্ন।

তিমির-কন্দরে শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে তারা আসতে পেরেছে বলে তাদের বিশ্বাস।

অন্ততঃ অত্যন্ত সতর্ক পাহারায় থেকেও আর কখনো কোন গুপ্তচরের আভাস তারা পায়নি।

তিমির-কন্দরে প্রবেশের পর অবশ্য এসব তুচ্ছ চিন্তার আর স্থানই নেই তাদের মনে। এক তীব্র বিস্ময়মাদকতার মধ্যে তারা যেন নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

তিমির-কন্দর সম্বন্ধে কিছু অনুমান ও কল্পনা তাদের মনে ছিল কিন্তু আসল সত্য তাদের সে কল্পনা ও অনুমানকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে।

এমন অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্যের কথা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

ঐশ্বর্য অবশ্য মূল্যবান ধাতু কি বিচিত্র দুর্লভ প্রস্তরখণ্ডের নয়। সে ঐশ্বর্যের কোন মূল্যই দুরুদের কাছে অন্ততঃ নেই।

এখানে যে ঐশ্বর্য আছে তা বহু যুগ আগেকার এক লুপ্ত মানবসমাজের সঞ্চিত স্মৃতির। সে স্মৃতি খোদিত হয়ে আছে শিলাফলকে গুহাগাত্রে, অঙ্কিত আছে পশুচর্মে।

নিজেদের বিলুপ্তি অনিবার্য জেনে এই বিস্মৃত মানবসমাজ যেন তাদের জাতিজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা সমস্ত বিদ্যা সমস্ত উপলব্ধি রেখাজালে বন্দী করে সুদূর ভবিষ্যতে প্রেরণ করতে চেয়েছে।

দুরু বাইরের ভূখণ্ডে সামান্য যে কয়েকটি ভগ্ন অসম্পূর্ণ শিলাফলকের খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার করে উল্লসিত হয়েছে তা এই গুহারাজ্যের সঞ্চয়ের তুলনা অরণ্যের পত্রপুঞ্জের কাছে কটি শুষ্ক জীর্ণপত্র মাত্র।

এই অগণন শাখার বিভক্তপ্রায় অশেষ সুড়ঙ্গলোকের গুহারাজ্য ছাড়া আর কোন নাম বুঝি দেওয়া যায় না। এ রাজ্যের অতি সামান্য অংশ মাত্র প্রথম কয়েকদিনে তারা সন্ধান করতে পেরেছে।

গুহার প্রথম প্রবেশপথ সংকীর্ণ। সে পথ প্রস্তরখণ্ড ও লতা-গুল্মে কিছুটা আচ্ছন্নই ছিল। সে সব বাধা অপসারিত করবার পর অভ্যন্তরে যত তারা অগ্রসর হয়েছে বিস্ময় তাদের তত বেড়েছে উত্তরোত্তর। গুহাবাস নয় এ যেন সত্যই এক গোপন পাতালপুরী, বিশাল এক পর্বত যার ওপর আবরণ হিসাবে স্থাপিত। এ গুহায় বংশপরম্পরায় যুগযুগান্ত যারা অতিবাহিত করেছে তাদের জীবনযাত্রার নিদর্শন নানাভাবে সর্বত্র ছড়ানো। সে সব নিদর্শনের অর্থ বোঝবার ক্ষমতাও দুরুদের নেই। কয়েকটি এমন বস্তু সেখানে ইতিমধ্যেই তারা পেয়েছে যার প্রয়োজন ও ব্যবহার সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাদের নেই। প্রাচীন কিংবদন্তী ও পুরাণের সত্য ও কল্পনায় মেশানো দু-একটি উল্লেখে যেন একটু-আধটু ইঙ্গিত সে বিষয়ে পাওয়া যায়।

উত্তর কালাবনী
রামকিংকর সিংহ

বিলুপ্ত জাতির লেখসঞ্চয় থেকে হয়ত অনেককিছুর রহস্য একদিন উদ্ঘাটিত হতে পারে দুরুদের এই আশা। দুরু নিজের আবিষ্কৃত পাঠোদ্ধার-প্রণালী আরো উন্নত করার চেষ্টাতেই শুধু মত্ত হয়ে ওঠেনি আজিব ও নন্দককেও সে প্রণালী শিক্ষা দিয়েছে।

কয়েকটি দিন এই মাদকতার মধ্যে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিত এক ব্যাপার তাদের সচকিত সন্ত্রস্ত করে তোলে।

এই গুহাপুরীতে নূতন সুড়ঙ্গপথ সন্ধান করতে আজিব ও নন্দক গভীর অভ্যন্তরপ্রদেশে কিছুদূর গিয়েছিল।

তারা পাংশু মুখে ফিরে এসে যে প্রশ্ন দুরুর কাছে তোলে তা চাঞ্চল্যকর।

আজিবই শুষ্ক কণ্ঠে প্রথম জিজ্ঞাসা করে, এ গুহাপুরী যাদের রাজ্য ছিল তারা কি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে মনে করো দুরু?

একটি পশুচর্মের অস্পষ্ট লিখনের পাঠোদ্ধারে দুরু তখন মগ্ন। আজিব ও নন্দকের মুখের পাণ্ডুরতা কি কণ্ঠের কম্পন সে লক্ষ্য করে না।

পশুচর্মের ওপরই দৃষ্টি রেখে সে কৌতুকের স্বরে বলে, বিলুপ্ত হবে কেন? তারা আত্মগোপন করে আমাদের ওপর দৃষ্টি রাখছে। অপেক্ষা করে আছে আক্রমণের সুযোগের।

সত্যই তাই। বলে নন্দক।

এবার নন্দকের গম্ভীর শঙ্কিত স্বর দুরুকে চমকিত করে।

সবিস্ময়ে মুখ তুলে তাকিয়ে বলে, তার অর্থ?

তার অর্থ অভ্যন্তরের এক সুড়ঙ্গপথে কটি পদচিহ্ন আমরা দেখেছি। সে পদচিহ্ন সদ্য সেখানে উপস্থিত ছিল এমন কয়েকটি মানুষের ছাড়া হতে পারে না। গুহার ধূলিতে কয়েকবার বার যাতায়াত চিহ্নগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেছে বলে তাদের সংখ্যা নির্ণয় ঠিক সম্ভব নয়, কিন্তু তারা যে আমাদের অংশে এসে আবার ফিরে গেছে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আজিবের ব্যাখ্যা শেষ হতেই নন্দক বলে, আরো একটি বড় প্রমাণ আছে বলে আমার এখন মনে হচ্ছে।

কি প্রমাণ? দুরুর উদ্বেগ আর গোপন থাকে না।

আমি যে বিশেষ শিলাফলক কটি নিয়ে কাজ করছি আশা করি তোমরা কেউ তার একটিও অপসারিত করনি? নন্দক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় সঙ্গী দুজনের দিকে।

সবিস্ময়ে মাথা নেড়ে দুরু ও আজিব জানায়, তারা তা করেনি।

কিন্তু একটি শিলাফলক তার মধ্য থেকে অবিশ্বাস্যভাবে অন্তর্হিত হয়েছে। তোমরা কেউ কোন কারণে সেটি নিয়ে থাকবে ভেবে আমি এ ব্যাপারটিতে কোন গুরুত্ব দিই নি, কিন্তু পদচিহ্নগুলি আবিষ্কারের পর আমার সন্দেহ সহসা জাগ্রত হয় এবং এখন বুঝছি তা অমূলক নয়।

কিন্তু এ যে অসম্ভব! দুরু বিমূঢ় ভাবে বলে, তাদের খোদিত লিপিতে যে বিবরণ পাচ্ছি তাতে বিলুপ্তি আসন্ন বলেই বার বার আক্ষেপ রয়েছে। এ ভূখণ্ডে আমাদের উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ারও তা বহু যুগ পূর্বের কথা। তারপর এক ধ্রুবজ্যোতি-বিচলন-কাল এই গোপন গুহাপুরীতে সে জাতির ক্ষীণতম ধারাও প্রবহমান বলে বিশ্বাস করা যায়? আর যদি সেই অসম্ভবই সম্ভব হয় তাহলে তারা তাদেরই নিজেদের শিলা-ফলক চুরি করবে কেন!

কোন বিশেষ বিবরণ কি বিদ্যা আমাদের জানতে না দেবার জন্যেও হতে পারে! নন্দক উত্তর দেয়।

শিলাফলকে সে রকম মূল্যবান কোন কিছুর আভাস কি পাচ্ছিলে? জিজ্ঞাসা করে আজিব।

সঠিক বলতে পারব না। দ্বিধাভরে জানায় নন্দক। এ শিলালেখার পাঠোদ্ধার বেশ কঠিন। তবু মনে হচ্ছিল কুপিতকিরণের প্রতিবিধান বিষয়ে কিছু যেন সেখানে বলার চেষ্টা আছে। আমরা যে তাদের প্রাচীন লিপির মর্মভেদ করতে পেরেছি এ কথা বুঝেই তারা ওই শিলাফলক সরাবার জন্যে তৎপর হয়েছে নিশ্চয়।

কুপিতকিরণ অর্থে সূর্যাভিশাপ বোঝাচ্ছে বলেই ত মনে হয়! দুরু চিন্তিতভাবে বলে, সে অভিশাপ-খণ্ডনের উপায় আমাদের জানতে দিতে না-চাওয়ার কারণ কি? বৈরিতাই যদি হয় তাহলে আমাদের এখানে প্রবেশেই ত তারা বাধা দিতে পারত! এখন আমাদের বিতাড়িত করবার চেষ্টাও ত অনায়াসে করতে পারে।

হয়ত তাই করবার সুযোগের অপেক্ষায় আছে—বলে আজিব।

না, রহস্যটা আরো জটিল মনে হচ্ছে। দুরু ভ্রূকুঞ্চিত করে কি ভেবে নিয়ে বলে, যদি সত্যিই সেই প্রাচীন জাতির কোন প্রতিনিধি এখনো এই পাতালপুরী অধিকার করে থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে দখল নিয়ে সংঘর্ষ আমরা বাধাব না। তাদের যেমন করে হোক বোঝাতে হবে, আমরা শত্রু নই, তাদের সৌহার্দ্যকামী। অতীতের সেই বিলুপ্ত ধারার সঙ্গে যদি সংযোগস্থাপন সম্ভব হয় তাহলে তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। তাদের সন্দেহ ও ভয় দূর করে কি ভাবে পরিচয়ের ব্যবস্থা করা যায় তাই আমাদের এখন চিন্তনীয়।

## অষ্টম উল্লাস

### দন্ডাপুর

বুবন অত্যন্ত সাবধানে সবল ও স্থূল বৃক্ষশাখাটির ওপর দাঁড়িয়ে উঠে ঘন পত্র-জাল সামান্য একটু সরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিচের পার্বত্য উপত্যকার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

না, যা আশা করেছিল তা নয়।

একটা সুপুষ্ট শরভ নিকটের প্রস্তর-স্তূপের আড়াল থেকে বার হয়ে এসে নিশ্চিত মনে নধর তৃণসন্ধানে বিচরণ করছে।

অন্য সময় হলে এ সুযোগ সে অবহেলা করত না। অব্যর্থ তীরসন্ধানে অচিরে শরভটিকে শূল্যপক্ক করবার ব্যবস্থা করত।

কিন্তু ক্ষুধায় যতই কাতর হোক এখন তার এ সব তুচ্ছ শিকারে মন দেবার সময় নেই।

সে শুধু একটি বিশেষ শিকারের অপেক্ষাতেই একাগ্র হয়ে আছে।

গত তিন দিন ধরে দিবারাত্রির অধিকাংশই তার কেটেছে এই বৃহৎ ন্যগ্রোধ জাতীয় বৃক্ষের পত্রাচ্ছাদিত শাখার ওপরে প্রায় নিথর নিস্পন্দ অবস্থায়।

এ ধরণের কঠিন ধৈর্যপরীক্ষা সে অবশ্য পূর্বেও দিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা দিতে হয়েছে এ ভূখণ্ডের একমাত্র হিংস্র বিভীষিকা দানবীয় শরট-শিকারের জন্যে। দানবীয় শরট যেমন হিংস্র-বীভৎস তেমনি চতুর ক্ষিপ্র নিঃশব্দ গতি ও নিমিষে রূপান্তর গ্রহণের দক্ষতায় মায়াবী। অসামান্য সতর্কতায় সুদীর্ঘ কাল বিনিদ্র ভাবে অপেক্ষায় না থাকলে শিকারীকেই তাদের শিকার হতে হয়। এ ভূখণ্ডের সৌভাগ্য এই যে, দানবীয় শরট ছাড়া আর কোন হিংস্র শ্বাপদ এখানে নেই এবং সে বিভীষিকাও একান্ত বিরল। বিরল হওয়ার জন্যে বুবনের অব্যর্থ লক্ষ্য অনেকখানি অবশ্য দায়ী। বিপক্ষ শিবির-পরিধির নিষেধগণ্ডী অগ্রাহ্য করে সে সর্বত্র ঘুণাক্ষরে সংবাদ পাওয়া মাত্র শরট-শিকারের গুপ্ত আশ্রয়মঞ্চের ব্যবস্থা করেছে। তাকে কোন শিবির থেকেই যে এসময়ে বাধা দেবার চেষ্টা হয়নি তাতে শিকারী হিসেবে এ ভূখণ্ডে তার শ্রেষ্ঠত্ব-স্বীকারের প্রমাণ পাওয়া যায়। শিকারে তার নৈপুণ্য যেমন সহজাত উল্লাসও তেমনি স্বতস্ফূর্ত। তার পরিচিত ভূভাগে অবশিষ্ট একটি কি দুটি শরট নিহত হবার পর আর যে শঙ্কাতীব্র উত্তেজনা উপভোগ করবার মত কোন বিপজ্জনক শিকার কিছু থাকবে না, এ পরিণাম তাকে অনেকবার বিমনা করে তুলেছে। পুরাণ উপকথায় ভয়াল যে সব পদে পদে মৃত্যু-ঝলমলিত অরণ্যের কথা শুনেছে তার জন্যে ঈর্ষাই হয়েছে তার আদিকালের মানব-সমাজের প্রতি।

এ কদিন কিন্তু কোন উত্তেজনা-উল্লাসের লোভে সে এই বিনিদ্র শিকার-সন্ধানে আত্মগোপন করে নেই।

শিকারে একাগ্রতা তার অনেক বেশী গভীর হলেও সত্যকার কোন উৎসাহই সে বোধ করেনি।

এই সব ভাবনাতেই কয়েক মুহূর্ত বুঝি মগ্ন ছিল সে। অন্যমনস্কতা তার চকিতে কেটে গেল। শরভটার সহসা দ্রুতবেগে পলায়নের শব্দে নিশ্চয়।

শরভটা অকারণে এমন ত্রস্ত হয়ে ওঠেনি বলে মনে হয়। তার প্রত্যাশা কি তাহলে সত্যিই পূর্ণ হতে চলেছে?

বুবন নিঃশব্দে তার নিক্ষেপ-রজ্জু হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল।

এখানে সে সশস্ত্র হয়ে আসে নি। ভল্ল বা ধনুর্বাণ কিছুই তার সঙ্গে নেই। হ্রস্ব কৃপাণ অবশ্য তার চিরসহচর। সেই সঙ্গে

এই নিক্ষেপ-রজ্জুটিই যা অতিরিক্ত।

প্রস্তরস্তূপের অন্তরাল থেকে একটা মূর্তি দেখা দিতে না দিতেই বুবন নিক্ষেপ-রজ্জু ক্ষেপণের উপক্রম করলে।

কিন্তু শিরোদেশে ঘূর্ণিত হয়েও সে রজ্জু তার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত হল না।

তার পরিবর্তে তার কণ্ঠে বিস্মিত আনন্দধ্বনি শোনা গেল, পরজ!

প্রস্তরস্তূপের অপর পার্শ্ব থেকে যে বার হয়ে এসেছিল সে এই আহ্বান শুনে শঙ্কিত তৎপরতায় সরে যেতে গিয়েও বোধহয় কণ্ঠধ্বনি চিনতে পেরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সবিস্ময়ে।

বুবন তখন তার বৃক্ষচূড়ার আশ্রয় থেকে দ্রুত দ্রুত সম্ভব নেমে এসেছে।

পরজ তুমি! এ যে বিশ্বাস করতেই পারছি না!

বুবন পরজকে উচ্ছ্বসিত আনন্দে আলিঙ্গন করে আবার এক নিশ্বাসে বলে গেল, তোমাকে আর দেখবার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কাফ্রামদের হাত থেকে তুমি যে মুক্তি পাবে কল্পনা করি নি। কেমন করে, কবে তুমি পালিয়েছ?

পরজের মুখেও গভীর আনন্দের দীপ্তি।

বুবনের আলিঙ্গন থেকে স্মিত মুখে মুক্ত হবার চেষ্টা করে সে বললে, তোমার বলিষ্ঠ বাহুর বজ্রবন্ধন শিথিল না করলে শ্বাসই সে রুদ্ধ হয়ে যাবে। উত্তর দেব কি?

যেন লজ্জিত হয়ে হেসে বুবন পরজকে মুক্ত করে বললে, বুঝতেই পারছ, অবিশ্বাস্য ও সৌভাগ্যে একটু আত্মহারা হয়ে পড়েছি। এখন শুনি তোমার ইতিহাস।

সবই বলছি। কিন্তু তার আগে এই সুদূরে বৃক্ষচূড়ায় কি শিকারের জন্যে ওৎ পেতে ছিলে বল দেখি? এখানে কোন দানব-শরট দেখা গেছে বলে ত জানি না।

শরভ নয় তার চেয়ে আরো বড় শিকার সন্ধান করছি পরজ। যে শিকার ধরতে পারলে হয়ত মানবগোষ্ঠী রক্ষা পেতে পারে!

বুবনের কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে বিস্মিত হয়ে পরজ জিজ্ঞাসা করলে—কোন শিকারের কথা বলছ বুবন? তোমার মত শিকারী না হতে পারি কিন্তু এ ভূভাগে শিকারযোগ্য সব প্রাণীই জানি। তা ছাড়া এ শিকারের সঙ্গে মানবগোষ্ঠীর রক্ষা পাওয়ার সম্বন্ধ কি!

সম্বন্ধ এই যে এ শিকার জীবিত বা মৃত যে অবস্থায় হোক কাফ্রামদের প্রতাপণ করতে পারলে এ সর্বনাশা সংগ্রাম থামবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি কাফ্রানদের সেই পলাতককে ধরবার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

পরজের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল শুধু বিস্ময়ে যেন নয়। বললে—কাফ্রামদের পলাতকা অর্থাৎ নিকিকে তুমি শিকার করতে চাও? তার সন্ধান তুমি পেয়েছ?

হ্যাঁ পেয়েছি। কোন শিবির-পরিধির মধ্যে তার সন্ধান যখন মেলে নি তখন তিমির-কন্দরে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে হয়ত সে এদিকে এসেছে বলে আমার অনুমান হয়। তিমির-কন্দর খুঁজে পাইনি, কিন্তু এই অঞ্চলে বিচরণ করতে করতে সেদিন দূর থেকে এক নারীমূর্তিকে এই পথে যেতে দেখেছি। তার দেহবর্ণ ও পিঙ্গল কেশদামই তাকে কাফ্রামদের পলাতকা বলে চিনিয়ে দিয়েছে। তাকে অনুসরণ করবার আগেই সে পার্বত্য অরণ্যের মাঝে কোথায় অদৃশ্য

হয়ে গেছে। তার গোপন আশ্রয় খুঁজে বার করতে না পারলেও এই স্থানটির লতা-গুল্ম ও কঙ্করময় মৃত্তিকা পরীক্ষা করে বুঝেছি মানব গতায়াতের সাম্প্রতিক পদচিহ্ন এখানে বর্তমান। তাই এখানে অপেক্ষা করছি প্রস্তুত হয়ে।

পরজ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে, কিন্তু সে পদচিহ্ন, আমারও হতে পারে! এ পথে আমারও যাতায়াত আছে দেখতেই পাচ্ছ।

তোমার যাতায়াতের চিহ্ন? বুবন একটু হাসল। না পরজ, আমার দৃষ্টি অত সহজে প্রতারিত হয় না। তাছাড়া এ স্থান সযত্নে পর্যবেক্ষণ করে অঙ্গবাস-বন্ধনীর এমন ছিন্নসূত্র পেয়েছি যা কাফ্রাম-রমণী ছাড়া আর কারও হতে পারে না। আমি জানি সে পলাতকা এখানেই কোথাও আছে। সুতরাং আমার হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

একটু থেমে উৎসাহভরে বুবন আবার বললে—তুমি। তুমিও ত আমায় সাহায্য করতে পারো?

পরজ বুবনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ, তা পারি।

সাহায্য করতেই হবে পরজ। কিন্তু তুমি তার নামটাও জানো দেখছি। কি করে? এবার জিজ্ঞাসা করলে বুবন।

পরজ একটু হাসল। তারপর ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বললে, নামটা আর জানব না! কাফ্রামদের কাছে এতদিন বন্দী ছিলাম কেন তাহলে?

এ উত্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোন ইঙ্গিত যদি থাকে, বুবন তা বুঝল না। কৌতূহলভরে সে বললে, তাও-ত বটে! সত্যি তাদের হাতে বন্দী হয়েও মুক্তি পেলে কি উপায়ে? মৃত্যু ছাড়া কাফ্রামদের শৃঙ্খল থেকে কেউ মুক্তি দিতে পারে না বলেই ত প্রবাদ।

প্রবাদ মিথ্যা নয়। গম্ভীর স্বরে বললে পরজ।

তা হলে? তুমি.....

বুবনের প্রশ্ন সমাপ্ত হবার আগেই বাধা দিয়ে পরজ বললে,—কেমন করে মুক্তি পেলাম সে কাহিনী সত্যিই শুনতে চাও?

নিশ্চয় চাই।

তাহলে শোন, ওই নিকিই আমায় মুক্তি দিয়েছে।

নিকি! মানে যে পলাতকা! —বুবনের গলার স্বরে বিস্ময়ের চেয়ে অবিশ্বাসই বেশী।

হ্যাঁ, স্বেচ্ছায় যে সমাজত্যাগিনী, যাকে বন্দিনী করে প্রত্যর্পণ করলে তিন শিবিরের বিরোধ মিটে যাবে তুমি মনে করো, সেই নিকিই আমাকে মুক্তি দেয়। এই সঙ্গে এ কথাও জেনে রাখো যে আমি কাফ্রামদের কাছে ধরা দিয়েছিলাম স্বইচ্ছায়।

এবার বিস্ময়-বিমূঢ়তায় বুবনের কণ্ঠ দিয়ে আর কোন স্বরই বার হ'ল না।

পরজ নিজে থেকে বলে চলল, কাফ্রামরা আমায় বন্দী করে নিয়ে গেছে এ রকম অনুমান সম্ভবতঃ তোমরা করেছিলে, কিন্তু বন্দী হবার সমস্ত আয়োজন আমিই করেছিলাম—এটা নিশ্চয় কেউ ভাবতে পার নি। হ্যাঁ বুবন, আমি কাফ্রামদের বন্দী হতেই চেয়েছিলাম, কেন চেয়েছিলাম তা বোঝানো কঠিন। তবু যতটুকু পারি চেষ্টা করছি। প্রভার শিবিরের মণ্ডলাবাসেই বোধ হয় লক্ষ্য করেছ আমি একটু দলছাড়া ছিলাম। তোমরা কি ভেবেছ জানি না কিন্তু নিজের মনে এই বিভিন্নতার জন্যে আমার ক্ষোভের অন্ত ছিল না। যা সকলের কাছে সহজ স্বাভাবিক আমার কাছে তা বিস্বাদ লেগেছে। মণ্ডল-কুমারীদের সঙ্গে যৌবনলীলায় কোন আগ্রহ আমার কোনদিন জাগে নি। বিতৃষ্ণা জেগেছে মণ্ডল-জীবনের আরো অনেক শিক্ষা-দীক্ষায়। তারপর কৈশোর পার হয়ে আমার মন এক ভয়ঙ্কর সন্দেহে জর্জর হয়ে উঠেছে। আমি হয়ত সেই প্রাচীন পুরাণ-বর্ণিত কালের কোন নিষ্ফল প্রক্ষেপ। অসামাজিক যে সব রুচি ও প্রবৃত্তি বহুকাল শিবির-সেবকদের ভেতর লুপ্ত হয়ে গেছে তাই আমার মধ্যে দুষ্ট গোপন ব্যাধির মত আবার দেখা দিয়েছে। আমি তখনই অনুভব করতাম শিবির-বধূরা আমার মনে কোন সাড়া জাগায় না। আমি একে একান্ত করে চাই। যাকে চাই তাকে শিবির-বধূদের মধ্যে খুঁজে পাই না। শিবিরের কারুর প্রতি প্রীতির অভাব আমার ছিল না কিন্তু নিজেকে কোথাও যেন নিঃসঙ্গ করেও রাখতে চাইতাম। সেই নিঃসঙ্গতা যেন কাউকে দেওয়া যায় না। সবচেয়ে গ্লানি হ'ত মনের মধ্যে অদ্ভুত এক স্বপ্নলঘু অথচ তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করে। সে আবেশ-বিহ্বলতা কোন এক বিশেষকে ঘিরেই যেন সার্থক হ'তে চায়। অবাস্তব পুরাবৃত্তে শুনেছি বিশেষ এক নারী ও বিশেষ এক পুরুষের পরস্পরের প্রতি এমনি তীব্র আবেগস্পন্দিত আকর্ষণের কথা। আমাদের শিবির-সমাজ সে জাতীয় আকর্ষণ দূর অতীতেই অতিক্রম করে এসেছে। নিজের মধ্যে তারই স্ফুরণ দেখে ঘৃণায় লজ্জায় ভাই পীড়িত হয়েছি কিন্তু কাউকে এমন কি তোমাকে পর্যন্ত তা জানাতে পারি নি। হয়ত আমার এ সমাজ-চেতনার বিকৃতি ভিন্ন সংস্রবে নিরাময় হতে পারে বলে একদিন হঠাৎ মনে হয়েছে। মনে হয়েছে প্রাভার শিবিরের ব্যাধির চিকিৎসা কাফ্রাম সমাজের নির্যাতনেই হয়ত হতে পারে। নারীপ্রধান কাফ্রাম সমাজে সমাজ-ভর্তা হয়ে কাটাতে হলে প্রকৃতিস্থতা আবার ফিরে আসবে, এই আশায় স্বেচ্ছাতেই কাফ্রাম-শিকারীদের দৃষ্টিতে পড়বার চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত আমার কৌশল ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু তাতে ফল যা হয়েছে তা হিতে বিপরীত। ওই তনিকা বা নিকির হাতেই আমি বন্দী হই। কাফ্রামদের বিধান অনুযায়ী ভিন্ন শিবিরের বন্দী পুরুষকে সমাজ-ভর্তার মর্যাদালাভের পূর্বে পঞ্চ পূর্ণিমা-কাল মূল শিকারীর নিজস্ব সেবক হয়ে থাকতে হয়। নিকিকে দর্শন করবার ও তার সঙ্গ পাওয়ার পর আমার মধ্যকার অসুস্থ প্রবণতা তীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আমাদের তিন শিবির-জগতে নিকি ছাড়া আর কোন রমণী নেই বলে আমার মনে হয়েছে। মনে হয়েছে এই নিকিকেই যেন সারা জীবন আমি খুঁজে ফিরছিলাম। তাকে পাই নি বলেই কোন নারীসঙ্গ আমাকে আকৃষ্ট করে নি। নিজের কঠিন ব্যাধির সমস্ত লক্ষণই আমি তখন চিনতে পেরেছি। বিশেষ করে নিকিকে একান্ত আপন করে নেওয়ার গর্হিততম বাসনা তখন দুর্বার হয়ে উঠে আমায় শঙ্কিত করে তুলেছে। তবু নিজেকে সম্বরণ করতে পারি নি। তখন সমাজভর্তার মর্যাদা পেতে আর এক পূর্ণিমা মাত্র বাকি। সেই পরিণাম আমাকে আতঙ্কে অভিভূত করে দিয়েছে। একদিন নিকির কাছে সমস্ত অসুস্থ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নিজের মনের বিকৃতি স্বীকার না করে পারি নি।

নিকি প্রথমে এ বাতুলতায় কৌতুকবোধ করে' উচ্চহাস্য করেছে, তারপর সমাজভর্তা হওয়ার ব্যাপারে আমার আতঙ্কের কথা শুনে প্রথমে স্তম্ভিত পরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। তার কাছে সহানুভূতির বদলে তীব্র তিরস্কারই পেয়েছি তারপর।

সমাজভর্তা পদে অধিষ্ঠিত হতে হয়েছে যথাসময়ে। জীবন আমার বিস্বাদময় হয়ে উঠেছে সকল দিক দিয়ে। আমার অস্বাভাবিকতা সকলের গোচর হতে বিলম্ব হয় নি।

সমুদ্ভূত কাঙ্কাম সমাজের আমি ঘৃণার ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠেছি। আমার সে যন্ত্রণা নিকির দৃষ্টি বোধ হয় এড়ায় নি। সমাজভর্তা হওয়ার পর আমার সঙ্গ সে কিছুকাল পরিহার করেই চলেছিল সম্ভবতঃ ঘৃণাতেই। কিন্তু সে মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে অকস্মাৎ। আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ দিনে দিনে বিরল থেকে বহুল, সংক্ষিপ্ত থেকে সুদীর্ঘ হয়ে উঠেছে। তারপর যা ঘটেছে তা অবিশ্বাস্য। ব্যাধিমুক্ত হতে এসে আমি পীড়ায় আরো জর্জরিত হয়েছি। আমার রোগ শুধু উগ্রতর হয়ে ওঠে নি, নিকির মধ্যেও কখন তা সংক্রামিত হয়ে গেছে সে নিজেও জানতে পারে নি। একদিন নিজের মনের এ বিকৃতির কথা সে আমার কাছে স্বীকার করেছে, আমার সমাজভর্তা-জীবন যে তার কাছেও দুঃসহ তাও গোপন করে নি। কাঙ্কাম নেতামার কাছে সঙ্ঘের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব করেছে দুঃসাহস ভরে। সেখানে বিফল হয়ে একদিন সত্যিই আমাকে মুক্তি দিয়েছে শিবির-প্রহরীদের দৃষ্টি এড়াবার কৌশল শিখিয়ে দিয়ে। নিজেও একদিন গোপনে স্বেচ্ছায় সে সমাজ ত্যাগ করেছে তারপর।

পরজ নীরব হবার পর বুবনও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

তারপর বিষণ্ণ স্বরে বললে, তোমার এ কাহিনী শুনে পূর্বে হ'লে হয়ত শুধু বিস্ময় ও ঘৃণাই অনুভব করতাম পরজ, আজ কেবল বেদনাই পেলাম। কিন্তু আমার কর্তব্য থেকে তবু ভ্রষ্ট হতে পারব না।

কি তোমার কর্তব্য? নিকিকে বন্দী করে কাঙ্কামদের প্রত্যর্পণ করা?

হ্যাঁ, তা না হলে এ সংগ্রামে ধরণী থেকে মানবগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পলাতকা নিকিকে খুঁজে পাওয়ায় ওপর মানবগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

তা সত্যই করেছে বটে! পরজের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক শোনালো বুঝি আবেগের তীব্রতায়।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে সে নিজেই আবার বললে দৃঢ়স্বরে, চলো, নিকির সন্ধান আমিই তোমায় দিচ্ছি।

তুমি! তুমি দেবে! সবিস্ময়ে বললে বুবন, এ কাহিনী শোনার পর তোমার কাছেই সবচেয়ে বড় বাধা পাবার জন্যে যে প্রস্তুত হয়েছিলাম।

তাতে বিস্মিত হচ্ছি না। ম্লান হেসে বললে পরজ, কিন্তু মানবগোষ্ঠীর ভবিষ্যতের খাতিরেই নিকির সন্ধান তোমায় না দিলেই নয়।

## নবম উল্লাস
## সিংহাবলোকন

তিমির-কন্দর এমন বিভ্রান্তিচক্র তা দূরুরাও অনুমান করতে পারে নি।

বিশাল বল্মীকস্তূপের মত তাতে অসংখ্য প্রশস্ত সুড়ঙ্গপথ পরস্পরকে জড়িত করে এমন জটিলতা সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে দিগ্বিদিক স্থির রাখা প্রায় অসাধ্য।

দূরু আজিব ও নন্দক দীর্ঘ কয়েক দিবসের চেষ্টায় বারবার ব্যর্থ হয়েও কিন্তু পরাভব মানে নি।

তিমির-কন্দরের মধ্যে রহস্যময় পদচিহ্ন পাবার পর থেকে সুদূর অতীতের কন্দরবাসীদের শেষ প্রতিনিধিদের সন্ধানে তারা অগ্রসর হয়েছে, পথ হারিয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে দীর্ঘকাল তবু আশা ত্যাগ করে নি।

আশা ত্যাগ না করার কারণ অবশ্য আছে। সুড়ঙ্গ-পথে যেতে যেতে এমন কয়েকটি রহস্যময় ধ্বনি তারা শুনেছে যা কন্দরে অন্য কারো অস্তিত্বেরই সাক্ষ্য দেয়।

একবার বিশেষ একটি ত্রিধা বিভক্ত সুড়ঙ্গ-পথের সঙ্গমে উপস্থিত হ'তে না হ'তে দ্রুত এক পদশব্দ বিলীন হয়ে যেতে শুনেছে পার্শ্ববর্তী পথে। তা ছাড়া আরো এমন এক বিচিত্র ধ্বনি মাঝে মাঝে তাদের শ্রুতিগোচর হয়েছে যার স্বরূপ নির্ণয়ই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সে ধ্বনি হয়ত রুদ্ধ কন্দর-পুরীর পাষাণগাত্রে ঘাত-প্রতিঘাতের দরুণ বিকৃত ও বিস্ফারিত। মনুষ্য-কণ্ঠনিঃসৃত কোন শব্দের সঙ্গে তার সাদৃশ্য তারা খুঁজে পায় নি। তবু তা যেন তাদের কোন লুপ্ত স্মৃতি আলোড়িত করে ঔৎসুক্য বর্ধিত করেছে।

সে ধ্বনি অনুসরণ করবার চেষ্টা তারা করেনি এমন নয়। কিন্তু সুড়ঙ্গ-পথের গোলকধাঁধায় তা যেন তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে।

এ ধ্বনি কিসের হতে পারে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ তাদের অল্প হয়নি।

নন্দকের ধারণা এ সেই কন্দরবাসীদেরই বিস্মৃত কোন ভাষা যা আজ তাদের কাছে অর্থহীন। আজিবের কিন্তু এ ধ্বনি মনুষ্য-কণ্ঠের কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ হয়েছে।

শুধু দূরুই স্পষ্ট কোন অভিমত প্রকাশ করেনি। স্মৃতির ক্ষীণ এক কম্পন তার মনে যে অস্ফুট ইঙ্গিত জাগিয়ে তুলেছে তা যেন কিছুতেই স্পষ্ট হতে চাইছে না।

এই ধ্বনির উৎস সন্ধান করার পথেই অকস্মাৎ সম্প্রতি যা ঘটেছে তাইতেই তারা এখন সবচেয়ে বিচলিত।

দূর কোন সুড়ঙ্গ-পথ থেকে ক্ষণিকের জন্যে এক আর্ত ক্রন্দন সহসা কন্দরগাত্রে ধ্বনি-প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলে বয়ে গেছে।

সে তরঙ্গের পর সব আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেও তারা আর স্থির থাকতে পারেনি। ব্যাকুল উত্তেজনায় এ ক্রন্দনধ্বনি যে দিক থেকে এসেছে সেই দিকে যত দ্রুত সম্ভব অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে কিছুক্ষণ ধরে।

ক্রন্দনধ্বনির রহস্য উন্মোচনের পূর্বেই সুড়ঙ্গ-পথের একটি সঙ্গমে এসে সচকিত হয়ে তাদের দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

অপর দিকের একটি পথে শুধু পদ-ধ্বনি নয় কাদের যেন আলাপ-গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে।

দূরু ও তার সঙ্গীরা সেই আলাপ-গুঞ্জন শুনেই সবচেয়ে বিস্মিত হয়।

এরা কি সেই কন্দরবাসীদের শেষ প্রতিনিধিদের কেউ! কিন্তু গুঞ্জনের ভাষা অস্পষ্ট হলেও আদৌ অপরিচিত বলে মনে হয় না। কালপারাবারের দূর দিগন্তে এই কন্দর যারা অধিকার ক'রে ছিল তাদের ভাষা কি তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল না?

কয়েক মুহূর্ত পরেই সব প্রশ্নের যে মীমাংসা হয়ে যায় তা একেবারে অপ্রত্যাশিত।

প্রথমে আত্মগোপন করবার বাসনা হলেও

দূরু ও তার সঙ্গীরা সুড়ঙ্গ-সঙ্গমে সাহস-ভরে দাঁড়িয়ে থাকে।

অপর দিকের আগন্তুকরাও সুড়ঙ্গ-সঙ্গমে পৌঁছে দূরুদের দেখতে পেয়ে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ বিমূঢ় বিস্ময়ে দুই দলই নীরব। তারপর হর্ষধ্বনির সঙ্গে পরস্পরের দিকে তারা এগিয়ে যায়।

আগন্তুকরা বিলুপ্ত কন্দরবাসীদের কেউ নয়, তারা বুবন ও পরজ। তারা দূরুদের দেখে যতখানি চমকিত দূরুরা তাদের দেখে ততোধিক।

প্রথম আনন্দোচ্ছ্বাসের পর দূরু সবিস্ময়ে বুবন ও পরজ এ তিমির-কন্দরের সন্ধান কেমন করে পেল জিজ্ঞাসা করে।

পরজ সহাস্যে জানায়, পেলাম তোমাদেরই অনুগ্রহে।

আমাদের অনুগ্রহে! দুরু বিমূঢ়ভাবে তাকায় পরজের দিকে।

হ্যাঁ, শমীকাননের কথা স্মরণ করলেই বুঝতে পারবে, তোমরাই আমাদের পথ-প্রদর্শক।

শমীকাননে তোমরাই তাহলে গোপনে আমাদের আলাপ শুনেছিলে?

আমরা নয়, আমি। তোমাদের দূর থেকে দেখেই আমার অনুমান হয় যে তিমির-কন্দরই তোমাদের লক্ষ্য। আত্মপ্রকাশ করা তখন নিরাপদ মনে করিনি। গোপনে তোমাদের আলাপ শুনে ও পরে অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত এই তিমির-কন্দরে পৌঁছোই। পৌঁছেও তোমাদের কাছে নিজেদের গোপন করে রাখতে হয়েছিল। গোপন রাখবার সে প্রয়োজন আজ আর নেই। তাই তোমাদের কাছে ধরা পড়ে দুঃখিত হইনি। তোমরা আমাদেরই সন্ধান করবে তা অবশ্য জানতাম।

তা জানতে! নন্দক বিস্ময় প্রকাশ করে। কিন্তু আমার ত তোমাদের অস্তিত্বও এখানে কল্পনা করিনি। আমরা আদি কন্দরবাসী-দের সন্ধান করতে বেরিয়েছি।

আদি কন্দরবাসীদের সন্ধান! পরজের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়। তাদের সুদূর ইতি-হাসের কিছু নিদর্শন ছাড়া একটা অস্থি-কঙ্কালও এ কন্দরে আছে কিনা সন্দেহ। তোমরা কি বাতুল?

না, বাতুল নয়। দুরু এবার উত্তর দেয়। তাদের ধারা যে একেবারে বিলুপ্ত হয়নি, সে জাতির দু-একটি প্রতিনিধি যে এখনো বর্তমান তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

কি প্রমাণ! বুবন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

পেয়েছি পদচিহ্ন, তাছাড়া একটি শিলা-ফলক অপসারণের প্রমাণ। নন্দক সেটির পাঠোদ্ধারে রত ছিল। অত্যন্ত মূল্যবান কোনো লিখন তাতে ছিল বলে আমাদের ধারণা। সেটি রহস্যজনকভাবে অপহৃত হয়েছে।

এই প্রমাণ! সহসা উচ্চৈস্বরে পরজ হাসতে শুরু করে। তারপর নিজেকে সংবরণ করে বিমূঢ় দুরুদের জানায়, পদচিহ্ন যা দেখেছ তা আমাদেরই। আর শিলাফলক অপহরণ করেছি আমি!

তুমি! দুরুর কণ্ঠে অবিশ্বাস ফুটে ওঠে। শিলাফলক নিয়ে তুমি কি করবে?

তোমরা যা করো তাই। শোনো দুরু, তোমায় শিলাফলক সংগ্রহ করতে আমি সেই প্রভার শিবিরেই দেখেছিলাম। তোমার অনু-করণে আমিও গোপনে ফলক সংগ্রহ করে তার পাঠোদ্ধারের প্রণালীও আবিষ্কার করি। সেদিন গোপনে তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে এসে ওই বিশেষ শিলাফলকটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন নন্দক সেখানে অনুপস্থিত। শিলালেখে কুপিতকিরণের প্রতিকারের কথা লক্ষ্য করে আমি কৌতূহলী হই। সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারের সুযোগ নেবার জন্যে সেটি আমি অপহরণ করে নিয়ে যাই। তারপর। আমরা যাকে সূর্যাভিশাপ বলি কন্দরবাসীরা তাকেই কুপিতকিরণ আখ্যা দিয়ে প্রতিকারের সত্যিই দু-একটি প্রণালী তাতে খোদিত করে গেছে।

কিন্তু তাহলে,—দুরু বিমূঢ়ভাবে বলে, আমরা যে অদ্ভুত এক ধ্বনি মাঝে মাঝে শুনেছি তার অর্থ কি!

কি জাতীয় ধ্বনি? জিজ্ঞাসা করে পরজ।

তা বলা কঠিন। সে ধ্বনি মনুষ্যকণ্ঠের কিনা তাও স্থির করতে পারিনি।

বুঝেছি। আবার কৌতুক হাস্যের সঙ্গে বলে পরজ, কিঞ্চিদধিক পঞ্চদশ বর্ষ যে ধ্বনি প্রাভারদের কেউ শোনেনি তার স্মৃতির রেশও তোমাদের মনে হারিয়ে গেছে!

অর্থাৎ—দুরু উত্তেজিত স্বরে বলে,—আমার মনে ক্ষীণ যে সংশয় জেগেছে তাই কি তাহলে সত্য! এ ধ্বনি শিশুর ক্রন্দনের?

ঠিকই বুঝেছ, পরজের স্বর গাঢ় গম্ভীর হয়ে ওঠে। শিশুর ক্রন্দনই তোমরা শুনেছ। এ ধ্বনি পঞ্চদশ বর্ষ প্রাভার শিবিরে শোনা যায়নি। তার পূর্বেও মাতৃনিলয়ে কোন কারণে উপস্থিত না থাকলে এ ধ্বনির সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই এ ধ্বনি তোমাদের বিমূঢ় করেছে। শোনো দুরু, নন্দক আজিব, শোনো বুবন, এ শিশু আমার, আমার আর নিকির। নিজের নিজের সমাজের কাছে আমরা অপরাধী। আদি যুগের কোন এক দুর্জ্ঞেয় প্রতিফলনে আমরা

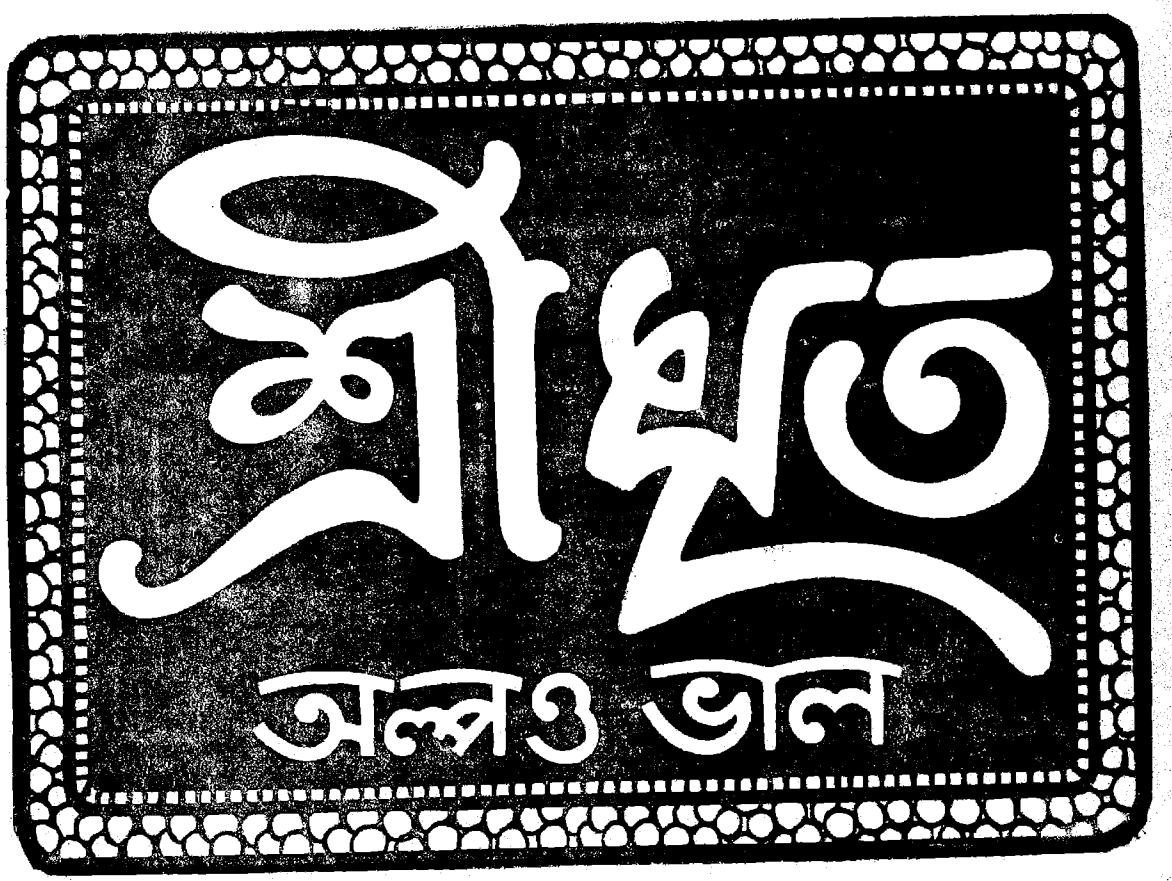

বর্তমানের বিকৃত ব্যতিক্রম। কিন্তু সেই বিকারই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। প্রাভার ও ইউসোভ শিবিরে শিশুর মুখ দীর্ঘকাল কেউ দেখেনি। কাফ্রাম সমাজে জননীরা মৃতবৎসা। শিশু-জন্ম কদাচিৎ হলেও তাদের বাঁচানো যায় না। আমাদের সন্তান কোন অলৌকিক কারণে জানি না সুস্থ সবল ও সূর্যাভিশাপ মুক্ত। কন্দরবাসীদের লুপ্ত লিপির কোন মূল্য যদি থাকে তাহলে তার বিধান নিয়ে আর নিজেদের আকুলতা দিয়ে এ সন্তানকে হয়ত বাঁচাতে পারব।

পারব, পারব, পারতেই হবে। নন্দক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আমার আজীবনের সাধনার এই হবে চরম পরীক্ষা। বিলুপ্তি-রোধের যা কিছু ওষধি উপায় আমি জেনেছি শিখেছি সব প্রয়োগ করে এ শিশুকে রক্ষা করবই।

তা যদি পারি, পরজ শান্ত স্বরে বলে, তাহলে মানবগোষ্ঠীর নিরাময় ধারা তার ও তার মত আরও দু-একটি নবজাতকের মধ্য দিয়ে ভাবীকালে প্রবাহিত হতেও পারে।

এক মুহূর্ত নীরব হয়ে পরজ আবার বলে, মানবগোষ্ঠীর ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে বুবন নিকিকে বন্দিনী করে কাফ্রামদের কাছে প্রত্যর্পণ করতে চায়। সেই ভবিষ্যতের পানে চেয়েই বুবনকে সন্তানবতী নিকির কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরাও চল। তোমাদের কর্তব্য তোমরাই স্থির কোরো তারপর।

কর্তব্য আমার স্থির হয়ে গেছে পরজ। দৃঢ়স্বরে বলে বুবন, শুধু কাফ্রামেরা কেন, এ ভূখণ্ডের তিন শিবির একত্র হয়েও এ কন্দর যদি আক্রমণ করে তবু আমার মৃতদেহ দলিত না করে তারা এ কন্দরে প্রবেশ করতে পারবে না।

কিন্তু আমি শুধু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। দুরু তার দুর্ভাবনার কথা প্রকাশ না করে পারে না—সে আর্ত চিৎকার তাহলে কিসের?

কোন আর্ত চিৎকার?

পরজের বিস্মিত প্রশ্ন উচ্চারিত হতে না হতে তারই উত্তরে যেন তিমির-কন্দরের গভীর হৃদয় থেকে এক তীব্র করুণ বিলাপ ধ্বনি তাদের দিকে তরঙ্গিত হয়ে আসছে মনে হয়।

সমবেত সকলে তখন স্থাণুর মত নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বিস্রস্ত বেশবাসে উন্মাদিনীর মত পিঙ্গলকেশা কাঞ্চনবর্ণা যে নারী ছুটে এসে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে পরজের বক্ষের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ে ইতি-পূর্বে কখনো না দেখলেও তাকে চিনতে কারুর বাকি থাকে না।

আকুল ক্রন্দনের ফাঁকে ফাঁকে নিকির উদ্ভ্রান্ত অসংলগ্ন বিলাপের যেটুকু অর্থ বোঝা যায় তাতে সবাই স্তম্ভিত।

নিদ্রিত অবস্থায় তার ক্রোড় থেকে কে তার সন্তানকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। জেগে উঠে সন্তানকে না পেয়ে সে তিমির-কন্দরের পথে পথে উন্মাদিনীর মত তাকে খুঁজে বেড়িয়েছে দীর্ঘকাল। কখনো আর্তনাদ করেছে কখনো শোকের তীব্রতায় মূর্ছাহত হয়ে পড়েছে। শিশুর কোন সন্ধান কোথাও পায়নি।

দুরু ও তার সঙ্গীরা এবার বুঝতে পারে প্রথমে তস্করের কবলে অপহৃত শিশুর ক্রন্দনধ্বনিই তারা শুনেছিল। সে তস্কর তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়াবার চেষ্টা করাতেই সে ধ্বনি অমন দিগ্বিদিকে বিক্ষিপ্ত বলে মনে হয়েছে। এরপর তারা যা শুনেছে তা নিকিরই আর্তনাদ।

কিন্তু এই অজ্ঞাত তিমির-কন্দরে প্রবেশ করে এ শিশুকে হরণ করা কার পক্ষে সম্ভব? কাফ্রামদের পক্ষে এ গুহাপুরীর পথ আবিষ্কার করাই ত কল্পনাতীত। তাছাড়া এ পথের সন্ধান পেলেও তারা এ কাজে গুপ্ততস্কর রূপে কাউকে পাঠাত না। সম্মিলিতভাবেই আক্রমণের চেষ্টা করত। শুধু সন্তানকে হরণ করে নিকিকে তারা নিষ্কৃতি দিত না কিছুতেই

অসহায় নিদ্রিত নারীর কোল থেকে এমনভাবে সন্তানহরণের নৃশংসতা কে তাহলে কিসের স্বার্থে করতে পারে?

এ বিহ্বল প্রশ্নের কোন উত্তরই যেন নেই।

## দশম উল্লাস
## কৈমুতিক

শিশু-অপহর্তার সন্ধান কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশ্চর্যভাবে মেলে। মেলে অবশ্য স্বেচ্ছায় তস্কর স্বয়ং এ অপহরণের দায়িত্ব স্বীকার করে বলে।

তস্কর আর কেউ নয় স্বয়ং শর্ভ—এ কথা কে পেরেছিল কল্পনা করতে!

শিশু-হরণের সংবাদ জানবার পর ব্যাকুলভাবে জনে জনে তখন তিমির-কন্দরের সর্বত্র খুঁজে ফিরছে।

এই অন্বেষণের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ-পথে বুবন ও পরজ শর্ভের দেখা পায়।

তিমির-কন্দরে তার উপস্থিতিই বিস্ময়কর।

কিন্তু সে বিস্ময় প্রকাশের তখন সময় নয়। বুবন ও পরজ ব্যাকুলভাবে অপহৃত শিশুর সংবাদ দিয়ে শর্ভ সে বিষয়ে কিছু জানে কিনা জিজ্ঞাসা করে।

শর্ভ যা উত্তর দেয় তা তাদের কল্পনারও অতীত।

নিজে যাকে হরণ করেছি তার খবর আমি ছাড়া জানবে কে! —নির্বিকারভাবে জানায় শর্ভ।

স্তম্ভিত বিস্ময়েই কিছুক্ষণ বুঝি তারা নির্বাক হয়ে থাকে। তারপর বিমূঢ় ব্যথিত স্বরে পরজ শুধু বলে, এ পরিহাসের সময় নয় শর্ভ। সত্যই আমার সন্তান অপহৃত। যদি যথার্থ কিছু জানো ত বলো। মিথ্যা যন্ত্রণা দিও না।

মিথ্যা যন্ত্রণা থেকে মুক্তিই ত তোমাদের দিতে চাইছি পরজ। তোমার সন্তান সত্যই তাই হরণ করেছি।

তুমি হরণ করেছ সত্যই! পরজের স্বরে তখনো অবিশ্বাস। কেন? কেন?

একটা অতিদীর্ঘ অসহ্য করুণ প্রহসনে শেষ যবনিকাপাত করতে। শর্ভের কণ্ঠ যেন করুণাতেই স্নিগ্ধ।

তোমার বাতুলতা রাখো শর্ভ! পরজ ধৈর্য হারিয়ে বলে, সত্যিই যদি এ কাজ করে থাকো ত কোথায় তাকে রেখেছ বলো! নিয়ে চলো অবিলম্বে আমাদের সেখানে!

না পরজ। শান্ত দৃঢ়স্বরে বলে শর্ভ, ফিরিয়ে দেব বলে তাকে হরণ করিনি। হরণ করেছি ইতিহাসের একটা ক্ষীণতম ধারাও যাতে ভাবীকালে না পৌঁছোতে পারে তারই জন্যে। ওই অবোধ অচেতন জড়পিণ্ড প্রায়-শিশুর মধ্যে তোমরা মানব-গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ আশার দীপ দেখতে পাচ্ছ। কি সে আশা তা কখনো ভেবে দেখেছ? ওই শিশু বেঁচে থাকলে বড় হবে মানুষ হবে। সে মানুষ হওয়া মানে ত শুধু দেহ ও মনের ক্ষুধায় ও জিজ্ঞাসায় জর্জর হওয়া, নিরাপদ নিশ্চিন্ততার জন্যে গোষ্ঠী গড়ে তারই শাসনবন্ধনে হয় জীবমৃত নয় ক্ষত-বিক্ষত হওয়া, অস্তিত্বের অর্থ খুঁজতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে আকাশ-ধরণী এক বা একাধিক দেবতায় ভরিয়ে তুলে তাদের দীন স্তাবকতা করা! ওই শিশু এক থেকে অগণনও যদি হয় তাহলেও তার রীতিনীতি ধর্ম সব হবে তার লোভ, হিংসা দম্ভ, দীনতার নগ্ন বীভৎসতাকে রঙীন আচ্ছাদন দেবার ছলনা। মিলনের চেয়ে বিভেদেরই সাধনা সে করবে অনেক বেশী, তারপর একদিন ঈর্ষা ও হিংসার তাড়নায় সূর্য-বীর্য অর্জনের লোভে সূর্যাভিশাপের ব্যাধি-কলঙ্ক নিয়ে আবার ধ্বংসের পথে নামবে। এ দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি আছে শুধু সমস্ত আবর্তনের কেন্দ্রগত অচলতায়। সেই অচলতাই তোমার শিশু লাভ করুক। মানবগোষ্ঠীর ধারা চিরকালের মত যাক লুপ্ত হয়ে সেই অচলতায়।

উন্মাদের বাতুল প্রলাপ। তবু তাই শুনতে শুনতে বুবন ও পরজ কি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিল!

সহসা চমক ভেঙে উদ্যত-কৃপাণ বুবনই প্রথম চীৎকার করে ওঠে, তোমাকে একটি প্রশ্ন শুধু করব শর্ভ। তোমার আরাধ্য অচলতাই চাও, না শিশুকে দেবে ফিরিয়ে?

উন্মাদ শর্ভ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার অবিচলিত মুখে দুর্বোধ এক হাসি।

বুবনের কৃপাণ সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত নেমে আসবার পরও সে হাসি যেন মিলায় না।

শর্ভের ভূলুণ্ঠিত দেহ অস্থিরভাবে অতিক্রম করে বুবন ও পরজ এগিয়ে যায়!

শিশুর অস্পষ্ট রোদনধ্বনি কোন গোপন গুহাগর্ভ থেকে ভেসে আসছে কি!

গহন তিমির-কন্দরের বুকে অনন্ত ভাবীকালই যেন শিশুর কণ্ঠে রোরুদ্যমান।

তার সন্ধান সত্যই কি কেউ পাবে না?

—শেষ—

ছোটবেলায় আর কৈশোরে খবরের কাগজের পাতায় পাতায় স্বদেশী আন্দোলনের কথা পড়তাম। পড়তাম জওহরলাল, রাজাজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনী, পন্থজী, জয়প্রকাশ, অশোক মেটা, রামমনোহর লোহিয়া ও আরো কতজনের কথা। নানা-জনের মুখে মুখে শুনতাম বিলেতে বসে কৃষ্ণমেননের কীর্তি-কলাপ। হেডমাষ্টার-মশাইয়ের কাছে কতদিন মাসানীর 'আওয়ার ইন্ডিয়া'র পড়া না পারার জন্য বকুনি খেয়েছি, তার হিসাব-নিকাশ নেই। জওহরলাল-জামাতা ফিরোজকে নিয়েই কি কম খোসগল্প করেছি এর আগে! এমনি নানাভাবে দেশের নেতাদের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত কৌতূহল দানা বেঁধে উঠেছিল মনের মধ্যে। মাঝে মাঝে এঁদের কথা ভেবে উত্তেজনাও বোধ করতাম।

দেশ স্বাধীন হলো। হোয়াইটওয়ে লেডলা'র ধনুজায় ফাটল ধরল। বাই য়্যাপয়েন্ট-মেণ্ট অফ দি হিজ রয়্যাল ম্যাজেস্টির কদর চৈত্রদিনের ঝরা পাতার মত ঝরে গেল। র‍্যানকিন উঠে খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম-চঞ্চলতা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পেল। ভাইসরয় কাউন্সিলের 'অনারেবল মেম্বর'দের গলফ খেলার ছবির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি ভবন আর লাটপ্রাসাদের সূত্রযজ্ঞের ছবি ছাপা শুরু হলো সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। লর্ড ক্লাইভের একদা বংশধরদের তীর্থস্থান ইউনাইটেড সার্ভিসেস্ ক্লাব উঠে গেল; পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় গান্ধীচক্র, সুভাষদল, ঝান্সী ব্রিগেড গড়ে উঠল। বিদেশী দ্রব্যের ব্যবহার কমল; নেতাজী বিড়ি, তেরাঙ্গা শাড়ী-সন্দেশ, গান্ধীজির বিকৃত ছবিওয়ালা রেশনব্যাগ সারা দেশ ছেয়ে ফেলল। গ্রাজুয়েটও কণ্ডাক্টর হলো; আর ভূতপূর্ব রাজনৈতিক বন্দীর বিড়ির দোকান গজিয়ে উঠল অলিগলির আশে-পাশে যত্রতত্র।

দিল্লীর কুইনস্‌ওয়ের নাম 'জনপথ' হলো। সাহেব গিয়ে কংগ্রেস এলো। উত্তপ্ত লোহার উপর হাতুড়ি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চারদিক, সাউথ ব্লকে জওহরলালের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেও তেমনি দিল্লীর সমাজজীবনের সীমিত গণ্ডী ভেঙে একাকার হয়ে গেল। গলফ-চেমসফোর্ড-জিমখানা ক্লাবত্রয়, সিসিল-ইম্পিরিয়াল প্রভৃতির 'বার' ও গুটিকতক কুঠীর মধ্যে অতীত দিল্লীর যে সামাজিক গণ্ডী বাঁধা ছিল, পার্লামেণ্টশীর্ষে তেরাঙ্গা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কিংসওয়ে ক্যাম্প—হরিজন কলোনী থেকে দক্ষিণে তিনমূর্তি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল নিঃশব্দে। আর ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্যদের কুঠীর অতি বিস্তৃত অঙ্গনে ঘাসের জাজিম আলু-মিনিয়াম পেণ্টেড বেতের কুর্শীতে বসে আই-সি-এস তিলকাঙ্কিত ভাগ্যবানদের অপরাহ্নকালীন মোসাহেবীর আসর বিদায় নিয়ে নতুন করে আরম্ভ হলো পার্লামেণ্টের সেণ্ট্রাল হলের কফির মজলিশ।

পার্লামেণ্টের প্রেস গ্যালারী থেকে জওহরলাল-কৃপালনী-মাসানী-ডাঙ্গে-অশোক মেটা প্রভৃতির বাদানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে সেণ্ট্রাল হলের আড্ডাখানার প্রতি আমার অসীম আকর্ষণ। বোধকরি সারা দেশের মধ্যে এটি একমাত্র স্থান যেখানে মন্ত্রীদের অহমিকার উগ্র প্রকাশ নেই, নেই দলাদলির ক্ষুদ্রতা। রাজনৈতিক দুনিয়ার কৈলাস-মানস সরোবর আর কি!

কেরালায় সেণ্ট্রাল ইন্টারভেশন নিয়ে লোকসভার ভিতরে কমিউনিষ্টদের তীব্র মন্তব্যে জর্জরিত করলেন 'দাদা' কৃপালনী। কৃপালনীর ঘাড়ে বন্দুক রেখে ফায়ার করে সাদা টুপিওয়ালার দল আনন্দে আটখান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। কেরালার টমাস ট্রেজারী বেঞ্চে বসে খুনীর মামলার দারোগার মত কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে অফুরন্ত অভিযোগ পেশ করলেন 'মিঃ স্পীকার, স্যারের' বিবেচনার জন্য। ডাঙ্গের সুতীব্র কটাক্ষ ভীমরুলের হুলের মত বিদ্ধ হলো বিপরীত দিকের সবার অন্তরে। ডাঙ্গের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বিধান-ভ্রাতুষ্পুত্রী রেণু চক্রবর্তী ও মন্ত্রী-কন্যা পার্বতী কৃষ্ণাণের সম্মিলিত কলধ্বনি কৃপালনী-মাসানী-ফ্রাঙ্ক এ্যান্থনীকে একটু চঞ্চল ও লোকসভার পরিবেশকে কিঞ্চিৎ নাটকীয় করে তুলল। এমনিভাবে সাটল-ককের মত অভিযোগ-অনুযোগ দেওয়া নেওয়া হলো।

'হাউস' থেকে সেণ্ট্রাল হলে ঢুকলেন প্রায় সবাই। প্রেস গ্যালারী থেকে বেরিয়ে ঘুরে সেণ্ট্রাল হলে ঢুকতেই দেখি একটা সিগারেট হাতে নিয়ে গেরেবেচারার মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন দাদা কৃপালনী। আমাকে দেখতেই বল্লেন, এই, ম্যাচিস দিজিয়ে।

'সরি'।

সরি! বেটা বদমাস প্রেসওয়ালা, সিগারেট নেই পিতা এহি বিলিভ করনা হোগা?

একটু এগিয়ে যেতেই আদিভূমি তেলেঙ্গানার নাগি রেড্ডীকে পাকড়াও করে বল্লেন,

"আলোয় আলোকময় ক'রে হে
এলে আলোর আলো"

প্রস্তুতকারক

ভাল জিনিসের দাম বেশী হয়

ইহার বৈশিষ্ট্য-
- পিতলের তৈরী বার্নার টিউব
- সম্পূর্ণ লণ্ঠন মোটা চাদর তৈরী
- লণ্ঠনের রং কেরোসিন তেলে নষ্ট হয় না
- শক্ত ও মজবুত

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৬৩, ৩নং চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন: ২২-৬৫৮০

দাও আগুন দাও। বিস্মিত ভাবে নাগি রেড্ডীকে চেয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হ'য়ে বলে উঠলেন, সারা কেরালায় আগুন জ্বালালে, আর আমার এই সিগারেটে একটু আগুন দিতে পারছ না ?

মুহূর্তের মধ্যে পাশে এলেন ফিরোজ গান্ধী। আচার্যকে লক্ষ্য করে বল্লেন, কিউ দাদা, কি ব্যাপার ? 'ইন্টারভেন' করব নাকি ? বুঝলেন আগুন নিয়ে খেলা চলছে। পরোপকারের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পকেট থেকে দেশলাই বের করে বল্লেন, নিন, আমিই আগুন জ্বালাচ্ছি। ফোক্‌লা দাঁতের এক গাল হাসি আর ধোঁয়া ছেড়ে আচার্য বল্লেন, তা বাবা তুমি আগুন জ্বালাতে পার; কিন্তু বি কুইক ফিরোজ। সবাইকে হাসিয়ে আচার্য অন্যত্র গমন করলেন।

এক পাশ দিয়ে ঘুরে সেণ্ট্রাল হলের নিউজ কর্ণারে টেলিপ্রিণ্টারের শেষ খবর-গুলো দেখতে চলেছি, এমন সময় একটু খোঁচা খেতেই পাশ ফিরে দেখি শ্রীমতী উমা নেহরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। হাত ধরে টেনে নিয়ে এক কোনায় পাশে নিয়ে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, বলতে পারো বাঙালী-দের মধ্যে চৌধুরীরা ব্রাহ্মণ না কায়স্থ ? হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র ও লক্ষণ সেন প্রচলিত শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে আমার জ্ঞান অপরিসীম; তবুও সমস্ত স্মৃতি রোমন্থন করে বিজ্ঞের মত জানালাম 'দুইই' হয়। শ্রীমতী নেহরুকে একটু চিন্তান্বিত দেখলাম। জানলাম, তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় যেসব বাঙালী উদ্বাস্তু মেয়েরা উত্তরপ্রদেশের নানা হোমে রয়েছেন, তাঁদেরই একজনের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে এই খোঁজ। ইনি উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে এক 'জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট' করেছেন যে এই সব বাঙালী উদ্বাস্তু মেয়েদের বিয়ের জন্য বেকার অথচ ভাল ছেলে তাঁর পছন্দ হলে সরকারকে তাদের চাকুরি দিতে হবে। শুধু তাই নয়, উত্তরপ্রদেশ সরকারের নানা দপ্তরে ফাইলের স্তূপের আড়ালে যেসব চিরকুমার লুকিয়ে রয়েছেন, তাঁদের বহু-জনের খোঁজ করে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করেন।

কানে কানে ফিস ফিস করে বল্লেন, মেয়েদের 'হোম' চালান কি সহজ ব্যাপার! ঝঞ্ঝাটের যেন শেষ নেই।...এক মহারাজপুত্র জানাল সে একটি রিফিউজি মেয়েকে ভালবাসে এবং বিয়ে করতে চায়। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে মাথা নীচু করে নখ খুঁটতে লাগল; বুঝলাম ইচ্ছা আছে। এবার একটু দৃঢ় হয়ে বল্লেন, জান ভট্টাচারিয়া, আমি কিন্তু ঐ বিয়েতে মত দিলাম না। রাজকুমারকে জানিয়ে দিলাম, বাপের টাকা ও চোখের নেশা কেটে গেলে তো আমার রিফিউজি মেয়েকে দূর করে দেবে; তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হবে না।

* * *

শ্রীমতী নেহরু অন্য একদিন এখানে বসেই কথায় কথায় টাকা-কড়ির আলোচনা শুরু করলেন—'লোকে ভাবে এম পি বলে কত টাকাই না জমাই। বিলিভ মি, একটা পয়সাও জমে না। পার্লামেণ্টারী পার্টিকে হেভী সাবস্ক্রিপসন ছাড়াও আজ এটা, কাল ওটা তো লেগেই আছে।...এই ত জওহরলাল বলেছে, আসাম আর কাশ্মীর ফ্লাডের জন্য একান্ন টাকা করে দিতে হবে। নিজের কনষ্টিটুয়েন্সীতে খরচ আছে, মণ্ডল-জেলা-পি-সি-সি ও এ-আই-সি-সির চাঁদা তো আছেই। এ ছাড়া আছে সোস্যাল ওয়েল-ফেয়ার অর্গানিজেশন ও আমাদের চিলড্রেন্স আর রিফিউজি হোম-এর চাঁদা। পার্লামেণ্ট থেকে যা পাই, তার একটা পয়সাও বাঁচে না, উপরন্তু কুলিয়ে ওঠাই দায়।' একটু থেমে আবার বলেন, 'জওহরলালকেও সব দিয়ে দিতে হয়; বই'এর আয় থেকে কোন মতে নিজের খরচা চালায়।

রিফিউজি মেয়েদের কাহিনী শুনে দিল্লীর পার্লামেণ্ট ভবন থেকে মন তখন চলে গিয়েছে কর্ণফুলি-বুড়ীগঙ্গা-মেঘনার পাড়ে; স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে ধুবুলিয়া-বার্ণপুর-বনগ্রামের সেই পরিচিত বেদনা-ময় ছবি। একটু আনমনা হয়েই চলেছিলাম। হঠাৎ তীব্র হাসির শব্দে মনের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। দেখি পাতিল খুব জোর জমিয়ে বসেছেন। কেরালার কমিউনিষ্ট

পাতিল খুব জোর
জমিয়ে বসেছেন —

ডেমোক্র্যাসী নিয়ে খোসগল্প চলছে। কেরালা শুনতেই খবর পাবার মহোৎসাহে বেশ একটু ঠেলাঠেলি করেই জায়গা করে নিলাম। শুনি পাতিল বলছেন, কেরালার এক মহতী জনসভায় গীতার কয়েকটা শ্লোককে অ্যামেণ্ড করে ডেমোক্রাটিক করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এযুগে গীতার 'এথিক্স অফ লাইফ' অচল এবং তাকে অ্যামেণ্ড করতে হবে। পাতিলের বক্তব্য শেষ হলো; হাসিতে সবাই লুটিয়ে পড়লেন।

পার্লামেণ্টের 'কমিউনিষ্ট পার্টির চীফ এম-পি রিলেসন্স অফিসার' রেণু চক্রবর্তী এতক্ষণ ধৈর্য ধরে গল্প শুনে এবার পাতিলের পিঠে এক মৃদু চাপড় মেরে বল্লেন, হোয়াট ইজ দিস ?

কাকুতি-মিনতি করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জাঁদরেল মন্ত্রী পাতিল দু'হাত জোড় করে বল্লেন, রেণু, ফর গডস্ সেক, প্লিজ এক্সকিউজ মি। আই অ্যাম দি লাস্ট মান টু ট্রাই টু অ্যামেণ্ড ইউ অ্যাণ্ড ইওর ফ্রেণ্ডস। যা বলেছি, সব অফ্ দি রেকর্ড; রাগ করো না।

হাজার হলেও বিধানবাবুর ভাইঝি, সাংবাদিকের পত্নী এবং তার উপর কমিউনিষ্ট। সুতরাং বিক্রমটা নেহাৎই কম নয়। ফোঁস ফোঁস করতে থাকেন চক্রবর্তী-গৃহিণী।

একটু চুপ করে থেকে এবার নিতান্ত গোবেচারার মত পাতিল বলেন, রেণু, কাম হিয়ার; বসো কফি খাও।...বেয়ারা! কফি লে আও; এক, দো, দো, তিন.....দশ কাপ লে আও।

—শুধু কফি কে খাবে? ফোঁস করে উঠলেন শ্রীমতী চক্রবর্তী।

—আচ্ছা বাবা, অর ভি কুচ লে আও; স্যাণ্ডউইচ, কাজু.....।

সবাই এদিকেই মশগুল। এক পাশে ফিরোজ আর কৃষ্ণমেনন যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বিশেষ কেউ লক্ষ্যই করেননি। মাথা থেকে গান্ধীটুপি খুলে সাদা চকচকে টাক চুলকাতে চুলকাতে পাতিলকে লক্ষ্য করে ফিরোজ বল্লেন, মিনিষ্টার সাব! হু আর দি টেন ফরচুনেটস যারা কফি আর ঐ সব কি কি পাবে?

অভিমান-হত কণ্ঠে ভ্রূকুঞ্চিত করে কৃষ্ণমেনন বলেন, ফিরোজ, ডোণ্ট বেগ ফ্রম সেলফিস পাতিল। শুধু নিজেই কফি খেতে জানে।

উদাসীনভাবে পাতিল বল্লেন, ফিরোজ মে ট্রাই হিজ লাক, বাট আই ডোণ্ট সী এনি হোপ ফর অ্যানাদার।

তবে রে! নো হোপ অ্যানাদার! ছড়ি দিয়ে পাতিলকে ঠেলে সরিয়ে জায়গা করে নিলেন কৃষ্ণমেনন। বেয়ারা কফির ট্রে নিয়ে হাজির হতেই চিলের মত ছোঁ মেরে তুল্লেন। সবার বিস্ময় কাটবার আগেই এক কাপ শেষ করে আর এক কাপ ঢেলে নিলেন মেনন। মিনিটের কাঁটা ঘুরতে না ঘুরতেই সেকেণ্ড কাপ শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন।

—গুড বাই রেণু। ছড়ি দিয়ে পাতিলকে এক খোঁচা মেরে বল্লেন, গুড বাই পাতিল। এক দু' কদম সরে গিয়ে বল্লেন, আমার লুঙ্গি পাঞ্জাবির পকেট নেই, পয়সাও নেই; আগে আগে কেটে পড়ি, নয়ত বেয়ারাটা হয়ত পিছু ধরবে।... অফকোর্স পাতিলের কোট-প্যান্ট-জামার অনেকগুলো পকেট; ফিরোজ, ডু ইউ থিংক দে আর এমটি?

পিছন ফিরে হাসতে হাসতে কৃষ্ণমেনন চলে গেলেন।

—একমাঘে শীত যাবে না। এই বলে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করেন পাতিল।

একটু দূরে দেখি সোস্যালিষ্ট থিওরিটিসিয়ান অশোক মেটা কয়েকজনের সঙ্গে কি না কি গুরুতর বিষয় আলোচনা করছেন। পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আরও দু' একজন বাঙালী ছিলেন। আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন, আই কাণ্ট ইমাজিন বেঙ্গল ক্যান গো কমিউনিষ্ট। সব বাঙালীর মধ্যেই দেশপ্রেম আছে, ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা আছে...

মাঝখান থেকে কে একজন বলে উঠলেন, বাংলার কংগ্রেস যে—

তীব্র আক্ষেপ করে সোস্যালিষ্ট তত্ত্ব-বিশারদ বলেন, তাই বলে সবাই কমিউনিষ্ট হবে? একি কথা?

"কয়েকটি মঞ্চসফল সার্থক নাটক"

পৃথ্বীশ সরকার
**কন্যালগ্ন**
**লবনাক্ত**

জোছন দস্তিদার
**অন্তরীণ**

কল্লোল মজুমদার
**আষাঢ়ে ঝঞ্ঝাট**

অমরেন্দ্র দাস
**এর শেষ নেই**

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
**রায়**

কমল চট্টোপাধ্যায়
**শাশ্বতিক** (একাঙ্ক)

তরুণকুমার
**কে থাকে কোথায়** (একাঙ্ক)

বিধায়ক ভট্টাচার্য
**সরীসৃপ** (একাঙ্ক)

কল্লোল মজুমদার
**ষ্টাণ্ট** (একাঙ্ক)
**অলমিতি** (একাঙ্ক)

পৃথ্বীশ সরকার
**ঋতুর শেষ নাম বসন্ত** (একাঙ্ক)

নীতীশ সেন
**একটি চায়ের কাপ** (একাঙ্ক)

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়
**নির্বাক প্রহরী** (একাঙ্ক)

"উপহার দিবার মত বই"

জোছন দস্তিদার
**প্রহরান্তে** (উপন্যাস)

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়
**স্বামী বিবেকানন্দ** (জীবনী)

অমরেন্দ্র দাস
**নাম নেই ছেলেটির** (শিশু-উপন্যাস)

অমর লাইব্রেরী
৫৪।৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আলাপ-আলোচনার যেন শেষ নেই সেণ্ট্রাল হলে। কি মন্ত্রী, কি এম-পি, কি প্রেস করসপনডেণ্ট—সবার মুখে যেন ডুবড়ী ফোটে এখানে।

গোটা দুই বেঞ্চি জুড়ে জমিয়ে বসেছিলেন দাদা কৃপালনী। দাদাকে ঘিরে ছিলেন মহাবীর ত্যাগী, মালব্য, বিমল ঘোষ, শরণ সিং, অশোক সেন প্রভৃতি এবং আমরা একদল। আলোচনা হচ্ছিল মৌলানার বম্ব শেল ফ্রম গ্রেভ ইয়ার্ড—ইণ্ডিয়া এ্যাটেন্স ফ্রীডম।

আচার্য বল্লেন, আগে তো ওয়ার্কিং কমিটির সব মিটিং-এই আমি উপস্থিত থাকতাম। কিন্তু কই, মৌলানা সাহেব বইতে যা লিখেছেন, তাতো কোনদিন বলতে শুনিনি।

বিমল ঘোষ বলে উঠলেন, দাদা, আপনি একটা অটোবায়োগ্রাফী বা মেমরি অফ ফ্রীডম মুভমেণ্ট লিখুন...

মালব্য-ত্যাগী-অশোক সেন একযোগে বলে উঠলেন, হ্যাঁ দাদা, আপনি একটা লিখুন।

—কি হবে লিখে? পোষ্টমর্টম একজামিনেশন করে কি কোন লাভ আছে? তাছাড়া এতে হয়ত আবহাওয়া আরো অন্ধকার হয়ে উঠবে।

সবাই বলে উঠলেন, তা হোক, তবু এর প্রয়োজনীয়তা আছে। ভবিষ্যতের ছেলে-মেয়েদের এসব জানান দরকার।

হঠাৎ মাঝখান থেকে বাঁকা চোখে আধো আধো স্বরে সুচেতাদি বলে উঠলেন, আমি কতদিন বলেছি ওকে।

'আমি কতদিন বলেছি ওকে'

—তুমি তো কত কথাই বলো!

মহাবীর ত্যাগী বলে উঠলেন, দেশেরও কিছু হবে না, কংগ্রেসেরও কিছু হবে না। হবে কোথা থেকে? এদিকে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের স্বামী ফিরোজ এক 'রিবেল', আর জেনারেল সেক্রেটারীর স্বামী দাদা কৃপালনী আর এক ফেমাস রিবেল। কংগ্রেস হ্যাজ বিন হ্যাসব্যাণ্ডেড্ বাই রিবেলস।

লাভলি, লাভলি।

একটু মৃদু হেসে আচার্য বল্লেন, ওসব কথা আমাকে বলো না ভায়া; জওহরলালের পিসফুল কো-এক্জিস্টেন্স বলতে যদি কোথাও কিছু থাকে, তবে তা আমার বাড়ীতেই আছে। সারা দুনিয়ার অন্যত্র তা ধানচাল হয়ে গেছে।

* * *

আর একদিন নানাপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার পর হিউমার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ডাঃ কেশকার বল্লেন, আমি যতদূর জানি সরোজিনী নাইডুকে কেউ বিট করতে পারত না। মিসেস নাইডুর হিউমার জ্ঞানের এক চমৎকার কাহিনী শোনালেন ডাঃ কেশকার।

মিসেস নাইডু তখন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। বোম্বের থেকে দিল্লী আসছিলেন; সঙ্গিনী ছিলেন এক প্রোথিতযশা কংগ্রেসনেত্রী। নেত্রী মহোদয়ার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পুরুষ-কণ্ঠের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাছাড়া ববড্ হেয়ার ও দেহের গঠনে নারীর বৈশিষ্ট্য ও কমনীয়তার অভাব ছিল। যাহোক, এক লেডিস ফার্ষ্টক্লাশে এ'রা দুজনে ভ্রমণ করছিলেন। বেশ একটু রাতে হঠাৎ কি কারণে টিকেট-চেকার দরজায় নক্ করল। দরজা খুলে স্লিপিং স্যুট পরিহিতা মিসেস নাইডু-সঙ্গিনী চেকারের সামনে হাজির হলেন।

—হোয়াটস দি ম্যাটার? এত রাত্রে বিরক্ত করতে এলেন কেন?

কণ্ঠস্বরের সেই কর্কশতা।

চেকার তো রেগে লাল। বিরক্ত করতে এলাম কেন, সে পরে দেখা যাবে। কিন্তু হাউ কুড ইউ বি ইন দিস লেডিস কম্পার্টমেণ্ট.. কোন লেডিস প্যাসেঞ্জার আছেন এই কম্পার্টমেণ্টে?

—হ্যাঁ, আমি বাদে একজন লেডি প্যাসেঞ্জার আছেন।

দুজনের কি তর্ক! শ্রীমতী নাইডু চাদর মুড়ি দিয়ে চুপচাপ মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন। তাঁর সঙ্গিনী নানাভাবে চেকারকে বোঝাতে চাইছিলেন যে তিনিও এই কামরায় ভ্রমণ করতে পারেন; কিন্তু চেকার কিছুতেই বুঝতে চাইছিলেন না।

দিল্লী ফিরে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সব বৃত্তান্ত পেশ করলেন শ্রীমতী নাইডু। শেষে মন্তব্য করলেন, আই ডোণ্ট নো হাউ সী কনভিন্সড দি চেকার দ্যাট সী ওয়াজ কোয়ালিফায়েড টু ট্রাভেল ইন লেডিস কম্পার্টমেণ্ট।

'ভেবে দেখিনি'

এই সেণ্ট্রাল হলের এমন রাজনৈতিক ও অন্যান্য আলোচনার আড়ালে কাঁচা বয়সের একদল এম-পি আর করসপনডেণ্ট সরস আলোচনার আসর জমিয়ে বসেন।

ভারতনাট্যম দেখিয়ে লণ্ডন-প্যারী-মস্কোতে কড় বইয়ে, লণ্ডন টাইমস'এর এডিটোরিয়ালে কমেণ্টটেড হয়ে বৈজয়ন্তী-মালা এলেন দিল্লী। অশোকা হোটেলে এক ক্রাউডেড প্রেস কনফারেন্সে নৃত্যপটিয়সী অভিনেত্রী জানালেন, ভারত থেকে ভারত-নাট্যম, কথক প্রভৃতি নৃত্যশিল্পকে কন্টিনেন্টে এক্সপোর্ট করার মহত্তম সুযোগ দেখে এসেছেন তিনি।

যোগীপুরুষের মত এক সাংবাদিক তাঁকে সিরিয়াসলি প্রশ্ন করলেন, বিয়ে করছেন কবে? পছন্দ করেছেন কাউকে? প্রশ্নকর্তার চাইতেও নির্বিকার চিত্তে নিতান্ত দার্শনিকের মত উত্তর দিলেন নর্তকী-অভিনেত্রী, ভেবে দেখিনি।

পরের দিন সেণ্ট্রাল হলে একদল ছোকরা এম-পি ও একদল করসপনডেণ্টদের কি সরস আলোচনা। আড় চোখে চেয়ে দেখেছি, ক'জন বেশ বয়স্ক মিনিস্টার—এম-পি একটু দূরে বসে এই আলোচনার রসালাপ উপভোগ করছিলেন।

এমনিভাবেই চলে সেণ্ট্রাল হলের দিন। মাঝে মাঝে মনে হয় বোধকরি সেণ্ট্রাল হলই ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রাসীর মানস সরোবর। *

দ্বিতীয় লোকসভার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা।

# কার্বন কপি

আশাপূর্ণা দেবী

লাল কাঁকরের সরু রাস্তাটা এসে শেষ হয়েছে, রংচটা ওই কাঠের গেটটার সামনে। শেষ হওয়া ছাড়া রাস্তাটার আর গতি ছিল না। কারণ শহরটাও শেষ হয়ে গেছে এখানে।

বাড়ীর পিছনেই রেললাইনের উঁচু বাঁধ। আর ওপাশে অনেকখানি বালির চড়ার ওধারে একটা বালুনদী। নাম নেই, দেহাতিরা ওর প্রকৃতি বিচার করে একটা নাম দিয়ে রেখেছে। ওরা বলে 'হঠাতি'। তার মানে ওই ওর প্রকৃতি। মাসের পর মাস কোথায় কোন-খানে লুকিয়ে আছে, অনড় রোগীর মত পড়ে আছে, হঠাৎ কোনও একদিনের আষাঢ়ে বর্ষণে লাস্যময়ী নবযৌবনার মত উথলে ওঠে।

এখন নদীটার অনড় রোগীর মূর্তি।

কিন্তু তখন ছিল ভরা যৌবন। অনেক দিন আগে যখন আর একবার এসেছিল উত্তরা 'ফুলমাটিতে'।

তাই এবারে এসে প্রথমটা চিনতে ভুল হচ্ছিল, 'চৌধুরী বাংলো' নামটা পড়ে নিঃসংশয় হলো।

তখন সেদিন নদীতে জল ছিল, আর সেই ছোট মেয়েটার চোখেও জল ছিল। অবিরাম কান্নায় বালিশ ভিজিয়েছিল সে, আর এক নদী বইয়ে ছিল।

অন্ততঃ উত্তরার পিসিমা সেই কথাই বলেছিলেন, 'ও-দাদা, মেয়ে যে তোমার কেঁদে নদী বইয়ে দিল গো।'

কিন্তু পিসিমার দাদা ওই নদী বহানোর মধ্যে আতিশয্যতা দেখেননি, তিনি জানতেন এমন ক্ষেত্রে অনেক ছেলেমেয়ে এমন অনেক কিছু করে বসে যা চোখের জলে নদী বহানোর চাইতে অনেক ঘোরালো।

উকিল মানুষ, কেস তো অনেক আসে? দেখেছেন নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে, দেখেছেন আত্মহত্যা করতে। তাই সকরুণ হাসি হেসে বলেছিলেন, 'অমন হয় মে মনীষা। সময় লাগবে সামলাতে।'

সামলাবার জন্যেই না মেয়েকে নিয়ে বিভাসরঞ্জন কলকাতার জনসমাজের বাইরে, এখানে এসে উঠেছিলেন। নইলে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বোনের একটা বাড়ী আছে বলে, স্বাস্থ্য উপায় করে নিতে আর কবে এসেছেন বিভাস?

উত্তরার মা আসেননি।

উত্তরার মা এটাতে আতিশয্য দেখেছিলেন। যার জন্যে মেয়ের এই মর্মান্তিক কষ্ট, সেটা তো মেয়ের নিজেরই বোকামির ফল। তবে?

যা নিজের দোষে ঘটেছে তার জন্যে আবার এত সহানুভূতি কি? এই অভিমত ছিল উত্তরার মায়ের। অভিমত ছিল, উত্তরা যত ধিক্কৃত হবে, যত তার লোকসমাজে মুখ দেখাতে মাথা হেঁট হবে, ততই আগামী বছরের জন্যে চেষ্টা আসবে, শপথ গ্রহণের সংকল্প আসবে।

বিভাস তা' বলেননি।

বিভাস নিজের কাজকর্মের ক্ষতি করে মেয়ে নিয়ে এক মাসের জন্যে এখানে এই 'চৌধুরী বাংলোয়' এসে উঠেছিলেন মেয়ের মনের সদ্যাক্ষতের উপর একটা পলস্তারা পড়বার সুযোগ দিতে।

এখানে লোকসমাজ কম।

উত্তরার পিসেমশাই অনেক দেখেশুনে এই জমিটুকু পছন্দ করেছিলেন বাড়ী করবার জন্যে। শহর ছাড়িয়ে রেললাইনের বাঁধের নীচে।

তা' পিসেমশাইকে আর বেশীদিন সে বাড়ী ভোগ করতে হয়নি, উত্তরার বিধবা পিসিই সময় সুযোগ মিললে এসে হাজির হতেন। কাঠের গেটের গায়ের মরচে-পড়া তালাচাবিটা খুলে ফেলে ঢুকে পড়তেন। থেকে যেতেন কিছুদিন।

সেই কিছুদিনের মধ্যে সেবার বিভাস আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। আসার কারণটা পিসি হয়তো ছেলেমানুষী বলে ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন দাদার একটা মোটে মেয়ে, তাই দাদা এত নাচাতে পারছেন। কিন্তু পিসির বড় ভাল লেগেছিল। 'বৌদির' আবরণমুক্ত দাদাকে পেয়ে ছেলেবেলার স্বাদ ফিরে পেয়েছিলেন যেন।

আর বিভাসও হয়তো সে আবরণের প্রভাব মুক্ত হয়ে বদলে গিয়েছিলেন, হালকা হয়ে গিয়েছিলেন। এই সহজ আবহাওয়ার মধ্যে থেকে উত্তরার চোখের জল শুকোতে বেশী দেরী লাগেনি, ম্যাট্রিকে ফেল করার মত মর্মান্তিক শোকও সামলে নিতে পেরেছিল।

হ্যাঁ, উত্তরা তার মায়ের মুখে কালি দিয়ে ম্যাট্রিকে ফেল করেছিল। একেবারে অপ্রত্যাশিত! প্রথম দিন প্রশ্নপত্রগুলো হাতে পেয়েই নাকি তার মাথার মধ্যটা একেবারে ধাপসা ধূসর হয়ে গিয়েছিল, সেই ধূসরতার মধ্যে থেকে একটা কথাও উদ্ধার করতে পারেনি উত্তরা। শুধু কলম কামড়েছিল, শুধু আকুল হয়ে মগজের সমস্তটা ওলট-পালট করে হাতড়ে বেড়াবার চেষ্টা করেছিল। চেষ্টা কাজে লাগেনি।

নার্ভাসনেস।

সম্পূর্ণ নার্ভাসনেস!

নইলে পড়াশোনা যথেষ্ট তৈরি করেছিল, বাড়ী এসে সেই প্রশ্নপত্রগুলোকেই টকাটক মেরে নিয়েছিল।

পরদিন থেকে বাকী দিনগুলো দিল পরীক্ষা, কিন্তু প্রথম দিনের ওই ব্যর্থতা সমস্ত উৎসাহ আর চেষ্টাকে শিথিল করে দিল।

ফলশ্রুতি ফেল।

উত্তরার মা এতটা আশা করেননি।

ভেবেছিলেন হয়তো থার্ড ডিভিশন পেয়ে মুখ ডোবাবে। একী! এ যে মুখে কালির বুরুশ!

উত্তরা ঘর থেকে বেরোয় না, কাজেই কালিপড়ামুখ মেয়ের সমস্ত আক্ষেপ আর অভিযোগের ভারটা তার উপর গিয়ে পড়ে। বিভাসবাবু দেখলেন মেয়েটাকে ওর মায়ের কবল থেকে কিছুদিনের জন্যে সরানো দরকার।

তাই মেয়ে নিয়ে ফুলমাটিতে চলে এলেন বোনের কাছে।

তা' বিভাসের বিবেচনাটা ভুল হয়নি।

শুধু শোকই সামলে উঠল না উত্তরা, যেন নতুন রক্তে লাবণ্যময়ী হয়ে উঠল, নতুন আবেগে চঞ্চল।

সে আবেগ কি শুধুই 'ফুলমাটির' আকাশ বাতাস আর পাখীরা ফুলেরা নিয়ে এসেছিল? সে লাবণ্যের উৎস কি শুধুই 'ওয়েদার'?

বিভাস শতমুখে 'ওয়েদারের' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন।

মনীষা বলতেন, 'হ্যাঁ নতুন বর্ষায় এখানের সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।'

কিন্তু মনীষা ভাইঝির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতেন।

আজ আর চৌধুরী বাংলোয় কোনও দৃষ্টি নেই। না স্নেহের, না সন্দেহের। মনীষা মারা গেছেন। অনেকদিন হ'ল গেছেন।

বিভাস খুব ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে হঠাৎ ওকালতি ছেড়ে ফিল্ম ডিরেক্টর বনে গিয়ে বম্বে চলে গেছেন। আর হয়তো উত্তরার মা এতদিনে মনের মত সমাজ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

কিন্তু উত্তরা?

উত্তরা হঠাৎ যেন সমাজের পক্ষপুটে থেকে পিছলে পড়েছে। উত্তরা তার সেই ঘটার বিয়ের স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ধর্মাধিকরণের কাছে যে আর্জি পেশ করেছিল, তা' মঞ্জুর হয়েছে। উত্তরা আবার তার বাবার পদবীতে ফিরে গেছে, যে বাবা বলেছেন, জীবনে আর ওর মুখ দেখবেন না।

মা ওকে সমর্থন করতে চেষ্টা করেছিলেন, মা ওর এই কাজটাকে ম্যাট্রিক ফেল করার চাইতে বেশী গর্হিত ভাবেননি। কিন্তু বিভাস বলেছেন 'চুপ! যে মেয়ে আমার মুখে কালি মাখিয়েছে—'

উত্তরা একবার মার মুখে কালি লেপেছিল, একবার বাবার মুখে লেপেছে।

আর অবাক হয়ে ভেবেছে উত্তরা, আশ্চর্য তবু বাবার পদবীটাই গ্রহণ করতে হচ্ছে তাকে। তাছাড়া আর কিছু নেই।

এই অস্বস্তিকর মানসিকতায় হঠাৎ 'ফুলমাটির' কথা মনে পড়ল উত্তরার। মনে পড়ল 'চৌধুরী বাংলো'টাকে।

পিসি নেই, পিসির ছেলেরা তো আছে? ওদের কাছে গিয়ে বাড়ীর চাবিটা চাইল উত্তরা। বলল, 'দু চারদিন থেকে আসব—'

ওরা বলল, 'চাবি খোলা আছে। মালি রেখে দিয়েছি একটা, আর তো যায় না বড় কেউ। শেষে জানলা-দরজাগুলো চুরি হয়ে যাবে। তা' গেলে ওই মালিটাই রেঁধে বেড়ে দেবে। কিন্তু কথা হচ্ছে—'

উত্তরা হাসল। বলল, 'বল শুনেই যাই তোমাদের 'কথা হচ্ছেটা'। বোধহয় এই পাপীয়সীকে বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া নিয়ে দ্বিধায় পড়েছ?'

পিসতুতো দাদা বলল, 'আঃ, কী-যে বলিস! কথা এই, ঠিক এই সময়ই অরণি গেছে ওখানে হস্তাখানেকের জন্যে। ও এলে—'

উত্তরা স্থির চোখে তাকাল।

অরণি!

দাদা বলল, 'হ্যাঁ অরণি, আমাদের পিসতুতো ভাই? কেন তাকে তো দেখেছিস? সেবারে মামার সঙ্গে যখন গিয়েছিলি, অরণি গিয়েছিল যে?'

উত্তরা ভুরু কুঁচকে বলল, 'মনে পড়ছে। কিন্তু ওরা থাকতে আর কারো যাওয়ায় বাধা আছে?'

পিসতুতো দাদা মাথা চুলকে বলল, 'বাধা মানে আর কি, ও তো একা রয়েছে—'

'কেন ওর স্ত্রী?'

'স্ত্রী? হায় কপাল, মাথা নেই তার মাথাব্যথা! ওই এক ছেলে! অমন কাজকর্ম করছে, অথচ না বিয়ে না সংসার! ওই ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়ে। কদাচ কখনো ফুলমাটিতেও যায়। এবারে—তা' ও তো বলেছে সামনের শনিবার পর্যন্ত থাকবে, তুই বরং রবিবারে—'

উত্তরা বলেছিল 'দেখি!'

কিন্তু সেই দেখাটা দেখবার জন্যে যে সেই রাতেই ট্রেনে চেপে বসবে উত্তরা, একথা কি ভেবেছিল উত্তরার পিসির ছেলে?

ভাবেনি।

ভাববে কেন? ভাববার মত তো কথা নয়? কিন্তু উত্তরা ভেবেছিল, 'হয়েছে কি! বরং তো সুবিধেই। সাতকালের ধুলো জমানো নেই বাড়ীতে, রান্নাঘরটা চালু রয়েছে।'

বরও তো চৌধুরী বাংলোয় গুনতিতে অন্ততঃ গোটা পাঁচেক।

লাল সুরকির রাস্তাটা শেষ করে সাইকেলরিকশটা থামল। নেমে পড়ে গেট ঠেলে ঢুকে সেই পাঁচটা ঘরের দিকে তাকাল উত্তরা। কোন ঘরটায় যেন ছিল সে সেবারে? ওই পিছনের কোণেরটায় না? রেললাইন দেখা যায় বলে বেছে নিয়েছিল।

না, প্রথমটা বেছেছিল বোধহয় কেবলমাত্র পিছন বলেই। যাতে মুখ দেখাতে কম হয়। তারপর ঘরটা ভাল লেগে গেল। ঘরের পিছনে বাগান ছিল। তাই বলেছিল বাবাকে পিসিকে।

বাগান আছে এখনো?

আস্তে এগিয়ে এল উত্তরা। রিকশওলাটার মাথায় নিজের ব্যাগ বিছানা চাপিয়ে।

কিন্তু কই?

কোথায় কে? পিসতুতো দাদার পরিবেশিত খবরটা ভুল তাহলে।

ওকে পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বারান্দায় জিনিস দুটো ফেলে রেখে মালিকে খুঁজতে রান্নাঘরের দিকে এগোল উত্তরা।

এমনি একটু জনমনুষ্যহীন জায়গার জন্যেই তো তৃষিত হয়ে উঠেছিল উত্তরা, হাতড়ে মরেছিল সেই জায়গা। ভাবতে, যেখানে কারো 'দৃষ্টি' নেই। না স্নেহের, না সহানুভূতির, না সন্দেহের।

অথচ—

শূন্য খাঁ খাঁ বাড়ীটা দেখে মনটা বিশ্রী হয়ে গেল কেন? খাঁ খাঁ করে উঠল কেন?

মালিকে খুঁজতে বেশী দূর যেতে হল না।

রিকশার শব্দ শুনে নিজেই সে বেরিয়ে আসছিল কোন এক কোটর থেকে। বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

উত্তরা অপ্রতিভ হ'ল।

বলল, 'এটা আমার পিসির বাড়ী, বুঝলে? থাকবো দু'চারদিন—'

মালি মাথা চুলকে বলল, 'চিঠি এনেছেন?'

'চিঠি!'

'আজ্ঞে মানে দাদাবাবুদের কারো চিঠি না হলে—'

'সেরেছে। তোমাদের আবার এইসব নিয়ম আছে নাকি? আমি নিশ্চিত হয়ে—'

মালি সবিনয়ে একটা বেতের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে, 'বসুন, একটু বসুন। যে দাদাবাবু রয়েছে এখানে, তিনি এলেই—'

উত্তরা এক মিনিট শিথিল হয়ে যায়। কথা বলতে পারে না।

তারপর নিজেকে চোস্ত করে নিয়ে বলে। 'দাদাবাবু? কোন দাদাবাবু আবার? আমি তো তোমার সব দাদাবাবুদেরই কলকাতায় দেখে এলাম। রমেন, সোমেন, শুভেন—'

মালির মুখে এবার হাসি ফোটে। বলে, 'তবে তো সবই জানেন। ইনি হচ্ছেন 'অরণীবাবু! এই বাড়ীটা অরণীবাবুর মামার বাড়ী!'

'ওহো হো তাই বল—' উত্তরা প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠে, 'খুব চিনি। বলতে হয় এতক্ষণ? তা' কোথায় গেছেন তিনি?'

'আজ্ঞে পাখী মারতে—'

'পাখী মারতে? আজকাল আবার শিকারী হয়ে উঠেছেন বুঝি বাবু?'

মালি হাস্য গোপন করে বলে, 'আজ্ঞে শিকার বলেন শিকার, খেলা বলেন খেলা। যান রোজ ভোরে বন্দুক ঘাড়ে করে। পাখী?'

বড়ো আঙুলটা তুলে নাচিয়ে নেয় লোকটা। আর এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাঝখানেই আসামীর আবির্ভাব। বন্দুক হাতে বীরের বেশ।

চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

অবাক হয়ে বলে 'কে?'

উত্তরা একটু বাঁকা হাসি হাসে, 'চিনতে পারছ না?'

'পারছি বৈকি! পারছি বলেই তো বিশ্বাস করতে দেরী লাগছে।'

'খুব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?'

'খুব।'

'কেন, তোমার মামার বাড়ীতে আসতে আছে, আর আমার পিসির বাড়ীতে আসতে নেই?'

'নেই কে বললে? আছে বলেই তো সেই দুর্লভ ঘটনা একাধিকবার ঘটল।'

'কি মনে হচ্ছে!'

'মনে হচ্ছে 'অকস্মাৎ' 'দৈবক্রম' এগুলো কেবলমাত্র উপন্যাসেরই বস্তু নয়।'

'আর যদি বলি, অকস্মাৎও নয়, দৈবক্রমও নয়, জেনেশুনে ইচ্ছে করে এসেছি?'

'তাহলে সেই মধুর মিথ্যেকে পরম সত্য বলে গণ্য করে স্বর্গসুখ পাবো।'

মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে হ'লে
ক্লোরোফিল যুক্ত
রদফেন
টুথপেষ্ট ব্যবহার করুন
দাঁতের গোড়ার ঘা, পায়োরিয়া ইত্যাদি সারাতে ক্লোরোফিল সাহায্য করে। নিয়মিত ক্লোরোফিল যুক্ত রদফেন ব্যবহারে মুখের বিশ্রী গন্ধ নিবারিত হয়, দাঁত ঝকঝকে সাদা দেখায়, ঘা ও দাঁতের ক্ষয় দূর হয়।

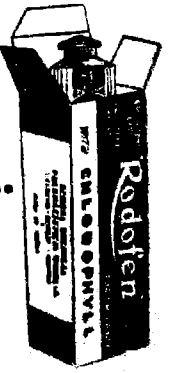


বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

'এখনো সেই রকম সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে পারো দেখছি।'

'সাজিয়ে-গুছিয়ে হয়তো, কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে নয়।'

'তোমার কাঁধের বন্দুক দেখে ভয় করছে। গুলিটুলি করে বসবে না তো?'

'ইচ্ছে করছে।'

মালি বোঝে রহস্য আছে।

কারণ বুদ্ধিমানেরা যাদের বোকা ভাবে তারা যে সব সময়ই বোকা হয় না, তার প্রমাণ হামেসাই মেলে। মালিটা বোকা নয়। আর বোকা নয় বলেই আর বেশীক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকার ভূমিকা অভিনয় না করে বলে, 'দিদিমণি খাবেন তো?'

'খাবো বৈকি! বাঃ খাবো না তো কি উপোস করতে এলাম? খুব ভাল ভাল খাবো। কী কী রাঁধছ বল?'

মালি বিনীত ভঙ্গীতে জানায়, রান্না এখনো শুরু হয়নি, বাবু পাখী মেরে আনবেন এই আশায়—'

এই আশায়!

বাবু ধমকে ওঠে, 'পাখী আবার আমি করে আনি হে? শিকার করতে যাই বলেই শিকার করে আনতে হবে এমন কোনো কথা নেই।'

উত্তরা মৃদু হেসে আস্তে বলে, 'না তা' নেই বটে। অন্ততঃ তোমার কাছে নেই।'

কোণের সেই ঘরটাই নির্দিষ্ট করে দেয় উত্তরা নিজের জন্যে।

অরণি বলে, 'দক্ষিণের ঘর থাকতে, উত্তরের ঘর—'

উত্তরা মৃদু হেসে বলে, 'উত্তরা যে। আর ভাগ্যের দাক্ষিণ্যে যার কপালে ঘরই সইল না, তার আর একদিনের ঘরে দক্ষিণের বাতাস লেগে লাভ?'

'একদিন! একদিন থাকবে বলে এসেছে?'

'কিছুই 'বলে' আসিনি। একদিনের বেশী থাকা সম্ভব কিনা তাও জানি না।'

পিছনের সেই বাগানে এসে বসেছে ওরা। বিকেলের চা খাচ্ছে, বেতের চেয়ার পেতে।

মালিটা সব গুছিয়ে দিয়ে গেছে।

দুপুরবেলা খাইয়েছে চর্ব্যচোষ্য করে, আবার রাত্রের ব্যবস্থাকল্পে বাজারের দিকে গেছে। মনে মনে হেসে গেছে, সুবিধে দিয়ে গেলাম তোদের। যার জন্য যোগসাজস করে দুজনে এসেছিস এখানে। ভাবটা যেন হঠাৎ যোগাযোগ।

সব বুঝি বাবা। এরা ধরতে পারেনি ওর মনের কথা। এরা নিশ্চিন্তে চা খাচ্ছে।

অরণি টেবিলে একটা সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'থাকা অসম্ভবই বা মনে হচ্ছে কেন? ভয় করছে?'

'করলে হাসির কিছু নেই।'

অরণি সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে, রহস্যভরা গলায় বলেন, 'অথচ সেদিন ভয় করেনি। যখন বয়েস ছিল—বোধহয় মাত্র ষোল।'

'ষোল বলেই তো ভয় করেনি! ছাব্বিশ হলে করতো।'

অরণিরও কি ভয় করছে?

নইলে অরণির দেশলাই জ্বালাতে অত দেরী কেন? কথা শুরু করতে জল খেতে ইচ্ছে করছে কেন?

'স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'ল কেন?'

'ভাব না থাকলেই বিচ্ছেদ হয়।'

'ভাবের অভাব কিসের, অত ঘটার বিয়ে—'

'বিয়েতে তো আসোনি, জানলে কি করে ঘটার বিয়ে?"

'না এলেও জানা যায়।'

'আমার খবর রাখার তোমার দরকার কি?'

'কিছু না! দেশের বহুবিধ খবরই তো রাখা হয়ে যায়।'

'শুধু এই?'

'তা' ছাড়া কী হবে?'

'ওঃ!'

'মনে হচ্ছে ক্ষুণ্ণ হলে!'

'হয়তো হ'লাম।'

'কেন?'

'আশা করেছিলাম, বলবে আমার খবরই তোমার ধ্যান-জ্ঞান।'

'মেয়েরা মধুর মিথ্যা বলে, কিন্তু বিশ্বাস করে কি?'

উত্তরা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর খুব কেটে কেটে বলে, 'সেদিন কিন্তু করেছিলাম।'

'সেদিন!' অরণি বিমূঢ় গলায় বলে, কোনদিন? কোন মিথ্যে?'

'মনে নেই? সেই ভয়ানক মিথ্যা কথাটা বিশ্বাস করে একটা অবোধ মুখ্খু স্কুলের মেয়ে নিজেকে হারিয়ে বসেছিল, আর—'

'সে কথাটা মিথ্যা, এই সত্যটাই বুঝি আবিষ্কার করেছ এতদিনে?'

'সত্যি তারই বা প্রমাণ পেলাম কই?'

অরণি আর একটা সিগারেট ধরায়। ধরিয়ে হাতে রেখে দেয়। বলে, 'হিসেবে একটু ভুল আছে তোমার। মেয়েটা অবোধ মুখ্খু বালিকা এটা ঠিক বসিয়েছ, কিন্তু ছেলেটাও যে নিতান্ত মূঢ় অজ্ঞান কুড়ি বছরের একটা ছেলে মাত্র, সেটা বসাওনি হিসেবের খাতায়। তা' যদি বসাতে, প্রমাণ পেতে। সহজেই বুঝতে পারতে তার কাছে সেটাই সত্য ছিল। সেই প্রথম ভাললাগাটাকেই সে ভালবাসা বলে বিশ্বাস করেছিল।'

'কিন্তু মাত্র কুড়ি বছরের মূঢ় ছেলেটার দুঃসাহসের তো অভাব ছিল না কিছু?'

'মূঢ় বলেই অভাব ছিল না। দুঃসাহস তো মূঢ়দেরই।'

'পিসি তাই বলেছিলেন বটে—'

'পিসি! ওঃ মামী! হ্যাঁ মামী বলেছিলেন 'তোর যদি বয়েসটা সাবালকের কোঠায় পৌঁছত, তাহলে তোর বাপকে বলে দিয়ে বুঝিয়ে ছাড়তাম শাস্তি কাকে বলে—'

'আমাকেও তাই বলেছিল। বলেছিল, 'পরিণাম জানলে আগুনে হাত দিতে যেতিস না। ভগবানের অশেষ দয়া তাই আমি এসে পড়েছিলাম।'

ঠোঁটটা কামড়ে তিক্ত একটা হাসি হেসে উত্তরা কথা শেষ করে, 'বলেছিল নেহাৎ দয়া করেই, একথা দাদার কানে তুললাম না।' অথচ মজা এই আমি ভেবেছিলাম, অনেক দিন পরে পর্যন্ত ভেবেছিলাম, 'অতটা দয়া প্রকাশ না করলেও হতো। হয়তো বাবার কানে তুললে—'

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায় অরণি। ওর মুখের রঙটা অস্বাভাবিক লাল দেখায়। ওর নিশ্বাসের উষ্ণতা যেন টেবিলের এধারে এসে উত্তরার গালে লাগে।

টেবিলের এধারে ঘুরে আসে ও।

উত্তরার কাঁধের দিকে এসে দাঁড়ায়, চেয়ারের পিঠটা চেপে ধরে, ভয়ানক একটা চাপা অথচ উদ্ধত গলায় বলে, 'তোমার পিসি, আমার মামী, সেই মহিয়সী মহিলাটি যা করেছিলেন, প্রকৃতির আইনে তা' জঘন্যতম অপরাধ তা' জানো? অথচ তিনি এটা করতে সাহস পেয়েছিলেন সামাজিক নিয়মে আমাদের বয়েস তখনো নাবালকত্বের গণ্ডিটা অতিক্রম করেনি বলে।'

'থাক তাঁর কথা.....উত্তরার রক্তের মধ্যে একটা উত্তাল সুর বাজছিল, উত্তরার শিরায় শিরায় একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটাছুটি করছিল, উত্তরা প্রতি মুহূর্তে আশংকা করছিল, বুঝি সাবালক অরণি তীব্র আক্রোশে সেই নাবালক ছেলেটার ওপর অবিচারের প্রতিশোধ নেবে, তবু কষ্টে কথাকে সহজ সুরে শেষ করেছিল সে, 'তিনি বেঁচে নেই।'

উত্তরা যা আশংকা করছিল—(নাকি, শুধু আশংকাই নয়, আশাও?) তা যদি অকস্মাৎ ঘটে যেত, হয়তো উত্তরা বাধা দিতে ভুলে যেত, হয়তো ওই বালুনদী 'হঠাতির' মত বালুস্তর ভাসিয়ে দিয়ে উত্তাল হয়ে উঠত, কূল ছাপিয়ে ঢেউয়ের ধাক্কায় পাড় ভাঙত।...কিন্তু...উত্তরার আশা আর আশংকা দুই-ই থমকে থাকল।

অরণি সরে গিয়ে শুকনো ঘাসের ওপর পায়চারি করতে লাগল।.....

উত্তরার ঘামে ঠাণ্ডা হাতটা আবার স্বাভাবিক উষ্ণতায় ফিরে এল।

কখন যেন পড়ন্ত বেলার সূর্য বিদায় নিয়েছে...চেতনায় এল যখন সমস্ত বাগানটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, দুজনায় কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

অরণি পায়চারি করতে করতে আবার সরে এসেছে, টেবিলের দুটো কোণ চেপে ধরেছে। আর তার মৃদু ভাঙ্গা ভারী গলাটা থেমে থেমে উচ্চারণ করছে। 'তিনি মারা গেছেন, কিন্তু আমরা তো বেঁচে আছি?

সেদিনের সেই অবিচারের শোধ নেওয়া যায় না উত্তরা? এই সন্ধ্যাটাকে উনিশশো তেষট্টির মনে না করে উনিশশো একান্নর মনে করা যায় না? আমরা তো দু'জনে দু'জনকে দেখতে পাচ্ছি না, কী এসে যায় যদি আমরা ভেবে নিই, আমাদের ওপর দিয়ে পুরো একটা যুগ চলে যায়নি। যদি ভেবে নিই সেই আবেগ, সেই রোমাঞ্চ, সেই মরে যাওয়ার মত অসহ্য সুখের মুহূর্তে কেউ এসে রক্তচক্ষু তুলে দাঁড়ায়নি আমাদের সামনে, আমরা শুধু সেই মুহূর্তটাকে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি...এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি...'

'অরণি! তুমি কী আমায় পরীক্ষা করছ?'

'পরীক্ষা! কী বলছ তুমি উত্তরা?'

'হয়তো তুমি ভাবছ, তুমি আছ জেনে, একা আছ জেনে, আমি ইচ্ছে করেই'—

'নিজেকে অত সৌভাগ্যবান ভাবতে পারি, এত সঞ্চয় আমার কোথায় উত্তরা? আমি শুধু মুষ্টিভিক্ষার কাঙালি।'.....

'ঘরে চল অরণি! আলো জ্বালাইগে—'

'না!' অরণি সবলে ওর দুটো কাঁধ চেপে ধরে। বলে, 'ঘরে গেলে আলো জ্বাললে আমরা হারিয়ে যাব, ফুরিয়ে যাব, সমাজের শেকলে বাঁধা পড়ে যাব। এখানে প্রকৃতি বন্য, নিরাবরণ! জীবনের একটি সন্ধ্যা কি এই প্রকৃতিকে উৎসর্গ করা যায় না—উত্তরা?'

উত্তরা মৃদু নিশ্বাস ফেলে।

উত্তরার সেই প্রতীক্ষায় উত্তাল রক্ত-প্রবাহ 'সমে' এসেছে, সুস্থির গতি পেয়েছে, তাই গলার স্বর আর কাঁপে না ওর। খুব নরম গলায় বলতে পারে, 'মুষ্টিভিক্ষায় লাভ কি অরণি?'

'মনে কর, আমার দুর্লভ সঞ্চয়ের ঘরে জমা রাখবো সেই ভিক্ষাটুকু। পরে, অনেক পরে জীবনকে যদি কোনদিন নিতান্ত মূল্যহীন মনে হয়, স্মরণ করবো এই সন্ধ্যাটিকে। তোমার আর কতটুকু ক্ষতি উত্তরা, অথচ আমার অগাধ সমুদ্রের লাভ, অনন্ত আকাশব্যাপী লাভ।'

'অরণি আমায় দুর্বল করে দিও না।'

'ভুল করছ উত্তরা। দুর্বলতার অর্থই জলেই তো ডুবে রয়েছ তুমি! আমি তোমাকে সেই দুর্বলতার পাথর থেকে উঠে আসতে ডাক দিচ্ছি। সবলে নিজেকে প্রকাশ কর তুমি। তুমি যে তোমার নিজের, একান্ত নিজের, সেই সত্যকে মহিমার সঙ্গে স্বীকার কর। এতবড় জীবনের একটি মাত্র সন্ধ্যা আমি তোমার কাছে চাইছি উত্তরা। যেটুকু দিতে কিসের এত দ্বিধা তোমার? তুমি এখন কারো বিবাহিতা স্ত্রী নও, কারো কুমারী মেয়ে নয়, আর তুমি তোমার পিসির নাবালিকা ভাইঝিও নও। তুমি তো কেবল-মাত্র তোমার।'

'সে জোর খুঁজে পাচ্ছি না অরণি..'

উত্তরা মনে মনে বলে, বরং তুমি সবল হও, তুমি আমায় লুঠ করে নাও...তোমার সেই জোরের কাছে, আমি হারিয়ে যাব, মিলিয়ে যাব। মনে মনে এমনি কত কথা বলে উত্তরা। কিন্তু মুখে বলে, 'আমার বুকের মধ্যে কীরকম যেন করছে; অন্ধকারে আমার ভয় করছে। ঘরে চল অরণি, আলো-জ্বালা ঘরে।'

'সমস্ত যৌবনকালটা ধরে শুধু—' গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বলে অরণি, 'কৃপণতাকে বাড়িয়েছ উত্তরা! অথচ সেদিন যখন এত সম্পদ এত ঐশ্বর্য এত লাবণ্যের কিছুই ছিল না—'

'সেদিনের কথা বারবার তুলো না অরণি। বরং সেদিনের মত নিজের জোরে কেড়ে নাও আমায়—'

অরণি এগিয়ে আসে, আরো কাছে, উত্তরার পিঠটা নয়, চেয়ারের পিটটা চেপে ধরে, হতাশ গলায় বলে, 'তা হয় না উত্তরা! ভিক্ষুক হতে পারি, বিশ্বাসঘাতক হতে পারব না।...তুমি এসে একা বাড়ীতে আমায়

"একটি মাত্র সন্ধ্যা আমি তোমার কাছে চাইছি উত্তরা।"

দেখে তক্ষুনি ফিরে গেলে না, নিশ্চিন্ত মনে রয়ে গেলে, এই বিশ্বস্ততার মূল্য শোধ করবো কি নীচ হয়ে? ছোট হয়ে? যদি স্বেচ্ছায় দিতে মাথায় করে নিতাম।... জানো উত্তরা, সেই কুড়ি বছরের ছেলেটা কত বছর ধরে কী অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে?'

উত্তরার গলা থেকে যে অস্ফুট আওয়াজটা বেরোয়, সেটা বোধহয় 'কি?'

অরণি আবেগরুদ্ধ গলায় বলে, 'সে স্বপ্ন, উঁচু বাঁধের ওপর রেললাইন, চোখের সীমানায় এক দুরন্ত নদী, আর একটা বাড়ীতে শুধু তুমি আর আমি—'

'তোমার সে স্বপ্নের কথা তো কোন-দিন আমার বাবার কাছে এসে বলনি অরণি?'

'বলেছিলাম উত্তরা। তুমি জানতে পারনি। তোমার বাবা বলেছিলেন, আমার মত ইতর ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়ার চাইতে মেয়েকে বরং কেটে জলে ভাসিয়ে দেবেন।'

'আশ্চর্য!'

'তাই সে স্বপ্ন শুধু স্বপ্নের কুয়াশায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু আজ...আজ আবার তুমি কেন এলে উত্তরা? একা একজন পুরুষের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে কেন রইলে?'

'আমায় মাপ কর অরণি!'

'মোহময়, জ্যোৎস্নাময় রাত্তিরটা তোমার হাতে আছে উত্তরা, ভাববার, সিদ্ধান্ত করবার—'

'রাতটা নেই অরণি, নটার গাড়ীতে আমি ফিরে যাব।'

ট্রেনের টাইমে তাড়াতাড়ি লুচি ভাজতে ভাজতে মালিটা ভাবে, 'দূর, যা ভাবছিলাম তা নয় দেখছি। যতই হোক—নির্জন নিরম্বু একটা বাড়ী, বলতে গেলে নিষ্পর একটা লোক। এখনকার মেয়েদের বেপরোয়া সাহস দেখে দেখে মনে করছিলাম বুঝি। ছিঃ ভারী লজ্জা করছে!'

উত্তরাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে আসতে আসতে অরণি ভাবে, ঘৃণা হচ্ছে নিজের ওপর। চাবুক মারতে ইচ্ছে হচ্ছে। কী লজ্জা! কী দৈন্য! দৈন্যের কী হাস্যকর প্রকাশ! কেন আমি ভিক্ষুকের মত এত খেলো করলাম নিজেকে? সত্যিই কি দরকার ছিল এতটার?

ট্রেনটা একটানা শব্দ করে চলেছে ঝিক্‌ঝিক্, ঝিক্‌ঝিক্!

সেই শব্দের মধ্যে উত্তরার ভাবনাগুলো স্পষ্ট হচ্ছে ...মিলিয়ে যাচ্ছে। উত্তরাও ভাবছে, সত্যিই কি দরকার ছিল এতটার? এতটা শুচিবাইয়ের? আমার এই মহান শুচিতার জবাবদিহি করতে যাব আমি কার কাছে? যদি নিজের কাছে হয় সবটাই তো হাস্যকর রকমের মূল্যহীন। প্রতি মুহূর্তেই তো আকাঙ্ক্ষা করেছি আমি ওকে, আশা করেছি।

তবে?

জবাবদিহিটা তাহলে সেই সংস্কারের কাছে। বুঝতে পারছি, আমি জীবন-বিশ্বাসী নই, আমি সত্যধর্মী নই, এমন কি আমি আধুনিকও নই। আমি আমার সেই সেকেলে পিসির কার্বন কপি মাত্র। এছাড়া আর কিছু হবার ক্ষমতা নেই আমার। কিন্তু—আমি এসেছিলাম কেন?

# শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

নবদ্বীপ নিবাসী রাজপণ্ডিত উপাধিধারী সনাতন মিশ্রের কন্যা। নিমাই পণ্ডিত যখন পূর্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় পণ্ডিতের প্রথমা পত্নী শ্রীলক্ষ্মী দেবী সর্প দংশনে স্বধামে প্রস্থান করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-জননী শচীদেবী গঙ্গাস্নানে গিয়া প্রতিদিনই এই বালিকাকে দেখিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতাকে প্রণাম করিলে যোগ্য পতি লাভ কর বলিয়া আশীর্বাদ করিতেন। শচীদেবী একদিন ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিতকে সনাতন মিশ্রের বাড়ী পাঠাইয়া পুত্রের জন্য কন্যাটিকে প্রার্থনা করিলেন। সনাতন মিশ্র সানন্দে সম্মতি দিলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিবাহ হইয়া গেল। বুদ্ধিমন্ত খান এবং মুকুন্দ সঞ্জয় উভয়ে মিলিয়া খুব আড়ম্বরের সঙ্গেই এই বিবাহকার্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন।

কয় বৎসরই বা তিনি স্বামীর সংসার-সুখ ভোগ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের কিছু দিন পরেই পিতার পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদনের জন্য নিমাই পণ্ডিত গয়া গমন করেন। গয়াধামেই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে ফিরিয়াই শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশ, হরিনাম সংকীর্তন—, মাত্র বৎসর দুই গৃহে ছিলেন। কিন্তু গৃহীরূপে নহে, রূপ ছিল হরিপ্রেমে প্রমত্তরূপ। নাম কীর্তন করিতে করিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেন, সর্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত, ক্ষতবিক্ষত। প্রায় গৃহে ফিরিতেন রজনী প্রভাতে। বিষ্ণুপ্রিয়া কত না যত্নে প্রিয় দয়িতের শুশ্রূষা করিতেন। শ্রীবাস অঙ্গনেও তাঁহার প্রবেশাধিকার ছিল না। জননী শচীদেবী কিন্তু পুত্রের নৃত্য-কীর্তন দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিয়াছিলেন।

অবশেষে মাঘ মাসের সেই রাত্রি। নিমাই গৃহত্যাগ করিলেন। গৃহে রহিলেন স্থবিরা জননী, যাঁহার পতি পরলোকে, জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। আর রহিলেন দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী-ভার্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। সন্ন্যাসের পর শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কৌশলে মহাপ্রভু আসিলেন আচার্য অদ্বৈত মন্দিরে শান্তিপুরে। শচীদেবীর ভগিনীপতি আচার্য চন্দ্রশেখর আসিয়া নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দকে লইয়া গেলেন শান্তিপুরে। জননী শচীদেবী গিয়া পুত্রকে দর্শন করিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া—? পতিবিরহ-বিধুরা পড়িয়া রহিলেন নবদ্বীপের শূন্য মন্দিরে। জিজ্ঞাসা করি—দেবী, কেন তুমি শান্তিপুরে যাও নাই? শান্তিপুরের মত বৃহৎ জনপদে এমন কি কোন ব্রাহ্মণগৃহ ছিল না, যেখানে গিয়া কয়েকদিন থাকিতে, লুকাইয়া আপনার জীবনাধিক প্রিয় দয়িতকে দেখিতে? মা যাও নাই, পতির আদেশ ছিল না বলিয়া না? মহাপ্রভু যেদিন পুরী হইতে জন্মভূমি দর্শনে আসিয়াছিলেন, সেদিন তো লক্ষ লক্ষ লোকে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করি সেদিনও কি দর্শনের ইচ্ছা হয় নাই?

শুনিয়াছি সারা বৎসরের পর একদিন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দত্ত মহাপ্রসাদাদি লইয়া পুরীধাম হইতে একজন ভক্ত নবদ্বীপে শুভাগমন করিতেন। সেই একটি দিনের জন্য তোমার গৃহের বহির্দুয়ার সমস্ত বৎসর ধরিয়া অবারিত থাকিত। পাছে প্রেরিত সন্দেশবহকে আসিয়া তিলার্ধের জন্যও বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয়। পাছে তাঁহাকে বলিতে হয় ওগো আমি আসিতেছি পুরীধাম হইতে দুয়ার খোল?

তারপর যেদিন শুনিয়াছিলে মহাপ্রভু প্রকট লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই ঐ দুয়ার চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ হইয়াছিল। দাসীগণ মই লাগাইয়া প্রাচীর পার হইয়া গঙ্গাজলাদি আনিয়া দিতেন। নরহরি চক্রবর্তী বলিয়াছেন—

প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিলা নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণা চতুর্দশীর শশির প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুরে অর্পয়॥
তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥

শ্রীরাধার বিরহে ব্রজের পশুপাখী তরু তৃণ লতাগুল্মও কাঁদিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো মথুরায় রাজভোগে ছিলেন। দ্বারকায় তাঁহার ঐশ্বর্যের অন্ত ছিল না। আর এ যে সন্ন্যাসজীবন। তুমি গৃহাশ্রয়ে, আর তোমার জীবনদয়িত রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় সহিয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা যাচিয়া বেড়াইতেছেন। কুরুক্ষেত্রে একদা সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। দন্তবক্র বধের পর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আর তুমি?

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের তিরোধানের পর শ্রীজাহ্নবী দেবী খেতরীর মহোৎসবে নেত্রীত্ব করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনাদি তীর্থ পর্যটনে গিয়াছিলেন। তোমার কি গয়া কাশী কুরুক্ষেত্র, শ্রীবৃন্দাবন সকল তীর্থই ছিল মহাপ্রভুর পদরেণু পবিত্র গৃহাঙ্গনে? একটি দিনের জন্যও তুমি সে গৃহের বাহিরে গমন কর নাই। এ হেন দুশ্চর তপশ্চরণ পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। আর্য রমণীর পক্ষে পতি পরম দেবতা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহ তো পতির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করেন নাই। প্রবাদ আছে শ্রীধাম নবদ্বীপের মহাপ্রভুর প্রতিমূর্তি তোমারই পূজিত। তোমার পক্ষে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না বলিতে পারি না। হয়তো এই কার্যে তোমার সম্মতি ছিল।

কোন বৈষ্ণব কবিই তোমার কথা লিখিতে সাহসী হন নাই। যে দুই একজন তোমার কথা বলিয়াছেন তাঁহারাও খুব সাবধানতার সঙ্গেই বলিয়াছেন। লোচন দাস ও ভুবন-মোহন দাস তোমার বারমাসের দুঃখের কাহিনী বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের লেখনী তোমার মহনীয় দুঃখের অতি সামান্য অংশও প্রকাশ করিতে পারে নাই। লোচন দাসের একটি কথা আমার বড় ভাল লাগে—

"সংকীর্তন অধিক সন্ন্যাস ধর্ম নহে"

তুমি তো জান মা, মহাপ্রভু তোমার অন্তর্বেদনাকেই প্রকাশ করিয়াছেন। রাধা-ভাবে তাঁহার যে বিলাপ সে তো তাঁহার কণ্ঠে তোমারই আর্তস্বর। তাঁহার চোখে এত জল কোথায় ছিল? সে-তো তোমারই অন্তর নিংড়ানো অশ্রুপ্রবাহ। পতির প্রিয় সাধনে তোমার সহায়তাই তাঁহাকে এমন শক্তি দান করিয়াছিল। প্রেমভক্তির জীবন্ত প্রতিমা তুমি, মহাপ্রভু তোমার কথাই মানবের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অযাচিতভাবে বিলাইয়া বেড়াইয়াছেন। তোমারই অসামান্য ত্যাগ, তোমারই অনন্যসাধারণ সাধনা, তোমারই অপার্থিব পতিপ্রেম, তোমারই জগদ্ধিতায় সর্বস্ব বিসর্জন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসাশ্রম এবং তদানুষঙ্গিক সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়াছিল। আত্মসুখ বাঞ্ছাহীন কৃষ্ণসুখ বাঞ্ছার ইহাই স্বরূপ। ইহাতেই সর্বভূতের কল্যাণ হয়।

# দেবীকল্পনার উৎস

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

দেবীকল্পনার প্রারম্ভ মানব-সভ্যতার উষাকালে প্রস্তর-যুগের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ে যখন পৃথিবীর আদিম অরণ্য, নদী-প্রান্তর ও নিভৃত গিরিগুহা সৃষ্টি করেছিল এক অপার রহস্য। প্রগতিশীল প্রত্ন-গবেষণায় যদিও অতীত যুগের নানা তথ্য সংগৃহীত হ'য়েছে তবুও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই আজও নানা বিচিত্র উপাদান মরু-প্রান্তর ও ভূগর্ভে অন্তর্লীন হ'য়ে আছে। এইসব সুপ্রাচীন উপাদান, বিশেষতঃ শিল্প-কর্ম আবিষ্কৃত হ'লে হয়ত মানব-সভ্যতার প্রারম্ভকালের নানা কথা জানা যাবে।

অস্পষ্টতার কুহেলী-আচ্ছন্ন প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ থেকেই একদিকে নারীর দেহ-সৌন্দর্য ও হৃদয়-প্রকৃতি যেমন সভ্যতা ও সমাজধর্মকে প্রভাবিত করেছে তেমনি অপরদিকে মাতৃত্বকে সকৃতজ্ঞ অন্তরে অভিষিক্ত করা হ'য়েছে জীবন-দায়িনীর সিংহাসনে। দুইটি কল্পনা ভিন্নতর হ'লেও তারা যেন প্রায়শঃ পরস্পরের মধ্যে লীন হ'য়ে গেছে। করুণাময়ী বিশ্ব-প্রকৃতির প্রলয় লীলায়ও অনুভূত হ'য়েছে সেই চিরন্তন দেবীর অদম্য ক্রোধ। সুদূর স্পেন দেশের অন্তর্গত লেরিডার নিকটবর্তী কোগুল গুহায় বিস্মৃত প্রস্তরযুগে রূপায়িত চিত্রে হয়ত বা হাজার হাজার বছর পূর্বেকার "অরিগ্নেসীয়" যুগ অথবা তার পরবর্তীকালের দেবীকল্পনার আভাস দেখা যায়। এখানে ঘাগরা পরিহিতা ও অনাবৃত-বক্ষা কয়েকজন নারীকে একটি পুরুষ-মূর্তির চারধারে নৃত্যরতা অবস্থায় দেখা যায়। পুরুষটি নিঃসংশয়ে অতিমানবীয়তা অথবা দেবত্বের অধিকারী। স্বাভাবিক কারণবশতঃ মনে হয় এই আলুলায়িত-কুন্তলা ক্ষীণ-কটি নর্তকীরা সম্ভবতঃ পূজারিণী অথবা দেব-সহচরী। তবে প্রশ্ন, এই পূজা কেন? এমনও হ'তে পারে, এই পূজা অথবা তাৎপর্যমূলক নৃত্যে প্রতিভাত হ'য়েছে কোন বিশেষ দিনে উপজাতি-গোষ্ঠীর সফল মৃগয়ার আকাঙ্ক্ষা। দেবীত্বের মহিমা ক্রমশঃই প্রস্তরযুগের সভ্যতাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে যার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন মাতৃ-মূর্তির রূপায়ণে। ইয়োরোপের অন্তর্গত ভিলেনডর্ফ, লাউসাল্ ইত্যাদি স্থান, মাল্টাদ্বীপ, এবং তুর্কির অন্তর্গত আমক্ প্রান্তরের প্রস্তরক্ষোদিত প্রাগৈতিহাসিক মাতৃ-প্রতিমাগুলি সর্বদাই নারীত্বের কামনা-বিধৃত আন্তরিক প্রতিমূর্তি ও নিখিল-প্রকৃতির অন্তর্লীন ঐশ্বর্যের প্রতীক।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রম-বিবর্তনের সঙ্গে এই দেবীকল্পনার যেন এক রূপান্তর ঘটে। প্রস্তরযুগের নারীমূর্তিগুলি যেখানে প্রায়শই বিপুল দৈহিক শক্তি এবং অসীম কামনা ও মাতৃত্বের প্রতীক পরবর্তী তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগে তেমন নানা ক্ষেত্রে এদের দেহ-সৌন্দর্যে কলা-কুশলী নায়িকার লালিত্য প্রতিফলিত হয়। অবশ্য নানা প্রতীকবাদও ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে। সর্প ও সিংহ ত' প্রাগৈতিহাসিক পশ্চিম-এশিয়া ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় জগতে মাতৃপূজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে। ইজিয়ান উপসাগরে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত সিংহবাহিনী ও সর্পদেবীর মূর্তি প্রকৃতই এক উচ্চাঙ্গের চিন্তাধারার পরিচয় দেয়। স্যার আর্থার ইভানস্ কর্তৃক আবিষ্কৃত রাজা মাইনসের স্মৃতি-বিজড়িত নোসস্ (Knossos)-এর ধ্বংসাবশেষে যে সর্পদেবীর মূর্তি দেখা যায় তার দেহ-সৌন্দর্যের কিছুটা ভয়ঙ্করী-ভাব সত্ত্বেও সুর-কন্যাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নাগিনীগণ প্রকৃতই সুন্দরী। তাদের ভ্রমরের ন্যায় ক্ষীণ কটিদেশে আঁট-ভাবে পরা থাক্ থাক্ করা নিম্নভাগে ছড়ান ঘাগরা ও দেহের ঊর্ধ্বাংশ প্রায় অনাবৃত। দেবীর কোমরে সর্প-মেখলা, দুই হাতে ভুজঙ্গ ও মাথায় মুকুট। কখনও এই মাতৃ-দেবীর সঙ্গে বিহঙ্গও দেখা যায়। কে জানে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্তে রূপায়িত সর্প, সিংহ পক্ষী নিখিল বিশ্বের প্রতীক কিনা? তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে প্রাগৈতিহাসিক পশ্চিম-এশিয়ায় মাতৃদেবীর সঙ্গে সিংহ, সর্প ও পাখীর সংস্রব আছে। ভারতীয় পৌরাণিক দেবীদের সঙ্গেও এই স্বর্গীয় প্রতীকবাদ দেখা যায়। অথর্ববেদে সর্পকে বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে। প্রাচীন মিশরের সর্পদেবী নেহেব নাম্ভ ও বুতো বিশ্ব-নারীত্ব ও সম্ভবতঃ উর্বরতার প্রতীক ছিলেন। প্রথমোক্ত দেবী একদা হেরাক্লিওপলিস্-এ পূজিতা হ'তেন এবং তিনি ছিলেন অর্ধ-মনুষ্যাকৃতি। কখনও তাঁকে কল্পনা করা হ'ত উত্তীয়মান নাগিনীর মত। বৃষ্টিগর্ভ মেঘের মধ্যে স্ফুরিত বিদ্যুৎ ও উড়ন্ত নাগিনীর কল্পনা দুই-ই ভূমির উর্বরতার প্রতি ইঙ্গিত করে। এছাড়া সর্পের বাস ত ভূমিগর্ভেই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন ইয়োরোপীয় ধর্ম-কল্পনায় কখনও দ্রুত ঝঞ্ঝা-বায়ুকে তরুণী ভালকীর দেবী-দলের সঙ্গে উপমেয় করা হ'য়েছে। ভারতের পৌরাণিক উপাখ্যানে লক্ষ্মীদেবীকে হস্তী (নাগ নামেও পরিচিত) দ্বারা বারি-অভি-ষিক্ত হ'তে দেখা যায়। এই হস্তীও অবশ্য বৃষ্টিগর্ভ মেঘের প্রতীক। প্রাচীন পশ্চিম-এশিয়ায় পূজিত পিতৃদেবতাকে এক ক্ষেত্রে মেঘবাহনরূপে এবং উর্বরতার অধিষ্ঠাতা হিসাবে কল্পনা করা হ'য়েছে। সুমেরীয় এবং আক্কাদীয় দেবতা আদাদও ছিলেন একদা বৃষ্টি এবং ঝড়ের অধিশ্বর। যেমন বৈদিক ইন্দ্র ছিলেন বজ্রধর এবং তাঁর

ক্রীট দ্বীপের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত সর্পদেবীর মূর্তি

ঐরাবত বৃষ্টিগর্ভ মেঘেরই স্বর্গীয় প্রতিরূপ।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই তরুলতা, নদ-নদী ইত্যাদির মধ্যে দেবীত্বের সন্ধান করা হয়েছে। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত হয়েছে কেমন করে সুন্দরী ডাফনে সূর্যদেবতা এ্যাপোলোর প্রেম থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বৃক্ষে রূপান্তরিতা হন। অপর একটি কাহিনীতে বর্ণিত আছে বিরহিণী ফিলিস্ কর্তৃক বৃক্ষদেহ ধারণ। প্রাচীন হেলেনীয় সভ্যতায় তরু-দেবীগণ "ড্রায়াড" নামে পরিচিতা ছিলেন। এই "ড্রায়াড"গণ ভারতীয় উপাখ্যানে বর্ণিতা "বৃক্ষকা" অথবা "শালভঞ্জিকা"দের সঙ্গে তুলনীয়। গ্রীক উপকথায় বর্ণিত আছে হতভাগিনী ড্রাইওপি তাঁর শিশুসন্তানের জন্য একটি পুষ্প আহরণের ফলে একজন ড্রায়াডের ক্রোধ উৎপাদন করেন এবং সেই বৃক্ষ-সেবীর ক্রোধের ফলে তাঁকে সেইখানেই তরু-দেহ লাভ করতে হয়। ড্রাইওপির শেষ প্রার্থনা ছিল তাঁর শিশু-সন্তানকে যেন প্রায়শই তাঁর দীর্ঘশ্বাস-ধ্বনিত ছায়াতলে আনা হয়। প্রাচীন গ্রীক উপকথার ড্রায়াডগণ এক বিস্মৃত অতীতের নির্দেশক এবং ভারতের নানা হিন্দু-বৌদ্ধ উপাখ্যানে বর্ণিতা মায়াবন-বিহারিণী বৃক্ষকা, অপ্সরা, শালভঞ্জিকা ও যক্ষিণীর সঙ্গে তুলনীয়। এই দেবী-প্রতিম বনানীসুন্দরীরা যেন প্রাক্-আর্য লোকমানসের অনুপম সৃষ্টি। ভরতের ভারহুত ও সাঁচীর তোরণ ও স্তূপ-বেষ্টনীতে যেমন এঁদের অপার দেহ-লাবণ্য ও সুঠাম ভঙ্গিমা ব্যক্ত হয়েছে তেমন শুঙ্গ-কুষাণকালে নির্মিত এ দেশের প্রস্তর ও মৃণ্ময় ভাস্কর্যে যক্ষিণী ও অপ্সরাদের রূপ-রেখা প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতীয় শিল্পে রূপায়িত এই বৃক্ষকা ও বনদেবীদের সুস্পষ্ট কামনা-বিধৃত নারীত্ব এবং শিল্প-শ্রীমণ্ডিত লাবণ্য স্বভাবতঃই উর্বরতা ও চির-নবীনতার আনন্দময় অভিজ্ঞান।

নোসস্-এর ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত সর্পদেবীর মূর্তি

সমুদ্র ও নদীকে অবলম্বন করেও দেবী-কল্পনার প্রসার ঘটেছে। সাগরের অতল বারিরাশির রহস্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর চাঞ্চল্য মানব-মনের কবিত্ব ও দর্শনকে চির-কালই উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রাচীন গ্রীকদের দেবতা বৃদ্ধ নেরেউস ছিলেন যেন সমুদ্র-তলের শান্ত গাম্ভীর্যের প্রতিরূপ এবং তাঁর সুন্দরী ললনারা উপরের ফেনিল ও অশান্ত লহরের প্রতীক সুরঙ্গমা নেরেইডগণ একদা নাবিকমনে হয়ত রোমাঞ্চকর কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। ছোট ছোট নদী অথবা স্রোতস্বিনী নিয়ে যে সব প্রাচীন উপকথা আছে তাদের মধ্যে গ্রীক দেবী এ্যারেথুসার কাহিনীটি খুবই আকর্ষণীয়। কথিত আছে এ্যারে-থুসার সৌন্দর্য-দর্শনে মুগ্ধ হ'য়ে নদী-দেবতা এ্যালফেউস তাঁকে অনুসরণ করেন এবং তন্বী দেবী তাঁর ভয়ে সমুদ্রতল দিয়ে পলায়ন করেন ও পরে একটি নির্ঝরিণীর রূপ পরিগ্রহ করেন। এ্যারেথুসার কাহিনী নিয়ে শেলীর একটি সুন্দর কবিতা আছে। প্রাচীন মিশরে পূজিত নীল-নদের দেবতা হাপি পুরুষ হ'লেও তাঁর দেহে নারীত্বের লক্ষণ ছিল। হাপি-দেবতার নারীবক্ষ প্রসঙ্গে বলা যায় যে প্রাচীন মিশরে শস্য-দেবী আইসিস্কেও মাঝে মাঝে পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই ধরণের কল্পনার 'অর্ধনারীশ্বরের' মূলে ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে কিনা কে জানে?

সমুদ্র এবং নদীর মধ্যে দেবী ও জল-কন্যাদের নানা কাহিনী দেখা যায় ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তীতে। গঙ্গা ও যমুনার কল্পনা যেমন একদিকে ভারতের মহান সংস্কৃতির পরিচায়ক অপর-দিকে তেমন লক্ষ্মী, মণিমেখলা এবং বারুণীর কল্পনা সমুদ্রের ঐশ্বর্য ও অপার সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করে। বাঙলার প্রাচীন 'মঙ্গল-কাব্য' এবং ব্রতকথায় বর্ণিতা মনসা ও চন্দুলীদেবীও যেন সমুদ্র ও সমুদ্র-যাত্রার অধিশ্বরী। আনুমানিক খৃষ্টীয় ৩য়—৪র্থ শতাব্দীতে ক্ষোদিত অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের গান্ধার ভাস্কর্যের একটি নিদর্শনে এক পূর্ণযৌবনা ও শিথিলবসনা নারীকে এক জলচারী ড্রাগনের উপর উপবিষ্টা দেখা যায়। তক্ষশীলা চিত্রশালায় রক্ষিত এই শিলাপট

রূপায়িত আলেখ্যটিতে মনসাদেবীর চিত্র পরিকল্পিত হয়েছে কিনা কে জানে? এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে, এই স্খলিত আবরণ এক দিকে প্রেম ও উর্বরতার প্রতীক যেমন হেলেনীয় শিল্পের এ্যাফ্রোডিটি অথবা ভেনাস্‌মূর্তি সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বেকার লিবীয় (Libyan) মাতৃদেবতা নীথ-এর ধ্যানেও স্খলিত বসনের সুস্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ উল্লেখ আছে। সম্রাট নারমের কর্তৃক মিশরের ঐক্যসাধনের পর এই দেবী নেপথিস-ভগিনী আইসিসের সঙ্গে একাত্মীভূতা হন। পণ্ডিত বাজ্‌ (Dr. Budge) কর্তৃক অনূদিত নীথ দেবীর আরাধনা-কাব্যের এক স্থানে আছে,

"হে স্বর্গের দেবী,

হয়নি অস্খলিত কভু তোমার বসন।"

(Donald A. Mackenzie Egyptian Myth and Legend, Intro. XXXV)

সমুদ্র-প্রসঙ্গে দেখা যায় লক্ষ্মী এবং হেলেনীয় প্রেমদেবী এ্যাফ্রোডিটির আবির্ভাবে কিছুটা সাদৃশ্য আছে, অন্ততঃ করেক শত বৎসর পূর্বে ইটালীয় চিত্রকর বত্তিচেল্লি-চিত্রিত ভেনাসের জন্ম বিষয়ক আলেখ্য-দর্শনে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। নীল-নদের বন্যা-প্রসঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় ধারণাটি দেবীকল্পনার এক মহান দৃষ্টান্ত। ফারাও শাসিত মিশরে যখনই নীল-নদে জলোচ্ছ্বাস হ'ত তখনই কৃষককুল ভাবত দেবী আইসিসের অশ্রুপাত ঘটেছে। জহ্নবী ও যমুনার মত তাহলে আবিসিনিয়ার তুষার-মৌলি শৈল-শিখর থেকে প্রবাহিত নীল-নদও বিগলিত করুণার প্রতীক।

তাম্রযুগে পশ্চিম-এশিয়া এবং পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মাতৃদেবীর বাহনরূপে সিংহ, চিতা অথবা মার্জার যেমন দেখা যায় তেমন দেবীর বিভিন্ন অর্ধ-জীবাকৃতি রূপও দেখা যায়। এই সব প্রতিমা স্বভাবতঃই ভারতীয় পৌরাণিক দৃষ্টান্তসমূহকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই সব সাদৃশ্য আরও চিত্তাকর্ষক হ'য়ে ওঠে যখন আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার এশিয়া-মাইনর ও প্যালেস্টাইনের ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত লিপিতে বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃত ধরণের নাম দেখা যায়।

(W. F. Albright: The Archaeology of Palestine, A. Pelican Book, pp. 102, 182-83).। এশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত ইয়াসিলিকায়ার শৈল-গাত্রে যেমন দেখা যাবে বৃষভেশ্বর পিতৃ-দেবতার সম্মুখে দণ্ডায়মানা সিংহ-বাহিনী মাতৃমূর্তি তেমন সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় ইত্যাদি সভ্যতার স্থায়ী

লিলিথদেবীর মূর্তি

আলোকিত পশ্চিম-এশিয়ার বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত বিভিন্ন দেবীমূর্তি ও তাদের বাহন ভারতীয় পৌরাণিক দেবী-গণের সঙ্গে তুলনীয়। প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত তেল্‌বেইত্‌-মিরসিমে আবিষ্কৃত এক শ্রেণীর মৃন্ময় ফলকে দেখা যায় প্রেম ও উর্বরতার দেবী ইশ্‌তারের নিরাবরণ মূর্তি দুই হাতে পদ্মের মৃণাল নিয়ে দণ্ডায়মানা যা সহজেই স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচীন ভারতীয় শ্রী অথবা লক্ষ্মীর ধারণাকে। অপরপক্ষে নৃসিংহী, নাগিনী এবং পেচকসহ লিলিথ দেবীর কামনাদ্যোতক মূর্তিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এ ছাড়া পশ্চিম-এশিয়ায় মিনেতএল-বেইদার প্রাপ্ত গজদন্ত-পেটিকায় ক্ষোদিত প্রফুল্লাননা শস্য-দেবী অথবা করুণাময়ী বন-দেবীর অপরূপ ভঙ্গিমাময় মূর্তিও বিশেষ আকর্ষণীয় এবং ভারতের শকুন্তলা-মানসের অন্তর্লীন ভাবটিকে যেন বাস্তব করে। দেবীরূপ ও দেবীধ্যানের পশ্চাতে সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী মানব-মনের যে উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় যার বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চীন, জাপান, পলিনেশিয়, মেক্সিকো, পেরু ও আফ্রিকার গহন অরণ্যেও সংঘটিত হয়েছিল। কে জানে মানব-সভ্যতার প্রথম প্রভাতে এই দেবীকল্পনা লোক-মানসে কেমন করে স্থান পেয়েছিল? ভারতীয় তাম্র ও ব্রোঞ্জ-সভ্যতার পূর্বে হয়ত আছে নানা অজ্ঞাত অধ্যায়। দেবীর রূপধ্যানের মধ্যেও একটি কথা বার বার ধ্বনিত হয়েছে, দেবী ত্রিকালেশ্বরী। তাঁর সংগ্রাম সৃষ্টির পক্ষে ও অনন্তকাল আশ্রিত জীবকুলের রক্ষার্থে।

# গোঁজ

## সতীনাথ ভাদুড়ী

পঁচিশ বছর আগে বিয়ে হয়েছে; কিন্তু স্ত্রীর উপর আকর্ষণ ভূপতিবাবুর একটুও কমেনি আজও। আকর্ষণ বললে কমিয়ে বলা হয়। তাঁকে স্ত্রৈণ বললেও কমিয়ে বলা হয়। বউ-পাগলা কথাটাও তাঁর মত গম্ভীর ও অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের পক্ষে খাটে না। দ্বিধায় পড়ে, পাড়ার লোকে নূতন নামকরণের সময়, তাঁর স্বভাবের ওই দিকটা বাদ দিয়ে অন্য একটা দিক চেপে ধরেছিল। তাঁর নূতন নাম দিয়েছিল 'গোঁজ'। নাম বাছবার অসাধারণ প্রতিভা জনসাধারণের। কেননা এর পর থেকেই দেখা গেল, গোঁজ কথাটা শুনলে তিনি রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারান।

কম কথার মানুষ তিনি। যেটুকু বলেন কাজের কথা। কাজটা হচ্ছে, নিজের দুঃখের কথা অপরকে জানানো। উদ্দেশ্য একটু সহানুভূতি পাওয়া। এর অতিরিক্ত আর কিছু চান না তিনি। গম্ভীর প্রকৃতির হলেও লোকজনের সঙ্গ তিনি ভালবাসেন। কারণ লোকজনের মধ্যে গিয়ে না বসলে, কাউকে ধরে নিজের দুঃখের কাহিনী শোনাবার সুযোগ পাবেন কি করে। লোকে বোঝে না। কেউ তাঁর গল্প শুনতে রাজী নয়; কারণ তাঁর দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাবার স্পৃহা কারও নেই।

তিন রকমের দুঃখে তিনি ভোগেন। প্রথম হচ্ছে যে, সর্বগুণসম্পন্না স্ত্রী রত্নমালার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাঁর মত এক অপদার্থ স্বামীর হাতে পড়ে। দ্বিতীয় দুঃখ যে, সহানুভূতিহীন উপরওয়ালা ও সহকর্মীরা তাঁর চাকরি-জীবন দুঃসহ করে তুলেছে। তাঁর তৃতীয় দুঃখ সাংসারিক অভাব-অনটন-জনিত।

এই তিনটির অতিরিক্ত কোন চতুর্থ বিষয়ে ভূপতিবাবু কথা বলতে পারেন না। চেনা লোকজনরা যেখানে বসে গল্পগুজব করেন, সেখানে গিয়ে বসতে তিনি ভালবাসেন। আড়ষ্টভাবে চুপটি করে বসে থাকেন। কোন কথা বলতে আরম্ভ করবার আগে তাঁর একটু সময় লাগে। তাই আড্ডার গল্প-গল্পের সঙ্গে তাল রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর তিনি চেষ্টা করেন পাশের লোকটিকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজের কথার শ্রোতা করে নেবার। এই নিয়েই লাগত গণ্ডগোল।

গণ্ডগোল হত, আবার মিটে যেত। ইদানীং বয়স হয়ে তিনি ক্রমেই বদমেজাজী হয়ে উঠছেন। সবাই বলে গোঁজিদার ছিট বাড়ছে। ফলে আজকাল ব্যাপারগুলো গড়াচ্ছে অনেক বেশী দূর।

মহিম ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে ওষুধ আনতে গিয়েছিলেন স্ত্রীর জন্য। সেখানে খুব ভিড়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এ সময়টুকু ভূপতিবাবু বাজে নষ্ট হতে দেননি। দন্তশূলে কাতর তিনকড়ি-পানওয়ালার কাছে নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে গল্প করছিলেন। রাজারাজড়ার ঘরে যায় যাওয়া সাজত, সে এমন স্বামীর হাতে পড়েছে, যে তাকে এক ফোঁটা ওষুধ কিনে দিতে পারে না অসুখ করলে—এই ছিল তাঁর গল্পের সারমর্ম। অনেকক্ষণ শোনবার পর তিনকড়ি বিরক্ত হয়ে বলেছিল—"তা রাজা-রাজড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিলেই তো পারেন তাঁকে।"

শুনে খুন চড়ে গিয়েছিল ভূপতিবাবুর। সেখানেই ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হয়ে যায়। মহিম ডাক্তার ভূপতিবাবুকে চলে যেতে বলেছিলেন ডিসপেনসারি থেকে।

ডিসপেনসারির আড্ডায় যাওয়া সেইদিন থেকে বন্ধ।

এর পরের ঘটনা ঘটে বীণাপাণি ক্লাবে। রিহার্সাল চলছে 'দুঃখীর সংসার' পালার। সবরকম বয়সের লোক আছে সেখানে। হঠাৎ চাপা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল—"এই রে! গোঁজিদা আসছে!"

চোখে-চোখে ইশারা খেলে গেল। ভূপতিবাবু এসে কোথায় বসবেন সে-ই হচ্ছে কথা। যেখানে এসে বসলেন তার কাছ থেকে লোকজন একটু সরে বসল হাসতে হাসতে। ভূপতিবাবু বসেছেন আড়ষ্ট হয়ে। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় রিহার্সাল শুনছেন। এর পর আর কারও খেয়াল নেই তাঁর কথা। যে যার নিজের মত তাস, দাবা, রিহার্সাল নিয়ে মেতেছে।

হঠাৎ শোনা গেল ভূপতিবাবুর চাপা গলা। একজনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন—"নায়ক বলছে ঠিকই। আমার বাড়ীতেও এই একই অবস্থা। ছেলেমেয়েদের পড়া হয় না পয়সার অভাবে। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। সব হুবহু মিলে যাচ্ছে। একমাত্র তফাৎ হচ্ছে যে আমার স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে এমনভাবে ঝগড়া করেন না;

আর এমন করে পাড়ার লোকের কাছে বলেও বেড়ান না। বুদ্ধি, বিবেচনা, ত্যাগ যে বিষয়ে বলুন, লাখে অমন একটা মেলে কিনা সন্দেহ। বুঝলেন।....."

"কী কানের কাছে বিড়বিড় করে বকছেন তখন থেকে! বউয়ের কেচ্ছা এখানে কেন? রিহার্সাল, তাস, দাবা এসবের একটাও যদি মনে না ধরে আপনার, তবে বউয়ের আঁচল ধরে বসে থাকুন গিয়ে বাড়ীতে গোঁজ হয়ে! জ্বালাতন!"

"কী! আমাকে গোঁজ বলা! আমার স্ত্রীকে নিয়ে কথা বলতে এসেছেন আপনি?"

হুলস্থুল পড়ে গেল ক্লাবে।

"আমরা বলছি, না আপনি বলছেন?"

মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছে ভূপতিবাবুর।

"জুতিয়ে মুখ ভেংগে দেবো!"

তিনি সেই ভদ্রলোকের হাত চেপে ধরেছেন। কয়েকজন মিলে ধরে, ঠেলতে ঠেলতে ভূপতিবাবুকে ক্লাব-ঘর থেকে বার করে দিল। তাঁর আস্ফালন তখনও থামেনি।

এর পরের কাণ্ডটা ঘটে দেবেন মুখুজ্যের বারান্দার আড্ডায়। ভূপতিবাবু এক কোনায় বসেছিলেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। আসর তখন বেশ জমজমাট অবস্থায়! আমেরিকার শক্তি বেশী, না রুশের, তাই নিয়ে দারুণ তর্ক চলছে। হরেনবাবু হঠাৎ শুনতে পেলেন ভূপতিবাবু কানের কাছে কি যেন বলছেন।

"বড়বাবু ভীষণ জ্বালাতন আরম্ভ করেছে।"

হরেনবাবু আমল দিলেন না। তাঁর মন তখন রয়েছে রুশ-আমেরিকার আণবিক বোমা-প্রতিযোগিতার দিকে পড়ে।

"আঃ! আপনি জ্বালাতন করবেন না এখন!"

কিছুক্ষণের জন্য রেহাই পেলেন হরেনবাবু। তারপর আবার আরম্ভ হ'ল ভূপতিবাবুর চেষ্টা আসরের মূল গল্পস্রোত থেকে তাঁকে আলাদা করে নেবার।

"চাকরি বুঝি আর করা যাবে না। এমন আদাজল খেয়ে লেগেছে বড়বাবুটা আমার পিছনে!"

কোন সাড়া পাওয়া গেল না হরেনবাবুর কাছ থেকে।

"সাহেব লোক খারাপ না; কিন্তু একেবারে বড়বাবুর হাতের মুঠোর মধ্যে।"

"কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে এ অফিসের গল্প শোনান কেন বাবা? বেশ তো গোঁজ মেরে বসেছিলে!"

রাজনীতির গল্প বাধা পড়ল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চেয়ে আড্ডার বর্তমান পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে বেশী চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠল।

খেপে উঠেছেন ভূপতিবাবু।

"আমাকে গোঁজ বলা! আমি গোঁজ?"

"গোঁজ না তো আবার কি! ওসব গল্প বাড়ীতে গিয়ে কপোত কপোতীর মত মুখোমুখি হয়ে বসে, বউয়ের কাছে শোনাওগে যাও! এখানে কেন সকলকে জ্বালাতন করে মারো!"

"আমি কি আপনার চাকর, যে অমনভাবে হুকুম করছেন! আমার স্ত্রী তুলে কথা বলতে এসেছেন! দেবো থাবড়ে মুখ ভেংগে!"

আর যাবে কোথায়। দুইজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মধ্যে হাতাহাতি হবার উপক্রম। মজা দেখবার জন্য লোক জড় হয়ে গেল। এখানে যাঁরা আড্ডা দিতে আসেন, তাঁরা সকলেই স্থানীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তাই ব্যাপারটা পাড়ায় আলোচিত হল আরও বেশী করে। ফলে, এই আড্ডার পৃষ্ঠপোষক জনকয়েকের বাড়ী যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল ভূপতিবাবুর।

এর পরের দৃশ্য দোলগোবিন্দবাবুর বাড়ীর অন্নপ্রাশনের ভোজে। ভোজবাড়ীতে ঢুকে কারও সংগে কথা বলেননি। খাওয়ার ডাক এলে আসনে গিয়ে বসলেন। তাঁর দুই পাশের আসন খালি। ভূপতিবাবু বুঝতে পারছেন যে চতুর্দিকের চাপাহাসির লক্ষ্য তিনিই। গৃহস্বামী একটু অপ্রস্তুত হয়ে সম্মুখে এসে বসলেন। আরম্ভ হল গল্প। দোলগোবিন্দবাবু বিনয় দেখিয়ে তাঁর আয়োজনের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে কথা তুলেছেন। এর পর আর চুপ করে থাকতে পারেন না ভূপতিবাবু।

"এর নাম অসম্পূর্ণ আয়োজন! আমার মত অবস্থার লোকরা বাড়ীতে কী খায়? শাকভাত জোটে না, তার আবার পোলাও-মাংস। দুধ খেতে পায় আমার ছেলে-মেয়েরা?"

কাছেই একজন গলা খাঁকার দিল। গৃহস্বামী গতিক বুঝে গল্পের বিষয় পালটাবার চেষ্টা করলেন।

"বৃষ্টি হবে বোধ হয় আজ। যা গরম পড়েছে।"

কিন্তু ভূপতিবাবুকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করা বৃথা।

"বুঝলেন দোলগোবিন্দবাবু মাসের প্রথমে মাইনে পেয়েই আড়াই মণ চাল চাল কিনে রাখি, যাতে মাসের শেষে ওই পদার্থটির অভাব না হয়। তবু মুদীর দোকানে বাকি পড়েছে প্রায় শ' দেড়েক টাকা। বিশেষ বুদ্ধিমতী স্ত্রী পেয়েছিলাম বলেই কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে আমার সংসার।".....উচ্চ হাসির রোলে এর পরের কথাগুলো আর শোনা গেল না।

"এই রে! গোঁজদা আরম্ভ করেছে।"

"ঠিক সুযোগ খুঁজে নিয়ে গোঁজদা গোঁজ ঠুকেছে।"

আর ভূপতিবাবু নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না।

"আমি তোমাদের ইয়ার? আমাকে গোঁজ বলতে এসেছ! অভদ্র চ্যাংড়ার দল!"

"এই তো বেশ কথার তুবড়ি ফুটছে! তোমরা মিছামিছি ওঁকে গোঁজ বলো।"

"ফিরিয়ে নিচ্ছি; ফিরিয়ে নিচ্ছি। গোঁজদা গোঁজ নয়; গোঁজদা গোঁজ নয়।"

একজন মাটির খুরির উপর গ্লাস দিয়ে বাজাতে আরম্ভ করল—গোঁজদা-গুজুম্ গোঁজদা গুজুম্। শিষ্টাচার ও চক্ষুলজ্জার বাধা ঘুচেছে। কর্মকর্তারা সকলে ছুটে এসেছেন সেখানে। করজোড়ে সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছেন, শান্ত হবার জন্য।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন ভূপতিবাবু।

"গোঁজ! তোমাদের বাপরা গোঁজ!"

গলার স্বর ক্রমেই চড়ছে। দোলগোবিন্দবাবু হাত-পায়ে ধরে তাঁকে আবার আসনে বসতে বলছেন। খেপে উঠেছেন ভূপতিবাবু।

"আমি কি ভিখিরী? বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছেন এমনিভাবে লোক দিয়ে আমাকে অপমান করাবার জন্য? বাড়ীতে খেতে না পেলেও আপনাদের কাছে হাত পাততে যাই না কোনদিন।....."

দোলগোবিন্দবাবুর হাত ঠেলে দিয়ে গোঁজদা অর্ধভুক্ত অবস্থায় নিমন্ত্রণবাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। সবাই অপ্রস্তুত। মাথার ছিট যেরকম বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যতে ওঁকে ঘাঁটানো আর ঠিক হবে না, এই হল সকলের রায়। এর পর থেকেই হ'ল মুশকিল ভূপতিবাবুর। উপরোক্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোর সম্মিলিত ফল দাঁড়াল যে, পাড়ার লোকে তাঁকে এড়িয়ে চলে। সবকয়টি পরিচিত আড্ডায় যাওয়া তাঁর বন্ধ। তিনি রাগ পুষে রাখেন না। রাগ পড়বার পর আবার লোকজনের সংগে মিশতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কেউ মিশতে রাজী নয়। কোন আড্ডায় গেলেই সেখানকার লোকরা কোন-না-কোন কাজের ছুতা দেখিয়ে এক-এক করে উঠে যায়। রাগও হয় আবার দুঃখও হয়। দুই-একজনকে ধরে জিজ্ঞাসাও করেছেন—"আমি কি বাঘ না ভাল্লুক না কুষ্ঠরোগী যে, অমন ভাবে পালাচ্ছ আমাকে দেখে?" তারা কেউ কোন উত্তর দেয়নি।

এত কাণ্ডের পরও ভূপতিবাবু ঠিক ধরতে পারেন না কোথায় তাঁর গলদ, কেনই বা তাঁর অন্তরের কথা ভাল মনে বললেও সকলে বিরক্ত হয়। কারও কাছ থেকে টাকা পয়সা চান না, তবু কেন কেউ তাঁর গল্প শুনতে রাজী নয়?

অফিসে সময় কাটে ছয় ঘণ্টা; বাজার করতে লাগে আধ ঘণ্টা। বাকি সময় কাটে কি করে, সেই হ'ল সমস্যা। স্ত্রীর সংগে গল্প করতে তাঁর ভাল লাগে। স্ত্রীর কাছাকাছি চুপ করে বসে থাকতেও তাঁর খারাপ লাগে না। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে যে, চব্বিশ ঘণ্টা তাঁকে পাওয়া শক্ত। পূজা-অর্চার উপর রত্নমালার ঝোঁক চিরদিনের। গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার পর থেকে আরও বেড়েছে। জপ-আহ্নিকে সময় লাগে সকালে দেড় ঘণ্টা, সন্ধ্যায় দেড় ঘণ্টা। এর পর ঢোকেন রান্নাঘরে। তখনই যা কিছু সুযোগ ভূপতিবাবুর, তাঁর কাছে বসবার।

অগত্যা রান্নাঘরে।

কাজেই আসল বিপদ রত্নমালার। ওই মানুষটিকে নিয়ে লোকের কাছে উপহাস-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি তাঁকে, এমন দিন নেই। বিয়ের রাত্রি থেকে আরম্ভ; আজও শেষ হয়নি। মনে আছে, বাসরঘরে হাসি-

ঠাট্টা, অনুরোধ, অনুনয়-বিনয় করেও কেউ নূতন জামাইকে কথা বলাতে পারেনি। "গান গাইবে না; কথা বলবে না; একবারটি হাস অন্তত নতুন জামাই!"

এতক্ষণে জামাই কথা বলল—"আমার মত লোকের হাসিখুশী আসবে কোথা থেকে বলুন?" কঠিন প্রশ্ন। ভ্যাবাচাকা লেগে গেল বাসরঘরের মেয়েদের। তারপর জামাই নিজেই বুঝিয়ে দিলেন। "নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই, এমন চাকরি। সাহেব আজ একরকম ফরমাশ করে, কাল করে অন্যরকম। খেটে মরি; কিন্তু তার বদলে পাবো শুধু গালমন্দ। বলুন, আপনারাই বলুন, এরকম মানুষের হাসি আসে? দেখুন আপনারা আর আমায় জ্বালাতন করবেন না!"

মহিলারা এর থেকে নূতন জামাই সম্বন্ধে যা ধারণা করবার করে নিয়েছিলেন। রত্নমালাও। নূতন জীবন সম্বন্ধে এক অজ্ঞাত ভয়ে কেঁপে উঠেছিল তাঁর বুক। বুঝে গিয়েছিলেন, অন্য দশজনের মত তাঁর কপাল নয়। তারপর পঁচিশ বছর ধরে একথা হাড়ে হাড়ে বুঝছেন।

ছেলেমেয়েরা বাপের সম্মুখে নেহাত কাজ না পড়লে আসে না। বাবাও কোনদিন তাদের সঙ্গে বসে গল্প করেননি, তারাও কোনদিন করেনি। বাবার হাস্যাস্পদ চরিত্রের জন্য বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তাদের চোরের মত থাকতে হয়। সহপাঠীদের মধ্যে তাদের পরিচয় গোঁজের ছেলে বলে। এইসব নানা কারণে বাবার উপর ছেলেমেয়েদের কোন দরদ নেই। সুতরাং সব দিক দিয়ে মুশকিল রত্নমালারই। এতকাল তবু স্বামী বাড়ীর বাইরে দিনের অনেকক্ষণ সময় কাটাতেন। সেই ছিল বাঁচোয়া। সে শান্তিটুকুও আর রইল না। গুরুদেবের মনে কী আছে তিনিই জানেন! তবে একপক্ষে ভাল হল। স্বামীর নিত্য নূতন কেলেঙ্কারির খবর আর তাঁকে শুনতে হবে না।

ভূপতিবাবু অপেক্ষা করেন, কতক্ষণে স্ত্রী পূজাহ্নিক সেরে রান্নাঘরে আসবেন। রান্নাঘরে বসে বসে দেখেন কী নিপুণ হাতে রত্নমালা সব কাজ করে যাচ্ছেন। বেচারী। তাঁর মত অপদার্থের হাতে পড়ে বেচারীর সারা জীবন খেটে খেটেই গেল। এ-ই একমাত্র ব্যক্তি যে তাঁকে নিয়ে উপহাস বিদ্রূপ করে না; তিনি চুপ করে বসে থাকলে বিরক্ত হয় না; তিনি মনের কথা বলতে আরম্ভ করলে উঠে চলে যায় না।

ছোট রান্নাঘর। দুইজন লোক পিঁড়ি পেতে বসলে তৃতীয় লোকের জায়গা হয় না। সেই ঘরে তিনি যতক্ষণ রাঁধবেন ততক্ষণ অতবড় একজন পুরুষমানুষ কাছে পিঁড়ি পেতে বসে তাঁর কাজ দেখবেন, এ জিনিস ভাল লাগে না রত্নমালার। কিন্তু উপায় কি। ও মানুষ যায় কোথায়।

কিন্তু এর যে আবার আর একটা দিক আছে। সেকথা বুঝতে আরম্ভ করলেন কয়েকদিনের মধ্যে। বড় মেয়েটা চিরকাল তাঁর রান্নাঘরের কাজে সাহায্য করত। বাবা বসে থাকলে সে আসে না; সব কাজ রত্নমালাকে একাই করতে হয়।

দ্বিতীয় অসুবিধা স্বামীর গল্প। যতই গম্ভীর প্রকৃতির লোক হন, তাঁর কাছে বসলেই স্বামীর মুখে কথার খই ফোটে। স্ত্রীই একমাত্র মানুষ যার সঙ্গে কথা বলতে ভূপতিবাবুর একটুও বাধো-বাধো ঠেকে না। এ-ই একমাত্র স্থান যেখানে তাঁকে আড়ষ্ট হয়ে বসে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। হাজার বার শুনে শুনে যেসব কথা রত্নমালার আগাগোড়া মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, সেই সব কথাই স্বামী প্রত্যহ বলে যান, একই ভাষায়, একই ভঙ্গীতে। মেয়েদের বিয়ে দিতে পাচ্ছেন না, এবং রত্নমালা যে একটি স্ত্রী-রত্ন, এই দুটো কথাই সময় নেয় সবচেয়ে বেশী। মেয়েরা বড় হয়েছে; তারা কাছাকাছি থাকলে এসব কথা যে বলতে নেই, সেকথা খেয়াল থাকে না ভূপতিবাবুর। স্ত্রী ইঙ্গিত-ইশারায় বুঝিয়ে দিলেও একথা তিনি বুঝতে চান না। ছেলেমেয়েদের সামনে লজ্জায় মাথা কাটা যায় রত্নমালার।

মহা মুশকিলে পড়লেন তিনি এ মানুষকে নিয়ে। অসহ্য লাগে তাঁর এই একঘেয়ে গল্প। সংসারে বাঁচতে হলে দুঃখ তো আছেই; সে দুঃখ যত ভুলে থাকতে পারা যায় ততই ভাল। তা নয় কেবল সেই কথা!

বড় মেয়েকে ডেকেছিলেন রত্নমালা রুটি বেলে দেবার জন্য। স্বামীকে বললেন চৌকাঠের বাইরে গিয়ে বসতে, নইলে রান্নাঘরে রুটি বেলতে বসবার জায়গা হয় না। মেয়েকে দেখেই বুঝি ভূপতিবাবুর মনে পড়ল যে গরীব হয়ে জন্মাবার অনেক দুঃখ; মেয়ের বিয়ে দিতে যত টাকা লাগে অত টাকা তাঁর হাতে কোনদিনই আসবে না।

এতটুকু আক্কেল যদি থাকে মানুষটার! থাকতে না পেরে রত্নমালা স্বামীকে থামতে বললেন। মেয়ে রুটি বেলার কাজ তাড়াতাড়ি কোনরকমে সেরে, উঠে চলে গেল। ভূপতিবাবু সেইখানে চুপ করে বসে রয়েছেন দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। রাত হয়ে যাচ্ছে। ছেলেপিলেদের খাওয়ার সময় হল। তারা খেতে বসবে কোথায়; স্বামী জায়গা জুড়ে বসে রয়েছেন। আর থাকতে না পেরে রত্নমালা বললেন—"ওখানে গোঁজ হয়ে বসে আছ কেন? যাও না, ও ঘরে গিয়ে বস না।"

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে বুঝি একটু সময় লাগল। তারপর লাফিয়ে উঠলেন পিঁড়ি থেকে ভূপতিবাবু।

"গোঁজ? আমি গোঁজের মত থাকি?"

হঠাৎ এই গলা-ফাটান চীৎকারে অবাক হয়ে গেলেন রত্নমালা। স্বামীর চোখমুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। এ মূর্তি তিনি কোনদিন এর আগে দেখেননি।

"আমাকে গোঁজ বলা! ভেবেছ কি তুমি? চাকর? আমি কি তোমার জমিদারিতে বাস করি? না আমি তোমার টাকা ধারি? আমার বাড়ীতে, আমার পয়সায় খেয়ে, আমাকে গোঁজ বলতে এসেছ! মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো! বাড়ী থেকে বার করে দেবো! যাও!" ধাক্কা দিয়ে ভূপতিবাবু স্ত্রীকে রান্নাঘর থেকে উঠনে বার করে দিলেন।

ছোট বাড়ী। এতটুকু উঠন। ছেলে-মেয়েরা সকলে ছুটে এসে থ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে। রত্নমালা একটাও কথা না বলে মাথা নীচু করে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উঠানের মাঝখানে। ছেলেমেয়েদের সামনে এ কী জঘন্য কাণ্ড। তাদের মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না তিনি। পাড়াসুদ্ধ জানাজানি হতে আর বাকি নেই বোধ হয়, স্বামীর ওই চীৎকারের পর। পাশের বাড়ীর দুটি ছেলে দোরগোড়ায় উঁকিঝুঁকি মারছে। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না আরও পাড়ার লোক বাইরে জড় হয়েছে কিনা। কেলেঙ্কারির একশেষ!

নিজের কৃতকর্মের গুরুত্ব বোধ হয় বুঝতে পারলেন এতক্ষণে ভূপতিবাবু। গটগট করে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। পাশের বাড়ীর ছেলে দুটো অন্ধকারে দূরে সরে গেল ভয়ে। বর্তমান মানসিক অবস্থাতেও এ জিনিস ভূপতিবাবুর নজর এড়াল না। তাঁর নাগালের বাইরে সকলে পালাতে চায়; এতেই তিনি সবচেয়ে বেশী ব্যথা পান।

এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন রত্নমালা। "ও মা!" বলে তিনি ছুটে রান্নাঘরে ঢুকলেন চড়চড়ির কড়া উনন থেকে নামাতে। একটা পোড়া গন্ধে সারা বাড়ী ভরে গিয়েছে। তারপর সেখান থেকে চেঁচিয়ে ছেলেকে বললেন—"রমেন, তুই একটু দেখ্ না এই অন্ধকারে কোথায় গেলেন উনি খালি পায়ে, লাঠি টর্চ কিছু না নিয়ে!"

তবু কি আবহাওয়া হাল্কা হয়।

যাক, ভূপতিবাবু আত্মহত্যাও করেন নি, কিছুই করেননি। অনুশোচনাগ্রস্ত মন নিয়ে ফিরে এসেছিলেন রাত এগারটার সময়। মনে পড়েছিল তিনি না ফিরলে, অভুক্ত অবস্থায় স্ত্রী ভাত আগলে বসে থাকবেন। রাত্রিতে কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রীর কাছে বলেছিলেন—"তুমিও যদি আমার দুঃখের কথা শুনতে রাজী না থাক, তবে আমি কার কাছে বলি?"

"ভগবানের কাছে বলো! মানুষ কতটুকু কী করতে পারে।"

তখন কিছু ভেবে বলেন নি রত্নমালা। কথার পৃষ্ঠে আপনা থেকে বেরিয়ে এসেছিল কথাগুলো।

পরের দিন স্বামীকে বললেন, একটু করে জপতপ করতে। আর কিছুর জন্য নয়,

সময় কাটাবার সুবিধা হবে ওতে; মনের দুঃখও একটু কাটতে পারে।

কথাটা বুঝি ভূপতিবাবুর মনে লাগল। হ্যাঁ না কিছু বললেন না তিনি। আপত্তিও করলেন না।

"তবে আমি গুরুদেবের কাছে লিখি?"

স্বামী দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

রত্নমালা কি লিখেছিলেন গুরুদেবের কাছে তিনিই জানেন। তবে দেখা গেল গুরুদেব অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি ভূপতিবাবুর বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে লিখিত নির্দেশ পাঠালেন।

"ভূপতি, তোমার এখনও দীক্ষা লইবার সময় হয় নাই। উহার পূর্বে মনকে শোধন করিতে হইবে। স্ত্রীমাত্রকে সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞান করিবে। রত্নমালার সহিত পাশাপাশি আসনে প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় জপে বসিবে। এতদ্ব্যতীত যে সকল প্রতিবেশীর সহিত ইতঃপূর্বে মনোমালিন্যের কারণ ঘটিয়াছে প্রত্যহ তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে, তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিবার জন্য। পূর্ণ এক বৎসর এইরূপ করিবার পর তোমার দীক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জিত হইতে পারে; তাহার পূর্বে নয়। এতদ্বিষয়ে আরও কিছু বুঝিতে হইলে শ্রীমতী রত্নমালার নিকট হইতে বুঝিয়া লইও।".....

ভূপতিবাবু দ্বিধায় পড়লেন। গুরুদেবের নির্দেশের প্রথমার্ধ মনের মতন। যিনি এত দূর থেকে ভাবী শিষ্যের মন বুঝতে পারেন, তাঁকে গুরু করতে তাঁর আপত্তি নেই। তবে গুরুদেবের দ্বিতীয় আদেশে তাঁর ঘোর আপত্তি। যারা তাঁকে দেখলে পালাতে চায়, তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে পায়ের ধুলো মাথায় নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মরে গেলেও না। আত্মসম্মানে বাধে। লোকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায় না, এইটাকেই তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ বলে মনে করেন।

স্ত্রী তাঁকে বোঝান যে, গুরুদেবের মত সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ যখন ওই রকম আদেশ দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তার কোন গূঢ় তাৎপর্য আছে।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ভূপতিবাবু বললেন—"থাকগে যাক!"

"একবার করেই দেখ!"

"না। ওদের পায়ে হাত দিতে পারব না আমি।"

"আমি কি তোমার জমিদারিতে বাস করি?"

"আচ্ছা পায়ে হাত না হয় নাই দিলে। শুধু দুয়ারের ধুলো মাথায় নিলেই চলবে। অষ্টপ্রহর বাড়ীর লোক যেখান দিয়ে যাতায়াত করে সেখানকার ধুলোই, তাদের পায়ের ধুলো। একবার করে দেখ গুরুদেব যা বলছেন। লজ্জা কিসের। যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান তিনিই পথের বাধা দূর করে দেবেন।"

স্ত্রী যে সন্ন্যাসীঠাকুরদের মত এত সুন্দরভাবে কথা বলতে পারেন, এ কথা ভূপতিবাবুর জানা ছিল না।

একটু সহজ হয়ে এল ব্যাপারটা। নরম সুরে বললেন—"লোকে হাসবে যে। দিনের বেলা কিছুতেই নয়। সন্ধ্যার পর যেতে পারি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতেই হবে। সন্ধ্যার জপ-আহ্নিক সেরে তারপর যেও। ঘণ্টা দুয়েকের বেশী লাগবে না।"

এই কথাই থাকল শেষ পর্যন্ত।

যে আড্ডায়, যে বাড়ীতে যান সেখানকার লোকজন তাঁকে দেখে সরে পড়ে। কেউ হয়ত দুই একটা কথা বলে, কেউ আবার তাও বলে না। এর জন্য আগে তিনি মনে ব্যথা পেতেন; এখন মনে হয় শাপে বর। অসীম কৃপায় গুরুদেব, তাঁর পদধূলি-সংগ্রহের সব বাধা দূর করে দিচ্ছেন। রাত্রির অন্ধকারে নির্জনে, গৃহস্থের সদর দরজার চৌকাঠের কাছের পদধূলি তুলে নিয়ে মাথায় দেন আর জিভে ঠেকান। লোকে ভাবে পাগলামি; তিনি মনে মনে হাসেন। গুরুদেব নির্দেশ দিয়েছিলেন, ঠাকুরঘরে পাশাপাশি আসনে দুইজনকে বসতে। তিনি পরের দিন গুরুদেবের চিঠিখানা আর একবার পড়লেন। তারপর ঠাকুরঘরে আসন পেতে নিলেন স্ত্রীর সামনা-সামনি। জপের সময় মুখোমুখি হয়ে বসতে চান। এতে রত্নমালার আপত্তি নেই।

স্ত্রী ধ্যানে বসেছেন চোখ বুঁজে। ভূপতিবাবু ধ্যান করছেন চোখ খুলে। ধ্যানস্থা স্ত্রীকে দেখবার সুযোগ তাঁর হয়নি এর আগে। একেবারে অন্যরকম দেখতে লাগছে। শত রূপে, শত মূর্তিতে তিনি স্ত্রীকে দেখেছেন এর আগে; কিন্তু এত সুন্দর কোন দিন লাগেনি। নিষ্পলক তাঁর চাউনি। মনে মনে হিসাব কষছেন তিনি। সকালে দেড় ঘণ্টা, সন্ধ্যা দেড় ঘণ্টা,—প্রত্যহ তিন ঘণ্টা। তিনশ পঁয়ষট্টিকে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হয়? দুই একবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন। কাগজ-পেন্সিল না হলে অসম্ভব। জপ শেষ হবার পর ও ঘরে গিয়ে অঙ্কটা কষে দেখবেন। এই সংখ্যাটা তিনি চান আরও বাড়ুক। বছরের পর বছর দীক্ষা নেবার যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা তাঁর চলতে থাকুক! তাঁর চিত্তশুদ্ধিতে অনেক সময় লাগুক! অত তাড়াতাড়ি কিসের? যে গুরুদেবের ব্যবস্থাপত্র এত চমৎকার তাঁর উপর ভক্তিতে মন গদ্‌গদ হয়ে ওঠে।

দেড়ঘণ্টা কতটুকুই বা সময়!

রত্নমালা চোখ খুললেন।

"একি! তুমি—?"

অপ্রস্তুত হবার বদলে, হেসে ফেটে পড়লেন ভূপতিবাবু।

"তবে কি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে গোঁজ হয়ে বসে থাকব?"

হাসতে হাসতে তিনি পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন। ক্যাগজ-পেন্সিল খুঁজছেন; তিনশ পঁয়ষট্টিকে তিন দিয়ে গুণ করে দেখবেন কত হয়। ছেলে-মেয়েরা সরে পড়ল, হঠাৎ তাঁকে ঘরে আসতে দেখে। কুলঙ্গির ভিতরে ধোপার খাতা আর ছোট্ট পেন্সিলটা নজরে পড়ল। ধোপার-খাতার হাতের-লেখাটা দেখে চমকে উঠেছেন তিনি। ধোপার খাতা কে লেখে সে কথা তিনি জানেন না। বড় মেয়েই হবে বোধ হয়।

ট্যাঁকের থেকে দোমড়ানো মোচড়ানো গুরুদেবের চিঠিখানা তিনি বার করলেন। হাতের লেখা হুবহু মিলে যায় ধোপার খাতার লেখার সঙ্গে।

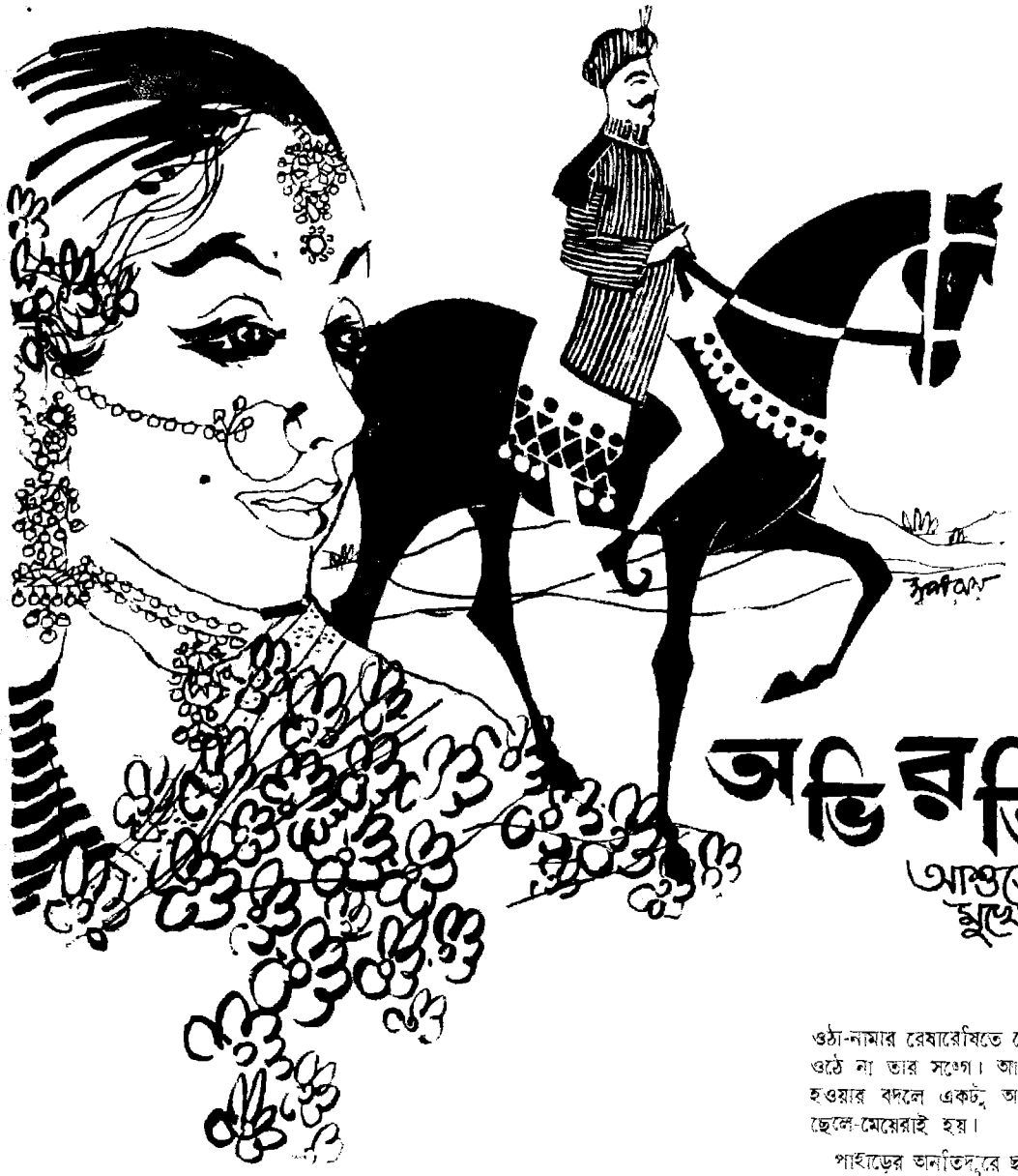

# অভিরতি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

গাঁয়ের নামে নাম বউটির।

পাহাড় ঘেঁষা রুক্ষ গ্রামটার নাম ভবানী। আর, মহেশ করের ঘরের বউয়ের নাম ভবানীবাঈ।

তা বিয়ের আগে নামের মুখরক্ষা করেছিল বটে মেয়েটা। মারাঠী রাজপুত দলবী ঘরের মেয়ে। পোষ মানাতে গেলে ফোঁস করে ওঠা স্বভাব। তার ওপর ছেলে-বেলা থেকে মাথার ওপর কড়া অভিভাবক না থাকার ফলে অপরিণত বয়সের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা বিঘ্ন তেমন পড়েনি।। ভাই ফৌজে চাকরি করে। বছরে দু'বছরে কখনো-সখনো এসে দু'দশ দিনের জন্য ঘুরে যায়। বাপ অন্ধ। বসন্ত হয়ে প্রথমে একটা চোখ গিয়েছিল, পরে দ্বিতীয়টারও দৃষ্টি গেছে। দারিদ্র্যের সংসার সামাল দিতেই মায়ের হিমসিম অবস্থা, মেয়ে আগলাবে কখন?

ফলে সময়ে বিয়েও হয়নি মেয়েটার। ওদের ঘরে ছোট বয়সে বিয়ে হয়। তার ওপর চোখে পড়ার মত চোখা রূপ নেই, যে কেউ সেধে এসে ঘরে নিয়ে যাবে। মোটা-মুটি সুশ্রী হলেও দুরন্তপনা আর বেয়াড়াপনার ফলে চেহারার মধ্যে একটা পুরুষালি কাঠিন্য দিনকে দিন বেশি প্রাধান্য লাভ করছিল। তার জ্বালায় অস্থির পড়শিনীদের অনেক সময় মন্তব্য করতে শোনা গেছে, ওটা মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে অন্ধ বাপের কাজে লাগত, ও-মেয়ে নির্ঘাত হাত-পা ভেঙে বাপের বোঝা হবে একদিন।

পারলে এমন মেয়ের হাত-পা হয়ত ভেঙেই দিত কেউ। হাত-পা অল্প-স্বল্প ভেঙে একটু শিক্ষা হোক এমন আশাও যে কেউ করে না এ-কথাও হলপ করে বলা যায় না। ভোর হতে না হতে ছেলে-মেয়ের দঙ্গল নিয়ে ভবানী হুড়মুড় করে একেবারে ওই পাহাড়ের ডগায় গিয়ে উঠবে। পাহাড়টার আড়াল থেকে সূর্যোদয় হয় বলেই ওটার নাম সূরয পাহাড়। সূর্যোদয় দেখে তারা আবার দৌড়-ঝাঁপ করে নেমে আসে। এই ওঠা-নামার রেষারেষিতে ছেলেরাও বড় পেরে ওঠে না তার সঙ্গে। আর ওই মেয়ে জখম হওয়ার বদলে একটু আধটু জখম অন্যের ছেলে-মেয়েরাই হয়।

পাহাড়ের অনতিদূরে ছাতলি নদী। নামেই নদী, বারোমাস শুকনো নুড়ি পাথরের হাড়-পাঁজর বার করেই আছে। ওই শুকনো নদীতেই হুটোপুটি করে সকলে, আর দৈবাৎ কখনো বেশি বর্ষা হলে বা বান ডাকলে আশ-পাশের বাসিন্দারা প্রমাদ গণে। ওই দস্যি মেয়েকে তখন রুখবে কে, সকাল-সন্ধ্যায় চারবার করে সেই খর জলে ঝাঁপা-ঝাঁপি করবেই। করুক, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে ঘরের ছেলে-মেয়েদেরও যে ঠেকানো যায় না। একবার তো একজনের মেয়ে ডুবতে ডুবতে বেঁচেছে, আর একবার একটা ছেলে পাথরে চোট খেয়ে পুরো এক-দিন অজ্ঞান হয়ে ছিল।

এটা মৌজা গ্রাম, অর্থাৎ দোকান পাট হাট বাজার নেই। ভবানী রোজ কসবায় যায় হাট-বাজার সওদাপত্র করতে। যেখানে ওসব আছে তার নাম কসবা। তা সেখানেও নিত্য ঝগড়া করে আসে। যে দামে যে জিনিস পাওয়ার অভিলাষ, তা আদায় না করে নড়বে না। দোকানীকে কটু কথা বলবে, সুবিধে বুঝবে ভয়ও দেখাবে।

সকলেই তিক্ত বিরক্ত তার ওপর।

এরপর আরো কিছু বয়েস হতে মেয়েটার দুরন্তপনা অতটা প্রত্যক্ষগোচর না হোক, তার বেয়াড়াপনার আঁচ সকলেরই গায়ে লাগে। মেয়ের বিয়ে নিয়ে ওর বাপ-মাকে দু'কথা শোনাতে গেলে, এমন কি দুটো সৎ পরামর্শ দিতে গেলেও ওই মেয়ের রসনার ঘায়ে পালাবার পথ মেলে না? অথচ, এব্যাপারেও তাদের তৎপর না হয়ে উপায় কি? উঠতি বয়সের ঘরের ছেলেগুলো যে ওর আশ-পাশেই ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়।

শেষে ওদের এক-ঘরে করারই মতলব ফেঁদেছিল পাড়া-পড়শীরা। এত বয়েস পর্যন্ত অমন মেয়ে ঘরে পুষে রাখাটা অপরাধেরই সামিল। কত বুড়ো হাবড়া অন্ধ খঞ্জ আছে একজনের হাতে গছিয়ে দিলেই তো হয় মেয়ে।

বয়স্ক মাতব্বরেরা কথাটা তুলল গাঁয়ের পাটিল ও মোড়ল কেশরকরের কাছে। কেশরকর প্রায় বৃদ্ধ, কিন্তু বেশ সবল পুরুষ। মস্ত যোদ্ধাবংশের সন্তান, তাকেও বীরপুরুষ জ্ঞানে মান্য-গণ্য করে সকলে। তাদের বীর-বংশের অনেক কথা আজও উপকথা হয়ে আছে। এই গুণেই গাঁয়ের পাটিল সে। গ্রামের বিপরীত প্রান্তে থাকে। দূরে থাকলেও সূরয পাহাড়ের ধারের এক দুর্বিনীত দুরন্ত মেয়ের খবর তার কানে আগেও এসেছিল।

এর বিহিত করতে গিয়েই এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটল। শুনে গ্রামবাসীরা অন্তত তাজ্জব বনে গেল। পাটিল কেশরকর নিজে এলো ভবানীর অন্ধ বাপের সঙ্গে দেখা করতে, সেই সঙ্গে তার দুন্ত মেয়েটাকেও দেখল। ডাকতে হয়নি, বাপের বিচার হবে কথাটা কানে আসতে কোমরে হাত দিয়ে নিজেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপর বৃদ্ধ মোড়লকে আরো দুই একদিন এসে মেয়ের বাপের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে দেখা গেল। অন্ধ বাপ তার দু' হাত ধরে আনন্দে গদগদ।

পাটিল একটা বিহিতের মতই বিহিত করল বটে। শুনে প্রথমে হাঁ হয়ে গেল সবাই। কেশরকর নিজের ছেলে মহেশকরের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছে ভবানীর।

প্রথম বিস্ময় কাটতে সকলের হাড়ে বাতাস লাগল। মেয়েটা মোক্ষম জব্দ হবে এইবার।

ঈর্ষার বদলে তাদের এই আনন্দেরও বিশেষ একটা কারণ আছে। মহেশকর বিপত্নীক। বছর দেড়েক হল ওর বউ রাণীবাঈ আত্মহত্যা করেছে। রাণীবাঈয়ের রূপ ছিল। সেই রূপের জোরেই বোধহয় দুর্দান্ত একরোখা মহেশকরকে সে বশ করতে পেরেছিল। দু'জনে দু'জনকে ভালবাসত খুব। সেই রাণীবাঈ আত্মঘাতিনী হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ তার নিন্দা করেনি, বরং মহীয়সী বলেছে। আত্মঘাতিনী হবার কারণ, ছেলে-মানুষি কৌতূহল নিয়ে সে কার্তিক পুজো দেখে ফেলেছিল। সংস্কার, সধবা স্ত্রীলোক কার্তিক পুজো দেখলে তার অবশ্যম্ভাবী বৈধব্য। রাণীবাঈ অতশত জানত না, পরে জানল। জেনে নিজের হাতে বৈধব্যযোগ খণ্ডন করে দিয়ে গেল।

মহেশকরও ফৌজে চাকরি করে তখন, বিদেশে থাকে। বীর-বংশের ছেলে বীর-পুরুষই হয়—অল্প সময়ের মধ্যে সে হাবিলদার হয়েছিল। সুযোগ সুবিধে পেলেই এবার বউকে নিয়ে আসবে ভাবছিল। তার মধ্যে এই দুর্ঘটনা। শুনেই দেশে ছুটল সে। তারপর চেষ্টাচরিত্র করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বসল।

সকলেই প্রায় বউয়ের নামে ধন্য ধন্য করল তার কাছে। এমন কি মহেশকরের বাপ মা-ও। কিন্তু দুই একজন অতি নির্ভরযোগ্য পড়শী-বন্ধু তার কান বিষিয়েও ছিল। তারা আড়ালে জানালো রাণীবাঈ বৈধব্যযোগ খণ্ডন করার জন্য আত্মত্যাগ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার আগে কার্তিক পুজো দেখে ফেলার অপরাধে শ্বশুর শাশুড়ীর গঞ্জনাও বড় কম ভোগ করেনি। একমাত্র ছেলের শঙ্কায় তারা বউয়ের ওপর বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

দুনিয়ায় শুধু এই বাপের মুখের দিকে চোখ তুলে কখনো কথা বলেনি মহেশকর। এরপরেও বলল না। কিন্তু বাপের সঙ্গে একটা নীরব বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়ে গেল।

আবার বিয়ের কথা শুনে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে উঠল মহেশকর। বাধার আভাস পেয়ে কেশরকর জানিয়ে দিল, বিয়ে না করলে বাপের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অতএব মহেশকর বাধা দিল না, —চাকরি করে না, বর্ধিষ্ণু বাপের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেলে তার চলবে না। এই সঙ্গে বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত সে আর আপত্তি করল না। কিন্তু বাপের সুনজরে পড়ে রাণীবাঈয়ের জায়গা দখল করতে যে মেয়েটা আসছে—সব রাগ আর বিদ্বেষ গিয়ে পড়ল তার ওপর।

এদিকে সকলের হাড় জুড়লো, কারণ তারা ভাবল যোগ্যে যোগ্য মিলন হয়েছে। যেমন বেয়াড়া মেয়ে, তেমনি মুগুর জুটেছে। আক্কেল হয়েছে।

মহেশকরকে এখনো ভয়ই করে সকলে। ওই ছেলে ফৌজে চাকরি না করলে বা এভাবে প্রথম বউ না মরলে তার দাপটে গাঁয়ে টেকা দায় হত বোধ করি। যেমন রগচটা তেমনি একরোখা। তবে ফৌজী দলে ছিল বলে, আর নিজেকে বীর-পুরুষ ভাবে বলে আগের সেই ছেলেমানুষি অত্যাচারের ঝোঁক গেছে। সমবয়সীরা এখন তাকে তোয়াজ করে চলে—গাঁয়ের খণ্ডোবার সঙ্গে তার তেজস্বিতার তুলনা দেয়। ঘোড়ায় আসীন অসি-হস্ত খণ্ডোবা হলেন দেশ-রক্ষক দেবতা—মহাদেবের অবতার।

মদের গেলাসের ইয়ার-বন্ধুরা ঠাট্টা করল, স্বয়ং ভবানী আসছেন—এবারে কার দাপট বেশি দেখা যাক। এরও তাৎপর্য আছে, ভবানী হলেন গ্রাম-রক্ষয়িত্রী দেবী—প্রতি গ্রামেই ভবানী-মূর্তি আছে।

আশা সফল হল। বিয়ের মাস না ঘুরতে দেব-দেবীর খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে গেল। একে তো কার জায়গায় এসে বসেছে, নতুন-বউ সেই হিসেব করে চলে না, তার ওপর চোখ রাঙাতে গেলে ফিরে যে-ভাবে তাকায়, তা বরদাস্ত করার মানুষ নয় মহেশকর। তা'ছাড়া বাপ এনেছে বলে সেই রাগ তো আছেই। ভ্রূকুটি গ্রাহ্য করে না বলে হাত নিশপিশ অনেকদিনই করেছে, কিন্তু সেদিন মৃতা রাণীবাঈ সম্পর্কে কি একটা উক্তি করে বসতে আর সহ্য হল না। হাতের লোহার মত পাঁচটা আঙুল ভবানীবাঈয়ের গালের ওপর ফুটে উঠল।

হতভম্ব ভবানী অতি কষ্টে চোখের জল সামলালো। দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে খর চোখে মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মহেশকর শাসালো, এই মুখে ফের ওই নাম আনবি তো মুখ একেবারে ভেঙে দেব।

সেই থেকে শুরু। ভবানী ওই নাম মুখে এনেও মার খেয়েছে, আর স্বামীর দাপটের ওপর দাপট করেও মার খেয়েছে। বউ শাসন করা একটা মনের মত কাজ হয়েছে মহেশকরের। আর ওই জেদী দুর্বিনীত মেয়েকে শাসন করার ব্যাপারে একটা সুবিধেও আছে। অত মার খেয়েও জোরে কাঁদে না,—কাঁদেই না বলতে গেলে। আর, শ্বশুরের কাছে নালিশও করে না। শ্বশুর বাড়ি না থাকলে সমান তালে রুখে ওঠে, ফলে আরো বেশি মার খায়। রাগে বিদ্বেষে ভবানীবাঈ এক-একসময় স্বামীর লোকান্তরিত প্রিয়া অর্থাৎ রাণীবাঈয়ের উদ্দেশেও কটূক্তি করে বসে। ফল কি হবে জেনেও করে। অন্ধ আক্রোশে কিল-চড় পড়তে থাকে তখন। ভবানীরও শক্ত সবল হাত আছে দুটো, যতক্ষণ সম্ভব যোঝে সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়তে হয়। অমন অসুরে শক্তির সঙ্গে সে পারবে কেন।

কিন্তু হাল ছাড়লেও হার মানে না। ফলে মহেশকরের বউকে শায়েস্তা করার গোঁ আরো বাড়ে।

এই পুরুষের রাতের নিভৃত বাসনার মুহূর্তগুলিও কেমন নির্মম হিংস্র মনে হয় ভবানীর। জঠরে মদ ঢেলে বাসনার তাপ জুড়তে চেষ্টা করে প্রথম। এক-একসময় বিফল হয় যখন, তখনই শুধু কাছে আসে।

আর, আসে যখন ভবানীর ওপর দিয়ে একটা বড় রকমের ধকল যায়। নিষ্ঠুর জড় পেষণের মত লাগে। মায়ামমতাশূন্য পর-পুরুষ কবলিত মনে হয় নিজেকে।

বছর না ঘুরতে কেশরকর হঠাৎ চোখ বুজল। মহেশকরের বউ-শাসনের স্বাধীনতা আর একটু বাড়ল। এই করে আরো দুটো বছর কেটে গেল। স্বভাবের ধাত বদলায়নি কারো। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুজনেই কিছুটা শ্রান্ত।

দোলের দিন সেটা। এখানকার যোদ্ধা-বংশীয়রা এই দিনে ঘটা করে বীর-উৎসব করে। মহেশকরের বাড়িতেও এই বীর-উৎসব বহুকাল ধরে চলে আসছে। এ-সবে মহেশকরের উৎসাহ খুব। শিব পুজোতেও সে বীরের মতই শোণিত-সুরার অর্ঘ্য দেয়। মদের পাত্রে নিজের বাহু কেটে অনেকটাই রক্ত দিয়ে ফেলে। প্রথমবার তার রক্ত দেওয়া দেখে ভবানী ভিতরে ভিতরে একটু শঙ্কিত হয়েছিল।

হোলির সন্ধ্যায় অতিথি অভ্যাগতরা এসেছে মহেশকরের বাড়িতে বীর-পুজায় যোগ দিতে। একটু আগে মদ খেয়ে আগুনের চারদিকে নাচ-গান করেছে সকলে। মেয়ে পুরুষেরা আগুনের চারদিক ঘিরে বসেছে। এইবার মৃত বীর ব্যক্তিদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হবে, তাদের যশের কথা খ্যাতির কথা বীরত্বের কথা বলে বলে এই উৎসবে আবাহন করা হবে তাদের। বিশ্বাস, তাদের আত্মা আসে, এক-একসময় কোনো একটি আত্মা এসে ভরও করে পরিবারের বা অন্য কারো ওপর। ভর হলে মহা আনন্দের ব্যাপার। যার ওপর ভর হয়, সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার মুখ দিয়ে মৃত আত্মা তখন কথা বলে।

সকাল থেকেই ভবানীর শরীরটা অসুস্থ ছিল। সে-ও ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে আছে, থেকে থেকে ঝিমুনি আসছে।

মৃত আত্মার স্তুতি এবং আবাহনের মাঝামাঝি সময়ে দেখা গেল, সে হঠাৎ ঢলে পড়েছে। হাত পা ছুঁড়ে কার সঙ্গে যেন যুঝতে চেষ্টা করল একটু, তার পরেই জ্ঞান হারালো।

হকচকিয়ে গেল সকলেই। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। মৃত আত্মা রমণীর ওপর ভর করে এ-রকমটা শোনা নেই বড়।

সহসা চমকে উঠল সকলে। ভবানীবাঈ আস্তে আস্তে উঠে বসেছে। তার চোখমুখ স্বাভাবিক নয় খুব। উজ্জ্বল দুই চক্ষু মেলে সে চেয়ে আছে মহেশকরের দিকে।

আমি রাণীবাঈ এসেছি!

সকলে নির্বাক। মহেশকর বিমূঢ়, বিভ্রান্ত। এ-রকম কণ্ঠস্বরও যেন কেউ শোনেনি আর।

তেমনি স্থির স্পষ্ট স্বরে ভবানীবাঈয়ের মুখ দিয়ে রাণীবাঈ বলে যেতে লাগল, তার স্বামী বীর, বীর স্বামীর ভালবাসার টানে সে কোথাও যেতে পারছে না, সর্বদা পাশে পাশে ঘুরছে। আজ সপত্নীর আশ্রয়ে সে স্বামীর কাছে এসেছে—এসেছে কারণ স্বামী সর্বদাই তাকে স্মরণ করছে। এই আশ্রয় সে সহজে ছাড়বে না, স্বামীর মন বুঝে, দুঃখ-বেদনা বুঝে সে মাঝে মাঝে আসবে।

ভবানীবাঈয়ের দুচোখ আবার ঘোলাটে হয়ে আসতে লাগল। মাথা আবার ঢলে পড়ল।

ঘরের মেয়ে পুরুষেরা স্তব্ধ। মহেশকরের মুখে রক্ত নেই।

সকলে যখন চলে গেছে, সেই রাতে প্রথম স্ত্রীর সুশ্রূষায় বসেছে মহেশকর। পাখার বাতাস করছে, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ভবানীবাঈ চোখ মেলে তাকালো তার দিকে। মহেশকর মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছিস?

ভবানীবাঈ জবাব দিল না। ক্লান্ত দুই চোখ বুজে এলো আবার।

পরের ছ' সাত মাসে সত্যিই বার পাঁচেক রাণীবাঈয়ের ভর হল ভবানীবাঈয়ের ওপর। এবারে ভর যখন হয় তখন আর বাইরের লোক কেউ থাকে না, শুধু বাড়ির লোক থাকে। রাণীবাঈ কথা বলে মহেশকরের সঙ্গে। মহেশকর চেয়ে থাকে। শোনে। কথা বলে না।

দেখতে দেখতে মহেশকরের মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা গেল। স্ত্রীকে অর্থাৎ, ভবানীবাঈকে মার-ধর করা দূরে থাক, তার ওপর রাগ পর্যন্ত করে না। ভবানীবাঈ ইচ্ছে করে দোষ করলেও না। হাসে, স্ত্রীকে আদর করতে আসে। ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে চায় না বেশিক্ষণ। তার মুখের রুক্ষ, কঠিন ছাপটা যেন মুছে যাচ্ছে।

কিন্তু পরিবর্তন কিছু ভবানীবাঈয়েরও হয়েছে। বিপরীত পরিবর্তন। কারণে অকারণে তার মেজাজ চড়ে। মহেশকরের হাসি দেখলে তার গা জ্বলে, আদর করতে এলে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। সে তো জানে এত আদর সোহাগ ভালবাসা কার উদ্দেশ্যে। সে তো উপলক্ষ মাত্র। শুধু সে কেন, মহেশকরের এমন পরিবর্তনের কারণ বাইরের লোকেরাও জানে। রাণীবাঈয়ের ভর হবার পরে সকল বৃত্তান্ত অন্যেরাই ভবানীবাঈকে সাগ্রহে শুনিয়ে যায়।

ভবানীবাঈয়ের ভিতরে ভিতরে শুকনো টান ধরছে একটা। চোখ জ্বলে, মন জ্বলে, বুক জ্বলে। অসহ্য লাগে এক-একসময়।

আশ্বিনের দশরার দিন এলো।

এই দিনের দিবাভাগে পুরুষেরা ঘোড়া পূজা, অস্ত্র পূজা, শাস্ত্রগ্রন্থ পূজা করে। মহেশকরের এ-সব অনুষ্ঠানেও ত্রুটি নেই। সন্ধ্যায় স্ত্রীরা কপালে নতুন সিঁদুর দিয়ে, মাথায় আতপ চালের ডালা রেখে স্বামীকে আরতি করে। তারপর তাকে আদর করে বসিয়ে নারকেল বাতাসা খেতে দেয়। স্বামী রুপোর টাকা দেয় স্ত্রীকে।

সন্ধ্যায় মহেশকর ঘরে বসে আছে। কিছুর যেন প্রতীক্ষা করছে সে। অদূরে মেঝেতে ভবানীবাঈ বসে। রুক্ষ, কঠিন মূর্তি। লোকটা বসে আছে বলেই তার রাগ।

স্ত্রীর ভাবগতিক সুবিধের না ঠেকলেও মহেশকর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে বরণ করবি না...আরতি করবি না?

জবাবে ভবানীবাঈ শুধু দুই চোখে আগুন ছড়ালো এক পশলা।

মহেশকর আবার বলল, এত ভালবাসিস তুই আমাকে—আরতি করবি না? কর্ না...আমি রুপোর টাকা রেখেছি তোর জন্যে।

ভবানীবাঈ ঘোরালো চোখে তাকালো তার দিকে, বুকের আগুন মাথায় উঠছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, আমি তোমাকে একটুও ভালবাসি না, তোমাকে ভালবাসে রাণীবাঈ! বলতে বলতে হঠাৎ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে, একেবারে কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বসল। দিশেহারা ক্রোধে এত-দিনের সব জ্বালা যেন উদ্গিরণ করতে লাগল সে। মহেশকরের হাসি-মুখ ঝলসে দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, আমি তোমাকে একটুও ভালবাসি না, তুমি আকাট বোকা তাই ভাবো রাণীবাঈ আসে তোমার কাছে—তোমার কাছে কেউ আসে না, আমার ওপর কেউ কোনদিন ভর করেনি—কেউ ভর করে না—সব আমি ইচ্ছে করে করি, তোমার মত বোকাকে ভোলাবার জন্য আমিই সব করি—বুঝলে? আমি তোমাকে একটুও ভালবাসি না, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি—

আত্মঘাতী স্পর্ধাভরে ভবানীবাঈ চেয়ে রইল তার দিকে।

এইবার কি স্ত্রী-হত্যা ঘটে যাবে একটা!

কিন্তু পরমুহূর্তে ভবানীবাঈ হতভম্ব। ওই মুখে বিস্ময় বিরাগ ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। মুখের দিকে চেয়ে মহেশকর হাসছে। অনুরাগের ভরপুর হাসি।

বলল, আমি জানি আমার কাছে কেউ কখনো আসেনি—আসে না। এই করে শুধু তুই-ই আসিস। আমাকে যদি ভালই না বাসবি তাহলে নিজেকে খুইয়ে রাণীবাঈ হয়েও আমাকে পেতে চাস কেন তুই?

রাগ গেছে, ঘৃণা গেছে, ওই হাসিমুখের দিকে ভবানীবাঈ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে শুধু। দেখছে। চোখের কোণ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে, সর্বাঙ্গে কি এক অজ্ঞাত শিহরণ অনুভব করছে। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে ঘর ছেড়ে ভাঁড়ারের দিকে ছুটল সে—বরণ-ডালা সাজাতে হবে।

আজ ভবানীবাঈ স্বামীর আরতি করবে।

# কবিতা

## দুটি কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

### অচেনা, আমাকে যারা চিঠি লেখো

অচেনা, আমাকে যারা চিঠি লেখো—অসুখী, তরুণী,
কবিতার কামড়ে অস্থির যুবা—না-পেয়ে উত্তর
লোকটা দাম্ভিক, ভাবো, কিংবা মানো নিজেদেরই ত্রুটি—

শোনো :
যাকে বলে 'ব্যস্ততা' তা নয় বাধা, অনিচ্ছাও নয়।
ফিরে-ফিরে পড়ি সব—উল্লিখিত, এবং না-বলা।
চিঠির প্রতিটি শব্দ
রুপোর টাকার মতো সুপ্রিয় নিক্কণে
গড়িয়ে-গড়িয়ে ধীরে জমা হয় আঁধার সিন্দুকে।

শোধ ক'রে দিতে চাই।
তোমাদের ঋণী আমি, মাঝে-মাঝে মনে পড়ে।
মাঝে-মাঝে,
যখন প্রকাণ্ড হ'য়ে রাত্রি নামে,
আমি দেখি অন্ধকারে দূরে-দূরে তোমাদের জানালায় আলো
বাঁকুড়ায়, গৌহাটিতে, বরিশালে।
তোমরা যে আছো,
এবং আমিও আছি সেই সঙ্গে,
এই তথ্য হঠাৎ ঝিঁঝিঁ'র মতো বেজে উঠে
সব শব্দ স্তব্ধ ক'রে দেয়।

কিন্তু—কী বলার আছে?
সে-রুপো গালিয়ে কোন মূর্তি হবে গড়া?
যে-আমি দাঁড়াতে গেলে প'ড়ে যাই,
প'ড়ে গেলে, অনেক উঁচুতে উঠি,
অনেক চেষ্টায় বহু পথ ছুটে
যা ধরি, তা তখনই ধুলোয় ফেলি—
যে-আমি দু-একবার পাতালে সেঁধিয়ে
শুনেছি সবুজ রক্ত গাছের শিরায়—
তার হাতে পরিচ্ছন্ন পুতুল কি হবে গড়া?
তার মনে 'অথবা' 'কিন্তু'র চাপে কথার সুযোগ কতটুকু?

সেইজন্যে, কিছুই বলার নেই।
বড়ো শক্ত কাজ, এই বেঁচে থাকা।

### প্রেমে-পড়া পুরুষের গান

এখন, আমার মধ্যে, ঢুকে পড়ে সমস্ত পৃথিবী :
উঁচু বাড়ি, লোকজন, মহিলার গন্ধে ভরা বস্ত্রালয়,
খাটুনি, ঝগড়াঝাঁটি, রকের খিস্তিতে ক্ষিপ্র বখা ছেলে,
আর যারা মন্দিরের আঁধারে অজ্ঞান।

রাত্তির বারোটা বেজে গেলে
আমাকে নিষ্ফল ফুঁড়ে হঠাৎ চীৎকার উঠে ডুবে যায়।
আমাকে মাড়িয়ে চলে হাজার সিঁড়িতে নামা-ওঠা।

সেই খোঁড়া ভিখিরি মেয়েটা
আমার স্নায়ুর ফিতে ছিঁড়ে নিয়ে, চুল বাঁধে সরল আহ্লাদে।
বেশ্যাদের ভাঙা গলা
আমার অক্ষম কানে তোলে শঙ্খনাদ।

পশুরাও চ'লে আসে, হামা দিয়ে, কুঁকড়ে বসে ঘেঁষাঘেঁষি,
যেন খুঁজে পেয়ে গেছে বেওয়ারিশ মৌলিক পোর্টিকো।
গাড়ি-টানা প্রকাণ্ড মহিষ তার
ক্লান্তির গালিচা পেতে তৃপ্ত হয়,
নেড়ি কুত্তা চারু চোখে কথা বলে।

আসে দূর, উপত্যকা, অরণ্য, প্রান্তর,
পথ, যান, সেতু,
শৃঙ্গে-শৃঙ্গে টেলিগ্রাফ-তারে
ছন্দ তুলে ব'য়ে যায় পর্বতের বিরাট বাতাস।

সব স্বস্থ,
সব স্থির, নিশ্চিত, অটুট,
রচিত নাটকে গাঁথা ঘটনার মতো :
শুধু আমি
হ'য়ে গেছি, স্রোত, গতি, নিঃসরণ—
অফুরান, হাঁ-খোলা, রক্তিম,
অচিকিৎস্য সংক্রমণে অবিরল স্রাবময় এক
ক্ষত।

## কালো পাহাড়

অজিত দত্ত

এই অন্ধকারে এসো না।
এ-অন্ধকার পাথরের মতো কঠিন।
অনেক আলোতে অবগাহন করে,
অনেক বর্ণের স্রোতে সাঁতার কেটে
তবেই আমি এই অন্ধকারে পেঁছুতে পেরেছি।

এ-অন্ধকারে এসো না;
কারণ, এ-অন্ধকারের বায়ু তোমার নাসিকার ঘ্রাণ কেড়ে নেবে,
তুমি ফুলের সৌরভ পাবে না।
এ-অন্ধকারের বর্ষণ তোমার মুখের স্বাদ ধুয়ে দেবে,
শুধু তৃষ্ণা ছাড়া তোমার জিহ্বায় আর কিছুই থাকবে না।
তুমি দেখবে মহাশূন্যে নিশ্ছিদ্র মেঘের মতো স্তম্ভিত কৃষ্ণতা।
তুমি যা ছুঁতে চাইবে দেখবে তা তুমি নাগাল পাও না।

এ-অন্ধকারে এসো না।
অনেক সোনালি রোদ সাঁতরে আমি
এই নিষ্ঠুর কালো পাহাড়ে এসে পেঁছেছি।

তবু, তবু যদি তুমি কোনোদিন এখানে আসো,
যদি এসে পেঁছও,
তবে হয়তো তুমি দেখবে যে,
এই নিষ্ঠুর অন্ধকার, এই প্রবঞ্চক অন্ধকার,
তোমার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে
একটুখানি করুণা, একটু সান্ত্বনার কণা।

যদি তুমি কান পেতে থাকো,
যদি তুমি অনেক বিনিদ্র রাত্রি স্তব্ধ হয়ে থাকো,
তবে, হয়তো শুনতে পাবে একটা ক্ষীণ সুর,
একটা দূরাগত গানের অস্পষ্ট শেষ কলি।

আর তখন, শুধু তখনই তুমি
এই নিষ্ঠুর অন্ধকারকে ভালবাসবে।
কেবল তখনই তোমার মনে হবে,
অজস্র রোদের সোনালি রোদ ঠেলে
এতদূরে ভেসে আসা তোমার সার্থক হল॥

## চতুর্মুখ

বিষ্ণু দে

তোমার অশ্রুর প্রান্তে হাসে
মহাসমুদ্রের নীলে শান্ত তটরেখা,
ঘরপোড়া মানুষের ঝড়েভাঙা জাহাজের অন্তরীণ নিশ্চিত আশ্রয়।
তোমার চোখের ক্লান্ত রাত্রির আকাশে
দূর সূর্য থেকে দেখা পল্লবিত বনরাজিনীলা
জীবনের হেমন্তে তন্দ্রায়।

তোমার চোখের উচ্চে প্রখর কৈলাসে,—
বহুদিন ছিল এক সাধ
বিশ্বজ্বালা বিরাট হিমের যজ্ঞে
মেলে রাখি সমস্ত হৃদয়
অগ্নিময় শতদলে,
তোমার বিস্মিত পক্ষ্মে, চোখের মণিতে
যেখানে দাহই শান্তি, অতনু আকাশে
নিত্যের যেখানে মুহূর্তের মরণেই জয়।

তুমি দিলে হাতে তুলে দানের আপন লাস্যে
সেই পারিজাত,
তোমার সন্ত্রস্ত ধ্যানে একদা যে ফুলে
তোমাকে অভয় হেনে তুষারবিদারী হাস্যে
দেবদারু বনে চ'লে গেল ক্ষিপ্র পার্বত্য কিরাত।
আবার তোমাকে সেই ফুল দিই,
এক ঝাঁক অরণ্যের অন্ধকার বাঁধো,
কবরীচূড়ায় বাঁধো পারিজাত, স্মিতহাস্যে বক্ষে বক্ষে দুলে।

বহুদিন মনে ছিল সাধ,
রাত্রিগুলি খুলে দিই অপার অগাধ
তরঙ্গিত-নীলে নীলে, বিশ্বময় সমস্ত জাহাজ
স্বাধীন স্বপ্নের মতো অন্ধকারে স্বচ্ছন্দ, অবাধ।
আর, দিনগুলি সূর্যোদয়ে মেলাই বন্দরে,
শান্ত স্থির স্তব্ধ তটদেশে উদ্যানছায়ায়
মাল্লাদের প্রতীক্ষিত ঘরে।
তোমার দুবাহু ঘিরে মনে হয় আজ
পূর্ণ হবে সাধ॥

## মৃত্যুত্তীর্ণ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কী যে ভয়ানক
কালো চোখ, কালো চুল, ত্বক
সম্বিতের অন্ধকারে — প্রেমে!
মনের শিখর হতে উজ্জ্বলতা অন্ধকারে নেমে
নিকট অরণ্যে পায় লোলুপ শ্বাপদ।
দিনরাত্রি মূর্ছাহত, নয় নিরাপদ
সেই মৃত্যুগ্রাসে।

যে গহ্বর চুল-চোখ-ত্বকের আভাসে
তা থেকে উত্তীর্ণ আমি, আরোহণ করছি শিখরে।

অগ্নিশুদ্ধ ভোরে
নচিকেতা, পাব আমি শরীরের অন্য এক মানে—
প্রেম নয়, অশরীরী প্রমা, আছি সেই অভিজ্ঞানে॥

## মহা তান্ত্রিক

দিনেশ দাস

মহাশ্মশানে একা মহাকাল জাগে,
কালের ঘড়ি এখানে স্তব্ধ!
চতুর্দিকে সাদা কয়েদবেলের মত নরকপাল
মাঝখানে শ্মশানচারী মহাতান্ত্রিক :
সম্মুখে তাঁর করোটির পানপাত্র
হাতে তাঁর এক অদ্ভুত বীণাযন্ত্র
শবের অস্থিতে নির্মিত,
বীণার তন্ত্রীগুলি প্রস্তুত মানুষের শুষ্ক নাড়ীতে।

মহাতান্ত্রিকের আশ্চর্য বীণা এবার ধ্বনিত হ'য়ে উঠল
মনে হয়, সেই সুরে
মৃতের নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চিত সমস্ত সুর প্রতিধ্বনিত।

ওই তান্ত্রিকের মতই যদি
আমার হাতে ভাষার মৃত শব্দগুলো
জীবিত হ'য়ে উঠত সুরে
প্রাণিত হ'য়ে উঠত লয়ে!

## দীঘায়

উমা দেবী

এদিকে ঝাউ-এর বীথি ওদিকে আকাশ অনিবার
মধ্যস্থলে মহানদ-সমুদ্র সঙ্গম।
এতক্ষণ এই ছিল চোখে যতক্ষণ
এক খণ্ড কালো মেঘ ছোঁয়নি গগন।
এতক্ষণ স্বপ্ন ছিল মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে।

ভিজে বালি নরম শীতল,
ঝাউবনে পবনে পবনে এক প্রমত্ত মর্মর,
সুনীল আকাশে ভেসে ভেসে
ক্রমশ মিলিয়ে গেল রৌদ্রের পাখীরা
পশ্চিমের দিগন্তসীমায়।
সুদৃশ্য সুন্দর পরিবেশ,
ওর মধ্যে মৃত্যু কি সুন্দর!
মৃত্যু কি সুন্দর—এই চিন্তা নিরন্তর
উঠেছিল মনে মনে।

ঠিক সেই ক্ষণে, যেন মন্ত্রমোহে
সমুদ্রের তল কেটে দেখা দিল তাম্রবর্ণ জ্বলন্ত
দিগন্তের সীমা ছুঁয়ে মধ্যাকাশ পর্যন্ত ছড়াল
মৃত্যুনীল-অগ্নিময় শিরাজাল তার।
আক্রোশে চীৎকারে
ভেঙে গেল মেঘদল দরদর বৃষ্টির ধারায়,
সমুদ্র অশান্ত হল।
ক্রমে ক্রমে জল বেড়ে বেড়ে
ভরে গেল বালুতীরে ছোটখাট জলাশয় যত।

তারপর—
ঘন ঘন বিদ্যুতের অগ্নিময় বৃশ্চিকদংশনে,
বজ্রের প্রমত্ত নাদে, সমুদ্রের তরঙ্গবিক্ষোভে,
যখন চেতনা হলো—
তখন—তখন—আর ফেরার উপায় কোনো নাই :
তবু দ্রুত ধাবমান পায়ের তলায়
ক্রমে অপস্রিয়মান বেলাবালুকায়
স্খলমান জীবনের নিশ্চিত শঙ্কায়
মনে হলো—"মৃত্যু ভয়ঙ্কর।"
অশ্রুপূর্ণ জীবনের লবণাক্ত স্বাদ—
সেও স্বাদু—সমুদ্রের তলস্পর্শী মৃত্যুর অগাধ—
মনোহর—তবু ভয়ঙ্কর।

## আহ্বান

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আবার আহ্বান আসে, জ্বলে শুধু নক্ষত্রের বাতি
আমার কামনাগুলি আকাশগঙ্গার নিয়তি
নিয়ে
অন্ধকার-অন্ধকার দিয়ে
হয়তো দেখবার শখ বারবার মিটিয়ে-মিটিয়ে
নতুন তারা'র হাত ধরে।
সে-তারা'র কক্ষপথে মনে হয় যেন ধরা পড়ে
কার মুখ। স্বেদবিন্দু কপালে-কপোলে
ঠোঁটে ক্লান্ত রিক্ত ম্লান হাসি ঢেউ তোলে
অতীত ও বর্তমান। ধাবমান কালে
কেন বারবার রেখা আঁকা হয়?
এ-কার নিয়তি দেখি? এ-কোন্ বিস্ময়?

নতুন তারার হাত ধরে
অন্ধকার অবাক প্রহরে
আবার আহ্বান শুনি।
একি শব্দ, একি গান, কার পদধ্বনি?

## জীবন কথা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীর থেকে চুপ-কথা সব হঠাৎ জেগে উঠে
ছড়িয়ে গেলো সারা আকাশময়।
মন বলে—'না, আরো আছে; ও সব কথা নয়।'
একটি মেয়ে পাশেই ছিলো শুধাই ডেকে তাকে,
বললো হেসে—'অনেক কথা আমার বুকের গুপ্তপাড়ায় থাকে।
নাও না বেছে দু'একটাকে ইচ্ছে যদি হয়।'
বাছতে গিয়ে চমকে উঠি
কথা তো নয় দু'এক মুঠি
রক্তে-রাঙা হৃদয়-ভাঙা অবাক্‌বিস্ময়
ছড়ালো প্রাণময়।

ফুলের প্রাণে ঘুমিয়ে-থাকা রঙিন কথা আরো
প্রথম রোদের এক ঝলকে জাগিয়ে দিতে পারো।
দেখবে তাতে মন যা বলে, মিথ্যে কিছু নয়;
কথার শেষে অনেক কথাই চুপটি ক'রে রয়।
সে সব কথাই ঝিমোয় মাঠে ঝুরি-বটের ছায়ে
পাল তুলে বা পেরোয় নদী মন-পবনের নায়ে।

পাহাড় থেকে মস্ত কথা পাথর যেন ভারী
গড়িয়ে এসে ধাক্কাখানা দিলো যে এক তারি
আঘাত খেয়ে বুক ভেঙেছে
তাকেই তবু মন মেনেছে
সামলে গেছি তাকে ক'রেই ভর।
সমস্তদিন আঘাত নিয়ে বুক কাঁপে থরথর।
সমস্তদিন বুক থেকে যে রক্ত ঝরে দারুণ আঘাত লেগে
সমস্তদিন জল ঝরে যে কান্না-ভরা আগুন-রাঙা মেঘে
সমস্তদিন ব্যাকুল বাতাস বইছে খর বেগে।
সমস্তদিন প্লাবন-আনা বাদল ঝর ঝর।
আধেক কথা পাথর হয়ে বাজ হেনেছে বুকে
বাকি আধেক পথ হারালো কোথা?

হাসির মতো রোদ এলো যে সলাজ লঘু পায়ে,
বললো—'আরে, কিমাশ্চর্য, জানতে পারোনি তা'?
বর্ণ-চোরা কাছেই থাকে, লুকিয়ে থাকে বটে,
হয়তো বা তা অনেক সময় ভিন্ন নামে রটে।
হাসির সাজে আরেক আধা সাজিয়ে রাখি আমি
দুই আধাতেই জীবন আছে পূর্ণ দিনযামী।'

## অ্যালবামে ভুবনেশ্বর

হরপ্রসাদ মিত্র

বিকেলের শেষ আলো নিভে গিয়ে নক্ষত্র জ্বলবার
অনন্য সন্ধিতে এসে,—
চত্বরে দাঁড়িয়ে সেদিন
দেখলুম মন্দির,—তার উত্তুঙ্গ খাড়াই,
পাথরের ঘট ছুঁয়ে লতিয়েছে সপ্তর্ষিলতিকা।
অদ্ভুত জ্যোতিতে দীপ্ত স্তব্ধ রূপ,
অন্ধকার পট।
যা পায় দর্শক—
সে কি কোনোকালে ভাষায় ধরবার?

অন্ধকার অন্তহীন
মনে হোলো আদিম জননী।
সময়ের বাঁধে বাঁধা হ্রদ, কিংবা অন্য কী যে,—কী যে—
চত্বরে দাঁড়িয়ে সেই মন্দিরের বিশাল খাড়াই
মনে হোলো মিশে গেছে জীবনের আদিম মাটিতে!

সেই স্তূপ
স্তব্ধের গম্ভীর রূপ!

তারপরে, এই লোকালয়ে—
চঞ্চল দুচোখে তাকে দেখি বৃথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।
নিখুঁৎ রেখায়, খাঁজে, কলসে কোথাও সে যে নেই।
অন্ধকার সে-আকাশ চিরকাল ক্যামেরা-লাজুক।

## অপেক্ষা

শান্তিকুমার ঘোষ

ফুলেল বাতাসে কিছু আছে সম্মোহন :
গোলাপী শহর সাজে সান্ধ্য অভিসারে;
প্রণালীর জলে নৌকা, নৌকায় গায়ক।

আসবে দিয়েছে কথা পুলের উপর
উড়ন্ত আঁচলে রাত্রি নক্ষত্র ছড়িয়ে।
আরণ্য আমার বাহু আদিম সম্মানে
মদির লোভন তাকে
নেবে ঢেউ-আন্দোলিত নৌকার জগতে॥

## চতুর্দিকে তাকালাম

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

নিরানন্দ দৃশ্যপটে কে আবার আমাকে জাগায়
যখন মুমূর্ষু চিত্ত গুহাশ্রিত ভীষণ আঁধারে
পুড়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ যাতনায়। শোচনীয় ব্যর্থতায়
যখন নাগর মূক, নায়িকাও নিজ গর্ভাধারে
গোপন প্রেমের ক্ষুধা বাড়ছে নানা রক্ত উপাদানে
টের পেয়ে বিষাদ-প্রতিমা। এবং হৃদয়তাপে
শহরের মূর্তিগুলো মূক-বধিরের মতো কানে
কিছুই শোনে না কিংবা ফাল্গুনে পাতারা যদি কাঁপে
ছায়ালীন মগ্ন হতে কখনো পারে না। রক্ত ঠোঁটে

দাঁতে দাঁত চেপে যতো ঋতুর কম্পন অনায়াসে
হেঁটে যায় পাতালের দিকে। অন্তত পার্থিব টানে
নিশ্চিহ্ন নূপুরধ্বনি, রৌদ্র জ্যোৎস্না নক্ষত্রের দেশে
মাতাল তরণী নিয়ে কেউ আর আবক্ষ উজানে
যাচ্ছে না ইদানীং। তাই আমি অস্থির বিস্ময়ে

চতুর্দিকে তাকালাম বিকেলের রৌদ্রের স্বচ্ছতা
যখন নারীর মতো প্রতিভাত সমস্ত শহরে
এবং প্রস্তরমূর্তি, টবে শাদা লাল ফুলগুলি
সূর্যের চুম্বনে ভোলে মানবিক হিংসার রুদ্রতা॥

## ধ্যানে স্থির হও

রাম বসু

অতঃপর, কোথায় এবার
এবার কোথায় যাবো?

নিরীশ্বর, যারা
মানুষীর অহংকারে
প্রেমের কস্তুরী বিশ্বে চিরকাল হতে চেয়েছিল
কোন্‌দিকে যাবে তারা?

ধ্রুপদী নায়িকা সব উপকথা আজ
কেউ অগ্নি, কেউ পাতালের নীচে
লোকশ্রুত নদী
তাদের নির্জন মুখ আমাদের স্মরণ হানে না।

বৃষ্টির একটু পরে ফুটপাতে, জলে
পুষ্পিত নগ্নতা দেখে স্থির আকাশের
পথের কুকুর, আহা, অপরূপ কেঁদে উঠেছিল।

আমরা ব্যর্থতা কান্না যত্ন করে বিদ্রূপে সাজাই
জন্তুর মতন শুদ্ধ আর্তনাদ, আর
পতঙ্গের সহজাত সঙ্গীত রচনা সাধ্যাতীত
তাই, অতঃপর কোথায়, কোথায়?

পার্ক স্ট্রীটে অজস্র বকুল ঝরে আছে, ঝরে আছে
পায়ের তলায় তারা পিষে, দলে, পচে, একদিন
পৃথিবীর অন্ধকার উর্বরতা হবে।

ততদিন শূন্যে জাল বুনে' বুনে' ধ্যানে স্থির হও।

## সমুদ্রে নগরে অথবা।

কৃষ্ণ ধর

সমুদ্রে নগরে অথবা চিহ্নিত কোনো পথে তাকে
বিভোর শিল্পীর মতো অনেকে দেখেছে বহুদিন।
অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরে ফিরে কখনো আপনাকে
প্রসিদ্ধ কোলাহলে হারায়ে ফেলেনি, অন্তরীণ
করেনি নিজের হৃদয়, ব্যবসায়ী তীক্ষ্ণতা ছিল না
তথাপি একটি কার্যে ছিল তার নিজস্ব প্রতিভা।

বিনিময় করেনি সে ভালবাসা, আশ্চর্য তুলনা
দেয়নি কাহারো সঙ্গে বহুতর সৌন্দর্য অথবা
চোখের চাতুর্য কিছুই আকৃষ্ট করেনি, নির্বাক
থেকেছে সে কলরবে, জনশ্রুতি না শোনার ভান
করে গেছে, প্রথামত সুবিনয় দেখিয়ে অবাক
করেনি মজলিস, শোনেনি মুগ্ধ চিত্তে কারো গান।

এই অপরাধে মানুষেরা তাকে ভেবেছে অভদ্র বটে
যেহেতু তাহার হৃদয় পাতা ছিল সমুদ্রের তটে।

## চিরসাথী প্রেমের লীলায়

হরেন্দ্রনাথ সিংহ

মনে আশা ভালবাসা দিলে যদি প্রাণে—
প্রণয় ঐশ্বর্য রত্ন জীবনের দান,
কেমনে মর্যাদা রাখি এ মহা সম্মান;
মোহ মায়া মরীচিকা মুগ্ধ দৃষ্টি হানে
রঙীন খেলানা দিয়ে বাসনা প্রদানে—
ছলনায় করে কত ভালবাসা ভান,
দাও শক্তি প্রেম ভক্তি কর ভাগ্যবান,
রব তব নয়নের রহস্য সন্ধানে।

সাধনা পূজায় মগ্ন দীপ্ত তনুখানি,
নিভৃতে রাখিও কাছে জীবনে মরণে।
জ্যোতির্ময়ী মহাবিদ্যা তুমি যে কল্যাণী,
মুক্তির বন্ধনে হিয়া স্মরণে চরণে।

সান্নিধ্য সুধায় স্নিগ্ধ ছায়ায় কায়ায়,
পূজার মূরতি চির প্রেমের লীলায়।

## ভয়াবহ মোচড়ে

মৃগাঙ্ক রায়

এখনো সেই প্রবল হাওয়া আসে নি;
শুধু উত্তর পশ্চিমের কোণে
বাঘের ভরাট গর্জনের মত মেঘ জমেছে,
শেয়াল ডাকছে, ভাঁটার টান ধরেছে গঙ্গায়,
বায়সী অন্ধকারের নিচে
ভেজা বালি থেকে চাপা আলো উঠছে।

এখনো সেই আকাশজোড়া হাওয়া আসে নি?
এপারে চিতা জ্বলছে, সদ্য লাফিয়ে উঠেছে
আগুনের শিখাগুলো, ধোঁয়া পাক খাচ্ছে,
ঢোল বাজছে, খোল করতাল ঢাক বাজছে।

হাওয়া আসবে, প্রবল হাওয়া আসবে;
গাছ ভেঙে পড়বে, হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে
শেয়ালের ডাক। তুমি চিতা থেকে উঠে
ঘোমটা টানবে। তোমার গল্পের
এক ভয়াবহ মোচড়ে দাঁড়িয়ে
বিস্মিত হবে রাজীব, ভেজা বালির মত
চাপা আলো উঠবে চোখে॥

## আড়াল

সুনীলকুমার নন্দী

নিশীথ হাওয়ায় ডাক দিয়ে যাও, বুঝতে আসো না
এগিয়ে যেতে লতাপাতা জড়ায় এসে পা—

খুলতে খুলতে ফুরায় বুঝি তোমার অবসর...
এখন আমি কী নিয়ে রই, দুয়ার খোলা ঘর
হা হা করে... টিলায় টিলায় নিশীথ ডাকা স্বর।

ডাক দিয়ে যাও, বাইরে আসা সাঙ্গ হলো না—
দুদিক দুজন... খুঁজতে গেলে প্রান্তসীমানা
আড়াল ফেলে লতাপাতায় বিপুল আঙিনা...

আয় নেমে আয় লতাপাতা ঘরের মুখে আয়।

## তীর্থযাত্রী

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

মা আমাকে নিয়ে একদিন, হাত ধ'রে,
গিরিবর্ত্মের মতো এই বাঁক পার ক'রে দিয়েছিল;
ক্ষুধার্ত পথ, পথের দুরূহ প্রান্ত;
কাঁকন-খোয়ানো কালো এই গলি, দস্যুঅধ্যুষিত
ফাটল-স্ফারিত প্রকাণ্ড ময়দান
হাত ধ'রে পার করেছিল একদিন।

মাকে আমি আজ হাত ধ'রে ধ'রে এ পথ করাবো পার,
মা আজ আমার শিশু,
সতর্ক হাতে ঢাকি দুয়েকটি রুপালি চুলের গুছি,
আপাতত এই ক্ষুধিত পথের ক্ষুরধার চক্রান্ত
কামক্রোধমোহমোহান্তব্যবসায়ী
পার হয়ে যাই, মা কিছু জানে না, মা আজ আমার শিশু॥

## চন্দ্রালোক গীতিকা

তরুণ সান্যাল

খানিক যেন ভালোলাগার স্পর্শ ছিল
কি ছিল ঐ হাতের পিঠে, কিংবা নিচে
বিশাল নীলে হাতের তালু উলটে রাখা :
দশ আঙুলের ফাঁকে গড়ায় আপন বীজে
নিজেই যেন আপনাকে সেচ, তারায় আঁকা
নীলিম আঁচল আলোর ফোঁটায় ফোঁটায় ভিজে

এখন আছি কোন পাহাড়ের গুহার তলে
কালো পাথর, পরুষ পাথর আমায় দেখে
নিজেই নিজের ঘাতক এবং খড়্গ হতে,
চুঁইয়ে নামে শব্দ, চূর্ণ ঘূর্ণি বেঁকে
প্লাবনে যায়, ধাবনে যায় আপন জলে
শিউরে ফাটায় বরফ বুকের সে পর্বতে

কত যে পাখি, কত যে মাছ আকাশে জলে
দেবদূতেরা স্বচ্ছ ডানায় নাইতে আসে
কে অপ্সরী নগ্নত্বকে মেঝের খাটে
হাজার হাসির জ্যোৎস্নাছলাৎ চুড়ায় ভাসে
...শায়িত আছি পত্রছায়ায় বৃক্ষতলে
করোটি তলে জ্যোৎস্নাপায়ী রাত্রি হাঁটে

কালো ঘোড়াটি অন্ধকার, কোথায় যায়
কেবল ছোটে, হাজার বর্শাফলক মেঘে...
কেবল ছোটে, পিঠে পিছল চাঁদের ছোরা,
কপালে গোল শাদাটি যেন স্পর্শ লেগে
সারা আকাশে শাদাকালোয় হারাতে চায়.....
কবিতা ফাটে ক্ষুরের ঘসায়, আঁধার ঘোড়া
পুচ্ছে জ্যোৎস্না প্লাবন ধাবন জড়াতে যায়॥

## কেউ একজন

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

আসুক আকাশ অন্ধ আবেগে আকুল ক'রে
আমার মনের কাণায় কাণায় পুলক-জ্যোৎস্না
ভাসছে এখন; ভাঙা-ভাঙা মেঘ আড়ালে সরে
এক্ষুনি যাবে। অল্পেই মন অধীর হোস্ না।

এই ছায়া আর এই আলোকের মান-অভিমান,
মালা-বদলের পালা,—শরতের খুশীর ঝলক
ক্ষণ-পূর্ণিমা, এই থৈ থৈ ভাসানের গান—
যত দেখি-শুনি, অবাক দু'চোখে পড়ে না পলক।

অলক্ষ্যে এরা করে যে হৃদয় হরণ আমার,
অঙ্গে অঙ্গে কে যেন আমার বাজায় বাঁশি,
একা একা চাঁদ মেঘের আড়ালে খেয়া হয় পার
রজত-গিরির চূড়ায় ছড়িয়ে জ্যোৎস্না-রাশি।

ভেবে দেখ্ সেই শোকাকুল রাত, দৃশ্যান্তের—
দিশেহারা মন যখন অকূল আকাশে উড়তো,
ভেবেছিলি পাবি স্পর্শ দু'খানি উষ্ণ হাতের?
রুদ্ধ আবেগে বুকে জড়াবার এই মুহূর্ত!

তাই বলি মন আসলে কিছুই কিছু না, এ-সব
জীবন-নাট্য গড়ার খাতিরে, যেমন ইচ্ছে
হাসিয়ে-কাঁদিয়ে, খাইয়ে অমৃত, তিক্ত-আসব,
কেউ একজন আমাদের যেন নাচিয়ে নিচ্ছে।

## অশোক মঞ্জরী

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

আর্তনাদ এনে দিলে শান্তির ভিতর।
এই সব ঘটে গেল চরিত্রের দোষে...
পৃথিবীতে কতবার মেঘ করে, অশোকমঞ্জরী
কতবার কেঁপে ওঠে দুয়ারের কাছে
মানুষেরা ভুলে যায়। কয়েকটি নির্বোধ
অসহ্য স্মরণশক্তি নিয়ে বাস করে।

স্বভাবের মধ্যে সব প্রচণ্ড মশাল
অবিরাম নৃত্য করে, শিকারের তাজা
মাংসগুলি আগুনের লোভনীয় তাপে
সিদ্ধ হয়; চন্দ্রালোক উষ্ণ ডালিমের
রসের মতোন ঝরে, বিপুল চিৎকার
হ'তে থাকে হৃদয়ের বনভোজনের।

পৃথিবীতে বাস ক'রে নিতান্ত বধির
থাকে না কেহই; লাল অশোকমঞ্জরী
দুয়ারে হঠাৎ মৃদু কথা বলে যায়,
এত মৃদু কথা, তারে ছায়া মনে হয়।
মানুষেরা ভুলে যায়; এসব ক্ষণিক
দৃশ্যে ডোবে না কেউ। কয়েকটি নির্বোধ
অসহ্য স্মরণশক্তি নিয়ে বাস করে।

## মানসী

অনিল ভট্টাচার্য

আমার মনের সকল মাধুরী দিয়ে
গড়েছি এ তনুখানি
সারা বিশ্বের সুষমা আনিয়া
সাজায়েছি রূপ-রাণী॥

আমার মোহন রূপ-তুলিকায়
শত চাঁদ আনি দিছি তব পায়
অন্তর ভরি প্রেম দিয়েছি গো
প্রিয় সখী হে পাষাণী॥

মর্মরে গড়া হে মোর মানসী
স্বর্গ-সভার তুমি উর্বশী—
তোমারি নীরব নূপুর ছন্দে
বাজে মনোবীণা প্রেম আনন্দে
আয়ি লাবণ্যে তোমারি লীলায়
রাঙিল পরাণখানি॥

## প্রেমিকা আমার

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

আয়নায় অনেক বড়ো মুখ রেখে স'রে যাও; দেখি
আমার যা কিছু প্রিয়, মৃত্যুর গভীর দেহভার।
আমি জানি, লাল-রঙা যৌতুক এখন
কোথাও বিকিয়ে যাবে স্থির সত্যে, গোধূলি বেলায়।
কোথাও এখন কারো মৃত্যু হবে, হ'লে
ঝড়ে উল্টে যাওয়া মুখ, গোঙানি-নির্ভর, নত কেহ
প্রতীক্ষায় নিভে যেতে যেতে.....কোনো দিন
সমুদ্রে যাবে কি।

এখন সাবেক ব'লে মনে হয়, ঐ খোলা চুলে
যা বলে বাতাস, আমি সেই সব যথার্থ ভাষণ
ভুলিনি কখনো; তবু চিহ্নহীন, প্রেমিকা আমার
ফেরাইনি কোনো রৌদ্রশোভিত কানন এই করে।
উদ্ধারে শ্যামল, দৃপ্ত, গম্ভীর তরঙ্গরব কেন
এই বক্ষ চিরে আজ পারে না শোণিতে মিশে যেতে।

বহুদূর থেকে দেখা যায়, অববাহিকা নিকটে
দিয়েছি পিপাসা মেলে, সমগ্র প্রহরগুলি একা;
বালিকার মতো জেগে আছে জ্যোৎস্নাতীর।
জ্যোৎস্নায় এখন মৃত্যু হ'লে, হায়
জন্ম হ'লে ফের—দিকচিহ্নহীন প্রেমিকা আমার,
তোমাকে পাবো কি।

## জ্যোৎস্নায় সমুদ্রকূলে

শান্তি চট্টোপাধ্যায়

জ্যোৎস্নায় সমুদ্রকূলে হয় নিরাসক্ত রাহাজানি
নৌকাখানি—
বহে আনে যারা
তারা দেয় রত্নের পাহারা
সমুদ্রে, প্লাবনে অনিমেষ
শুধুমাত্র ভেসে যায়, ছেড়ে যায় সমুদ্রের দেশ।
এখন দ্বীপের মাঝে অনিমেষ খুলিয়াছে চোখ
এখানে পালক
পাখির মতন করে ওড়াউড়ি।
কতদিন ওড়ায়নি ঘুড়ি

কতদিন ধরেনি লাটাই
অনিমেষ চেয়ে দ্যাখে পুরাতন অনিমেষ নাই!
সে তো জ্যোৎস্নাসমুদ্রের কূলে
হয়তো উঠেছে ভারি ফুলে
হয়তো ঢেকেছে তারে বালি
কিংবা করতালি
নিরাসক্ত শিশু — করে খেলা
উপকূলে শুয়ে আছে অনিমেষ একান্ত একেলা।

## অস্থিরতা জমে

মণীন্দ্র রায়

অস্থিরতা জমছে ক্রমে ক্রমে
আবার যেন স্থিতির ভিত
টলছে অনিয়মে।
অন্ধকারে স্রোতের বেগ
যদিও আজ অনুল্লেখ,
পাড়ের মাটি ভোলে কি সেই
ক্ষণিক বিভ্রমে!

শান্তি নেই পুরনো ব্যবহারে,
যদিও সেই প্রাচীনা প্রেম
চাইছে আড়ে আড়ে।
ভালোবাসাও শূন্য, যদি
না ঘটে তার পরমাগতি—
বিদ্ধ ক'রে মর্মমূল
দেখে সারাৎসারে।

অস্থিরতা, কোথায় নিয়ে যাবি?
কোথায় তোর হৃদয়স্বসা,
একক অনুভাবী?
আদিম পিতা বুকের হাড়ে
ইচ্ছাকে তার গড়তে পারে।
আমরা যে আজ অন্ধ, বধির,
এবং অ-মেধাবী!

তবু এখন রক্তে এ কার শ্বাস?
আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষার
বিবাহে একি ত্রাস!
তৃষ্ণাতার সে সংরাগে
ধাতুপিণ্ডে মূর্তি জাগে।
অস্থিরতা, কোথায় নিবি?
সে কোন পরবাস!

না উঠতে পারে। লক্ষ্মীঠাকরুন সমুদ্র থেকে চুপিচুপি উঠে এসে ঝাঁপি উজাড় করে ঢেলে দিয়ে গেছেন। এত ফলন নইলে হয় না। ধান নয়, সোনা ঢেলে দিয়ে যান। প্রতি বছরই এমনি। এক সাগরচকই বিশাল সংসারের সমস্ত খরচ যোগান দেয়। সমস্ত কুলিয়ে তবু ধান বাড়তি থাকে। বড় আদরের চক—বছরের মধ্যে এগারো মাস চন্দ্রভানু এখানে পড়ে থাকেন। সদাসতর্ক, ভয় কিছুতে ঘোচে না। সন্তানের মধ্যে একটি ছেলে। সাগরচকও যেন আর-এক সন্তান। অবোলা সন্তানকে দুর্যোগের মধ্যে নদী-কূলে অসহায় ফেলে যাচ্ছেন—মনের কি অবস্থা মাঝিমাল্লারা বুঝবে কেমন করে?

বাঁধের ধারে চক্কোর দিয়ে ঘুরছেন। এক সময় সম্বিত হল, দেরি হয়ে গিয়েছে বড়। বিস্তর গোন নষ্ট হল। তখন মাঝির উপরে তাড়া ঃ ধেয়ে চলো। এই জোয়ারে আফরার খালে তুলে দিতে হবে। বুঝব ক্ষমতা। সেখান থেকে ভাটা ধরব। নইলে সারা রাত্তির ভোগান্তি।

কিন্তু মুখের তাড়ায় বোট ছোটে না। আফরার আগে থেকেই বেগোন। গুণ টেনে অনেক কষ্টে খালের মুখ অবধি পৌঁছানো গেল। খালে ঢোকা অসম্ভব। আর কি হবে, চাপান দাও তবে এখানে। রাঁধাবাড়া হোক।

চন্দ্রভানু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন চতুর্দিক। মোহনার উপর গোলপাতায় ছাউনির প্রকাণ্ড ঘর উঠেছে। অজগর জায়গায় ঘর তুলল কে এখানে?

মিত্তিরবাবুর খটি।

খটি এদ্দুর অবধি এসে গেছে? কোন জায়গা আর বাকি রাখবে না লালমোহন মিত্তির—ছাঁকনি দিয়ে পয়সা জল থেকে তুলছে।

ব্যাপার তাই বটে! কুচোচিংড়িকে এই অঞ্চলে বলে জলের পোকা। পোকার মতোই অজস্র। স্নানে নামলে ঠোক দিয়ে দিয়ে অস্থির করবে গায়ের তেল খাবার লোভে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তবে বাঁচোয়া। গামছা ছাঁকনি দিলে চিংড়ির ভারে সে গামছা টেনে তোলা দায়। চিংড়ি-ধরা একরকম ঘন জাল আছে, কিন্তু জেলে-মালোরা সে জাল বানাতে চায় না। কী হবে জলের পোকা মেরে, খদ্দের কোথা, পয়সা দিয়ে ও জিনিস কে কিনতে যাবে?

# মনোজ বসু

লালমোহন মিত্তির উত্তর অঞ্চলের মানুষ। তিনি এসে হাটে হাটে ঢোলশহরৎ দিলেন, যে যত কুচোচিংড়ি নিয়ে আসুক, উচিত দামে কিনে নেবেন তিনি। দরও একটা বেঁধে দিলেন। নতুন এক ব্যবসা ফেঁদেছেন—চিংড়ি শুকিয়ে বাইরে চালান দেওয়া। রোদে শুকানো হবে। এবং বাদার জঙ্গলে কাঠকুটোর অপ্রতুল নেই—রোদের অভাবে আগুনে শেঁকাও চলবে।

গাঙ-খালের বাঁকে বাঁকে কারখানা—চিংড়ি শুকিয়ে বস্তা-বন্দি হয় সেখানে, নৌকো বোঝাই হয়ে চালান যায়। এই কারখানাকে বলে খটি। শ' খানেক খটি বসে গেছে দেখতে দেখতে। অহোরাত্রি চিংড়ির নৌকোর চলাচল। জেলেরা অন্য মাছ ধরা ছেড়ে কুচোচিংড়ি ধরছে কেবল। খদ্দের খুঁজতে হয় না, যে কোন খটিতে মেপে দিলেই হাতে হাতে পয়সা। এত শুকনো চিংড়ি কারা খায় রে বাবা! নাম লালমোহন তো ক'টা বছরের মধ্যে সত্যি সত্যি তিনি লাল হয়ে গেলেন। অঞ্চলের মধ্যে ডাকসাইটে বড়লোক।

বড়লোক ডাক পড়ে গিয়ে কিন্তু বিপদ দেখা দিল। খটিতে খটিতে লঠেতরাজ। জেলেদের দাম মেটানোর জন্য নগদ টাকা-পয়সা মজুত রাখতে হয়, তার উপর মাল বিক্রির টাকা এসে

জমে। এতগুলো খটির সর্বত্র সব সময় কড়া পাহারার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। অঞ্চলের মানুষ তারা, তক্কে তক্কে থাকে। দেশি কামারের গড়া বন্দুক বল্লম শড়কি নিয়ে নদী-খালের গর্ভ থেকে অকস্মাৎ রে-রে করে এসে পড়ে, টাকায় থলি ছিনিয়ে নিয়ে চক্ষের পলকে নৌকো ছুটিয়ে দেয়। ধরিত্রীর শিরা-উপশিরার মতো নদী-খাল ছড়ানো।—নৌকো নিয়ে কোন খাল-দোখালার পথে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল, কোন রকম তার নিশানা মেলে না।

পুলিশকে যথারীতি জানিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বোট ও লঞ্চ নিয়ে দমারোহ করে জল-পুলিশ টহল দিয়ে বেড়ায়। ডাকাতরাও তেমনি ঘড়েল। পুলিশ এই দিকটায় তো ভিন্ন একদিকে পড়ে তারা কাজ সেরে পালাল। বড় বেশি গণ্ডগোল তো চুপচাপ রয়ে গেল কিছুদিন। লালমোহন চোখে অন্ধকার দেখছেন।

কারখানার ম্যানেজার ভক্তদাস। ধবধবে পোশাক এঁটে অফিসে বসে ফাইলে সই মেরে যাচ্ছেন, ভাঁটিঅঞ্চলের ম্যানেজার সে মানুষ নয়। নাম সই করতেই কলম ভাঙে, এমনি ম্যানেজার বহু। ভক্তদাস অতদূর নয় অবশ্য। সোনাছড়ি বন্দরে হেড অফিস—সবগুলো খটির যাবতীয় হিসাবপত্র মাস অন্তে সেখানে চলে যায়, জাবেদা খাতায় ভক্তদাস টুকে রাখে। লেখাপড়ার কাজ করে তক্ষুনি আবার চিংড়ির বস্তা ঘাড়ে নিয়ে নৌকোয় ফেলতে লাগল। এই ম্যানেজার। স্থানীয় লোক বলে ঘাঁতঘোঁত সমস্ত জানে। লালমোহনের দেখতে দেখতে এত উন্নতি, তার একটা কারণ ভক্তদাস হেন করিতকর্মা ম্যানেজারটি পেয়ে গেছেন।

ভক্তদাস বিরস মুখে ঘাড় নাড়ে : পুলিশে হবে না বাবু, পুলিশ কি করবে? ওরা হল গর্তের ইঁদুর। যমরাজই খুঁজে হদিস পান না—কোন একটা জোলো-ডাকাত মরতে শুনেছেন কখনো?

লালমোহন বললেন, তবে কি হবে ভক্তদাস? কাজ-কারবার তুলে দিতে বলো?

ভক্তদাস একটু ভেবে বলে, বেলডাঙার রায়বাড়ি গিয়ে ধরুন। ভাঁটি অঞ্চলে থেকে ও'দের শরণ না নিলে উপায় নেই। সকলের কাছে যেতে বলিনে, ছোটরায়কে বলুন। ঐ একজনেই হয়ে যাবে।

লালমোহন কিছু অবাক হয়ে বলেন, আমার জন্য ও'রা কি ডাকাত তাড়াতে যাবেন?

কিছু না। কোন মানুষ কি করছে ও'রা সব জানেন। মাতব্বর একটা-দুটোকে চোখ টিপে দেবেন—সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক ঠাণ্ডা।

গলা খাটো করে ভক্তদাস বলে, রায়েদের এককালে পেশা ছিল এই গাঙে-খালে নৌকা মেরে বেড়ানো। ছোটরায়ের বাপ রুদ্রভানু অবধি চলেছিল। সরকারের কড়াকড়ি বুঝে তিনিই শেষটা চকের বন্দোবস্ত নিয়ে চকদার হলেন। ছোটরায়কে টোলে পাঠালেন পণ্ডিত বানাতে। ছোটরায়ের ছেলেটা শুনি আরও ধুরন্ধর। বিদ্যের জাহাজ হয়েছে, বিদ্যের ধান্দায় দেশভুঁই ছেড়ে কলকাতা শহরে পড়ে থাকে। হাত-পা ধুয়ে রায়েরা এখন পুরোপুরি ভদ্দোরমানুষ—তা হলেও পুরানো খাতির যাবে কোথা? ডাকাতেরা সর্দারমান্য দেয় ও'দের। ছোটরায় আপনাকে পেয়ার করেন জানতে পারলে খটির পাঁচ-শ হাতের মধ্যে কোন মন্দ-নৌকা ভিড়বে না।

পুলিশের দৌড় বোঝা গেছে। ভক্তদাস যা বলছে, এই হল শেষ উপায়। রায়বাড়ি দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ আসে। অন্যান্য বার ভক্তদাস গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, এবারে লালমোহন নিজে যাবেন, নিজে গিয়ে চন্দ্রভানুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে আসবেন।

এই পুজোর মুখে রায়বাড়ির ছোট তরফে বিষম দুর্ঘটনা। ইন্দুমতী দোতলার সিঁড়ি দিয়ে পড়ে চোট খেলেন। শয্যাশায়ী অবস্থা। বিশাল সংসার, মানুষ কতগুলো হঠাৎ হিসাবে আসে না। সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব ঐ এক ইন্দুমতীর উপর। আঁচলে চাবির থোলো ঝুলিয়ে ছোটখাট মানুষটি সকাল থেকে রাতদুপুর অট্টালিকার একতলা-দোতলা ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছেন —কোন কিছু নজরে এড়ায় না। তবু তো চোখ একটি মাত্র, ডান-চোখ কানা। লোকজন তটস্থ—বাতাসের মতন নিঃশব্দপায়ে কখন এসে পড়েন। এমনিই সকলে বরাবর দেখে আসছে। সেই মানুষ দিনের পর দিন বিছানায় নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন। ইন্দুমতীকে বাদ দিয়ে এবারে দুর্গোৎসবের কাজকর্ম কেমন করে হবে, ভেবে পাওয়া যায় না।

গোবিন্দসুন্দরী সম্পর্কের হিসাবে নাকি পিশ-শাশুড়ি। কণ্ঠে কান্নার সুর এনে বলেন, অষ্টপ্রহর পাক দিয়ে বেড়াও বউ, তাতেই সব শাসনে থাকে। দেখাশুনো যতই করি, আমি তো তোমার সিকির সিকিও পেরে উঠব না।

ইন্দুমতী বলেন, ডাল বাছা হয়ে গেছে পিশিমা?

থতমত খেয়ে গোবিন্দসুন্দরী বলেন, হুঁ, তা একরকম—

হয়ে থাকে তো ধামা ধরে আনুন এখানে। আমার সামনে—চোখের উপর। ছোলার সঙ্গে মুসুরি কেমন করে মিশে যায় জানিনে। বিধবারা খাবেন। মুসুরি আমিষ, একটি দানা থাকলে চলবে না।

সত্যিই তো, সত্যিই তো—। বলে গোবিন্দসুন্দরী সরে পড়লেন। দরদ জানাতে এসে কী দুর্ভোগ!

অন্তরালে গিয়ে গর্জন করে ওঠেন : বয়ে গেছে, মাইনে-করা দাসীবাঁদী নাকি! কিছু করতে পারব না—যাও।

ডালের ধামা নিয়ে বসেছেন আবার। ক্ষীরোদা-ঝি'কে দেখে হাত নেড়ে ডাকলেন : ক্ষীরি, শুনে যা। বড্ড সর্বনাশ যে এদিকে—

কাছে নিয়ে এসে বলছেন, মুখ দিয়ে বের না করিস তো বলি। বউমার ব্যথাখানা সহজ নয়। হাড় চুরমার হয়ে মাংসে অবধি থেঁতলে গেছে। আর উঠতে হবে না, বিছানায় পড়ে চিঁ-চিঁ করা এবার থেকে। তেষ্টার এক ঢোক জল—দয়া হল তো কেউ এগিয়ে দেবে, নয় তো ছাতি ফেটে মরবে।

আক্রোশ মিটিয়ে বলছেন। একটা গুণ ক্ষীরোদার—এর কথা ওকে গিয়ে লাগায় না। নির্ভাবনায় তাই বলা যাচ্ছে। বলেন, ধর্ম সব দেখে রাখে। দেখেছে বলেই এত খোয়ার। গুরুজন আমি—একবাড়ি লোকের মধ্যে আমার বাক্স হাতড়ুল-পাতড়ুল করে রুপোর বাটি বের করল। রাত্তিরবেলা চোখে ঠাহর হয় না— রুপোর বাটি পিতলের বাটির তফাৎ ধরতে পারিনি। বলুরে ক্ষীরো, আমি বুঝি ইচ্ছে করে নিয়েছিলাম! তেমনি ঘরের বেটি আমি, তেমনি ঘরে বিয়ে হয়েছিল!

ক্ষীরো-ঝি জিজ্ঞাসা করছিল—রুপোর বাটি পিতলের বাটির কথা নয়, সে বৃত্তান্ত সকলে জানে, বাড়িসুদ্ধ হাসাহাসি হয়েছে তাই নিয়ে। বলতে যাচ্ছিল, অসুখের কথা গোবিন্দসুন্দরী আন্দাজি বলেছেন, না ধনঞ্জয় কবিরাজ বলেছে কিছু বিশেষ-ভাবে। কিন্তু বলবার আগে দুড়দাড় করে ছুটল দোতলায় ইন্দুমতীর ঘরে। বড় উঠানের অপর দিকে বিনোদের মা আর নকড়ি গোমস্তার কথাবার্তা—তা-ও কানে পৌঁছে গেছে। ইন্দুমতী হুংকার দিয়ে উঠলেন : কি নিয়ে ঝগড়া তোমাদের? আমার কাছে এসো বিনোদের মা। শুনি।

বিনোদের মা ভয়ে লজ্জায় এতটুকু। ঘরে ঢুকে মিনমিন করে বলে, ঝগড়া নয় মা। মশারি ছিঁড়ে গেছে, মশা আটকায় না। বিনোদকে নিয়ে সমস্ত রাত আলো জেবলে বসে ছিলাম। মশারি কবে আসবে, জিজ্ঞাসা করছিলাম গোমস্তামশায়কে?

মশারির কথা বলেছ তুমি কবে?

পরশুদিন।

ইন্দুমতী ভ্রূকুটি করলেন : দু-দুটো দিনের মধ্যে একখানা মশারি জোটে না? আমার সংসারের মানুষ আলো জেবলে বসে রাত কাটায়?

প্রশ্নটা ক্ষীরোদার দিকে তাকিয়ে। খাস-চাকরানিকে সকল কৈফিয়ত দিতে হবে। ক্ষীরো তাড়াতাড়ি বলে, হাটে লোক পাঠানো হয়েছিল। জালের মতন জিনিস দেখে আনে নিশা গঞ্জ থেকে কাল ভাল মশারি এনে দেবে।

ইন্দুমতী অধীর কণ্ঠে বলেন, গোড়াতেই কেন গঞ্জে পাঠানো হল না? গোমস্তা-মশায়কে জিজ্ঞাসা করবি। শুনতে চাই আমি জবাব।

বচসার মুখে বিনোদের মা-ও ঠিক এই কথাগুলো নকড়ি গোমস্তাকে বলছিল। অবস্থা বিবেচনায় সে এখন নকড়ির পক্ষ নিয়ে বলছে, হাটে মিলে যাবে, উনি ভেবেছিলেন। গঞ্জ অবধি যেতে হবে না। ভালো জিনিস আসেও তো কখনো-কখনো।

ইন্দুমতী লুফে নিয়ে বললেন, আমি জানি, জানি। দুটিকুপণ মানুষ—বারো গণ্ডা পয়সার জোলার মশারিতে যদি কাজ চলে যায়, গঞ্জে পাঠিয়ে খামোকা কেন দু-টাকা-আড়াই টাকা খরচ করতে যাবেন? যাও তুমি বিনোদের মা। দেখছি।

বিনোদের মাকে সরিয়ে দিয়ে ইন্দুমতী ক্ষীরোকে বললেন, আমার মশারি খুলে ওর বিছানায় টাঙিয়ে দিয়ে আয়।

স্তম্ভিত ক্ষীরোদা বলে, সে কি! আপনার শরীরের এই দশা মা—

মশারি থেকেও আমার ঘুম হয় না। কাল রাত্রে বিনোদের মা যা করেছে—আমার আজ তাই। আলো জ্বালা থাকবে, বসে বসে আমি রাত কাটাব। হাত-পা কোলে করে দাঁড়িয়ে রইলি যে—হুকুম মানবি নে? শুয়ে পড়ে আছি, কিন্তু বেঁচে রয়েছি আমি এখনো।

তাকিয়ে পড়লেন কর্ত্রীঠাকরুন। চোখের দৃষ্টি একনলা বন্দুকের বুলেট যেন। মশারি খুলতে ক্ষীরোদা দিশা পায় না।

অনতিপরে কবিরাজ এলেন। ধনঞ্জয় কবিরত্ন—লোকে বলে ধন্বন্তরি কবিরাজ। অসুখ লাগে না, হাতে ছুঁয়ে দিলেই রোগ নাকি ছুটে পালায়। সেই কবিরাজ গোড়া থেকে দেখছেন—কত মালিশ, অনুপান বদলে বদলে কত রকমের বটিকা। নিরাময়ের কোন লক্ষণ নেই। কবিরাজকে পেয়ে নিত্যি দিনের সেই প্রশ্ন : আর কত দিন কবিরাজমশায়? আমার সংসার যে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

কবিরাজ আজকের মানুষ নন। চন্দ্রভানুর বাপ রুদ্রভানুর যখন শেষ অবস্থা, এই ধনঞ্জয় তখন সূচিকাভরণ প্রয়োগ করলেন। বয়সে ছেলেমানুষ—সেই তখন থেকে রায়বাড়ি গতায়াত। আপন জনের অধিক হয়ে গেছেন।

ইন্দুমতী বলছেন, চোখের উপর ভূতের নৃত্য চলছে, সামান্য মশারির অভাবে লোকে ছেলে নিয়ে রাত জেগে কাটায়—শুয়ে শুয়ে আমায় এই সমস্ত দেখতে হয়। তাড়াতাড়ি সেরে দিন, নয়তো বিষ বড়ি-টড়ি খাইয়ে শেষ করে দিন একেবারে।

হাস্যমুখ ধনঞ্জয়ের। ছেলেমানুষের মুখে আগডুম-বাগডুম শুনছেন যেন।

অধীর কণ্ঠে ইন্দুমতী বলেন, আপনি বলেছিলেন পুজোর আগে সেরে উঠব।

সারবেনই তো।

পুজো যে এসে পড়ল। এক মাসও বোধ হয় নেই।

নির্বিকার কবিরাজ বলেন, আসুক না।

আমার কিন্তু মনে হয়, খারাপই হচ্ছে দিনকে দিন। পায়ের দিক থেকে ক্রমেই যেন অসাড় হয়ে আসছে।

ধনঞ্জয় উড়িয়ে দেন : ও কিছু নয়। অনেক দিন ধরে শয্যাশায়ী, অঙ্গের চালনা হয় না। সেইজন্যে অমন ঠেকে।

ইন্দুমতী কিছু ভরসা পেয়ে বলেন, এত বড় মচ্ছব সামনে। কিছুই গোছগাছ হয়নি। আমি পড়ে থেকে সমস্ত মাটি। আগেকার বলশক্তি পাবো তো আবার?

ধনঞ্জয় বলেন, ঠিক পাবেন। হয়েছে কী, বলুন তো? সেরে উঠে ডবল খাটনি খেটে এত দিনের লোকসান সুদসুদ্ধ আদায় করে নেবেন।

চন্দ্রভানু আজ এসে পৌঁছেছেন। কখন এসে কবিরাজের পিছনে দাঁড়িয়েছেন। দু-জনে বাইরে এলেন। ধনঞ্জয়ের এতক্ষণের হাসি-মুখ ঘরের বাইরে এসে অন্ধকার। প্রদীপ নিভে গেলে হঠাৎ যেমন অন্ধকার হয়। বললেন, রোগির সামনে যা-ই বলি, নিজের উপর আমি আর ভরসা রাখতে পারিনে ছোটরায়। ভাল চিকিৎসক কাউকে দেখান।

চন্দ্রভানু বলেন, অবস্থাটা কি, খুলে বলুন।

লক্ষণ খারাপ। প্রাণের শঙ্কা করি নে, বেঁচে থাকবেন ঠিকই। তবে শুয়ে পড়ে থাকতে হবে এমনি।

কত দিন?

ঢোক গিলে কবিরাজ বলেন, হতে পারে সারা জীবন। আমার চিকিচ্ছের কাজ হল না। আমি পরাজিত। দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছেন। পায়ের দিক থেকে অসাড় হয়ে আসছে, মিথ্যে বলেন নি সেটা।

চন্দ্রভানু আঁতকে উঠলেন : কী সর্বনাশ!

ধনঞ্জয় বলেন, আমি বলি, দীন নন্দন ডাক্তারবাবুকে দেখান না কেন একবার। তাঁর মাতা কেউ নয়। চকে খবর দিয়ে পাঠান। কোন রকম উপায় যদি থাকে, তিনি বাতলে দেবেন।

চন্দ্রভানু বলেন, চক ছেড়ে তাঁর পক্ষে আসা মুস্কিল। ডাক্তারখানা সবে জমতে লেগেছে। আসতেই চাইবেন না। আমি ফিরে যাই—বলে-কয়ে দু-চার দিনের জন্যে পাঠাব। পুজোর গোলমালটা কাটলে সদরের ডাক্তার এনে দেখানো যাবে একবার। বড় সর্বনাশের কথা বললেন কবিরাজমশায়। আমি চকে পড়ে থাকি, ছোটবউ সংসার নিয়ে আছে। দু-জনে দু-দিকে—দিব্যি চলে আসছিল। এই রাবণের সংসার ছোটবউ ছাড়া কে সামলাতে পারে?

কবিরাজ বলেন, রোগিকে স্তোক দিই, তা বলে আপনাকে তো পারি নে। আমার জ্ঞানবুদ্ধিতে যা আসে, খোলাখুলি বললাম। সংসার-সংসার বলে বউমাও ছটফট করছেন। কিন্তু আসল সংসার কতটুকু আপনাদের! স্বামী-স্ত্রী আর ছেলে। তার মধ্যেও দু-জন আপনারা বাইরে বাইরে। আজেবাজে একগাদা পুষ্যি—ওদের কতক সরিয়ে দিন, তা ছাড়া উপায় কি?

বিশ-পঁচিশজন আছেন, আজেবাজে তার মধ্যে একজনও নন। চন্দ্রভানুর স্বর উত্তপ্ত হয়ে উঠল : যাঁদের পুষ্যি বলছেন, তাঁদের একজনকেও আমরা নিয়ে আসিনি। সরাবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। বেলডাঙার এই বাড়ি যেদিন শেষ হল, রায়েরা গৃহপ্রবেশ করলেন, আসবাবপত্তর এলো, সেই সঙ্গে ওঁদেরও বাপ-দাদারা এসে ঢুকলেন। রায়-বাড়ি যদি কখনো লয় পায়, সকলে আমরা একসঙ্গে সরব। আগে একজনও নয়।

একটু থেমে আবার বলেন, উপায় নেই। রায়েদের প্রতিশ্রুতি আর রায়বাড়ির ইজ্জত এর সঙ্গে বাঁধা। বাইরের লোকের কাছে আজব ঠেকতে পারে, কিন্তু আপনার তো কিছু অজানা নেই। আপনি কেন অমন কথা বলবেন কবিরাজমশায়?

পুজোর দিন এগিয়ে আসে, ইন্দুমতী ততই পাগল হয়ে উঠছেন। অঞ্চলের মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে, এবারে বুঝি সমস্ত পণ্ড। কেলেঙ্কারির পার থাকবে না। বেঁচে থেকে চোখের উপর এ জিনিস তিনি কেমন করে দেখবেন?

দিনের মধ্যে অমন বিশবার স্বামীর উপর অনুযোগ করেন; তুমি কিছু দেখছ না।

চন্দ্রভানু বলেন, এ সবের আমি কি বুঝি আর কি দেখব। দেখতে গিয়ে তোমারই চিরকেলে বন্দোবস্তে হয়তো ভণ্ডুল ঘটিয়ে বসব।

আবার বলেন, বাড়ি এলেই তো শালগ্রাম-শিলা বানিয়ে ফেল। শুয়ে বসে থাকা আর ঘন ঘন তোমার প্রণাম নেওয়া।

ইন্দুমতী কেঁদে বলেন, আমি পড়ে আছি আর সকলে মিলে ধর্ম দেখছ তোমরা এই সময়।

ধনঞ্জয় কবিরাজের সঙ্গে দেখা হলেই মারমুখী : ধোঁকা দিলেন আপনি, কিছুই করলেন না। পুজোর মধ্যে সেরেসুরে উঠব—কোথায়?

কবিরাজ আর সামনে আসেন না, রোগি দেখা আপাতত বন্ধ।

ধ্রুবভানুর কলেজের ছুটি। সে বাড়ি এসেছে। মাকে প্রবোধ দেয় : যত উতলা হবে, সেরে উঠতে ততই দেরি পড়ে যাবে। ছটফট কোরো না, নির্বিঘ্নে সব হয়ে যাবে দেখো।

হবে কেমন করে? তোরা যে বাপবেটা হাতে করে কুটোগাছটিও ভাঙিসনে—

কুটো কি তুমিও কোনদিন ভাঙতে মা?

কি, কি বললি তুই? ক্রুদ্ধ ইন্দুমতী এক চোখ পাকিয়ে পড়লেন।

ধ্রুব বলে, মিথ্যে বলিনি। ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে দেখ তুমি। ছুটোছুটি চেঁচামেচি করে বেড়াও, কিন্তু নিজ হাতে কতটুকু কি করো? যারা বরাবর করে থাকে, এবারও তারাই করবে।

করবে, তার জন্য ডাক-হাঁক লাগে। ছেলে-মানুষ তুই—তোকে কিছু বলছিনে। কিন্তু বাড়ির যিনি কর্তা তিনিও একেবারে চুপ। শালগ্রাম-শিলা কথা বলে না, তিনি কেন তবে বলতে যাবেন? আমি পারিনে, শুয়ে শুয়ে এইখান থেকে চেঁচাই—

হাউহাউ করে ইন্দুমতী কেঁদে পড়েন;

আমার চেঁচামেচি কেউ আজকাল কানে নেয় না। হুকুম নিজের কাছেই কান্নার মতো লাগে।

কিরণবালা কমবয়সি মেয়ে। বরে নেয় না, তা বলে আমোদের কমতি নেই। ছুটোছুটি করে বেড়ায় সর্বক্ষণ। কোন সুবাদে জানা নেই, ইন্দুমতীকে মাসিমা বলে ডাকে। সে এসে খবর দেয় : প্রতিমার উপরে চালচিত্র বসে গেছে, ডাকের সাজ পড়েছে। গর্জনতেল মাখিয়ে দিয়েছে, জ্বলজ্বল করছেন ঠাকুর-ঠাকরুনরা।

ঠোঁট উলটে ইন্দুমতী বলেন, ঐ সাজ-গোজ অবধি। দুর্গাঠাকরুনের কপালে উপোস এবারে—ছেলেমেয়ে সুদ্ধ।

ক্ষীরো-ঝি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মিছে উতলা হচ্ছ মা। কাজকর্ম ঠিকঠিক চলেছে। গোমস্তামশায় গঞ্জ থেকে এই মাত্তোর কাঁচা-বাজার সেরে এলেন, ভাঁড়ারি তুলেপেড়ে রাখছে।

বাজার হবে না কেন, গোমস্তামশায়ের দু-পয়সা লভ্য আছে যে! ঐ বাজার অবধি, বাঁধাবাড়া হয়ে মানুষের পাত অবধি পৌঁছবে না। এত চোখে চোখে রেখেও ঠেকাতে পারিনে, এবারে দু-হাতে লুটবে।

তবু যথানিয়ম কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। ইন্দুমতী থাকে যখন পান জিজ্ঞাসাবাদ করেন। না, গোলমাল কিছু নেই।

ইন্দুমতী কিন্তু অবিশ্বাসে ঘাড় নাড়েন; মিথ্যে বলছ তোমরা সকলে। আমার ভরে। যজ্ঞিবাড়ি টুঁ-শব্দটি নেই, বাড়িশুদ্ধ ঘুমিয়ে রয়েছে। কাজ হলে এখানে শুয়ে শুয়েই আমি টের পেতাম।

চন্দ্রভানুকে ডাকিয়ে এনে বলেন, তোমার পায়ে পড়ি—

চন্দ্রভানু বলেন, শালগ্রাম-ঠাকুরের সে তো নিত্যি সকালের বরাদ্দ। অবেলায় গ্রেপ্তার করে পায়ে পড়ার কি ঘটল?

পায়ে পড়ি তোমার—বসে বসে খালি পাশা খেললে হবে না। যত চোরছ্যাচোড় ফাঁকিবাজ—ওদের শাসনে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। কাজে না পেরে ওঠ, মুখে অন্তত কিছু হাঁকডাক করো।

করি তো তাই। হাড়ের পাশাও তেমনি তাদোড়। বিনা হাঁকডাকে কথা শোনানো যায়!

এমনি সময় ধ্রুব এসে বলল, নেমন্তন্নর ফর্দ মিলিয়ে এলাম বাবা। অন্য বারে যা যায়, এরই মধ্যে তার দেড়া ছাড়া হয়ে গেছে।

আরে সর্বনাশ, কী করি এখন আমি? ইন্দুমতী আর্তনাদ করে ওঠেন : আমি যে ভাবছিলাম, চিঠির নেমন্তন্ন একেবারে বন্ধ করতে বলব। দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার হবে—চোখে না-ই দেখি, কানে তো শুনব! তার আগে মরণ হয় যেন আমার।

পুজোয় লোকারণ্য। ধুমধাম অন্য বারের চেয়ে বেশি বই কম নয়। ভক্তদাসকে নিয়ে লালমোহন এসেছেন। রায়বাড়ির অট্টালিকার সদর-অন্দর উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখলেন খানিক। পুজোর সমারোহ দেখলেন। তাজ্জব হয়ে গেছেন। বলেন, খোলামকুচির মতো টাকা ছড়াচ্ছে, খরচ করতে জানে বটে। আলাদা মন-মেজাজ এদের।

ভক্তদাস বলে, ডাকাতের গুষ্ঠি যে। টাকা-পয়সা এঁদের কাছে গাঙের জোয়ার-ভাটার খেলা—আসতে যেমন যেতেও তেমনি। খরচা করে আনন্দ এঁদের, জমানোয় নয়। এখন পেশা বদলেছে, কিন্তু পুরানো রেওয়াজ যাবে কোথা?

লালমোহন বলেন, আনি-দুয়ানি-সিকি করে করে আমাদের টাকা—এ জিনিস আমরা ভাবতেও পারিনে। ব্যাপারবাণিজ্যের লোকে পারে না।

চাঙারি মাথায় মাঝি এতক্ষণে দেখা দিল। চণ্ডীমন্ডপের সামনে চন্দ্রভানুর সঙ্গে মুখোমুখি। সকৌতুকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন : ওতে কি?

মায়ের নামে যৎসামান্য ভোগ-নৈবেদ্য নিয়ে এসেছি।

ধ্রুবকে ডেকে চন্দ্রভানু লালমোহনের পরিচয় দিয়ে দিলেন : মিত্তিরমশায়—বাইরে থেকে এসে দেখতে দেখতে কারবার জাঁকিয়ে তুলেছেন। সোনাছড়ি বন্দরের উপর একখানা বাড়িও করেছেন ছবির মতো।

ছোটরায়ের মতো মানুষ এতসমস্ত খবর রাখেন—লালমোহন অবাক। চন্দ্রভানু বলছেন, পুজোর ভোগ এনেছেন, পুরুত-ঠাকুর মশায়ের হেপাজত করে নাম-গোত্র লিখিয়ে দিয়ে এসো। যে যে নামে সংকল্প হবে। পুজোঅন্তে প্রসাদ নৌকোয় তুলে দিতে ভুল না হয়—বাড়ি নিয়ে যাবেন।

লালমোহন বলেন, বাড়িতে কে আছে, লোকজন কেউ এখনো দেশ থেকে আসেনি। ভিতরের কাজ এখনো বাড়ির বাকি। মাঘ মাসে গৃহপ্রবেশ, বাড়ির লোক তখন আসবে।

আলাপ জমানোর জন্য লালমোহন উসখুস করছিলেন। সুযোগ পেয়ে অনেক কথা বলে নিলেন। কিন্তু বলছেন কাকে? পাশা পড়েছে বৈঠকখানার ফরাসে। চন্দ্রভানু সেইদিকে ছুটলেন।

ধ্রুবর হাত এড়ানো যায় না। প্রসাদ শুধু-মাত্র নৌকোয় নিয়ে রেহাই হল না। আসনে বসে রীতিমতো রাজসিক প্রসাদ পেতে হল রায়বাড়ি বসে। গুরুতর রকমের হয়েছে। বাড়ির নিচে গড়খাইয়ে নৌকো—সেই পথটুকুও হাঁটা মুশকিল। ধ্রুবও ছাড়বে না : এখন কেন নৌকোয় গিয়ে বসে থাকবেন? জো আসুক। বিশ্রাম করুন ততক্ষণ।

নিরিবিলি একটা কামরায় বিছানা করে লালমোহন ও ভক্তদাসকে নিয়ে চলল। লাল-মোহন মুগ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন, এমন কাজের ছেলে হয়েছে, বাবাজী, ছোটরায় মশায় তাই নিশ্চিন্ত। আমার মেয়েটাও ঠিক এইরকম। কালেভদ্রে যখন বাড়ি যাই, ছুটোছুটি করে সে-ই আমার সব করে দেয়। কিছু করতে গেলে তাড়া দেয়, শুয়ে-বসে সময় কাটাতে হয়। উঃ, কতদিন যে বাড়ি যাইনি! রক্ষে পাই সোনাছড়ি ওরা সব এসে পড়লে।

ধ্রুব হেসে বলে, এবাড়ি কিন্তু আলাদা। আমি সত্যিই কিছু করছিনে। করছেন বাবা।

লালমোহন আরও মুগ্ধ হলেন। কী বিনয়ী ছেলে, কেমন মিষ্টভাষী। কথা যেন হাসি না মাখিয়ে বলতে পারে না।

ধ্রুব বলছে, বাবা ঐ যে নিচের বৈঠক-খানায় রয়েছেন, ক্ষণে ক্ষণে গলা পাওয়া যাচ্ছে—

ভক্তদাস বলে, পাশা খেলার চিৎকার—

ঐ যথেষ্ট। বাবা রয়েছেন, লোকজনের সেটা মনে পড়ে যাচ্ছে। এর উপরে মুখে আবার কী বলতে যাবেন!

ধ্রুব চলে যাবার পরেও তার কথা। ভক্ত-দাস বলে, পেটে অঢেল বিদ্যে, তাই অমন ভালো। আমাদের তল্লাটে বিদ্যে জিনিসটা বড় কম। রায়বাড়িতেও ছিল না, ছোটরায় শক দিয়ে শুরু। বুড়ো কর্তা পুরানো কাজকর্ম তোবা করে সাগরচক বন্দোবস্ত নিলেন, ছেলেকে টোলে পাঠালেন ধর্মপথে মতি যাবে বলে। তাঁর ছেলেয় এসে একেবারে হুলস্থুল কান্ড—দু-দুটো পাশ দিয়েছে, জলপানি পেয়েছে একটায়। পড়েই যাচ্ছে। এই বয়স অবধি পড়া ছাড়া কাজ নেই।

লালমোহন বললেন, ছেলেটা বড্ড আমার মনে ধরেছে। সেই যা বলছিলে তুমি ম্যানেজার — ব্যাপারবাণিজ্য এদের সাহায্য ছাড়া বজায় রাখা যাবে না। এসেছিও সেইজন্যে।

আজ্ঞে হ্যাঁ—

কিন্তু গরজটা কি এঁদের বলো। আমার স্বার্থে কেন এঁরা ডাকাত শাসন করতে যাবেন?

ভক্তদাস ঘাড় নেড়ে বলে, তা করবেন। সেকালে ছিলেন দলপতি, একালের চকদার—লোকের উপর মাতব্বরি এঁদের চিরকাল। সেই মাতব্বরি মেনে নিয়ে শরণ নিলেই হল। বলেই দেখুন না। রক্ত এঁদের আলাদা—এই মচ্ছবের ব্যাপারেই দেখতে পাচ্ছেন। অপর দশজনের সঙ্গে মেলে না।

লালমোহন তর্ক করেন : বেশ, একবার না হয় শাসন করে দিলেন—বছর কয়েক নির্ঝঞ্ঝাটে চলল। তার পরে আবার যদি অত্যাচার আসে! বার বার কোন লজ্জায় বলতে যাব? তাই মতলব আসছে একটা মাথায়—

দুটো হাতপাখা নিয়ে ধ্রুবভানু এসে পড়ল এই সময়। মাছি লাগতে পারে, গরম হতে পারে। ছেলেটার সকল দিকে নজর, অতিথির আপ্যায়নে তিলমাত্র ত্রুটি হতে দেবে না।

পাখা দিয়ে চলে গেলে লালমোহন হঠাৎ বললেন, ধ্রুব ছেলেটিকে জামাই করব। তুমি কি বলো ম্যানেজার? অনুরোধে একবার হয়তো এঁরা গাঙ-খাল সামাল করে দিলেন। কিন্তু আমার হল চিরদিনের কাজকারবার। রায়েদের সঙ্গে বাঁধা কুটুম্বিতে হলে একেবারে নিশ্চিন্ত।

ভক্তদাস পরমোৎসাহে ঘাড় নাড়ে : খাসা মতলব করেছেন। ছোটরায়ের বেহাই হতে পারলে তো পাথরে পাঁচ কিল। খটি দুনো তেদুনো করে ফেলব। কোন গাঙ-খালের মোড় বাদ থাকবে না। টাকাপয়সা খটির উঠোনে মাদুর পেতে শুকোতে দিলেও কোন বেটা চোখ তুলে দেখতে যাবে না তখন। কারবারের ছেঁড়া কথা না তুলে তবে আপনি সরাসরি বিয়ের প্রস্তাবই উত্থাপন করুন।

সুযোগও পাওয়া গেল। বিদায় নিয়ে লালমোহন নৌকোয় উঠবেন, গৃহকর্তা চন্দ্রভানুকে খুঁজছেন। তিনি দরদালানে এখন। প্রসন্ন মেজাজ। এত বড় ব্যাপার

ঢুকেবুকে গেল, টু-শব্দটি হয় নি। ইন্দুমতী অভাবে কি-হয় কি-হয়—কিন্তু অন্যান্য বারের চেয়েও বেশি শৃংখলা। চন্দ্রভানু নিজে অবশ্য পাশা খেলেছেন, গল্পগুজব করেছেন, চন্ডী-মন্ডপে একটা জলচৌকি নিয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে পুজো দেখেছেন। তবে ভোরবেলা উপর থেকে সেই যে নেমেছিলেন, সিঁড়ি বেয়ে আর ওঠেন নি। নিচের তলায় সারা দিন।

লালমোহন গিয়ে নমস্কার করতে চন্দ্রভানু বললেন, আছেন আপনারা? কে যেন বলল, সন্ধ্যের আগে রওনা হয়ে পড়েছেন।

লালমোহন বলেন, কথা ছিল তাই। কিন্তু বাবাজীর জন্য হল না। সামনে বসে এমন খাওয়ালো, গড়িয়ে না পড়ে উপায় ছিল না। কী ছেলে! পুত্রভাগ্যেও আপনি বড় ভাগ্যবান।

সুযোগ এসে গেল তো প্রস্তাবে আর দেরি কেন? লালমোহন বললেন, একটা দিনেই মনে হচ্ছে ছেলেটি কত আপন আমার! সত্যি সত্যি তাই হতে দিন, সেই দরবার আপনার কাছে।

চন্দ্রভানু সবিস্ময়ে চোখ তুলে চাইলেন : খুলে বলুন মিত্তিরমশায়।

সে দৃষ্টির সামনে লালমোহন থতমত খেয়ে যান। কণ্ঠের আওয়াজ পেয়েই মানুষজন ছুটোছুটি করে কাজকর্মে লেগে যায়, নিশ্চয় এই দৃষ্টির সামনাসামনি পড়বার ভয়ে। বিনা ভূমিকায় বলে ফেললেন, ধ্রুবকে বড্ড ভালো লেগেছে। মীনাক্ষীকে নিয়ে নিন আপনি—ঐ আমার এক মেয়ে।

ভালো তো অনেকেরই লাগে ধ্রুবকে, সত্যি ভালো ছেলে। তবে তো অনেক জনের মেয়ে নিতে হয়। কাকে বঞ্চিত করব বলুন। কিন্তু হবার উপায় নেই। রায়বাড়ির নিয়ম, একের বেশি দুই বিয়ে হবে না। সেকালে হত শুনেছি, এখন বন্ধ।

হো-হো করে চন্দ্রভানু হেসে উঠলেন : বাইরে কেউ যদি কিছু করে উপায় নেই, কিন্তু শুদ্ধান্তঃপুরে স্ত্রী একজনই।

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হলেন এবার : এ তল্লাটে আপনি নতুন। কিন্তু ভক্তদাস পুরানো লোক, তার কিছু অজানা থাকবার কথা নয়। রায়বাড়ির বউ আনতে বিস্তর বিচার-বিবেচনা লাগে। নতুন বড়লোক আপনি—মেয়ের সংগে ভরা সাজিয়ে যৌতুক পাঠাবেন মানুষজনের চমক দেবার জন্য—

লালমোহন আরও ফলাও করে দিলেন কথাটা : আজ্ঞে না, চমক দেবার উদ্দেশ্য নয়। একমাত্র মেয়ে আমার। আইন মতে ছেলেরা ওয়ারিশান। কিন্তু ন্যায়ত ধর্মত মেয়েরও অংশ থাকা উচিত। তাই সেই প্রাপ্য অংশ গয়না ও নগদ টাকায় আমি বিয়ের সময় একেবারে দিয়ে দেবো।

চন্দ্রভানু অবিচল কণ্ঠে বলতে লাগলেন, গয়না-টাকাই সব নয়। রায়বংশের কর্তারা শুধু অট্টালিকাই গড়েন নি, সেই সংগে মস্ত বড় ইজ্জত গড়ে বিস্তর দায়দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। যাকে-তাকে এ বাড়ি বউ করে আনা চলে না, কনের বিচারটাই সকলের আগে।

ঘাড় নেড়ে সগর্বে সায় দিয়ে লালমোহন বলেন, খাঁটি কথা। সেদিক দিয়েও জোর আমার খুব। রায়বাড়ির অযোগ্য হবে না আমার মীনা। সোনাছড়ি বন্দরে সামান্য একটু বাড়ি তৈরি হচ্ছে আমার—

হেসে চন্দ্রভানু বলেন, এদেশ-সেদেশের মাঝিমাল্লা নৌকো ঘুরিয়ে নিয়ে আপনার সেই সামান্য বাড়ি দেখতে যায়।

লালমোহন বলেন, মাঘমাসে গৃহপ্রবেশ করে আপনাদের অঞ্চলের পাকা বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছি। পায়ের ধুলো দিতে হবে তখন একবার, নিজে এসে বলে যাব। মীনাক্ষীকে দেখবেন—নিজের মেয়ে নিয়ে মিথ্যে দেমাক করছি কিনা, তখন বিবেচনা করবেন।

চন্দ্রভানু সকৌতুকে বললেন, সুরূপা বুঝি? ভালোই। সেটা কিন্তু কিছুই নয়। আমার স্ত্রীর চোখই একটা নেই, শুনেছেন বোধহয়। কুমারী অবস্থায় বাঘে থাবা দিয়েছিল। তার জন্যে রায়বাড়ি বিয়ের বাধা ঘটেনি। আমার নিজের মায়ের সম্বন্ধে বলা ঠিক হবে না কিন্তু এ বাড়ির বউ পদ্মিনী-নূরজাহান কেউ নয়। আমরা রূপ দেখি না, ঘর দেখি।

লালমোহনেরও জেদ চেপেছে। বললেন, কুলীন-ঘর আমরা, মুখ্য কুলীন না হলেও মধ্যাংশ। ঠিকানা দিচ্ছি, দেশেঘরে লোক পাঠিয়ে সন্ধান নিন। সে দিক দিয়েও হারব না।

হেরেই তো রয়েছেন মশায়, লোক পাঠানোর দরকার হবে না। কিন্তু থাক এখন। আজকে আপনি নিমন্ত্রিত অতিথি। অন্য কোন সময় হবে।

লালমোহন বলেন, আবার কবে দেখা হয় না হয়—কথা যখন উঠেছে, খোলাখুলি হয়ে যাওয়া ভালো। আপনি বলুন।

নাছোড়বান্দা লালমোহন, শেষ না শুনে নড়বেন না। চন্দ্রভানু বললেন, বহুজন নিয়ে আমাদের বিরাট সংসার। ছেলের বউ এসে একদিন সংসারের দায়িত্ব নেবে, কর্ত্রী হবে। ধ্রুবর মায়ের যা অবস্থা, সে দিনের খুব যে দেরি, মনে হয় না। যারা সব আছে, আশ্রিত প্রতিপাল্য কেউ নয়, সংসারেরই অংশ। আপনার মেয়ের মনমেজাজ এমন সংসারে খাপ খাবে বলে মনে করতে পারছিনে।

লালমোহন আহত কণ্ঠে বলেন, মেয়েকে তো জানেন না আপনি। দেশেঘরে দূরের জায়গায় রয়েছে, চোখের দেখাটাও দেখেন নি এখন অবধি।

আপনাকেই দেখতে পাচ্ছি। খুব ভাল করেই দেখছি এই ক'বছর, খবর সমস্ত জানি। টাকা অনেক আপনার—কুচোচিংড়ি বিক্রির টাকা। দরদাম ঠিক করে তাই থেকেও আবার ঝুড়ি পিছু এক পয়সা দু-পয়সা করে কাটা হয় খাতার বৃত্তি বলে। এমনি পয়সা জমিয়ে জমিয়ে টাকা।

হেসে উঠে চন্দ্রভানু বলেন, ওরাও তাঁদোড় তেমনি—জেলে হয়ে বেচে দিয়ে এলো; ডাকাত হয়ে লোকসান বন্দুর পারে উশুল করল। কালিঝুলি মেখে খাটতে হুংকার দিয়ে এসে পড়ে,—তাদের বাইরের লোক ভাববেন না, দরদাম নিয়ে খানিক আগেই হয়তো বা কাঁদা-কাটা করে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি, কুচোচিংড়ি নিয়ে বেশ তো চলছিল, আবার হাঙর ধরার ঝোঁক কি জন্যে?

অপমানে মুখ রাঙা লালমোহনের। সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান। তা হলেও ঝানু ব্যবসাদার—রাগের মধ্যেও হিসাবজ্ঞান হারান না। কর্মসিদ্ধি না-ও যদি হয়, চটিয়ে উল্টো উৎপত্তি ঘটাতে আসেননি। সামলে নিতে কিছু সময় গেল। হাসিমুখে তারপর বলেন, তা সত্যি, এক পয়সার দু-পয়সার মানুষই আমি। কিন্তু আমার তো কিছু নয়, আরজি আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে—

তাই তো বললাম, ঘর দেখে আমরা মেয়ে আনি। মেয়ের গাঁইগোত্র দেখতে যাইনে। খেয়ানৌকোর ইজারা নিয়ে প্রথম আপনি পয়সা করেন—দেশেঘরে ছিলেন যখন। আধপয়সা একপয়সা করে খেয়ার মাশুল আদায় হয়, সেই পয়সা। সেটা গর্ব আপনার, গলা ফাটিয়ে জাহির করেন। আমাদের সৃষ্টিছাড়া সংসারের এলোপাথাড়ি খরচা, খরচ করতেও ক্ষমতা লাগে—আপনার হিসাবি ঘরের মেয়ে দেখেশুনে তো পাগল হয়ে যাবে।

ঘরদালানে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। সারা দিনের অবসন্ন চন্দ্রভানু উপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন। অর্থাৎ কথাবার্তা আর চালাতে চান না, বিশ্রাম এইবারে।

নৌকোয় এসে লালমোহন বোমার মতো ফেটে পড়লেন : কথা শুনলে ভক্তদাস! খাতার বৃত্তি আদায় হয়, সেটুকু অবধি জেনেছে। কিন্তু আমি যদি হই একপয়সা আধপয়সার চোর, ওরা যে শ-হাজারের নৌকো-মারা ডাকাত। আজকে চকদার হয়েছেন। দু-দিনের ভন্ডোর হয়ে ভাতকে বলেন অন্ন।

ভক্তদাস বলে, এত শোনার পরেও হেসে হেসে কথা বলে এলেন বড়বাবু, ঐটে বড় বুদ্ধির কাজ হয়েছে। জলে বাস করে কুমিরের সংগে ঝগড়া চলে না। বেলডাঙার রায়েরা সত্যি সত্যি একদিন জলের উপরের কুমির ছিল। কুমির কি—কুমির দেখে তো ডাঙায় উঠে পালানো যায়। কুমির-বাঘ দুটো একাধারে—জলে ডাঙায় কোথাও রক্ষে নেই। জমাজমি নিয়ে থেকে এখন নরম হয়েছে—কিন্তু রাগলে বিশ্বাস নেই, পুরানো রক্ত টগবগিয়ে উঠতে পারে।

গুম হয়ে শুনছিলেন লালমোহন। নিশ্বাস ফেলে বললেন, দেমাক ছিল ভক্তদাস, কোন কাজে আমি হারিনে।

হেরে গেছেন, তাই বা এর মধ্যে ধরলেন কিসে? লক্ষ কথার কমে বিয়ে হয় না, সেই লাখ আগে পুরিয়ে ফেলুন। তার আগে হার-জিতের ব্যাপার নেই। মন খারাপ করে চুপচাপ থাকলে লাখ কেমন করে পুরবে? সারা বিকাল বকবক করে আমি খানিক এগিয়ে দিয়ে এসেছি। খাস-চাকরানি ক্ষীরোদা আমাদের গাঁয়ের। তাকে শুনিয়ে এলাম, কাজেকর্মে মেয়ে খুব দড়, খাটনির দিক দিয়ে শাশুড়ির কান কাটবে নতুন-বউ। কথাটা চলে যাক গিন্নির কানে। আর কন্যা-পণের একটা ভারীরকম আন্দাজ দিয়ে এলাম নকড়ি-গোমস্তার কাছে—ছোটরায় অবধি পেঁছে যাক। কারবারের গরজ, তার উপর আপনার পছন্দ—ঐ বর নিলাম ডেকে কিন্তু

বড়বাবু। কথাবার্তা যেখানে এগোক, নর্কড়ি আমায় খবর পাঠাবে বলেছে।

দশমীতে মণ্ডপের প্রতিমা নিয়ে বিসর্জনের জন্য বেরিয়ে গেল। একলা ঘরে শুয়ে পড়ে থেকে ইন্দুমতীর কান আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। কানে এলো গোবিন্দ-সুন্দরীর গলা। মৃদু কণ্ঠে কার সঙ্গে যেন বলছেন, ছোটবউ উঠতে পারে না, কাজ কিছু আটকে থাকল তাতে? কলের মতো সব হয়ে গেল, টুঁ-শব্দটি নেই। কেবল তো চেঁচামেচি আর ঝগড়াঝাটি—লোকে তাতে দিশা করতে পারে না। কাজের গণ্ডগোল হয়। দেখ, অন্য বারের চেয়ে ভালো ভাবে হল কিনা!

আগেকার দিন হলে গোবিন্দসুন্দরীর ডাক পড়ত সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কথাগুলো এমন নিদারুণ সত্য, ধমক দিতে আজ লজ্জা করছে।

উৎসবের পর স্তব্ধতা। সন্ধ্যার পর থেকেই সদরবাড়ি, অন্দরবাড়ি শ্মশানের মতো থমথম করছে। জানলা দিয়ে চাঁদ দেখা যায়। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ইন্দুমতীর বিছানায়।

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, অতি মৃদু। মানুষ দেখতে হয় না, শব্দেই বোঝা যায়। ইন্দুমতী তবু প্রশ্ন করেন, কে?

কাতর হয়ে বলছেন, ঘরের মধ্যে এসো একবার তুমি। আমার কাছে। উঠতে পারছি নে বলে কি প্রণামটাও নেবে না?

ঘরে ঢুকে চন্দ্রভানু স্ত্রীর পাশে দাঁড়ালেন। বলেন, প্রণাম নিলাম না কেমন করে? সকালেও তো এক দফা হয়ে গেছে। যখন চকে পড়ে থাকি, পায়ের ছাপ আমার হয়ে প্রণাম নিয়ে নেয়।

সে আমার নিত্যদিনের বরাদ্দ। বিজয়ার দিনে এখনকার এ জিনিস আলাদা। ওঠো তুমি, খাটের উপর উঠে দাঁড়াও। আমার মাথার কাছে।

হাত বাড়িয়ে ইন্দুমতী জায়গাটা দেখতে গেলেন। কী যেন হয়ে গেল হঠাৎ। হাত উঠল না। মাথা ঘোরাবার চেষ্টা করলেন, তা-ও হল না।

"কুচো চিংড়ি নিয়ে বেশাতো চলছিল, আবার হাঙর ধরার ঝোঁক কি জন্যে?"

হাউ-হাউ করে কেঁদে পড়লেন: আমি যে পাথর হয়ে জমে গেলাম অহল্যার মতো। অহল্যার পাপ ছিল, আমার তো কোন পাপ নই। তবে কেন এতবড় শাস্তি? আরও এগিয়ে এসো তুমি। ঠিক আমার শিয়রে। দেখ, আজকে তবু কেঁদে বলতে পারছি—ক'দিন পরে কথাই হয়তো বন্ধ হবে। তখন কিছু বলতে যাবো না। শিয়রে দাঁড়িয়ে পা তুলে দাও আমার কপালের উপর। হাত বাড়াতে পারছিনে বলে পদধূলি পাবো না আজকের দিনে?

সত্যি সত্যি তাই করতে হল চন্দ্রভানুকে। স্ত্রীর কপালের উপর এক পা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। সেই পা ইন্দুমতী সরিয়ে নিতে দেবেন না: থাকুক, আর একটুখানি রাখো।

কী যেন মধুর তৃপ্তি উপভোগ করছেন। যতক্ষণ সেটা বাড়িয়ে নেওয়া যায়। তারপর এক সময় চন্দ্রভানু পাশে বসে পড়লেন।

ইন্দুমতী গাঢ়স্বরে বলেন, সত্যি, কী মন্তোর জানো তুমি বলো।

কেন?

কাজের মধ্যে একটিবার তোমার গলা পেলাম না। অথচ একটুকু গণ্ডগোল নেই, আপনাআপনি সমস্ত মিটে গেল।

চন্দ্রভানু বলেন, যারা বরাবর করে থাকে তারাই সব করছে। তুমি উঠতে না পারলেও তোমার নিয়মে কাজ হয়েছে। বাহাদুরি যদি কিছু থাকে, সে তোমার।

ইন্দুমতী বলেন, নিশ্চয় তুমি মন্তোর জানো। নইলে হতে পারে না। আগে জানলে মন্তোরটা শিখে নিতাম। তা হলে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটি করে বাড়িসুদ্ধ বিষনজরে পড়তাম না। এখন আর উপায় নেই। কোন দিন আর উঠতে পারব না, মন্তোর শিখে নিয়ে খাটাব কোথায়?

চন্দ্রভানু সান্ত্বনা দেন: কেন উঠবে না, কী হয়েছে তোমার? কবিরাজমশায় তো বলছেন—

এক মাস। মাসের উপর একটা দিনও বেশি নয়। মাস পাঁচ-ছয় ধরে এই এক মাসের কথা বলেন, তার আগে বলতেন হপ্তা। আর মনে মনে যা বলেন—আগে বুঝতাম না, এখন সেটা ধরে ফেলেছি। কিন্তু যা বলছি—আর আমি তোমায় কাছ-ছাড়া হতে দেবো না। তোমার ঐ মন্তোর নিয়ে আমার পাশে থাকবে। সাজানো সংসার নইলে ছারখার হয়ে যাবে।

আর সেদিকটা—আমাদের সাগরচকের কি হবে তাহলে?

উৎসবের হট্টগোলে চন্দ্রভানু এই ক'দিন সাগরচরের কথা একেবারে ভুলে ছিলেন। হঠাৎ যেন সুদূরের কলরোল কানে বেজে ওঠে। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে—চতুর্দিক থেকে। জয়াল নিয়ে বড় বড় মাটির চাঁই জলে খসে পড়ছে। সৈকতবর্তী নিঃসঙ্গ নিঃসহায় চর এই রাত্রিবেলা আর্তনাদ করছে বুঝি চন্দ্রভানুর উদ্দেশে। ভয়ে কাঁপছে।

আর ইন্দুমতী পঙ্গু হয়ে ঠিক পাশটিতে শুয়ে। স্বামীকে ছেড়ে দেবেন না, তাঁরও বড় ভয়। একদিন ইন্দুমতীর নাম রটেছিল সিংহিনী-বউ। বিয়ের সময় তেরো বছরের মেয়ে তিনি। একটা চোখ নেই বলে পাত্র জোটাতে কিছু দেরি হয়েছিল। সিংহিনীর তুলনাটা প্রথম সেই সময়কার। নতুন বউয়ের মেজাজ অসম্ভব রকমের চড়া, ছুঁয়ে কথা বলবার জো নেই—মাথা ঝাঁকিয়ে ফুঁসে উঠবে। কথায় কথায় মাথা ঝাঁকানো ইন্দুমতীর অভ্যাস ছিল সেই বয়সে। মুখখানা ঘিরে থোপা থোপা চুল—ঝাঁকুনিতে চুল দুলে উঠত, সিংহের কেশরের কথা মনে এসে যেত তখন। সতের বছরের কিশোর চন্দ্রভানু নতুন বউয়ের চালচলন দেখে এয়ার বন্ধু কারো কাছে বলেছিলেন, বউ কে বলবে? ঘোমটা দিয়ে সিংহ এসেছে রায়বাড়ি। কথাটা সেই চাউর হয়ে গেল। সেবারে যখন গোবিন্দ-সুন্দরীর তোরঙ্গের মধ্যে রুপোর বাটি আবিষ্কার করে ইন্দুমতী যৎপরো-নাস্তি নিগ্রহ করলেন—চন্দ্রভানু তখন বাড়িতে, তাঁরই চোখের উপর। যতই দূরের

হোক, সম্পর্কে পিশিমা। তবু চন্দ্রভানু মুখ দিয়ে রা কাড়লেন না। এই নিয়ে গোবিন্দসুন্দরী কি বলেছিলেন কোথায়, ঠিক কানে পৌঁছে গেছে। চন্দ্রভানু ডাকলেন : শোন পিশিমা, বলে বেড়াচ্ছ আমি নাকি স্ত্রৈণ?

ওমা, এত বড় মিথ্যে কে লাগিয়েছে? গোবিন্দসুন্দরী আকাশ থেকে পড়লেন: সে লোকের যেন কুড়িকুষ্ঠ হয়। মুখে যেন পোকা পড়ে।

সহাস্যে চন্দ্রভানু বলেন, কি বলেছ তবে? তোমার নিজের মুখেই শুনি।

ভাগ্যবতী ছোটবউ, সেই কথা বলে বেড়াই। সেকালের বউরা কেঁদেই জনম কাটাত। গলায় দড়ি দিয়েছে, বিষ খেয়েছে। শতেক পরমায়ু হোক আমাদের ছোট-বউর, সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার করুক।

সরে পড়ছিলেন এমনি সব বলে। চন্দ্রভানু বললেন, সেকালের বউরা ছিল পল্লবিনী লতা। নাড়া দিলে নীহারবিন্দু ঝরে ঝরে পড়ত। সিংহনী এসেছে এই ছোট-বউয়ের রূপ ধরে। এখানে মাথা গলাতে যাবো, এত ভাগত নেই আমার। সে তোমরা যাই বলো।

ঠিক তাই। সিংহিনীর দাপট নিয়ে এত-কাল সংসার করে এসেছেন। আজকে এই দশা। ক্ষণে ক্ষণে চোখের জল। স্বামীকে ডাকিয়ে এনে পাশে বসান : যেতে পারবে না কোনখানে। কোনদিনও না। আমার শাশুড়ির এই সংসার। মরবার আগে চাবির গোছা আমার আঁচলে বেঁধে দিয়ে গেলেন। স্বর্গ থেকে দেখছেন, আমি অবহেলা করি নি। জীবনে সংসার বই জানিনে। আর তুমি ছটফট করছ সংসার উচ্ছন্নে দিয়ে পালানোর জন্য।

বড় বড় চোখ দুটো বিঘূর্ণিত করে গর্জন করে ওঠেন সহসা : জিজ্ঞাসা করি, সংসারের কোন দায়িত্ব কি তোমার নেই? এ জিনিস শুধু কি একলা আমার?

জবাবের কথা পেয়ে গেছেন চন্দ্রভানু : সংসারের গরজেই তো চকে পড়ে থাকি। আমার বাবাও মরণ পর্যন্ত সেখানে থেকে গেছেন। সংসারের হাল ধরে মা যেমন ছিলেন, তাঁর অন্তে তুমিও তেমনি রয়েছ। আমরা পড়ে থাকি তেপান্তরে। ঘরে বাইরে দু-দিক সামলানো যাচ্ছে, সংসার তাই কলের মতো চলে। চকে যদি না যাই, ভরা সাজিয়ে কে তোমার ভাণ্ডার ভরে দেবে ছোটবউ?

বলছেন, রাত থাকতে উঠে ভাঁড়ারের চাবি খুলে তোমার কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়, চলে রাতদুপুর অবধি। সেখানেও তাই, কাজের অন্ত নেই। বাঁধের পর বাঁধ দিয়ে নোনা জল ঠেকানো, খরার সময় জমির উপর হিসাব করে সার সাজিয়ে যাওয়া, কাঁকর বেছে ফেলে চাষ দিয়ে মাটি তৈরি করে রাখা—নতুন বর্ষায় মাখনের মতো যাতে গলে যায়। কটা আর বলি ছোটবউ। বিস্তর তোয়াজ করতে হয়, তবে খুশি হয়ে সাগরচক তোমার সংসারের রসদ জোগায়। তোয়াজ শুধু মাটির নয়—মানুষ যারা সেই মাটি নিয়ে পড়ে আছে, তাদেরও।

এই চলল। অষ্টপ্রহর কথা-কাটাকাটি। কলহ রীতিমতো। অবশেষে হাউহাউ করে কান্না। ইন্দুমতী যেতে দেবেন না চন্দ্র-ভানুকে। সর্বক্ষণ আঁকড়ে রয়েছেন।

চিঠি এলো বৃন্দাবনের কাছ থেকে। চন্দ্রভানু যখন চকে না থাকেন, বৃন্দাবনই সর্বময়। হাতের লেখাটা নীহারনলিনীর—নীহারকে দিয়ে লিখিয়েছে। পোস্টাপিস যেতে একটা পুরো ভাঁটির পরেও অর্ধেক ভাঁটি লাগে, পুরোপুরি দিন লেগে যায়। এত হাঙ্গামা করে চিঠি পাঠিয়েছে, না জানি কোন খবর।

পাঁচ পাঁচটা জায়গায় বাঁধ ভেঙেছে। ক্ষেতের পাকাধান নোনা জলে বিস্তর পচে গেছে। অঘ্রাণমাসে এখনই এই—চৈত্র-বৈশাখে সাঁড়াসাড়ির বান আসবে, তখনকার অবস্থা কি দাঁড়াবে? গাঙ যেন খেলাচ্ছে—খেলদার যে দিকটা, সেখানে কিছু নয়—ভিন্ন এক খানে পথ করে নিয়ে উদ্দাম বেগে জল ঢুকে পড়ে। খবর পেয়ে হৈ-হৈ করে সব পড়ল—বাঁধ তার আগেই নিশ্চিহ্ন। জলরাশি খলখল করে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। গাঙ বুঝি টের পেয়ে গেছে, আসল মানুষ ছোটরায় নেই এখন, যা খুশি তাই করা যেতে পারে।

এমনি সব কথা চিঠিতে, নীহার-নলিনীর বাঁধুনি। সত্যি তাই। সাপের হাঁচি বেদের চেনে, জলের চলাচল সম্পর্কে তেমনি বলা যায় চন্দ্রভানু সম্পর্কে। বাইরের উজ্জ্বল প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ নদী দেখে কে বুঝবে শয়তানি মতলব তলে তলে—রূপ দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখে নিঃসাড়ে জলতলে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে যাচ্ছে। বৃন্দাবন সর্বদা চন্দ্র-ভানুর সঙ্গে ঘোরে, তবু সে বোঝে না। এক তৃতীয় নেত্র আছে বুঝি চন্দ্রভানুর, জলের কারসাজি ধরে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যবস্থা করেন।

নকড়ি-গোমস্তাকে ডেকে চন্দ্রভানু বললেন, বোটের ছাতটা ঠিক নেই, তাড়া-তাড়ি মেরামত করিয়ে দাও। দু-একদিনের মধ্যে।

যাবেন?

চিঠি তো দেখলে। কথাটা চাউর কোরো না তুমি। তোমার বউঠাকরুন টের না পায়।

নকড়ি বলে, আপনিও চললেন—সদর-বাড়ি অন্দরবাড়ি ওরা তো সব লাঠালাঠি হাঙ্গামা বাধাবে নিজেদের মধ্যে। বুড়ো মানুষ আমি সে ঝঞ্ঝাট পোহাতে পারব না। যে মানুষ পারতেন, তাঁর আজ উত্থানশক্তি নেই।

চন্দ্রভানু হাসলেন একটুখানি। নকড়ি অজকের মানুষ নয়, বুড়োকর্তা বৃন্দভানুর আমলের। নিজের কেউ নেই, রায়েরাই সব। হাসির অর্থ বুঝতে বাকি থাকে না—প্রস্তাবটা কানে শোনারই যোগ্য নয়। নকড়ি বলে, অবস্থাবিশেষে ব্যবস্থা, এদ্দিন তো এসব কথা ওঠেনি। রায়বাড়ি থেকে সরিয়ে বৃত্তির ব্যবস্থা বরঞ্চ করে দিন।

জিভ কেটে চন্দ্রভানু বলেন, অমন কথা মুখেও এনো না নকড়ি। মনে করে নাও, ওঁরা উত্তমর্ণ। এক সময় ধেরে খেয়েছিলাম, এখন তার শোধ হচ্ছে। দয়ার দান নয়, উচিত প্রাপ্য নিয়ে নিচ্ছেন। এই ভাবটা মনে এনো, ঝঞ্ঝাট পোহাতে বিরক্তি লাগবে না। আমার মা

তাই ভাবতেন, ছোটবউও বরাবর তেমনি ভেবে এসেছে।

একটুখানি থেমে জোর দিয়ে আবার বলেন, সত্যি সত্যি তাই। চিরকালের বৃত্তি বদল করে রুদ্রভানু চক বন্দোবস্ত নিলেন। চকদার হলেন, বাবুলোক হলেন, ছেলেদের পড়াশুনোয় দিলেন। কিন্তু তার আগে দরিয়ার জলে চরে বেড়ানোর দিনে যাঁরা সব ছিলেন, তাঁদের দরিয়ায় ডুবানো যায় না। এতবড় বাড়ি এত ঠাট-বাট তাঁদেরই জন্যে। নিজের দুই ছেলে আর ও'রা ও'দের বউ-ছেলে নিয়ে মা আমার সংসার সাজালেন। তুমি যে জানো না কিছু, তা নয়—জেনেশুনে কেন অবুঝ হও নকড়ি?

নকড়ি বেকুব হয়ে গেছে। আমতা-আমতা করে বলে, রয়েছেন ও'রা সেজন্যে বলছিনে। মানুষে দু-মুঠো খাবে মাথা গুঁজে থাকবে, কে তাতে বাদি হতে যাবে? ক্ষণে-ক্ষণে বুদ্দুমার বেধে যায়, সেইজন্যে ভয় করি। খেয়ে তো কাজ চাই একটা, নইলে পেটের ভাত হজম হয় কি করে?

ঠিক ধরেছে। চন্দ্রভানু লুফে নিলেন কথাটা : যিনি কাজে রাখাটাই ভুল হচ্ছে, গোলমালের মূল সেখানে। কাজ দিতে হবে। জমা-খরচ লিখতে বলব না, কিম্বা নৌকোয় দাঁড় বাইতেও বলব না। তা হলে অপমান বোধ করবেন—খাওয়ার দাম নেওয়া হচ্ছে, এই রকমটা গিয়ে দাঁড়াবে। ভিন্ন রকমের কাজ—

নকড়ি-গোমস্তা তটস্থ হয়ে কাজের নির্দেশ শোনবার অপেক্ষায় আছে।

গান-বাজনার ব্যবস্থা করে দাও। শখের যাত্রার দল গড়ে বৈঠকখানায় মহলা দিন। তাস-দাবা-পাশার দরাজ ব্যবস্থা হোক। বড়-শীঘিতে আর গাঙে-খালে সব ছিপ নিয়ে বসুন। উপস্থিত এই সব মনে আসছে। তুমিও ভাবো না গোমস্তামশায়, ভেবে ভেবে এমনি অনেক বেরুবে। মেয়েদের কি হবে, ছোটবউয়ের সঙ্গে পরামর্শ কোরো। মেয়েদের কথা পুরুষ আমাদের বলা ঠিক হবে না।

জানতে কি ইন্দুমতীর বাকি থাকে? কত ছর কত দিকে, ঠিক ঠিক খবর পৌঁছে দিয়ে যায়। চন্দ্রভানুকে এর পর তিনি একেবারে চোখের আড়াল হতে দেবেন না। একটু বাইরে গেলেই ডাক-পাড়াপাড়ি। সন্দেহ করেছেন। পালঙ্কের প্রান্ত দেখিয়ে বলেন, বোসো—বসে থাক এখানে—

কাতর হয়ে ইন্দুমতী বলে ওঠেন, বোটের ছাত মেরামতের ধুম পড়ল—পালাবে আমায় ফেলে? সংসার নয়, নিজের কথাই বলি আজ। সাগরচকে বারো মাস পড়ে থাক তুমি—যখন এসো, কুটুম্বর মতো কটা দিন থেকে চলে যাও। কোন দিন বলতে গিয়েছি কিছু? রায়বাড়ির বউয়ের আছে স্বামীসুখ নয়, সংসারের খাটনির সুখ। সেই সুখটাই চলে গেল, কী নিয়ে থাকি আমি বলো।

জল ভরে আসে চোখে। এক বিছানায় পড়ে থেকে থেকে সিংহিনী-বউর কী হয়েছে—কথায় কথায় চোখে জল। বলেন, সাধের সংসার পিছলে বেরিয়ে গেছে আমার হাত থেকে। তুমি আছ তাই—চলে গেলে একটা মানুষও আর ঢুকবে না আমার ঘরে। একটা কথা বলি আজ তোমায়। নিজের জন্য কোন-দিন কিছু তো চাই নি—সারা জীবনের মধ্যে আজকে একটা প্রার্থনা—

চন্দ্রভানু অভিভূত হয়ে শুনেছিলেন। বললেন, বলো—

চলে যাবার আগে তোমার বন্দুকের গুলিতে আমায় শেষ করে যাবে। বেঁচে থেকে চোখ মেলে নিজের হেনস্থা দেখতে পারব না।

রায়বাড়ির চিরকেলে দুর্ধর্ষ সিংহিনী ভেঙে পড়লেন একেবারে।

আর এদিকে চিঠির পর চিঠির বন্যা বয়ে চলেছে। বৃন্দাবনের সেই চিঠি এসেছিল। চকে থেকেও ডাকের চিঠির আনাগোনা চলে তেমন সম্ভাবনা মনে ওঠেনি কারো কখনো। কারণও ঘটেনি। ভুল করেছেন চন্দ্রভানু বৃন্দাবনের চিঠির জবাব পাঠিয়ে। চিঠি দিয়েও কথাবার্তা চালানো যায়, তারা বুঝতে পেরেছে। খেয়ার ইজারাদার লিখেছে : সাগর-চকের বাসিন্দাদের দেখাদেখি সবাই এখন মাংনা পারাপার হতে চায়; চন্দ্রভানু চৈত্রমাসে হিসাব করে বছর-খোরাকি ধান দিয়ে দেন, তারা কি দেবে? বললে মারতে আসে।

আমিনের চিঠি : চকের মাঝ বরাবর নতুন রাস্তা হবে—চেন নিয়ে সেই জমির মাপজোপ করতে গিয়েছিল, চেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। রাস্তার বাবদে জমি কেউ দেবে না।

মাইনর ইস্কুলের হেডমাস্টার লিখেছেন : ইস্কুল চলছে বটে, কিন্তু ছাত্র নেই। চন্দ্রভানু যতদিন না ফিরছেন, ছাত্র-লাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

সমস্ত চিঠির এক হস্তাক্ষর। ছোটরায়ের কাছে চিঠি কি ভাবে যাওয়া উচিত—বোধকরি কেউ নিজের উপর ভরসা করতে পারে না, নীহারকে দিয়ে লেখায়।

সর্বশেষ ডাক্তার দীন নন্দনের চিঠি। বুড়োমানুষ দীন ডাক্তারের হাত কাঁপে, তাঁর চিঠি নীহারনলিনীকে তো লিখতেই হবে। লিখেছেন : আলমারির কবজায় মরচে ধরে গেল, অষুধ নিতে কেউ আসে না, আলমারি খোলার আবশ্যক হয় না। চন্দ্রভানু না ফিরলে হবেও না আর। মরচে ধরেছে বোধহয় ডাক্তারের হাটুতেও—চার মাসের মধ্যে বাসাবাড়ির উঠোন পার হয়ে বেরুনোর আবশ্যক ঘটেনি—।

কেবল নীহারনলিনীর নিজের নামে কোন চিঠি নেই।

বাপ রুদ্রভানু গত হবার পর বছরের মধ্যে এগারো মাস চন্দ্রভানুর সাগরচকে কেটে যায়। বিষয়কর্মের দায়ে পড়ে থাকা—গোড়ায় শুধু মাত্র তাই ছিল। তারপরে ভালবেসে ফেলেছেন। ভালবাসেন সাগরচক জায়গাটাকে, এবং জায়গার বাসিন্দা মানুষগুলোকে। দুর্ধর্ষ ছিল তারা এক কালে—এই বেলডাঙার বাড়ি যারা উঠেছিল তাদেরই দোসর। গাঙে-খালে নৌকো মেরে বেড়াত। পেশাই তাই। এমন হয়ে উঠল, মহাজনের নৌকা, ভুলেও ঐ তল্লাটের ছায়া মাড়াত না। মালপত্র যেখানে এক হপ্তায় যাবার কথা, এ-গাঙ সে-গাঙ ঘুরে ঘুরে এক মাসে দু-মাসে পৌঁছত। সরকারও তখন উঠেপড়ে লাগল জোলো-ডাকাত দমনের জন্য। জল-জঙ্গলের নরম দু-পক্ষে কতকটা যেন গেরিলা-লড়াই। তাদের হাতে দেশি-কামারের গড়া গাদা-বন্দুক—কামারশালে বানানো ছররা। সরকারের টোটার বন্দুক হলে হবে কি—জঙ্গলের মধ্যে নদী-খাল জাল বুনে আছে, সকল অন্ধি-সন্ধি নখদর্পণে তাদের। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকো ঘায়েল করে কোন একখানে লুকিয়ে পড়ে। জল-পুলিশ তার পরে এসে চতুর্দিক তোলপাড় করেও খোঁজখবর পায় না।

অঞ্চলের ব্যাপার-বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম—তারও বড়, সরকারের মান-ইজ্জতে ঘা পড়েছে। মরীয়া হয়ে লাগল পুলিশ। বাঁকে বাঁকে পুলিশের ঘাঁটি, স্টীমলঞ্চ আর সাদাবোট অহোরাত্রি চক্কোর দিয়ে ফিরছে। উৎপাত বন্ধ এক রকম। তা হলেও একটা অঞ্চল নিয়ে পুলিশ চিরকাল কিন্তু এভাবে পড়ে থাকতে পারে না—নৌকো-মারারা ওত পেতে আছে, সরে গেলে নির্ঘাৎ সেই আগের অবস্থা হবে। সরকারি তরফের লোকে সেটা জানে।

এমনি সময় জেলার সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে চন্দ্রভানুর বাপ রুদ্রভানু গিয়ে দেখা করলেন। রুদ্রভানু লেখাপড়া তেমন না জানলেও কদর বুঝতেন, চেষ্টা-চরিত্র করে পঞ্চাশ-ষাটটা ইংরেজি কথা মুখস্থ করে নিয়েছিলেন—কথার পৃষ্ঠে কথা জুড়ে সাহেব-সুবোর কাছে যা-হোক করে মনোভাব বোঝাতে পারতেন। রায়েদের নাম সাহেবের কানে গিয়েছিল, খাতির করে রুদ্রভানুকে বসালেন তিনি।

রুদ্রভানু বললেন, ডাকাত-দমনে আমি তোমাদের সাহায্য করব সাহেব। সেইজন্যে এসেছি। উপযাচক হয়ে এলাম তোমার কাছে।

সাহেবের বিস্ময়ের অবধি নেই। নৌকো-মারাদের নেতা এরাই। রুদ্রভানুর বাপ ইন্দ্র-ভানু নৌকোয় নিজে উপস্থিত থেকে দল চালনা করতেন। এখন অবশ্য নিজেরা যান না, তা হলেও শোনা যায় ওস্তাদ-ভাগ একটা থাকে তাঁদের নামে। বেলডাঙার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। তাদেরই ছোটকর্তা প্রস্তাব নিয়ে নিজে হাজির হয়েছেন—

বলছেন, নৌকো-মারা চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ভিন্ন পথে। টোটার বন্দুকে ধরুন দশ-বিশজন ঘায়েল করলেন—তার দুনো-তেদুনো এসে পড়বে। এভাবে কোনদিন শেষ হবে না। একেবারে গোড়া ধরে টান দিন।

সেই গোড়ার কথা ফলাও করে বলছেন রুদ্রভানু : মানুষ আসলে কেউ খারাপ নয় সাহেব। অসৎবৃত্তি কেউ শখ করে নেয় না। ভরণপোষণের দায়ে নিতে হয়, তার জন্য মরমে মরে থাকে। সকলে ভোগ-সুখে বহাল-তবিয়তে আছে—তার মধ্যে কয়েকটা মানুষ কেবল নিরন্ন, শক্তি-সামর্থ্য আছে খাটবার জায়গা পায় না। ধর্মকথা শুনিয়ে কি শাসনের ভয় দেখিয়ে তাদের ঠাণ্ডা রাখা যাবে না। বন্দুক না তুলে জমি-জিরেত দাও তাদের, গৃহস্থ বানাও। নোঙ্গরে মানুষ মাটির মায়ায় পড়ে যাবে। তখন দেখবে ঘর-বাড়ি পরিবার-পরিজন ছেড়ে নড়তে চাইবে না সেই মানুষ।

এই সমস্ত বোঝালেন তিনি সাহেবকে। প্রস্তাবও আছে। লাট বন্দোবস্ত দিতে হবে

নামমাত্র মূল্যে, সুবিধাজনক শর্তে। এখন বাদার জঙ্গল, অসংখ্য খাল-দোখালা, গাছের নিচে ছায়াচ্ছন্ন ভূমিতে নোনাজলের তফরা খেলে বেড়ায় দিবারাত্রি। জঙ্গল কেটে বাঁধ-বন্দি করে সোনা ফলাবেন সেখানে—তিনি এবং দুজন-নৌকো-মারারা মিলে। দলের মধ্যে যারা বুড়োহাবড়া দুর্বল-অশক্ত তারা চলে যাবে বেলডাঙার রায়বাড়ি, তাদের অংশ সেইখানে থেকে নির্ঝঞ্ঝাটে ভোগ করবে।

প্রস্তাব পেয়ে সাহেব লাফিয়ে উঠলেন। এক কথায় রাজি। দলবল নিয়ে রুদ্রভানু উঠে-পড়ে লাগলেন। বেলডাঙার সঙ্গে সম্পর্ক বড় আর নেই। চকেই পড়ে আছেন বারো মাস তিরিশ দিন। সাগরের অনতিদূরে বড় দুই নদীর মোহনার উপর—লোকের মুখে মুখে সাগরচক নাম দাঁড়িয়ে গেল। রুদ্রভানু যা বলেছিলেন ঠিক তাই—চারিদিক প্রায় শান্ত কয়েকটা বছরের মধ্যে। মহাজনি নৌকোর চলাচল শুরু হল আবার। তবে বহর সাজিয়ে যায়—পুরানো বদনামটা রয়েছে, একা-দোকা নৌকো ভাসাতে আজও গা-ছম-ছম করে। নৌকো মারার ব্যাপার একেবারে যে না ঘটে, এমন নয়। নিতান্তই কালে ভদ্রে।

চর নয়, এক রাজ্যপাট। টিলায় টিলায় গ্রাম। নৌকো-মারা যাদের একদা একমাত্র পেশা ছিল, পুরোপুরি গৃহস্থমানুষ তারা। জমির চাষ করে, ফসল তোলে। গরু-বাছুরের কল্যাণে উঠানে মানিকপীরের গান দেয়। সাঁজের বেলা শাঁখ বাজিয়ে মেয়ে-বউরা ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপুজো করে। ক'টা বছরের মধ্যে এত সমস্ত। লোভে বেড়ে গিয়েছে, রুদ্রভানু এক গুরুমশায় জোগাড় করে পাঠশালা বসিয়ে দিলেন। ছোঁড়াগুলো নেহাৎপক্ষে সাদামাটা যোগ-বিয়োগ আর কাঠাকালি বিঘেকালি শিখে নিক।

অন্য সমস্ত বেশ ভালো, এই পাঠশালা করেই বিপদ ঘটল। তারপরে যে ক'টা বছর রুদ্রভানু বেঁচে ছিলেন ছেলে জোটাতে হিম-সিম হতেন। গরু রাখা এবং ক্ষেতে পান্তা-ভাত বওয়ার মতো জরুরি কাজ ছেড়ে পাঠ-শালা ঘরে অলস হয়ে ক-খ-ঠ করবে, কোন মুরুব্বি পছন্দ করে না এটা। নিঃসীম মাঠ আর কূলহীন নদী চতুর্দিকে—পড়ুয়া-দেরও মন-উড়ু-উড়ু। কখনো চোখ রাঙিয়ে কখনো বা মুক্তহাতে টাকা-পয়সা ছড়িয়ে ছাত্র জোটাতে হত।

চন্দ্রভানুর আমলে এসে পাঠশালার এই গতিক দেখে আরও তাঁর জেদ বেড়ে গেল। পাঠশালা কি—তিন-চারখানা ঘর তুলে মাইনর ইস্কুল বসালেন এই জায়গায়। পণ্ডিত একজন ছিলেন, সে জায়গায় পাঁচ-পাঁচজন মাস্টার।

কপালক্রমে এই সময়ে আবার দীননাথ নন্দন ডাক্তারকে জোটানো গেল। সদরে প্রাক-টিশ করে দীন-ডাক্তার দস্তুরমতো নাম করেছেন। চন্দ্রভানুর সঙ্গে দহরম-মহরম খুব। বুড়ো বয়সে ডাক্তারকে হাঁপানি ডিস-পেপসিয়া ইত্যাদি গন্ডা দুই-তিন রোগে ধরল। রোগির চিকিৎসা বন্ধ করে, নিজের চিকিৎসাই করেন শুধু। চন্দ্রভানু বলেন, চলে আসুন দিকি আমাদের সাগরচকে। এসে টাটু-ঘোড়ার পিঠে চড়ে গাঙের ধারে বাঁধের উপর ছুটোছুটি করুন। মাছ-জাম্বা, মাছ-চচ্চড়ি, মাছের ঝাল-ঝোল, মাছের অম্বল—এক পাতে বসে মাছের আট-দশটা তরকারি খেতে লাগুন। ভয় পেয়ে রোগ পালিয়ে যাবার দিশা পাবে না। নিজে আরোগ্য হবেন, অন্য দু-চারকে আরোগ্য করে পুণ্যকর্ম করবেন। সে পুণ্য আমি মাংলা করতে বলি নে, কাছারি থেকে যথাবিধি বৃত্তির ব্যবস্থা হবে।

এ হেন বিচক্ষণ ডাক্তারটি পেয়ে ডাক্তার-খানা খোলা হল সাগরচকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য—উভয় দিকের ব্যবস্থা। রোগি না আসতে পারে তো ডাক্তার নিজে ঘোড়ায় অথবা নৌকো যোগে গিয়ে ব্যবস্থা দিয়ে আসবেন। অষুধও রোগির বাড়ি গিয়ে পৌঁছবে, এবং অবস্থা বিশেষে পথ্য। একটি পয়সা লাগবে না কোন বাবদে।

ডাক্তারখানারও সেই পাঠশালার দশা। আলমারি ঠাসা অষুধ, ডাক্তারবাবু ধবধবে জামা গায়ে চাড়িয়ে বসে আছেন, কিন্তু রোগির টিকি দেখা যায় না। এই খোলা-মেলা জায়গায় লোকের স্বাস্থ্য ভাল, সেটা মানি। তা বলে কি তুচ্ছ জ্বরজারিটাও হতে নেই? হলে গোপন করবে, প্রকাশ হতে দেবে না কিছুতে। ডাক্তারের ভয়ে। ডাক্তারি অষুধ উৎকট তেতো, এবং ডাক্তার ভাত বন্ধ করেন কথায় কথায়। অসুখে এদের মারতে পারে না, কিন্তু পেটে একটা বেলা ভাত না পড়লে মরার দাখিল হয়।

তবে নীহারনলিনী এসেছে দীন-ডাক্তারের সঙ্গে। চালাকিটা বুঝতে কিছুদিন গেল। মেয়েলোক হওয়ায় সুবিধা—পটাপট লোকের ঘরে ঢুকে পড়া যায়। অসুখ করেছে, অথচ ডাক্তার না দেখিয়ে লেপকাঁথা জড়িয়ে নিঃসাড়ে পড়ে আছে—সেটা এখন আর হবার জো নেই। নীহার দেখে এসে দীন-ডাক্তারকে সঙ্গে করে আবার সে বাড়ি যাবে। ডাক্তার ব্যবস্থা দিয়ে ফিরবেন, নীহার তার পরেও থাকবে। নিজ হাতে অষুধ খাইয়ে এবং পথ্যের যথোচিত ব্যবস্থা করে তবে ছুটি। ফাঁকি দিয়ে বিনা চিকিৎসায় রোগ সেরে না ফেলে।

যেখেপুনে মাইনর ইস্কুলের হেডমাস্টার নীহারকে ধরলেন: রোগির জন্যে তোমার ঘোরাঘুরি তো আছেই, ঐ সঙ্গে আমার ছোঁড়াগুলোর একটু খোঁজখবর নিও তো মা। নানান ছুতোয় ইস্কুল কামাই করে।

রোগিদের ছিল, এবার ছেলেদেরও বড় বিপাক। ইস্কুলে যাওয়ার বাবদ নীহারের তাড়া খেতে হচ্ছে। যেখানেই পালাক, ঠিক তার নজরে পড়বে, ধরে নিয়ে ইস্কুলে বসিয়ে দেবে। গতিক এমন, মাঠ পার হয়ে বাঘের ভয় তুচ্ছ করে একদিন বাদায় গিয়ে পড়ল ইস্কুল-পালানো গোটাকতক ছেলে। বাঘ কোথায় লাগে নীহারনলিনীর কাছে!

দীন-ডাক্তার নীহারের পরিচয় দিয়ে থাকেন: মেয়ে আমার। কখনো বলেন, পূর্বজন্মের মা। ছেলে জ্বরায় ব্যাধিতে অথর্ব হয়ে পড়ছে,—মা-জননী আড়ালে থাকতে পারল না, ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে। এর অধিক তাঁর মুখ থেকে পাওয়া যায় না। একা মানুষ ডাক্তার—প্রথম বয়সে বউ আর মেয়ে মারা গেল, তারপরে আর সংসারের ঝঞ্ঝাটে যান নি। অবিশ্যি সমাজে এই নীহার মেয়েটা এসে জুটল। ঘরের মধ্যে ডাক্তারের দেখাশুনা করে, বাইরে রোগিদের অষুধপত্র দেয়। নার্সের কাজও করতে হয় দায়ে-দরকারে। কী যে না করে, বলা যাবে না। ডাক্তারের পুরো গার্জেন সে-ই।

অভাগিনী মেয়েটা, বড় দুঃখের জীবন। কিছু লেখাপড়া জানে, এক বয়সে রূপসী বলে খ্যাতি ছিল। কিন্তু বিয়েথাওয়ার দিকে গেল না—মা আর ছোট ভাইদের কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবে? মাস্টারি করে সংসার চালিয়েছে, লেখাপড়া শিখিয়েছে ভাইদের। বড় হয়ে তারা চাকরিবাকরি করছে এখন, সংসারধর্ম হয়েছে। এবারে বিয়ে করলে ক্ষতি নেই। প্রয়োজনও বটে—বউরা খিটখিট করে, অনাবশ্যক ভারবোঝা মনে করে নীহারকে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে লালিত্য ঝরে গেছে, বিয়ে আর হবে কেমন করে? সে এক দীর্ঘ কাহিনী। এমন শান্ত বুদ্ধিমতী—তবু শেষ পর্যন্ত মাথা খারাপ হল নীহারনলিনীর। উদ্দণ্ড পাগল। দীন-ডাক্তার দেখছিলেন, চেষ্টাচরিত্র করে তিনিই হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসা করালেন। সুস্থ হল নীহার, কিন্তু তখন সমস্যা, ভাইরা বাড়িতে রাখতে চায় না আর। বউদের ঘোরতর আপত্তি। ভয় করে তাদের, পাগলের চাউনি দেখে আঁতকে ওঠে। ছেলেপুলে কোলে নিতে গেলে বউরা ছিনিয়ে নেয়, পাগলের খেয়াল—দিলই বা মোক্ষম চাপ আদর করতে গিয়ে। এই-সব নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধে যখন-তখন। শেষটা নীহারনলিনী নিজেই রাগ করে বেরুল। বাঁচল ভাইরা। দীন-ডাক্তার আদর করে ডেকে নিলেন: সংসার-সংসার করে তুই পাগল। আমি ডাক্তার—আসল রোগ তোর কি সেটা জানি। আমি নিজে আর আমার রোগিপত্তর মিলে এখানেও সংসার একটা। এতবড় সংসার কোনখানে পাবিনে—এই সংসারের মালিক হয়ে থাক তুই।

দীন-ডাক্তার ধরেছেন ঠিকই। নিজ কর্তৃত্বে খাটতে পারলে নীহারনলিনী আর কিছু চায় না। ডাক্তারের কাছে বড় আনন্দে আছে। যত কাজ স্ফূর্তি ততই বেড়ে যায়। এ হেন কর্মিষ্ঠা মেয়ে পেয়ে চন্দ্র-ভানুর মাথায় আবার এক নতুন মতলব উদয় হল। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোই বা বাড়িতে কেন পড়ে থাকবে? তাদের জন্য মেয়ে-পাঠশালা হোক। নীহারনলিনী একেবারে সর্বময়ী এ ব্যাপারে—মেয়ে-পাঠশালার ছাত্রী জুটিয়ে আনা থেকে পড়ানো। নতুন খাটনি পেয়ে আহার-নিদ্রা ভুলে লেগে গেছে। কিন্তু এতদিন যা হোক এক রকম হয়েছে, এইবারের বাধা ঘোরতর। মেয়ে কেউ পাঠ-শালায় দেবে না। বাসন-মাজা, রাঁধাবাড়া, গোয়াল-বাড়ানো, ধান-ভানা, ছেলে-ধরা—কাজের তো অন্ত নেই। শৌখিন লেখাপড়া নিয়ে বসবে কখন এর মধ্যে?

খোদ চন্দ্রভানুকেই শেষে আসরে নামতে হল: কী সমস্ত বলাবলি হচ্ছে নাকি মাতব্বর?

ঘাড় তুলে চন্দ্রভানুর সঙ্গে কে মুখোমুখি করবে? বেমালুম অস্বীকার: ছুটকো মানুষ কোথায় কি বলল—সে কিছু নয়। সাগরচক আপনার—জমাজমি ঘরবাড়ি

ছেলেমেয়ে বাচ্চাবুড়ো সকলের মালিক আপনি। যাকে যেখানে নিয়ে বসালে ভাল হয় সেইখানে বসাবেন আপনি।

অবস্থা এই। নীহারনলিনী সকলের জবানি চিঠি লিখে দিয়েছে, নিজের নামে কিছু লেখে নি। চন্দ্রভানুই লিখলেন তাকে : ডাক্তারবাবুকে নিয়ে চলে এসো। ফন্দী আমি এখানে। তোমরা এসে উদ্ধার না করলে বেরোবার কোন উপায় নেই।

দীন-ডাক্তার ও নীহারনলিনী এসে পড়ল। ডাক্তার বলেন, চিঠি না পেলেও এসে পড়তাম। বলেন কি ভায়া, অব্যবহারে স্টেথিসকোপের নল-দুটো অবধি আরশুলায় ফুটো করে দিয়েছে।

নীহার বলে, ডাক্তারখানার এই দশা শুনলেন। ইস্কুলের অমন সুন্দর ঘরবাড়িতে দিনদুপুরে ইঁদুর-ছুঁচো কিচকিচ করে বেড়ায়। মাইনর ইস্কুলের মাস্টারমশায়রা ঠিক ন'টায় দশটায় ঘণ্টা বাজিয়ে তাস নিয়ে বসেন, চারটের সময় ছুটির ঘণ্টা দিয়ে বাড়ি ফিরে যান।

দীন-ডাক্তার নিশ্বাস ফেলে বলেন, কিছুই গড়ে তোলা গেল না। তাসের ঘর। আপনি ক'টা মাস গরহাজির, চারিদিক দিয়ে সব ধসে পড়ছে। এদ্দিন চকে পড়ে থেকে নিজের শরীরটাই কেবল তাগড়াই করে এলাম। অন্যের কোন-কিছুই হল না।

মানুষের ভাল করা বড় সহজ নয়। চন্দ্রভানু অনেক রকমে ঠেকে বুঝেছেন। সর্বক্ষণ চোখ পাকিয়ে সামলে রাখতে হয়, শৈথিল্য পেলে আর কিছু হতে দেবে না। কিন্তু মনোবেদনা বাইরে থেকে টের পাওয়া যাবে না, হাসিমুখে তিনি সব শুনে যাচ্ছেন। একমুখ হেসে বললেন, ভালই হল। কাজ এবার এখানে—এই রায়বাড়ি। ডাক্তারখানা নেই, ইস্কুল নেই—এত সহজে তাই আপনাদের পেয়ে গেলাম।

ইন্দুমতীর অবস্থা বললেন, ডাক্তারের জিজ্ঞাসার উত্তরে যাবতীয় লক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করলেন : ধনঞ্জয় কবিরাজ গোড়া থেকে দেখছেন। নিজের উপর তিনি ভরসা রাখতে পারছেন না। আপনি নিরাময় করে দিন ডাক্তারবাবু। ছোটবউয়ের বোঝা তার কাঁধে তুলে দিয়ে খালাস হই। আমি যেতে পারলে চকে যেমন ছিল, তেমনি আবার সব চলবে।

ডাক্তার আর নীহারনলিনীকে নিয়ে চন্দ্রভানু রোগিণীর ঘরে গেলেন। দীন-ডাক্তার ইন্দুমতীর জানা, চিকিৎসার ব্যাপারে অনেকবার এ-বাড়ি এসে গেছেন। অবাক হলেন ইন্দুমতী নীহারকে দেখে। ধবধব করছে গায়ের রং। বয়স হয়েছে—কিন্তু দেহ ছেড়ে যৌবনের বিদায় নেবার লক্ষণ নেই।

মুগ্ধ চোখে মুহূর্তকাল তাকিয়ে ইন্দুমতী বললেন, নোনারাজ্যে এই পদ্মফুল পড়ে ছিল?

দীন-ডাক্তার হেসে বলেন, নোনারাজ্য থেকে তোমায় সরোবরে এসে উঠলাম বউমা। বাপ আর মেয়ে আমরা অসুখের সঙ্গে লড়াইয়ে নামছি—আমার অষুধ আর নীহারের সেবাযত্ন। দেখি, অসুখ কদ্দিন আর তোমায় শুইয়ে রাখতে পারে!

দীন নন্দন হেন ডাক্তারের কথায় ইন্দুমতীর হাসি ফুটল অনেক দিনের পরে। সকাল-সন্ধ্যা দু-বার করে ডাক্তার দেখেন, নীহারনলিনী সর্বক্ষণ ছায়ার মতন ইন্দুমতীর কাছে আছে। কিছুদিন পরে পাকা রায় পাওয়া গেল। নতুন কিছু নয়, ধনঞ্জয় কবিরাজেরই কথা। ইন্দুমতীর বাকি জীবন বিছানার উপরে কাটবে, আর উঠতে হবে না। ধনঞ্জয়ের বিদ্যেসাধ্যি না থাক, ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা আছে। নাড়ি ধরেই সব বুঝতে পারে।

চন্দ্রভানু হাহাকার করে ওঠেন : উপায়? চক যে আমার রসাতলে যাবার দাখিল। ছুটে গিয়ে পড়বার জন্য ছটফট করছি।

চিন্তাকুল ডাক্তার মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়েন : কোন উপায় দেখিনে। অবস্থা আরও বরঞ্চ খারাপ হবার সম্ভাবনা। দেহের নিচের দিকটা এখন অসাড়—এমন হতে পারে, কোন অঙ্গেরই সাড় থাকবে না। মুখের কথা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

ভবিষ্যতের এক ছবি খেলে যায় চন্দ্রভানুর মনের উপর দিয়ে। নির্মম নৃশংস ছবি—মানুষের মন বাইরের লোকে দেখতে পায় না, এই বড় রক্ষা। চন্দ্রভানু যেন বিপন্ন সাগরচকে চলে যাচ্ছেন ইন্দুমতীর চোখের সামনে দিয়ে। চকের চেয়ে বড় কিছু নেই তাঁর কাছে। ইন্দুমতীর বাকশক্তি নেই, কিন্তু টনটনে চেতনা। নিষেধ করবার শক্তি নেই, প্যাটপ্যাট করে চেয়ে দেখছেন শুধু। জল পড়ছে হয়তো বা চোখের কোণ দিয়ে। হবেই যখন সেই অবস্থা, তাড়াতাড়ি এসে যাক। দেরি কেন? ইন্দুমতী দিনে দিনে যত অশক্ত হচ্ছেন, তত জোরে আঁকড়ে ধরছেন চন্দ্রভানুকে। পঙ্গু স্ত্রীর আর্তনাদের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়া অসম্ভব।

ক্ষমতা বটে নীহারনলিনীর। ক'টা দিনের মধ্যে ইন্দুমতী তাকে যেন চোখে হারাচ্ছেন। গোবিন্দসুন্দরী একটু-আধটু রোগির কাজ করছিলেন, সামনে হাজির থাকলেও এখন আর ইন্দুমতী তাঁকে কিছু বলেন না। নীহার আসার পরে এই হয়েছে। শতমুখে নীহারের প্রশংসা : আপনাদের ডেকে ডেকে সারা হতাম পিসিমা, এখন মুখের কথা মুখে থাকতেই কাজ হয়ে যায়। ভারি গুণের মেয়ে নীহার, একটি দোষ খুঁজে পাইনে।

গোবিন্দসুন্দরী একদিন বলে বসলেন, আছে বইকি দোষ—

অসহ্য লাগে। নতুন একটি আবার উড়ে এসে জুড়ে বসল। তাঁরা যেমন তেমনি রয়ে গেলেন। বললেন, দোষ আছে বউমা—সর্বনেশে দোষ। সেই এক দোষে সমস্ত মাটি।

কৌতূহলী ইন্দুমতী প্রশ্ন করেন, কি দোষ পিসিমা?

রূপ। বয়স হয়েছে, কিন্তু রূপের আগুনে নিভল কই? আগুনে কতজনের কপাল পুড়িয়ে এলো, ঠিক কি! সামলে রেখো বউমা, খাণ্ডব-দাহন না হয়।

ইঙ্গিতের মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ নেই। ইন্দুমতীর ক্লান্ত মুখের উপর ক্ষীণ হাসি খেলে যায়। বললেন, এমনিই চেয়েছিলাম পিসিমা। দোষ যে আমারও আছে। কুশ্রী মানুষের হাতে খেতে পারি নে, ঘেন্না করে। দেখতে পান না, খাওয়ার সময়টা ক্ষীরো-ক্ষীরো করে ডাক পাড়ি?

চন্দ্রভানু এই সময়টা দীন-ডাক্তারকে নিয়ে আসছিলেন। গোবিন্দসুন্দরী উচিত মতো জবাব পেয়েছেন—খুশি হলেন কথাবার্তা শুনে। ক্ষীরোদা গৌরাঙ্গী—গোবিন্দসুন্দরী এখন বুড়ো হয়েছেন বলে নয়, বয়সকালেও তাঁর রূপের খ্যাতি ছিল না। ঠিক হয়েছে যেমন লাগতে আসেন। ধক করে একটা জিনিস চন্দ্রভানুর মনে এসে যায়—চকে পালানোর উপায় একটা বোধহয় আছে। এখনই হতে পারে।

ইন্দুমতী ডাক দিলেন : নীহার—

নীহারনলিনী সঙ্গে সঙ্গে বেলের পানা নিয়ে আসে। বেল গুলে ঘরে-পাতা দইয়ের সঙ্গে মেশানো। জমশলার কালো গুঁড়ো উপরে ভাসছে। অনেক কষ্টে ঘাড় একটু তুলে ইন্দুমতী একচুমুকে খেয়ে তৃপ্তি ভরে বললেন, আঃ—

গোবিন্দসুন্দরীর দিকে চেয়ে সগর্বে বললেন, দেখলেন! মুখেও কিছু বলতে হয় না আমার। ডাক শুনে বুঝতে পারে কখন কি লাগবে। সাধে ভালবেসে ফেলেছি! ওর গুণ যে আমার চুলের মুঠি ধরে ভালবাসিয়ে ছাড়ে।

দীন-ডাক্তারকে বলেন, এখন আমার ইচ্ছে হয় কি জানেন? আপনার অষুধ আর নীহারের যত্নে সেরেসুরে যদিই বা ভাল অবস্থা হয়, ইচ্ছে করেই আমি ভাল হব না। ভাল হলে তো নীহারকে নিয়ে চলে যাবেন। ওকে আমি ছাড়তে পারব না।

আশায় আশায় চন্দ্রভানু বলে ওঠেন, তবে আর কি, নীহারকে নিয়ে সংসারধর্ম কর। ডাক্তারবাবু রইলেন, চিকিচ্ছের ত্রুটি হবে না। সাগরচকের গতিক দেখেবুঝে আসি একবার—

না—। কথা নয়, যেন গর্জন করে উঠলেন ইন্দুমতী।

চন্দ্রভানু তবু বলে যাচ্ছেন, গিয়ে তোয়াজ করি গে। চক বিগড়ালে রসদ কে যোগাবে? রসদ বিনে সংসার যে অচল।

প্রাণপণ চেষ্টায় ঘাড় একটু নেড়ে ইন্দুমতী জোর দিয়ে বললেন, না-না-না—। এক চোখের তারাটি দপ করে একবার যেন জ্বলে উঠল। চন্দ্রভানু দেখতে পেলেন সেই সিংহিনী—কেশর ফোলানো। নিরাশ হলেন।

সকলে চলে গিয়ে ঘর নিভৃত হল। ইন্দুমতী আর চন্দ্রভানু। ইন্দুমতী বললেন, কী বললে তুমি—নীহারকে নিয়ে সংসারধর্ম করব! নীহার দ্বিতীয় পক্ষ নাকি তোমার? তা হলেও হবে না। ভাঁড়ারের চাবি শাশুড়ি আমার আঁচলে বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁর শাশুড়ি আবার তাঁর আঁচলে বেঁধেছিলেন। আমি উঠতে পারি না বলে সে জিনিস তোমার কাছে রয়েছে। আর দিতে পারি ধ্রুবর বউয়ের আঁচলে। আমায় খাড়া করে দাও, আর নয়তো ধ্রুবর বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে এসো—চলে যাবার কথা তার আগে বলতে এসো না।

দুয়ের কোনটাই দু-দশ দিনের মধ্যে হবার নয়। ঝড়-বাদলের দুর্যোগের মধ্যে

নদীকূলে নিঃসহায় ফেলে-আসা সাগরচক সর্বক্ষণ ছোটরায়ের মন জুড়ে রয়েছে। চক একদিন জলতলে ছিল। নিঃসীম জলের মাঝখানে বাঁধ ঘিরে তাঁর বাপ রুদ্রভানু রায় ডাঙা আদায় করে নিলেন। সে ডাঙায় ফসল ফলে, সে ডাঙায় মানুষ ঘরের পর ঘর তুলে যাচ্ছে। সে ডাঙায় রাস্তাঘাট সাঁকো-পুল ইস্কুল-পাঠশালা—এবং ডাক্তারখানা। হিংসায় জল বুঝি ফেটে মরছে। বাঁধের উপর ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্রভানুর কত দিন মনে হয়েছে, ষড়যন্ত্র ঐ জলের নিচে। খলখল ছলছল করে কুটিল পরামর্শ—কোনখানে এতটুকু ফাঁক পেলে মাথা গলিয়ে ব্যূহের ভিতর ঢুকে মাটির বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে চক আবার পাতালরাজ্যে নিয়ে যাবে। কোটালের মুখে পাহাড় প্রমাণ ঢেউ অধীর হয়ে আছড়ে পড়ে চতুর্দিক থেকে। ঘন বর্ষায় অনাতিদূরের সমুদ্র ঘোর গর্জনে ডাক দেয়—দুড়ুম-দাড়াম আওয়াজ ক্ষণে ক্ষণে। সমুদ্রের তলে কামানের লড়াইয়ের মহড়া চলেছে যেন।

ইন্দুমতী বলেন, অত ছটফটানি কেন তোমার বলো দিকি। কাছে একটু বসে থাকতে চাও না। যেন জল-বিছুটি মারে এখানে।

কাতর চন্দ্রভানু বলেন, এই তো আছি বসে।

বসে ফালুক-ফুলুক করছ। সরে পড়তে পারলে বাঁচো। এমনধারা কই আগে তো ছিল না। ডাক্তারবাবুরা এসে পড়বার আগে।

তোমার মনের ভুল ছোটবউ।

ইন্দুমতী রেগে বলেন, চোখদুটো কানা হয়নি এখনো। কানা হয়ে যাই, তখন ভূতের নত্যে কোরো। কিছু দেখতে পাব না, বলতেও যাব না।

হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বিস্তর দিন শয্যাশায়ী থেকে মনমেজাজ তিরিক্ষি। বাঁকা কথা ছাড়া মুখে নেই, কথায় কথায় কেঁদে ভাসান। যখন দৌড়-ঝাঁপ পারতেন, এত মানুষের মস্তবড় সংসার ছাড়া অন্য কিছু তাকিয়ে দেখবার ফুরসত ছিল না। দেহ যত অসাড় হয়ে আসছে, স্বামীকে ততই ধরে থাকতে চান। আতঙ্ক লাগে চন্দ্রভানুর—পঙ্গুর পাশে থেকে থেকে নিজেও বোধ করি পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। মুক্ত জায়গায় থাকার মানুষ—শয্যার পাশ থেকে পালাবার জন্য আঁকুপাকু করেন তিনি।

কোথায় গিয়েছিলে? দুপুর থেকে একেবারে দেখলাম না।

অভিযোগ মিথ্যা নয়। দুপুরবেলা ইন্দুমতী চোখ বুজে ঝিম হয়ে ছিলেন। ফাঁক বুঝে চন্দ্রভানু পালিয়েছিলেন সেই সময়।

ছিলে কোথায় তুমি?

আমতা-আমতা করে চন্দ্রভানু বলেন, কোথায় আবার! কাছারিঘরে গিয়ে জমা-খরচটা দেখছিলাম একটু।

ক্রুদ্ধ ইন্দুমতী বললেন, মিছে কথা। বাড়িতেই ছিলে না তুমি, খিড়কির বাগানে গিয়েছিলে।

এটাও ঠিক। চন্দ্রভানু খিড়কির পুকুর-ঘাটে হুইল-ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসে-ছিলেন। সংকটাপন্ন স্ত্রীকে একলা ফেলে মাছ ধরা—এ হেন হৃদয়হীনতার ব্যাপার খুলে বলা চলে না, এটা-ওটা বলতে হয়। অথচ গোপন নেই সেই আসল মানুষের কাছে। সংসার ইন্দুমতীর—লোকজন তাঁরই অনুগত। ভাল হয়ে উঠে আবার হাল ধরবেন, সকলে জেনেবুঝে রয়েছে। একজন কেউ চুপিচুপি খবর পৌঁছে দিয়ে ভাল হয়ে গেছে তাঁর কাছে।

একবার যা বলা হয়ে গেছে সেই জিনিসই ধরে থাকতে হয়। চন্দ্রভানু তম্বি করে বলেন, হুঁ, বাগানে গিয়েছিলাম! শুয়ে শুয়ে দেখেছ তুমি!

দেখতে হয় না, তোমার মুখে তাকিয়ে পড়তে পারি। কেন গিয়েছিলে তা-ও জানি। নীহারনলিনীর সঙ্গে জলকেলি করতে।

ইন্দুমতীর কথাবার্তা এমনি হয়েছে ইদানীং। এক বিছানায় পড়ে থেকে হয়েছে। জ্বলে উঠলেন চন্দ্রভানু। তা সত্ত্বেও সামলে নিতে হল। দীন-ডাক্তারের উপদেশ : শুনে যাবেন, জবাব দিতে যাবেন না। কথা কাটা-কাটিতে উত্তেজনা বাড়বে। পাগলে বলছে, তাই ভাববেন। একদিন সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

হয়েছে, ঠিকই তো হয়েছে! রাগ নিভে গিয়ে হাসি জাগল চন্দ্রভানুর মুখে। এক মতলব এসে গেছে।

নীহারনলিনীকে নিভৃতে নিয়ে বললেন, যা বলছি শোন মন দিয়ে। হেসো না।

ইতস্তত ভাব আসছিল বোধ হয়। একবার কেশে গলা সাফ করে নিলেন। অতিশয় গূঢ় বৃত্তান্ত, সেটা বোঝা যাচ্ছে। নীহারনলিনী উন্মুখ হয়ে আছে।

চন্দ্রভানু বললেন, প্রেম করতে হবে আমার সঙ্গে।

ভ্রূভঙ্গি করে নীহারনলিনী বলে, হাসতে মানা করলেন, সে জন্যে হাসছি নে। কিন্তু প্রেম আমি করলেও আপনি তো করবেন না। করবেন কোনখানে গিয়ে? বেলডাঙা রায়বাড়ির শতেক কান শতেক চোখ। বিনি কাজের মানুষে বাড়ি বোঝাই—ঠারেঠোরে এমনিই কত রকমের কথা চলছে। আর সাগরচকে যখন ফিরে যাব—হায়রে কপাল! দিন-রাতগুলো চব্বিশ ঘণ্টার না হয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টার হলেও তো সিকি মিনিট আপনার অপব্যয়ের ফুরসত হবে না। বুড়ি হতে চললাম— একতরফা প্রেম করে মুনাফাটা কী আমার?

মুনাফা মস্তবড়। তোমার না হোক, আমার। আমারই বা কেন—সাগরচকের। ঠিকই বলেছ তুমি নীহার, সাগরচকে সিকি মিনিটের সময় নেই—কাজ কাজ আর কাজ। প্রেম-প্রণয় যত কিছু বেলডাঙার এই রায়-বাড়ির ভিতরে।

কথাবার্তার ধরন রহস্যময়। নীহার বুঝেও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। চন্দ্র-ভানুর মুখের দিকে চকিতে একবার চেয়ে নিয়ে বলে, এই বাড়ি? রক্ষে করুন। আমার অত সাহস নেই। বাড়িময় বউঠানের চর। ঐ যে দেখুন, গোবিন্দঠাকরুন—আপনার পিসিমা। গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছেন। বেচাল কিছু দেখলেই পুটপুট করে লাগাবেন। না দেখলেও বানিয়ে বলবেন যদ্দুর পারেন।

চন্দ্রভানু এক কাণ্ড করে বসলেন। নীহারের একেবারে কানের কাছে মুখ এনে অকারণে এদিক-ওদিক বার কয়েক তাকিয়ে ফিস ফিস করে কুশল প্রশ্নের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন : আছ কেমন নীহার? ঘুম-টুম ভাল হয় রাত্রে? দিনমানটা কেমন লাগে? চক ভাল না এই বেলডাঙা? সাঁতারের অভ্যাস তোমার—তা দেখ, দীঘিটা বড্ড সদরের উপর, দীঘিতে সুবিধা হবে না। তুমি বরঞ্চ—

অকস্মাৎ থামলেন, কথাটুকুও শেষ করলেন না। গোবিন্দসুন্দরীকে দেখানোর জন্যে—সরে গেছেন তিনি, উপরে উঠে গেছেন। আর এখন ফিসফিসানির প্রয়োজন নেই।

ফল অনতিপরেই দেখা দিল। ইন্দুমতী গদগদ নীহারের উপর। বললেন, তোমার মতন কাজের মেয়ে দেখিনি আমি। বিপদ-ভঞ্জনকে খুব ডাকাডাকি করি, তিনিই এনে দিয়েছেন। আজ থেকে পাশের এই ছোট ঘরে শোবে তুমি—এক ডাকে যাতে পাওয়া যায়। রাত্রে আমার জলতেষ্টা পায় এক একদিন।

সেই পাশের ঘরে যেতে হয় ইন্দুমতীর ঘরের ভিতর দিয়ে। বাইরের দিককার দরজা তালা এঁটে বহুকাল থেকে বন্ধ। ব্যবস্থা শুনে চন্দ্রভানু মুখ টিপে হাসলেন। অষুধ ধরেছে।

তাঁর উপরেও আছে। ছোটরায়কে ইন্দুমতী বললেন, তুমি নিচের তলায় চলে যাও। নীহার রয়েছে, আর কোন ভাবনা নেই। রোগির কাছে উদ্বেগে তোমার ঘুম হয় না, দেহ আধখানা হয়ে যাচ্ছে। আমি এই পড়ে আছি—এর উপরে তুমি পড়লে তো একেবারে সর্বনাশ। সে আমি হতে দেবো না।

সেই নতুন ব্যবস্থা। চন্দ্রভানুকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন ইন্দুমতী, মন্ত্রবলে যেন সেই মুঠো আলগা হয়ে গেল। নীহার-নলিনীকে চোখে হারাচ্ছেন এখন। পাশের ছোট্ট ঘরখানায় নীহারের জন্য তক্তাপোশ একটা। রাত্রে ইন্দুমতী একটু-আধটু যা ঘুমাতেন, তা-ও বন্ধ একেবারে। ক্ষণে ক্ষণে সাড়া নেন : ও নীহার—

নীহার বলে, জল দেবো?

না, এমনি ডাকলাম। তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি। পরের ঘরের মেয়ে, কতদূর থেকে এসেছ—যা যখন দরকার বলবে, লজ্জা করবে না—কেমন?

দিনমানে কোন এক নিভৃতে নীহার-নলিনী হেসে হেসে চন্দ্রভানুকে বলে, বড্ড ভালবাসা ছোটরায়, ভালবাসার চোটে লহমার তরে ঘুমোতে দেন না। নতুন বিয়ের বরকে হার মানিয়ে দেন, এত ভালবাসা বউঠানের।

চন্দ্রভানু প্রসন্ন। মুক্তি খানিকটা এগিয়েছে। বাড়ি ছাড়া না-ই হোন, ঘর ছাড়া অবধি হয়েছে আপাতত। মনের কথাটা নীহারনলিনীকে বললেন। অন্যে শুনলে বলবে, স্ত্রীর এই অবস্থা, তুমি এখন ফাঁক কাটাবার তালে আছ। বড় স্বার্থপর তো তুমি। কিন্তু নয় কে শুনি—নিজের মতন কোন মানুষ কবে অন্যকে ভালবেসেছে?

ফাল্গুনের শেষে, খুব দেরি তো চৈত্রের গোড়ায় সাগরচক থেকে ধানচালের ভরা এসে পৌঁছায়। এবারে কি হল—চৈত্র গিয়ে বৈশাখ পড়ে গেল, ভরার তবু উদ্দেশ নেই। চন্দ্রভানু নেই, অতএব বৃন্দাবনের উপর ভার। 'আসছি' 'আসছি' করছে বৃন্দাবন, দু-দুবার লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছে—কিন্তু আসে না। রায়বাড়ির সারা বছরের রসদ—বাড়ির ঘাটে এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই।

এলো অবশেষে। অন্য বারে যা আসে, পরিমাণে তার অর্ধেক। এই জোটাতেই হিমসিম—গোলার তলা অবধি কুড়িয়ে তুলে এনেছে। তাতে কুলোয়নি—সম্পন্ন চাষীদের গোলা থেকে আনতে হয়েছে। ধারই বলতে হবে—পাওনা নেই তবু চেয়েচিন্তে আনা, ধার বই কি বলা চলে? আগামী সনের খাজনা বাবদে কাটান যাবে।

বৃন্দাবনের কাছে চন্দ্রভানু চকের কথা শুনেছেন। কতদিনের অদর্শন, উদ্বেগের তাই অন্ত নেই। দুই প্রান্তের গাঙ দুটো যেন দুই দুর্বৃত্ত আততায়ী। যেন মানুষ—মানুষের মতো চোখকান আছে তাদের। টের পেয়েছে, আসল মানুষটা হাজির নেই এবারে। একেবারে আদাজল খেয়ে লেগে গেল। পুরানো বেলদার চারজন—বিপদ বুঝে তার উপরে আরও পাঁচ-সাত জন নিযুক্ত হল। অত্যন্ত পাকালোক তারা, জলের চলাচল বোঝে। কাঁধে কোদালি দিন নেই রাত নেই সর্বক্ষণ বাঁধের উপর সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে ঘুরছে। যোগ হলেও হতে পারে, কোন একখানে হয়তো সন্দেহ হল—লাফ দিয়ে পড়ে সেখানে। হাঁক দিল অন্যদের উদ্দেশে, হুড়মুড় করে তারা এলো। দরকার হলে গৃহস্থ মানুষরাও এসে পড়বে—ঘরবাড়ি ভাতকাপড় এবং দুনিয়ার উপর যা-কিছু বাঁধ-ঘেরা ঐ চরটুকুর ভিতরে। শয়তান জল সেই বস্তু পাতালে টেনে নেবার জন্য হামলা দিয়ে বেড়ায়। মানুষও সর্বক্ষণ তৈরি প্রতিরোধের সৈনিক হয়ে।

হলে হবে কি—সৈন্য আছে, অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর, কিন্তু সেনাপতি কোথা? সে বটে ছোটরায় চন্দ্রভানু। তাঁর বাপ রুদ্রভানুও ছিলেন খানিকটা। জলের শয়তানি বোঝেন এঁরা। ক্ষীণ বাঁচিভঙ্গে নদী যেন ঢলে ঢলে পড়ছে, আর জলতলে ঠিক সেই সময়টা তস্করের মতো সিঁধ খুঁড়ে যাচ্ছে বাঁধের গায়ে। ছিদ্র একটু পেয়ে গেল তো শতেক তরঙ্গ মাথা-ভাঙাভাঙি করছে ঢুকে পড়বার জন্য। মাটির বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে বিশাল পথ বানিয়ে নিল, রূপসী নদী লহমার মধ্যে রাক্ষসী। এমনি কাণ্ড ঘটে গেছে বার পাঁচ-সাত। শীতকালের সামান্য জলে এই, দুরন্ত সময় সামনে তো পড়ে আছে—বর্ষায় যখন ঢল নেমে আসবে। চকের বাসিন্দারা ব্যাকুল হয়ে পথ তাকাচ্ছে—কবে আসবেন ছোটরায়, কুহকিনী নদীর ছলাকলায় ভোলেন না যে মানুষ, দৃষ্টি ঠিক গিয়ে সেই পাতালতলে পৌঁছায়।

চন্দ্রভানু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত শুনলেন। একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বাঁকে বাঁকে ঘোরা নদীর আর পছন্দ হচ্ছে না। দু-পাশে দুই নদী একটি পথ ধরে এক হয়ে অদূরের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়। সেই পথ সাগরচকের মাঝ বরাবর। তাড়াতাড়ি রুখে দিতে হবে, নইলে সর্বনাশ। ইতিমধ্যেই হয়তো বা দেরি হয়ে গেছে।

সারারাত্রি চন্দ্রভানুর ঘুম হল না। সাগরচকের মানুষজন ছোটরায়—ছোটরায় করে ডাকছে,—নদী-মাঠ-গ্রাম পার হয়ে রাত্রের নৈঃশব্দে যেন কানে আসে। সকলের সর্বস্ব ভেসে যায়। তবু ইন্দুমতী ছাড়বেন না কিছুতে : চকদার কতই তো আছে—ঘর-বাড়ি ছেড়ে তোমার মতন কে বারোমাস পড়ে থাকে?

আছে চক অনেকেরই বটে, কিন্তু সাগরচক কারো নয়। দুর্দান্ত ছেলের মায়ের মতন হিমসিম হতে হয়, বারো মাস পড়ে থেকেও তো সামলে ওঠা যায় না।

কালবৈশাখীর ঝড়ঝাপটা গেছে আজ সন্ধ্যাবেলা—সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ অবধি। বৃষ্টি-ধোওয়া জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরে আছে। ঘর থেকে উঠানে নেমে গিয়ে চন্দ্রভানু খানিক পায়চারি করলেন। একটি মনে এত দুশ্চিন্তা ধরে না। ইন্দুমতীর তো ঘুম নেই, রাত্রি বলে কিছু নেই তাঁর। তাঁকে গিয়ে বলবেন অবস্থা, পরামর্শ করবেন, ছুটি চাইবেন। দীন নন্দনের মতো অমন ডাক্তার সর্বক্ষণ বাড়ির উপর, তার উপর নীহারনলিনী—ভাবনার কিছু নেই। সেইসব বুঝিয়ে বলবেন—

বুঝে দেখ ছোটবউ, সংসারের অন্ন-বস্ত্র, ঠাটঠমক সমস্ত সেই জায়গা থেকে। ভাণ্ডার ধরে টান পড়েছে—অবুঝ হোয়ো না, কয়েকটা দিন ছুটি দাও আমায়। দেখে আসি একবার, চোখে না-দেখা অবধি সোয়াস্তি নেই।

দরজা ভেজানো। চোখ বোঁজা ইন্দুমতীর। চন্দ্রভানু সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়েছেন কি না দিয়েছেন, ইন্দুমতী চিৎকার করে উঠলেন : কে, কে তুমি?

সারা রাত্রি তিন-সলতের প্রদীপ জ্বালা থাকে রোগির ঘরে। ইন্দুমতী বলছেন, যাচ্ছ কোথায় তুমি? কোন মতলবে?

চন্দ্রভানু বলেন, মতলব কী আবার! তোমার কাছেই এলাম ছোটবউ—

রাতদুপুর ছাড়া আসা যায় না বুঝি আমার কাছে? পা টিপে টিপে চোর হয়ে আসতে হয়? ব্যঙ্গের সুরে ইন্দুমতী কেটে কেটে বলছেন, ন্যাকা আমি—বুঝিনে? ঘুমিয়ে আছি ভেবেছিলে? যাচ্ছিলে পাশের ঘরে—বুঝেসুজেই ওকে এনে আটক করেছি—

রাত ঝিমঝিম করছে। চেঁচামেচিতে জেগে পড়েছে সকলে। ক্ষীরোদার অলিন্দে শোওয়ার ব্যবস্থা সে ঢুকে পড়ল। গোবিন্দসুন্দরী নিচের তলার সেই শেষপ্রান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন। দরজা-জানলার বাইরে আরও সব এসেছে, শব্দ-সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বাড়ির মধ্যে আচমকা এমন মজাদার কাণ্ড—কে ঘরে শুয়ে থাকতে যাবে? থাকলে ক্ষতি নেই অবশ্য—গোবিন্দসুন্দরী যখন হাজির আছেন, রায়বাড়ি সামান্য স্থান—গোটা বেলডাঙা গ্রামের ভিতরে জানতে কারো বাকি থাকবে না। রাত্রি ভোর হবার যেটুকু অপেক্ষা।

গোবিন্দসুন্দরীকে সাক্ষি মানেন ইন্দুমতী : টিপিটিপি যাচ্ছিলেন পিশিমা। ভেবেছেন ঘুমিয়ে আছি। চক্ষু বুঁজে আমি ঝিম হয়ে পড়ে থাকি, একদিন না একদিন হাতে-নাতে ধরব। ঠিক তাই হল।

চোপরও—গর্জন করে উঠলেন চন্দ্রভানু। সে গর্জন এ-বাড়ির কেউ কখনো শোনে নি। জোলো-ডাকাত নৌকোয় উঠে প্রথম যে তাড়ায় আরোহীকে ভয়-চকিত করে, সে বোধহয় এই কণ্ঠ। ইন্দুমতী কিন্তু ভয় মানেন না। সাহসী চিরদিনই, পঙ্গু হয়ে পড়ে থেকে আরও যেন ক্ষেপে আছেন। বলেন, কি করবে তুমি, গলা টিপে ধরবে? এসেও ছিলে সেই মতলবে—গলা টিপে শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে নীহারের ঘরে যেতে। করো তাই। সাগরচকে চোখের আড়ালে যা করে এসেছ, জোড়া-মন্দিরের বাস্তু-ভিটেয় আমার সংসারের উপর সে অনাচার জীবন থাকতে ঘটতে দেবো না আমি।

একবাড়ি লোকের মধ্যে কেলেঙ্কারি। আজ বলে নয়, চিরজীবন পঙ্গু মানুষটা জ্বালিয়ে মারবে। চন্দ্রভানুর এত রাগ হয়েছিল, দেবেন বুঝি সত্যি সত্যি গলার উপর হাতদুটো চাপিয়ে। হঠাৎ কী হল—রাগ একেবারে জল। মুখের উপর চকিতে একটু হাসিও বুঝি খেলে যায়। বলেন, সেই ভালো, চলে যাবো চকে। রাতটুকু পোহাক, সকালবেলাই যাচ্ছি।

ভ্রূভঙ্গি করে ইন্দুমতী বলেন, সে আর গিয়েছ তুমি! খুঁটো পোতা যে এখানে—বাঁধা-গরু খুঁটোর চারিধারে ঘুরে মরবে। সে দিকটা লয় হয়ে যাচ্ছে, খবরের পর খবর—খবর নিয়ে বৃন্দাবন নিজে এসে পড়ল। বাড়ির মধ্যে ছেড়ে কিছুতে নড়বার জো নেই। ঘরের মধ্যে এনে পুরেছি, সেই অবধি ধাওয়া করেছ। কতখানি বেপরোয়া হলে তবে মানুষে পারে! ছেলেটা দুদিন বাড়ি এসেছে, তা বলেও লাজলজ্জা নেই একটু।

অপবাদ ঘাড় পেতে নিয়ে একটি কথাও না বলে চন্দ্রভানু সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। ধ্রুবভানু এসেছে ছুটিতে, দোতলার শেষ-দিকে তার ঘর। ভিড়ের মধ্যে সে নেই—থাকতে পারে না। কিন্তু জানতে কিছু বাকি থাকছে না তার। লজ্জা ও বেদনা পাচ্ছে, না-থাকলেই ভাল হত আজকের দিনে।

নিচের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন চন্দ্রভানু, পদশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন নীহার-নলিনী। কী আশ্চর্য, যাকে জড়িয়ে এত কুৎসা, পিছন ধরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে নেমে চলে এলো। নীহারনলিনী জাঁক করে বলে, লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, ওদেরই চোখের উপর দিয়ে এলাম। তাকিয়েও দেখল না। কে ভাবতে পারে, এত কাণ্ডের পর ছোটরায়ের কাছেই যাচ্ছি আবার।

চন্দ্রভানু অবাক হয়ে বলেন, হাসিমুখ যে তোমার?

বাঃ রে, হাসিরই তো দিন। যার জন্যে চেষ্টাচরিত্র তাই তো হয়ে গেল। বউঠান নিজেই এবার চাইছেন, আপনি সাগরচকে চলে যান। আমার সঙ্গে যাতে দেখাসাক্ষাৎ না হয়। কোন ভাবনা নেই। আমি আছি, ডাক্তারবাবু আছেন,—রোগির সেবাযত্নের ত্রুটি হবে না।

সে আমি জানি নীহার। সংসার ঠিকই চলবে, রোগিরও এতটুকু অবহেলা হবে না। তুমি হতে দেবে না। এতবড় মিথ্যে রটনাও তোমার মুখের হাসি মুছতে পারে নি। যে মানুষ রটাল, তার সম্বন্ধে এতটুকু রাগ-দুঃখ তোমার নেই।

নীহারনলিনী খিলখিল করে হেসে ওঠে : রটিয়ে আমার কি ক্ষতিটা করবেন? আমার কি সমাজ-সামাজিকতা আছে? ছেলেমেয়ে আছে যে বিয়েথাওয়া দিতে হবে? আপনজন আছে যে কলঙ্ক শুনে মুখ পুড়বে? কোন দুর্ভাবনা আমার নেই, আমার মতন ভাগ্যধরী কে?

শান্ত গম্ভীরভাবে চন্দ্রভানু শুনে গেলেন। বললেন, ভাবনা আমার হচ্ছে। আমি চলে যাচ্ছি, ছোটবউয়ের আক্রোশের মুখে তুমি একলা পড়ে রইলে—

নীহারনলিনী একেবারে উড়িয়ে দেয় : কিছু না, কিছু না। প্রতাপ বউঠানের ছিল বটে একদিন, রায়বাড়ির সিংহিনী আজ পাঁকে পড়ে আছেন। বাড়ির কেউ পারতপক্ষে সামনে আসে না। আঁচলে চাবি বাঁধা থাকলে সংসারও সেই সঙ্গে বাঁধা থাকে না—এ কথাটা বোঝেন না উনি। রাগ কেন হবে, মায়া হয় আমার বউঠানের উপর।

বলে, আমি ভাবছি আপনার কথা। আপনার নামে যত কুচ্ছোকথা রটে গেল। আপনার যে অনেক আছে। অঞ্চলজোড়া নাম-ডাক, হাজার মানুষ আপনার মুখ তাকিয়ে থাকে—

চন্দ্রভানু নীহারের সেই আগের কথার সুরে বলে ওঠেন, কিছু না কিছু না। পুরুষ-মানুষ আমি যে—তায় রায়বংশের পুরুষ। দুর্নাম এ বাড়ির পুরুষের ভূষণ। কুলাঙ্গার কেবল আমিই ছিলাম। আর হয়ে উঠছে—আমার ছেলে ধ্রুবভানু। মিথ্যে বলছি নে, গোবিন্দ-পিশির সঙ্গে আলাপ করে দেখো তুমি।

হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বলেন, জাতে উঠলাম এদ্দিনে। খাতির-ইজ্জত গাঁয়ের উপর যা ছিল, শতগুণ হল এবার থেকে।

ঠিক সকালবেলা নয়, গোছগাছ সারা হতে প্রায় দুপুর। নীলবোট ঘাটে এনে লাগিয়েছে। যাকে যা বলবার বলে-কয়ে—যেমন বরাবর হয়ে আসছে—নৌকোয় গিয়ে উঠলেন।

ইন্দুমতীর ঘরেও গেলেন একবার। ইন্দুমতী বলেন, পালঙ্কের উপর উঠে দাঁড়াও—আমার শিয়রে। বিজয়া দশমীর দিন যেমন করেছিলে।

দাঁড়াতে হল সেই রকম। বিস্তর চেষ্টায় ইন্দুমতী হাত বাড়ালেন একটু। পায়ের ধুলো কোনক্রমে মাথায় ঠেকিয়ে কেঁদে পড়লেন : এই ভাগ্যটুকু কতদিন আর আছে, কে জানে। হাত দুটোও অসাড় হয়ে এসেছে।

যে কজন সেখানে, সকলে চোখ মুছছে। কাল এই ঘরের ভিতর এমন বচসা এতবড় কেলেঙ্কারি, সে যেন নিশিরাত্তির দুঃস্বপ্ন একটা। যাত্রামুখে নীহারনলিনী নেই। ইন্দুমতীই তাকে ডাকছেন : ও নীহার, তোমাদের ছোটরায় রওনা হয়ে যাচ্ছেন। কোথায় গেলে তুমি?

সেনোছাড়ি বন্দরে লালমোহন মিত্তিরের বাড়ি শেষ হয়ে গেছে। জাঁকিয়ে গৃহপ্রবেশ। আসল মচ্ছব শেষ হল, শানায়ের বাজনা তবু থামে না। সকালবেলাটা এবং সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত বেজে চলে। চিরকালই বুঝি বাজবে, কোনদিন থামবে না। নৌকোর দাঁড় থামিয়ে গাঙের উপরে মাঝিমাল্লারা শোনে। এক আজব বাড়ি—আয়তনে খুব যে বড় তা নয়। ধরন আলাদা—কোন ঘর গোল, কোনটা পাঁচকোণা, কোনটা সাতকোণা। দোতলার একটা বারান্ডা গাঙের জলের উপর অনেক দূর অবধি বেরিয়ে এসেছে। কলকাতা শহর থেকে দক্ষ মিস্ত্রি এনে দস্তুরমতো খরচ-খরচা করে বানানো।

দেশ থেকে সব এসে পড়েছে। নতুন তারা এই ভাঁটিঅঞ্চলে—যা দেখে তাই অপরূপ। বড় বড় গাঙ, দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠ, মাঠের দূরতম প্রান্তে বাদার জঙ্গলের ঘন সবুজ রেখা। প্রথম কয়েকটা দিন তো মীনাক্ষী বারান্ডার রেলিং ঝুঁকে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত। সাদা মার্বেলের মেজের সঙ্গে পা দুটো তার যেন গেঁথে দিয়েছে, নড়তে ফিরতে পারে না।

নামডাক হয়েছে বাড়ির তা বলে নিন্দে-মন্দও যে হচ্ছে না এমন নয়। স্কিনস চোখে ধরবার মতো বটে, কিন্তু অতিশয় ফঙ্গা-বেনে। দু-দশ বছরের মধ্যে দেখে নিও


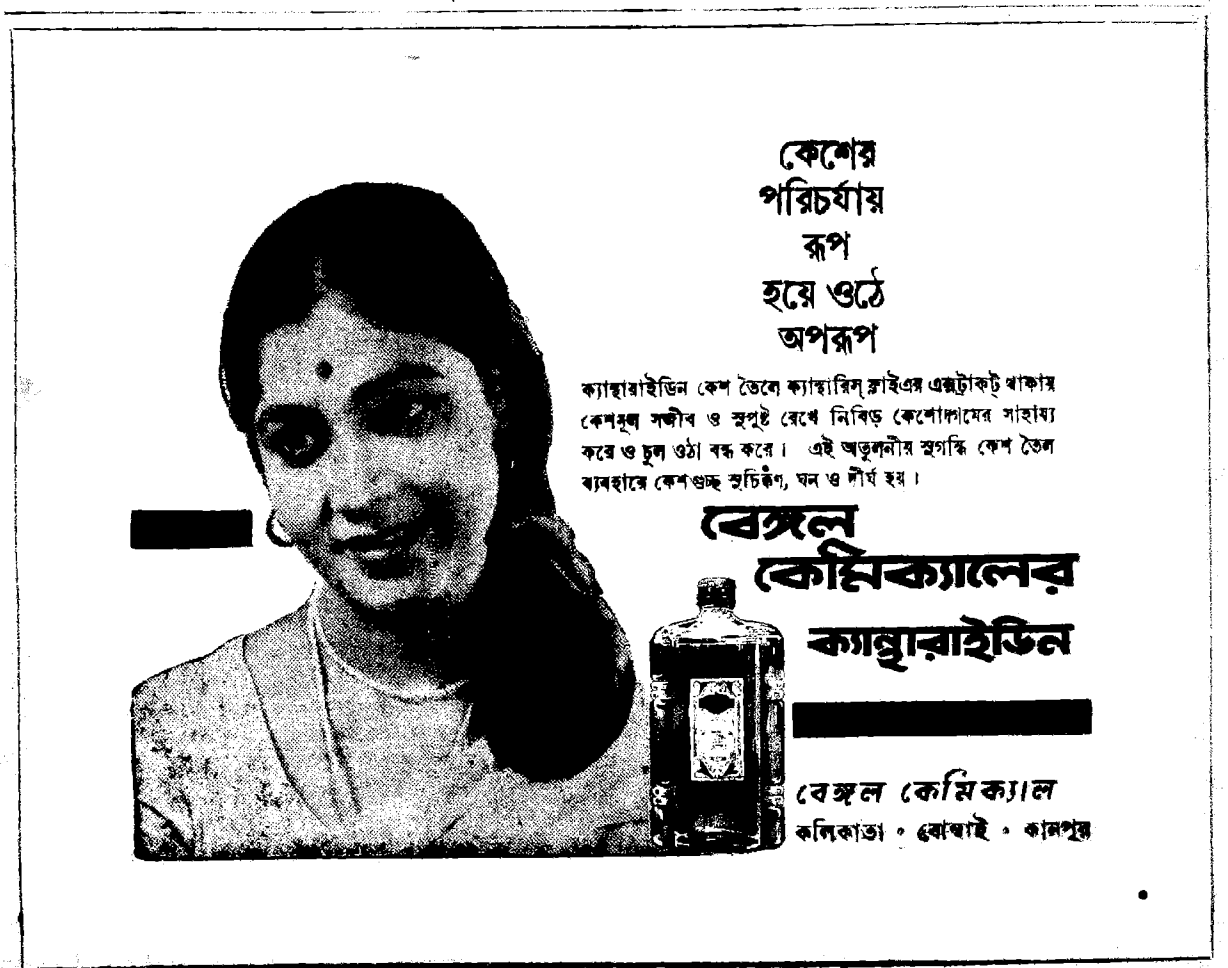

ইঁটে নোনা ধরে পাতলা দেয়াল ফুটো ফুটো হয়ে যাবে। ফুরফুরে শৌখিনতা এ-তল্লাটে চলে না। তুলনার কথাও ওঠে : দালানকোঠা কেমন হওয়া উচিত বেলডাঙার রায়বাড়ি দেখে বুঝবে। অট্টালিকা নয়, পাহাড়। পাকা-পোড়ের ইট, দেয়াল এক-মানুষের সমান চওড়া। গাঙের বান এসে এসে কতবার আছাড় খেয়ে পড়েছে, ইটের একটা টুকরো খসাতে পারে নি কোথাও।

সেই রায়বাড়ি দেখা হয়ে গেল মীনাক্ষীর। নিতান্তই দৈবক্রমে। ঘাড় হেঁট করে মানতে হয়, বড় জিনিস গড়তে জানত বটে তখনকার মানুষ। দেখাটা তবু তো শুধুমাত্র বাইরে থেকে। কৌতূহল ছিল ভিতরে যাবার, কিন্তু হতে পারে না। কুচোচিংড়ি-ধরা মানুষরা হাঙর ধরার তালে আছে, সেই কথা উঠে পড়বে। নিজের অধ্যবসায়ের জোরে লালমোহন সামান্য থেকে এত বড়লোক হয়েছেন, তাঁর মেয়েরও ইজ্জত কম নয়।

ব্যাপারটা এই। নদীকূলে বিশাল বটের তলায় শিবমন্দির—কুসির বটতলা সেই জায়গার নাম। কুসি অর্থাৎ কুসুম নামে কোন এক নিষ্ঠাবতী বিধবা শিব-দর্শন পেয়েছিলেন এখানে। বটের ঝুরির মধ্যে বুড়োশিব লুকিয়ে বসে আছেন, নোনা নদীর জোয়ারে ভেসে এসে মকরবাহিনী মা-গঙ্গা তাঁর পাদ-বন্দনা করলেন—স্বপ্নে দেখতে পেলেন কুসুম। পুণ্যমাসের পুণ্য-তিথি সে রাত্রি—অক্ষয়তৃতীয়া। ধড়মড় করে জেগে উঠে আশ্চর্য বৃত্তান্ত কুসুম বললেন সকলকে। তারও অনেক দিন পরে নৌকা-পথে যেতে যেতে হঠাৎ নজরে পড়ল স্বপ্নে-দেখা সেই বটগাছ। নেমে ঘুরে ঘুরে দেখেন। খুঁজতে খুঁজতে বৃহৎ শিললিঙ্গও পাওয়া গেল—আষ্টেপিষ্টে বটের ঝুরি জড়িয়ে ঠাকুর পালিয়ে রয়েছেন। চাউর হয়ে গেল চতুর্দিকে। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন মা-গঙ্গা পতি-সন্দর্শনে আসেন, নোনা গাঙ গঙ্গার মাহাত্ম্য পেয়ে যায়। গঙ্গাস্নানের এমন সুবিধা পুণ্যার্থীরা ছাড়বেন কেন, বিস্তর লোক জমে, মেলা বসে যায় কুসির বটতলায়। নৌকোয় নৌকোয় ছয়লাপ! নৌকো-বাইচ হয়। কুসির বটতলায় মহা-পার্বণ অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে।

বৃত্তান্তটা লালমোহনের নতুন বাড়ি এসে পৌঁছাল। অতিরঞ্জিত হয়েই এসেছে। সত্তর বছরের বৃদ্ধা লালমোহনের মা। তিনি রোখ ধরলেন, পাতকী তরাতে মা-গঙ্গা নিজে এদ্দূরে আসতে পারছেন, আর আমরা এই পথটুকু যাব না?

মীনাক্ষী আরও তাঁকে তাতাচ্ছে : বুঝে দেখ ঠাকুরমা। হাঙ্গামা-হুজ্জুত নেই, রেল-স্টিমার চড়তে হবে না, অথচ পুরো-পুরি গঙ্গাস্নানের ফল। মীনাক্ষীও যাবে ঠাকুরমা'র সঙ্গে, কত নদী কত গাঁ-গ্রাম দেখবে!

কিন্তু মুশকিল হল, নিয়ে যায় কে সঙ্গে করে? খাটির কাজে বিস্তর কাঠ লাগে, বাদায় বন্দোবস্ত করতে হয়। সেই ব্যাপারে লালমোহনের সদরে যাবার প্রয়োজন ঠিক ঐ সময়টা। এবং তাম্বিরের ব্যাপার ভক্তদাস ছাড়াও হবে না। সঙ্গে কে যাবে তা হলে?

ভক্তদাস বলে, রাইচরণকে আমরা নেবো না। সে ওঁদের নিয়ে যাক : রাইচরণ গেলে নির্ভাবনা।

হল তাই। পুরানো দক্ষ মাঝি রাইচরণ নৌকো নিয়ে চলল। মীনাক্ষীর মা মনোরমা শিন্নিবান্নি মানুষ, যাত্রামুখে তিনিও উঠে পড়লেন। ছটফটে মেয়ে আর স্থবির শাশুড়ি সামলানো কি মাঝিমাল্লার কর্ম? মুখে এই বলছেন, পুণ্যলাভের বাসনা তাঁরও কি মনে মনে নেই?

চন্দ্রভানু চলে গেছেন, তারই দিন দশেক পরে। ছুটিতে এসে ধ্রুবভানু মনের সাধে হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে। সমবয়সি আট-দশটা ছোকরা সর্বক্ষণের সঙ্গী।

বাইরে-বাড়ির অদূরে নদী। দিগ্‌ব্যাপ্ত নদী—এপারে দাঁড়িয়ে অনেক ঠাহর করে ওপারের গাছপালা দেখা যায়। এমন নদী রয়েছে, স্নান তবু দীঘিতে। নদীর জল নোনা, তার উপর কুমিরের ভয়। নদী আর দীঘির মধ্যে প্রশস্ত বাঁধ—বাঁধ বেঁধে নদী থেকে একটুকরো জল আলাদা কেটে নেওয়া হয়েছে যেন। বর্ষার সময়টা নদীর লবণাক্ত ভাব অনেকটা চলে যায়, বাঁধের উপর নালা কেটে দেয় তখন। নদীর জল দীঘিতে এসে ঢোকে, সেই সঙ্গে গুঁড়ো-মাছ আসে প্রচুর। ভাঙান, ভেটকি, পায়রা-চাঁদা, চিংড়ি—হরেক রকমের মাছ।

দীঘিতেই অতএব ঝাঁপাঝাঁপি করছে। নেমেছে কোন সকালবেলা। ঘাটে অনেক লোক—তারা বলাবলি করছে, শহরে থেকে এত লেখাপড়া করে ঠাণ্ডা হতে পারল কই? সেই ছেলেবয়সের মতো।

একজন বলে, রায়বংশের রক্তে যে আগুন। কত পুরুষ ধরে জ্বলছে। দুটো পাশ দিয়েই অমনি নিভে যাবে বুঝি? বিদ্যের নিচে চাপা থাকে, বেসামাল হলেই দাউ দাউ করে উঠবে। যেমন ছোটরায়, তেমনি এই ছেলে। রায়-বাড়ির মানুষ নিয়ে আমাদের মতন বাঁধা হিসাব চলে না।

বাঁধের উপরে আমগাছ জামগাছ কয়েকটা। একটা ডালে আম টুকটুক করছে। আঙুল তুলে ধ্রুব অন্যদের দেখাল।

সঙ্গীরা হেসে খুন : সিঁদুরে-গাছের আম যে! কাঁচা থেকেই তমনি সিঁদুরের ছোপ। কী আশ্চর্য, কলেজে গিয়ে নতুন মানুষ হয়ে পড়েছ—এই চিনতে পারো না?

হাসাহাসি ধ্রুবর বরদাস্ত হয় না। বলে, কোনটা কাঁচা কোনটা পাকা দূর থেকেই আমি ফারাক বুঝি। পরখ হোক তা হলে।

বার দুই ইতিমধ্যে দীঘি পাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে। আবার এই নতুন অজুহাত। সাঁ-সাঁ করে সকলের আগে ধ্রুব জল কেটে ছুটল। কখনো ভেসে যাচ্ছে, কখনো ডুব-সাঁতার। একটি দুটি আরও যাচ্ছিল, খানিকটা গিয়ে ফিরে আসে। এই বড় দীঘি এপার-ওপার করা চাট্টি কথা নয়। এবং আমি যে কাঁচা, তাতেও সন্দেহ নেই। কী হবে পাগলামির পাল্লা দিয়ে? ধ্রুবই দেখে এসে বলবে।

পৌঁছে গেছে ধ্রুব ওদিককার বাঁধে। গাছের মাথায় তাকিয়ে দেখে। কী বুঝল, সে-ই জানে। হাঁক দিয়ে বলে, বাজি ধরো তবে, আম ছিঁড়ে এনে দেখাই।

মুহূর্ত দেরি না করে গাছের উপর চড়ে গেল। কাঠবিড়ালির মতো এ-ডাল ও-ডাল করছে। কী হল হঠাৎ—থমকে দাঁড়িয়ে যায়। নদীর দিকে নজর পড়েছে। অবাক কাণ্ড। মাঝনদীতে মানুষ দাঁড়িয়ে। নৌকোও একটা কাত হয়ে পড়েছে, দেখতে পাওয়া যায়।

বিপদে পড়েছে কারা। ডালে ডালে পা ফেলে নামবার ধৈর্য থাকে না। দোতলা থেকে ধ্রুব দিল লাফ মাটিতে। ভিজা কাপড়ে বাঁধ ধরে ছুটেছে। রায়বাড়ির তিনদিক ঘিরে কাটা খাল—পুরানো আমলের গড়-খাই। ডিঙি মিলল একটা সেখানে। ডিঙি খুলে লহমার মধ্যে বড়-নদীতে বেরিয়ে পড়ে।

জল জল আর জল, কূলকিনারা নেই—তার মধ্যে মানুষ। যোগীঋষিরা শোনা যায় জলের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে পারেন, এরাও বুঝি তাই। হাঁটছে না, জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। একটির পরনে রঙিন কাপড়চোপড়—রঙিন হওয়ায় সকলের আগে নজর পড়ে। জল কেটে ধ্রুব ছুটল সেদিকে।

গঙ্গাস্নানে পাপক্ষয় করে মীনাক্ষীরা কুসির বটতলা থেকে ফিরছিল। পথের মাঝে বিপত্তি। মাঝগাঙে চর—চরে ঠেকে পানসি কাত হয়ে জল উঠে গেছে। তলির তক্তাও কিছু হয়তো জখম হয়েছে—জল ছেঁচে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মাঝিমাল্লা সেই কাজে লেগে গেছে। শেষ-ভাঁটায় এখন ডাঙা জেগেছে, নৌকো থেকে বেরিয়ে মেয়েলোক তিনজন আশ্রয় নিয়ে আছে সেখানে। কিন্তু জোয়ার আসন্ন—কতক্ষণই বা আছে পৃথিবী-টুকু! এখনই ভাসিয়ে দেবে। দেখতে দেখতে হাঁটুভর জল—হাঁটু থেকে কোমর, কোমর থেকে গলা। তা-ই বা কেন—মাঝগাঙে ছুরিভোজের আয়োজন, কুমির-কামট কি এত অবসর দিতে যাবে?

চরের উপর বোঠের খোঁচ মেরে শক্ত করে ডিঙি ধরে ধ্রুব হাঁক দেয় : উঠে আসুন!

বলার অপেক্ষা মাত্র। এসো ঠাকুরমা—বৃদ্ধার হাত ধরে মীনাক্ষী উঠি কি পড়ি চলল। বড় ভয় পেয়েছে। মায়ের উদ্দেশে ডাক দেয় : চলে এসো।

দায়িত্বভার রাইচরণের উপর। জল সেঁচার কাজ ছেড়ে তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে আসে : কোথা চললে ঠাকরুনরা, উতলা হবার কী? আমাদের নৌকোই তো চালু হচ্ছে এবার।

তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ধ্রুব মনোরমার দিকে চেয়ে বলে, এদিককার গাঙ-খাল বড্ড খারাপ। কুমির এসে কখন লেজের বাড়ি মারবে ঠিক-ঠিকানা নেই।

জানি গো জানি। মেয়েলোক বলে ভয় দেখিও না! রুদ্ধ হয়ে রাইচরণ বলে, বিলেত থেকে আসছি বাপু, সোনাছড়ির লোক আমরা।

কুমিরের নামে মেয়েরা আরও ব্যাকুল। চক্ষের পলকে ডিঙির উপরে।

অন্যদের যথোচিত কাজের উপদেশ দিয়ে রাইচরণও ডিঙির দিকে আসছে। ধ্রুব হাত নেড়ে বলে, তুমি কেন, তোমায় উঠতে দেবো না। নৌকো তোমার তো চালু হয়ে যাচ্ছে। যদি না হয়, জোয়ারের জলে সাঁতার কেটে বেড়িও।

বোঠের ধাক্কায় ডিঙি সত্যি সত্যি জলের দিকে ঠেলে দিল।

রাইচরণ চেঁচামেচি করে : নিয়ে চলল হে, কী সর্বনাশ! কার নৌকো কি বৃত্তান্ত —মা-ঠাকুরমা-দিদি, আপনারা তো এক কথায় উঠে পড়লেন।

কুমির জলের নিচে চলাচল করে, জলের উপরে আরও বেশি ভয়ের জীব—গাঙেখালে রাহাজানি করে যারা বেড়ায়। ইদানীং খবই কম, তাহলেও মানুষের একেবারে ভয় ঘোচে নি। মনোরমা শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলেন : চলে এসো না তুমি। জল তা কি হয়েছে! এইটুকু জলে কাদায় ভয় পেয়ে গেলে?

হাসতে হাসতে ধ্রুবজ্ঞানু ডিঙি ঘোরাল। রাইচরণ উঠে পড়ে নদীজলে পা ধুতে ধুতে বলে, তুমি কে বলো দিকি? তোমার এত দয়টা কিসের?

হাসি থামিয়ে মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে ধ্রুব বলে, ধরেছ ঠিক। বুদ্ধি আছে তোমার। জোলো-ডাকাত। হায় হায়, কুমিরের মুখ থেকে বাঁচতে গিয়ে ডাকাতের হাতে পড়ে গিয়েছ।

স্নানের মধ্যে উঠে এসেছে—খালি গা। পাথর কুঁদে যেন শক্ত সুপুষ্ট দেহখানি গড়ে তোলা। জোয়ার এসে গেছে, টান কাটাতে শিরা-উপশিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। শিরা যেন ইস্পাতের তার—আওয়াজ বোঠের নয়, তারগুলোই বুঝি কড়-কড় করে উঠছে। জোলো-ডাকাত—চেহারায় সেটা কিছুমাত্র অবিশ্বাস্য ঠেকে না। এ হেন বিপদের মধ্যেও হাসি চিকচিক করে মীনাক্ষীর ঠোঁটে। ঐ এক ধরন মেয়েদের। খাসা লাগছে—নিঃসীম জলের উপর দিয়ে ডাকাতে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। রাবণ রথে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, এ মানুষ ডিঙিতে তুলে।

ধ্রুব হঠাৎ রাইচরণের উপর খিঁচিয়ে ওঠে : হাঁ করে কি দেখ? হাতের কাছে বোঠে রয়েছে—দাও না দু-টান টেনে। তাড়াতাড়ি ডাঙায় উঠে যাই।

রাইচরণ একদৃষ্টে মাঝগাঙে নিজ নৌকার দিকে তাকিয়ে। জোয়ারে এখনই জলের উপর ভাসবে—তার আগে ভিতরের জল নিঃশেষে সেঁচে ফেলা দরকার। নিজের চলে আসতে হল এদের এই হাঙ্গামায় পড়ে—তিনটে মেয়েলোক এমনি ছেড়ে দেয় কেমন করে? ধ্রুবর ধমকানিতে সক্রোধে চোখ তুলে তাকাল একবার, ভাল-মন্দ জবাব দিল না। মাইনে-করা মাল্লা নাকি তেমোর! বাহাদুরি করে যেমন ডিঙি নিয়ে পড়েছিলে, মরো একলা বোঠে মেরে। রাইচরণকে ডাকো কেন এখন? বয়ে গেছে রাইচরণের!

তা ধ্রুবও পরোয়া করে না। পাকা মাঝি রীতিমতো। সাঁ সাঁ করে ডিঙি ছুটিয়ে নিয়ে চলল। মীনাক্ষীর লজ্জা-লজ্জা করে। হাতের কাছে বোঠে—তুলে ধরল একটু উঁচু করে। বোঠের মাথা হঠাৎ জলে ফেলে ঝপ্‌পাস করে দিল টান। টানের পর টান—ঠিক একেবারে মাল্লা মানুষের মতো।

ধ্রুব হাঁ-হাঁ করে ওঠে : রেখে দিন আপনি—

হচ্ছে না বুঝি?

ধ্রুব হেসে বলে, হয়নি এখনো। হতে পারে যে কোন মুহূর্তে। ডাঙাঅঞ্চলের মানুষ বেঠে ধরা শিখবেন কোথা? টাল সামলাতে পারবেন না, জলে পড়ে যাবেন।

রাইচরণের একটু আগের কথাগুলোই মীনাক্ষীর ঠোঁটের আগায় এসে পড়ে : তুমি কে বলো দিকি, তোমার এত দায়টা কিসের?

আরও বলতে ইচ্ছে করে, তোমার ভরসা করে বেরিয়েছিলাম নাকি? যা হবার হত—চরের উপর থেকে কুমিরে মুখে করে নিয়ে যেত। তুমি কি জন্য ডিঙি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে?

মনে মনে এই সমস্ত কথা, অপরিচিত মানুষকে মুখ ফুটে বলা যায় না। বোঠে ডিঙির উপর তুলে রেখে মীনাক্ষী নিঃশব্দে বসে রইল।

লজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে ধ্রুব বলে, তাহলেও ধন্যবাদ। চেষ্টা করেছেন, হাত-পা কোলে করে থাকতে পারেন নি।

ডিঙি বাঁধের ধারে আমতলায় এসে পড়ছে। সকলে নেমে পড়ল। রাইচরণ বলে, দিব্যি ছায়া জায়গা। এইখানটা দাঁড়ান আপনারা মা। ওদেরও ঠাহর হবে, পানসি নিয়ে আসবে এখানে।

ধ্রুব বিরক্ত কণ্ঠে বলে, করো তাই তুমি, গাঙের ধারে দাঁড়িয়ে থাক। ঘরবাড়ি রয়েছে—মেয়েরা কেন থাকতে যাবেন? আপনারা চলে আসুন, বাড়ির মধ্যে গিয়ে বসবেন।

মীনাক্ষী পা বাড়িয়েই আছে। বলে, চলুন। আঁচলটা কাদায় গিয়ে পড়েছিল, ধুয়ে নিতে হবে।

দীঘির পাড় ধরে যাচ্ছে। রাইচরণকেও অগত্যা পিছন নিতে হয়। ঠিক যে কারণে নিজের নৌকো ছেড়ে ধ্রুবর ডিঙিতে ডাঙায় আসতে হয়েছে। জোরে হাঁটা ধ্রুব-ভানুর অভ্যাস—হারবে কেন মীনাক্ষী, সে-ও চলেছে সমানে তার সঙ্গে।

গাছপালার অন্তরাল থেকে রায়বাড়ি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, সামনে এসে মীনাক্ষী থমকে দাঁড়ায়। বিশাল অট্টালিকা। দু-পাশে দুই মন্দির—কালীমন্দির আর কৃষ্ণ-মন্দির, প্রকাণ্ড ফটক মাঝখানে। বাড়ি ঢোকা যেন দেবমন্দিরে ঢোকা, এমনি একটা ভাব মনে আসে। যিনি কৃষ্ণ তিনি কালী—আয়ান ঘোষের ছলনার জন্য বংশীধর কৃষ্ণ নরমুণ্ডমালিনী কালী হয়েছিলেন। রায়-বংশের পুরুষরা সেকালে কালী-ভজনা করতেন। মেয়েদের কৃষ্ণ-মন্দিরে যাতায়াত, অন্তঃপুর থেকে কৃষ্ণমন্দির অবধি কড়া পর্দার ব্যবস্থা।

অন্যেরাও এতক্ষণে এগিয়ে এসেছেন। ধ্রুব ডাকল, আসুন—

রাইচরণ চেনে, নৌকোর মানুষ কে না চেনে বেলডাঙার রায়দের বাড়ি? সবিস্ময়ে বলে, কোথায় নিয়ে চললে? রায়বাড়ি নিয়ে ঢোকাচ্ছ যে?

ধ্রুবভানু ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ—

কাজকর্ম করো বুঝি এঁদের?

মনোরমা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করেন : রায়মশায়দের কেউ হও নাকি বাবা?

ধ্রুব বলে, ছোটবাবু চন্দ্রভানু রায় আমার বাবা।

চকিতে আর একবার দেখে নিয়ে মীনাক্ষী মাথা নিচু করে। মনোরমাও তাকিয়ে পড়লেন : ক' ভাই তোমরা? ছোট রায়-মশায়ের একটি ছেলে তো কলকাতায় পড়া-শুনো করে শুনেছি।

ধ্রুব মৃদু হেসে বলে, ভাই-বোন আমার কেউ নেই। আমি একা।

চোখ বড় বড় করে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে রাইচরণ বলে ওঠে, রায়মশায় ডাকসাঁইটে মানুষ। এদেশ সেদেশ একডাকে চেনে তাঁকে। তাঁর মতন লোকের ছেলে হয়ে খালি পায়ে মালকোঁচা মেরে গাঙে গাঙে বোঠে বেয়ে বেড়াচ্ছ, আবার বলো কলকাতায় থাক তুমি।

ধ্রুব বলে, সাঁতার কাটতে কাটতে ছুটলাম, গায়ে জামা পায়ে জুতো ফুল-কোঁচা দেওয়া কাপড় কখন পরি বলো।

মনোরমাকে বলে, দাঁড়ালেন কেন? আমাদেরই বাড়ি, ভিতরে গিয়ে বসবেন।

মনোরমা ঘাড় নাড়লেন : না বাবা, রাই-চরণ ঠিক বলেছিল, আমতলায় গিয়ে দাঁড়ানো ভাল। নৌকোর লোক দেখতে পাবে। নয়তো সারা দেশ খুঁজে খুঁজে বেড়াবে।

ধ্রুব বলে, আমি তার ব্যবস্থা করছি। ডিঙি নিয়ে লোক যাচ্ছে, নৌকোর খবর বলে আসবে।

না বাবা—

ঘুরে দাঁড়ালেন তাঁরা। মীনাক্ষী আসবার বেলা যেমন, ফিরছেও তেমনি দ্রুত পায়ে। সকলের আগে আগে। মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দেখে ধ্রুব তিক্ত কণ্ঠে বলে, তা ছুটে-ছুটি কেন? বুড়োমানুষটি যে পেরে উঠছেন না। মুখে আহ্বান করা হয়েছে, জোর করে তো নেওয়া হচ্ছে না?

পাষাণমূর্তির মতো সে দাঁড়িয়ে রইল। ফটক অবধি এসে ছুটে পালানো—পরিচয় বুঝতে পেরে বাড়ি ঢুকতে ঘৃণা? নীহার-নলিনীর ব্যাপারটা নিশ্চয়—সোনাছড়ি বন্দর অবধি চলে গেছে, কোথাও লোকের জানতে বাকি নেই। অপমানে জ্বলছে ধ্রুব। সে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল হি-হি করে হাসতে হাসতে রাইচরণও যখন ফিরে চলল। তার কথাই বহাল রইল শেষ পর্যন্ত। নতুন টাকা হয়েছে—লালমোহন মিত্তিরের মাঝি-মাল্লা অবধি দেমাক করে দাঁত দেখিয়ে হেসে যায়।

দুই নদীর মোহানার উপর পর পর দুটো প্রশস্ত বাঁধ। ভিতর-বাঁধের গায়ে কাছারি-বাড়ি। ছাদের উপরে চন্দ্রভানু শখ করে কয়েকটা নতুন ঘর তুলেছেন। একদিকে বাদার জঙ্গল, আর একদিকে ফাঁকা—অনেক অনেক দূর প্রায় সমুদ্র অবধি নজর চলে। মোটা গুঁড়ি ফেলে কাছারির ঘাট বাঁধানো।

চন্দ্রভানুর নীলবোট ঘাটে এসে লাগল। নামতে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ান। দৃষ্টি ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক দেখেন। আর্তনাদের

মতো সুর বেরুল ঃ নামব না, চারিদিক ঘুরে দেখে তারপরে আমি কাছারি ঢুকব।

রওনা হবার দিনও ঠিক এমনি ঘটেছিল।

মাঝি অবাক। দুপুর গড়িয়ে বিকাল—পেটে দানা পড়েনি কারো। গোন পেয়ে শেষরাত থেকে অবিরত বেয়েছে। তিলেকের তরে চন্দ্রভানু থামতে দেননি। রান্নাবান্না করতে চেয়েছিল মাল্লারা—বললেন, পথে-ঘাটে হ্যাঙ্গামায় কাজ নেই। কাছারিবাড়ি উঠেই রাঁধা-ভাত খাওয়াবো খান পাঁচেক তরকারি দিয়ে।

বিনা বিশ্রামে প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিল। শরীর ঝিমঝিম করছে ক্ষিধেয়। চন্দ্রভানু নিজেও জলস্পর্শ করেননি। নামতে গিয়ে কোন বাধা ঘটে গেল—মাঝিমাল্লাদের সর্বক্ষণ জলে বাস, তারা কিছু জানল না বুঝল না—চন্দ্রভানু কী যেন দেখতে পেলেন জলের উপর, ভয়ঙ্কর কথাবার্তা শুনলেন জলের কলধ্বনিতে—ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে এই অবেলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর হুকুম।

বোটের উপরে থেকেই হল না, চন্দ্রভানু নেমে পড়লেন এক সময়ে বাঁধের উপরে। নিচু হয়ে, কখনো প্রায় মাটিতে শুয়ে পরখ করেন ফাটলের ক্ষীণতম রেখা পড়েছে কিনা কোন-খানে। দেখতে দেখতে অনেক দূর চলে গেলেন। ঝুপসি ঝুপসি জঙ্গল, মহিষমারি বলে জায়গাটাকে—পুরানো বাদাবনের কিছু অবশেষ। মহিষখালি কিছুতে ঠেকানো যাচ্ছে না, বৃন্দাবন বলেছিল। শুধুমাত্র বাঁধ ভেঙেই জল নিয়ন্ত্রণ নয়, সরু এক খালের রেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকখানি দূর অবধি। সবুজ বনের উপর দিয়ে ক্ষীণ উপবীত-সূত্রের মতো। এখন নগণ্য চেহারা, বিস্তার এক হাত দেড় হাতের বেশি নয়—কিন্তু এই তল্লাটের উচ্ছৃঙ্খল সুচতুর জলকে বিশ্বাস নেই। তুচ্ছ জলরেখা কোন এক কোটালের কয়েকটা দিনের মধ্যে দুস্তর হয়ে ওঠে। দু-বছর চার বছরে ভয়াল এক নদী—এপারে-ওপারে নজর চলা কঠিন। সেই কাণ্ড বুঝি এখানেও হতে চলেছে। সাগরচক ভূমির অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দ্বীপ বানাবে, পুরোপুরি নিজের কুক্ষিতে নিয়ে ফেলবে। আক্রমণ তারপরে চতুর্দিক থেকে—নিঃসীম জলের মধ্যে সামান্য এতটুকু ডাঙা কতদিন যুঝতে পারে, দেখে নেবে তখন। সেই অবস্থা খুব যে বেশি দূরে, মনে হয় না।

এর পরে চন্দ্রভানু যেন পাগল হয়ে উঠলেন। আজ এখানে, কাল সেখানে—পাগলের মতন ছুটাছুটি। নদী শান্ত করা যায় কেমন করে। ভাল ভাল লোক এনে দেখাচ্ছেন। চিরকাল যারা এই সব নদীর চালচলতি দেখে আর হাঁকডাক শুনে ভিতরের মতলব ধরে ফেলে, এক মুঠো মাটি হাতে তুলে তল্লাটের মাটির গুণাগুণ বলে দেয়। তেমনি সব অভিজ্ঞ লোক। একজনে এক এক রকম বলে, ভরসা করা যায় না। সদরে গিয়ে সেচ-বিভাগের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। সেখান থেকে কলকাতা। বিস্তর ধরাপাড়া করে বহুদর্শী ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে ফিরলেন। ধরছেন চন্দ্রভানু ঠিকই—জলের গর্ভে চকের কলিয়ে যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয়। ঠেকানো দুষ্কর বটে। স্রোতের টান ঘুরিয়ে দিতে হবে কায়দাকৌশল করে। অবস্থা এমনি দাঁড় করাতে হবে—চড়া পড়বে এদিকটা, নদীর যত কিছু ভাঙন ভিন্ন পারে। আপাতত একটা কাজ করে দেখুন—ডাঙা থেকে নদীর সিকিভাগ অবধি বাঁধ দিয়ে বান। সে বাঁধ একটি দুটি নয়—একশ দেড়শ হাত অন্তর চলবে। সাগরচকের এলাকা শেষ হবে, তারও পরে খানিকটা দূর অবধি। দুটো বাঁধের মাঝে বালি জমে জমে সর পড়ে আসবে। বাঁধ অবশ্য ভাসিয়েও নিয়ে যেতে পারে। সঠিক কিছু বলা যাবে না, তবে রক্ষার উপায় একটা বটে। করে দেখুন তো রায়মশায়, কী রকমটা হয়।

সেই আয়োজন চলল। মাটি ফেলা শুরু হয়ে গেছে। ঘাট-সত্তরে কী হবে, অনেক বেশি লোক লাগানোর দরকার। শ-পাঁচেক অন্তত। স্রোতের বেগ আটকাতে স্রোতের জলের মতোই পয়সা খরচ। হচ্ছে সেই সব ব্যবস্থা। এমনি সময় এক রাত্রিবেলা হঠাৎ তুমুল কাণ্ড। মহিষমারির কঠিন পুরনো বাঁধ জলের তোড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। শোরগোল তুলে শত-সহস্র মুখে নদীজল ঢুকছে। মানুষও যে যেখানে ছিল আর্তনাদ করে এসে পড়ল। জল ঠেকানোর হরেক চেষ্টা। এমনি মাটি ফেলে লাভ হচ্ছে না, চক্ষের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। গায়ে গায়ে বাঁশের খোঁটা পুঁতে দেদার খড় এনে জড়াচ্ছে খোঁটার গায়ে। এইবারে মাটি। এমনি ভাবে জলের বেগ কিছু কমল।

সারারাত্রি ও সারাদিনের পরিশ্রমে কোন রকমে জল আটকানো গেল। কিন্তু ক্ষীণ বাঁধের পরমায়ু কতক্ষণ—যখন খুশি ভাসিয়ে নিতে পারে। এত লোকের আকুতি দেখে করুণার্দ্র হয়েই যেন বাঁধটুকু থাকতে দিয়েছে। জলরাশি রোদে চিকচিক করছে—চন্দ্রভানু মুখ ফিরিয়ে নেন। মনে হল, তাঁরই দিকে চেয়ে ব্যঙ্গ করছে অকূল হাসি বিস্তার করে।

সাগরচকের কেউ কিছু জানে না, চন্দ্রভানু ব্রতদুপুরে নীলবোটে গিয়ে উঠলেন। চোরের মতন পালিয়ে যাওয়া—টিলায় টিলায় সেই আর্তনাদ উঠেছিল, তাই বুঝি তাড়িয়ে তুলল তাঁকে। সন্ধ্যাবেলা মাঝিকে একটুমাত্র ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন, চলে যাবার প্রয়োজন হতে পারে। তৈরি হয়ে বোটের মধ্যে তারা বসে আছে। প্রবল টান—কুটো-পাছটি ফেললে বুঝি দুখানা হয়ে যাবে। টানের পড়ে গিয়ে বোট হু-হু করে ছুটতে লাগল।

ভরা পূর্ণিমা সেদিন, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। চন্দ্রভানু বোটের ছাদের উপর উঠে বসলেন, ছাদ থেকে বাম্পাচ্ছন্ন চোখ চরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন সম্বিত নেই। অনেকক্ষণ পরে অস্পষ্ট আদেশ বেরুল ঃ সোনাছড়ি বন্দর—

সোনাছড়ি দেখতে দেখতে জেঁকে উঠেছে। অঞ্চল জুড়ে লালমোহন মিত্তিরের কুঠি, তার যাবতীয় বন্দোবস্ত এই যুগলছড়ির গদি থেকে। গদিরই লাগোয়া লালমোহনের নতুন বাড়ি। খবর গেল। কানে শুনে লাল-মোহনের বিশ্বাস হয় না ছোটরায় চন্দ্রভানু ঘাটে এসে বোট বেঁধেছেন, নিজে চলে এসেছেন দেখা করার জন্য। দেখ তো আজ সকালে আকাশের সূর্য কোনদিকে উঠেছে—পুবে অথবা পশ্চিমে?

হন্তদন্ত হয়ে লালমোহন ঘাটে ছুটে গেলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে বলেন, কি আদেশ?

আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি। আপনার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক হবে আমার—

কিসে কি হল, লালমোহন বুঝতে পারেন না। মত হঠাৎ ঘুরে গেল কিসে?

চন্দ্রভানু নিজেই ক্রমশ প্রকাশ করে বলছেন, আপনার কন্যা আমার কুললক্ষ্মী হবে। কিন্তু বরপণ লাগবে, আমাদের রায়-বাড়ির যা রেওয়াজ—

লালমোহন কৃতার্থ হয়ে বলেন, নিশ্চয় দেবো। তখনই তো বলেছিলাম। আমার ঐ এক মেয়ে। সাধ মিটিয়ে সাজিয়ে দেবো।

চন্দ্রভানু বললেন, আজ্ঞামোজা কথায় কাজ এগোবে না মিত্তিরমশায়। কথাবার্তা শেষ করে যাবো বলে নিজেই চলে এসেছি। দাবিটা আমি না হয় খোলাখুলি টাকার অঙ্কে বলি—

নতুন নতুন বাঁধ বাঁধা এবং নতুন খাল কেটে স্রোতের গতি ঘোরানো—সমস্ত ব্যাপারের মোটামুটি একটা হিসাব তৈরি হয়েছে। চন্দ্রভানু নিজের সংগতিতে খানিকটা পারবেন। বাকি অঙ্কটা বলে দিলেন। শিহরণ লাগে লালমোহনের, উৎসাহ চুপসে আসে।

মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে চন্দ্রভানু বললেন, ব্যবসাদার মানুষ—লাভ-লোকসান মনে মনে খতিয়ে দেখছেন। দামটা বুঝি বেশি বলে ঠেকছে?

লালমোহন তাড়াতাড়ি বলেন, তা নয়। দেশ থেকে সবাই তো এসে গেছেন। আমার মা রয়েছেন। সকলের সঙ্গে কথা বলতে হবে একবার—

শেষ করতে না দিয়ে চন্দ্রভানু আগের কথা ধরেই বলে যাচ্ছেন, বাইরে থেকে এসে অঢেল টাকা করেছেন, এবারে প্রতিষ্ঠা চাচ্ছেন অঞ্চলের মধ্যে। রায়বাড়ির সঙ্গে কুটুম্বিতা করবেন, খরচ সেজন্য বেশিই হবে। চিংড়ি-খটির হিসাব ধরে তুলনা করতে যাবেন না।

কথায় গা পচে যায় না, অপমানের দা লালমোহন গায়ে মাখেন না। মিনমিন করে বললেন, হিসাবের কি তুলনা করব রায়-মশায়। যদি কিছু করতে হয় সে আমার সংগতির হিসাব।

হুঁক দিয়ে তৎক্ষণাৎ মাঝিকে ডেকে চন্দ্রভানু বললেন, তোমার দাঁড়িরা সব নেমে গেল কেন? ছুটে গিয়ে ডেকে আনো, রওনা হতে হবে।

রওনা হবেন কেন? জবাব আমি দিইনি তো এখনো—

হতভম্ব হয়ে গেছেন লালমোহন, হেসে ব্যাপারটা লঘু করতে চান। বললেন, কন্যা-দায় মাথার উপর—এ সময় নিজের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়, বুদ্ধিশুদ্ধি অন্যের কাছে নিতে হয়। আমি সেই কথাটাই বলছিলাম।

আমারও মাথায় মস্ত দায়। বেশ কথা, গোনের ঘণ্টা দুই-তিন বাকি এখনো।

উজান ঠেলে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। কাজ নেই, রইলাম এখানে জোয়ার অবধি। শলাপরামর্শ যা-কিছু এই সময়ের মধ্যে সেরে আসুন গে।

লালমোহন করজোড়ে বলেন, এখানে জলের উপর কেন থাকতে যাবেন? ঘাটের উপরেই কুঁড়ে-ঘর আমার, ঘরে এসে বসুন। মেয়ে দেখাটাও হয়ে যাবে।

চন্দ্রভানু ঘাড় নেড়ে অবলীলাক্রমে বলেন, দরকার কি? আপনার মেয়ে রূপবতী—সে তো বলেছিলেন আমার বাড়িতে। হয় যদি, আমার সেটা উপরি লাভ। কিন্তু আপনার কোন লাভ নেই। বরপণ তার জন্য কমবে না। রূপ নিয়ে রায়বাড়ির মাথাব্যথা নেই। বায়বাড়ির কনে দেখা হয় কথাবার্তা পাকা করে একেবারে সেই আশীর্বাদের দিনে। পাত্র বউ দেখতে পায় শুভদৃষ্টির সময়। কুশ্রী হলেই বরঞ্চ আমাদের বেশি পছন্দ—রূপের দাপ থাকে না। সংসার নিয়ে পড়ে থাকে সেই বউ, অসুরের মতো খেটে যায়।

কিছু কড়া হয়ে বললেন, আপ্যায়নে আপনি কিন্তু অনেক সময় নষ্ট করছেন মিত্তিরমশায়। জোয়ারের প্রথম মুখে বোট আমি ছাড়বই—তার মধ্যে জবাব না পেলে ধরে নেবো আপত্তি রয়েছে। সম্বন্ধ আরও কয়েকটা আছে, কোন একটা পাকাপাকি করে তবে ফিরে যাব।

চন্দ্রভানু বোটেই রয়ে গেলেন। লালমোহনকে দিশা করতে দেন না, তড়িঘড়ি তুললেন একেবারে। চন্দ্রবাবুর আসার খবরটা ইতিমধ্যে চাউর হয়ে গেছে। কি প্রস্তাব নিয়ে উপযাচক হয়ে চলে এসেছেন, শোনবার জন্য বাড়ি উন্মুখ। ডাকতে হল কাউকে। এমন কি ভক্তদাসও এসে দাঁড়িয়েছে।

লালমোহন রাগে গরগর করছেন : দেবো না বিয়ে। টাকার জন্যে সম্বন্ধ করতে এসেছে। টাকায় পুষিয়ে দিয়ে মেয়ের বদলে একটা কলসি কি একটা বালিশ কনে-পিঁড়িতে বসিয়ে সাতপাক ঘোরালেও বোধ হয় আপত্তি করবে না।

লালমোহনের মা গিন্নিঠাকরুন বলেন, মেয়ে তোমার এই একটি বই তো নয়। দিলেই না হয় টাকা। টাকা হয়েছে, সেই জন্যেই বলি। দাদাভাইরা সমস্ত কিছু পুরবে কেন, দিদি কি আমার ফেলনা? দিদি আমার গাঙের জলে ভেসে এসেছে?

সেকথা আমিই ছোটরায়কে আগে বলেছি। তাই বলে বেহিসাবি একটা চাইবে?

হিসাবের কথা হলে ভক্তদাসের এলাকায় পড়ে। সে বলে ওঠে : বিয়ে দেবেন না দেবেন আলাদা কথা। বিবেচনা করে দেখুন, হিসাব কিন্তু বেঠিক নয়। যতগুলো খটি, সব জায়গায় চারটে পাঁচটা করে পাহারাদার। শুধু মাইনে আর বাবরদারি বাবদ কত পড়ে, খতিয়ে দেখুন। এক বছর দু-বছরের ব্যাপার, তা-ও নয়—চিরকাল ধরে চলবে। এর উপরে পুলিশের তদ্বির রয়েছে। বিয়ে যদি হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে পাহারা বাতিল। ছোটরায়ের বেহাইয়ের জিনিস—ভূতেও তাকিয়ে দেখবে না।

একটুখানি থেমে যায় সে। কাল আরও আছে। ছোটরায় নিজে এসেছেন—এই অবস্থায় ভেস্তে দিলে আমাদের আর রক্ষে রাখবেন না। পাড়ি গুটিয়ে ঘরে ফিরতে হবে। পুলিশ বিক্ষণ মোতায়েন রেখেও সামলানো যাবে না।

সবিস্তারে শুনে মনোরমাও বিরূপ। তিক্তকণ্ঠে বলেন, কেবল ব্যাপারবাণিজ্যই ভাবছেন ম্যানেজারমশায়, মেয়ের দিকটা দেখবেন না? আমি আরও অনেক খোঁজ নিয়েছি। রায়বাড়ির বউয়ের সুখ হয় না, পুরুষরা বেয়াড়া। অধিকুড়ো ঐ ছোটরায়েরই ব্যাপার দেখুন না—স্ত্রী বর্তমান থাকতে কেলেঙ্কারি ঘর অবধি টেনে এনেছেন।

ভক্তদাসের সুর সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায় : বটেই তো! সাতপাকের বিয়ে চোদ্দ-বার উল্টো-পাক দিয়েও খসানো যায় না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সকল দিক দেখতে হবে বইকি! বলেছেন খাঁটি কথা। রায়বাড়ি আর দশটা গৃহস্থালির মতন নয়। ধরন-ধারণ আলাদা। সুন্দরবনের বাঘ মরে গিয়ে রায়েদের ঘরে জন্ম নেয়। বিশ্বাসও হয় সেকথা।

বিষম সমস্যা। তবে একথাও ঠিক, একালের রায়বাড়ি বদলে যাচ্ছে। অনেক বদলেছে, আরও বদলাবে। জেলো-ডাকাত জলে জলে বেড়াত—ভূমিলগ্ন হয়ে চকদার হয়েছে। পাত্র শহরে থেকে পাশের পর পাশ দিচ্ছে—সে কি আর বাপ-পিতামহের মতো হবে!

জোয়ারের আরও কিছু দেরি, অতএব পরামর্শ লম্বা হতে বাধা নেই। বুড়ামানুষ গিন্নিঠাকরুন বেশিক্ষণ বসতে পারেন না, নিজের ঘরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন। শাড়ি খস খস করে অন্ধকারে মীনাক্ষী এসে পায়ের কাছে বসল।

গিন্নিঠাকরুন বলেন, কি দিদি?

মীনাক্ষী বলে, পূর্ণিমায় বাতের অসুখ বেড়েছে তোমার। হাত-পা কামড়াচ্ছে। তাই একটুখানি টিপে দিতে এলাম ঠাকুরমা।

কে বলল তোকে? কিছু হয়নি আমার। যা তুই, কষ্ট করতে হবে না। আমি ঘুমোই।

মীনাক্ষী জেদ করে বলে, প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমায় তো বাত বাড়ে, হাত-পা কামড়ায়। না বললেই শুনব? তোমার ঘুম ধরেছে ঠাকুরমা, তাই গোপন করছ। না-ই কামড়াল হাত-পা, তা বলে একটুখানি টিপে দিলে বুঝি দোষ!

ঠাকুরমা বলেন, এতক্ষণ ছিলি কোথায় দিদি? কথাবার্তা সব শুনেছিস?

বয়ে গেছে আমার! ঝঙ্কার দিয়ে উঠে মীনাক্ষী পা টিপতে লেগে যায়। ক্ষণপরে বলে, অনেক টাকা চাইছে বুঝি? তা ঠাকুরমা, নাতনিটি তোমার কেমন তা-ও তো দেখতে হবে! টাকার লোভে নিতে যাচ্ছে—বিনি টাকায় কে ঘরে নেবে বলো।

ঠাকুরমা চটে গিয়ে বলেন, টাকা দেবার কথা আমিও বলেছি তোর বাপকে। তার জন্যে মিহামিছি তুই নাতনির নিন্দে করবি নে। মানা করে দিচ্ছি। টাকার জন্যে যে আটকাচ্ছে তা-ও ঠিক নয়। ও-বাড়ির পুরুষগুলো বদ—বানর বাঘ মরে মরে ঐসব পুরুষ হয়েছে, ম্যানেজার বলছিল। বড় ভয়ানক।

মীনাক্ষী এবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে, সেই জন্যেই আরও যেতে চাই।

কেন রে?

বিড়াল পুষে বশ করে তো সবাই। বাঘ বশ করায় বাহাদুরি। ডাঙাঅঞ্চলের মানুষ বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ওরা। ক্ষমতাটা দেখিয়ে দিতে চাই আমি।

এমনি সময় চটিজুতোর শব্দ বাইরে। পরামর্শ শেষ করে লালমোহন চলেছেন। গিন্নিঠাকরুন ছেলেকে ডাকছেন : ও লালু শোন। কি ঠিক করলে তোমরা? আমাদের কথাটাও তো শুনে নেবে।

মীনাক্ষী আর নেই। ফুড়ুত করে যেন পাখি হয়ে উড়ে চলে গেছে।

সোনাছড়িতে কথাবার্তা পাকা হল তো সেখান থেকে সদরে। বিয়ের কেনা-কাটা কিছু আছে। কিন্তু আসল ব্যাপার হল—নদীর সঙ্গে পুরোপুরি এবার লড়াইয়ে নামা, সেই আয়োজন। বিশেষজ্ঞ চলে যাবেন সাগরচকে, নক্সা বানাবেন। যন্ত্রপাতি কিছু যাবে বাইরে থেকে। এইসব ব্যবস্থায় দিন দশেক কেটে গেল। সদর ছেড়ে তারপর চন্দ্রভানু বাড়ি চলে এলেন।

ইন্দুমতীর আরও খারাপ অবস্থা। হাত-খানাও উঁচু করে তুলতে পারেন না এখন। কিন্তু চোখে আগুন। একবার নীহারনলিনী আর একবার স্বামীর দিকে চেয়ে তিনি ভ্রূকুটি করলেন : অসময়ে হঠাৎ? চকে মন টিঁকল না বুঝি?

মুখে বিষের থলি। সর্ব অঙ্গ গিয়ে মুখটাই বজায় রয়ে গেছে বিষ ছড়ানোর জন্যে। কথা কাটাকাটি করতে প্রবৃত্তি হয় না, অবসন্ন কণ্ঠে চন্দ্রভানু বললেন, আসতে হল ছোটবউ তোমারই সংসারের জন্য। ধ্রুবর বউ ছাড়া কারো আঁচলে তুমি যে চাবি দেবে না। নতুন বউকে শিখিয়ে পড়িয়ে দায়ভার দিতেও সময় লাগবে। বিয়ে ঠিক করে এলাম। ধ্রুবকে জরুরি খবর দিয়ে পাঠিয়েছি। এখনো আসেনি—কাল-পরশুর মধ্যে ঠিক এসে পড়বে। শুভকর্ম মিটিয়ে দিয়ে একনাগাড় এবার থেকে চকে গিয়ে থাকব।

এরপর চন্দ্রভানু আর স্ত্রীর ছায়া মাড়ান না, দোতলার সিঁড়িতেই পা ছোঁয়ান না একেবারে। ইন্দুমতী যা বললেন, তেমনি সন্দেহ আরও কতজনের মনে ঘুরছে! এই নিয়ে কথা উঠবার সুযোগ দেবেন না। বৈঠকখানায় দিনরাতের আস্তানা। প্রকাণ্ড হল, অতিকায় থাম সারি সারি। সেইখানে ফরাসের উপর বসে নিজের ডানহাত চিতিয়ে চোখের সামনে ধরে চুপচাপ বসে দেখেন। মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে না। কেউ এসে পড়লে দু-কথায় বিদায় করে বাঁচেন। হাতের হিজিবিজি রেখাজালের মধ্যে যেন সাগর-চকের গোটা অঞ্চল নিয়ে মানচিত্র। কোথাও নদী কোথাও খাল কোথাও টিলা কোথাও বা ক্ষেত। কত ছুটাছুটি করেছেন এদের উপর দিয়ে—সমস্ত যৌবন কেটে গেছে। জীবনের অপরাহ্নে এসে নদী-খাল-বিদ্রোহী—দু-পুরুষ ধরে সাজানো সাগরচক টেনে জলতলে নামিয়ে নিয়ে নিশ্চিহ্ন করব।

গড়গড়া নিয়ে গেল। কলকাতা থেকে ধ্রুব এসে গেছে, বুঝি মায়ের ঘরেই আছে সে এখন। মেলানো হাত মুঠি হল—মুঠিতে নল ধরে চন্দ্রভানু গড়গড়া টানছেন। চোখ বুজে আসে—বোধহয় চিন্তায়। কিম্বা হয়তো আরামে। অনেকক্ষণ কাটল।

পায়ের শব্দে চোখ মেলেন : ধ্রুব?

আমি নকড়ি। চক থেকে একদল প্রজা এসেছে, দরকার আছে আপনার কাছে।

চন্দ্রভানু ভ্রূকুটি করলেন : রায়বাড়ি কোনদিন আসে না কোন প্রজা। আসবার কথাও নয়। কত জায়গায় আমার ছুটোছুটি—বাড়ি এসেছি, তা-ই বা ওরা জানল কি করে?

খোঁজে খোঁজে এসে পড়েছে। সদরেও গিয়েছিল। নাকি উপায় নেই।

আসামি খুঁজতে বেরিয়েছে। জ্বলছেন চন্দ্রভানু মনে মনে। বিশাল পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজন তারা চিরকাল জুগিয়ে এসেছে। বিপদের মুখে রাত্রিবেলা পালিয়ে আসা—পলাতক আসামি ছাড়া অন্য কি ভাবতে পারে?

নকড়ি মৃদুকণ্ঠে বলে, ঘন্টাঘরের নিচে সব দাঁড়িয়ে আছে।

কী করতে হবে আমায় বলো। পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে ছুটতে হবে? ধাপে ধাপে গলা চড়ছে চন্দ্রভানুর : প্রজা এসেছে—তাই নিয়েও যদি আমায় বিরক্ত করবে, তোমরা আছ কি জন্যে?

নকড়ি হাত কচলে বলে, খাজনা নেবার ক্ষমতাই আমাদের। যদি খাজনা দিতে আসত, নিয়ে নিতাম। আপনা অবধি খবর দেবার কারণ হত না।

রায়বাড়ি তাদেরও অন্য কাজ নেই ঐ খাজনা দেওয়া ছাড়া। বাকি সব রায়েরাই নিজে থেকেই করে আসছে। বাতলে দিতে হয় না।

নকড়ি বলে, বরাবর হয়ে আসছে তো তাই। এবারই উল্টো-পাল্টা দেখি। হাতে করে লিখিত দরখাস্ত নিয়ে এসেছে।

জবাব দিলেন না চন্দ্রভানু। গড়গড়া টেনে যাচ্ছেন। কাচুমাচু মুখ করে নকড়ি দাঁড়িয়ে। লম্বা একফর্দ বালির কাগজ ঈষৎ নাড়-চাড়া করে।

মুখ থেকে নল সরিয়ে চন্দ্রভানু বললেন, পড়ো একটু—কি লিখেছে, শোনা যাক।

পড়ছে নকড়ি : মহিমার্ণব হুজুর বিশাল বটবৃক্ষ-স্বরূপ। আমরা যাবতীয় সন্তান-সন্ততিগণ সুশীতল ছায়ায় পরম শান্তিতে বসবাস করিতেছিলাম—

চন্দ্রভানু হো-হো করে হেসে উঠলেন : খাসা লিখেছে হে! বটবৃক্ষের উপমা—ঝড়-ঝাপটা যতই আসুক বটবৃক্ষ কাবু হয় না। ইস্কুল বসিয়ে কাজ হয়েছে তবে? মুন্সী-বিদ্যা হেডমাস্টারের ঠিক—অন্য কাজ নেই, বসে বসে দরখাস্ত লিখেছে। মোদ্দা কথাটা কি নকড়ি—নিরবধি বাঁধ ভাঙছে, এই তো?

নকড়ি বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। চকের দক্ষিণ অংশে লবণাক্ত জলের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে—

গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে চন্দ্রভানু ঘন ঘন টানতে লাগলেন। অর্থাৎ যা শোনবার হয়ে গেছে, আর শুনতে চান না। একটা কিছু জবাব না পেয়ে নকড়িও যেতে পারছে না। চুপচাপ আছে।

ধ্রুব কখন এসে দাঁড়িয়েছে পিছন দিকে। বলে উঠল, তারা দেখা করতে চায় বাবা। মুখে সমস্ত বুঝিয়ে বলবে।

মুখ ফিরিয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রভানু বলেন, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে নিশ্চয়। বলেছেও যা বলবার?

হ্যাঁ—। ঘাড় নাড়ে ধ্রুব : কিন্তু আমায় বলে কি হবে? প্রতিকার তো আমার হাতে নেই।

আছে। তোমার হাতেই সব। বোসো তুমি, আমার জরুরি ডাক সেইজন্য।

নকড়ির দিকে চেয়ে বললেন, রাত্রে দেখা হবে না। মণ্ডপবাড়ি চলে যাক। বেরিয়ে গেলে দারোয়ানকে দেউড়ি বন্ধ করতে বলো। রাত্রে কি জন্যে ফটক খোলা থাকে, কাল তার কৈফিয়ৎ তলব হবে।

নকড়ি চলে গেলে চন্দ্রভানু আরও কিছুক্ষণ ধূম উদ্গীরণ করলেন। টিক-টিক করে দেয়াল-ঘড়িতে সময় যাচ্ছে। মুখ তুলে হঠাৎ বললেন, তোমার বিয়ে সাব্যস্ত করে এসেছি ধ্রুব। লালমোহন মিত্তিরের মেয়ে। কাল ওরা আশীর্বাদ করতে আসবে। দশ দিন পরে আঠাশে তারিখ বিয়ে।

আবার বলেন, উপায় কি বলো। এর পরেই অকাল পড়ে যাচ্ছে। এক মেয়ে তাদের, অদিনে অক্ষণে দেবে না। তিন মাস তা'হলে বসে থাকতে হয়। তারা পারলেও আমি পারব না।

ধ্রুবভানু যেন পাথর হয়ে গেল। বলে, জরুরি ডাক পেয়ে মায়ের কথাই মনে হল আমার। পরীক্ষার মুখ হলেও ছুটে এসে পড়েছি।

চন্দ্রভানু বলেন, আজকেও না এসে পৌঁছলে আমি নিজে চলে যেতাম। দিনক্ষণ পাকাপাকি করে দশের মুরুব্বিরা লগ্নপত্র করে এসেছি।

ধ্রুব বলে, আমার পরীক্ষা যে ঠিক ঐ সময়টা। দিন নেই রাত নেই জীবন-পণ করে খাটছি।

পরীক্ষা বাতিল।

বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে ধ্রুব নিঃশব্দে উঠে পড়ল। চন্দ্রভানু বললেন, কিছু বলে গেলে না?

আমার মতামত জানতে চাও বাবা?

অমত নয়। সুশীল সুবোধ্য ছেলের মতন ঘাড় নেড়ে হাঁ বলে যাবে, এইটে চাচ্ছি। এ-বাড়িতে বরাবর যা হয়ে এসেছে। আমিও যেমন একদিন আমার বাবার কাছে হাঁ দিয়েছিলাম।

কিন্তু চন্দ্রভানুর কৈশোরের সে দিন-কাল বদলে গেছে। অন্যরকম বায়ুবাড়ি এখন। বাপের কথার জবাবে ধ্রুবভানু বলে, যদি না পারি?

পারলে ভাল ছিল। তুমি মনের খুশিতে থাকতে পারতে, আমিও হাসিমুখে কাজে লাগতাম।

একটু থেমে কঠিন কণ্ঠে বললেন, তোমার অমতে কাজের অবশ্য কোনই ক্ষতি হবে না। লালমোহন মিত্তির আশীর্বাদ করে যাবে, আঠাশে তারিখ ঢোল-শানাই বাজিয়ে সোনাছড়ি বন্দরে গিয়ে তুমিও ঠিক বরাসনে বসবে।

নকড়িকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল এমনি সময়।

আবার কি নকড়ি?

মণ্ডপবাড়ি তালাবন্ধ। মহাদেব দারোয়ান বলল, চাবি আপনার কাছে।

তাই বোধহয় হবে। চন্দ্রভানুর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। হাসতে হাসতে বলেন, পুজোর পর মহাদেব দেশে যাচ্ছিল, মণ্ডপ-বাড়ির চাবি দিয়ে গিয়েছিল বটে আমার। সে চাবি আমি ছোটবউকে দিয়ে দিলাম।

ধ্রুব শশব্যস্ত হয়ে বলে, মা'র কাছ থেকে নিয়ে আসি আমি।

চন্দ্রভানু সজোরে ঘাড় নেড়ে উঠলেন : না—

তা হলে ওরা থাকবে কোথায় বাবা? খাবেই বা কি?

মস্তবড় দীঘি রয়েছে—খাবে দীঘির জল। থাকবে আমতলায়।

ছেলেকে ঠেশ দিয়ে বলছেন, কলকাতার তেতলা ঘরে থাকা অভ্যাস নেই—ওরা বেশ পারবে। নোনাঅঞ্চলের মানুষের মুখে অমৃতের মতো লাগবে আমাদের দীঘির জল। উতলা হোয়ো না তুমি—রোগামানুষ ছোটবউকে চাবির জন্য রাত্রিবেলা বিরক্ত করব না।

নকড়ির দিকে ফিরে তিক্তস্বরে বলেন, তুমি আজকের মানুষ নও নকড়ি। ব্যাপার কোথায় গিয়ে ঠেকেছে বুঝে দেখ। চরের মানুষদের ভাসিয়ে দিয়ে আমি যেন আরাম করে অট্টালিকায় এসে বসেছি। এতদূর অবিশ্বাস করছে আজ, এত আলাদা করে দেখছে। দল বেঁধে দরখাস্ত নিয়ে চকের কথা মনে করিয়ে দিতে এলো। রায়বাড়ির দেউড়ি পার হয়ে উঠানের উপর জমায়েত হয়ে দাঁড়াল।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে আবার বলেন, বাইরে যেমন, ঘরের ব্যাপারেও ঠিক তাই ছেলের বিয়ে ঠিক করে এসেছি, তা নিয়েও কথা কাটাকাটি। বিয়ে করবে, তার জন্যে নাকি মতামতের দরকার। কী হয়ে গেছে সব, কী ছেবেছে—বলো দিকি! সাগরচক যেন আমার নয়! ছেলে যেন আমার নয়! নদীগুলো যা করছে, এ-ও তাই—বাঁধ ভাঙারই ব্যাপার। কোনদিকে আর বাঁধ রাখা যাচ্ছে না নকড়ি।

কলকে বদলে দিয়ে গেছে, গুম হয়ে চন্দ্রভানু তামাক টানতে লাগলেন। নকড়ি চলে যাচ্ছিল—চন্দ্রভানু বললেন, কাল সকালবেলা ফটক খোলার পরেও সাগরচকের একটি প্রাণী উঠানের ত্রি-সীমানায় যেন ঢুকতে না পাবে। দারোয়ানকে বলে দিও নকড়ি। আর বাড়ির ভিতরের কেউ যদি বেরুতে চায়, তাকেও বেরুতে দেবে না আমার হুকুম ছাড়া।

নকড়ির মুখে কথা সরে না। চন্দ্রভানু আরও স্পষ্ট করে বললেন, ধ্রুবর কথাই বলছি। কাল পাত্র-আশীর্বাদ—আশীর্বাদ শেষ হবার আগে ধ্রুব রায়বাড়ি থেকে বেরুবে না।

ধ্রুবভানুর হাসিমুখ। হেসে বলে, আটক করলে বাবা?

চন্দ্রভানু ঘাড় নাড়েন : অন্যায়ের সাজা পাবে বইকি। চকের মানুষদের গাছতলায়, তেমায় আবদ্ধ ঘরে। তালাও আটকাবে, যদি প্রয়োজন হয়।

কিন্তু ঘরে আটক করেই কি ঠেকাতে পারবেন? ঠেকানো যায় না।

চন্দ্রভানু বলেন : কী জানি, আমি তে বরাবর এই করে এসেছি। বাঁধ আটকে জল ঠেকিয়েছি, দরজা আটকে মানুষ। বাঁধে এখন আর বাগ মানছে না, মানুষই বা কী করে দেখা যাক।

অনেক—অনেক রাত্রি। রায়বাড়ি একেবারে নিশুতি। চন্দ্রভানু ছেলের ঘরের দরজার নাড়া দিলেন। খিল আঁটা নেই, দরজা হাঁ হয়ে পড়ল। ঘুমোয়নি ধ্রুব। বই একটা সামনে রয়েছে, কিন্তু পড়ছেও না। বাপকে দেখে চাবিতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

চন্দ্রভানু হেসে ওঠেন। ছেলেমানুষের মতো উচ্ছলিত সরল হাসি। এই নিশি-রাত্রে বাইরের কেউ নেই, ইজ্জতের প্রশ্ন নেই। বাপ আর ছেলে—একেবারে ভিন্ন মানুষ বাপ এখন।

বড্ড রাগ হয়েছে—না-রে? আমার স্বভাবটা হুবহু পেয়ে গেছ তুমি। বিয়ের সময়টা আমিও ঠিক এই করেছিলাম।

পাশে বসে পড়লেন। হাসিমুখে ছেলের গায়ে হাত রাখলেন। ধ্রুবর সর্বদেহ কঠিন—বুঝি রক্ত-মাংসের নয়। বুঝি নিশ্বাসও পড়ে না। ইস্পাতে গড়া অচঞ্চল কঠিন মূর্তি একটা।

চন্দ্রভানু আবার হাসলেন। ছেলের মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে থেকে বললেন, তোমায় কি বলি, আমারও হুবহু এই ব্যাপার। কে এসে তোমার মায়ের খবর বলল, কনের কিন্তু একটা চোখ নেই। রাগারাগি করছি : কানা মেয়ে বিয়ে করব? আরও খবর পেলাম, চোখের বদলে এক হাজার টাকা বেশি ধরে দিচ্ছেন কনের বাপ। সে টাকা এই সাগরচকেরই জন্য। বন হাসিলে জলের মতন খরচা হচ্ছে—এক হাজারের অনেক দাম তখন। বাবার কানে কি করে কথাটা চলে গেল। এক-ঘর আত্মীয়-কুটুম্বর মাঝখানে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, মতলব কি তোর? আপোসে যাবি, না কান ধরে পানসিতে তুলতে হবে? ভরসা করতে পারেন না। ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করলেন, যাত্রামঙ্গল পড়বার সময় বের হয়ে এলাম।

এবার ধ্রুব না বলে পারে না : তুমিও তো তালা আটকানোর কথা বললে বাবা।

তিনি সত্যি সত্যি আটকে রেখেছিলেন, আমি শুধু মুখে বললাম একবার। নকড়ি পুরানো লোক, কর্তার আমলও দেখেছে। রুদ্রভানুর ছেলে হয়ে ইজ্জতের দায়ে একবার অন্তত বলতেই হবে আমায়। বলেছিলাম, এখন আবার রাতদুপুরে খোশামুদি করতে এসেছি। এমন অবস্থা ভাবতে পারতেন সেকালের রুদ্রভানু? তবু তো বউমা আমার কানা নয় খোঁড়া নয়—শুনেছি পরম রূপ-বতী। আর তুমি মুখের উপরেই ফরফর করে অমতের কথা শুনিয়ে দিলে। দিনকাল বদলেছে, সন্দেহ কি।

সাগরচকের কথা এসে গেল। সমুদ্রজল রাক্ষসের মতো হাঁ করে আছে, সিকিভাগ গ্রাস করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। বাসিন্দারা আর ভরসা করতে পারে না—পালিয়ে চলে এসেছি, এই ধরে নিয়েছে। বাবা আর আমি—দু-পুরুষ আমরা জীবনপাত করে এলাম, চরের বিপদ আজ দরখাস্ত করে আমার কাছে জানান দিতে এসেছে। রাগ হয় কি না বলো!

বলতে বলতে কণ্ঠ ভারী হল। চোখও অশ্রুসিক্ত নাকি— ম্লান দীপালোকে ঠাহর করবার জো নেই। ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে চন্দ্রভানু আবার বলেন, দলিলপত্রে মালিক যে-ই হোক, সাগরচক সকলের। সকলে আমরা প্রতিপালিত হচ্ছি—যত মানুষ চকে ঘরবাড়ি বানিয়ে আছে, যত মানুষ এই রায়-বাড়ির ভিতরে আছে। ওদের আর আমাদের বাপ-দাদারা একসঙ্গে জলেজঙ্গলে ছুটো-ছুটি করে বেড়িয়েছে। চিলেকোঠায় ঘরজোড়া জয়ঢাক ছিঁড়েখুঁড়ে পড়ে আছে এখনো—একদিন ছিল, ঐ ঢাকে একবার কাঠি দিলে অঞ্চল জুড়ে শতেক ঢাকে ঘা পড়ত সঙ্গে সঙ্গে। দীঘির মাঠ জুড়ে কাতারে কাতারে মানুষ জমত। জীবন দিতে কবুলে—দিয়েছেও কতজনা। এখন চকদার মানুষ কিনা, ফরসা কাপড়জামা আমাদের অঙ্গে, বাড়ির ছেলে বিদ্বান হচ্ছে—সেইজন্যে সন্দেহ ওদের। সন্দেহ একেবারে অন্যায়, তাই বা বলি আজ কেমন করে?

## দ্বিতীয়পর্ব

বাঘ মরে রায়বাড়ির পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়—বাপের বাড়ি ভক্তদাসের কাছে শুনেছিল মীনাক্ষী। এখানে শ্বশুরবাড়িতেও সেই কথা। কিরণবালা মেয়েটা বয়সে মীনাক্ষীর চেয়ে কিছু বড়। বরে নেয় না, কোথাকার অন্য এক রমণী নিয়ে আছে। অসহায় অবস্থা—আছে কিরণ রায়বাড়িতে, খায়দায় থাকে। নতুন-বউয়ের বড় ভাব জমল কিরণের সঙ্গে।

কিরণবালা সাবধান করে দেয় : এরা ভাই সুন্দরবনের বাঘ। বাঘ পোষ মানে না, এরাও তাই। পোষ মানাতে পারবি নে, সর্বদা নজরে নজরে রাখবি—বেচাল কিছু করতে না পারে। অন্তত এই রায়বাড়ির ভিতরে। দুয়োরে ঢুকতে জোড়া-মন্দির, দু-দুজন ঠাকুর-ঠাকরুন চোখ মেলে আছেন, অনাচারে বাড়ি ধ্বসে পড়বে।

ইন্দুমতীর দৃষ্টান্ত দেয়। আরও শোচনীয় অবস্থা তাঁর এখন। কথাও একরকম বন্ধ। মুখ দিয়ে ফ্যাসফাস করে আওয়াজ বেরোয়, সে বোঝে একমাত্র নীহার-নলিনী। বুঝে নিয়ে ব্যবস্থা করে। তবু প্রতাপটা দেখ সেই পঙ্গু মানুষের। নীহার-নলিনীকে আটকে ফেলেছেন নিজের কাছে, স্বামীকে তেপান্তরের চকে সরিয়ে দিয়েছেন। চন্দ্রভানু আসুন দেখি বাড়ি নিয়মের বাইরে—বছরে দুবারের বেশি তিনবার। হপ্তার বেশি থাকুন দেখি বাড়ি এসে। যাড়ি যে ক'দিন থাকবেন, চোখাচোখি তাকান তো একবার নীহারনলিনীর দিকে। সে আর হতে হয় না! ছোটরায়ের নামে বাঘে-গরুতে এক-ঘাটে জল খায়, কিন্তু বাড়ির মধ্যে সেই মানুষ কেঁচো। শাশুড়ির আঁচলের চাবি নিয়েছে নতুন-বউ, সেই সঙ্গে ওঁর পতি-শাসনের কায়দাও শিখে নাও।

মীনাক্ষী মনে মনে জিভ কাটে। হেসে মুখ টিপে। সখী হয়েছিস—রাত্রিবেলা ভোঁস-ভোঁস করে না ঘুমিয়ে জানলায় আড়ি-পেতে একদিন শুনে এলে তো পারিস কেমন এই তরুণ-বাঘের গর্জন।

নিশিরাত্রি। ভরা পূর্ণিমা সেদিন। রায়-বাড়ির দোতলার অলিন্দে জ্যোৎস্না গড়িয়ে এসে পড়ছে বড় বড় থামের ফাঁক দিয়ে। লোকজন-ভরা বাড়ি নিশুতি হয়ে থমথম করছে। এ রাত্রে দেয়ালের অন্তরালে কে বন্দী হয়ে থাকবে—পায়ে পায়ে দুজনে অলিন্দে এসে বসল।

মীনাক্ষী বলে, বাঘ নাকি তোমরা—কিরণ-ঠাকুরঝি বলে। বাঘ থেকে রায়বাড়ির পুরুষ হয়ে এসেছে।

ঠিক তাই। জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে ধ্রুব-ভানু মেনে নিল : অত শক্তি আর অমন সাহস মানুষের কখনো হতে পারে না। আমাদের বলত, বনের বাঘ নয়—জলের বাঘ। গুণীনের মন্ত্র পড়ে নীতিনিয়ম মেনে বনের বাঘ ঠেকানো যায়, কিন্তু জলের বাঘের নামে লোকে একদিন থরথর করে কাঁপত।

দীঘি ছাড়িয়ে তার ওদিকে দিগ্‌ব্যাপ্ত নদী জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে। চেয়ে চেয়ে ধ্রুবভানু উন্মনা হয়ে পড়েন। বলে, খুব যে বেশি দূরের দিন তা নয়। আমার ঠাকুরদা রুদ্রভানু চক বন্দোবস্ত নিয়ে কাছারিতে স্থিতি করলেন। জমি বড় পাজি জিনিস—এক জায়গায় কামড়ে পড়ে থাকতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রুদ্রভানুকে নেশায় জমিয়ে দিল। এলাকা ঠান্ডা করে ফেলল। বলশক্তি দৌড়ঝাঁপ সমস্ত গিয়ে চকের জমিই সর্বস্ব এখন আমাদের।

ধক করে চন্দ্রভানুর কথা মনে এসে যায়। কোথায় এখন—এই জ্যোৎস্না রাত্রে? বউ-ভাতের পর একটা দিনেরও সবুর মানলেন না। এক একটা ঘণ্টারও যে অনেক দাম। শয়তান নদী নতুন নতুন প্রবেশপথ বানিয়ে ঘাঁটি শক্ত করে নিচ্ছে। বিয়ের ব্যাপারটা কোন রকমে চুকিয়ে টাকার কাঁড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। চিঠি আসে কালেভদ্রে কদাচিৎ—কেমন আছ, ভাল আছি, এই জাতীয় পাঁচটা সাতটা কথা। সদরে ছুটাছুটি চলছে— অঞ্চলের এর তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তারা এসে খবর বলে। আজ এই রাত্রে, অনুমান করা যায়, তাঁরও চোখে ঘুম নেই। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দেখছেন না অলসদৃষ্টি মেলে—মানুষজন জুটিয়ে পূর্ণিমার কোটালের দুর্বার জল-স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে বেড়াচ্ছেন।

ধ্রুব গম্ভীর হয়ে পড়েছিল। ভাল লাগে না মীনাক্ষীর—ঝুপ করে কোলের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে। দু-বাহু গলায় জড়ায়। বলে, গুণীনের মন্তোর কোথায় লাগে আমার কাছে—সকলের বড় গুণীন আমি। [illegible] বেঁধে ফেলেছি। পোষা বাঘ এই যে

আমার—সে বাঘে হামলা দেবে না কখনো, কামড়াবে না—

ধ্রুব বলে, কি করবে?

গান গাইবে আমার কানে কানে, আদর করবে, ভালবাসার কথা শোনাবে, আমার মনপ্রাণ জুড়ে থাকবে—

চাঁদের আলোয় ধ্রুব মুগ্ধচোখে তাকিয়ে আছে মুখের দিকে। মীনাক্ষী বলেই যাচ্ছে, আজকে বলে নয়—চিরকাল। যতদিন আমি বেঁচে থাকব, তার চেয়ে একটা দিন একটা ঘণ্টা একটা মিনিটও কম নয়। আনন্দের ঘোরে তারপরে একদিন মরে পড়ব তোমার পায়ের নিচে। শেষ তখন।

খবরদার!

বেশ চলছিল, তাড়া খেয়ে মীনাক্ষী সভয়ে ধ্রুবর দিকে তাকায়।

ধ্রুব বলে মরার কথাবার্তা কোনদিন আর যেন মুখে না শুনি। খুনোখুনি হয়ে যাবে, এই বলে দিচ্ছি।

ভয়ে ভয়ে মীনাক্ষী বলে, মরব না তা বলে? কোন একদিন—

না, কোনদিনও না।

এ তোমার অন্যায়, জুলুম।

বেলডাঙার রায়েদের জুলুমবাজ বলে বদনাম কি আজ এই প্রথম হল।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। চাঁদ পশ্চিমে চলেছে। কথার যেন শেষ নেই, কথা বলে বলে সাধ মেটে না। প্রাচীন এক নারিকেল-গাছ অন্দরের উঠানে। গাছের ছায়া পড়ে এসে দুজনের মুখে। গাছের পাতা ঝিলমিল করে, মুখের উপরে জ্যোৎস্না ডোরা কেটে যায়। অসহ্য আনন্দে দিশা করতে পারে না, দুচোখে জল এসে পড়ে মীনাক্ষীর।

ধ্রুব ব্যাকুল হয়ে বলে, কি হল?

কেন তুমি এত ভালো? এবাড়ি নিয়ে কতরকম শুনি—বউদের কত কায়দা-কানুন করতে হয় নাকি বর বাঁধবার জন্য। অলিন্দে অনিন্দে পুরস্ত্রীদের কত চোখের জল পড়েছে। সংসারধর্ম নিয়ে দিনমানটা তবু একরকম কেটে যায়, চাব প্রহর রাত আর কাটতে চায় না। রেলিং ধরে কত কত প্রতীক্ষা। কিন্তু এ আমার কী হল—দেবতা হয়ে বরাভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ। একটিবার চাইতে হয় না, আপনাআপনি বর পেয়ে যাই।

দুই সতীনের গল্প বলেছেন গোবিন্দ-সুন্দরী—এ-বাড়িব সেকালের দুই বউ। যে রাত্রে কর্তা বাড়ি এলেন, চুলোচুলি ঝগড়া দু-জনে। কে দখল নেবে স্বামীর? কর্তা বাড়ি না এলে বড় ভাব—দুই বোন তখন, অভিন্নহৃদয় দুই সখী। দাবাখেলা শিখে নিয়েছিল, দাবায় সমস্ত রাত কেটে যেত। মীনাক্ষীর কী দুর্ভাগ্য—একটা সতীন নেই যে খানিক ঝগড়া করে বাঁচে। অতই বা কেন—ধ্রুব বাড়ি ছেড়ে দশ-পা দূরে যায়। না যে বিরহের একটা জোব নিশ্বাস ফেলবে। পরীক্ষা দিল না এবার—দেদার ছুটি। ঘুরঘুর করে বেড়ায় নতুন-বউকে কেন্দ্র করে। এ বাড়ির চিরকালের নিয়ম মীনাক্ষীতে এসে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। দুঃখ কম! বাঘ বশ করবার অহঙ্কাব নিয়ে এসেছিল, সে বাঘ কোথায় পাবে যে খুজে?

বৈশাখ শেষ হয়ে জ্যৈষ্ঠমাস পড়ে গেল। চন্দ্রভানু আসেন না। লোকমুখে খবর এসেছে, অছেন ভালই—কাজের ঝঞ্ঝাটে দেরি হচ্ছে। না আসুন তিনি, কিন্তু সাগরচকের ভরাও যে এসে পৌঁছল না। এমন কাণ্ড আর কখনো ঘটে নি—চন্দ্রভানু কিম্বা রুদ্রভানু কারও আমলেই নয়। মাসাবধি যদি দেরি হয়—বেলেল্লাকারি ঘটবে। রায়বাড়ি উনুনে হাঁড়ি না চড়বার গতিক।

ততদূর নয় অবশ্য। জ্যৈষ্ঠের মধ্যেই এসে পড়লেন। দীঘির পাড়ে নৌকা বেঁধেছে। নকড়ি-গোমস্তা উদ্বেগে ছুটতে ছুটতে ঘাটে গিয়ে পড়ল। সকলের আগে যেটা মনে এসেছে:—বাঁধের কি খবর?

অনেক মাটি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। টাকা অনেক ডুবিয়েছে। আমি ছাড়ব না। মাটি নয়—বুঝলে, ইস্পাতের পাতে ছিরে আমি এবার বাঁধ ঠেকাব। লখিন্দরের লোহার বাসরের মতো।

কথাবার্তা কেমন যেন খাপছাড়া, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত। ভয় পেয়ে নকড়ি আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

চন্দ্রভানু অন্দরে গেলেন। ইন্দুমতী চক্ষুটা মেলে তাকিয়ে পড়লেন, গোঁ-গোঁ করে বললেন কি-একটা। নীহারনলিনী বুঝিয়ে দেয়। : খবর জিজ্ঞাসা করছেন।

হয়তো বা জানও গিয়েছে। চন্দ্রভানু চিৎকার করে শুনিয়ে দেন : বরাবর যেমন এসে থাকে—একটি দানার কমতি নেই। ভরা খালাস হচ্ছে, মিলিয়ে দেখে নিক। রায়বাড়ির পান থেকে চুন খসবে না—যতদিন আমি আছি।

মীনাক্ষী এসে প্রণাম করল। গাঢ়স্বরে চন্দ্রভানু আশীর্বাদ করলেন। বলেন, ফর্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে ভাঁড়ারে পাঠাও মা। তোমাব শাশুড়ি যা এতদিন করে এসেছে। এককালে আমার মা-ও করতেন।

কণ্ঠস্বব শুনে মীনাক্ষীর ভয় করে। চকিতে একবার শ্বশুরের মুখে তাকায়। ধ্রুবভানুর কাছে বলে, নৌকো-ভরা মালপত্র, সকলে কেবল সেইটেই দেখছে।

ধ্রুব বলে, তা ছাড়া আর কি করবে?

মানুষটির দিকে তাকিয়ে দেখে না একবাব।

কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, ও-মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকাবে?

কিন্তু তুমি তো ছেলে—

ছেলে হই যা-ই হই, হুকুম তামিল করবার যন্ত্র। রায়বাড়ির এই বিধি।

তবু ধ্রুব আজ বাপের কাছে গেল। মীনাক্ষী মিথ্যা দেখে নি। বিয়ের কাজ-কর্ম সেরে উৎসব-বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন, ব্যস্তসমস্ত মানুষ তিনি তখন। বোঝাই নৌকো নিয়ে সেই মানুষটার প্রেতাত্মা আজ ফিরে এসেছেন।

ধ্রুবভানু আকুল হয়ে বলে, কি হয়েছে বাবা?

কিছু না, কিছু না। খুবই খাটনি যাচ্ছে তো! দরিয়ার সঙ্গে লড়াই। সে লড়াই অবশ্য চিরকালের—

গলা হঠাৎ নিচু করলেন। ফিসফিস করে অতি-গোপন খবর দিচ্ছেন যেন : আমি বুড়ো হয়ে গেছি রে ধ্রুব। গাঙের নবযৌবন দিনকে-দিন। আব বুঝি পেরে উঠলাম না!

ছোটরায় হেন মানুষের মুখে এমনি কথা—বুড়ো হয়েছেন তাতে সন্দেহ কি! এমনি অন্তরঙ্গ কথাবার্তা ছেলেব সঙ্গে আর একটিবার হয়েছিল—সেই নিশিরাত্রে ধ্রুব যখন বিয়ের নামে গুম হয়ে বসে ছিল।

চন্দ্রভানু সত্যি সত্যি বুড়োমানুষ। তবু কিন্তু এবারে সাতদিনও নয়। মাল খালাস হলে সঙ্গে সঙ্গে অমনি রওনা।

এর পরে পুরোপুরি মাসও নয়। যাত্রাগান বারোয়ারিতলায়। ভাল পালা—সুভদ্রাহরণ। বেলডাঙার মেয়ে-পুরুষ কেউ বড বাড়ি ছিল না। কিন্তু হলে হবে কি—ঝপঝপ করে বৃষ্টি এলো হঠাৎ। দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। বাড়ি এসে তারপর খাওয়া-দাওয়া, সেরে সব ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাতঘুম এসে গেছে। এমনি সময় হরিধ্বনি : বল হরি, হরিবোল—

ঠাকুরদেবতাব নামে মানুষ তো গদগদ হয়ে উঠবে—এ নামে আপদ-মস্তক কাঁপে। চয়টুজ্জেবাড়ির কর্তামশাই বটকৃষ্ণ স্ত্রীকে বলেন, কানে শুনছ ভবীর মা? কে যেন চললেন। তাই না?

ভবীর মা উঠে পড়েছিলেন। হঠাৎ কাঁপুনি ধরে যায়। কাঁপা গলায় পুত্রবধূকে ডাকছেন : অ বউমা, লেপ-কাঁথা যা হোক একটা দাও দিকি নি। শীতে যে জমে গেলাম। নিগগির দাও।

বউয়ের শব্দসাড়া নেই। রাত-দুপুরে কে আবার এখন ঝঞ্ঝাট করে! শুনি নি শুনি নি— এই বেশ ভালো। অগত্যা ভবীব মা যে তোষকে শুয়েছিলেন—সেইটাই উঁচু করে তুলে তার ভিতবে ঢুকে পড়ে কুণ্ডলী হয়ে রইলেন।

বটকৃষ্ণও ওদিকে প্রশ্নেব পর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন : কে চললেন বলো দিকি? যাচ্ছেন মহাযাত্রায়—বেরুলেন কোন বাড়ি থেকে? এখন-তখন অবস্থা—গাঁয়েব কারো সম্বন্ধে তো শুনি নি। তুমি শুনেছ নাকি ভবীর মা? ভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের শ্মশানঘাটায় আসার শখ কার হল? এত ভাল লাগল কিসে?

ভবীব মা কোন-কিছুই শোনেন না। কান দুটো সমেত গোটা মাথা তোষকের নিচে ঢুকে গেছে। বয়সে বুড়ো হয়ে গেছেন, তাঁদেরও এমনি দিন আসছে—হরিবোলে সেই কথা মনে পড়ে যায়। দেহেব কাঁপুনি ঠিক শীতের কাবণে না হরিবোলে, বলা কঠিন। আর বটকৃষ্ণেব হয়েছে—কোন মানুষটার ডাক পড়ল, গাঁয়ের না বাইরের, সঠিক না জানা অবধি সোয়াস্তি নেই। বলছেন, যে-ই হোক, বেষাক্কেলে মানুষ বলব আমি তাকে। বৃষ্টি-বাদলাব এমন অভদ্রা রাত্রে নিজের একলা যাওয়া নয়—যাদেব কাঁধে চেপে চললেন, নিমোনিয়া হয়ে তাদেরও যে যেতে হবে দু-দশ দিনের ভিতব।

বাইবেব দাওয়ায় আওয়াজ পেয়ে বলেন, কে গা? অ্যাঁ—অনাদি উঠে পড়েছিস?

বড়ছেলে অনাদিই বটে। বলল, কান্না একটা মনে হচ্ছে বাবা বায়বাড়ির দিক থেকে। রায়বাড়ি কে যাবার মতন? পুরানো রোগি

ছোটগিন্নি যদি হন। কষ্ট বিস্তর ভোগ করেছেন, কিন্তু এখন তো কষ্ট-দুঃখের অতীত তিনি। অঙ্গগুলো পড়ে গেছে, বোধজ্ঞান নেই। সব হারিয়ে শূন্যে পড়ে আছেন, এখন তিনি কেন আর যেতে যাবেন।

ছেলের উপর বটকৃষ্ণ ধমক দিয়ে ওঠেন : তাগড়া জোয়ান বসে বসে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়বে কেন? লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, খবরটা নিয়ে এসো। সুখ-অসুখে দেখবে না তো পড়শি হয়েছ কেন?

অনাদি বলে, বৃষ্টিই ছাড়ে না। ঘরের বার হওয়া এখন চাট্টিখানি কথা।

বুড়ো ক্ষেপে যান : আমায় যদি এখন অন্তর্জলীতে নামাতে হত। কি করতে, কাঠুরে ডাকতে যেতে না পড়শির বাড়ি?

এমনি সময় ছাতা মাথায় তিনজন রাস্তা দিয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে আসে। আসছে বায়বাড়ির দিকে থেকেই। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বটকৃষ্ণ হাঁক দিলেন : কারা তোমরা, এদিকে এসো একবার।

বাইতি-পাড়ার গোঁসাইচরণ সতীশ আর মহেন্দ্র।

কোথায় গিয়েছিলে গোঁসাই? কান্নাকাটি কিসের, কি দেখে এলে বলো।

ছোটরায়ের নীলবোট চক থেকে ফিরল। আসল মানুষটা সন্ন্যাস রোগে গেছেন। লাস নিয়ে এসেছে।

সতীশ বলে, দীঘির পাড়ে বোট একটুখানি রেখে ছোটরায়ের ছেলেকে তুলে নিল। আর একটি মানুষ নয়, নকড়ি গোমস্তাও নয়। কত লোক যেতে চায়, তা চক থেকেই প্রজাপাটক ঠাসাঠাসি হয়ে এসেছে। বলে, জায়গা নেই, চেয়ে দেখ।

গোঁসাইচরণ বলে, লাস নামাল না। বলে, গিন্নি-মায়ের ঐ অবস্থা—কার জন্যে তবে নামানো? বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে নামানো-উঠানোয় হাঙ্গামা বিস্তর—নামবেন একেবারে শ্মশানঘাটায়, চিতায় উঠবার সময়টা। বোটের ছাতে বিছানা পেতে সাজিয়ে রেখেছে—ফুল, ফুল আর ফুল। ফুলের পাহাড় ঠেলে মড়ার একখানা আঙুল পর্যন্ত দেখবার জো নেই।

বটকৃষ্ণ গুম হয়ে শুনছিলেন। ফোঁস করে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন : ছোটরায়ের পাথরের দেহ সন্ন্যাসে আচমকা শেষ করে দিল, আমরা তবে তো নেই।

গোঁসাইচরণ বলে, না চাটুজ্জেমশায়, দেশসুদ্ধ চলে যাবে, আপনার ঐ চিটের মতো দেহ নিয়ে ঠিক টিকে থাকবেন। বসকষ নেই—দুধ মরে ক্ষীর, ক্ষীর মরে চাঁচি, সেই চাঁচি হয়ে আছেন আপনি। ও জিনিসের আর মার নেই।

নিতান্ত এক চ্যাংড়া ছোঁড়ার কথা, তা হলেও সোয়াস্তি একটু পেলেন বোধহয় বটকৃষ্ণ। ঘরের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ভবীর মা'র চিচিঁ গলা : ও বউমা, ওরে ও আবাগির বেটি, কথা বুঝি কানে-কপালে যায় না। বললাম না, কম্প লেগেছে। কাঁথা-লেপ যা হয় কিছু ফেলে দে।

গোঁসাইরা তিনজন শতকণ্ঠে তারিপ করছে : এই পুরু তোষক-বালিশ-পাশ-বালিশ। তার উপরে ফুল। অত ফুল জোটালো কেমন করে সেই আবাদ-জায়গায়? রাজার বিয়ের ফুলশয্যা যেন শখ করে বোটের উপরে হচ্ছে। তা ছোটরায় প্রজাপাটকদের কাছে রাজাই তো বটে! বোট ভরতি সেই প্রজারা। অত দূর থেকে বেয়ে বেয়ে নিয়ে এসেছে ঘিরে বসে আছে। তারাই সব—নকড়ি হেন মানুষটাকেও পাত্তা দিল না।

শুনে শুনে অনাদি চাটুজ্জে চঞ্চল হয়ে ওঠে : দেখতে হয় তবে তো! শ্মশানেই যাওয়া যাক।

অপর তিনজনের খুব বেশি আপত্তি নেই। দেখতেই তো গিয়েছিল রায়বাড়ি অবধি। বলে, ভিজে জবজবে আমরা। তা বেশ, তামাকের জোগাড় দেখুন, এক ছিলিম টেনে গা গরম করে বেরিয়ে পড়ি।

ঘরে ঢুকে অনাদি বৃষ্টিবাতাস আড়াল করে কলকের উপর নারকেল-খোসার নুড়ি ধরাচ্ছে। বউ এসে বলল, সর্দিতে ডবডব করছ, নাড়ি ধরেও বোধহয় জ্বর পাওয়া যাবে। যাবে এই অবস্থায়?

অনাদির সংক্ষিপ্ত জবাব : ছোটরায় কি নিত্যিদিন মরবেন? শ্মশানের মড়ব কি রোজ হবে?

দুর্যোগ সত্ত্বেও শ্মশানে বেশ একটি জনতা। হরিবোলের ফলেই এসে জমেছে। যাত্রাগান ভেঙে গেল তো ছোটরায়ের সৎকারে খানিকটা তার ক্ষতিপূরণ। কিন্তু হলে হবে কি—মাঝ নদী দিয়ে নীলবোট বেয়েই চলল। পাড়ের দিকে আসে না। সকলে তখন হাঁক পাড়ছে : শ্মশান এই যে, চিনতে পারছ না? বোট লাগাও—

বোট কানেই নেয় না। জনতা ক্রমশ মারমুখি হয়ে ওঠে : কী আশ্চর্য, মড়া নিয়ে চললে কোথা তোমরা? বলি, ছোটরায় আমাদের কেলডাঙার মানুষ নন? পুরোপুরি তোমাদের হলেন কেমন করে? আমরা সব দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

বত বেশি হৈ-হল্লা তো বৃন্দাবন হালের কাছে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। ছোটরায়ের জীবনকালে যেমন ছিল, মরণের পরেও সে সকলের বড় মাতব্বর চেঁচিয়ে বলে : ছোটরায় মা-গঙ্গায় দাহ হবেন, আজেবাজে শ্মশানে নামবেন না।

গঙ্গায় পৌঁছতে পচে গিয়ে গন্ধ-গন্ধ হবেন যে! হাত-পা খসে খসে আসবে। ভাঁটি-অঞ্চলে গঙ্গা পাচ্ছ কোথা।

বৃন্দাবনের জবাব : কুসির বটতলায়।

সেখানে গঙ্গা তো মরশুমের সময়টা। তাঁর এখনো এক মাস দেড় মাস দেরি।

বৃন্দাবন বলে, এক মাস দেড় মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। মুক্তি তদ্দিন মুলতুবি থাকুক।

লোকের আহ্বান গ্রাহ্য না করে নীলবোট ছ-খানা দাঁড় বেয়ে তীব্র স্রোতে দেখতে দেখতে বাঁকের আড়াল হয়ে গেল। উৎসাহী কেউ কেউ যেত চলে হয়তো সেই কুসির বটতলা অবধি। কিন্তু রাত্রিবেলা এই জলবাতাস—সকলের বড় মুশকিল, জায়গাটা নদীর ভিন্ন পারে। খেয়া পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে—যতই হাঁকডাক করো, মাঝি এই রাত্রে সাড়া দেবে না।

কুসির বটতলার শ্মশানে বোট গিয়ে ধরল। ঝুরি নেমে একটা জায়গা বড় দুর্গম, দিনমানেই অন্ধকার হয়ে থাকে—বেছে বেছে সেইখানটা পছন্দ করে প্রকাণ্ড চিতা সাজিয়েছে। মেলার সময়টা ছাড়াও বারোমেসে দোকানপাট কিছু কিছু আছে। সাড়া পেয়ে তাদের দু-চারজন এদিকে এসেছে। হরিধ্বনি দিতে আরও কতক এসে পড়ল।

মড়া চিতায় তোলা হবে, তার আগে নদীজলে স্নান করানো বিধি। বৃন্দাবন ধ্রুবভানুকে বলে, কলসি নিয়ে নাও খোকাবাবু। বাপের শেষ-চানের জল তোমাকেই তুলে আনতে হবে। পথ পিছল হয়ে আছে, পা হড়কে না যায়। পা টিপে টিপে সামাল হয়ে চলো। আলো ধরে আমি আগে আগে যাচ্ছি।

ঘাটে চলল দুজনে। ঘাট আর কি—খান কয়েক বাবলার গুঁড়ি ফেলা আছে এক জায়গায়। হঠাৎ বৃন্দাবন বলে, শোন একটা কথা। কাছে এসো, একেবারে কাছে। কানে কানে বলব।

ফিসফিস করে বলে, মড়ার উপরের কাপড় সরিও না। কাপড়ের উপরেই জল ঢেলে চান করাবে। কাপড়-চোপড় বিছানা-পত্তর ফুলটুল সুদ্ধ চিতায় তুলব। যাকে তাকে ধরতে দেওয়া হবে না—তুমি, আমি, আর বাছাই লোক আছে আমার পাঁচজন।

ধ্রুব বলে, বলো কি বৃন্দাবন-কাকা! শেষ-দেখা একটিবার দেখব না?

বৃন্দাবন বলে, দেখবার মানুষ আরও তো ছিল কতজন—তুমি একলা নও খোকাবাবু। গিন্নিঠাকরুনের ঐ রকম অবস্থা, তবু তাঁর ঘরে নিয়ে শেষ দেখা দেখিয়ে আনা যেত।

কথা যা বলছে সব সত্যি। এ কাজের মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। তা বলে ধ্রুব শুনবে না। জেদ ধরে বলে, অন্যের বেলা যেমন হয় হল—আমি ছেলে, একমাত্র ছেলে, দেখতেই হবে আমায়। মুখ না দেখে মুখাগ্নি হতে পারে না।

বৃন্দাবন গম্ভীর অকম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে, ছোটরায়ই নেই—কার মুখ দেখবে?

ধ্রুব স্তম্ভিত হয়ে বলে, বাবা নন? কাকে তবে বোটের উপর ফুলে ঢেকে নিয়ে এলে?

মানুষই নয়। গরানের ছিটের খড় জড়িয়ে ছোটরায় সাজিয়ে এনেছি। জানি কেবল আমি আর ওরা ঐ পাঁচজন। আমাদের বাইরে অন্য কেউ যেন টের না পায়, একফোঁটা সন্দেহ কারো মনে না আসে!

বাবা কোথায় তবে?

নেই তিনি, মারা গেছেন।

ঢোক গিলে বৃন্দাবন বলে, মেরে ফেলেছে। মেরে গাঙেক জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। লাস নিখোঁজ।

শুনে ধ্রুব সেই জলের ধারে কাদার উপর ধপ করে বসে পড়ল। সম্বিত আছে কি নেই।

ওদিক থেকে ডাকাডাকি করছে : কই গো, চানের জল আনতে এত দেরি কেন? হল কি?

বৃন্দাবন বলে, খোকাবাবু ভেঙে পড়েছেন। বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠান্ডা করছি। হোক না দেরি, তাড়া কিসের?

ধ্রুবকে বোঝাচ্ছে : এত বড় মানুষের এই পরিণাম। কুক ছেড়ে আমাদেরও কাঁদতে ইচ্ছে করে। চেপেচুপে তবু যাত্রার পালার মতো এই ভড়ং করতে হচ্ছে। লোকে বুঝতে

না পারে। বেশি ভয় থানাপুলিশ নিয়ে—তারা ঘুণাক্ষরে না টের পায়।

ধ্রুব মাথা তুলে বলে, খুন কবে ফেল্লেছে—পুলিশে তো আমাদেরই জানানোর কথা।

আরে সর্বনাশ, কিছুতেই নয়। বিড়বিড় করে বৃন্দাবন আদ্যোপান্ত বলে যায় : নোনা জল সাগরচকে শতমুখে ঢুকছে। যত কিছু ছিল, জলে ভাসিয়ে নিয়ে একেবারে নিঃসম্বল করেছে। মাটি না ফেলতে না ফেলতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যত যাচ্ছে, রোখ বাড়ে চন্দ্রভানুর। হারব না, হারব না। যে বাঁধ গেছে, ডবল করে মাটি চাপান দাও সেখানে তা-ও গেল তো চৌগুণ। মাটির বাঁধ বলা যায় না শেষটা—চাঁদির বাঁধ। টাকা টাকা করে পাগল হয়ে উঠলেন। বেপরোয়া। সেকালের সেই পুরানো পথ ধরতে হল আবার, রুদ্রভানু যা তোবা করেছিলেন। গাঙে-গাঙে নৌকোব উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। নইলে রায়বাড়ির ইজ্জত থাকে না। ধান চাল জিনিষপত্র ভরা বোঝাই হয়ে যা সেদিন ভাণ্ডারে উঠল, সাগরচক তার কিছুই দেয়নি। গাঙ-খালের উপর রোজগার।

বৃন্দাবন বলছে, ছোটরায় বড় জাঁকজমকে বেঁচেছিলেন, মবণে সেই জাঁক দেখিয়ে যাচ্ছে। শ্রাদ্ধশান্তিতেও তাই হবে। তার পরেও যেমন যেমন আছে, তেমনি সব চলবে। একচুল এদিক-ওদিক হবে না। তোমার কাঁধে দায় পড়ল খোকাবাবু, রুদ্রভানু অন্তে ছোটরায়ের উপর যেমন একদিন পড়েছিল। কেমন করে কি হবে, আজ থেকে তোমারই ভাবনা সেটা। কিন্তু রায়বাড়ির চিরকালের জৌলুষ নেভানো চলবে না। ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে দেশান্তরী হবে, তার আগে কিছুতে নয়।

চন্দ্রভানু গেলেন। সাগরচক আগেই নাকি গেছে—বৃন্দাবনের কাছে শোনা। রায়বাড়িরও টলমল অবস্থা—তাসের ঘরের মতো কোন দিন বা ভেঙে পড়ে। কি করবে কারো ধ্রুবভানু, তোমাব কাঁধের দায় এবারে। এক-দিন রুদ্রভানুর কাঁধ থেকে চন্দ্রভানুর উপর যেমন দায় পড়েছিল।

পুরো বছর যেতে না যেতে অট্টালিকা হঠাৎ যেন শ্রীছাঁদ হারিয়ে বুড়ো হয়ে পড়ল। সদব-উঠানে হাঁটুভর ভাঁটুইবন, আগাছার জঙ্গল। কাছারিঘবে নকড়ি-গোমস্তা কাজ করছে, ছাতের এক চাংড়া চুনবালি খসে হুড়মুড় করে খাতাপত্তরের উপব পড়ল। এক জায়গায় এই একটা ঘরেই নয়, সারা ঘববাড়ি জুড়ে এমনি কান্ড। নকড়ি বিষম কঞ্জুষ হয়ে পড়েছে, তাকিয়ে দেখবে না এসব দিকে।

নকড়ি বলে, জনমজুব দিয়ে জঙ্গল সাফ করা যায়, রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে চুনকামও হতে পাবে। আগে ববাবব হয়ে এসেছে, এখন কেন হচ্ছে না—বোঝ সেটা খোকাবাবু। চকের ঐ অবস্থা—এক একটা পয়সা বাপেব হাড় এখন। কুর্তামশায়রা তার উপবে ভূতপেত্নীর আড্ডা বসিয়ে গেছেন। পান থেকে চুন খসলে ওরা রক্ষে রাখবে না। ওদের ঝঞ্ঝাট ঝুলিয়ে তবে তো অন্যসব!

আঙুল দিয়ে পাশের বৈঠকখানা নির্দেশ করল। আড্ডা জমজমাট সেখানে। পাশা পড়েছে।

বিষম হুল্লোড়। কচ্চে-বারো ছ-তিন-নয় আ-ঠ-রো—এই কান্ড চলেছে বেলা দুপুর থেকে। নকড়ি একটা জরুরি হিসাব নিয়ে পড়েছে, সাধ্য কি মন বসায়। সেজন্য আরও বিরক্ত। বেলা গড়িয়ে কখন যে লুচি-হালুয়া এসে যাবে। মুখ বন্ধ হবে খেলুড়ে-মশায়দের। আন্ধারও ইস্তফা।

হুঙ্কার উঠল সহসা : তামাক দেবার একটা লোক থাকে না গোমস্তামশায়, আপনাদের হয়েছে কি বলুন তো?

একটা কিছু বলতে হয—নকড়ি বলে, তাই নাকি? দেখছি।

দেখবেন আর কাকে? সুখময়টাকে বিদায় দিয়েছেন। আছে এক ক্ষীরি-ঝি। সারা দিনে সে মাগীর তো টিকি দেখবার জো নেই।

নকড়ি বলে, ক্ষীরোদার কী দোষ! ভিতরের কত ফাইফরমস—তাঁরা যে সাক্ষাৎ মা-চামুন্ডা। এক লহমা মেয়েটার পায়ের জিরান নেই।

পুরুষ এদের আত্মাভিমানে লাগে : ভিতরের তোয়াজ হলেই বুঝি হয়ে গেল? আমরা কেউ নই? হুকো দুপুর থেকে তিনবার কি চারবার মাত্তোর ঘুরেছে।

নকড়ি বলে, অনেক বেশি। কোটো ভরতি তামাক সিকিতে এসে ঠেকেছে।

কি বললেন? মুখ তবে পচে উঠল কেমন করে? ও সব জানিনে এত হেনস্থা চলবে না। মাহিন্দার না দিতে পারেন, নিজে আপনি তামাক সাজবেন। গুণে গুণে দেবেন, ছিলিমের পাকা হিসাব থাকবে।

এক কথা দু-কথায় লেগে যায় বুঝি ধুন্দুমার! ধ্রুব কোন দিকে যাচ্ছিল, ছুটে এসে পড়ে : গোমস্তামশায়কে কেন। আমি রয়েছি, আমার উপর হুকুম করবেন। দিন কলকে—

কলকে তুলে নিয়ে ধ্রুব তামাক সাজতে যায়। তড়াক করে উঠে নকড়ি ছুটে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে ছুঁড়ে দিল মাটিতে। কলকে খানখান হয়ে যায়।

হাসিতে ভুলিয়ে ধ্রুব নকড়ির ক্রোধ শান্তির চেষ্টা করে : করলাম না হয় একটু সেবাযত্ন। হাত কি আমার ক্ষয়ে যাচ্ছিল?

নকড়ি অবরুদ্ধ স্বরে বলে, চাকরবাকর নেই—তাই বলে ছোটরায়ের ছেলে তামাক সেজে সেজে ভূতপ্রেতের মুখে এগিয়ে ধরবেন, সেই জিনিষ বসে বসে আমি দেখব!

ধ্রুবভানু মরমে মরে গিয়ে বলে, ছিঃ ছিঃ, এসব কী বলছেন। কর্তারা আদরযত্নে এনে রেখে গেছেন। চকের মানুষরা দরখাস্তে সেই যে অশ্বত্থগাছের উপমা দিয়ে ছিল, ঠিক তাই।

রাগে গরগর করতে করতে নকড়ি বলে, অশ্বত্থের ডালে ভূত-পেত্নীর আস্তানা। গাছ শুকিয়ে আজ কাঠ হতে চলেছে। অপদেবতা-গুলোর নড়ন-চড়ন নেই। করে একদিন মেজাজ হারিয়ে ঝাঁটা ধরব—ঝেঁটিয়ে সাফ-সাফাই করব। সে ঝাঁটা আমকেও তোমরা মারবে, সেটা জানি। কিন্তু নানান অশান্তির মধ্যে এসব নিয়ে মাথার ঠিক থাকে না।

ধ্রুবভানু টেনে নিয়ে এসেছে নকড়িকে বাছাধিঘরে, ফরাসের উপর তার নিজ জায়গায় এনে বসিয়েছে। শান্ত করছে : লড়াইয়ে সৈন্যসামন্তের প্রাণ যায় কিম্বা অঙ্গহানি হয়, তাদের ছেলেপুলের জন্য সরকার বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। এ-ও তাই। আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন গোমস্তা-মশায়। রাষেরা সৎ আর সম্ভ্রান্ত হয়েছে, তারই খেসারত। প্রতিকারের উপায় আপনার আমার হাতে নেই—বায়বাড়ির ইজ্জত এব সঙ্গে জড়ানো, আর পুরানো কর্তাদের প্রতিশ্রুতি। যতদিন বায়বাড়ি আছে, এরাও থাকবে। না পোষায় আমরাই মরব।

সেই রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে মীনাক্ষী দেখে ধ্রুব নেই তার পাশে। আনমনা দেখা যায় ইদানীং—মীনাক্ষীর সাতটা কথার পরে হয়তে একটা জবাব দিল। অভিমানে বধূর চোখ ফেটে জল আসে—কিন্তু তা-ও ধ্রুবর নজরে পড়ে না। গেল কোথা নিশিরাত্রে? ছাঁৎ করে ওঠে মন, কিরণবালার ভয় দেখানো কথাগুলো মনে ভাসে। রাত্রে ঘরে থাকা একটা এ বংশের পুরুষের রীতি ছিল না। পুরানো রক্ত টগবগিয়ে ওঠে নাকি ধমনীতে?

এমনিই ভাবছিল। হঠাৎ দেখে ছায়ামূর্তি ঘরে ঢুকছে।

আঁতকে ওঠে : কে? প্রায় আর্তনাদ। কে তুমি?

ধ্রুব বলে, ডাকাত। ডাকাতি করতে এসেছি।

খিলখিল করে হেসে ভয় ভাঙিয়ে দেয়। এ হাসি অনেক দিনের পরে। বলে, কী যে ভীতু! কেলেঙ্কারি ঘটাচ্ছিলে একটুনি চেঁচামেচি করে।

লজ্জারক্ত মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি বলে, তাই বুঝি! আমি ভেবেছিলাম—

কী ভাবছিল, তা বলার ফুরসত হল না। বলতে দিল না বরে, মুখে কুলুপ পড়ে গেছে তখন। রাগ-দুঃখ যত-কিছু জমেছিল, সুদে-আসলে শোধ।

ক্ষণপরে ধ্রুব বলে, যা বললাম সত্যি সত্যি তাই হত যদি। আমি না হয়ে ডাকাতই যদি হত—

এখন মীনাক্ষী নির্ভয় নিশ্চিন্ত। বীরাঙ্গনার ভঙ্গীতে বলে, হল তো বয়ে গেল। তুমি কাছে থাকলে ডাকাতে আমার কী ভয়? তোমার বুকে মুখ ঢেকে পড়তাম। তুমি বাঁচাতে আমায়। বাঁচা না-ই হল তো মরে গেলাম। তোমার বুকে মরা হল।

লালমোহন মিত্তির এলেন মেয়েজামাই দেখতে। খবরবাদ না দিয়ে হঠাৎ চলে এসেছেন। চন্দ্রভানুর শ্রাদ্ধের সময় নিতান্ত বাইরের মানুষের মতো ক'টা দিন থেকে গিয়েছিলেন—তার পরে এই।

নকড়ি ছুটতে ছুটতে ঘাট অবধি গিয়ে আহ্বান করে : আসতে আজ্ঞা হোক, উঠে আসুন। এদ্দিনে তবু সময় হল। মাথার উপরে আপনিই এখন একমাত্র—আর কে আছে বলুন। গিন্নিঠাকরুন জ্যান্ত থেকেও তো মরা।

আসিনে কেন জানেন গোমস্তামশায়? ভয়ে। চকদার মানুষের চাল-চলতি আলাদা।

বাড়িতে দীয়তাং ভুজ্যতাং। চিংড়ির কারবারি আমি—তা-ও আবার কুচোচিংড়ি। বুক ঢিবঢিব করে জোড়া-মন্দিরের ভিতর দিয়ে ঢুকতে।

চন্দ্রভানুর কথাগুলোর শোধ নিচ্ছেন এত দিন পরে। মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন।

বলেন, চক থেকে ধানচাল টাকাকড়ি আসে জোয়ারজলের মতো, খরচা হবে যায় ভাঁটার টানে। ভক্তদাস বলল, চলুন, দেখেই আসা যাক কী বস্তু সেই সাগরচক। সেইখান থেকে ফিরছি। চোখে দেখে এসে তবেই সাহস হল, রায়বাড়ি ঢুকতে। সামান্য মানুষ আমি, কুচোচিংড়ি বেচে খাই—কিন্তু লুকোছাপা নেই, যে কেউ গিয়ে আমার খটি দেখতে পায়। আমার কাজে ইজ্জত না-ই থাক, ভাঁওতাবাজিও নেই। রায়বাড়ির সাগরচক কিন্তু চোখেব নজবে আসে না। বুড়োলোক দু-এক জনে বলে, ছিল এককালে সত্যি। কিন্তু ভরা সাজিযে এই সেদিন পর্যন্ত এসেছে—সাগরচকের তো নয়, কোন চকের আমদানি—বেহাইমশায় বেঁচে থাকলে আজ জিজ্ঞাসা করে দেখতাম।

কথা বলতে বলতে লালমোহন দীঘির পাড় দিয়ে আসছেন। ম্যানেজার ভক্তদাস যথারীতি সঙ্গে। চন্দ্রভানুব মৃত্যু ও সাগর-চক নিয়ে নানা উল্টোপাল্টা কথা কানে আসতে লেগেছে। লালমোহনেব মনে হল, অনভিজ্ঞ জামাইকে অপদস্থ করা ও সম্পত্তি ফাঁকি দেওযার জন্য শরিকী চক্রান্ত। সকেজমিনে খোঁজ নিতে দুজনে বেরিযে পড়েছেন।

ধান কাটার মরশুম। ক্ষেতখামারের কাজে মানুষ দলে দলে নৌকো নিয়ে নাবালে নামছে। ক্ষেতভরা ফসল, মনভরা স্ফূর্তি। হাসিহল্লায় নদী তোলপাড়।

ভক্তদাস চেঁচিযে পথ জিজ্ঞাসা করে ঃ সাগবচক কোন দিকে, নিশানা দাও ভাই। সেইখানে যাবো।

সকলে মুখ তাকাতাকি করে। এ বলে, জানো কোথায়? ও বলে, গিয়েছ সেখানে? এত জায়গায় ঘোরাঘুরি—সাগরচক কই মনে তো পড়ে না।

পুরো দুটো দিন এদিকে সেদিকে ঘোরাঘুবি। শেষটা খোঁজ পাওয়া যায়। এক বুড়া মাঝি গদগদ হয়ে উঠল ঃ আহা, বড় ভাল জায়গা গো! মিঠাজলের পুকুর—টিউকলের তখন চলন হযনি, খাবার জলের অভাব পড়লে কতদিন এসে চকের পুকুর থেকে নৌকো ভরে জল নিযে গিয়েছি। দোতলা কাছারি, ইস্কুল, ডাক্তারখানা—

রাত হয়ে গেছে তখন. অন্ধকার। ভক্তদাস নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ল ঃ কোন্ দিকে সেই চক, ভাল করে হদিস দিয়ে যাও মুরুব্বি। ঘুবে ঘুবে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি।

এই তো—

লালমোহন ছ'ইয়ের তলে ছিলেন, লহমাব মধ্যে বাইবে চলে এলেন। মাঝি বলছে, রান্নাঘরে ঢুকে বলেন বাড়ি আর কদ্দুর—আপনাদের হল সেই বৃত্তান্ত। পানসি তো চকের বাঁধে কত্তা।

সীমাহীন জল—জল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তবু নাকি সাগরচকে এসে পড়েছেন। সীমানার বাঁধের উপর। ঠাহর করে দেখে দেখে ভক্তদাসও ক্ষণপরে বলে, তাই বটে আজ্ঞে। মুরুব্বি মিথ্যে বলে যায়নি। বাঁধের মতোই লাগে।

ভরা জোয়ারে চারিদিক ডুবে আছে, স্রোত অন্ধকারে ডাক ছেড়ে ছুটেছে। লালমোহনও দেখতে পাচ্ছেন কালো রঙের বিসর্পিল রেখা একটা—মাইল মাইল পরিব্যাপ্ত অতিকায় অজগরসাপ ভাসছে যেন জলের উপর। সাগরচকের বাঁধ। বাঁধের অন্তরালে পাকা ধানে ভরা দিগ্‌ব্যাপ্ত প্রান্তর। দোতলা পাকাকাছারি বড়নদীর উপর। টিলায় টিলায় গ্রাম। রাত পোহায়ে দিনমান হলে ধান কাটতে মানুষ দলে দলে ক্ষেতে নামছে। ক্ষণে ক্ষণে সখীসোনার গান—যেমন ঐ কিষাণদের ডিঙিতে পথের মধ্যে শুনে এলাম। ধান কেটে খোলাটে তুলছে। ডলে-মলে ভরা বোঝাই হয়ে গাঙ-খাল বেয়ে বেয়ে চলে যাবে বেলডাঙার রায়বাড়ি। —একমাত্র মেয়ে মীনাক্ষীর সংসাবে। যে সংসারে ধুমধাম লেগেই আছে—চিংড়ির খটিওয়ালা নতুন বড়লোক লালমোহন সে বস্তু ধারণায় আনতে পারেন না। মীনাক্ষীদের সাগরচকে এসে পড়লেন অবশেষে!

নোঙর ফেলতে গিয়ে মাটিও পাওয়া গেল সহজে—অগভীর জায়গা। রাতটুকু সেখানে কাটল। শেষরাত্রে ভাঁটা, একফালি চাঁদও দেখা দিয়েছে আকাশে। তখন কিছু আন্দাজ পাওয়া যায়। ভোরের আলোয় সুস্পষ্ট দেখা গেল—

ধানক্ষেত কোথা—জলের সমুদ্র। টিলার উপবে দু-চারটে ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি, এককালে বসতি ছিল বোঝা যায় বটে। চন্দ্রভানুর বড় বাহারের কাছাবিবাড়িও বেশি দূরে নয়।

পানসি ঘুরিয়ে কাছারির ঘাটে গিয়ে ধরল। উঠানে একহাঁটু জঙ্গল—সাপখোপ কত লুকিয়ে আছে ঠিক কি। সীমানার পাঁচিল ভেঙেচুরে স্তূপাকার। নোনা-ধরা পলস্তারা খসে কামরার দেয়ালগুলো দাঁত বের-করা কঙ্কালের মতো ভয় দেখাচ্ছে।

লালমোহন হাহাকার করে ওঠেন ঃ সাগর-চকের জাঁক কানে শুনেই মজলাম। মেয়ে দেবার আগে একবার স্বচক্ষে দেখে গেলাম না!

এখন আবার রায়বাড়ির বৈঠকখানায় ঢুকতে গিয়ে সাগরচকের কাছারির সেই চেহারাটা মনে আসে। এই উঠানও ঠিক তাই। মনঃক্ষোভ চেপে রাখতে পাবেন না। স্থান-কাল ভুলে ভক্তদাসকে বলে ওঠেন, কী করেছি আমরা ম্যানেজার! হায় রে হায়, অট্টালিকাই দেখলাম, ভিতরে চামচিকের বাসা দেখলাম না কেউ তাকিয়ে!

ধ্রুবভানু কোন দিকে ছিল, হন্তদন্ত হয়ে এসে প্রণাম করল।

লালমোহন জামাই সম্ভাষণ করলেন ঃ তোমাদের চক দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না বাবাজি। তোমাদেব সাগরচক দেখতে হলে ডুবুরি হতে হয়। বেহাইমশায় নেই যে, কাকেই বা বলি আজ এইসব।

একটু থেমে আবার বলেন, মুখে বললেই তো শোধ যাবে না, উপায় কি হতে পারে তাই ভাবছি। কলকাতার পড়াশুনো শেষ করে তুমি কোন কাজকর্মে ঢুকে পড়ো। আমি পিছনে আছি, তোমাদের যা হোক এক রকম সস্কুলান হবে। কিন্তু রায়বাড়ির নিত্যিদিনের এই ধুমধাড়াক্কা আর ঐ যে নিষ্কর্মার দল পোষা হচ্ছে—

প্রসঙ্গ উঠতেই ধ্রুবভানু ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলে, ভিতবে চলুন বাই—

অর্থাৎ এ সমস্ত আলোচনা কাবো সামনে হতে দেবে না। উচিত বটে। বাগেব বশে লালমোহনই বরঞ্চ হুঁশ হারিয়েছিলেন। সামলে নিলেন।

অন্দরে যেতে যেতে জামাইকে একেবারে একলা পেযে ফলাও করে আরম্ভ করলেন ঃ এক এক মানুষের এক ব্যাপারে মজা। তোমার বাপ-দাদারা পিঁজরাপোল বানিয়ে গেছেন। অকেজো অক্ষম গরু-মহিষ নিয়ে পিঁজরাপোল করে, তোমাদের এটা হল মানুষের পিঁজরাপোল। ভূমিলক্ষ্মী অফুরন্ত দিতেন, তখন এসব পোষাত। পথ দেখিয়ে দাও ওদের সোজাসুজি—দালানে ছুঁচো-চামচিকে বরঞ্চ বসবাস করুক। সে ভালো, এক পয়সাও তাতে খরচা নেই।

কথার মাঝখানে আচমকা ধ্রুবভানু অন্দরের একটা ঘরে আঙুল দেখিয়ে দেয় ঃ আপনাব মেয়ে ঐখানে, চলে যান। বলে মুহূর্তের জন্য আর দাঁড়ায় না। হনহন করে উল্টো দিকে চলল। লালমোহন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন। অশিষ্টতা, অপমান। বাপও একদিন এই বাড়িতে অপমান করেছিলেন। তখন অনেক ছিল, লালমোহনও প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হাঘরের বেটা হাঘরে আজকে এত স্পর্ধা পায কোথায?

মেয়েব কাছে গিয়ে বোমার মতো ফেটে পড়েন ঃ না-হক অপমান করল আমায়। বাপ যেমন ছিল, ছেলেটাও অবিকল তাই। রক্তের দোষ।

মীনাক্ষী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনল। বলে, ওরা কি কবব না করবে, কুটুম্বমানুষ তুমি তাব মধ্যে কথা বলতে যাও কেন?

কথার মধ্যে থাকব না—বলিস কি তুই? বুকেব জ্বালা—তাই বলতে হয়। বিষয়-সম্পত্তির দফা নিকেশ। পানসি ভরে বরসজ্জা পাঠিযেছি, মাথা থেকে পা অবধি তোকে গয়নায় সাজিয়ে দিয়েছি—কিছু কি তার থাকবে? বেচে খাবে একটা দুটো করে। সমস্ত হয়ে গেলে ফুটো ইজ্জত তারপরে ঠেকাবে কি করে? ভিক্ষের ঝুলি তখন যে কাঁধে।

সন্ত্রস্ত হয়ে মীনাক্ষী বলে, চুপ করো বাবা। পায়ে পড়ি তোমার। যা বললে কক্ষনো আর উচ্চারণ কেরো না। দেয়ালেবও কান আছে।

থাকলে তো বযে গেল। কানে পড়ে কি করবে? সাগরচক সাগর হয়ে রযেছে। ভিখারি তো এখনই, এত ডাঁট কিসেব শুনি? তুই চলে আয আমার সঙ্গে। সোনাছড়ি ভাইদের সঙ্গে না থাকিস, তোর জন্যে আমি আলাদা পাকা ব্যবস্থা করব।

শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে মীনাক্ষী বলে, এদের

সর্বনাশ দেখে এসে তোমার মন ভাল নেই বাবা। তুমি চলে যাও। মন খারাপ সকলেরই। ভয় করছে, আমারও মুখ দিয়ে বেয়াড়া কথা বেরিয়ে না পড়ে।

ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে মীনাক্ষী দেখে, ধ্রুব নেই—সেই আর এক রাত্রের মতো বেরিয়ে পড়েছে। কুলদিগাড়ে সারা রাত রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলে—আবছা অন্ধকার, কেমন একটা রহস্যময় থমথমে ভাব চারিদিকে। ছোটখাট এক মাঠের মতন বিস্তৃত কক্ষ, অত্যুচ্চ ছাত, তারই সঙ্গে নিতান্ত বেমানান ছোট ছোট ঘুলঘুলি আর আঁটো মাপের দরজা—এই রাত্রে মনে হয় রাক্ষসের বিশাল জঠর। তার ভিতরে এসে পড়ে মীনাক্ষী তিলে তিলে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কী করবে সে, কেমন করে বাঁচবে? ডাক ছেড়ে কেঁদে ফেলে বুঝি নিশুতি রায়বাড়ি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে।

কিরণবালা যখন তখন বলে, পুরুষমানুষ বিশ্বাস করতে নেই ভাই নতুন-বউ—এ রায়-বাড়ির পুরুষ কিছুতে নয়। মুখ দেখে মুখের হাসি আর কথাবার্তা শুনে সেকালের কোন বউ ধরতে পারেনি সেই পুরুষই ডাঙায় জলে সারারাত্তির উৎপাত করে বেড়িয়েছে। বংশের রীতিনিয়ম একালে এসে বাতিল কি একেবারে—কে জানে! ধ্রুবর বুকে মাথা রেখে মীনাক্ষী পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোয়, একঘুমে রাত কাবার। সকালবেলা মীনাক্ষী উঠে পড়বার পরেও অনেকক্ষণ ধরে ধ্রুব ঘুমোয়, তখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে দেবতার মতো প্রসন্ন হাসি ঘুমন্ত মানুষের মুখে। কিন্তু কে জানে, বিশ্বাস নেই এদের—রাত্রে কোন এক মুহূর্তে হয়তো পিতৃ-পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত দেহের মধ্যে টগ-বগিয়ে উঠেছিল, বেরিয়েছিল টিপিটিপি। শেষ রাত্রে ফিরে এসে আবার দেবতা হয়ে ঘুমোয়। মীনাক্ষী টের পায় না। পুরুষের কত রকমের মহিমা—কে তার হদিস দিতে পারে?

খুটখুট খুটখুট একটা ক্ষীণ আওয়াজ যেন বাইরে। অতি ক্ষীণ—কান পেতে থাকলে তবেই একটু একটু শোনা যায়। সুসম্বদ্ধ তাল রয়েছে—নিশ্বাসেপ্রশ্বাসে যেন ঘুমন্ত অট্টালিকার বুকের উঠানামা। আওয়াজ বুঝতে পারছে, কক্ষের বাইরে অলিন্দের উপর। খুটখুট খুটখুট। একেবারে দরজা অবধি আসছে এখন, এসে আবার ফিরে যায়।

দরজা ভেজানো, কী সর্বনাশ! খিল দেওয়া নেই। এই দরজা খুলে ধ্রুব বেরিয়ে গেছে। খাট থেকে মীনাক্ষী নেমে পড়েছে। খিল এঁটে দেওয়া যাক। আওয়াজটা খুট-খুট করে এই সময় একেবারে চৌকাঠের কাছাকাছি এসে পড়েছে। খিল না দিয়ে মীনাক্ষী দড়াম করে খুলে ফেলল দুদিকের দুই কবাট।

ধ্রুব। সুদীর্ঘ অলিন্দের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পায়চারি করছে। থামের পাশ দিয়ে চন্দ্রালোক তেরছা হয়ে পড়েছে—সেই আলো এক একবার মুখের উপর ঝিক-মিকিয়ে ওঠে। চলছে যেন ঘড়ির পেণ্ডুলাম, দেহের মধ্যে প্রাণ বলে বস্তু নেই। দরজা খুলে মীনাক্ষী বাইরে চলে এসেছে, তবু ধ্রুবর নজরে আসে না, চোখ মেলে থেকেও যেন সে কিছু দেখছে না। শয্যার উপরের পাশা-পাশি সেই মানুষটি নয়—প্রেতলোক থেকে সদ্য নেমে এসেছে আলাদা এক ধ্রুব। গা কাঁপে, বুক শুকিয়ে আসে। ব্যাকুল হয়ে ছুটে গিয়ে মীনাক্ষী তার হাত জড়িয়ে ধরল।

আচ্ছন্ন দৃষ্টি তুলে যেন ভিন্ন এক জগৎ থেকে ধ্রুব প্রশ্ন করে, কি মীনা?

মীনাক্ষী কেঁদে বলে, ওগো, আমার ভয় করছে। যা ছিলে তুমি তেমনি হও।

নিঃশব্দে বধূর সঙ্গে সে ঘরে ঢুকল। খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে বেদনাচ্ছন্ন গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মীনাক্ষীর দিকে। গা শিরশির করে মীনাক্ষীর। বলে, কি হয়েছে, খুলে বলো আমায়। বলো।

ধ্রুব সহসা বলে উঠল, তোমার গয়না-গুলো আমায় দাও।

হায়রে হায়, রূপসী যুবতী বউ চোখে দেখতে পেল না, দেখছিল এতক্ষণ গা ভরে যে সব ছাইভস্ম গয়না পরে আছে। গয়না হঠাৎ এক এক চাঙড়া আগুন হয়ে ওঠে, গা যেন পুড়েজ্বলে যাচ্ছে, ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলে বেঁচে যায়।

ধ্রুব আবার বলে, দিয়ে দাও ওগুলো। আমার বড় দরকার।

কাতর অনুনয়ের কণ্ঠ। সম্ভবত জলে-ভোবা সাগরচক নিয়েই ব্যাপার। নতুন বাঁধ বাঁধতে সোক লাগাবে। কিংবা পুরানো কোন ঋণ মাথার উপর চেপে আছে, গয়না দিয়ে দায়মুক্ত হবে। সেই উদ্বেগে ঘুম নেই চোখে। নিশি-পাওয়ার মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেন, কি বৃত্তান্ত—এতসব জিজ্ঞাসার সাহস নেই, ইচ্ছাও করছে না। চোখ ছল-ছলিয়ে এলো মীনাক্ষীর। ছাই গয়না! গয়না চলে গিয়ে রাতভোর তোমায় যেন পাশটিতে পাই। একটি কথাও না বলে মীনাক্ষী একে একে গায়ের গয়না খুলে দিল। মকরমুখ দু'হাতের দুটি কঙ্কণ—মকরের দুজোড়া চোখে লাল-টুকটুকে পাথর বসানো। কঙ্কণ-পরা হাত-দুটি নেড়ে মীনাক্ষী বলে, আমার ঠাকুরমা'র দেওয়া সৌভাগ্যকঙ্কণ। সৌভাগ্য শুধু রেখে গিছি, এ কাউকে দেওয়া যায় না।

ধ্রুবভানু বলে, আমায় দাও মীনা, আমি

"কি হয়েছে খুলে বলো আমায়।"

চাইছি। আরও দাও—যেখানে যা-কিছু আছে। তোমার বাক্সপেঁটরায় যত কিছু আছে, সমস্ত গয়না আমার চাই।

বাক্স খুলে আরও যত ছিল মীনাক্ষী বের করে খাটের উপর রাখে। মধুর হেসে বলে, আর আমায় নেই—

কমসম নয়, স্তূপাকার। শীতের তত্ত্বের শালখানা খুলে ধ্রুব সমস্ত একত্র করে বাঁধল। পুঁটলিটা উঁচু করে তোলে একবার।

মীনাক্ষী বলে, আমি দেখি—

দেখাদেখি সে-ও তুলতে গেল। সহজ নয়। সোনার বড় বিষম ওজন। তুলতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

ধ্রুব বলে, উঃ, কত দিয়েছেন! বাবা টাকাই চেয়েছিলেন, কিন্তু বাড়তি সোনা কেন যে দিতে গেলেন আমার মতন পাত্রকে!

চুপ! মীনাক্ষীর আদরের তাড়ায় ধ্রুবর কথা শেষ হয় না। হেসে বলে, মেকি মেয়েটা গছালেন যে! শ্বশুরঠাকুর না-ই চাইলেন, নিজেদের আক্কেল-বিবেচনা থাকবে না ঃ গয়নায় একটু ঝিকিমিকি হয়ে তবেই তোমার পাশে দাঁড়াতে পারলাম।

ধ্রুবও হাসছে। বলে, তা নয়। কেন দিয়েছেন জানো—নির্গুণ জামাই দুঃসময়ে বেচে খেতে পারবে সেইজন্য। শ্বশুর-মশায়ের দূরদৃষ্টি আছে।

মীনাক্ষী শিউরে উঠল। বাপের কাছে যা বলেছিল সত্যি সত্যি তাই। রায়বাড়ির দেয়াল শুনতে পায়। শুনে রেখেছিল তাদের বাপে-মেয়ের কথা, নতুন-মানিবের কাছে যথা-কালে পৌঁছে দিয়েছে।

ভাল করে তখনো সকাল হয়নি। হঠাৎ বৃন্দাবনকে দেখা গেল।

কি খবর?

ভাল খবর খোকাবাবু। গাঙ যা চেয়েছিল, তাই হয়েছে—দুই গাঙে মিলে-মিশে চকের ভিতর দিয়ে সোজা পথ করে নিয়েছে। পাশে পাশে মাটি ফেললে আর এখন গোলমাল করবে না, মুরুব্বিরা বলছে। চক ছোট হয়ে গেল, কিন্তু বেঁধে ফেলতে পারলে ফলন আগেকার চেয়ে বেশি বই কম হবে না।

যে জন্য বৃন্দাবন এতদূর চলে এসেছে—মবলগ টাকার দরকার। তাড়াতাড়ি চাই—বৃন্দাবনদের অনিশ্চিত পন্থার উপরে নির্ভর করা যাচ্ছে না। কাছে না থাকলে ধারকর্জ করে ব্যবস্থা করে দাও খোকাবাবু। পরিশোধ একটা দুটো বছরের মধ্যে সুনিশ্চিত।

ধ্রুবর কণ্ঠস্বর হাহাকারের মতো। বলে, কিছুই নেই তোমাদের খোকাবাবুর। একেবারে কিছু নেই। ঐরাবত পড়ে পড়ে তাই ব্যাঙের লাথি খায়। যেতেও চাইনে মরীচিকার পিছনে। যার জন্যে বাবার ঐ শেষ পরিণাম।

ছেলেমানুষ বড় বেশি রকম ভেঙে পড়েছে। বৃন্দাবন ধমক দেয় ঃ ছোটবায়ের ছেলে না তুমি?

রায়বাড়ির কুলাঙ্গার। সুখ আর শান্তির সামান্য জীবন চাই আমি। কলকাতার জানা-শোনা সকলের কাছে চিঠিপত্র লিখছি। কোন একটা ব্যবস্থা হলে দেশান্তরী হবো। সাগরচক রায়বাড়ি এ সমস্ত তোমাদের। আমি এখানে বেমানান।

বিরস মুখে বৃন্দাবন চলে যাচ্ছে। ধ্রুব বলে একটু দাঁড়াও। আমি যাবো তোমার ডিঙিতে। পথে নামিয়ে দিও।

মীনাক্ষীর গয়না কাপড়েচোপড়ে জড়িয়ে কাপড়ের পোঁটলা হয়েছে একটা। কাপড় ছাড়া যেন অন্য কিছু নয়। পোঁটলা হাতে ধ্রুব বৃন্দাবনের ডিঙিতে উঠল।

সেই দিন সেই রাত্রি দেখা নেই, পরের দিন সন্ধ্যার কাছাকাছি ধ্রুব বাড়ি ফিরল। ক্লান্তিতে আধখানা, কিন্তু তৃপ্তি আর আনন্দে যেন নেচে নেচে ফিরল। কেন এক বড় দায় কাটিয়ে এসেছে, সেটা আর জিজ্ঞাসা করে নিতে হয় না।

মীনাক্ষীরও বড় আনন্দ। গয়না গেছে, সেই রাত্রির পর থেকেই কেমন এক আতঙ্ক—শতেক বার ঘুম ভেঙে যায়। দেখে, বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে ধ্রুবভানু, দুটি হাতে বেষ্টন করে আছে তাকে। ধ্রুবর ঘুম আর এতটুকু বিচলিত নয়। গয়না বিদায় হয়ে এই যে বউয়ের নতুন গয়না হল। ভারি জাঁকের গয়না। বরের দুখানা বাহু কণ্ঠহার হয়ে গলায় রয়েছে, ভালবাসার মিষ্টি আবেশ সর্ব অঙ্গ আর মনপ্রাণ জুড়ে গয়নায় ঝিনিমিনির মতো বাজছে। সোনার বোঝা ফেলে ভারমুক্ত হয়েছে মীনাক্ষী। সে ছিল অহংকারের বোঝা, অস্বস্তির বোঝা। ঐ এক ব্যবধান ছিল তার আর ধ্রুবর মধ্যে—ফুটন্ত কাঁটার মতন। বাধা মুছে গিয়ে দুজনে মিলে একলা—একজন।

বাড়ির মধ্যে সকলের নজরে আসতে লাগল। গোবিন্দসুন্দরী অনেকক্ষণ এক-দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ঃ তোমার গা এমন খালি কেন বউমা? গয়না কি হল?

খুলে রেখেছি। বড্ড ভারী পিশিমা, বয়ে বেড়াতে কষ্ট হয়।

গোবিন্দসুন্দরী গালে হাত দিয়ে বলেন, ওগা আমার কী হবে! মেয়েমানুষের গায়ে গয়না ভারী, কেউ বিশ্বাস করবে না। আছে অনেক বলে দেমাক দেখাচ্ছ, তাই বলাবলি হবে।

কিরণবালা বলে, কী হয়েছে বল তো নতুনবউ? ঝগড়াঝাটি হল বুঝি?

হাসিতে ভেঙে পড়ে মীনাক্ষী ঃ দূর!

তা-ও বটে! ঝগড়াঝাটির পর এত হাসিস্ফূর্তি আসে না। ব্যাপার অন্য কিছু।

মীনাক্ষী জবাব ভেবে নিয়েছে ইতিমধ্যে। বলে, রেখে দিয়েছি সামাল করে। মাগো মা, যা সব চুরি-ডাকাতির কথা শোনা যায়!

নয়নতারা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, আর যেখানে যা-ই হোক, এ বাড়ি কখনো নয়। সর্দার-মান্য পেয়ে থাকে এরা এখন অবধি।

রায়বাড়ি স্ত্রীলোক অনেক। কানাকানি সকলের মধ্যে, কথা ক্রমে বাহির-মহলে চলে যায়। সেখান থেকে পাড়ার মধ্যে। সরকার-দের মেয়ে সৌদামিনী এসে বলে—হয়তো বা পরখ করবার অছিলায়—তোমার কঙ্কণ জোড়া একটুখানি দাও নতুন-বউ। স্যাকরা এসে বসে আছে, তাকে দেখিয়ে এক্ষুনি আবার দিয়ে যাবো। ঐ রকম মকমকে দিয়ে অনন্ত গড়াব।

মীনাক্ষীকে অগত্যা স্বীকার করতে হয় ঃ গয়না ওঁর কাছে দিয়েছি ভাই। উনি কোথায় সামাল করে রেখেছেন।

কিরণবালা এসে দাঁড়িয়েছে। অবাক হয়ে সে বলে, এই মরেছে! নেকী মেয়ে-মানুষ তুই! পুরুষের হাতে গয়না কেউ দেয়—তার উপর এই বাড়ির পুরুষের কাছে?

সৌদামিনী বলে, আছে তো কাছে, না চলে গেছে অন্য কোথায়? তুমি ভিন্ন জায়গার মেয়ে, এখানকার রকমসকম জানো না। গয়না চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিও, কাছ-ছাড়া কোরো না। ঘরের পুরুষ ভাল হয়তো বড্ড সুখের কথা। তাই বলে একেবারে গা ঢেলে বিশ্বাস করতে যাবে কেন?

বলছে সৌদামিনী, আর বাঁকা হাসি হাসে কিরণবালার দিকে চেয়ে। হাসি দেখে মীনাক্ষীর বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন যেন তাল গোল পাকিয়ে যায়, অজানা শঙ্কায় বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করে। কঠিন হয়ে রুখে থাকে, মাথা ঘুরে না পড়ে যেন এদের সামনে।

কিরণবালা পিঠ পিঠ তাবায় এক গল্প শোনাল—রায়েদেরই বড়তরফের ব্যাপার। ফুল-বউয়ের হাতের রুলি চুরি গেল। নিরেট সোনার জিনিস, বিস্তর দাম। হৈ-হৈ পড়ল বাড়ির মধ্যে। বড়বাবু রগচটা মানুষ চাকরবাকর ধরে এই পিটুনি ঃ চোর বাইরে থেকে এসেছে? বাড়ির মানুষ তোরাই কেউ সরিয়েছিস, প্রাণে বাঁচতে চাস তো সরলভাবে স্বীকার কর। স্বীকার করল এক ছোকরা চাকর, না করে রেহাই ছিল না। ফাটকে যেতে হল ছোকরাকে। সেই রুলি তারপরে পাওয়া গেল জেলেপাড়ায় এক জেলের মেয়ের হাতে। ঠসক করে মেয়েটা মেলায় গিয়েছিল, বেলডাঙার একজনে তার হাতের রুলি দেখে এসে বড়বাবুকে বলল। খাঁটি বৃত্তান্ত তখন বেরিয়ে পড়ে ঃ অপর কেউ নয়, খোদ ফুলবাবুই প্রণয়োপহার দিয়েছেন ঘুমন্ত স্ত্রীর হাত থেকে গয়না চুরি করে নিয়ে। চাকরটা জেল খাটছে তখনো। চুপ, চুপ—ঘরের ছেলেছোকরি বাইরে চাউর না হয় যেন। তেমন মনুষ বড় তরফের ঐ ফুলবাবু শুধু নয়, নিষমই এই রায়বংশের।

মীনাক্ষী মরীয়া হয়ে ধ্রুবভানুকে জিজ্ঞাসা করল, গয়না নিয়ে কি করলে? কাছে আছে তোমার?

না, বেচে খেয়েছি।

লালমোহন মিত্তিরের কথাগুলোই ছুঁড়ে মারে তার মেয়ের গায়ে। ভ্রূকুটি করল ধ্রুব বধূর দিকে। বলে, হঠাৎ গয়নার কথা কেন? যেদিন সমস্ত দিয়ে দিলে তখন তো একটি কথাও বলোনি।

মীনাক্ষী থতমত খেয়ে বলে, এমনি—

ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় সামনে থেকে। পালিয়ে যেন বাঁচল। ধ্রুবভানুর মনে অহোরাত্র কাঁটার মতো খচখচ করে ঃ গয়নার শোক হঠাৎ উথলে উঠল, আসল কথাটা কি বড়লোকের মেয়ের মনে মনে? সাগরচক গিয়েছে, সেই দারিদ্র্য নিজের স্ত্রীও ব্যঙ্গ করল?

নিভৃতে পেয়ে রুদ্ধভাবে সে মীনাক্ষীর হাত চেপে ধরল ঃ গয়নার কথা কি ভেবেছ, সত্যি কথা বলো। স্পষ্টস্পষ্টি জবাব দাও।

ইদানীং এমন হয়েছে, মীনাক্ষী ধ্রুবর মুখের দিকে তাকায়, সৌদামিনীর সেই বাঁকা চোখ দেখতে পায় সেখানে। দেখে দেখে

ক্ষেপে গিয়েছে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত কঠিন কণ্ঠে বলল, আমার সৌভাগ্য-ক্ষণ সেই গয়নার মধ্যে। একেবারে না বেচে যদি বন্ধক দিয়ে থাকো—

কি হবে তাহলে? বড়লোক বাপের হাতে-পায়ে ধরে বন্ধক ছাড়িয়ে আনবে?

হাতে-পায়ে ধরতে হবে কেন? টের পেলে নিজে থেকেই বাবা ছাড়িয়ে দিতেন।

যেন মীনাক্ষী নয়—এত কথা কে বুঝি বলিয়ে নিল তার মুখ দিয়ে। বলতে বলতে থেমে পড়ে। কেমন করে তাকিয়ে পড়েছে, ধ্রুব। বাঘের কথা শুনেছিল, বাঘ মরে এরা সব হয়েছে—বাঘে বুঝি এমনি করে তাকায় ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে। নির্বান্ধব এই অট্টালিকা যেন মহারণ্য—বাঘের মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে। হায়, হায়, কে বাঁচাবে?

মীনাক্ষী কেঁদে বলে, ছাই গয়না! গয়না চাইনে আমি। কথার কথা—একটা ঠাট্টাও কি করতে নেই! আমার ঘরের খবর বাবাকে জানাতে যাবো কেন? রাগ কোরো না, পায়ে পড়ি তোমার।

কোন কিছুই ধ্রুবর কান অবধি পৌঁছায় না। সে বলে যাচ্ছে, ঠিক ঠিক সেই জিনিস তোমায় দিতে পারব না। সৌভাগ্য-কঙ্কণও গেছে। কিন্তু গয়নায় তোমাকে ঢেকে ফেলব, গয়নার বোঝায় গুঁড়িয়ে দেবো। এই আমার কথা দেওয়া রইল।

বচসার পর থেকেই নতুন উপসর্গ। ধ্রুবভানুকে সন্ধ্যার পরে ঘরে পাওয়া যায় না, ফেরে অনেক রাত্রে। অর্থাৎ চঞ্চুলস্ফার বালাই কেটে আসছে ক্রমে। ঘর ছেড়ে মীনাক্ষী তাদের সেই অলিন্দে এসে দাঁড়ায়। দিগ্‌ব্যাপ্ত নদী অন্ধকার রাত্রেও চিকচিক করে। অট্টালিকা নিশুতি, নিঃশব্দ। কল্লোলধ্বনি অস্পষ্ট কানে আসে চাপা কান্নার মতো। মীনাক্ষীর মনপ্রাণ ঐ সঙ্গে সুরে মিলিয়ে কাঁদে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে একসময়ে সে গিয়ে পড়ে বিছানায়। ধ্রুব আসে অনেক—অনেক পরে, রাত্রি প্রায় শেষ করে। মীনাক্ষী সমস্ত টের পাচ্ছে। ঘুমের ভান করে পড়ে আছে, সন্ধ্যা থেকেই ঘুমোচ্ছে যেন। কথা-বার্তা দুজনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত, নিতান্ত যেটুকু নইলে নয়। ধ্রুব কদিন বড় উসখুস করেছে, নিভৃতে হয়তো কিছু বলার জন্য। মীনাক্ষী সুযোগ দেবে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, কাজের অছিলায় সর্বক্ষণ অন্যদের কাছে থাকে। কী হবে আজেবাজে মিথ্যেকথা শুনে?

এক রাত্রে অমনি দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের কাছে কী কিলবিল করে—মীনাক্ষী লাফিয়ে দু-পা সরে যায়। না, নতুন কিছু নয়—নর্দামার ফোকর থেকে ইঁদুর বেরিয়ে এসেছিল, মানুষ দেখে পালিয়ে গেল। মানুষগুলো ঘুমোয়, পুরানো বাড়ির অস্থিসন্ধি থেকে ইঁদুর বেরিয়ে বিচরণ করে। আর আকাশের অন্ধকারে পাখার ঝাপটা দিয়ে বাদুড় উড়ে বেড়ায় এদিক-সেদিক। এদেরই রাজত্ব এখন, এদেরই এই রাত্রিকাল।

গড়খাইয়ের মুখে হঠাৎ নজর গিয়ে পড়ে। বড়নদী থেকে ডিঙি একটা এসে ঢুকছে। একজন মাত্র মানুষ—বোঠেও বাইছে না, আলগোছে ধরে আছে। জোয়ারের ধাক্কায় ধীরে ধীরে ডিঙি খালের মধ্যে ঢুকে গেল। তেঁতুলতলার অন্ধকারে এসে ডিঙি ও মানুষ অদৃশ্য। অত দূরের হলেও সে মানুষ চিনতে মীনাক্ষীর ভুল হয় না।

আজকে আর ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে না। কথা স্পষ্টাস্পষ্টি হয়ে যাওয়া উচিত। এগিয়ে সিঁড়ির পাশে চলে গেল। উঠে আসছে ধ্রুব অতি নিঃশব্দে—বিড়ালের চলনে। অলিন্দে উপর পা দিয়েছে, শান্তকণ্ঠে মীনাক্ষী আহ্বান করল, এসো।

ধ্রুব হকচকিয়ে গেছে। কৈফিয়তের ভাবে বলে, পড়াশুনোয় বসি। পরীক্ষাটা দেবোই এবার। এত রাত্রি হয়েছে, বুঝতে পারিনি।

যেন অন্যদিন তাড়াতাড়ি এসে পড়ে। মীনাক্ষী সকাল সকাল শুয়ে পড়ে, তাই জানতে পারে না।

ধ্রুব বলে, বাইরে-বাড়ি নয়—এবার থেকে বইটই এই ঘরে নিয়ে আসব।

সে কি গো! হাসিতে ভেঙে পড়ল মীনাক্ষী। ঘাড় দুলিয়ে বলে না, কক্ষনো না। রায়বংশের পুরুষরা বাইরে বাইরে কত কি করে বেড়ায়। তোমার তো ভাল কাজ—বাইরে-বাড়ি বসে পড়াশুনো করা। সন্ধ্যাবেলা অন্দরে আসতে যাবে কেন? আমার নাম খারাপ হবে—লোকে বলবে, কুহকিনী বউটা বাঘকে ঘরে পুরে ভেড়া বানিয়েছে।

পড়াশুনো সেরে কোন পথ দিয়ে চুপি-সারে বাড়ি এসে ঢুকলে সে কি আর দেখিনি আমি? লালমোহন মিত্তিরের মেয়ে মীনাক্ষী, ফর্মবীর সজ্জন বাপের মেয়ে পাপজর্জর পড়তি সংসারে এসে পড়েছে—মনে যা হচ্ছে মুখে তার এতটুকু ছায়া ফুটতে দেবে না। কত বড় হাস্যকর কথা বলেছে যেন ধ্রুব, হাসিতে একেবারে গলে গলে পড়ছে। বলে, না, ওসব হবে না, সন্ধ্যাবেলা ঘরে কেন বসে থাকতে যাবে?

ঘরের মধ্যে দুজনে। কুলুঙ্গির প্রদীপটা মীনাক্ষী চাপা-দেওয়া খাবারের কাছে নিয়ে এলো। ঢাকা আলগা করে গ্লাসে জল গড়িয়ে দিয়ে জাপটে বসে পড়ল সামনে মেঝের উপর।

ধ্রুব বলে, তোমার খাওয়া হয়েছে তো?

ভ্রূভঙ্গি করে মীনাক্ষী বলে, কখন. কখন! রোজই তো খেয়ে নিই আমি। কি করব—ক্ষিধে আমি মোটে সহ্য করতে পারি নে. তা লোকে যা-ই বলুক।

ধ্রুবভানু সত্যি সত্যি খুশি হয়ে বলে, কে কী বলবে! পুরুষমানুষ কখন কোন কাজে আটকে পড়ে, আর একজনে না খেয়ে কেন বসে থাকবে?

এ কিন্তু মিথ্যা বলল মীনাক্ষী। খাবনি সে. কোন দিন খায় না। খেতে প্রবৃত্তি থাকে না। রাত্রের খাওয়া ছেড়েই দিয়েছে এক রকম।

আচমকা বোমার মতো এবারে সেই প্রশ্ন, যার জন্য আজ মীনাক্ষী সামনে এসে বসেছে ঃ আমার গয়না কোথা?

হাতের গরাস মুখে না তুলে ধ্রুব তাকিয়ে পড়ল। মীনাক্ষী কেটে কেটে বলে, গয়নায় ঢেকে দেবে বলেছিলে যে হাঁকডাক করে। গয়নার ভারে নাকি গুঁড়িয়ে দেবে? কত দেরি সেদিনের? হাত খালি কান খালি গলা খালি—লোকের কাছে মিথ্যে অজুহাত দিতে দিতে প্রাণ যায়। সর্বাঙ্গ ঢেকে কাজ নেই, আমার কল্যাণকঙ্কণ দিয়ে দাও শুধু। তা-ও না পারো তো সাদামাটা কঙ্কণ এক জোড়া।

পাবে তুমি, নিশ্চয় পাবে। খাওয়া ছেড়ে ধ্রুব উঠে পড়েছে। বলে বাপ-ঠাকুরদার বাস্তুর উপর দাঁড়িয়ে আমি মিথ্যে বলিনি নতুন-বউ। বাপের বাড়ি থেকে যেমনটি এসেছিলে, সোনার সজ্জায় আবার আমি তোমায় তেমনি করে সাজাব। আমার প্রতিজ্ঞা।

সকালে ঘুম ভেঙে মীনাক্ষী দেখে, ধ্রুব কখন উঠে বেরিয়ে গেছে। বাড়িতেই নেই। সমস্তটা দিন কেটে গেল। কোথায় গেছে কেউ জানে না, নকড়ি-গোমস্তা অবধি নয়। কান্না পাচ্ছে বড় মীনাক্ষীর—মানুষটাকে টেনে রাখবে, তা নয় অপমান করে দূরে সরাল। সামনে খাবার নিয়ে বসে খেতে পারল না। এবারে দেখা হলে মাথা খুঁড়বে পায়ে ঃ চাইনে সোনা, কিছু চাইনে আমি। তুমি কাছে কাছে থাকো। সেই আগেকার মতো আদরে আদরে ভরে দাও।

দুটো দিন ও দুটো রাত্রি গেছে। ধ্রুব এলো না। বাড়ির লোকের কিছুমাত্র উপেক্ষা নেই। এই তো নিয়ম পুরুষ-মানুষের। এই তরফে না হোক, অন্য তরফে হামেশাই এ রকম ঘটে রায়বাড়ি। কিন্তু মীনাক্ষী যে অঞ্চলের মেয়ে, সেখানে এ জিনিসের মার্জনা নেই। বাঘ পোষ মানানোর দেমাক করে এসেছিল এবাড়ি, আজ কোথায় মুখ লুকোবে ভেবে পায় না।

আরও অতিষ্ঠ করে তুলছে বাড়ির মানুষ যখন তখন দরদ জানিয়ে। গোবিন্দসুন্দরী বলেন, সোনার অঙ্গ কালি করে ফেললি যে দিদি, আয়না ধরে দেখেছিস? হয়েছে কি শুনি! কাঁচা বয়সে পাকসাট অমন সবাই মেরে থাকে, রক্তের জোর কমলে সেরে যাবে। স্ফূর্তি করে খাবি-দাবি, দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নিবি। তোদের বয়সের খেলাই তো এই—রাধাকৃষ্ণের মান-অভিমান।

আর কিরণবালা সন্ধ্যা হলেই কাঁটা-চিরুনি ফিতে-দড়ি আলতা-সিঁদুর নিয়ে জোর করে ধরে বসায়। চুল বাঁধবে, পাতা কেটে টিপ পরাবে, সিঁদুর পরাবে, আলতা দেবে পায়ে। ছাঁচিপান মুখে পুরে দেবে ঠোঁটদুটি যাতে লাল-টুকটুকে হয়। মুখ-খানা একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরিয়ে দেখে তৃপ্তি ভরে বলে, ফাঁদ একখানা সাজিয়ে রাখলাম ভাই। যে জায়গায় যায়, তার চেয়ে শতেক গুণ রূপ দেখিয়ে মন কাড়তে হবে। তাই আমি কবলামা একবার যদি এসে পড়ে, ফুড়ুত করে পালাতে হবে না বাছাধনের। আটক হয়ে থাকবে।

সারাগোজে সর্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বালা করে, মুখে মীনাক্ষী কিছু বলতে পারে না। কদিন পরে ভক্তদাস পালসি নিয়ে এসে পড়ল। লালমোহনের মা'র বড় অসুখ—বুড়োমানুষ কখন আছেন কখন নেই, নাতনীকে একটিবার দেখতে চান। এ সমস্ত

রাস্তা সুতরাং সুগম; কিন্তু আরও রাস্তা তো আছে—নেপথ্যে আত্ম-চেষ্টা।... অঙ্ক? নেপোলিয়ান আল্পস্ লঙ্ঘন করলেন কি করে? ব্যোমকেশ লিখলেন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ।

যেখানে যাঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করে গেছেন সবাইকে জড়ো করে যখন এইভাবে নিজেকে উৎসাহিত করছি সেই সময় একদিন দেবকুমে একখানি বটানী বা উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রাথমিক বই আমার হাতে পড়ে গেল। সেদিনটাও একটা স্মরণীয় দিনই আমার জীবনে, যদিও আবার বলতে হয়, ফল কিছু হোল না। কিন্তু সে আলাদা কথা।

দেখলাম এও তো বিজ্ঞান, অথচ অঙ্কের বেড়াজাল দিয়ে ঘেরা নয়। অন্তত গোড়ার দিকে ভীতিপ্রদ তেমন কিছু নজরে পড়ে না, পরে থাকে, সে পরের কথা।

আর একটা মস্ত বড় সুবিধা, ল্যাবরেটারির বালাই নেই। যদি থাকেও তো সে পরের দিকে, ইতিমধ্যে আমি অনেকখানি এগিয়ে যাব, একটা ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং তাইতেই নিয়ে যাবে সামনে টেনে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ণ-পরিচয়টাই সবচেয়ে বিভীষিকার যুগ।

আরম্ভ করে দিলাম।

এক আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করছি ধীরে ধীরে, অথচ, আরও যা আশ্চর্য—এই জগৎটি তার নীরব আবেদন নিয়ে আমায় বেষ্টন করেই ছিল এতদিন! এও যেন আলিবাবার 'ওপন্ সিসেম'এর ব্যাপার। প্রভেদ এই যে, এ গুহা-দ্বার খোলবার কোন যাদুমন্ত্র নেই, আছে যন্ত্রই, চাবি। আপাতত একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরি, একটি কাঁচি, একটি মাইক্রোস্কোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র এবং একটি ভালো নিড়ানি। অর্থাৎ মিরাকল বা ভোজবাজি নয়, সাধনা। মিরাকেলের বিস্ময়ই আছে স্থায়িত্ব নেই। আরম্ভ করে দিলাম আমার সাধনা।

মিরাকল নয়ই বা কি সে? মূল থেকে নিয়ে শীর্ষ পর্যন্ত একটি অতি সামান্য উদ্ভিদের পদে পদে বিস্ময়। আর, কী অফুরন্ত বৈচিত্র্য!

বাড়িতেই আরম্ভ করলাম আমার গবেষণা। আমার পড়ার আড্ডা ছিল ওপরের ছাতে একটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত ঘরে। প্রয়োজন মতো গাছ-গাছড়া জোগাড় করে এগিয়ে চলাম।

বেশ নিরুপদ্রবেই কাটল তিনটে মাস। বাড়িতে এ নিয়ে বেশি কৌতূহল নেই। ফুলের শখ ছিল, ছাতে—টবে কিছু জমা হয়েছিল আগে থাকতেই, নূতন শখটা তার মধ্যেই বেশ আত্মগোপন করল। তারপর একদিন টের পেলাম বাড়িতে হয়তো অজানা থাকলেও সংবাদটি সমস্ত পাড়ায় বেশ ভালোভাবেই কখন ছড়িয়ে পড়েছে।

কিসের ছুটি ছিল সেদিন, অনেকরকম গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে খাওয়া-দাওয়া সেরেই আমি কাজে লেগে গেছি। সেদিন উদ্ভিদের শিকড় নিয়ে আমার বিশেষ পরীক্ষা চলছে, এবং সেই উদ্দেশ্যে শিকড়ের বৈশিষ্ট্য আছে এই ধরণের কতকগুলি উদ্ভিদ সংগ্রহ করে রেখেছি। মধুমালতী শ্রেণীর লতা-বৃক্ষের বীজ থেকে গাছ হয় না, হয় সুদূরে-প্রসারী শিকড় থেকেই। অরকিড বা অন্যান্য পরগাছার শিকড়ের প্রকৃতি ভিন্ন ধরণের। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে—কলমি, হিংচা গাঁটে-গাঁটে শিকড় বের করতে করতে অগ্রসর হয়। মোড়ক-জাতীয় উদ্ভিদের আবার অন্যরকম ব্যবস্থা। এই সব উদ্ভিদের আবার বীজ নেই—প্রকৃতির Economy বা মিতাচারে এও এক আশ্চর্য ব্যাপার!

একেবারে হো-হো করে হেসে উঠলেন

সেদিন আমার টেবিল আর ছোট ঘরখানি এই রকম নানাজাতীয় উদ্ভিদে বোঝাই হয়ে গেছে বলতে পারা যায়। তারই মাঝে দরজার দিকে পিঠ করে আমি তীক্ষ্ণধার ছুরি আর অনুবীক্ষণ যন্ত্রটির সাহায্যে একগোছা হিংচার গোড়া নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়েছি, এমন সময় দরজায় হঠাৎ আস্তে আস্তে কিছু লোকসমাগম হল বলে অনুভব করলাম। ক্ষণিক অন্যমনস্কতা তারপর, গভীর তন্ময়তায় যেমন হয়, সেটাও কেটে গেছে, এমন সময় একটু যেন ফিসফিসানির মতো কানে যেতে ঘুরে চাইলাম।

আমার মামার বাড়ি। মামা-মামিমাদের নিয়ে বাড়ির ভেতরটা জনবিরল হলেও, পাড়ায় আশেপাশে দিদিমা-মাসিমাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। এবং তাঁদের অনেকেই, মার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে অন্তরঙ্গতা থাকায়, মামা-মাসিমাদের চেয়েও আমার সম্বন্ধে বেশি আগ্রহশীলা।

দেখলাম বর্ষিয়সী-বৃদ্ধা মিলে পাঁচজনের একটি নাতিক্ষুদ্র দল; পুরোভাগে রয়েছেন লাহিড়ী-দিদিমা। স্থূল শরীরের সমস্ত ভারটা ডান হাতে ডান হাঁটুর ওপর রেখে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি ঘুরে চাইতে বললেন—'তাই দেখছিলুম, কতক্ষণে সাড় হয় শৈলভায়ার আমার।' সঙ্গে সঙ্গে পাশে—রতন-মাসির দিকে চেয়ে বললেন—'তোকে বলছিলাম না রতু? একেবারে ঐরকম জ্ঞান-বুদ্ধি না হয়ে গেলে বিদ্যে হয়? মুয়ে আগুন! অত চেষ্টা করলে দাদা, তা হোল কিছু? এখন তিনকাল গিয়ে চারকালে এসে একটু ভাগবত পড়ব—অক্ষর গুণে গুণে দুটো পাতাও শেষ হয় না একটা দিনে।'

"বিদ্যে যে একটা সাধনা পিসিমা।" রতন-মাসি মন্তব্য করলেন।

লাহিড়ী-দিদিমা বলে চললেন—"পরশু সকালে গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সময় বাগী-ঠাকুরঝির সঙ্গে দেখা—জিজ্ঞেস করলুম—হ্যাগা আমাদের গিরির ছেলে শৈল মামার বাড়িতে যে পড়তে এল, তা লেখাপড়া কেমন করছে, আছে কেমন খোঁজ রাখিস একটু? .....ঠাকুরঝি বললে—'ওমা, সে আবার জানান দিয়ে খোঁজ নিতে হয় নাকি? গিরিদির ছেলে শৈল একজন যে মস্ত বড় কবরেজ হতে চলেছে একথা চৌধুরী পাড়ার কোন্ মানুষটা না জানে? যখনই দেখো, একগাদা গাছ-গাছড়া, পাতা-ফল-শেকড় নিয়ে চলেছে।'

.....বললুম—'সত্যি নাকি? তা ও ছেলে একটা কিছু যে না হয়েই যায় না এ আমার জানা।.....কাল পূর্ণিমা ছিল, বেতো রুগী তায় অনেকটা পথ তো, আর হয়ে উঠল না। ভাবলুম আজ তাহলে একবার দেখে আসি। পথে অর্ত-দিদি, রতন, সাতকড়ি-ঠাকুরঝি আর বিলাস-ঠাকুরঝির সঙ্গে দেখা, বললে চলো আমরাও যাই.....'

সাতকড়ি-মাসি কাছেন থেকে একটু এগিয়ে এলেন—"কবরেজ যে এতবড় শহরটা থেকে লোপাট হয়ে গেল বাবা। তোর ঘরটা দেখে যেন বুকে বল আসছে। তা সত্যি কথা বলব বৈকি, যত বড়ই ডাক্তার হোক তোমার বৈকুণ্ঠ চৌধুরী, কি হরিধন আঙ্ডি, কি অত যার নামডাক সেই পান্নালাল ডাক্তারই।"

"তা এসে যখন পড়েছিই মরতে মরতে, দু দিকিন ভাই একটা ভেবেচিন্তে.... ঐ গো উঃ!" —হাঁটুর ওপর ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে

ছিলেন লাহিড়ী-দিদিমা, কথা বলতে বলতেই একটা চাড়া দিয়ে মুখটা বিকৃত করে উঠলেন।

হঠাৎ আবির্ভাবে আর কথাবার্তার গতি-প্রকৃতিতে বিমূঢ়ই হয়ে পড়েছিলাম, "কি হোল দিদিমা?" —বলে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠতে নাক-মুখ আরও সিঁটকে একপা এগিয়ে এলেন ভেতরে। বললেন—"সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলুম দাদু আমার, তা নিজেই তো দেখিয়ে দিলে। বাত আর কি ভাই; আমার যম। কাল আমার কোটালের পূর্ণিমে গেছে, এখন ক'দিন ভোগায় দেখ্। তা দে ভাই দেখেশুনে একটা কিছু। ...ওমা, এই তো রয়েছে—কিসের শেকড় বল দিকিন, যেন চেনা-চেনা।"

"মধু-মালতীর"—বললাম আমি।

"ঠিক ধরেছি! তার শেকড় তো বাতের মস্ত বড় ওষুধ। না গো অমর্ত-দিদি?"

"ধন্বন্তরী একেবারে। এ কথা কে না জানে?" —বলতে বলতে অমর্ত-দিদিমা ঘরের মধ্যে ঠেলে এলেন। "দেখি তো" বলে গোড়ার গোছাটা তুলে নিয়ে বললেন—"মধু-মালতীই তো। শৈলই বলুক না, পড়া বিদ্যে তো আমরা না হয় আনাড়ি শুনেছি, বলছি। কি গো, বাতের ওষুধ বলেই এনেছিস তো?"

পরিস্থিতি দ্রুত যে রকম জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বিমূঢ় ভাবটা কাটা দূরের কথা, আরও উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল, আমি ও'দের আলাদা সাব্যস্ত না করে, নিজেও কবিরাজিটা পুরোপুরি মেনে না নিয়ে, মাঝামাঝি একটা দাঁড় করিয়ে বললাম—"বাতে অবশ্য লাগে, ভালো ওষুধই, তবে আমি এনেছি এক অন্য উদ্দেশ্যে, সেটা....."

"তাই দেখছিলুম কতক্ষণে সাড়া হয়, শৈলভায়ার আমার।"

আরও তিনজন চৌকাঠ পেরিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, বিলাস-মাসিমা একটু ঠেলে এসে বললেন—"ওমা, সেকথা কি বলছিস বাবা, একটা ওষুধ নাকি একটা রোগেরই জন্যে? এই কালমেঘের কথাই ধরো না, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, তাতেও ধন্বন্তরী, আবার....."

"আমি ভাই নিলুম গোড়াগুলো, যে জন্যেই না আনিস, তোর দিদিমা তো আগে বাঁচুক.....উঃ মাগো! ঐ আবার একটা টিস মারলে!"—এগুবার ঝোঁকেই আর একবার সিঁটকে উঠে শিকড়ের গুচ্ছটা মুঠিয়ে ধরলেন লাহিড়ী-দিদিমা—"আর একেবারে টাটকা রে! এতেও যদি পোড়া-বাত না সারে তো সেরেও কাজ নেই, একেবারে শ'য়ে গিয়ে উঠবে তোর দিদিমার সঙ্গে।.....আর সাতকড়ি যেন কি বলছিলি?"

"বলছিলুমই তো"—সামনে একটু ঠেলে এলেন সাতকড়ি-মাসিমা। বললেন, "আর ঐ তো জোগাড়ও করে রেখেছে শৈল। মাসি কি আলাদা? উপযুক্ত সন্তান, সে টের পায় যে! কী অনাছিষ্টি পিণ্ডির বাত বাবা! জিজ্ঞেস কর বরং তোর অমর্ত-দিদিমাকে, পাশেই তো বাড়ি। পোড়া শিবপুরের বাজার, সব পাবে, একমুঠো হিংচে পাওয়া যাবে না। আমি সব ক'টি নিলুম বাবা।...আশীর্বাদ করি দিদির মুখোজ্জ্বল কর। তুই বাবা জোগাড় করে নিবি সব। আর, এবার দু'টি বেশি করে আনিস বাবা, যা লোভ দেখালি মাসিকে... ও শাদাগুলো কি বল দিকিন, ব্যাঙের ছাতা নাকি? .....ওরে বিলেস! তোর কেঁড়িক যেরে!"

"তাই নাকি! ওমা, সত্যি তো! এ জিনিস কোথা থেকে জোগাড় করলি বাবা? আমি যে কত লোককে বলে বলে হেরে গেছি! কী যে পেল্লায়ে অরুচি, না দেখলে পেতায় যাবিনি বাবা! কদ্দিন থেকে যে খুঁজছি, ঐ একটি জিনিস রোচে মুখে, দু'মুঠো ভাত তুলতে পারি। .....না, দিবিা দেওয়া রইল কাউকে সন্ধান দেবে না। আমি নিজেই আসব বাবা, নিয়ে যাব। কী অমর্ত যে দিলি শৈল, কী বলে যে আশীর্বাদ করব তোকে।....."

অম্লশূল আছে, আধকপালি আছে, পালা-জ্বর আছে, দাঁত-কনকনানি আছে—সেদিনকার সঞ্চিত শিকড়গুলি তো গেলই, পূর্বসঞ্চিত যা কিছু গাছগাছড়া লতা-গুল্ম ছিল ঘরটায় সবগুলি একটা না একটা রোগ নিবারণ বা আরোগ্যের ওজুহাতে পাঁচজনে হাতিয়ে নিয়ে, পুনরাগমনের ভরসা দিয়ে ঘর, টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। প্রথম দিনের নমুনা। তারপর এই চলল। বাড়লই বলা উচিত। কারণ, কি থেকে কি হোল জানি না, তবে কবিরাজী যশটা আমার বেড়েই চলল। আমি যে বিজ্ঞান নিয়ে এই এই চর্চাটুকু করছি এটা মামাদের বলার উপায় ছিল না, কলেজ-পাঠ্যের পরিপন্থী বলে সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করে দিতেন, তবে প্রকাশ না করার শপথ দিয়ে মামিমাদের বলা ছিল, এবং উদ্ভিদজগতের অদ্ভুত রহস্য তাঁরা অবসর সময়ে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই শুনতেনও আমার কাছে। দিন কতক তাঁদের কাছেও গোপন রাখলাম—এমনি আসেন, ও'দের মতোই কৌতূহলের সঙ্গে শোনেন গল্প—এই বলেই সারলাম। তারপর, উদ্ভিদ-বিদ্যা তো একরকম শিকেয় উঠল, আমি এমন ভয়াবহভাবে পাড়ার হিংচে-সুশনি-কোঁড়ক-নারিকেলের শিকড়—অশোকের ছাল সরবরাহ করার যন্ত্র হয়ে উঠলাম যে একদিন তাঁদেরও বলতে হোল—তাঁরা যদি এ'দের হাত থেকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা করতে পারেন।

শিউরে উঠলেন তিনজনেই। বললেন—"রক্ষে করো বাবা, এ শহরে কার এতবড় সাহস যে লাহিড়ী-গিন্নির ঐ দলের ওপর কথা কইবে? .....তার চেয়ে ছেড়েই দে বরং এ বাই, পড়ার ক্ষতি হচ্ছে বলে কর্তাদের কানে তুলতেও তো পারছিস না।....."

ছোট-মামিমার আক্রোশটা একটু বেশি, বললেন—"তার চেয়ে বয়ে সারা হচ্ছিস, কিছু তেমনি গোড়া এনে মিশিয়ে দেনা ওর সঙ্গে, দু-একটা মরুক, দল পাতলা হোক, পাড়াটা ঠাণ্ডা হোক।"

খুব মন বসে আসছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হওয়ার এমন সুগম পথ ক্রমেই এত দুর্গম হয়ে উঠল যে, বল্কপাতি তুলে রেখে এ


॥প্রতিমা পুস্তক॥
১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত রোড
কলিকাতা—১৪
শাখা ঃ১৩, কলেজ রো, কলি-৯
• অর্ডার সাপ্লাই হয় •
স্কুল-কলেজ-পাঠাগারের বই
* লেখক মহল *
রচনা প্রকাশের জন্য লিখুন

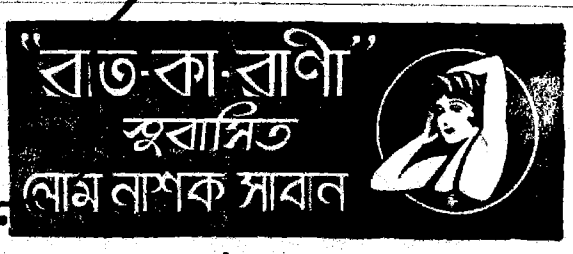

অভিযান সাঙ্গাই করে দেবো ঠিক করেছি, এই সময় জায়গাটার ওপর নজর পড়ে গেল।

শহর থেকে বেশ খানিকটা বেরিয়ে এসে বড় একটা জঙ্গলই বলা চলে, তবে নিতান্ত বাঘ-ভাল্লুকের আড্ডা নয়। দক্ষিণে, ভেতরের দিকে একটা খুব বড় পরিত্যক্ত বাড়ি, জায়গাটা তারই সংলগ্ন মনে হয়। পশ্চিমে খানিকটা দূর দিয়ে রেলের লাইনটা ঘুরে বেরিয়ে গেছে। পূব শহরটা এগিয়ে আসছে, তবে শেষ নতুন বাড়ি যে-কটা নজরে পড়ে তা অনেক দূরে এখনও। চমৎকার নিরিবিলি জায়গা।

প্রথম দিন সঙ্গে আরও দু'জন ছিল বলে দেখে নিয়ে চলেই এলাম, তবে তার পরদিন গিয়ে জঙ্গলের বাইরে বাইরেই ঘুরে ঘুরে যা দেখলাম তাতে মন ভরে উঠল আমার। কত রকমের আগাছা, কত রকমের লতা, গুল্ম তার ইয়ত্তা নেই। বড় বড় গাছের সংখ্যাও কম নয়। আম, জাম, কাঁটাল, নারিকেল আরও আমার অজানা কি সব বৃক্ষ। আপাততঃ আমার সঙ্গে সেগুলির নিজের কোন সম্পর্ক না থাকলেও তাদের শাখায়-শাখায় অর্কিড ও অন্যান্য নানা জাতীয় পরগাছায় শিক্ষা-গবেষণার একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে রেখেছে। এক সময়ের সুপরিকল্পিত বাগানই তো, একটি পুরনো ঝাউগাছের প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত একটি মনি-প্ল্যান্টের (money Plant) লতা উঠে গিয়ে তার বিরাট হলদে রঙের পাতার ভিড়ে বাগানের খানিকটা যেন আলো করে রেখেছে। একদিকে একটি নবীন অশ্বত্থ একটা খেজুর গাছকে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসাৎ করে উঠেছে বেড়ে। প্রকৃতি এখানে ভেঙে-গড়ে যা-খুশি করবার খেলাঘর পেতেছে। অদ্ভুত বেহিসাব, অদ্ভুত খেয়াল, অদ্ভুত বৈচিত্র্য। এই খেয়ালী মেয়ে কি নিয়মে চলে বুঝতে হলে তো এই অনিয়মের রাজ্যেই এসে আসন পাততে হবে।

তাই পেতেছিলাম আমি। মাত্র তিনটি সপ্তাহের সাধনায় যতখানি এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম, ওদিকে তিন মাসের চেষ্টায় তার অর্ধেকও পারিনি। তাও সে-সাধনা ছিল তো একরকম অবিচ্ছিন্নই। আর, এর মধ্যে কত ফাঁক!

কলেজের দিনে সময় কমই থাকত হাতে। যে-দিনের যেমন রুটিন, তারপর গঙ্গা পেরিয়ে এতদূর এসে বাড়ি, তারপর জল-যোগ করে আবার প্রায় মাইল দুয়েক হেঁটে বাকসাড়ার এই পড়তি বাগান, সময় খুব কম থাকত। তবে ছুটির দিন তাড়াতাড়ি আহার সেরেই বেরিয়ে পড়তাম আমি। একখানি থলের মধ্যে ছুরি, কাঁচি, অনুবীক্ষণ, একটি নিড়ানি। আর থাকত একটি ভাঁজকরা ছোট্ট আসন। ঘুরে ঘুরে প্রয়োজন-মত গাছটি বেছে নিয়ে আসনটি পেতে আমি বসে যেতাম। কখনও কখনও একটি গাছ নিয়েই দিনের পর দিন কেটে যেত আমার।

অনুভব করছি, পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠছি আমি। ঘরে-বাইরে অনুযোগ—নিজের শরীর, নিজের বেশভূষার দিকে নজর নেই। এ কী হয়ে উঠছি দিনদিন!

ঠিক ইচ্ছাকৃত নয়, তবু এই যে আপনা হতেই একটা অবিন্যস্ত আলুথালুভাব, চিরুনির সঙ্গে মাথার সম্পর্ক অল্পে অল্পে একেবারেই ঘুচে গেছে, হয়তো কোনদিন তেল দিতেও ভুলে গেলাম, জামার বোতাম নেই, থাকলেও এলিয়ে পড়ে আছে গায়ে—এতে এক অদ্ভুত তৃপ্তি পাই।

—শুধু এই একটা আত্মপ্রসাদ, একটা আত্মপ্রত্যয় যে, আমি হয়ে উঠছি। হয়ে উঠছি ডক্টর সেনের আদর্শে, শুধু তাই নয়, তাঁরও যিনি গুরু, সমস্ত ভারতের যিনি বিজ্ঞান-গুরু সেই আচার্য রায়ের আদর্শে আত্ম-বিস্মৃত সাধক। কৃত্রিম, বা লোক-দেখানো কিছু নয়; মনটা স্বতঃই কেমন যেন নিজে থেকে সরে সরে যাচ্ছে। আমি হয়ে উঠছি।

কিন্তু হায়রে মানুষের দুরাশা!

সেদিন কি একটা স্নান উপলক্ষে কলেজের ছুটি। আগের দিন আমি আবার এক আশ্চর্য উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছি, বনের একটু বাইরের দিকেই এক জায়গায় কতকগুলি লজ্জাবতী লতা। সে সময় আচার্য বোস প্রধানত এইটিকেই অবলম্বন করে তাঁর "প্ল্যান্ট-অটোগ্রাফ" নিয়ে সাড়া জাগিয়েছেন। আগের দিন প্রায় সন্ধ্যার মুখে আমি আবিষ্কার করলাম। তখন আর সময় নেই, পরের দিন প্রায় সমস্ত দিনটা হাতে নিয়ে গিয়ে পড়লাম আমি।

একেবারে তন্ময়ীন হয়ে গেছি, আমার আর বাহ্যজ্ঞান নেই বলা যায়। পাশে বেশ যত্ন করে মাটির চাঁইসুদ্ধ ওপড়ানো একটি লতা, বাড়ি নিয়ে গিয়ে টবে পুতব। তার পাশে আমার নিড়ানিটা। আমি স্পর্শের তারতম্যে ঝিরঝিরে পাতাগুলিকে শুইয়ে দিচ্ছি। কখনও ধীরে, কখনও ত্বরিতে, অন্য-গুলি আবার আস্তে আস্তে জেগে উঠছে নিদ্রা থেকে। সচেতন প্রকৃতির সামনে আমি প্রায় লুপ্ত-চেতন হয়ে এসেছি, এমন সময় বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো একেবারে চমকে উঠলাম। এবার আর ফিসফিসানি নয়, একেবারেই স্পষ্ট—

"ও বাবা, তুমি কী করছ এখানে এমন ক'রে!!"

ঘুরে দেখি গঙ্গা-স্নানার্থিনীদের বেশ একটি মাঝারি গোছের দল, বৃদ্ধা-প্রৌঢ়া-যুবতী-কিশোরী নিয়ে জনসাতেক; আমায় প্রশ্ন করেছেন সবচেয়ে যিনি বৃদ্ধা। মাথায় কদম-ছাঁট চুল, পরণে মটকার থান, হাতে একটি কমণ্ডলু। বাকি সবাই দৃষ্টিতে বিস্ময় জাগিয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে; ছোটদের দিকে তার সঙ্গে খানিকটা ভীতিও।

বনটার প্রায় দেড়শ' গজ তফাতে একটা রাস্তা রেলের ওদিক থেকে এসে শহরের দিকে চলে গেছে, আর বনের ওদিক থেকে একটা সরু পায়ে-হাঁটা পথ ঘুরে তাইতে

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

**অন্তর্মনা** ২·০০

দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ

**মনসিজ** ৫·০০

"জীবনের সমস্ত অপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে যে প্রেম ক্ষতিপূরণ করতে সমর্থ লেখক এই জোরালো বক্তব্যকে হাজির করতে সক্ষম হয়েছেন।"

চতুরঙ্গ, শ্রাবণ ১৩৬৯।

রঞ্জন বিলাস বসু

**পুরনো দিন**

**পুরনো কথা** ২·৫০

পুরনো গ্রামবাঙলার সমাজ ও জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়।

কমাদ গুপ্ত

**অবরোহন** ৭·৫০

বহুপ্রশংসিত উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ।

**শ্বেতকরবীর দোসর** ২·৫০

উপন্যাস। প্রকাশিত হইল।

বরেন গাঙ্গুলী

**কংস কবুতরী কথা**

(উপন্যাস) ২·৫০

অজয় দাশগুপ্ত

**সূর্যতামসী** (উপন্যাস) ২·৫০

বিশ্ব বিশ্বাস

**নীল সাগরের জলে** ১·৫০

কিশোর উপন্যাস

**অন্যান্য গ্রন্থ**

রম্যা রলাঁর **শিল্পীর নবজন্ম**—৫·০০, নীলরতন মুখোপাধ্যায় **অপরিচিতার চিঠি**—২·০০, সুবোধমোহন ঘোষের **উৎস**—২·০০, মিহির আচার্যের **দিন-বদল**—২·০০, সতীন্দ্র মৈত্র অনূদিত **গারাভঞ্চির কবিতা**—২·৫০, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় **অমরাবতী** ১·০০।

**অগ্রণী প্রকাশনী**

এ ১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা—১২

গিয়ে মিশেছে। একেবারেই চালু নয়, ঘন্ত জমে গেছে; আজ স্নান উপলক্ষে এই প্রথম মানুষ চোখে পড়ল।

অমন একটা ঘোর থেকে হঠাৎ জেগে উঠে প্রথমটা হতবুদ্ধিই হয়ে পড়েছিলাম, তারপর একটা বিরক্তিই ঠেলে উঠল মনে, কোনও উত্তর না দিয়ে সবার ওপর থেকে খরদৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে আমি আবার ফিরে বসলাম।

কোন প্রশ্ন নেই আর, শুধু নিজেদের মধ্যে চাপা ফিসফিসানি—

"না: ঘাঁটিয়ে কাজ নেই.....আবার খুরোপো সঙ্গে রয়েছে! ...না গো না, অত সাহস দেখাতে হবে না তোমায়...করব জিজ্ঞেস পিসিমা?...চলে আয়, ঘাঁটিয়ে কাজ নেই...কামড়ায়ও...মাথার কি ঠিক আছে...?"

সেদিন এইটুকুর ওপর দিয়েই গেল। চলে গেল সবাই। তারপর আরও দুটা দিন বেশ নিরুপদ্রবেই গেল কেটে। কিন্তু সেটা নিশ্চয় এইজন্যই যে কলেজ থাকায় এবং দেরি পর্যন্ত ক্লাস থাকায় আমি মাত্র একেবারে বিকালের দিকে ঘন্টাখানেক সময় পেলাম এসে কাজ করবার। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তারপর দিন ছিল রবিবার। আমার লজ্জাবতী-অধ্যায় আপাতত শেষ হয়েছে। বনের ভেতরের দিকে একটা নূতন ধরণের লতা পেয়েছি, ক্যাকটাস-জাতীয়, একেবারে পত্রশূন্য, গায়ে খুব মিহি রোঁয়ার মতো কাঁটা। সেটি তুলে নিয়ে এসে, কাঁটার জন্যই মাটিতে রেখে আমি প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েই অনুবীক্ষণ নিয়ে পরীক্ষা করছিলাম, একবার উঠে দেখি, প্রায় সেই দলটি কখন এসে একটু তফাতে দাঁড়িয়েছে। এবার যেমন কম-বয়সীদের দু'একজন নেই মনে হোল, তেমনি বৃদ্ধা-প্রৌঢ়ার সংখ্যা আরও পুষ্ট। তাঁদের তরফ থেকেই প্রশ্ন-মন্তব্য শুরু হোল—

"ও বাবা, তুমি অমন করে মুখ থুবড়ে এখানে কি করছ চাঁদ আমার? সেদিনও দেখলাম।"

আজ একটু লোভই হোল, উত্তর দিলে যদি নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আজ বসেও ছিলাম বনের দিকে পেছন করেই, এড়ানোও গেল না। বললাম—"আমি পড়ি মা এখানে এসে।"

পেছনের দিকে একটু চাপা মন্তব্য হোল—"ঐ শোন বলিহারি? সহজ লোকের এই পড়া?"...হ্যাঁ, বাবা, পড়ো, তা বই-খাতা কোথায় তোমার?"—অত্যন্ত দরদে ভরা স্বর। আমি উত্তর দেওয়ার আগেই, এ-পাড়ার অর্থ যেন ধরে নিয়ে অন্যকণ্ঠে প্রশ্ন হোল—"বেশ করো পড়ো বাবা। তা বাড়ি যাও দিকি।...আহা কোন্ মার কপাল ভেঙেছে গো? বাঁশের কোঁড়ার মতন ছেলে এমন! এই বয়সেই সাধ-আহ্লাদ সব গেল!"

প্রশ্নের একটু ভিড়ই পড়ে গেল—

"বিয়ে করেছ তুমি বাবা?"

"বাড়ি কোন্‌খানে!"

"বাপ-মা বেঁচে আছে? (নিজের মনেই) আর বেঁচে থেকে তো ভারি লাভ তাদের! আহা গো!"

"নাওনা-ধোওনা কেন বাবা? নাইবে ভালো করে। মাথায় ভালো ক'রে ঠাণ্ডা তেল দেবে। বলে দেয় না কেউ? যাও তো মানিক আমার, বাড়ি যাও।"

সেইদিন ঐ পর্যন্তই। উত্তর দেওয়ার যেমন ফাঁকও পাচ্ছি না, তেমনি সব প্রশ্নের একই উদ্দেশ্য দেখে বাক্য খুঁজেও পাচ্ছি না কিছু বলবার। দৃষ্টিও স্বভাবতই শূন্য এবং উদ্‌ভ্রান্ত এবং তাইতেই আশু বিপদের কোন সম্ভাবনা দেখে দলটি শেষে পাৎলা হোল।

কিন্তু শেষ হোল না এইখানে। ক্রমে সকাল ছেড়ে বিকেলেও কৌতূহলীদের সমাগম আরম্ভ হতে লাগল। বিশেষত্ব এই যে অল্প-বয়সীদের সংখ্যা একেবারেই লুপ্ত হয়ে, প্রৌঢ়া, বিশেষ করে বৃদ্ধাদের সংখ্যা যেতে লাগল বেড়ে। প্রশ্ন-মন্তব্য—উপদেশও স্পষ্ট হতে হতে শেষে পাগলা-কালীর তামার বালাও এসে পৌঁছে গেল একদিন।

শেষে পাগলা-কালীর তামার বালাও এসে পৌঁছে গেল একদিন।

তবুও ওদিকে মুক্ত প্রকৃতি একটি একটি করে রহস্যের দ্বার খুলে যে মোহে আকৃষ্ট করছে, ছাড়তে পারছি না।

তারপর একদিন অবস্থাটা এর চেয়েও চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছাল।

কেমন যেন গা-সওয়াও হয়ে এসেছে। ছুরি-কাঁচি-অনুবীক্ষণ নিয়ে কাজ করে যাই, ওরা এসে দাঁড়ায়, প্রশ্ন-মন্তব্য করে, চলে যায়, আবার কাজে লেগে যাই আমি। তারপর শেষ চোটটা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবেই পড়ল এসে।

সেদিন কাজের মধ্যে হঠাৎ চোখ তুলে দূর থেকেই দলটিকে দেখে মনে হোল তার মধ্যে থেকে একজন যেন একটু চেনা-চেনা। একটু এগুতেই বুঝলাম লাহিড়ী-দিদিমার দল। আরও কাছে আসতে দেখলাম, একটু রদবদল হয়েছে, অমর্ত-দিদিমা আর বিলাস-মাসিমা নেই, তেমনি এখানকার দলের মাতব্বর জনত্রিশেক রয়েছেন; বয়সে সবাই কাছাকাছি। এগিয়ে আসতে আসতে লাহিড়ী-দিদিমাদের তিনজনের গতি বিস্ময়ে মন্থর হ'য়ে আসছিল, বেশ বোঝা যায়, হুজুগটা কমে গেছে, তবে ওপাড়ার উদীয়মান কবিরাজ আমিই যে এ-পাড়ায় এসে নূতন-রূপে আসর জমিয়ে বসেছি এটা আন্দাজ করতে পারেননি। থমকে দাঁড়ালেন সামনে এসে। লীডার হিসাবে লাহিড়ী-দিদিমারই প্রশ্ন করার কথা, কিন্তু তিনি যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। প্রশ্ন করলেন সাতকড়ি-মাসিমা—

"আমাদের শৈল না? তোর এ-দশা কেন বাবা? আমরা সেখানে তোর মামিদের জিজ্ঞেস করে উত্তর পাই না....."

"দেবে উত্তর?"

—ফোঁস করে উঠলেন লাহিড়ী-দিদিমা। মুখে ভাষা ফিরে এসেছে।

বেশ সিধে চালেই আসছিলেন—ভারী, শরীরে যতটা সম্ভব—সেইজন্যে চিনতেও ভুল হয়েছিল আমার; হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে ডান হাতে হাঁটুটা আগের মতো চেপে ধরে নাক-মুখ সিঁটকে বললেন—"কম শয়তানের দল! —ওরা ভাঙবে ভেতরের কথা? ভালো কবরেজ ব'লে চালিয়ে শেষে কিনা এক বন্ধ পাগলের ওষুধ ব্যাভার করিয়ে.....উঃ, ঐ আবার টিস্ মারছে গো!—ঐ!—ঐ! তোরা যাবি, না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরণ দেখবি এই আষাটায় আমার?...ঐ গো! উঃ!..."

ঘুরে দল নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগুলেন শহরের পানে।

আর চালাতে পারিনি দিনকতক তো এই দারুণ অপরাধের স্খালন কি করে হবে সেই দুশ্চিন্তাতেই কাটল ভয়ে ভয়ে। তারপর বৈজ্ঞানিক হওয়ার দুরাশা আর উদয় হয়নি মনে কখনও।

চুল সম্বন্ধে
কি খুব
চিন্তিত?

লক্ষ্মীবিলাস আপনার
সকল সমস্যার
সমাধান করবে।

লক্ষ্মীবিলাস
তৈল

এম. এল. বসু এণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস :: কলিকা. তা—৯

# ইউরোপের জিপ্‌সি সমাজ

**দিলীপ মালাকার**

মধ্যযুগ হতে ইউরোপে পরিচিত জিপ্‌সি-সমাজ। তার আগে এদের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। মধ্যযুগ হতে একালের বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজে হয়েছে কত ওলট-পালট। কত তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। কিন্তু ইউরোপে জিপ্‌সি-সমাজের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নিং এখানেই বোধহয় জিপ্‌সি-সমাজের বিশেষত্ব। গত পাঁচশ বছরে জিপ্‌সিদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলনেও বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়নি।

জিপ্‌সিরা ইউরোপে বহুনামে পরিচিত। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে তাদের পরিচয় শিগান বলে। কখনো তাদের বলা হয় বোহেমিয়ান বলে। চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি প্রদেশের নামই বোহেমিয়া। বোহেমিয়ান মানে ভবঘুরে। পশ্চিম ইউরোপে এরা পরিচিত 'জিতান' নামে। ইংরেজদের দেশে এরা জিপ্‌সি বলে পরিচিত। কিন্তু জিপ্‌সিদের ভাষায় তারা 'রোম' ও 'মানুষ'। 'রোম' শব্দটি নাকি হিন্দি থেকে এসেছে। এদের ভাষায় 'রোম' হচ্ছে পুরুষ আর 'রোমানি' (সং রমণী) স্ত্রী। মানুষ মানে আমাদের ভাষায় যা তাই। এদের ভাষায় প্রচুর হিন্দি, রাজস্থানি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ফলে এখনকার জিপ্‌সি ভাষা একটা জগাখিচুড়ি। গ্রীক, হিন্দি, রাজস্থানি, শ্লাভ ভাষা, স্প্যানিশ শব্দ মিশিয়ে জিপ্‌সি ভাষার বর্তমান রূপ। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে আমি জিপ্‌সিদের দেখেছি অনেকটা আমাদেরই মতন দেখতে। তাদের ভাষায় প্রচুর ভারতীয় শব্দ। আমি বুলগারিয়ার অনেক জেলায় ও গ্রামে জিপ্‌সিদের দেখেছি যাদের ওরা বলে শিগান্‌, তাদের দেখলে মনে হবে যেন তারা উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থান থেকে সদ্য এসেছে। চেহারা পোশাকে রয়েছে রাজস্থানি ভাব। ওরা যখন কথা বলে তখন কতক শব্দ বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারি। এদের একজন সম্পূর্ণ অচেনা আত্মীয়ের মতন আলাপ জুড়ে দিল। এখনও এরা চুলকে বলে 'কালে', সূর্যকে বলে 'দেউ', চোখকে 'আঁখ', স্ত্রীকে 'রামনি' এমনি আরও কত কথা। বুলগারিয়ার শিগানরা এখনও অনকোরা রয়েছে। ওদের মধ্যে আবার অনেক সামাজিক দলাদলি চলে। এক একটি উপজাতি অন্যের থেকে পৃথক। ভারত থেকে যারা এসেছে তাদের কথাবার্তায় বোঝা যায়। আরেক দল আসে ইরান-তুর্কি থেকে। এদের বলে আসে গ্রীস হয়ে। তাই এদের ভাষায় গ্রীক ভাষার প্রাধান্য। এদের এবং ভারতীয় দলের একাংশ যায় উত্তর আফ্রিকা হয়ে স্পেনে। স্পেন থেকে এরা যায় বৃটেনে, একদল আসে ফ্রান্সে। ফ্রান্সে ও জার্মানীতে যে-সব 'জিতান' বা জিপ্‌সি আছে তাদের অর্ধেক এসেছে স্পেন থেকে, আর অর্ধেক পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গারি থেকে।

আমি হাঙ্গারি ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় শিগানদের দেখেছি মিশ্রিত চেহারায়। এরা একেবারে ফর্সা নয় আবার ভারতীয়দের মতন

স্পেনীয় জিপ্‌সি মেয়ে

তামাটেও নয়। এদের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ হওয়ায় এরা অন্য রকমের হয়েছে। বুলগারিয়ান শিগানদের মতন নয়। হাঙ্গারিয়ান জিপ্‌সিদের অধিকাংশ এখন নাইট ক্লাবে কাবারে ও সঙ্গীত-আসরে বাজনা বাজিয়ে থাকে। বিশেষ করে বেহালা। 'শিগানার অর্কেস্ট্রা' শুধু হাঙ্গারি নয় সমগ্র মধ্য ইউরোপ জুড়ে খ্যাত।

বছর কয়েক আগে বুদাপেস্তের 'এস্টোরিয়া' হোটেলের রেস্তোঁরায় খাচ্ছি। আমাদের টেবিলের সামনেই বাজাচ্ছিল একদল জিপ্‌সি 'শিগানার অর্কেস্ট্রা'। আমায় দেখেই ওরা অতি সহজে চিনতে পারে আমি ভারতীয়। ওদের মধ্যে দু'জন ছিল একেবারে উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থানের অধিবাসীদের মতন দেখতে। দোভাষীর মাধ্যমে তারা এসে আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। তারা বলছিল যে, তাদের পূর্বপুরুষরা নাকি এসেছে ভারতবর্ষ থেকে। তবে অধিকাংশ ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিশে গেছে। তাদের দেখে চেনা যায় না বটে, কিন্তু অনেকেই তাদের পুরোনো সংস্কৃতি ও ভাষা বজায় রেখেছে। আমাদের খাবার টেবিলের সামনে যে-সব জিপ্‌সি বাজনা বাজাচ্ছিল তাদের অনেকেই কিন্তু খাঁটি ইউরোপীয়দের মতন দেখতে। তারাও নাকি জিপ্‌সি। তবে তাদের মধ্যে যারা দেখতে ভারতীয়ের মতন তারাই আমার সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মতন আলাপ জুড়ে দেয়। তারাই বলছিল যে, এতক্ষণ তারা যা বাজাচ্ছিল তাকে হাঙ্গারিয়ানরা 'শিগান' সঙ্গীত বলে বটে, কিন্তু আসল জিপ্‌সি বাজনা তারা সাধারণত বাজায় না। আমাকে খুশী করার জন্যে তারা সত্যিকারের শিগান সঙ্গীত বাজিয়ে শোনাল। শুনে মনে হল যেন আমি উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান বা পাঞ্জাবের লোকসঙ্গীত শুনছি। এদের বাজনার সুর ও তাল অনেকটা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের মতন। এদের আদি নিবাস যে ভারতবর্ষে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বুলগারিয়ায় এমন কোনো শহর দেখলাম না যেখানে একটা দুটো জিপ্‌সি বা শিগান নেই। মেয়েদের চেনা যায় সহজে তাদের পোশাকে। তরুণী ও যুবতীদের দেখলে মনে হবে যেন ওরা পাঞ্জাব, রাজস্থান বা কাশ্মীর থেকে এসেছে। মেয়েরা এখনও খোঁপায় ফুল গোঁজে বা কখনো ফুলের মালা। পুরুষগুলো ইউরোপীয় পোশাক পরে বলে অনেক সময় তাদের চেনা যায় না।

বুলগারিয়ার রিলা পাহাড়ে রয়েছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'অর্থডক্স' খৃষ্টানদের মঠ। মঠটার বয়স হবে আটশ বছর। ওখানে এখন টুরিস্টদের বেজায় ভিড়। আমিও সেখানে দিন চার ছিলাম। সেখানে দেখি এক শিগান মঠের প্রধান গেটের কাছে বসে টুরিস্টদের জুতো পালিশ করছে। যে বাক্সটার ওপরে টুরিস্টদের পা-সুদ্ধ জুতো পালিশ করছিল সেই বাক্সের দুই ধারে দুই ফটো লাগান।

জিপ্‌সিদের মধ্যে রয়েছে অনেক সম্প্রদায়। একের সঙ্গে অন্যের নেই মিল। বুড়োরা আজও তাদের সেই পুরোনো আচার-সংস্কৃতি পালন করে। কোথাও এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চায় না। আজ এখানে কাল ওখানে এই করে। কিন্তু তরুণ ও শিশুদের শিক্ষার ভার নিয়েছে বুলগারিয়ান সরকার। তার মতন অনেক শিক্ষিত যুবক যে কোনো বৃত্তি গ্রহণ করে সভ্য-ভব্য হয়েছে। অধিকাংশ জিপ্‌সি এখনো সেই পুরোনো অবস্থায় রয়েছে। ওদের জন্যে বুলগারিয়ান সরকার অনেক প্রচেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু সবই ব্যর্থ প্রায়। তবে তরুণ ও যুবকরা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সেটা আমি লক্ষ্য করেছি। হাঙ্গারী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডেও সেই অবস্থা। বুড়ো জিপ্‌সীদের নিয়ে মহা সমস্যা। এরা তাদের পুরোনো ভবঘুরে জীবনাভাব ত্যাগ করতে চায় না।

জিপ্‌সিরা এক দেশ থেকে আরেক দেশে অনবরত ঘুরে বেড়ায় বলে মধ্যযুগে ইউরোপময় ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। জিপ্‌সিদের দেশ-বিদেশে যথেচ্ছভাবে ভ্রমণ ও নাগরিকত্ব যাতে বন্ধ হয় তার জন্যে ইংলণ্ডে এক আইন পাশ হয় ১৩৯৯ সালে আর স্পেনে ১৪৯২ সালে। এই দুই দেশের আইন প্রণয়নে বোঝা যায় যে, তাদের ভয় ও ঘৃণা ছিল অ-ইউরোপীয় জাতি সম্পর্কে। ইউরোপের অনেক রাষ্ট্র জিপ্‌সিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না কোনোদিন। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞী মারি থেরেসা ১৭৬১ সালে নতুন আইনবলে অষ্ট্রিয়ায় জিপ্‌সি-সন্তানদের কেড়ে নিয়ে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার হুকুম দেন। ১৭৮২ সালে অষ্ট্রিয়ায় আরেক আইন প্রয়োগ করে প্রায় জিপ্‌সি উচ্ছেদ করার যোগাড় হয়। আইনের প্রধান বক্তব্য ছিল এই : যারা সৎ উপায়ে জীবিকানির্বাহ করে না তাদের নিশ্চিহ্ন করা উচিত। ফলে অনেক শিশুদের প্রাণ যায়। এমন সব অদ্ভুত আইন পাশ হতে থাকে ইংলণ্ডে, স্পেনে, জার্মানীতে ও রাশিয়ায়। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিনের আমলে শিগান-দের ক্রীতদাস হিসেবে গণ্য করা হত। তাদের নিয়ে ইউক্রেনিয়া ও ক্রিমিয়া অঞ্চলে চাষ-বাসের কাজে লাগান হয়। তার পরবর্তী ইতিহাসও তেমনি রোমাঞ্চকর। পূর্ব ইউরোপের সোস্যালিষ্ট দেশ ছাড়া আর কোথাও জিপ্‌সিদের নাগরিক অধিকার নেই (তারা সেখানে ভবঘুরে বলে পরিচিত)।

এক ফ্রান্সেই দুই লাখ জিপ্‌সির বাস। প্যারিসের কাছে রোম্যাঁ ভিল ও ম'রই-এ দেখেছি জিপ্‌সি বা জিতানদের ছাউনি। ওরা ওখানে হয় মজুরের কাজ, কারখানার শ্রমিকের কাজ, মৃত্তিকাশিল্পের কাজ, নয় তো তামার ঘটি-বটি তৈরির কাজ করে থাকে। মেয়েদের অনেকে হাত-দেখা ও তুকতাকের কাজ করে প্যারিসে। প্যারিসের অনেক জনবহুল পাড়ায় কাফেতে দেখা যাবে জিপ্‌সি রমণী হাত দেখছে। এতে এদের রোজগার। ফরাসী জিপ্‌সিদের সমিতিও আছে। আছে এদের মাসিক পত্রিকা। পত্রিকায় নাম 'লা ভোরা মন্দিয়াল শিগান' (আন্তর্জাতিক শিগান মুখপাত্র)। এদের সমিতির সভাপতির নাম বইদা বুবুদ। দক্ষিণ ফ্রান্সের স্যাঁৎ মারি দ্য লা ম্যার'-এ প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে বসে ইউরোপীয় জিপ্‌সিদের সভা। ফ্রান্স ও স্পেনের অধিকাংশ জিপ্‌সি এখন খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী। তারা আসে স্যাঁৎ মারি দ্য লা ম্যার-এ তীর্থযাত্রা করতে। যিশুখৃষ্টের মাতা মেরি হল জিপ্‌সিদের আরাধ্যা দেবী। তার উৎসবে এরা গান গেয়ে, গীটার বাজিয়ে যে শোভাযাত্রা বের করে তা সত্যি দেখবার মতন। আমি ওখানে দেখেছি জিপ্‌সিদের শোভাযাত্রা। তাদের ভাষায় কিন্তু খৃষ্টের বন্দনা। তাঁকে ঘিরে তাদের চলে সপ্তাহখানেক উৎসব পালন। সেই সঙ্গে চলে জিপ্‌সি সঙ্গীত ও গীটার বাজনার প্রতিযোগিতা।

ফ্রান্সে এখনও অধিক সংখ্যক জিপ্‌সী বাস করে দেখেছি কারাভান বা চলন্ত গৃহে। এখন আর তাদের ঘর ঘোড়ার টানে না। টানে মোটরগাড়ীতে। অনেকে বাস করে তাঁবুতে।

জার্মানীতে আমি জিপ্‌সীদের চিহ্ন দেখতে পাইনি। জার্মানরাই বলেছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার বাহিনী পাঁচ লাখ জিপ্‌সীদের হত্যা করে। অপরাধ তারা জার্মান নয়। জার্মান জাত নয় বলে। যেমন ইহুদিরা। যুদ্ধের পরে জিপ্‌সীদের জার্মানী প্রবেশ বন্ধ করা হয়েছে। তামাটে রঙের জিপ্‌সীদের এখন জার্মানীতে বাস করা নিষিদ্ধ।

স্পেনে জিপ্‌সীদের দেখেছি অন্য রকমের। একালের স্প্যানিশ সঙ্গীত নিয়ে যাঁরা গর্ব করেন তাঁরা জেনে রাখুন যে, স্প্যানিস নৃত্য ও গানে পূর্ণ প্রভাব রয়েছে জিপ্‌সীদের। জিপ্‌সীদের নাচে ভারতীয় নাচের তাল অনুভব করা যাবে অনায়াসে। জিপ্‌সী সম্প্রদায় এখনও স্পেনে বেশ প্রভাবশালী। কারণ স্পেনে ষাঁড়ের লড়াই জাতীয় ক্রীড়া। এই ষাঁড়ের লড়াই-এ যে কজন বিখ্যাত যোদ্ধা তারা সবাই জিপ্‌সী। এরা এখনও তাদের ধর্ম ও গোঁড়ামি পালন করে চলে।

জিপ্‌সী-সমাজে বিয়ে-থা হয় তাদের মধ্যেই। ছেলে-মেয়ের বিয়ে ঠিক করে তাদের বাবা-মা। মেয়েকে ও মেয়ের বাপকে প্রচুর যৌতুক ও উপঢৌকন দিয়ে তবে বিয়ে করা যায়। তাই ভাবী স্বামীদের দিনরাত খেটে সেই অর্থ জোগাড় করতে হয়।

জিপ্‌সী-সমাজ, জিপ্‌সী জীবন ও প্রেম নিয়ে একটি ছবি কিছুদিন হল তোলা হয়েছে ফ্রান্সে। ছবিটার নাম 'ক্লিশ রোমানি'। ছবিটিতে অভিনয় করেছে প্যারিসের কাছের জিপ্‌সীর দল। এদের নিজেদের বিচারালয়ে হয় বিচার। এদের মধ্যেও আবার আছে জাত-বাতের বিচার। এদের সম্প্রদায়ের নেতার কথা এরা এক বাক্যে শোনে। নেতার মৃত্যুর পর নির্বাচিত হয় আরেক নেতা। সে সব নাকি হয় স্বপ্নাদিষ্ট।

ফ্রান্স ও স্পেনের জিপ্‌সীদের দেখলে চেনা যায় না যে এরা এককালে ছিল ভারতীয়। তবে এদের ভাষায় বোঝা যায়। এদের অনেকে এসেছে উত্তর আফ্রিকা থেকে। তাই এদের মধ্যে আরবি শব্দের চলন। উত্তর আফ্রিকায় আরব ও আফ্রিকান সভ্যতায় মিলন ঘটেছে। সুতরাং উত্তর আফ্রিকাগত জিপ্‌সীরা অনেকগুলো সংস্কৃতির মিলনে গঠিত। তাই তাদের ওপর অনেক সংস্কৃতির প্রভাব। এদের এক-একটি সম্প্রদায় এক এক রকমের ধর্ম পালন করে। তেমনি ভাষা।

পশ্চিম ইউরোপে জিপ্‌সীদের সামাজিক উন্নয়নকল্পে কোনো প্রচেষ্টা আমি দেখিনি। পূর্ব ইউরোপে সোস্যালিষ্ট দেশে দেখেছি এদের পরিবর্তনের দৃশ্য। পশ্চিম ইউরোপে এখনও জিপ্‌সীদের দেখা হয় সেকালের সার্কাস খেলোয়াড়, সঙ্গে নাচানো বা জন্তু নাচানোর খেলোয়াড়, হাত-দেখা বা জোচ্চোর বলে। ভারতেও তাই। ভারতে জিপ্‌সীরা পরিচিত বেদে বা সাপুড়ে বলে। তাদের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে?


হাঁপানী

রোগী হতাশ হইবেন না। রোগাক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিনা বিশ্রামে সহজে সম্পূর্ণ নিরাময় নিশ্চয় সম্ভব। পুনরাক্রমণের আশঙ্কা নাই। ব্যয় অত্যল্প। চিকিৎসাহতাশ যক্ষ্মা ও হাঁপানী রোগীরা আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানার্জিত ক্ষমতায়, সহস্রজনের রোগমুক্ত পত্রগুলি চাক্ষুষ পরীক্ষা ও পরামর্শের জন্য যোগা-যোগ করুন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধা জমাট কুয়াশা মুছিয়া যাইবে আপনার মন থেকে। ফলাফল সঙ্গে সঙ্গেই যক্ষ্মা ও হাঁপানীর জীবাণু কাবু করিয়া সকল উপ-সর্গের অবসান ঘটায়। আহারে রুচি আনে, ক্ষুধা বাড়ায়। রক্ত, শক্তি, ওজন বৃদ্ধি করে, ফুসফুস ক্ষয়মুক্ত হয়। ফুসফুসে পুনরাক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দান করাই চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য। ব্যয় ১২ দিনে ৯৷৷০ টাকা, ২৪ দিনে ১৮৲ টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

শ্রদ্ধা চিকিৎসালয়
কবিরাজ ডি, এন, সরকার
২৩, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
ফোন : ২৪-১০৫৪

# দেওয়া নেওয়া

পরিমল গোস্বামী

• একটি মিশ্র মনস্তত্ত্বের পরিস্থিতি—লজ্জা, আত্মধিক্কার, ক্রোধ ইত্যাদির অপূর্ব মিলন।

ভূপেশবাবু মহা উত্তেজিত। তাঁর গিন্নি আরও।

স্ত্রীর কাছে স্বামী যে কত অসহায় তা এই মুহূর্তে আরও একবার প্রমাণিত হচ্ছে। গিন্নির সুর যেমন চড়া তেমনি ধারালো।—একশবার বলেছি, তুমি শুনলে না। ট্যাক্সির নম্বরটা পর্যন্ত নাওনি।

ভূপেশবাবু অস্থিরভাবে পাইচারি করছেন আর বলছেন, ব্যাগটা আমার হাত থেকে নিলেই পারতে জোর করে।

আহা, কি নীতিকথাই শোনাচ্ছ এখন। তোমার উপর জোর খাটাব? বলি আমার ঘাড়ে কটা মাথা আছে শুনি? তোমার বুদ্ধির উপর আমি কথা বলব? তবেই হয়েছে। তবু বলেছিলাম, পৈ-পৈ করে বলেছিলাম ব্যাগটা তোমার কাছে রেখো না, ট্রাঙ্কে রাখ। তখন কত বড় বুদ্ধিমান সাজলে। বললে, ট্রাঙ্ক নিয়ে স্টেশনের কুলিরা সরে পড়ে, নিজের হাতে থাকলে হারাবার ভয় নেই। অথচ সে ট্রাঙ্কে আমার যে সব গয়না আছে তার বুঝি দাম নেই?

সে কথাটা মনেও এলো না তখন। এখন তিন হাজার টাকার জন্য বসে বসে হায় হায় কর।

ভূপেশবাবুর সমস্ত গা কাঁপছে। তিনি গিন্নির কথার উত্তরে কি বলতে গেলেন, গলা দিয়ে কোনো কথা বেরোল না, যা বেরোল তা শুয়োরের মতো গোঙানিতে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ মাত্র।

বলি, একেবারে • বাক্যহারা যে! কিছু বলবে, না আমিই চেঁচাব বসে বসে?—নিজের দোষটা কি—

কথাটা শেষ হ'ল না। দরজায় জোর কড়া-নাড়ার শব্দ হ'ল, এবং অত্যন্ত বিরক্তভাবে ভূপেশবাবু গিয়ে দরজা খুলেই হঠাৎ চমকে উঠলেন। সামনে ট্যাক্সিচালক।

ট্যাক্সিচালক তার হাত থেকে ব্যাগটি ভূপেশবাবুর হাতে দিয়ে বলল, এই ব্যাগটি আপনিই ফেলে গিয়েছিলেন ট্যাক্সিতে, ফেরৎ দিয়ে গেলাম।

ভূপেশবাবু কি বলতে গেলেন, কিন্তু গলা থেকে ময়ূরের মতো শুধু একটি অর্থহীন কেকাধ্বনি নির্গত হ'ল।

গত আধঘণ্টা ধরে তিনি অসহ্য মানসিক গ্লানি ভোগ করছিলেন, থানায় টেলিফোন ক'রেও ফল হয়নি, বরং উল্টে গাল খেয়েছেন ট্যাক্সির নম্বর বলতে না পেরে। ঠিক এমনি এক দুর্দান্ত মানসিক সংকটের সময় ট্যাক্সি-ড্রাইভার ব্যাগটি ফিরিয়ে দিল।

বাড়িতে আনন্দ কোলাহল প'ড়ে গেল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলল, এবারে আসি?

সে কি কথা—ব'লে ভূপেশ-গিন্নি এগিয়ে এসে বললেন, একটুখানি না ব'সে যেতে পাবে না। তোমার নামটি কি ভাই?

অজিত চৌধুরী।— সংক্ষিপ্ত জবাব। অজিত চৌধুরী বুঝতে পারল, কিছুক্ষণ না ব'সে উপায় নেই।

ভদ্রলোকের ছেলে। খুব ভাল লাগল ভাই তোমার স্বভাব দেখে। এমন কর্তব্যজ্ঞান আজকাল আর নেই। তুমি একটুখানি ব'সে যাবে। কিছু মিষ্টিমুখ না ক'রে যেতে পাবে না। আমি এখুনি আসছি।

কিছু জলযোগের ব্যবস্থা হ'ল।

ইতিমধ্যে ভূপেশবাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে খবরের কাগজের অফিসে ফোন ক'রে দিয়েছেন। এই সততার খবরটা প্রকাশ করলে তিনি কৃতজ্ঞ হবেন। করবেন কি দয়া ক'রে?

বার্তা সম্পাদক শুনে বললেন, দয়া ক'রে মানে কি মশায়, এই রকম খবরই তো চাই। নিশ্চয় ছাপব। আমি এখুনি রিপোর্টার পাঠাচ্ছি, ফোটোগ্রাফও তুলে আনবে। বছরে এমন ঘটনা একটার বেশি পাওয়াই যায় না। আপনি ড্রাইভারকে যেমন ক'রে হোক ঠেকিয়ে রাখুন, মিনিট দশেকের মধ্যে জীপে করে রিপোর্টার গিয়ে পৌঁছবে।

অজিত ইতিমধ্যে কিছু মিষ্টি খেয়ে চায়ে মুখ দিয়েছিল। এমন সময় ভূপেশ-বাবু এসে তার পাশে ব'সে বর্তমান কাল সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করলেন। তারপর পকেট থেকে দুখানা একশ টাকার নোট বার করে তার হাতে দিতে যেতেই অজিত এক লাফে উঠে পড়ল।

ভূপেশবাবু অজিতকে জানলে এমন কাজ করতেন না। কারণ অজিত আদর্শবাদী আধুনিক যুবক। তার গোঁফজোড়াও আধুনিকতার সঙ্গে (এবং আদর্শবাদের সঙ্গে) মিলিয়ে সরু রেখার মতো দুদিকে বিস্তৃত।

ভূপেশবাবুর পুরস্কার দেবার চেষ্টা দেখে, বলল মাপ করবেন। টাকার লোভ থাকলে ব্যাগ ফিরিয়ে দিতাম না।

তোমার সততা দেখে খুশি হয়েছি, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছি, তার একটা চিহ্ন থাকবে না? সামান্য টাকা— তুমি আমার এমন উপকার করেছ।

অজিত দৃঢ়স্বরে বলল, আমি যা করেছি তার জন্য পুরস্কার নেওয়া আমি পছন্দ করি না। ভদ্রতার খাতিরে কিছু মিষ্টি এবং চা খেয়েছি। এবারে আমাকে উঠতে হবে। গাড়ি বসিয়ে রাখা মানে অনেক লোকসান।

ভাই, এটা উপকারের একটা প্রতিদান। অবশ্য খুবই সামান্য।

অজিত ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, উপকার তো আমি আপনাদের হাওড়া থেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েও করেছি, এবং তা ক'রে আমার যা ন্যায্য পাওনা তা আমি আদায় ক'রে নিয়েছি। কিন্তু তারপরে যা করেছি তার জন্য কোনো দাম নেওয়ার আমি কোনো নির্দেশ কারো কাছ থেকে পাইনি। আর এটা আমার ব্যবসাও নয়।

তবু অনুরোধ করি—

না। আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে আর অনুরোধ করবেন না— বলতে বলতে অজিত বাইরের দিকে পা বাড়াল। ভূপেশ-বাবুও নাছোড়। তিনি একদিকে স্ত্রীর কাছে ছোট হয়েছেন, অন্যদিকে অজিতের কাছে। এই দুটি মারেই তিনি যেমন কাবু হয়েছেন তেমনি মরীয়া হয়ে উঠেছেন। অজিতকে তিনি পুরস্কার নেওয়াবেন ব'লে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন।

অজিত বাড়ির বাইরে পা বাড়াবামাত্র খবরের কাগজ থেকে জীপগাড়ী ছুটে এসে দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ওদের পথ রোধ করল। রিপোর্টার অনিল ক্যামেরা ঘাড়ে এক লাফে নিচে নামতেই ভূপেশবাবু তাকে রিপোর্টার ব'লে চিনতে পেরে বললেন, এই যে রিপোর্টারমশায়, ইনিই ট্যাক্সি-ড্রাইভার, অজিত চৌধুরী এঁর নাম—এই যুবকটিই আমাকে ব্যাগ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

রিপোর্টার অনিলের সকল কাজ বিদ্যুৎ-গতি। আপনি এক আশ্চর্য লোক অজিত-বাবু, আমি আপনার ছবি তুলব, রিপোর্ট ছাপব। ট্যাক্সি-চালকের সততার মস্তবড় বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে।

কিন্তু অজিতের এক কথা। আমি এর মধ্যে নেই মশায়—ব'লে অজিত ওঁদের ঠেলে বেরিয়ে এলো।

ইতিমধ্যে বহু লোক এসে জুটেছে জীপ দেখে। তারা কিছু না জেনে এসে ভিড় করেছে, এবং যাই হোক, তাদের উপভোগে বাধা হবে না, এমনি তাদের মনোভাব। অজিত তাদের ঠেলে এগোতে লাগল। জনতাও তার পিছনে। রিপোর্টার অনিলও পিছনে। সে চটপটে লোক, কাজ ছাড়া এক সেকেণ্ড সে থাকে না।

এ পর্যন্ত এক রকম ছিল, কিন্তু এরপর থেকে ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে উঠতে লাগল।

তার মানে অজিত তার ট্যাক্সি ফেলে দৌড়তে আরম্ভ করল এবং অনিলও ছুটল তার পিছনে। সে কাজ করতে এসেছে কাজ ক'রে চলে যাবে, সোজা কথা। তার হাত থেকে অজিতের মতো যুবক ছাড়া পাবে, এ তার কল্পনার বাইরে। এ তার পরাজয়।

ভিড়ের লোকেরা কিছুই বুঝতে পারছে না। বাইরে থেকে চেহারা দেখে অপরাধী কিনা বোঝা যায় না, পোষাকও অপরাধীর মতো নয়। অবশ্য ছদ্মবেশও হ'তে পারে ওটা। তবে যাই হোক, মজাটা সমানই মনে হচ্ছে। একজন মন্তব্য করল, চোরেরাই আজকাল ভদ্রলোক সেজে থাকে বেশি।

প্রায় দু মিনিট ছুটে অজিত একটি খোলা দরজা পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। জনতা হতবুদ্ধি, অনিলও তাই।

অজিত আর কাউকে ভয় করুক না করুক খবরের কাগজকে খুব ভয় করে, বিশেষ করে রিপোর্টারকে। নইলে এই দুর্বুদ্ধি তার হত না। না ছুটে সোজা ট্যাক্সিতে বসে ট্যাক্সি চালিয়ে দিত। আত্ম-প্রচারের বিরোধী সে। তার ট্যাক্সিখানা ভূপেশবাবুর বাড়ির সামনে দূরে একটি খোলা জায়গা ছিল, সেইখানে রেখে এসে-ছিল। অত দূরে রেখেছিল কি মনে ক'রে তা সেই জানে।

এ দিকে কলকাতার দুর্লভতম বস্তু খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে তিন-চারজন লোক ছুটে এসেছিল, কিন্তু দৌড়ে যে প্রথম হয়েছে, সে সোজা গিয়ে উঠে বসেছে ভিতর। ড্রাইভার এলে সে যাত্রী হবে, এই আশা। কিন্তু তার ইচ্ছার বিপরীতটাই


# রাজ জ্যোতিষী

বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ, হস্ত-রেখা বিশারদ ও গভর্ণমেণ্টের বহু উপাধিপ্রাপ্ত রাজ-জ্যোতিষী পণ্ডিত ডঃ হরিশ্চন্দ্র শাস্ত্রী

হাউস অব্ এষ্ট্রোলজি

ফোন ৪৭-৪৬৯৩

৪৫এ, এস পি মুখার্জী রোড, কলিঃ-২৬।

যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা কোপিত গ্রহের প্রতিকার এবং জটিল মামলামোকর্দ্দমায় নিশ্চিত জয়লাভ করাইতে অনন্যসাধারণ। তিনি প্রশ্ন গণনায়, করকোষ্ঠী নির্মাণে ও জটিল কুররোগ আরোগ্য করাইতে অদ্বিতীয়। নানা দেশের মনীষিগণ উপকৃত হইয়া অযাচিত প্রশংসাপত্রাদি দিয়াছেন।

**সদা ফলপ্রদ কয়েকটি জাগ্রত কবচ।**

**শান্তি কবচ**—পরীক্ষায় পাশ, মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি সর্ব দুর্গতি নাশক, সাধারণ—৫৲, বিশেষ—২০৲।

**বগলা কবচ**—মামলায় জয়লাভ, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সর্ব কার্য্যে যশস্বী হয়। সাধারণ—১২৲, বিশেষ—৪৫৲।

**সাম্বৎসরিক রত্ন** (বাংলা)

পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত। হস্তরেখা জানিবার শ্রেষ্ঠ বই। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত • ২য় সংস্করণ—৬৲ টাকা।

**হ্যুয়েল অব পামিস্ট্রী** (ইংরাজী) ৭৲ টাকা।

ঘটল। কারণ তাকে ট্যাক্সিতে ব'সে থাকতে দেখে অনিল তাকে নানা রকম জেরা করতে আরম্ভ করেছে।

কেউ ভাবছে ডাকাতের গাড়ি, কেউ ভাবছে খুনের। বলাবলি করছিল তারা। ভিতরের যাত্রীটি ভয়ে বেরিয়ে এলো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্য দিক থেকে আর একজন উঠে বসল ভিতরে। ট্যাক্সি এখন তার দখলে।

অজিত সেই যে ঢুকেছিল অপরিচিত বাড়িতে, সেখানেই লুকিয়ে ছিল, এতক্ষণে বেরিয়ে এলো। আর কোনো উপায় নেই। বেরিয়ে এসে দেখে তার ট্যাক্সির কাছে সবাই এসে জুটেছে। অতএব তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল, সে প্রায় হেরে গেল।

হৈ হৈ ব্যাপার। ভূপেশবাবুও বেরিয়ে এসেছেন ট্যাক্সির কাছে। তখনও তাঁর আশা আছে টাকাটা অজিতকে দিতে পারবেন। ফোটো তুলতে দিলে এটাও অস্বীকার করবে না হয়তো।

অনিল গিয়ে এবারে অজিতকে আগলে দাঁড়াল। বলল, দাঁড়ান আগে ফোটোটা তুলে নিই—ব'লে ক্যামেরার ফোকাস্ করতে লাগল।

অজিত এক হাতে মুখ আড়াল ক'রে অনিলকে বলল, শুনুন শুনুন, আপনি ভেবেছেন কি? আমার গোটাকত প্রশ্নের জবাব দিন আগে। আমাকে অন্য সব ট্যাক্সি-চালক থেকে আলাদা ক'রে দেখছেন কেন? অন্য সব মানুষদের থেকেও বটে। কিন্তু কেন? আপনি আমাদের কাছ থেকে কি ব্যবহার পাবার আশা করেন?

অনিল হঠাৎ ক্যামেরা থেকে চোখ সরিয়ে সে চোখ অজিতের চোখে নিক্ষেপ করল। কি আশা করি?—এই আশা করি যে আপনারা চুরি করবেন। যাত্রীর ভুলে ফেলে-যাওয়া কোনো জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবেন না।

কেন?

কেন? দেখুন অজিতবাবু, আজ বিশ হাজার বছরের সভ্যতার ফলে যে জিনিস গ'ড়ে উঠেছে সেটা কি, তা কি এখনও বুঝতে পারেন নি? জানেন না সেটা কি?

না।

এত দিনের সভ্যতার ফলে কোটি কোটি লোক চোর হয়েছে। আর আপনি তার মধ্যে হঠাৎ একটি ব্যতিক্রম। আপনি সেই ঐতিহ্য ভাঙতে চান?

শুনুন রিপোর্টারমশায়, তাই যদি হয় তবে আমি একা কেন, এ রকম ব্যতিক্রম তো আগে হয়েছে, আপনারাই তা ছেপেছেন। কিন্তু তাতে কি লাভ হ'ল আপনাদের?

অনিল যেন চমকে উঠল কথাটা শুনে। লাভ! লাভের কথা কে বলেছে? এ ধরনের খবর ছাপা তো একটা স্টান্ট। কাগজে এক-ঘেয়ে চুরির কথা প'ড়ে প'ড়ে লোকে বিরক্ত হয়। মাঝে মাঝে তার উল্টো খবর ছাপতে পারলে ওরই মধ্যে একটা বৈচিত্র্য বাড়ে। তার বেশি কিছু না। আমি রিপোর্টার, আমার কাজ নতুন খবর সংগ্রহ করা।

অজিত বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

কিন্তু অনিল ততক্ষণে ক্যামেরা আবার চোখে তুলে ধরেছে।

অজিত বলেই চলেছে, আমি যা করেছি তা মানুষের সাধারণ একটি ধর্ম।

অনিল আবার চোখ থেকে ক্যামেরা সরিয়ে বলল, ও সব বাজে তত্ত্বকথা ছাড়ুন, ভাই। আপনার ছবি কাগজে বেরোবে, সততার খবর বেরোবে, এটাতেই আপাতত রাজি হয়ে যান। বড় বড় কথা আপনার মনেই থাক।

অসহায়ের মতো অজিত দাঁড়িয়ে রইল ভিড়ের মাঝখানে। তার মনে তার গড়া যাবতীয় আদর্শবাদ ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। কাউকে সে এত দিন গ্রাহ্য করেনি। বি-এ পাস ক'রে ট্যাক্সি-ড্রাইভার হয়েছে, বহু লোকের বাধা অগ্রাহ্য ক'রে। কিন্তু এখন সে অনিলের কাছে সম্পূর্ণ কাবু হয়ে পড়ল। ছুটতে তার পায়ে একটু চোট লেগেছিল সেইখানে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, ছবি আর খবর ছাপায় যদি সমাজের উপকার হয় মনে করেন, তবে যা হয় করুন, এবং আমাকে তাড়াতাড়ি মুক্ত ক'রে দিন।

অনিল এ কথায় হো হো ক'রে হেসে উঠল। হাসি যেন থামে না। বলল, আদর্শ-বাদ বুঝি ঢুকেছে মাথায়? বুঝতে পেরেছি। সমাজের উপকার হবে বৈকি, ভাই। সমাজ একটু মজা অনুভব করবে। আপনাকে বোকা বলবে। স্কুলের দু-একজন ছাত্র আপনার ছবি কেটে ডায়ারিতে এঁটে রেখে দেবে। এই পরিমাণ উপকার হবে সমাজের। এই কি কম?

ক্যামেরার মাথায় আলো জ্বলে উঠল দপ ক'রে—চোখ ধাঁধিয়ে দিল সবার। ক্লিক্ শব্দ হ'ল একই সঙ্গে। অনিল অজিতকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক লাফে জীপে উঠে পালিয়ে গেল।

অজিত যেন আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ট্যাক্সিতে উঠে ডান হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে বা হাত দিয়ে গিয়ার স্পর্শ করল। পিছনের যাত্রীটির কথা মনে পড়ল এতক্ষণে। স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞাসা করল কোন্ দিকে যেতে হবে?

ভূপেশবাবুর মনে আশা, ফোটো তুলতে দিয়েছে যখন, তিনি টাকাটাও দিতে পারবেন। অজিতকে বললেন, এবারে তা হ'লে—ব'লে পকেটে হাত দিলেন।

হাত পকেট ভেদ ক'রে বেরিয়ে এলো মুক্ত আকাশে।

পকেট নেই।

ইতিমধ্যে অজিত ও তার গাড়ি বহু দূর চলে গেছে। স্তম্ভিত ভূপেশবাবু চমকে উঠলেন। ঐঃ যা—গাড়ির নম্বরটা এবারেও নেওয়া হ'ল না।

আর একটি কল্পনায় আরও একবার চমকে উঠলেন। বাড়ি গিয়েই শুনতে হবে, 'আগেই বলেছিলাম'—

# সুখ

## নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—মাছ ধরতে চান? ওভাবে হবে না।

আমি চমকে উঠলুম। আমার ধারণা ছিল বিকেলের এই নির্জন মাঠে, এই ছোট নদীটার ধারে যেখানে একটুকরো পাথরের ওপর বসে আমি শান্ত স্বচ্ছ জলের ভেতরে ছিপ ফেলেছি, তার আধ মাইলের ভেতরে কোনো জনপ্রাণী নেই। না—ভুল বলা হল। দু-একটা গোরু চরতে দেখেছিলুম এদিক-ওদিক, আশপাশের কাঁটা ঝোপ-ঝাড় থেকে এক-আধটা শেয়ালও বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়, কিন্তু—

তাকিয়ে দেখলুম, পেছনে একটি মানুষ দাঁড়িয়ে। ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়েস, একটু বেশিমাত্রায় লম্বা বলে শরীরের ওপর দিকটায় অল্প একটু ভাঁজ পড়েছে। গায়ে আধময়লা হাফ শার্ট, পরণে ধুতি, পায়ে ধুলো-মাখা রবারের জুতো। কালো ফ্রেমের চশমার ওপর পশ্চিমের রোদ পড়ে মনে হচ্ছিল চোখ দুটো জ্বলছে আগুনের গোলার মতো।

ভদ্রলোক আবার বললেন, নতুন লোক নিশ্চয়। না হলে এ নদীতে ছিপ ফেলবার পণ্ডশ্রম কেউ করে না। কিছু পেলেন?

—ব্যাস-ব্যাস। যথেষ্ট পেয়েছেন। আজকের মতো খুশি হয়ে বাড়ী চলে যান। আর সত্যিই যদি দুটো-চারটে মাছ ধরতে চান, তাহলে রোমে এসে রোমান হতে হবে। অর্থাৎ গামছা পরুন, পলো নিয়ে জলে নামুন, ঘণ্টা-তিনেক পরিশ্রম করুন, তারপর দেখবেন অন্ততঃ পোয়াটাক চুনো মাছ জোগাড় হয়েছে।

বলে, হেসে উঠলেন।

ভদ্রলোক কিছু লেখাপড়া জানেন বলে মনে হল। আর ঠিক এই পরিবেশে তাঁর আবির্ভাবটা কেমন অসংগত বোধ হল আমার কাছে। উত্তর বাংলার এই গ্রামটিতে কয়েকটা ছুটির দিন আমি কাটাতে এসেছি এক সপ্তাহ আগে। যে আত্মীয়টির কাছে এসেছি—তিনি সম্পর্কে আমার কাকা; তাঁর পরিচিত এবং বন্ধুবান্ধব—অর্থাৎ যে দু-চারটি মোটামুটি শিক্ষিত মানুষও এখানে আছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে আগেই। দুজন পোস্টঅফিসের কেরানী, জনকয়েক স্কুল-টীচার, একজন ডাক্তার আর তার কম্পাউন্ডার, জনতিনেক ব্যবসায়ী। এঁদের বাইরে আর কেউ রোমে এসে রোমান হওয়ার প্রবাদ শোনাতে পারেন সে-কথা আমার জানা ছিল না। আর বিকেলের এই নির্জন মাঠে যেখানে আধ মাইলের ভেতরে কোনো জনপ্রাণী আছে বলে আমার মনে হয়নি, সেখানে হাওয়ায় বেনাবন সরসর করছিল, যেখানে ওপারের জঙ্গল থেকে মধ্যে মধ্যে ভেসে আসছিল লেবুঘাস আর বন-তুলসীর গন্ধ, যেখানে আমার ঠিক পায়ের নীচেই মিহি বালির ওপর খানিকটা নীলচে জল প্রায় নিথর হয়ে ছিল আর কয়েকটা ভাঙা ঝিনুকের রুপালি খোলায় লাল রোদের টুকরো মুক্তো হয়ে জ্বলছিল সেখানে এই লোকটি যেন হঠাৎ ফুটে উঠল। যেন একটু আগে সে কোথাও ছিল না—একটু পরে এই রোদ মুছে গেলে সে-ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আমি ছিপ গুটিয়ে আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে পড়লুম। জলের কোল ছেড়ে উঠে এলুম পাড়ের ওপর। সেই চার ইঞ্চি বেলে মাছটা পাথরের ধারেই পড়ে রইল।

নদীর ধারের একটি মাত্র গাছ—একটা শিমুলের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছিলেন ভদ্রলোক।

—চললেন?

বললুম, হ্যাঁ। ভেবে দেখলুম, আপনার প্রস্তাবটাই ভালো। কাল গামছা আর পলো এনেই চেষ্টা করে দেখব।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন। বললেন, বাইরের লোক—না?

—এক সপ্তাহ হল এসেছি।

—কোথায় উঠেছেন?

পরিচয় দিলুম। তারপর বললুম, আমার ধারণা ছিল, এখানকার সকলের

সঙ্গেই আমার মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে। কারণ, বিকেলে ডাক আসবার সময় সবাই-ই একবার পোস্টঅফিসে যান। কিন্তু আপনার সঙ্গে কখনো আমার দেখা হয়নি।

বিড়িতে টান দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, তার কারণ আমার কখনো চিঠি আসে না। কখনো আসবে না।

শেষ কথাটায় আর একবার চমকালুম আমি। চিঠি কখনো আসেনি এটা অসম্ভব না হতে পারে কিন্তু চিঠি কখনো আসবে না, এইটেই কানে অত্যন্ত বেসুরো ঠেকল। আর বিকেলের সেই পড়ন্ত রোদে আরো একবার তাঁর চশমার কাচদুটোকে আশ্চর্য বলে মনে হল আমার। অনুভব করলুম, এখানে আসবার পরে যাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে—এই মানুষটি তাদের চেয়ে অন্তত খানিকটা আলাদা।

বললুম, আপনিও বোধহয় ঠিক এখানকার লোক নন।

—এখনো এখানকার লোক হতে পেরেছি কিনা জানি না। কিন্তু আট বছর আছি এখানে। মাসের হিসেব ধরলে আরো কিছু বেশী।

—কী করেন?

—চাষবাস। মডেল ফার্মিং।

মডেল ফার্মিং। ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সব যেন রূপকথার মতো শোনাচ্ছে। এই নগণ্য ছোট গঞ্জটির আশপাশে মডেল ফার্মিং-এর মতো একটা ব্যাপার কিছু আছে এ-কথা তো কেউ আমাকে বলেনি।

ভদ্রলোক বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না—না? একদিন নিয়ে যাব আপনাকে। আছেন তো এখন?

—আর দিনচারেক থাকব।

—আচ্ছা, দেখা হবে তা হলে। নমস্কার।

বলে ভদ্রলোক পাড়ি থেকে নদীর দিকে নেমে গেলেন। জুতো খুলে হাতে নিলেন, কাপড় তুললেন, হাঁটু পর্যন্ত, তারপর প্রায়-মজা নদীটার তিরতিরে জলটুকু ছপছপ করে পার হয়ে একটা বুনো জন্তুর মতো ওপারের বনতুলসী আর লেবুঘাসের বনের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন।

একটা অদ্ভুত অস্বস্তিতে আরো কিছুক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে। যেন স্বপ্ন দেখলুম—যেন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল চোখের সামনে। এই নির্জন মাঠ, বাতাসে বেনাবনের শব্দ, লেবু-ঘাস আর বনতুলসীর গন্ধ আর কালো হয়ে আসা রোদের রঙ সমস্ত জিনিসটাকে অদ্ভুত প্রেত-প্রত্যয়ে পৌঁছে দিতে পারত, যদি না আমি দেখতুম তখনো নদীর জলটা অনেক-খানি ধরে ঘোলা হয়ে আছে, যদি না আমার চোখে পড়ত শিমুল গাছের তলায় একটা আধপোড়া বিড়ি থেকে সুতোর মতো ধোঁয়া উঠছে তখনো।

কাকা কনফার্মড ব্যাচেলার, একটি পোস্টাল পিয়নকে নিয়েই তাঁর সংসারযাত্রা। সে-ই রান্নাবান্না করে। রাত্রে খেতে বসে আমি নদীর ধারের সেই অদ্ভুত ভদ্রলোকের কথা কাকাকে বললুম।

কাকা বললেন, বুঝেছি, পাগ্‌লা চৌধুরী।

—পাগ্‌লা চৌধুরী মানে? পাগল?

—না, পাগল বলে তো মনে হয় না। একটু অদ্ভুত ধরণের এই যা।

—অদ্ভুত কেন?

তা ছাড়া কী আর। লেখাপড়া জানে মনে হয়—ভদ্রলোক, অথচ কারুর সঙ্গে বিশেষ মেশে-টেশে না। যা কিছু খাতির গ্রামের চাষাভুষোর সঙ্গে। আমি তো এই দু-বছর আছি এখানে—হাটে কয়েকবার দেখা হয়েছে, আর সামান্যই আলাপ।

—নিজের সেই মডেল ফার্মিং নিয়েই থাকেন বুঝি?

—মডেল ফার্মিং!—কাকা ভ্রূকুটি করলেন: সে সব তো কিছু শুনিনি। সামান্য কিছু জমি-জমা আছে, চাষ-বাস করে, তা ছাড়া গ্রামের লোককে জরি-বুটি দেয়, টোট্‌কা চিকিৎসা করে—এই তো জানি।

—টোট্‌কা চিকিৎসা?

—হুঁ, এইসব করেই চালায়। এখানকার ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশায় একেবারে আনসোস্যাল। শুনেছি প্রথম যখন এদিকে এসেছিল, তখন পুলিশে সন্দেহ করেছিল অ্যাবস্কন্ডার, কিছু খোঁজ-খবরও নিয়েছিল। শেষে দেখেছে ওই এক ধরণের খেয়াল-খ্যাপা লোক—ঘাঁটাঘাটি করে কোনো লাভ নেই।

—কোথায় থাকেন?

—গঞ্জের বাইরে, গাঁয়ের ভেতর। ঠিক কোথায় তা বলতে পারব না।

কৌতূহল মিটল আপাতত। পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ নিজের খেয়াল-খুশিতে দিন কাটিয়ে চলে; আমার কাছে যা নিছক পাগলামো, আর একজন তার ভেতর নিজের মতো করে যুক্তির শৃঙ্খলা খুঁজে পায়—অতএব ও নিয়ে মাথা ঘামানো সম্পূর্ণ নিরর্থক। কিন্তু তবুও রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম এল না। জানলার বাইরে দূরের একসার কালো গাছপালার ওপর তামাটে রঙের বিবর্ণ চাঁদটা ডুবে যাওয়া দেখতে দেখতে আর বাদুড়ের ডানার আওয়াজ শুনতে শুনতে দুটো জিনিস আমাকে বারবার পীড়ন করতে লাগল। সেই পড়ন্ত রোদের আলোয় আগুনের মতো জ্বলতে থাকা চশমার কাচ: 'আমার চিঠি কখনো আসবে না।' আর—আর সেই আসন্ন সন্ধ্যায় অমনভাবে নদীটা পার হয়ে বন-তুলসী আর লেবুঘাসের জঙ্গলে কোথায় মিলিয়ে গেল লোকটা?

পরের দিনটা নিজের এলোমেলো কাজ নিয়ে কাটল। সারা সকাল বসে বসে অনেক-গুলো চিঠি লিখলুম। কাকার ছোট রেডিওটা গোলমাল করছিল, সেটা খুলে ঘণ্টা-দুই হাতুড়ে চিকিৎসা চালালুম, কাজ চালানোর মতো দাঁড়িয়ে গেল। দুপুরে বাঁধানো পুরোন মাসিক পত্রিকা জোগাড় করে একটা ধারাবাহিক নিটোল প্রেমের উপন্যাস পড়ে ফেললুম শেষ কিস্তিটা পর্যন্ত। বিকেলে চা খাওয়ার সময় মনে পড়ল মাইল পাঁচেক দূরে একটা চমৎকার পুরোনো মন্দির আছে, সেটা নাকি দেখবার মতো। চা শেষ করে কাকার সাইকেলটা নিয়ে সেই মন্দিরটার উদ্দেশেই বেরিয়ে পড়লুম।

কাকা বললেন, দেরী করিস্‌নি, রাস্তাটা খারাপ।

—না না, সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসব।

ঘড়িতে দেখলুম সাড়ে চারটে। যেতে আসতে মাইল দশেক রাস্তা—সাইকেলে কতক্ষণই বা লাগবে? মন্দিরের জন্যে আধঘণ্টা সময় ধরে রাখা যেতে পারে। সাড়ে ছ'টার মধ্যেই ফিরে আসব। তা ছাড়া পৌনে সাতটা সাতটার আগে তো ভালো করে অন্ধকারই হয় না আজকাল। ভাবনার কিছুই ছিল না।

কাঁচা মাটির পথ, গোরুর গাড়ী চলে, তবু সাইকেলের পক্ষে এমন কিছু দুরূহ দুর্গম নয়। মাঠের ভেতর দিয়ে, আম-জাম বাবলা বনের পাশ কাটিয়ে, গোটা দুই গ্রাম ছাড়িয়ে আর খুব সম্ভব সেই নদীটারই একটা লোহার সাঁকো পার হয়ে যখন মন্দিরে পৌঁছুলুম তখন আকাশে কালকের মতোই রাঙা বিকেল। কিন্তু আজ আর আমার পাগ্‌লা চৌধুরীকে মনে পড়ল না। মন্দিরটাই আমাকে মুগ্ধ করল। লাল পোড়া ইটে বিষ্ণুপুরী ধরণে তৈরী—প্রত্যেকটি ইঁটে কারুকার্য; এখন ফাটল ধরেছে এখানে ওখানে, নবরত্ন চূড়ার কটাই ভেঙে পড়েছে, তবু দীঘির উঁচু পাড়ির ওপর যেন রাজার মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে এখনো। ভেতরে কালো কষ্টিপাথরে গড়া অষ্টভুজা কালীমূর্তি—তাঁর গায়ে বহুদিনের জমাট সিঁদুরের প্রলেপ, চাপধরা রক্তের মতো দেখাচ্ছে। মন্দিরের চাইতেও মূর্তিটা অনেক বেশি পুরোনো বলে মনে হল।

ঘাটের সিঁড়িগুলো ভেঙে ঘাসবনের মধ্যে লুকিয়েছে, দীঘিটা মজে এসেছে আধাআধি, শ্যাওলা-পানা-পদ্মপাতায় ঢাকা মেঘরঙ জলের ওপর পদ্মের কালো শুকনো ডাঁটা সারি সারি ফণাহীন কেউটের মতো দাঁড়িয়ে। মন্দিরের সামনে বসে দীঘির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম আমি আর শুনতে পেলুম হাওয়ায় হাওয়ায় দীঘির চারধারে বেল, আমলকী, রুদ্রাক্ষ আর হরীতকীর বন থেকে যেন দমচাপা দীর্ঘশ্বাস উঠছে।

যখন খেয়াল হল, তখন ফিকে নীল রেশমী শাড়ীর মতো হালকা সন্ধ্যার গায়ে তারা জ্বরী ঝুলছে, জোনাকির বুটি ফুটছে বেল-আমলকী-রুদ্রাক্ষের ছায়ায়। অনেক দেরী হয়ে গেল যে! ব্যস্ত হয়ে আমি উঠে দাঁড়ালুম, সাইকেলটা নিয়ে নেমে এলুম উঁচু ডাঙাটা থেকে, তারপর বাড়ীর দিকে চলতে শুরু করে দিলুম।

আম-জাম-বাবলা গাছের ওপর দিয়ে তামাটে রঙের চাঁদটা আলো ছড়াচ্ছে—সেটে পথে চলেছি সাইকেল নিয়ে। কেন জানি না, ওই মন্দিরটাই আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল। চমক ভাঙল বিশ্রী একটা হোঁচট খেয়ে। কড়াং কট করে আওয়াজ কানে এল—অর্থাৎ চেন ছিঁড়ল সাইকেলের।

সামনে এখনো পড়ে রয়েছে মাইল পাঁচেক পথ। আর যেখানটায় চেন ছিঁড়ল সে জায়গাটাও

একটু বেয়াড়া। কতগুলো বড়ো বড়ো গাছ যেন সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর, চাঁদ দেখা যায় না—ছাড়া ছাড়া অন্ধকারের টুকরো থমথম করছে। সাইকেলের আলোটাকে শেষ সীমানা দিয়ে বাঘের বাচ্ছার মতো বাদামী রঙের কী একটা দৌড়ে গেল, আতঙ্কের ধাক্কা লাগল একবার। পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম ওটা একটা অতিকায় ভাম বেড়াল।

কয়েক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিচ্ছি, হঠাৎ কানে এল : কী হল সাইকেলের?

আরো একবার দারুণভাবে চমকালুম আমি। পথের ধারের অন্ধকার ছায়া ফুঁড়ে একটা কুঁজো মতন লোক এগিয়ে আসছে। লোকটার হাতে ছোট একটা টর্চের আলো ঝলকে না উঠলে আমি হয়তো চিৎকার করে উঠতুম।

আমার মুখে টর্চ ফেলে লোকটা বললে, আরে—আপনি যে!

তখন চিনতে পারলুম। সেই পাগলা চৌধুরী।

জিজ্ঞেস করলুম : আপনি এখানে?—বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছিল তখনো, গলার আওয়াজ যে আমার কেঁপে উঠল, নিজেই টের পেলুম সেটা।

—একটু কাজ ছিল। কিন্তু আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—কপালিনীর মন্দির দেখতে।

—সেটা বুঝেছি। নতুন লোক, তাই জানেন না—দিনের বেলা ছাড়া এ-সব দিকে না আসাই ভালো।

—চোর-ডাকাত? অপদেবতা!

—না মশাই, সে সব নয়। অন্য ব্যাপার। নিন—এগিয়ে চলুন এখন। সাইকেল তো দেখছি বেকার হয়ে গেছে, টানতে টানতেই যেতে হবে। চলুন।

ভদ্রলোক সঙ্গে থাকায় মনে ভরসা এসেছিল। চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলুম, পথে কী আছে বলছিলেন?

—সাপ মশাই, সাপ। বিরাট বিরাট গোখুরো। পাকা গমের মতো গায়ের রঙ, এদিকে বলে গোমা সাপ। কামড়ালে আর দেখতে হবে না। খুব পুরোনো আমলের জায়গা কিনা—নবাবী ইটের পাঁজা আর ভাঙা মন্দির-মসজিদের তো অভাব নেই আশপাশে। নিশ্চিন্তে বংশবৃদ্ধি করছে।—বলেই ভদ্রলোক আমার হাত ধরে টানলেন : একটু দাঁড়ান।

—কী হল?

—শুকনো পাতার খড়খড়ানি পাচ্ছেন না? ওঁদেরই কেউ যাচ্ছেন একটু দূরে দিয়ে—সাপের চলা ছাড়া ও-রকম আওয়াজ হয় না। দাঁড়িয়ে যান—এগোতে দিন মহাপ্রভুকে। সাইজে বেশ বড়োই হবেন—নিদেনপক্ষে হাত পাঁচেক মনে হচ্ছে। আর বলবার দরকার ছিল না। এমনিতেই আমার রক্ত হিম হয়ে এসেছিল।

কতক্ষণ পরে সাপটা চলে গেল জানি না। ভদ্রলোক আমার হাতে আবার একটা চাপ দিতে সভয়ে নড়ে উঠলুম আমি।

—নিন, চলুন এবার। লাইন ক্লিয়ার।

চলতে লাগলুম, কিন্তু কী ভাবে সে কেবল আমিই জানি। অন্ধকার গাছগুলোর ভূতুড়ে জগৎটা পেরিয়ে যখন তামাটে চাঁদের আলোয় আবার মেঠো পথে এসে পড়লুম, তখনো সমানে পা কাঁপছে। চৌধুরীর টর্চ মধ্যে মধ্যে জ্বলছে-নিবছে, কিন্তু আমার ক্রমাগত মনে হচ্ছিল—যে-সব ছোট ছোট অন্ধকারের টুকরোগুলোতে টর্চের আলো পড়ছে না, সাক্ষাৎ মৃত্যু কুণ্ডলী পাকিয়ে অপেক্ষা করছে তাদের ভেতর। আমি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুতের মতো বিষাক্ত ফণা মাথা তুলবে তার।

আরো আধ মাইল পথ নিঃশব্দে কাটল। আমার গলা অদ্ভুতভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল, আমি কথা কইতে পারছিলুম না। চৌধুরী কী ভাবছিলেন জানি না—তামাটে চাঁদের পিঙ্গল আলোয় তাঁর একটা লম্বা ছায়া পড়েছিল পথের ওপর; কেমন যেন মনে হচ্ছিল ও ছায়াটা চৌধুরী নয়—তাঁর আগে আগে একটা ছায়ামূর্তি তাঁকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

হঠাৎ চৌধুরী বললেন, নিন—ওই আপনার পোস্টঅফিসের আলো দেখা যাচ্ছে, গঞ্জের কাছে এসে পড়েছি আমরা। নির্ভয়ে চলে যান এবার।

—আপনি?

—আমি বাঁ দিকে যাব। ওই যে ওখানটায় একটা মিটমিটে আলো দেখছেন, ওই আমার আস্তানা—একটু হেসে বললেন, মডেল ফার্ম। আসুন না বেড়াতে বেড়াতে কাল সকালের দিকে। চিনতে অসুবিধে হবে না, একটা ডোবা দেখতে পাবেন, তার ধারে তিনটে তাল গাছ। আসবেন কাল?

বললুম, আসব।

—তা হলে এই টর্চটা রাখুন সঙ্গে। কাল সকালেই সঙ্গে করে আনবেন।

বললুম, টর্চের দরকার নেই, এমনিই যেতে পারব এখন। আর তা ছাড়া আমার চাইতে বেশি পথ যেতে হবে আপনাকে, ওটা আপনারই দরকার।

—আমার না হলেও চলে। অভ্যেস হয়ে গেছে।

কেন জানি না, ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলুম : একটা কথা বলব? রাগ করবেন না?

—রাগ করব কেন? বলুন।

—আপনি সব জেনেশুনেও এই সন্ধ্যেবেলা ওই সাপের জাঙালে গিয়ে ঢুকেছিলেন?

—দরকার মশাই, দরকার। পিয়োর অ্যান্ড্ সিম্পল্ নেসেসিটি।—চৌধুরী হাসলেন : কয়েকটা সাপের খোলস আনতে গিয়েছিলুম।

—সাপের খোলস।—পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমার ঝাঁকুনি লাগল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আজ কী তিথি জানেন? জানেন না? যাই হোক, এই তিথিতে সাপের খোলস কুড়িয়ে আনতে পারলে তা দিয়ে বাতের একটা অব্যর্থ ওষুধ নাকি তৈরী করা যায়। সেইটে পরীক্ষা করব বলেই খোলস খুঁজতে গিয়েছিলুম। একেবারে হতাশ হতে হয় নি, দুটো পেয়েছি। দেখবেন?

এতক্ষণে আমার মনে পড়ল, কাকার কাছে শুনেছি যে চৌধুরী জড়ি-বুটির ব্যবসা করেন; আরো খেয়াল হল, চৌধুরীর বাঁ হাতে ছোট একটা চটের থলি আছে বটে।

চৌধুরী থলেতে হাত ঢোকাবার উপক্রম করতেই আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলুম।

—না-না, সাপের খোলস আমি দেখতে চাই না।

হা-হা করে মাঠ কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন, যতই বিষধর সাপ হোক মশাই, তার খোলসে বিষ থাকে না। আচ্ছা—চললুম এখন। কাল সকালে তা হলে আসছেন আমার ওখানে—নেমন্তন্ন রইল।

বলে আর দাঁড়ালেন না—বাঁ দিকের রাস্তা ধরে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে চললেন। আর আমার মনে হল, তাঁর পাশে পাশে যেটা চলেছে ওটা তাঁর ছায়া নয়—আর একটা ছায়া-মূর্তি সহযাত্রী বন্ধুর মতো তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

নদীর ধারের সেই অদ্ভুত বিকেল, সন্ধ্যার অন্ধকারে সাপের জাঙাল আর ঘুরে-ফিরে সেই একটা লোক! সব মিলে একটা রহস্যময় তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলুম। একজন বিদেশী মানুষ, যথেষ্ট শিক্ষিত বলে মনে হয়, আট বছর ধরে উত্তর বাংলার এই নগণ্য পাড়াগাঁয়ে একটা আশ্চর্য জীবন যাপন করছে। আরো বিচিত্র এই যে এখানকার কেউ আজ পর্যন্ত তাঁকে ভালো করে চেনে না। পলাতক আসামী নয়—তা হলে পুলিশের চোখ এড়াতে পারত না। পাগলা বলে একটা বদনাম আছে, কিন্তু যেখানে যেভাবেই দেখা হোক—লোকটিকে অন্তত পাগল বলে আমার মনে হয়নি।

রহস্যের আকর্ষণে পরদিন যখন চৌধুরীর মডেল ফার্মে গিয়ে পৌঁছলুম, তখন বেলা গোটা আটেক হবে। চৌধুরী ডোবার ধারে সেই তিনটে তাল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন মনে হল। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলেন।

—আসুন—আসুন।

প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারলুম কাকার কথাই ঠিক। এ আর যাই হোক—মডেল ফার্মিংয়ের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। টিনের ছোট একটি বাড়ী—বিঘে কয়েক জমিতে সামান্য কিছু তরি-তরকারি চোখে পড়ল। গুটি ছয়েক হাঁস চরছিল ডোবায়—কয়েকটা মুরগীকেও এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে দেখলুম।

যে ঘরটায় ঢুকলুম—সেইটেই বোধ হয় বসবার ঘর। একটা তক্তপোশের ওপর মলিন ছেঁড়া মাদুর। মেটে দেওয়ালের দুটো কুলুঙ্গিতে কতগুলো শিশি-বোতল-কৌটো, কিছু শেকড়-বাকড়। বুঝতে পারলুম, মডেল ফার্মিংয়ে চৌধুরীর অন্ন-সংস্থান হয় না—এইগুলোতেই তাঁর আসল জীবিকা।

—বসুন, চা বলে আসি।

বললুম, চা আমি খেয়ে এসেছি, ব্যস্ত হবেন না।

আহা, খেয়ে তো আসবেনই, সে কি আর আমি জানিনে? কিন্তু আমার ফার্মের টাটকা মুরগীর ডিমের ওমলেট আর নিজের গোরুর দুধের মালাই চা—তার স্বাদ একটু আলাদা মনে হবে আপনার। বসুন—বসুন—

ভেতরের দিকে চলে গেলেন চৌধুরী, আমি সেই তক্তপোশটায় বসে রইলুম। মেটে ঘরের সোঁদা গন্ধের সঙ্গে সেই ওষুধপত্রগুলোর আঘ্রাণ যেন একটু একটু করে কুয়াশার মতো

আমার মস্তিষ্কের ভেতরে ঘন হতে লাগল। বাইরে থেকে হাঁসের ডাক শুনতে পাচ্ছিলুম—খোলা দরজা দিয়ে প্রকাণ্ড একটা নীল ভ্রমর এসে ঘরের ভেতরে একবার ঘুরপাক খেয়ে গেল।

চৌধুরী ফিরে এলেন—বসলেন তক্তপোশের আর এক কোনায়। বললেন, আমার মডেল ফার্ম দেখে খুব নিরাশ হয়েছেন, না?

কী জবাব দেব বুঝতে পারলুম না। একে আদৌ ফার্ম বলে কিনা আমার জানা নেই, আর এইটেই মডেল হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত কিনা তা-ও আমার মনে সংশয় তুলল।

চৌধুরী হাসলেন: ইচ্ছে একটা সত্যিই ছিল সুকুমারবাবু। কিন্তু এই আট বছরে—

বাধা দিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললুম, আমার নাম আপনি জানেন?

—কলকাতার একজন প্রফেসার এসেছেন আমাদের পাড়াগাঁয়ে—নাম কে না জানে বলুন। আমার নামও নিশ্চয় শুনেছেন আপনি—

হাসিটা আবার ফুটে উঠল ভদ্রলোকের মুখে: পাগলা চৌধুরী, তাই না?

কুণ্ঠিত হয়ে জবাব দিলুম: তাই শুনেছি।

—কিন্তু পাগলা আমার নাম নয়, ডাকনামও নয়। এখানকার লোকেই ওটা দিয়েছে আমাকে। আপনি নিশ্চয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাকে পাগলাবাবু বলে ডাকতে পারবেন না—আর বার বার চৌধুরীমশাই বলতেও বেয়াড়া লাগবে। আমার একটা জবরদস্ত পোশাকী নাম আছে—তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী। সংক্ষেপে তুহিন বলতে পারেন।

তুহিনাংশু দত্ত চৌধুরী! এই মুহূর্তে ঘরের মেটে দেওয়াল আর ওষুধপত্রের গন্ধে কুয়াশা জমে ওঠা আমার মস্তিষ্কের ভেতরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। এই নাম একটু অসাধারণ—এ নাম একবার কানে এলে সহজে ভোলা যায় না। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ল।

সেই কবিতার বইটি। সবসুদ্ধ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার বেশি নয়। গাঢ় হলদে রঙের মলাটে লাল টকটকে অক্ষরে লেখা: 'খাঁচায় সকাল'। কতগুলি তীক্ষ্ণধার আধুনিক কবিতা। বিখ্যাত সমালোচকের লেখা উচ্ছ্বসিত মুখবন্ধ।

পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলুম। আর শুধু বইটিই নয়। কিছু কিছু সাময়িক পত্রিকায় এই উজ্জ্বল প্রতিভা আবির্ভাব জানিয়েছিল সেদিন। ভিড়ের মাঝখানে মিশে যায়নি—নিজের পরিচয়েই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তারপর হঠাৎ কবে হারিয়ে গেলেন তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী। তাঁর আরো কিছু অনুরাগী পাঠকের সঙ্গে আমিও তাঁর কবিতার খোঁজ করেছিলুম দু-এক বছর পর—তারপরে যেমন হয়, 'খাঁচায় সকাল'-এর কবিকে আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

কিন্তু মনে পড়ল। প্রায় দশ বছরের ওপার থেকে মনে পড়ল আবার। সেই গাঢ় হলদে মলাটের ওপর টকটকে লাল অক্ষরগুলো স্পষ্ট জ্বলে উঠল চোখের সামনে।

রুদ্ধ স্বরে বললুম, কবি তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী?

ঠিক দেখলুম কিনা জানি না, পাগলা চৌধুরীর মুখ শাদা হয়ে গেল একবারের জন্যে। তারপরেই হেসে উঠলেন।

—কী আশ্চর্য, সে-সব ছেলেমানুষির কথা এখনো কারো মনে আছে নাকি? আমি তো কবে ভুলে গেছি।

—ভুলে গেছেন? অথচ এত ভালো কবিতা লিখতেন আপনি?

ভালো কবিতা নয় মশাই, হাত থাকলেই বাঙালি ছেলে কবিতা লেখে, আমিও লিখতুম। তখন সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছি, একটা ভদ্ররকমের চাকরিও জুটিয়েছিলুম—একজনের পাল্লায় পড়ে একটা কবিতার বইও ছেপে ফেলা গেল। তারপরেই দেখলুম এ-সব প্রলাপ বকবার কোনো মানেই হয় না। ভাবলুম—একটা বড়ো কাজ কিছু করা যাক—সামথিং কনস্ট্রাক্টিভ। একটা মডেল ফার্ম করলে কেমন হয়? ছুটিতে দার্জিলিং চলেছি—এই রেলস্টেশনটায় এসে যেন ট্রেন থেমে গেল—লাইনে গোলমাল হয়েছে কোথাও। কী মনে হল—নেমে পড়লুম এখানে। চলে গেলুম গাঁয়ের ভেতরে। সেই-দিনই কয়েক বিঘে জমি বায়না করে ফেললুম অসম্ভব সস্তায়। সেই থেকে আছি এখানে—কবিতা লেখার চাইতে অনেক বড়ো কাজের খোঁজ পেয়েছি। এদিকের লোকে টোটকায় বিশ্বাস করে, আমি কিছু আলোচনা করেছি ও নিয়ে, নেহাৎ ফেলনা জিনিস নয় মশাই। মডেল ফার্মিংয়ে তেমন জুৎ করতে পারিনি, তবুও সব মিলিয়ে বেশ আছি। কী হবে মশাই বানানো কবিতা দিয়ে—কী মানে হয় তার?

এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন তুহিনাংশু। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলুম না আমি, কেমনতরো মনে হল অনেক কথার ভিড়ে করেকটা ছোট ছোট কথা লুকিয়ে রইল; এমন অনেকগুলো প্রশ্ন রইল—যার জবাব তুহিনাংশু কোনোদিন দেবেন না।

আমার স্মৃতির মধ্যে কয়েকটা কবিতার লাইন জ্বলে উঠল হঠাৎ। আশ্চর্য ভালো লেগেছিল সেদিন। অন্যমনস্কের মতো আমি আবৃত্তি করলুম:

মণিকা, তোমার বাঘিনী প্রেমের
আদিম অন্ধ রাতে
নোনা সাগরের ক্ষুব্ধ নিশানে
দোলে সুন্দরবন
আমি ছুটে চলি হিংস্র কিরাত
খর-বল্লম হাতে
সাপের মণিতে বিষাক্ত-নীল
আলোয় সঞ্চরণ—

—থামুন!

না, চিৎকার করলেন না তুহিনাংশু, প্রায় নিঃশব্দেই উচ্চারণ করলেন। কিন্তু তাঁর চোখে, তাঁর ঠোঁটে, তাঁর সমস্ত শরীরে যেন আর্তনাদ ফুটে উঠল একটা—যেন ঘর ফাটিয়ে একটা নীরব হাহাকার জেগে উঠল তাঁর। আতঙ্কে থেমে গেলুম আমি।

তুহিনাংশু আরো কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটি মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। কালো, কদাকার, গায়ে ময়লা একটা শাড়ী জড়ানো—একটি সেমিজ-ব্লাউজ পর্যন্ত নেই। কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা—হাতে ওমলেট আর জলের গ্লাস।

তুহিনাংশু বললেন, আমার স্ত্রী।

আমি বললুম, নমস্কার।

ভদ্রমহিলা ফিরেও তাকালেন না আমার দিকে। তক্তপোশের ওপর আমার পাশেই প্লেট আর গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন, এক হাতে মাথার ঘোমটা আরো খানিকটা টেনে দিলেন, তারপর আবার যে পথে এসেছিলেন সেইদিকেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তুহিনাংশু বললেন, কিছু মনে করবেন না মশাই। আমার স্ত্রী বোবা আর কালা—কানে শুনতে পায় না। চোখেও যে খুব ভালো দেখে তা নয়।

চকিত হয়ে বললুম, তাই নাকি?

সেই কালো ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে তুহিনাংশুর চোখ দুটো অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতায় জ্বলতে লাগল: এই তো ভালো মশাই—যাকে বলে আদর্শ স্ত্রী। লেখাপড়া জানে না—গরিবের মেয়ে, কানে শোনে না, কথা বলতে পারে না। আমি বিয়ে করেছি বলে চির-কৃতার্থ হয়ে আছে—কী করি না করি কোনোদিন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। এর চাইতে সুখ কিছু আছে বলতে পারেন আপনি? যাক গে—ওটা খেয়ে ফেলুন আগে—ঠাণ্ডা হলে আর ভালো লাগবে না।

কথা খুঁজে না পেয়ে আমি ওমলেট-টাতেই মন দিলুম। স্বাদ পাচ্ছি না—একটা অজানা অস্বস্তি মনটাকে যেন চেপে ধরেছে এসে। মেটে দেওয়াল আর ওষুধ-বিষুধের সেই গন্ধের কুয়াশা আবার যেন ঘন হয়ে আসছে আমার মস্তিষ্কের ভেতরে। আমি এক হারিয়ে-যাওয়া কবি আর এই পাগলা চৌধুরীর মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে ফিরছি কোথাও—খুঁজছি সেই নির্জন বিকেলের আলোয় বনতুলসী আর লেবু-ঘাসের গন্ধভরা নদীর ধারে—খুঁজছি কপালিনীর মন্দির থেকে আসবার সময় সেই থমথমে অন্ধকারভরা সাপের জাঙালের মাঝখানে।

সেই মহিলা দুটো ময়লা পেয়ালায় করে প্রায় শাদা রঙের চা নিয়ে এলেন। তাঁকে সম্ভাষণ করবার পণ্ডশ্রম আমি আর করলুম না। শুধু দুখানি কালো কালো শীর্ণ হাতের ওপর আমার চোখ পড়ল—যেখানে চারগাছা নীল কাচের চুড়ি ছাড়া আর কোনো আভরণই নেই।

—যাই বলুন মশাই, আমি সুখী।—তুহিনাংশু যেন স্বগতোক্তি করতে লাগলেন: কবিতা—কলকাতা! কোনো মানে হয় না মশাই। তার চাইতে এই ভালো—অনেক ভালো। ভাবতে পারেন আট বছরের মধ্যে আমার নামে কোনো চিঠি আসেনি, আমি খবরের কাগজ দেখিনি—'টোটকা দর্পণ' আর 'ভেষজ-রহস্য' ছাড়া কোনো বই পড়িনি? সুখ! সুখের অর্থ যে কী, কেউ বলতে পারে! বেশ আছি আমি—কারো কাছে এতটুকু নালিশ নেই আমার।

কোনো নালিশ নেই? 'খাঁচায় সকাল' কবিতার আরো কয়েকটা পংক্তি আমার মনে এল:

এক মুঠো আগুন দাও তোমার হৃদয় থেকে
হে লোহিতাক্ষ—হে জবাকুসুমসংকাশ
হে হিরণ্যপাণি!

খাঁচার এই লোহার শলাকাগুলো পুড়ে যাক গলে যাক—চিরতরে হোক্ নিশ্চিহ্ন—

—চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে মশাই!

—হ্যাঁ, খাচ্ছি।

মালাই চা-ই বটে। চায়ের স্বাদ-গন্ধ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া গেল না তাতে। সন্দেহ নেই, তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী সত্যি-কারের সুখের সন্ধান পেয়েছেন এখানে—জীবন থেকে শহরকে চিরদিনের মতোই মুছে

কী হবে মশাই বানানো কবিতা দিয়ে—কী মানে হয় তার?

দিয়েছেন। নইলে এ চা বরদাস্ত করা অসম্ভব হত।

পকেট থেকে বিড়ি বের করে তুহিনাংশু জিজ্ঞেস করলেন: চলে?

—না, মাপ করবেন।

—ওঃ, আপনার বুঝি সিগারেট? আমাদের পাড়াগাঁ মশাই, বিড়ি নইলে ঠিক জুৎ হয় না। আচ্ছা, চলুন এবার—আমার ফার্ম একটু দেখিয়ে আনি আপনাকে। অবশ্য দেখবার মতো কিছুই নেই, সামান্য কিছু তরী-তরকারি কেবল আছে। বরং শীতকালে এলে—

বলতে বলতে আমরা বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে। মাথার ওপর নীল উজ্জ্বল আকাশ, দিগন্তে পাহাড়ের রেখা। শস্যহীন মাঠ পড়ে আছে—যতদূর চোখ যায়। সেই নদীটার একফালি জল দেখতে পেলুম, এখান থেকেও সেই শিমুল গাছটা দেখা গেল যেখানে আমি মাছ ধরতে গিয়েছিলুম, আর যেখানে প্রথম হঠাৎ যেন বিকেলের আলোর ভেতর থেকে ফুটে উঠেছিলেন চৌধুরী।

আমি ওঁর মুখের দিকে চাইলুম। রগের কাছে দু-তিনটে চুল চকচক করছে রোদে, চোখের কোলে কালির রেখা, আজ দিনের বেলায়—এই রোদের ভেতরে আমার মনে হল, বয়েসের তুলনায় ভদ্রলোক যেন অনেক বেশি বুড়িয়ে গেছেন।

সামনে একটা প্রকাণ্ড গ্রানাইট পাথরের চাঙাড় পড়ে ছিল। হঠাৎ সেই দিকে এগিয়ে গেলেন তুহিনাংশু।

—এই পাথরটা দেখছেন?

—দেখছি।

—কী মনে হয় আপনার?

—কী আবার মনে হবে?

—খুব একটা বিদঘুটে সাপার্স বলে বোধ হয় না? কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ যেন রাস্তা জুড়ে একটা অর্থহীন বাধা।—বলতে বলতে একটা উগ্র বন্য আলো তাঁর দু-চোখে ঝলকে উঠল: জানেন—এই আট বছর ধরে এটাকে রোজ আমি ঠেলে সরাতে চেষ্টা করি, অথচ একটুও নড়ে না।

আমি বললুম, কী আশ্চর্য, খামোকা ওটাকে সরাবার জন্য কেন পণ্ডশ্রম করবেন? আর অতবড়ো একটা পাথরকে মাটি থেকে নড়ানো কি কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব?

—কী সম্ভব তা হলে বলতে পারেন?—চৌধুরীর স্বরে হঠাৎ যেন একরাশ আগুন ঝরে পড়ল: চিরকাল কি এমনি করে একটা পাথরের তলায় সব চাপা পড়ে থাকবে? কবিতা হারিয়ে যাবে—মণিকা হারিয়ে যাবে—যেখানেই যাব, এই পাথরের হাত থেকে আমি মুক্তি পাব না? আপনি বিশ্বাস করুন—এইবারে এটা সরবেই, তার সময় এসেছে।

বলতে বলতেই চৌধুরী পাথরটার দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রাণপণে ঠেলতে লাগলেন সেটাকে। লোকটা সত্যিই পাগল কিনা বুঝতে চেষ্টা করছি, তৎক্ষণাৎ একটা তীব্র চিৎকার আমার কানে এল।

অমন জান্তব, অমন বুকফাটা চীৎকার জীবনে আমি কখনো শুনিনি। বিদ্যুৎবেগে ফিরে তাকালুম। বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে তুহিনাংশুর সেই কালো-কুৎসিত বোবা-কালা স্ত্রী। মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে, চোখের তারাদুটো বিস্ফারিত, একরাশ রুক্ষ চুল উড়ছে ডাকিনীর মতো। তার মুখের চেহারা কল্পনা করা যায় না—যেন মৃত্যু-বিভীষিকা দেখতে পাচ্ছে সামনে।

—আঁ-গাঁ-গাঁ-গাঁ—আবার একটা জৈব আর্তনাদ বেরুল তার গলা দিয়ে।

তখন তুহিনাংশু সোজা হয়ে আমার দিকে মুখ ফেরালেন। পাথর ঠেলবার পরিশ্রমে বুকটা তখনো যেন ঢেউয়ের মতো ওঠা-পড়া করছে ভদ্রলোকের। ঝড়ের মতো নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে হেসে বললেন, ভয় পায় মশাই—পাথরটা ঠেলতে গেলেই ভয় পায়। কিন্তু এটা বুঝতে পারে না যে ওটা না সরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমি মুক্তি পাব না।

চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার পা-দুটো মাটির মধ্যে গেঁথে গেল।

অনেকগুলো কথার উত্তর একসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে গেছে তখন। আত্মহত্যা করব না—এই প্রতিজ্ঞা করে তিলে তিলে আত্মহত্যার সাধনা কি এমনিভাবেই করতে হয়? এই বোবা-কালা কুরূপা স্ত্রী, এই জীবন, অকারণে বিকেলের নদী পার হয়ে সন্ধ্যার বনতুলসী আর সেবুঘাসের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, তার অন্ধকারের ভেতরে সাপের খোলস খোঁজার কী অর্থ থাকতে পারে আর? খাঁচার শলা তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি—তীরের ফলা হয়ে পাখির বুকে বিঁধেছে।

আমি তুহিনাংশু দত্তচৌধুরীর আত্মহত্যা দেখতে পাচ্ছি। পাথর ঠেলার পরিশ্রমে ঝড়ের মতো শ্বাস পড়ছে তার, আর—আর ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে সাদা সরু রক্তের ধারা রোদের আলোয় জ্বলে উঠছে।

চৌধুরীর স্ত্রী ছুটে এল তার দিকে। কিন্তু আমি দেখলুম তার পাশে সেই ছায়াটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে—সেই প্রেতাত্মার সহ-চর, যে শেষ মুহূর্তের আগে তার সঙ্গ ছাড়বে না।

# শহীদ স্তম্ভ

## নন্দগোপাল সেনগুপ্ত —॥

এই মাত্র ফিরেছি।

সকালে উঠেই জীপ নিয়ে দৌড়তে হয়েছিল বারুইপুর। সেখানে রাজ্যপাল কৃষি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। বক্তৃতা দিলেন আমাদের সহযোগী সম্পাদক।

আমাকে যেতে হয়েছিল প্রদর্শনীর খবর আর ছবি সংগ্রহ করতে।

বুঝতেই পারলেন বোধ হয় যে আমি সংবাদপত্রের রিপোর্টার। অর্থাৎ সেই হতভাগ্য জীব, যার পায়ের সংখ্যা মাত্র দুখানা না হওয়াই উচিত ছিল।

যাই হক মাথায় এক খাবলা তেল ঘষে আর ঘটি দুই জল ঢেলে সবে ভাতের থালাটা সামনে টেনে নিয়েছি, আর পিঠের কাছে ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল।

মুখে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করে গৃহিণী বললেন, কে আবার?

ভয়ে ভয়ে বললাম, আর কে? নিউজ এডিটর। তাঁর হুকুম বিকাল পাঁচটায় মধ্যমগ্রাম যেতে হবে মিটিং কভার করতে। দেশনায়ক গণেশ আড্ডির সভাপতিত্বে সেখানে শহীদবাগের ভিত্তিস্থাপন হবে।

—শহীদবাগ আবার কি?

—বুঝলে না? দেশের জন্যে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের নামে একটা বাগান বসানো হবে, সেখানে একটা স্তম্ভ টম্ভ স্থাপন হবে আর কি!

ব্যাজার গলায় গিন্নী বললেন, এই ছাইয়ের চাকরি ছেড়ে আবার প্রফেসারীতে ফিরে চলো ত। দিন নেই, রাত্রি নেই, খালি দৌড় আর দৌড়। একটা সিনেমা দেখা নেই, একটা নেমন্তন্নে যাওয়া নেই.....এ কি ভদ্দরলোকের চাকরি?

আমতা আমতা করে বললাম, বিরক্ত হলে কি চলে? আমাদের কাজ ত চাকরি নয়, এ যে দেশ-সেবা।

—পোড়া কপাল সেবার, মুখ বিকৃত করে বললেন গিন্নী তারপর একটা ঢোক গিলে বললেন, তোমাদের ওপরওলারা বাস্তমে করে দেশ-সেবা করছেন, তোমরা তার কাহিনী কেত্তন করে, আর লম্বা লম্বা ছবি ছেপে দেশ-সেবা করছ। এত সেবায় দেশ টিঁকলে হয়!

দেখলাম কথা বাঁকা দিকে মোড় ফিরছে। আর ঝঞ্ঝাট বাড়ানো সুবুদ্ধি নয় বুঝে বললাম, তা অবশ্য ঠিক।

তারপর স্রোতটা অন্যদিকে ফেরানোর জন্যে বললাম, তা তুমিও থালাটা নিয়ে বসে যাও না। এদিকে বেলা ত প্রায় একটা বাজে।

—থাক, আর দরদ দেখাতে হবে না, বলেই একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে গিন্নী রান্নাঘরে ঢুকলেন মাছ-তরকারি আনতে।

খাওয়া সেরে শরীরটা ইজি-চেয়ারে এলিয়ে দিলাম। অল্প একটু গা গড়িয়ে নিয়েই আবার ত বেরুতে হবে।

কদিন হল একটা গোয়েন্দা নভেল ধরেছি, শেষই করতে পারছি না। গল্পটা এমন এক জট-পাকানো রহস্যের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, যাতে হেস্তনেস্তয় না পৌঁছানো পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কিন্তু পড়ব কখন?

ঠিক করলাম এই ফাঁকে পাতাগুলো ধাঁ-ধাঁ করে উল্টে যাই। তাতে বিশ্রামও হবে, ঘুমটাকেও এড়ানো সহজ হবে।

সামনের মোড়ায় পা দুটো তুলে দিয়ে বইখানা খুললাম।

পেশাদার বদমায়েস পিয়েরোকে কিভাবে এক সুন্দরী কিশোরীকে টোপ হিসাবে এগিয়ে দিয়ে একের পর এক যুবককে তার আপেল বাগানে ভুলিয়ে আনে, তারপর তাদের অচেতন করে গা থেকে সমস্ত রক্ত চুঁইয়ে নেয় এবং তাদের মৃতদেহগুলি আপেল গাছের আশেপাশে পুঁতে ফেলে, তার রোমাঞ্চকর কাহিনী।

এই খুনী পিয়েরোকে আর তার বাহন তন্বী তোমারাকে চতুর গোয়েন্দা ফ্লেচার শেষ পর্যন্ত ধরলেন ল্যাডেন্ডারের গন্ধ অনুসরণ করে।

জমাটে গল্পের আতলে তলিয়ে গেলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই।

কোথায় মধ্যমগ্রাম, কোথায় শহীদবাগ, কোথায় বা গণেশ আড্ডির বক্তৃতা.....সব ভাল-গোল পাকিয়ে ছোট্ট একটা বুদ্বুদের

"এত সেবায় দেশ টিকলে হয়!"

মতো চোখের সামনে দিয়ে দুলতে দুলতে শূন্যে মিলিয়ে গেল!

আমি যখন হাজির হলাম, সভা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

আহ্বায়ক শশবিন্দু হাজরা তখন মূল প্রস্তাবের বয়ানটা পড়া শেষ করে, প্রস্তাবিত স্তম্ভের ফলকে যে-যে শহীদের নাম খোদিত হবে, সেই তালিকা পড়ার অনুমতি চাইছেন।

প্রস্তাবটা এই রকম: জননী জন্মভূমির বন্ধন মুক্তির সংগ্রামে যে সমস্ত বীর সন্তান অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন, জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁহাদের সকলের উদ্দেশে এই সভা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। তাঁহাদের নামে উৎসর্গিত এই উদ্যানের মধ্যস্থানে যে স্তম্ভ স্থাপিত হইবে, তাহাতে স্বাধীন ভারতের নর-নারী আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য রূপে তাঁহাদের নাম উৎকীর্ণ করিতেছি।

চতুর্দিক থেকে তুমুল করতালি প্রস্তাবকে সম্বর্ধিত করল।

উৎসাহিত হয়ে হাজরা মশায় নামের তালিকা পড়া সুরু করলেন: নিত্যানন্দ হোড়, হরিহর তলাপাত্র, করালীকান্ত কর্মকার, বিপিনবিহারী সাঁপুই, সোনামুখ দেবনাথ.....

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এক ক্ষীণকায় ভদ্রলোক। গোটা চেহারাটা তাঁর তীক্ষ্ণ একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো।

তিনি বললেন, এ-সব নাম চলবে না। এঁদের কেউ চেনেন না। এঁরা কারা? কি করেছেন এঁরা? এঁদের নাম ঘটা করে ফলকে তোলার মানেটা কি?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন আর এক ভদ্রলোক। সপ্তমে গলা চড়িয়ে তিনি বললেন, আপনি যাঁদের নাম শোনেন নি, তাঁরা দুনিয়ায় ছিলেন না, এ কেমনধারা যুক্তি। আপনি কুরোপাটকিনের নাম শোনেন নি বলে তিনি কোন দিন ছিলেন না.....এই মেনে নিতে হবে নাকি আমাদের?

তাঁর কথার লেজুড় ধরে বললেন হাজরা মশায়, এঁরা সবাই তারকেশ্বর ডাকাতিতে পুলিসের গুলীতে প্রাণ হারান। হাওড়া হুগলী চব্বিশ পরগণার বীর সন্তান এঁরা।

আর কোথায় যাবে? বিকট চীৎকার করে ডায়াসের ওপর লাফিয়ে পড়লেন এক স্থূলোদর প্রৌঢ়। গালের এক পাশে তাঁর এক ট্যাবলা পান। হাতে একটা রেশনের থলি।

তিনি বললেন, হাওড়া হুগলী চব্বিশ পরগণা.....এই গুলিন তোমাগো বিপ্লবের আকড়া হইছে, চোট্টগ্রাম, ঢাহা, বরিশাল, এগোর নাম শুনছো কখনো? বিপ্লবী দ্যাখছো কখনো? ঘুটীগো স্বভাবের এই হইল মস্ত দোষ!

তাঁর হাতে একটা হেঁচকা টান দিয়ে ছোকরা গোছের এক ভদ্রলোক বললেন, এ কি বলতিছ চাঁদ? মেদিনীপুরের কাছে লাগবেক কোন শালা? ডজনে ডজনে বিপ্লবী.....

—কিরে হালা, তুই আমাগো হালা কইস?

—আলবৎ বলবেক, বলবেক নি কেনে?

—শুধু চট্টগ্রাম, বরিশাল, আর মেদিনীপুর! আর কোথাও বিপ্লবী হয় নি, না? কত গণ্ডা সোনার চাঁদ ছেলে যে ফাঁসিতে জান দিল বর্ধমান, বীরভূম, আর মুর্শিদাবাদে, তার হিসাবটা কে করবে? বাঙালের দোষই ঐ, সব তাতে নিজের কোলে ঝোল টানে।

—বাঙ্গাল কইলে মারিয়া চারখানা দাত খুলিয়া নিমু।

বাজখাঁই গলায় এক তরুণ বলে উঠলেন, থামো না বাওয়া। অত গণ্ডগোলে কাজ কি? পুলিশের হাতে মরা নিয়ে কথা, যে মরেছে সেই শহীদ। আমার পিসতুতো দাদা চোরাই মদের বিজনেস করতে গিয়ে গুলী খেয়ে প্রাণ হারাল, সেই বা কম কি? আর একজন বললেন, আমার কাকা পুলিসের গাড়ীতে চাপা পড়ে প্রাণ হারাল, সেই বা তাহলে কম শহীদটা কি?

ওদিকে তখন মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও হাওড়া-হুগলীর দলের মধ্যে ঠেলা-ঠেলি, গুঁতোগুঁতি শুরু হয়ে গেছে।

সভাপতি আড্ডি মশায় গলায় গাঁদা ফুলের মোটা একটা মালা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

মাইকে মুখ রেখে তিনি কি যেন বলতে গেলেন। কিন্তু হট্টগোলের আতিশয্যে তা কারো কানে পৌঁছাল না।

হঠাৎ দেখা গেল দপ্তর ইট পাটা শুরু হল।

বাগানের রেলিং একটার পর একটা উপড়ে নিয়ে যে যাকে পেল, তাকে বেপরোয়া ঠেঙাতে লাগল। কিল-চড় ও চীৎকারে চতুর্দিক ধরল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চেহারা।

পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে নিঃশব্দে সরে এলাম নিরাপদ দূরত্ব থেকে দু-একখানা ছবি নোট করে।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘটনাস্থলে ফিরে এসে দেখি, ডায়েসে তখনও গাঁদা ফুলের মালা গলায় আড্ডি মশায় বসে আছেন। আর তাঁর সামনে সমগ্র সভামণ্ডপে ছড়ানো রয়েছে ইট-পাটকেল, বোতল-ভাঙ্গা, চেয়ার-টেবিলের ভগ্নাবশেষ এবং তারি মধ্যে ইতস্তত রক্তাক্ত মৃতদেহ গোটা কয়েক।

হতভম্ভ গ্রামবাসী, দরিদ্র রেফুজী এবং চলতি পথের সাধারণ মানুষ চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন অনেক। উদ্যোক্তাদের কেউ নেই।

সহসা যেন মূর্ছা ভঙ্গে জেগে উঠলেন আড্ডি মশায়। দাঁড়িয়ে মাইকে মুখ দিয়ে জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন, বন্ধুগণ, শহীদ তালিকা প্রস্তুত নিয়ে যা হয়ে গেল, তারপর

"এরা কারা?"

আর পুরানো শহীদদের উল্লেখে দরকার নেই। ঘটনা আমাদের এখানেই এক ডজন নূতন শহীদ তৈরি করে দিয়েছে। আসুন, এঁদের নামই আমরা ফলকে উত্তকীর্ণ করে জাতীয় কর্তব্য করি।

সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল জ-য়-হি-ন্দ!

চমকে উঠে দেখি ইজি-চেয়ারেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হাতে রয়েছে সেই গোরেন্দা ছোকরার আত্মজীবনী!

ঘটনাটা বড় বড় সব কাগজেই বের হয়েছিল। এ নিয়ে 'দেশসেবক' আড়াই কলম এক সম্পাদকীয়ও লিখেছিল। অবশ্য আলোচনা হবার মতনই ব্যাপার।

দেশ স্বাধীন হয়েছে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই, কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্বজ্ঞান কি বেড়েছে? শ্রমের মর্যাদা, কর্তব্যনিষ্ঠা এসব সম্বন্ধে আমরা কি পূর্ণমাত্রায় অবহিত? সমাজের সর্বস্তরে কি কর্তব্যপরায়ণতা সঞ্চারিত?

সেদিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এইসব প্রশ্ন ছিল। ঘটনাটা সত্যিই লজ্জাকর। যে কোন স্বাধীন দেশের পক্ষে খুবই অপমানজনক।

গোলকগঞ্জের পোস্টম্যান একটি জরুরী টেলিগ্রাম বিলি না করে সেটি মাঠের মাঝখানে ফেলে চলে এসেছে। পোস্টমাস্টারের প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিতে না পারায়, সন্দেহ হয়। তারপর একটু তদন্ত করতেই ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়ে।

কিছুদিন আগে ঠিক এই ধরণের আর একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এক পোস্টম্যান বুঝি তার চিঠিসুদ্ধ ব্যাগ গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছে! অবশ্য চিঠির এর চেয়ে সদ্গতি আর কল্পনা করা যায় না, তবু পত্রপ্রেরকরা এবং যাঁদের পত্র পাবার কথা, তাঁরা ক্ষেপে উঠেছিলেন।

পোস্টম্যানটি নতুন, অল্পবয়সী। চাকরিতে তখনও কাঁচা গুটি। তার চাকরি গিয়েছিল। জেল হয়েছিল কিনা ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।

কিন্তু টেলিগ্রামের ব্যাপারে জড়িত পোস্টম্যানটির বয়স প্রায় তিরপান্ন। অর্থাৎ আর বছর দুয়েকের মধ্যে তার অবসরগ্রহণ করার কথা। লোকটার সারা জীবনের চাকরির রেকর্ড নাকি ভাল। কি একটা সৎ কাজের জন্য সরকার থেকে একবার পুরস্কারও পেয়েছিল।

আশ্চর্য কাণ্ড, প্রবীণ বয়সে, একি মতিচ্ছন্নতা।

কিছুদিন হাটে, মাঠে, ঘাটে অর্থাৎ অফিসে, ময়দানে, বাড়ীর রোয়াকে এই আলোচনা চলল। চায়ের কাপ সামনে রেখে তর্কের ঝড়। দু এক জায়গা থেকে হাতাহাতির খবরও এল।

একদল বলল, সরকার কর্তব্যনিষ্ঠা চান, কর্মপটুতা চান, অথচ সেই অনুপাতে বেতন দিতে রাজী নন। ঠিকভাবে উদরপূর্তি না হলেই, কাজে গাফিলতি আসে। কর্তব্যবুদ্ধি তলিয়ে যায়।

আর একদল ক্ষেপে উঠল।

ইংরেজ আমলে এদের মাইনে ঢের কম ছিল, অথচ এ ধরণের অভিযোগ কখনও শোনা যায়নি। তার মানে, ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত একটা শৈথিল্য এসেছে। চালক যদি অপটু হয়, গাড়ী খানায় পড়বেই। গাড়ীর আর দোষ কি।

উত্তেজনা প্রায় মাস তিনেক ধরে চলল। তারপর অন্য সব উত্তেজনার মতন একসময়ে স্তিমিত হয়ে গেল। অবশ্য দ্রুত স্তিমিত হবার একটু কারণও ছিল। শহরে ইংলণ্ডেশ্বরী আসছেন। চারদিকে সাজ সাজ রব। তাঁর আসার শড়কের দু পাশে মুখপোড়া বাড়ীগুলোয় চুনকাম হল। পাঁজরপ্রকট অট্টালিকার সংস্কার। স্থানে স্থানে বিজয় তোরণ। বাড়ীর ঝি বৌ খুঁজে খুঁজে বিয়ের বেনারসী বের করে রাখল।

এই আনন্দের প্লাবনে কর্তব্যবিমুখ পোস্টম্যানের কথা সবাই বিস্মৃত হল। আমিও।

হয়তো আর কোনদিনই এ প্রসঙ্গ মনে আসত না, যদি না ভাইঝির জন্য এক সম্বন্ধ দেখতে পরাগপুরে আসতে হ'ত।

বেশীক্ষণ ধরে আর পাত্রকে দেখতে হ'ল না। দেখবার প্রয়োজনও ছিল না।

শুনেছিলাম পাত্রের কথায় বড় বড় লোক ওঠবোস করে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। পাত্রের দর্জির দোকান। মাঝারি সাইজের। ফিতে হাতে পাত্র নিজেই মাঝে মাঝে দাঁড়ান। খদ্দেরকে তাঁর হুকুম তামিল করতে হয় বৈকি। প্রয়োজনে হাত তুলতে হয়, ঘাড় বেঁকাতে হয়, পাও দোমড়াতে হয়।

তাছাড়া পাত্রের ওজন সাড়ে তিন মণের কম নয়। একটা সাইকেল-রিক্সায় উঠতে পারে না। একটায় চড়ে, একটায় পা রাখে।

নমস্কার করে উঠে আসছিলাম, কিন্তু পাত্রের বাবা বাদ সাধলেন। সেকি হয়, একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে বৈকি। ভয় নেই, দোকানের কিছু নয়, সব বাড়ীর তৈরী।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর দুটো রেকাবিতে বাড়ীর তৈরি জিনিসের নমুনা এসে হাজির। একটায় স্তূপীকৃত তালের বড়া। আর একটায় অনেকগুলো গোকুল পিঠে।

হাতজোড় করলাম, কিন্তু নিস্তার নেই। এবার পাত্র নিজে বুঝে দাঁড়ালেন, ফেলবেন না স্যর, অনেক কষ্টের জিনিস।

বহু কষ্টে প্রায় অর্ধেক শেষ করলাম, কিন্তু শরীরের অবস্থা কাহিল। হাঁটা সম্ভব নয়, সাইকেল-রিক্সার শরণ নিলাম। স্টেশনে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই আটটা বারোর গাড়ী সদর্পে বেরিয়ে গেল। অনুসন্ধানে জানলাম, এর পরের গাড়ী, এবং শেষ গাড়ী দশটা বাইশ।

প্রমোদ ভ্রমণ

ফটো ঃ হিরণ্ময় রায়চৌধুরী

পায়ের বাপান্ত করতে করতে প্ল্যাট-ফর্মের ওপর বসলাম। বারদুয়েক চোঁয়া ঢেঁকুর উঠে অবস্থা আরও সঙ্গীন করে তুলল।

কোথাও জনমানব নেই। টিকেটঘর বন্ধ। স্টেশনমাষ্টারও বোধহয় অফিসঘরে তালা দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে গেছেন। ট্রেন আসার সময় হ'লে আসবেন। বাতির বাহার আলোয় ছলনা মাত্র। অন্ধকারই কেবল বাড়ছে।

হঠাৎ মনে হ'ল পাশে কে একজন বসল। আধো অন্ধকারে ঠাওর করে দেখলাম এক-হাতে ছাতা, অন্য হাতে একটা পোঁটলা।

নমস্কার বাবু। অন্ধকার থেকেই কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

প্রতিনমস্কার করলাম।

কতদূর যাবেন বাবু?

ক'লকাতা। আপনি?

লোকটি বিব্রত হ'ল। আমাকে আপনি আজ্ঞে বলছেন কেন, আমি চাষাভুষো লোক।

কথাবার্তা কিন্তু ঠিক চাষাভুষো লোকের মতন মনে হল না। খুব মার্জিত হয়তো নয়, কিন্তু কথার ধরণ, উচ্চারণের ভঙ্গী বেশ ভদ্র।

তুমি কতদূর যাবে?

আজ্ঞে প্রসাদপুর।

নিতান্ত কথার পিঠে কথা বলার ভঙ্গীতে বললাম, সেখানেই থাক বুঝি।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেখানেই থাকি। এখানে মেয়েকে দেখতে এসেছিলাম।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, আকাশে কালো মেঘের স্তবক জমছিল, আচমকা একেবারে মুষলধারায় নামল।

পাশের লোকটি ছাতা খুলতে খুলতেই বেশ ভিজে গেলাম।

চলুন বাবু, ওইদিকে একটা ভাঙা কামরা আছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াই। ছাতায় এ বৃষ্টি আটকাবে না।

ছাতির তলায় মাথা রেখে লোকটির পাশে পাশে চললাম।

আধভাঙা কামরা। সম্ভবত বিশ্রামাগার তৈরি হচ্ছিল, তারপর রেল-কর্তৃপক্ষের খেয়ালে আর সম্পূর্ণ হয়নি। টালির ছাদ, তবে অনেকগুলো টালিই নিশ্চিহ্ন। চার-দিকের দেয়াল খাড়া আছে। উন্মুক্ত জায়গার চেয়ে অনেকটা ভাল। জায়গা বুঝে দাঁড়াতে পারলে মাথা আর শরীর দুই বাঁচে।

আকাশের দিকে চেয়ে সনিশ্বাসে বললাম, আচ্ছা বিপদে ফেললে তো।

লোকটি অভয় দিল, অসময়ের বৃষ্টি বেশীক্ষণ থাকবে না বাবু। ট্রেন আসবার আগেই থেমে যাবে। কটা বাজে দেখুন তো।

রেডিয়াম ঘড়ি, কাজেই অন্ধকারেও দেখার কোন অসুবিধা হ'ল না। বললাম, পৌনে নটা।

এখনও অনেক দেরী, নিন, বসুন বাবু।

দুটো খালি পেট্রলের টিন কোণ থেকে টেনে এনে লোকটি পেতে দিল। বোঝা গেল, এ স্টেশনের নাড়িনক্ষত্র তার নখদর্পণে।

ওরই মধ্যে একটু আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। প্যাকেট থেকে আর একটা বের করে এগিয়ে দিলাম লোকটার দিকে, নাও, ধরাও।

লোকটি হাতজোড় করল, আমার ওসব আসে না বাবু। রাতে খাওয়ার পর এক ছিলিম তামাক টানি। ব্যস, নেশা বলতে ওইটুকু।

অফুরন্ত অবসর। অজানা পরিবেশ। আকাশের অনিশ্চিত অবস্থা। এ সময়টা গল্প-গুজবে কাটানো ছাড়া আর করবার কিছু নেই। অন্তত ট্রেন না আসা পর্যন্ত।

এতক্ষণ ধরে মনের মধ্যে যে সন্দেহটা ধোঁয়ার রূপ নিচ্ছিল, সেটাই প্রকাশ করে ফেললাম, তোমার কথাবার্তা শুনে তো ঠিক চাষী শ্রেণীর বলে মনে হচ্ছে না তোমাকে।

লোকটি হাসল, জাত চাষী নই আজ্ঞে। অবস্থার বিপাকে প'ড়ে এই বয়সে লাঙল ধরতে হয়েছে।

চাষবাস আরম্ভ করেছ ক বছর?

এই বছর তিন চার হবে।

অন্ধকারের মধ্যে চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করলাম। সম্বল আকাশের বিদ্যুৎ আর মুখের সিগারেটের আগুনের স্ফুলিঙ্গ। সেই স্বল্প আলোতেই কপালের বলিরেখা, গালে, চোখের কোণে সময়ের হিজিবিজি আঁচড় চোখে পড়ল।

মাত্র তিন-চার বছর যদি মাঠে নেমে থাকে তো বেশ বৃদ্ধ বয়সেই চাষের কাজ শুরু করেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এর আগে কি করতে? চাষবাস আরম্ভ করার আগে?

লোকটি একটু ইতস্তত করল। ঢোঁক গিলল দু-একবার, তারপর কুণ্ঠা জড়ানো গলায় বলল, আগে পোস্টম্যানের কাজ করতাম।

পোস্টম্যান? বুঝতে পারলাম সেইজন্যই কথাবার্তার মধ্যে মার্জিত ভাবের রেশ রয়েছে। কিছু পরিমাণ ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। সামান্য লেখাপড়াও জানা দরকার।

হাসতে হাসতে বললাম, তাহলে, চাষ-বাস তোমার নিছক শখ বল। পেন্সন পাচ্ছ, শুধু বাড়তি রোজগারের আশায় এ বয়সে লাঙল ধরেছ। পরিবারে লোকসংখ্যা খুব বেশী বুঝি।

লোকটি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, না, বাবু বেশী আর কি। একটি মেয়ে ছিল তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা বুড়ো-বুড়ি আর বছর বারোর একটি ছেলে।

বিস্মিত হলাম।

তাহলে এ বয়সে এত খাটবার দরকার কি?

দরকার আছে বাবু, খুবই দরকার আছে। একটা অন্যায় করেছিলাম, তাই সরকার চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছে। পেন্সনও বাতিল করে দিয়েছে। আমি না খাটলে সবাই উপোস করে মরবে।

বৃষ্টি একটু কম। কিন্তু মেঘগর্জনের বিরাম নেই। আকাশের পিঠে বিদ্যুতের অন্তহীন কশাঘাত।

মন একটু একটু করে পিছু হটে আর এক ঘটনায় ফিরে গেল। সংবাদপত্রে পড়া

আর এক পোস্টম্যানের কর্তব্যচ্যুতির কাহিনী। সম্ভবত এই ধরণেরই কি একটা সাজা হয়েছিল। বয়স বেশী হওয়ার জন্য জেলে যাওয়াটা মকুব হয়েছিল। অবশ্য ঠিক মনে পড়ছে না।

সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। প্রশ্নটা করা সমীচীন হবে কিনা এ নিয়ে একটু ভাবলাম। তারপর কৌতূহলই জয়ী হল। বলেই ফেললাম,

আচ্ছা, এক পোস্টম্যানের ব্যাপার খবরের কাগজে বের হয়েছিল কয়েক বছর আগে। একটা টেলিগ্রাম না কি ডেলিভারী না করার দরুণ সাজা হয়েছিল।

লোকটি একবার আমার দিকে চেয়েই চোখ নামাল, খুব মৃদু কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, ওটা আমারই ব্যাপার। একটা টেলিগ্রাম ঠিক জায়গায় না দিয়ে মাঠের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম, তাই শাস্তি হয়েছিল বাবু। বলতে গেলে গুরু পাপে লঘু দণ্ডই হয়েছিল। যে অন্যায় আমি করেছিলাম, সাজা আমার আরও কঠিন হওয়াই উচিত ছিল।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকল। দণ্ড লঘু হয়েছে এমন অভিযোগ দণ্ডিতের কাছে অপ্রত্যাশিত।

তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কটা বেজেছে দেখুন তো বাবু।

ঘাড় হেঁট করে ঘড়ি দেখলাম। নটা পনেরো। আশ্চর্য, মনের গতির মতন সময়ের গতিও মন্থর। প্রহরের পর প্রহর খঞ্জপায়ে মহাকালের তোরণ পার হবার চেষ্টা করছে। কিংবা মনে হচ্ছে, এমন একটা জায়গায় এসেছি, যেখানে সময়ও বুঝি আমাদের নাগাল পায় না।

এখনও ট্রেন আসতে অনেক দেরী বাবু। শুনবেন আমার কাহিনী। যখন যে জানতে চেয়েছে, তাকেই বলেছি। এতে যদি একটু পাপ খণ্ডন হয় বাবু। মানুষের দেওয়া সাজার পালা তো শেষ হয়ে গেছে, ভগবানের শাস্তির অংশ যদি একটু কমে।

কোন উত্তর দিলাম না। বুঝতে পারলাম সত্যি মিথ্যা মেশানো একটা কাহিনীর এখনই আমদানী হবে। নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা।

পকেট থেকে আর একটা সিগারেট বের করে গোটা তিনেক কাঠি খরচ করে ধরালাম। টানের পর টান দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সৃষ্টি করলাম। ততক্ষণে কাহিনী শুরু হয়ে গেছে।

গাঁয়ের নাম গোলোকগঞ্জ। ঠিক গাঁও বলা যায় না বাবু, আধাশহর। রেললাইনের এপারে বিজলী বাতি আছে, পাকা শড়ক আছে, হরদম মালবোঝাই লরী চলছে। সেদিকটায় পোস্টঅফিস। আবার লাইনের ওপারে মজা ডোবা, তাল নারকেলের বন, খোড়ো চালের ঘর। দু-একটা বনেদী পাকা বাড়ীও আছে, তবে তার দৈন্যদশা প্রকট। বর্তমান মালিকদের সংস্কার করার মুরোদ নেই।

গোলোকগঞ্জে আমি ছিলাম টানা পাঁচ বছর। কাজ করতাম শহরের দিকে, কিন্তু থাকতাম লাইনের ওপারে। মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল। আমি একলা নয়। পোস্টঅফিসের ছোকরা কেরানীবাবু আর আমি। রান্নাবান্না আমিই করে দিতাম। অল্প মাইনেয় এদিকটায় সুবিধা। সপ্তাহে তিন দিন হাট। তাজা তরিতরকারি পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে এ বাড়ী ও বাড়ী থেকে শাকপাতাটাও জোটে। শ্যামল গাছপালার মতন এপারের লোকদের মনগুলোও সবুজ। দয়া, মায়া, মমতায় ভরাট।

সিগারেট হাতেই ধরা আছে। টানবার কথা আর মনে নেই। যে ভাবে লোকটি গোরচন্দ্রিকা শুরু করেছে, তাতে সারাটা রাতই হয়তো কেটে যাবে।

আমাদের বাড়ীর সামনে এক চিলতে জমি ছিল বাবু, অবসর সময়ে নিজের হাতে কুপিয়ে সেখানে তরকারির গাছ লাগিয়েছিলাম। কয়েকটা ফুলের গাছও ছিল। একেবারে বেড়ার ধার ঘেঁসে কয়েকটা শিউলি গাছ। সার সার বেলফুলের চারা। ফুলের সময় পাতা দেখা যেত না। ফুলে গাছ ভেঙে পড়ত।

মেয়েটি রোজ সকালে সাজি হাতে এসে দাঁড়াত।

একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটি? কে মেয়েটি?

ওই ভুবনবাবুর মেয়ে। ভুবন বাড়ুজ্জে। এক সময়ে দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। জমিদারের নায়েব, কিন্তু জমিদারের চেয়েও প্রতাপশালী। তবে কোনদিন অন্যায় করেন নি। গরীবের মা-বাপ। দুঃখীর জন্য শুধু চোখের জলই ফেলেন নি, তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। এ রকম দেবতার মত মানুষ শেষদিকে পঙ্কাঘাতে বিছানা নিলেন। জমিজমা যা ছিল, সবই প্রায় চিকিৎসাতেই গেল। ইদানীং যে কাছে যেত, তাকে কেবল মেয়ের কথা বলতেন।

আমার ওই মনোর জন্যই যত চিন্তা। ওর একটা ব্যবস্থা না হলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

মনো মানে মনোরমা। অপরূপ লাবণ্যময়ী। যেমন রঙ, তেমনই গড়ন। আর স্বভাব যেন মাটির মতন। কোনদিন উঁচু গলায় কথা শুনি নি।

তার বিয়ের অবশ্য খুবই চেষ্টা হচ্ছিল। কলকাতায় এক মামা ছিলেন। তিনি বুঝি বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। দেখাশোনাও চলছিল। কিন্তু ঠিক যেমনটি এঁরা খুঁজছিলেন, তেমনটি পাওয়া যাচ্ছিল না।

কাছেপিঠে কোথায় বাজ পড়ল। চমকে উঠতেই হাত থেকে সিগারেটটা অন্ধকারে জ্বলন্ত অর্ধবৃত্ত এঁকে মাটিতে গিয়ে পড়ল।

লোকটি আস্তে আস্তে বলল, দুর্গা, দুর্গা। আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার বলল, বড় দুর্যোগ বাবু।

খেই ধরিয়ে দিলাম, তারপর?

তারপর, লোকটি একটু বুঝি চিন্তা করল, সেই মেয়েটি, অর্থাৎ ভুবনবাবুর মেয়ে মনোরমা রোজ সকালে আমাদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়। পুজোর ফুল তুলতে। একেবারে বাড়ীর সংলগ্ন মন্দির। ভৈরবেশ্বরের বিগ্রহ। মনোরমা স্নান সেরে ফুল তুলে পুজোয় বসত।

অনেক দিন মগডালের শিউলি ফুলের নাগাল পেত না। আমাকে ডাকত। আমি এসে ডাল নীচু করে ধরতাম। কিংবা নাড়া দিতাম সজোরে, আর ঝরঝর করে ফুলের রাশ তার আঁচলে ঝরে পড়ত।

মাঝে মাঝে বলতাম, আমি ছুঁলে যে তোমার পুজোর ফুল অপবিত্র হয়ে যাবে মনোদিদিমণি, নয়তো ভোরে উঠে আমি তোমার জন্য সব ফুল পেড়ে রাখতাম, একটি মাটিতে পড়তে দিতাম না।

টানা দুটি ভ্রু বিস্ময়ে, কৌতূহলে মনোরমা বঙ্কিম করে তুলত। বলত, কেন, তুমি ছুঁলে অপবিত্র হবে কেন? আমার ভৈরবেশ্বর তোমাদের জাত-বিচারের অনেক ওপরে। দিনরাত তো ভূতপ্রেতের সঙ্গে ফেরেন। অত বামুন কায়েত বোঝেন না। যে ভক্তিভরে পুজো করবে, তার পুজোই তিনি নেবেন। কাল থেকে তুমি ফুল তুলে রেখ, আমি নিয়ে যাব।

বলেছিলাম বটে, কিন্তু এমন একটা কাজ করতে কখনও সাহস হয় নি। ভৈরবেশ্বর নাকি জাগ্রত দেবতা। আমি যেমন ফুল কুড়োয় নি, মনোদিদিমণিও তেমনি আর জোরও দেয় নি। নিজেই কুড়িয়ে নিয়ে গেছে ফুলের স্তূপ।

প্রত্যেকবার বিজয়ার দিন ভুবনবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম প্রণাম করতে।

ইদানীং আর কোন কথা বলতেন না। প্রণামের উত্তরে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে করতে বলতেন, দয়াল, মনোর জন্য একটা ভাল পাত্র দেখে দিতে পার। তুমি তো নানা জায়গায় ঘোর।

এবার পূজায় আকর্ষণীয় শাড়ীর সমাবেশ
নিউ বেনারসী হাউস
কলেজ স্ট্রীট জং • পূবে
কলিকাতা ৯ — ফোন ৩৪৭৯৭৫
বেনারসের দরে বেনারসী

শুনুন কথা বাবু। আমি গোলকগঞ্জের পোস্টম্যান। লোকের দরজায় দরজায় চিঠি বিলি করে বেড়াই। আমার চেনার পরিধি আর কতটুকু। আর বিয়ের পাত্র ঠিক করবার মতন এলেমই বা কোথায় আমার। কিন্তু তবু ভুবনবাবুর মনে দুঃখ দিতে চাই নি। ঘাড় নেড়ে বলেছি, দেখব আজ্ঞে, নিশ্চয় দেখব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

আমরা সবাই ভেবেছিলাম ভুবনবাবু বুঝি আর মেয়ের বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেন না। খুব বাড়াবাড়ি হল অসুখ। শহর থেকে বড় ডাক্তার এল। কাজ শেষ করে মাঝে মাঝে খবর নেবার জন্য গিয়ে দাঁড়াতাম।

ঠিক এমনি সময় এক সম্বন্ধ জুটে গেল।

শহর থেকে মামাই নিয়ে এলেন। ছেলে নাকি একেবারে রাজপুত্র। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। কোন বেসরকারী অফিসের প্রায় কর্ণধার। বছর চারেকের ওপর বিলেতে ছিল।

ভুবনবাবুর পক্ষে শহরে গিয়ে পাত্র দেখে আসা সম্ভব নয়, পাত্রের ফটো নিয়ে এলেন মনোরমার মামা। এক কথায় সবাই পছন্দ করে ফেললেন। দেনা-পাওনা নিয়ে কথা-বার্তা চলতে লাগল। ইতিমধ্যে পাত্রের বাপ আর কাকা এসে মেয়ে দেখে গেলেন। দুজনেই একবাক্যে স্বীকার করলেন, এমন মেয়ে লাখে একটা মেলে না।

আশ্চর্য কাণ্ড। ডাক্তারের ওষুধ বিষুধে যা হয় নি, মনোরমার বিয়ে স্থির হ'তে তাই হ'ল।

একটু একটু করে ভুবনবাবু সেরে উঠতে লাগলেন। একেবারে ওঠানামা করতে পারতেন না, কিন্তু আজকাল লাঠি ধরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেন। চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে এঘর থেকে ওঘর। এদিক থেকে ওদিক।

ভুবনবাবুই মেয়েকে সম্প্রদান করলেন। সকলেই ভেবেছিলেন, উনি একটানা অতক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারবেন না। কিন্তু ঠিক পারলেন। কষ্ট হ'লেও মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু বললেনও না মুখ ফুটে।

মনোরমার মামা নিজে এলেন নিমন্ত্রণ করতে।

আমি তো অবাক। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলাম, একি কাণ্ড, আপনি নিজে কেন এলেন এত কষ্ট করে। একবার খবর পাঠালেই আমি চলে যেতাম।

মামা হাসলেন, তা কি হয়। সামাজিক ব্যাপার। কন্যাদায়। আমাদের নিজেদের স্বারস্থ হ'তে হয়। তাছাড়া, মনো বার বার বলে দিয়েছে, দেখ মামা, দয়ালদাকে বলতে যেন ভুল না হয়। আর কারো ওপর ভার দিও না। তুমি নিজে বলে এস।

দুটো চোখ জলে ভরে এল। নিজের মেয়েটার কথা মনে পড়ল। ঠিক মনোর বয়সীই হবে। তবে খুব ছোটবেলায় বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

বিয়ের কথাবার্তা শুরু হতেই মনো বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছে। আমার এখানে ফুল তুলতে আর আসে না। ভোরে একবার ভৈরবেশ্বরের মন্দিরে যায়। তাও সঙ্গে ঝি থাকে।

সমস্ত গোলোকগঞ্জের নিমন্ত্রণ। ভুবন-বাবুর বাড়ী আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। স্টেশন থেকে বাড়ী পর্যন্ত মাঝে মাঝে নারকেল-পাতা দিয়ে গেট। ফটকে শানাই।

বিয়ে গোধূলি লগ্নে। তাই বর যখন এল, আমি চিঠি বিলি করছি। পথের ওপরই দাঁড়িয়ে পড়লাম। মেয়ের বাড়ী থেকে পাল্কি গিয়েছিল, কিন্তু বর পাল্কিতে ওঠে নি। পায়ে হেঁটেই চলে এসেছিল।

দয়াল একটু থামল। দম নিল। চোখ কুঁচকে বর্ষণক্ষান্ত আকাশের দিকে একবার দেখল।

ভাবলাম, এ একেবারে ধান ভানতে শিবের গীত শুরু হয়েছে। নিজের কর্তব্যচ্যুতির কথা বলতে গিয়ে সাড়ম্বরে এক বিয়ের বর্ণনা শুরু করেছে। হাতে কোন কাজ নেই, ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া। কর্মহীন অবকাশে এ ধরণের কাহিনী শুনতে মন্দ লাগছে না। বাধা দিতে মন চাইল না। বলুক দয়াল, কি বলতে চায়।

পথের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। অঙ্গে সরকারী খাকি পোশাক। কাঁধে ব্যাগ। হাতে চিঠির গোছা।

বর হাঁটছে বলে, বরযাত্রীদেরও হাঁটতে হ'চ্ছে। কেবল পিছনে বরের বাবা আর পুরোহিত আসছেন পাল্কিতে। সামনে বাজন্দার, পিছনে গ্যাসের বাতি। তখনও আকাশ থেকে রোদ সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। তাল-নারকেলের আগায় চিক্‌চিক্ করছে স্বর্ণচিহ্ন।

চোখের পলক পড়ল না। পুরুষমানুষ যে এত সুন্দর হয় ধারণাই ছিল না বাবু। নাক মুখ চোখ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। কাঁচা হলুদ বর্ণ। এক মাথা কুঞ্চিত চুলের রাশ। দীর্ঘ একহারা চেহারা। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, কান্তিমান।

মনোদিদির ঠিক উপযুক্ত। একেবারে সোনায় সোহাগা।

চিঠি বিলি শেষ করে, অফিসে মনি-অর্ডারের হিসাব বুঝিয়ে যখন ছুটি পেলাম, তখন রাত হয়েছে।

ঢালা বারান্দায় খাওয়া-দাওয়ার বন্দো-বস্ত। এক কোণে চেয়ারের ওপর ভুবনবাবু বসে। সব কিছু তদারক করছেন।

আমি যেতেই ঠিক টের পেলেন। বললেন, দয়াল, এত দেরী যে?

বললাম, কাজ শেষ করে আসতে রাত হয়ে গেল।

তারপর অনেকবার দেখা হ'য়েছে মনো-দিদির সঙ্গে। বরের সঙ্গে গরুর গাড়ীতে শ্বশুরবাড়ীতে যাচ্ছেন কিংবা ফিরছেন বাপের বাড়ী।

মাস খানেকের মধ্যেই প্রথম খাম হাতে এল। ওপরে মুক্তার অক্ষরে লেখা। শ্রীমতী মনোরমা দেবী। তলায় ভুবনবাবুর নাম। তার তলায় লেখা গোলোকগঞ্জ।

খামটা হাতে করে দেখলাম বেশ ভারী। আর একটু হ'লেই বাড়তি মাশুল লেগে যেত।

খামটা অন্য চিঠির থেকে একটু আলাদা করে রাখলাম। ব্যাগের মধ্যে নয়, আমার খাকি কোটের ভিতরের পকেটে।

ভুবনবাবুর বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে দেখি একেবারে সদর দরজার কাছে মনোরমা। সিঁথের লাল টকটকে সিঁদুর। হাতে শাঁখা। একেবারে নতুন রূপে, নতুন মানুষ।

আমি যেতেই মনোরমা ফটক পার হয়ে প্রায় রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল, দয়ালদা, আমার কোন চিঠি আছে?

হাসি সামলে গম্ভীর গলায় বললাম, তোমার চিঠি? কই না তো? তোমার চিঠি আবার কোথা থেকে আসবে?

মুহূর্তে শ্রাবণের মেঘ এসে মনোরমার মুখ ঢেকে দিল। হাসি মিলিয়ে গেল। ছলছলিয়ে এল দুটি চোখ। আস্তে আস্তে পিছিয়ে ফটকের ওধারে চলে গেল। মাথা নীচু করে খুব অস্ফুট গলায় বলল, আশ্চর্য, আজ মঙ্গলবার, আজই আসবার কথা।

ততক্ষণে কোটের পকেট থেকে আমি চিঠিটা বের করে ফেলেছি। চেঁচিয়ে বললাম, দেখো তো মনোদিদিমণি এই চিঠিটা কিনা?

মনোরমা ঘুরে দাঁড়াল। ছুটে এল আমার কাছে। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিল।

নিরীহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কার চিঠি গো দিদিমণি?

সিঁথের সিঁদুর মনোরমার দুটো গালে নামল। আমার দিকে চোখ তুলে একবার চেয়েই দৃষ্টি নামিয়ে বলল, ওই আমাদের কলকাতার গোমস্তার।

সেই থেকে আমিও মজা পেয়ে গেলাম। যতবার চিঠি এল, চিঠি মনোরমার হাতে তুলে দিতে দিতে বললাম, তোমার কলকাতার গোমস্তার চিঠি দিদিমণি। অনেক জমি-জমা, বিষয়-সম্পত্তির কথা নিশ্চয়, চিঠিটা যা ভারী।

মনোরমা একটা আঙুল নিজের ঠোঁটে রেখে ভ্রূ কুঁচকেছে, আঃ, একটু আস্তে দয়ালদা, বাবা ওপরের বারান্দায় বসে রয়েছেন।

মুখ তুলে দেখতাম, ভুবনবাবু সত্যিই বারান্দার কোণে চেয়ার পেতে বসে রয়েছেন। হাতে একটা বই। আমাদের কথাবার্তার শব্দ কানে গেছে এমন মনে হ'ল না।

চিঠির সংখ্যা বাড়ল। প্রথম প্রথম সপ্তাহে একটা, তারপর একদিন অন্তর। মাঝে মাঝে এ তরফের চিঠিও আমাকেই ফেলতে হ'ত। সে চিঠিও ওজনে নিন্দার নয়।

তারপর একদিন সেই সর্বনেশে খবর এল। সেই মারাত্মক টেলিগ্রাম।

কোন টেলিগ্রামে কি থাকে আগে থাকতেই আমরা তার খবর পেয়ে যাই। কোন

টেলিগ্রাম বিলি করে সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বকশিশের জন্য আর কোন টেলিগ্রাম দিয়ে রসিদ নিয়ে কান্না গোল ওঠবার আগেই পালিয়ে যেতে হয় সেখান থেকে তা আমাদের জানা। টেলিগ্রামবাবুর কাছ থেকেই খবর পেয়ে যাই।

এবারেও পেয়ে গেলাম।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। দুটো পা-ই ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগল। ইচ্ছা হ'ল খাকি পোশাকটা জমা দিয়ে ছুটে কোথাও পালিয়ে যাই। যে দিকে দু-চোখ যায়।

কিন্তু কোন উপায় নেই। ও বাঁটের পোস্টম্যান আমি। এ বার্তা আমাকেই বহন করে নিয়ে যেতে হবে।

তাও একবার শেষ চেষ্টা করলাম।

পোস্টমাস্টারবাবুর কাছে হাতজোড় করে দাঁড়ালাম।

শরীরটা বড় খারাপ লাগছে বড়বাবু। আজকের দিনটা যদি ছুটি দিতেন।

পোস্টমাস্টারবাবু নতুন। মাস তিনেক হ'ল এখানে বদলী হয়েছেন। খুব কড়া লোক। দয়া-মায়ার ধার ধারেন না। কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। বুঝতে চান না।

গোঁফজোড়া ফুলিয়ে বললেন, তাহলে তোমার কোটটা খুলে রেখে যাও দয়াল,

প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিল।

গায়ে দিয়ে আমি বেরোই চিঠি আর টেলিগ্রাম বিলি করতে।

এর ওপর আর কথা চলে না। চিঠি আর টেলিগ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

টেলিগ্রাম প্রথম বিলি করার কথা, কিন্তু আমি ঘুরে ঘুরে চিঠি বিলি করলাম। ভুবনবাবুর বাড়ীর কাছাকাছি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

শরীরটা এবার যেন সত্যিই খারাপ হ'ল। কপালের দু পাশে অসহ্য যন্ত্রণা। বুকের মাঝখানটাও টনটন করে উঠছে। চোখ বন্ধ করলেই চোখের সামনে ভেসে উঠছে মনো-দিদিমণির কালো চুলের মাঝখানে আয়োতির রক্তিমচিহ্ন।

দয়ালদা।

সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। একেবারে সামনে মনোরমা। কৌতুকহাস্যে মুখখানি উজ্জ্বল। খিড়কীর পুকুরে গা ধুতে চলেছে। এক হাতে গামছা আর শাড়ী।

তোমার সঙ্গে একদম আড়ি করে দেব দয়ালদা। আজ পাঁচ দিন গোমস্তার কাছ থেকে কোন চিঠি আন নি। পরশু আমি যে চিঠিটা দিয়েছিলাম, সেটা ফেলেছ কিনা কে জানে? আজও কোন খবর নেই তো?

আমি জানি না। নিজের থেকেই মাথাটা এদিক থেকে ওদিকে সঞ্চালিত হ'ল। নেতিবাচক।

তোমাদের পোস্টঅফিসটা ভাল করে খুঁজো তো দয়ালদা। কোথাও কোণে-টোণে পড়ে নেই তো? এ রকম তো হবার কথা নয়।

যখন খেয়াল হ'ল, তখন মনোরমা চলে গেছে। গাছের ফাঁকে আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। হাত থেকে চিঠি আর টেলিগ্রামটা পড়ে গিয়েছিল। চিঠিগুলো কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। টেলিগ্রামটা তেমনি পড়েছিল ঘাসের ওপর। হাজার চেষ্টা করেও ওটাকে আর তুলে নিতে পারি নি।

দয়াল থামল। মনে হ'ল যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। জীর্ণ বুকটা আবেগে ওঠা-নামা করছে। অতীতের একটা দৃশ্য থেকে দয়াল নিজেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

তারপর। শেষ হ'য়ে যাওয়া কাহিনীর শেষ শোনার অর্থহীন আগ্রহ।

তারপর ধরা পড়ে গেলুম বাবু। পোস্ট-মাস্টারবাবু জেরা করলেন। টেলিগ্রাম যে ঠিক জায়গায় বিলি করেছি তার রসিদ দেখাতে বললেন। কিছুই দেখাতে পারলাম না। পুলিশ এল। টেলিগ্রাম কুড়িয়ে পেল মাঠের ওপর থেকে। আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এজাহার। জবানবন্দী। কোর্টের ব্যাপার তো আপনি খবরের কাগজেই পড়েছেন। কর্তব্যে অবহেলা। আরও কঠিন সাজা হওয়া উচিত ছিল আমার, কিন্তু বয়স আর সার্ভিসের রেকর্ড দেখে লঘু দণ্ডই দিয়েছে। ওই গাড়ী আসছে বাবু। আগের স্টেশন ছেড়েছে। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

আবার বিদ্যুতের ঝিলিক। এ বিদ্যুতের আলো নতুন করে চেনাল দয়ালকে। খবরের কাগজের পাতা যে মানুষটাকে আড়াল করে রেখেছিল, সেই দণ্ডিত, কর্তব্যচ্যুত, অন্যায়-নিষ্ঠ মানুষটার নতুন এক পরিচয় উন্মোচিত করল।

হাতটা অসঙ্কোচে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, অচেনা জায়গা, তার ওপর এই দুর্যোগ, তুমি আমার হাতটা ধর দয়াল। পথ দেখিয়ে টিকেটঘরের কাছে নিয়ে চল।

# পলাতকার প্রত্যাবর্তন

শেষ পর্যন্ত উড়োজাহাজের টিকিট একটা কিনেই ফেললো সুমিতা। কাউকে খোশামোদ করতে হল না, কিউ দিতে হল না, কারো কাছ থেকে সুপারিশ আনতে হল না, বুকিং-অফিসে ঢুকেই টাকা গুনে দিয়ে টিকিট-খানা কিনে ফেলল সে। সুন্দরী মেয়ের জয় সর্বত্র। ট্যাক্সি ধরবার জন্য গড়িয়াহাটার মোড়ে মাত্র মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বহু লোক দাঁড়িয়েছিল সেখানে। চাতকের মতো ট্যাক্সির তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল তাদের। মিটার ডাউন করে একটি ট্যাক্সিওয়ালা চলেই যাচ্ছিল ওদের পাশ কাটিয়ে। হঠাৎ ব্রেক কষে সুমিতার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাবেন?"

গাড়িতে উঠে জবাব দিল সুমিতা, "চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনু। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস করপোরেশনের অফিসে চলুন।"

অফিসে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে কাউণ্টারের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়ে মধ্যবয়সী বুকিং-ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাবেন?"

"বাগডোগরা। সেখান থেকে দার্জিলিং। কত ভাড়া?"

"একশো দশ।"

ম্যাজিকের মতো কাজ হয়ে গেল। হ্যাণ্ড-ব্যাগের মধ্যে টিকিটখানা ভরে রেখে বেরিয়ে এল বাইরে। এবার একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে মুরারীলালের কাছে। গতকাল তার অফিসে টেলিফোন করে সুমিতা জেনে নিয়েছিল যে, মুরারীলাল পাণ্ডে চা-বাগান পরিদর্শনের জন্য দার্জিলিং গিয়েছে। ফিরে আসতে আরো পনরো দিন দেরি হবে। মস্ত বড় ব্যবসায়ী। ছেলেবেলায় একবার বিয়ে হয়েছিল। এখন মৃতদার। বছর চল্লিশ বয়স হবে। সুমিতার উনিশ। বি-এ পড়ছে। বি-এ পড়তে পড়তেই দার্জিলিং যাওয়ার জন্য উড়োজাহাজের টিকিট কিনে বসল। পনরো দিন অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য নেই আর। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কোটিপতির কাছে গিয়ে পৌঁছনো দরকার।

তার আগে মুরারীলালকে টেলিগ্রাম করল একটা। টেলিগ্রাম-অফিসে ঢুকেও অসুবিধে হল না কিছু। কেরানীবাবুটি বললেন, "এক ঘণ্টার মধ্যে টেলিগ্রামটা যাতে পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করছি।"

"বিশেষ ধন্যবাদ। খুবই জরুরী খবর।" কপালে হাত ঠেকিয়ে কেরানীবাবুটিকে নমস্কার করল সুমিতা।

বালিগঞ্জ অঞ্চলে পূর্ণ দাস রোডে ওরা বাস করে। বাড়িটা সুমিতার জন্মের আগেই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন ওর বাবা নিত্যবন্ধু মিত্র। বণিক অফিসে চাকরি করেন। তখন ভাড়া ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা। মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াও বাড়তে হয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে বিপদে পড়লেন নিত্যবন্ধুবাবু। ভাড়া-বৃদ্ধির বেড়াটা অতি দ্রুত উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। পঁয়ত্রিশ থেকে যখন একশো পঁয়ত্রিশে এসে ঠেকল তখন বেড়া টপকতে গিয়ে বার বার মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে লাগলেন। দুধের পরিমাণ দিলেন কমিয়ে। প্রতিদিন আধসের করে মাছ আসত সেটা হল এক পোয়া। মাংসের দোকানের সামনে দিয়ে মুখ নিচু করে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। ব্রিটিশ আমলে ট্রামের প্রথম শ্রেণীতে চেপে অফিসে যেতেন। এখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। সবসুদ্ধ পাঁচটি প্রাণী। তাদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য ক্রয় করা অসম্ভব হয়ে উঠল।

তার ওপর আবার একটি হরিণ পোষেন নিত্যবন্ধুবাবু। কয়েক বছর আগে একটা বাচ্চা হরিণ উপহার পেয়েছিলেন এক শিকারী-বন্ধুর কাছ থেকে। এখন আর বাচ্চা নয়। বেশ বড় হয়েছে। গায়ে-পায়ে মেদমজ্জার সমারোহ দেখবার মতো! মাংসাশীরা কখনো কখনো খাঁচার ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ওর নিতম্বের মাংসে খোঁচা মারবার চেষ্টা করে। দেখতে পেলে ছুটে আসে সুমিতা। গালাগাল করতে ছাড়ে না। হরিণের নিতম্বে খোঁচা মারার অর্থ কি? উল্টোদিকের বাড়ির রোয়াকে বসে যারা আড্ডা মারে তারাই আসে খোঁচা মারতে। শাড়ীর আঁচলটা তলার দিকে ভাল করে টেনেটুনে দিয়ে ধমকে ওঠে সুমিতা, "খবরদার, নিতম্বিনীর গায়ে হাত দেবেন না। অনুমতি না নিয়ে পরের বাড়িতে ঢুকেছেন। পুলিশকে ফোন করব নাকি?"

"পুলিশ? তারা আসবে না। তা ছাড়া আমি তো আপনাদের হরিণটাকে খেয়ে ফেলি নি। একটু শুধু সুড়সুড়ি দিচ্ছিলাম।"

এই পাড়াতেই থাকে ছেলেটা। বাড়িওয়ালা অম্বিকা মজুমদারের ছোট ছেলে পটলের বন্ধু। অম্বিকাবাবু দোতলায় থাকেন। পটল কিংবা তার বন্ধুরা কেউ কাজকর্ম করে না। রোয়াকে বসে শুধু নিতম্বিনীর মেদবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে।

নিতম্বিনী নামটা নিত্যবন্ধুবাবুই রেখে-ছিলেন। যখন রেখেছিলেন তখন সুমিতার বয়স ছিল কম। আজকাল সুমিতার কাছে থাকলে নিতম্বিনী নামটা উচ্চারণ করতে লজ্জা পান তিনি। সুমিতার মা-ও সাবধান হয়ে গিয়েছেন। ডাকবার আগে রোয়াকের দিকে দৃষ্টি ফেলেন একবার। তাঁর বিশ্বাস

ছেলেগুলো আজকাল সুমিতার দিকে চেয়ে থাকে, হরিণের দিকে নয়।

এ-বাড়ির আনন্দের উৎস হচ্ছে নিতম্বিনী। সুমিতার ছোট ছোট দুটি ভাই সন্তু আর ভন্তু হরিণটাকে নিয়ে সারাদিন খেলা করে। অফিস থেকে ফিরে এসে প্রথমেই নিত্যবন্ধুবাবু খোঁজ নেন, নিতম্বিনী সুস্থ আছে কিনা। ঠিক সময়ে তাকে খাওয়ানো হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন করেন তিনি। সুমিতারও চোখের মণি হচ্ছে হরিণটা। নৃত্যশিল্পী হিসেবে সুমিতা নাম করেছে খুব। নিতম্বিনীর সামনে নাচের মহড়া দেয় সে। তাকে নাচ শেখাবার চেষ্টা করে। কয়েক বছর চেষ্টার পরেও নিতম্বিনী আজকাল একটু আধটু কোমর দোলায়, কিন্তু নাচতে পারে না। তাই দেখেই মিত্র-পরিবারের সবাই হাসতে হাসতে লুটোপুটি খায়। বাড়িভাড়া একশো পঁয়ত্রিশ টাকা হওয়ার পর সিনেমা-থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন নিতম্বিনীর কোমর-দোলানি দেখে আমোদ-আহ্লাদের শখ মেটায় এরা।

কদিন আগে চটিজুতোয় প্রচণ্ড আওয়াজ করতে করতে বাড়িওয়ালা অম্বিকাবাবু নেমে এলেন একতলায়। রবিবার বলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করছিলেন নিত্যবন্ধুবাবু। নিতম্বিনীও বসে ছিল সেখানে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে অম্বিকা মজুমদার জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়ি আছেন নাকি, মিত্রমশাই?"

অম্বিকাবাবু একজন পেন্সনপ্রাপ্ত সাবজজ। যে বছর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় সেই বছরই [illegible] থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন তিনি। দুটি ছেলে। বড়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য বিভাগে চাকরি করে। ছোটটি এখনও বেকার। ঘোরতর বামপন্থী। কোনো দলের সভ্য নয় যোগ দেয় নি, কিন্তু যে কোনো বামপন্থী [illegible] শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। সভা [illegible] যোগ দেওয়ার পর বাকী সময়টুকু যায় করে উল্টোদিকের বাড়ির রোয়াকে বসে।

চৌকির ওপর পা গুটিয়ে বসে অম্বিকাবাবু বললেন, "মস্ত বড় শোভাযাত্রা বেরুবে আজ। খেয়েদেয়ে একটু আগেই আমার ছোট ছেলে পটল বেরিয়ে গেল। সুমিতা বুঝি মিটিং কিংবা মিছিলে যোগ দেয় না?"

"না।" গম্ভীর সুরে জবাব দিলেন নিত্যবন্ধু মিত্র।

"কেন? এই দুর্দিনে শুধু পাড়ায় পাড়ায় নেচে বেড়ালে চলবে কেন? কাল তো দেখলাম খবরের কাগজে সুমিতার ছবি বেরিয়েছে। বেশ আছেন আপনি—"

"কি রকম?"

"তিনখানা বড় বড় ঘর, ভাড়া দেন মাত্র একশো পঁয়ত্রিশ—খবরের কাগজে মেয়ের ছবি ছাপা হয়। তার ওপর আবার হরিণ পোষেন। আপনি মশাই রাজালোক! এদিকে তো শুধু ট্যাক্স বাড়িয়ে চলেছেন দিল্লীর বড়কর্তারা। সবাইকে দিয়ে-থুয়ে যা বাঁচে তা দিয়ে আর দুটি সাদা ভাতও জুটে উঠছে না। মশাই, চল্লিশ টাকা চালের মণ! বড় ছেলেটা পেটের ব্যারামে ভুগছে বলে মাসের মধ্যে পনরো দিন বার্লির জল খায়। কিন্তু বামপন্থী পটল আমার পথে বসাল! দু-বেলায় তিন পো চালের ভাত মারে—"

"মারবেই তো। মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হয় অনেক।" নিতম্বিনীর গায়ে হাত বুলতে বুলতে মন্তব্য করলেন নিত্যবন্ধুবাবু।

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম—" গলার সুরে দোলা দিয়ে অম্বিকাবাবু বললেন, "আসছে মাস থেকে আরো পনরোটা টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিতে হবে। একেবারে সোজাসুজি একশো পঞ্চাশ।"

"বলেন কি! এই তো এক বছর আগে কুড়ি টাকা বাড়িয়ে দিলাম।" হরিণটাকে খোঁচা মেরে ঘর থেকে বার করে দিলেন সুমিতার বাবা।

"দিল্লীর বড়কর্তারা যা কাণ্ড করে চলেছেন তাতে ছ মাস পর পর ভাড়া বাড়িয়ে দিতে হবে। চলি এবার—"

"কিন্তু আর তো ভাড়া বাড়ানো চলবে না।"

"কেন?" দরজার ও-পাশে ঘুরে দাঁড়ালেন অম্বিকাবাবু।

"মাইনের টাকা থেকে উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না।"

"সে কথা বললে বাড়িওয়ালার পেট ভরবে কেন? তা মশাই এক কাজ করুন। আমি হচ্ছি গিয়ে শান্তিপ্রিয় লোক। ঝগড়াঝাঁটি পছন্দ করি না। অন্য কোথাও একটা ফ্ল্যাট দেখে উঠে যান।"

পাশের ঘর থেকে কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল সুমিতা। রাগের জ্বালায় সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছিল ওর। অম্বিকাবাবুর সামনে এসে সুমিতা বলল, "একটি পয়সাও ভাড়া আর বাড়াব না আমরা। আপনার যদি সংসার না চলে তা হলে পটলদাকে চাকরি করতে বলবেন। পঁয়ত্রিশ টাকার বাড়ি একশো পঁয়ত্রিশ হয়েছে, আর কি চান আপনি? দুধ খাওয়া তো বন্ধই হয়ে গিয়েছে, আপনি কি চান সন্তু আর ভন্তু ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে বাড়ি বসে থাকবে? দরকার হয় এবার আমরা আইনের সাহায্য নেব।"

"আইনের সাহায্য?" হো হো করে হেসে উঠলেন অম্বিকা মজুমদার। তারপর বললেন, "আইন আদালতের মধ্যেই তো সারাটা জীবন কাটিয়ে এলাম মা, কিন্তু—যাক গে, তুমি একজন নৃত্যশিল্পী, তোমাকে আইন-আদালতের গল্প শুনিয়ে লাভ নেই। যাদের অর্থবল আছে তারাই, শুধু আইন-আদালতের সাহায্য পায়। মিত্রমশাই, পরের মাসে একেবারে দুশো টাকার একটা রাউন্ড ফিগার নিয়ে আসবেন।"

।। দুই ।।

তারপর কয়েকটা মাস কেটে গিয়েছে। নিত্যবন্ধুবাবুর কাজ বেড়েছে একটা। প্রতি মাসে রেন্ট কন্ট্রোলারের অফিসে ভাড়া জমা দিতে যেতে হয়। সুমিতার কথা শোনবার পর একশো পঞ্চাশ টাকা নিতেও রাজী হন নি বাড়িওয়ালা।

ভাড়াটে তুলে দেওয়ার জন্য আদালতেও যাননি তিনি। মাঝে মাঝে শুধু একতলার আলো আর পাখা বন্ধ করে দেন। সন্তু গিয়ে নালিশ করলে অম্বিকাবাবু বলেন, 'ওতে আমার কোনো হাত নেই, বাবা। ইলেকট্রিক কোম্পানি 'লোড শেডিং' করছে।' কোনো কোনো দিন সকালবেলা কলের জলও যাচ্ছে বন্ধ হয়ে। তাড়ার মুখে স্নান করতে পারেন না নিত্যবন্ধুবাবু। সকাল সাড়ে আটটায় তাঁকে অফিসে বেরুতে হয়।

রাত্রে যখন বাড়ি ফিরে আসেন তখন শরীর আর মন থাকে ক্লান্ত হয়ে। কোনো রকম অভাব-অভিযোগের কথা শুনতে গেলে মেজাজ যায় বিগড়ে। প্রতিদিনই নতুন উৎপাতের সংখ্যা বাড়ছে। মাঝরাত্তিরে চটিজুতোয় আওয়াজ করতে করতে এক-তলায় নেমে আসেন বাড়িওয়ালা। দুমদাম করে দরজা বন্ধ করেন। একবার দুবার নয়, বার কয়েক নীচে-ওপরে নামা-ওঠা করেন তিনি। ঘুম ভেঙ্গে যায় নিত্যবন্ধুবাবুর। বাকী রাতটা জেগে জেগে কাটিয়ে দেন তিনি। সুমিতার ওপর রাগ হয় তাঁর। কি দরকার ছিল বুড়ো মানুষটাকে আইনের ভয় দেখাবার? লোকটা পেন্সনপ্রাপ্ত সাবজজ হলেও স্বাধীন ভারতের আইনকানুন সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। তা ছাড়া কলকাতার যা অবস্থা তাতে তিনখানা বড় বড় ঘরের জন্য দুশো টাকা তিনি অবশ্যই দাবি করতে পারেন। শুধু তিনখানা ঘর বললেই সব কথা বলা হল না। বাড়ির দক্ষিণ দিকটা খোলা। তিনখানা ঘরেই হু-হু করে হাওয়া ঢোকে। সামনের খালি জমিটুকুর একধারে নিতম্বিনীর জন্য একটা খাঁচা তৈরী করেছেন নিত্যবন্ধুবাবু। খাঁচার জন্য আলাদা ভাড়া দিতে হয় না তাঁকে। কলকাতার ব্যাপার দেখে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যান নিত্যবন্ধু মিত্র। ভাবেন, দেশটাকে চালাবার জন্য বোধহয় আজকাল আর লোকের দরকার হয় না, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো নিজে থেকেই চলে। প্রীতি ও সহানুভূতির স্পর্শবঞ্চিত যন্ত্রটার প্রকৃতি কী নিষ্ঠুর!

হ্যাণ্ডব্যাগ ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নিল না সুমিতা। ভোর ছটার মধ্যে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুর অফিসে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। ভাঙা মাস্তুলের মতো কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। পালিয়ে যাচ্ছে সুমিতা। আবার যখন ফিরে আসবে তখন সে কোটিপতির স্ত্রী।

সাতটার মধ্যেই দমদম পৌঁছে গেল। আগে কখনো বিমানঘাঁটিতে আসবার সৌভাগ্য হয়নি সুমিতার। পৃথিবীর নানা-দেশের লোক এখানে জড়ো হয়েছে। হৈ-চৈ নেই। হল্লা-চিৎকার কানে আসছে না। একটা আন্তর্জাতিক পরিবেশের মধ্যে নিরাপদে এবং নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে বেড়াতে পারছে। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী বলে সুমিতাকে চিনতে পারছে না কেউ। পটলদা কিংবা তার দলের একটি লোকও এখানে বসে আড্ডা মারছে না। পালিয়ে এসে ভাল করছে। কোটিপতির বউ হয়ে পূর্ণদাস রোডের বুকের ওপর দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলবে। পটলদাদের শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে।

যাত্রীদের মুখগুলি কী আশ্চর্য সুন্দর! প্রত্যেকের মুখেই ভদ্রতা আর শিক্ষার ছাপ সুস্পষ্ট। আচার-ব্যবহার একেবারে নিখুঁত। কথা বলতে গিয়ে একে অপরকে

ধন্যবাদ জানাচ্ছে। একটু আগেই সুমিতার পাশ কাটিয়ে একটি ভদ্রলোক কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ওর গায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেলেন তিনি। তেমন কিছু উদ্দেশ্য-মূলক ধাক্কা নয়। কলকাতার ট্রামে-বাসে চলতে গিয়ে প্রতিদিনই ধাক্কা খায় সুমিতা। তার মধ্যে উদ্দেশ্য থাকে। অভদ্রতার প্রমাণ থাকে। কিন্তু এই ভদ্রলোকটি ট্রাম-বাসের যাত্রী নন। মুখ ঘুরিয়ে সুমিতাকে বললেন, 'দুঃখিত—'

দুঃখিত? গায়ে একটু ধাক্কা লেগেছে বলে দুঃখপ্রকাশ করছেন তিনি! কে এই বিমানযাত্রী? বাঙালী, হ্যাঁ নিশ্চয়ই বাঙালী। চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে। এক সময়ে পূর্ণদাস রোডে থাকত। পটলদার সঙ্গে রোয়াকে বসে মাঝে মাঝে আড্ডাও মারত। হ্যাঁ, ঠিক, এই তো সেই দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত! সুমিতাকে বিয়ে করবার জন্য পটলদার মারফৎ প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বদলে গেল নাকি?

কাউন্টারের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে উল্টো-দিকের লোকটির সঙ্গে কথা বলছিল দেবপ্রসাদ। ইংরেজীতে কথা বলছিল সে। কী সুন্দর ভাষা, আর কী সুন্দর বাচন-ভঙ্গী! অবাক হয়ে গেল সুমিতা। পটলদার বন্ধুদের মধ্যে যে কেউ এমন সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে, নিজের কানে না শুনলে যেন বিশ্বাস করত না সে। দেবপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুমিতা। পূর্ণদাস রোডের সেই রোয়াকটির কথা মনে রইল না আর।

ডানদিকে মুখ ঘোরাতেই সুমিতাকে পেল দেবপ্রসাদ। অবাক হওয়ার সুরে জিজ্ঞাসা করল সে, 'আরে মিস মিত্র—মানে সুমিতা, তুমি এখানে? কোথায় চললে?'

'দার্জিলিং।

'এই ঘোর বর্ষায় দার্জিলিং কেন?'

'একটা জরুরী কাজ আছে। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'শিলিগুড়ি। বেশ ভালই হল। বাগ-ডোগরা বিমানঘাঁটি পর্যন্ত একসঙ্গেই যাওয়া যাবে। দার্জিলিং-এ নাচ-গানের জলসা আছে বুঝি?'

'না—অন্য কাজ আছে একটা।' খোলা বারান্দার দিকে হাঁটতে হাঁটতে সুমিতাই জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আজকাল চাকরি-বাকরি করছ বুঝি?'

'হ্যাঁ। বছর তিন আগে একটা কভেনেন্টেড চাকরি পেয়ে গেলাম। পেট্রল কোম্পানি। শিলিগুড়িতে মস্ত বড় পেট্রল ডাম্প খোলা হয়েছে তা বোধহয় তুমি খবরের কাগজে দেখেছ—'

'না। আমি খবরের কাগজ পড়ি না দেবপ্রসাদ, কত টাকা মাইনে দেয় ওরা?'

সব মিলিয়ে এখন বারো শো পাচ্ছি। পরে আরো বাড়বে।'

'এতো টাকা তোমায় ওরা মাইনে দেবে কেন? কথাটা বলে ফেলেই লজ্জিত বোধ করল সুমিতা। তারপর সংশোধনের চেষ্টা করতে করতে বলতে লাগল সে, 'রাগ করো না দেবপ্রসাদ। আমি বলতে চাইছিলাম যে, পেট্রল সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকলে এতো টাকা মাইনে কেউ পায় কিনা। পটলদা তো পঞ্চাশ টাকা মাইনেতেও চাকরি পাচ্ছে না, অর্থাৎ—'

কথাটা শেষ করতে পারল না সুমিতা। তার আগেই হেসে ফেলল দেব-প্রসাদ। হাসতে হাসতে বলল সে, 'পেট্রো-কেমিকেল সম্বন্ধে আমার খানিকটা জ্ঞান আছে। থিসিস লিখে ডক্টরেট পেয়েছি। অবিশ্যি সেটা কিছু বড় কথা নয়। রাশিয়ায় গিয়ে সেখানকার খনিতে দু বছর কাজ করে এসেছি। চলো, এবার আমাদের ডাক পড়েছে। প্লেনে চাপতে হবে।'

যাত্রীর ভিড় নেই। ওরা দুজন পাশা-পাশি বসল। উড়োজাহাজে এই প্রথম চাপছে সুমিতা। নানা রকমের কৌতূহল থাকাই উচিত ছিল সুমিতার। কিন্তু সমস্যার জালে মনটা ওর এতো বেশি জড়িয়ে পড়েছিল যে, অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না। কাঠের পুতুলের মতো দেবপ্রসাদের পাশে চুপ করে বসে রইল সে।

হঠাৎ এক সময়ে জিজ্ঞাসা করল সুমিতা, 'পটলদার সঙ্গে তোমার আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না?'

'পূর্ণদাস রোড থেকে উঠে আসবার পর আর কোনোদিনও দেখা হয়নি। কেন বলো তো?'

প্রায় বারো হাজার ফুট ওপরে ওঠে এসেছে উড়োজাহাজ! মাথার ওপরে নীল আকাশ, তলায় ঘন মেঘ। দেবপ্রসাদের দিকে ঝুঁকে বসে সুমিতা বলল, 'পটলদা সেদিন আমাকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়েছিল। লাগাতে পারেনি—'

হ্যাঁ, তাই তো দেখছি'—সুমিতার মুখটা একবার ভাল করে দেখে নিল দেবপ্রসাদ।

'বাবা আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বা দিকের গালের চামড়া পুড়ে গেল। দিন পনরো হাসপাতালে থেকে এলেন।'

'কি চায় পটল?'

'বলেছে পেট্রল ঢেলে আমাদের সকলকে পুড়িয়ে মারবে।'

'পেট্রল? ও, হ্যাঁ পেট্রল। কিন্তু কেন?'

'আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলছে। তুমি তো এক সময়ে পটলদাদের সঙ্গে রোয়াকে বসতে। একবার বিয়ের প্রস্তাবও পাঠিয়েছিলে। তাই না?' জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'হ্যাঁ—তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম। বুদ্ধিসুদ্ধি পাকেনি। আমার অপরাধ হয়ে-ছিল।' হাসবার চেষ্টা করল দেবপ্রসাদ। তারপর একটু থেমে সেই বলল, 'আমায় তুমি ক্ষমা করো।'

'আগে আমার কাহিনীটা শুনে নাও,' একটু জড়সড় হয়ে বসে সুমিতা বলল, 'আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। মা, বাবা, সন্তু আর ভন্তু কেউ জানে না। পটলদাদের অত্যাচার সহ্য করতে পারলাম না। বাবার উপায় নেই, নইলে তিনিও পালাতেন। সমাজের যে অংশটায় অত্যাচার নেই সেখানে গিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া নিতেন তিনি।'

'সমাজের কোন অংশটায় অত্যাচার নেই বলে তোমার বিশ্বাস?' আলোচনাটা ব্যক্তিগত স্তর থেকে সাধারণ স্তরে টেনে তোলবার চেষ্টা করল দেবপ্রসাদ।

একটু ভেবে নিয়ে সুমিতা বলল, 'সেই জন্যই আমি কোটিপতিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। মুরারীলালকে টেলিগ্রাম করেছি। দার্জিলিং এসেছে চা-বাগান পরিদর্শন করতে।'

'মুরারীলাল কে?'

'মুরারীলাল পাণ্ডে। বিরাট বড়লোক। নিউ এম্পায়ারে যতবার নাচতে গিয়েছি ততবারই সে সামনের সীটে বসে থাকত। টিকিট কিনত না, প্রতিবারই হাজার টাকা করে ডোনেশন দিত। তারপর ঠিক তোমার মতো বিয়ের প্রস্তাব পাঠাল।'

'বললাম তো তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম'—বিব্রত বোধ করল দেবপ্রসাদ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'মুরারীলালের বয়স কত?'

'চল্লিশ। এতকাল তো প্রস্তাবটাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। এখন নিজেই চলেছি তাকে খোশামোদ করতে।'

'ছি-ছি—খোশামোদ করতে যাচ্ছ কেন?'

'যাচ্ছি মনের দুঃখে। ও কি? কানে তুলো গুঁজলে কেন?'

'ইঞ্জিনের আওয়াজ সহ্য করতে পারি না। কাহিনীটা বলো আমি শুনছি।' কণ্ঠস্বরে সহানুভূতির আতিশয্য প্রকাশ করল দেবপ্রসাদ।

সুমিত্রার চোখ প্রায় ভিজে উঠেছে। কপালের ওপর হাত রেখে বলল সে, "অ্যাসিড বালব ছোঁড়ার পরেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। মুরারীলালের কথা মনে পড়ে নি একবারও। মনে পড়ল চারদিন আগে। প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে টাকা তুলে দেব বলে নাচতে গিয়েছিলাম নিউ এম্পায়ারে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বেজে গেল। যখন ফিরলাম তখন দেখি, একতলাটা অন্ধকারে নিমজ্জিত। কেমন একটা বিয়োগান্ত পরিবেশের চিহ্ন দেখলাম আমি। নিতম্বিনীর খাঁচার সামনে বসে নন্তু আর ভন্তু হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে। ওপর। ব'সে ব'সে তাঁরাও চোখের জল ফেলেছেন। গতকাল থেকেই নিতম্বিনীকে পাওয়া যাচ্ছিল না। অফিস কামাই ক'রে সারাটা দিন বাবা নিতম্বিনীকে খুঁজছেন। দু'-তিন মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনো জায়গাই খুঁজতে বাকী রাখেন নি তিনি। এমন কি সন্তু আর ভন্তু পর্যন্ত ইস্কুলে যায় নি। মায়ের মনের অবস্থাও ভাল ছিল না। রান্নাবান্না বিশেষ কিছু একটা করলেন না। তারপর ও'রা বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেলেন, পটলদারা নিতম্বিনীকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলেছে। খানিকটা মাংস মাটির হাঁড়িতে ক'রে কে যেন রেখে গিয়েছে খাঁচার সামনে।"

"এ তো অরাজকতা!"

"কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার—পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড! সেই দিন রাত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, কোটিপতিকে বিয়ে করব। টাকার মুগুর মেরে কুকুরগুলোকে শায়েস্তা করব। দেবপ্রসাদ, আমার বিয়েতে সাক্ষী থাকবে তুমি?"

"সাক্ষী?—যদি বলো, থাকতে পারি। শুধু একটা কথাই ভাবছি—"

"কি কথা?"

"তোমার বাবা আর মাকে জানিয়ে-শুনিয়ে বিয়ে করলে হ'তো না?"

"জানিয়ে-শুনিয়ে কোটিপতিকে বিয়ে করা যায় না। তুমি বিয়ে করো নি, দেবপ্রসাদ?"

প্রচণ্ডভাবে নড়ে উঠল উড়োজাহাজটা। মেঘের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। বাগডোগরা বিমানঘাঁটিতে নামবার সময় হয়েছে। যাত্রীরা সবাই কোমরে বেল্ট বেঁধে নিঃশব্দে ব'সে রয়েছে। মিনিট দশেক চেষ্টার পর ঘোষণা শুনল যাত্রীরা : "আমরা আবার দমদম ফিরে যাচ্ছি। অবতরণ করা সম্ভব হ'ল না। বিমানঘাঁটিতে এক হাঁটু জল জমেছে।"

দেবপ্রসাদের হাতটা ফস ক'রে চেপে ধ'রে সুমিত্রা বলল, "দেখলে তো আমার ভাগ্য কত খারাপ! প্রকৃতি পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধতা করল! তা মুরারীলাল নিশ্চয়ই বাগডোগরায় এসে অপেক্ষা করছে। দেবপ্রসাদ, এখন আমি কি করব?"

"দমদমে ফিরে যাই আগে, তারপর ভাবব।"

"না, অতোক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে পারব না। একটা পথ তুমি বাৎলে দাও আমায়।" চেয়ারের গায়ে এলিয়ে পড়ল সুমিত্রা।

বেলা এগারোটার মধ্যেই আবার ওরা ফিরে এল দমদম বিমানঘাঁটিতে। খবর নিয়ে জানল, অন্ততঃ তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে যাত্রীদের।

দেবপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুমিত্রা।

দেবপ্রসাদ বলল, "তিন ঘণ্টা অনেক সময়। এখানে ব'সে থেকে লাভ কি?"

"কি করতে চাও?" সুমিত্রার দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা।

"ট্যাক্সি চেপে চলো পূর্ণদাস রোড থেকে ঘুরে আসি।"

"সেখানে কেন?"

"সবার সঙ্গে দেখাশুনা ক'রে আসবে। অতো বড় একটা খবর, শুনলে তোমার বাবা-মা খুশী হবেন। শুভ কাজে তাঁদের আশীর্বাদ চাই। পটলরাও দেখুক, ভয় পেয়ে তুমি ওদের সমাজটাকে ত্যাগ করো নি। চলো, একটা ট্যাক্সি এখনো দাঁড়িয়ে আছে।"

ট্যাক্সিতে উঠে বসল ওরা। ঝুপ ঝুপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। কখন যে শ্যামবাজারের মোড়টা পার হয়ে গেল টের পেল না সুমিত্রা। গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছে। যাত্রা শুভ হয় নি। বাগডোগরায় নামতে পারল না প্লেন। চৌরঙ্গীর মোড়টা পার হয়ে আসবার পর সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করল, "আজ আমরা বাগডোগরায় ফিরে যেতে পারব তো?"

"দু একদিন পরে গেলেও তো ক্ষতি কিছু হবে না।"

"না, না তা হয় না।" দেবপ্রসাদের দিকে ঝুঁকে বসে সুমিত্রা বলল, "ফের যেতেই হবে। মুরারীলাল ব'সে থাকবে সেখানে। তাকে আমি কিছুতেই নিরাশ করব না। বুঝলে দেবপ্রসাদ, বিয়ের পর পটলদাদের বাড়িটা আমি ডবল দাম দিয়ে কিনে নেব। বাবার কাছ থেকে ভাড়া নেব না আমরা।"

"বিনে ভাড়ায় তিনি ওখানে থাকবেন না। কোটিপতি জামাই-এর কাছে মাথা নিচু করবেন কেন তোমার বাবা?"

"বেশ, তাহ'লে পঁয়ত্রিশ টাকা ক'রে চাইব আমরা।"

"তাঁর আত্মসম্মানবোধ প্রখর। তেতাল্লিশ সালের ভাড়ায় তিনি তেষট্টি সালে তিনখানা ঘর কিছুতেই দখল ক'রে থাকবেন না। তোমার বাবাকে আমি চিনি।" একটু হেসে দেবপ্রসাদ বলল, "আপাতত বাগডোগরায় যাওয়ার দরকার নেই। কয়েকটা দিন পূর্ণদাস রোডেই থেকে যাও—"

প্রতিবাদের সুরে ব'লে উঠল সুমিত্রা, "না, না—কক্ষণো না। ওখানকার অবিচার আর অত্যাচারের মধ্যে কিছুতেই ফিরে যাব না আমি।"

"তুমি শিল্পী ব'লেই তো অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। পালিয়ে যাবে কেন?" সুমিত্রার হাতের ওপর চাপ দিয়ে দেবপ্রসাদই ঘোষণা করল, "আমি থাকব তোমার পাশে।"

সেই দিনই উড়োজাহাজের টিকিটখানা ফেরৎ দিয়ে এল সুমিত্রা মিত্র। দেবপ্রসাদও আর যায় নি।

অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিল সে।

অনুরাগের আবেশে যেন আত্মমগ্ন সুপ্রিয়।

কেউ যেন কখনও আর প্রেমে পড়ে না। কেউ আর কাকেও ভালবাসে না।

দিন নেই রাত নেই বিভ্রান্তিতে সুপ্রিয় যেন বিভোর সদাক্ষণ। থাকে অন্যমনে। যেন অন্য এক পৃথিবীর স্বপ্ন তার চোখে। কথা বলছে, যদিও কথায় মন নেই। অফিসের কাজ করে যেন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। বাঁধাধরা মামুলি রুটিনমাফিক কাজ মার্চেন্ট অফিসের, অভ্যাসের আয়ত্তে চালিয়ে যায় সুপ্রিয়। প্রশংসা বা নিন্দার কোন মূল্য দিতে চায় না। কোথায় কাজে কেরামতি দেখিয়ে অন্যান্য সকলের অনুসৃত পথে চলবে ওপর-ওয়ালাদের তুষ্ট রাখতে, সুপ্রিয় ভিন্ন পথে চলে। মহাজনদের পথ ধরে না সে। কাজ করতে করতে কাজের কাজীকে প্রসন্ন রাখা যে কাজেরই অন্তর্গত—মানতে চায় না। ফাঁকি না দিয়ে চিনির বলদের মত কাজ চালিয়ে গেলেই যে পদোন্নতি হয় না এ পোড়া দেশে, সুপ্রিয় দেখেশুনেও বুঝতে চাইলো না। সজ্জনের নির্ভেজাল সততার তারিফ করে না কেউ, কে বোঝাবে তাকে এই চরমতম সত্য!

প্রেমের ঠাঁই অনেক উঁচুতে। প্রথম আর প্রধান। সব কিছুর ঊর্ধ্বে।

সুপ্রিয়র কাছে চাকরী অফিস বড়সাহেব ফাইল লেজার মুখ্য নয় গৌণ। আগে ভালবাসা, তারপর আর কিছু। খেয়ে প'রে সুখে থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রেম নয়, প্রেমের জন্যই এই মরদেহ ধ'রে জীবনধারণ। অবশ্য তার সঙ্গে একমত হবে, এমন এক-জনেরও আর আজকের দিনে দেখা মেলে না।

ছুটির সময় যত এগিয়ে আসে তত যেন গতি আর চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেরানীদের চোখ পড়ে তখন ঘড়িতে। কত দেরী আর! আর কত দেরী পাঁচটা বাজতে! কাজের ঝামেলা মুলতুবী রেখে উঠে পড়া যায়। আজকের মত বকেয়া কাজ বাকী থাকবে। ঘড়ির ঐ চলমান কাঁটা দুটিকে যদি কোন যাদুমন্ত্রে এগিয়ে দেওয়া যায় যৎসামান্য। যেন বিজলীর শক খেয়ে খেয়ে এক পা এক পা এগিয়ে চলেছে মুহূর্তের কাঁটা!

আর মাত্র পাঁচ মিনিট! পাঁচটা বাজতে।

দেওয়াল-ঘড়ি থেকে উন্মুখ চোখ নামিয়ে টেবলের সরঞ্জাম সাজাতে শুরু করলো সুপ্রিয়। মোটা মোটা বৃহদাকার খাতা, সশব্দে মলাট বন্ধ করতে থাকে। দোয়াত, কলম, লাল-নীল পেন্সিল, পিনের কুশন যথাস্থানে রাখতে রাখতে জানুর সাহায্যে টেবলের আলমারির পাল্লাটা বন্ধ করলো। আবার এক শব্দ কাষ্ঠ-আঘাতের। সুপ্রিয় চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে সটান। ভাব দেখায় এমন, যেন আজও সে অন্যান্য দিনের মতই সমান ব্যগ্র। অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার নিত্যনৈমিত্তিক আগ্রহ তার মুখে।

অন্য দিনের কথা জানি না, আজকের দিনটি কিন্তু ঠিক অন্যদিনের সমতুল্য নয়। আজ এক বিশেষ দিন। সুপ্রিয়র এই ব্যস্ততা সকলেই লক্ষ্য করে প্রতিদিন। যদিও সে নিজে মনে মনে জানে, আজ এসেছে সেদিন, এসেছে। আজ সারাদিন ধ'রে যেন অফিসের টাইপিস্ট-মেয়েটি টাইপরাইটারে অর্গানের সুর বাজিয়ে একটি মাত্র নামের গান শুনিয়েছে। সেই মিষ্টি একটি নাম—'নন্দিতা'। অফিসের কাগজপত্রের খস খস যেন সেই নামটি শোনায় বারে বারে, 'নন্দিতা'। খোলা জানলা থেকে ভেসে আসে রাস্তায় যান-বাহনের যান্ত্রিক ধ্বনি। সেই 'নন্দিতা' নাম শুনিয়ে যায় যেন সুপ্রিয়র কানে। আর সেই সঙ্গে সুপ্রিয় মনের গহনে নন্দিতার রূপের ভিন্ন ভিন্ন আকার ভেসে ওঠে। নন্দিতার অনিন্দ্য রূপলাবণ্য, অতুল-নীয় সৌন্দর্যসুষমা। নন্দিতার ঢলো ঢলো যৌবন।

আজ যেন সারাদিন এক মধুর সুখ-স্বপ্নের মধ্যে কেটে গেছে। শ্লথগতি, মন্থর সুখের আর আরামের স্বপ্ন। জেগে জেগে যেন তৃপ্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। ভাবতে ভাল লাগে, সুপ্রিয়র নিবিড় বাহুবন্ধনে বাঁধা নন্দিতা। দুই নিমীলিত চোখের কাছে, তার সুন্দর মুখের রাঙা অধরের কাছে একটি মধুলোভী ভ্রমর নাচানাচি করছে।

ছেলেবেলায় গুরুমশাই লোভ দমন করতে বলেছিলেন। আজ যেন আর স্মরণে আসছে না সেই মূল্যবাণ বাণী। মনে পড়ছে না।

মাঝে মাঝে অবিশ্বাস। নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারে না সুপ্রিয়। তবে কি সত্যিই নন্দিতার সঙ্গে তার নিরালায় দেখা হবে আজ! এতদিন দূরে থেকে চোখে দেখতে পেয়েছে; আজ এই প্রথম কাছে পাবে নন্দিতাকে। আর সলাজ দৃষ্টি নয়। সশঙ্কায় আড়নয়নের চাউনি—আজ বাতিল হয়ে যাবে। আজ সোজাসুজি সামনাসামনি দেখবে সে নন্দিতাকে। কোথাও এক নির্জন পরিবেশে।

কি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে তাকে ভেবে ঠাওরাতে পারে না সুপ্রিয়। এক গুচ্ছ শুভ্র

প্রাণতোষিক ঘটক

# দোঁহে ডাকে দোঁহারে

ফুল। এক শিশি সুগন্ধি। এক বাক্স রুমাল। কত কি মনে পড়ে একে একে। তর্ত যেন এক সম্মোহনী যাদুতে আচ্ছন্ন হ'তে থাকে সুপ্রিয়।

ছুটির দিনে এখানে সেখানে চ'লে যায় সে।

অফিস বন্ধ থাকলেই সুপ্রিয় কলকাতার বাইরে চলে যাবে। খুব বেশী দূরে নয়, কাছাকাছি কোথাও শহরের আশেপাশে। একদিনের ফুরসৎ পেলেই বাহির যেন ডাক দেয় সুপ্রিয়কে। অজানা অচেনা সুদূরের আহ্বান আসে যেন। অলস দিনের মেঘলা আকাশ হাতছানি দিয়ে ডাকে। দিগন্ত ইসারা জানায়।

ডায়মণ্ডহারবার। শিবপুর বোটানিকশ। আলিপুরের চিড়িয়াখানা। দমদম বিমান-বন্দর। বেলুড় মঠ। গান্ধীঘাট।

সেদিন বোটানিকশের এক দূরপ্রসারী এভিনিউ ধ'রে আনমনে এগিয়ে চলেছিল সুপ্রিয়। শীত শীত বাতাস চলেছে পৌষালী। রোদ্দুর গায়ে লাগে না। পিচঢালা প্রশস্ত পথের দুই পাশে বিভিন্ন গাছের সারি। নাম-লেখা। গাছের কুলুজী। সবুজ ঘাসের চত্বরে ছড়িয়ে আছে একেক দল চড়ুইভাতির পায়রা আর চড়াই। বকবকম করছে কেউ কেউ। শিশুর দল কিচির মিচির করছে। সুখাদ্যর লোভে ঝাঁক ঝাঁক কাক সভা সাজিয়ে বসেছে গাছের ডালে ডালে।

কারা কোথায় ট্রানজিশটার রেডিওতে গান শুনছে চলতি ছায়াছবির।

গাছের বংশ-পরিচয় পড়তে পড়তে এগিয়ে চলেছে সুপ্রিয়। হাতে একটা কমলা লেবু। হঠাৎ কোথা থেকে ক্যাম্বিশের একটি বল ছুটতে ছুটতে এসে আঘাত খায় সুপ্রিয়র পায়ে। প্রথমে অপ্রস্তুত, তারপর সচেতন হয় সে। খেলোয়াড়ী ভঙ্গীতে বলটি হাতে তুলে নেয়। তারপর চোখ ফিরিয়েই দেখতে পায় আক্রমণকারীকে। নন্দিতা দাঁড়িয়ে আছে কেমন যেন ভীরু চোখে। হাত পাতলো নন্দিতা। মুখে মৃদু নম্র হাসি।

রাগের বদলে হাসি দেখা দেয় সুপ্রিয়র মুখে। সে পাকা ফিল্ডসম্যানের মত বলটি ছুঁড়ে দেয়। নন্দিতা নিজের হাতে দেখতে পায়, বল নয় কমলালেবু। আরও যেন লজ্জা পায় সে। আবার হাত পাতে ভিক্ষা প্রার্থনার ঢঙে। সুপ্রিয় তার হাতে ধরিয়ে দেয় ক্যাম্বিশের বল। এক ঝলক প্রসাধনী সুগন্ধ ভেসে আসে নন্দিতার বুকের জামা থেকে। নয়তো মাথা থেকে ঝুলন্ত অশ্বপুচ্ছ থেকে।

—চলে আসুন দাদা। চলে আসুন।

খেলার দল থেকে একটি কিশোর ছেলে ডাক দেয় সরবে সোৎসাহে। হাততালি দিয়ে ডাকে। ছেলেটির চালচলনে যেন টেস্ট খেলার উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তা।

ডাক শুনে স্থির করতে পারে না সুপ্রিয়। সাড়া দেবে কি দেবে না।

নন্দিতা হাসছে মুক্তাসারি দাঁত দেখিয়ে দেখিয়ে। রাঙানো লাল অধরে হাসির ঝিলিক। সূর্যের আলোয় চকচিকা তোলে কানের ঝুমকাফুল। গাছ-কোমর বেঁধেছে নন্দিতা। কালো রঙ শাড়ীর আঁচল জড়িয়েছে ক্ষীণকটিতে।

তারপর কখন যে দলে নাম লিখিয়ে খেলায় জমে গেছে সুপ্রিয়, তা সে নিজেই জানে না। তখন সে দলের একজন। গোটা দুই ক্যাচ লুফেছে। স্রেফ পা বাড়িয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছে অব্যর্থ একটা বাউণ্ডারি।

চোখাচোখি হয় নন্দিতার সঙ্গে। ক্ষণ-স্থায়ী দৃষ্টি বিনিময় একেকবার। নন্দিতাও মাঠে নেমেছে খেলতে। ফিল্ড করছে সমান ভালো। ছুটতে ছুটতে বল ধরছে। চোখে চোখ পড়লেই হাসি হাসি মুখ দেখতে পায় সুপ্রিয়। দেখাদেখি হয় বার বার, কিন্তু একটিবারের জন্য স্পর্শসুখ অনুভব করে সে। নন্দিতার হাতে হাত লেগে যায় সুপ্রিয়র। যখন তার হাতে সে খেলার বল ধরিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা আর কোমল পরশ লাগে সুপ্রিয়র হাতে। নন্দিতার নরম নরম হাতের ছোঁয়া।

এক মুহূর্ত। তাই-ই যথেষ্ট। সুপ্রিয় কখনও ভুলতে পারবে না সেই কোমল ঠাণ্ডা প্রথম স্পর্শস্মৃতি।

আর একবার নন্দিতা যেন স্বেচ্ছায় কাছে আসে। তখন খেলা ভেঙে গেছে। সূর্য ঢ'লে পড়েছে আকাশপ্রান্তে। শুভ্র রৌদ্র সোনালী-লাল রঙ ধরেছে। চড়ুইভাতির দলে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলার ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। এক ঝোপের আড়ালে তখন সুপ্রিয়। খেলার শেষে ক্লান্ত। একটি সিগারেট ধরিয়েছে সে। মুখ থেকে ধোঁয়ার বল ছেড়ে ছেড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিতে থাকে।

—হেরে গেলেন শেষ পর্যন্ত! ছিঃ!

পাশ থেকে অতর্কিতে কথা বললে নন্দিতা। কালো রং শাড়ীর আঁচলের আঁটসাঁট বাঁধন আর নেই কোমরে। আঁচল পিঠে ঝুলছে।

—আবার কবে দেখা হবে আমাদের? আবার কবে দেখতে পাবো?

বক্তব্য অব্যক্ত রাখতে পারে না সুপ্রিয়। নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না মনের আবেগ। কথা ক'টি উচ্চারণের পরে লজ্জা পায় যেন। এধার সেধার দেখে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে।

—হ্যাঁ দেখা হবে। কিন্তু কবে কখন কোথায়?

নন্দিতা বললে সম্মতির মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে। তার কথায় যেন ব্যাকুলতা।

—সামনের সোমবারে বেলা সাড়ে পাঁচটায়।

ব'লতে হয় তাই যেন না ভেবেই ব'লে সুপ্রিয়। একটা দিনক্ষণ জানিয়ে দেয় এক কথায়।

—কোথায়? যেন রুদ্ধশ্বাসে, চাপা উদ্বেগের সঙ্গে বলে নন্দিতা।

—নিউ মার্কেটের মেইন গেটে। গ্লোব সিনেমার সামনে। শ্বাস ফেলতে পারে না যেন সুপ্রিয়। শেষ কথা না শুনিয়ে।

—বেশ তাই হবে। আমি থাকবো সেখানে। কলেজ থেকে ফিরতি পথে। মৃদু মৃদু ঘনিষ্ঠ হাসি নন্দিতার মুখে। কেমন যেন লজ্জায় অস্ফুট। প্রথম দেখার, নতুন পরিচয়ের লজ্জা।

আর একটিও কথা বলে না কেউ। অবশ্য যা বলাবলি হয়েছে সামান্য কয়েকটি কথায়, তাই যথেষ্ট। কিছু আর বলতে বাকী থাকলো না। বিদায় গ্রহণের ব্যথাভরা চোখ দুজনের। ছাড়াছাড়ি হওয়ার বাস্তব বেদনা। বিরহ-বৈরাগ্য চোখে চোখে।

অনেক পরে সুপ্রিয়র মনে পড়লো। সে জানে না তার নাম। চেনে না তার ঠিকানা। সুপ্রিয় অদম্য কৌতূহলে জানতে চাইলো না কিছুই। অজ্ঞাত পরিচয়—যেন এক অলৌকিক ঘটনার মত অদ্ভুত ঠেকে সুপ্রিয়র। না-জানার সঙ্গে প্রেমের সুসম্পর্কে অনেক বেশী মাধুর্য। বিস্ময় নয়, রোমাঞ্চের শিহর সুপ্রিয়র বুকে। চকে তৃষ্ণা নন্দিতার রূপের স্মৃতি তার বুক জুড়ে আছে।

দেওয়াল-ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো ঠং ঠং।

ছুটি হওয়ার মধুমুহূর্ত আবার এসেছে আজ। ঘড়ির ঠং-ঠং আওয়াজ কাজ-শেষের কলগুঞ্জনে কানে যায় না কারও। ঘড়ির কাঁটার সংকেতে ঠিক পাঁচটা বেজেছে। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচ।

উলুধ্বনি শুনবে কোথায় সুপ্রিয়! যাত্রার ঠিক আগে, অফিস ত্যাগের প্রাক্কালে আজ শুনবে কোথায় সানাইয়ের মিঠে রাগিণী—চার দেওয়ালে ঘেরা এই অফিস আজ এখন মনে হয় কেমন যেন নীরস গদ্য। ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট।

আনলা থেকে টুইডের কোট টেনে গায়ে চাপাতে থাকে সুপ্রিয়। আর খানিকক্ষণের মধ্যে সে দেখতে পাবে নন্দিতাকে। আজ তাকে পাওয়া যাবে নৈকট্যের আহ্বানে। একান্ত গোপনে।

—আরে, এই যে সুপ্রিয়!

কার গম্ভীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর গমনোদ্যত সুপ্রিয়র পিছনে। কেন কে জানে বিরক্তির রেখা ফোটে তার কপালে। ভুরু বেঁকে ওঠে।

—তোমাকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি সারা অফিসে।

আবার সেই একই কণ্ঠের কথা। সেই অদ্বিতীয় গাম্ভীর্য কথার সুরে।

—আমাকে কেন আবার এখন!

সুপ্রিয় যেন হতচকিতের মত বললে না দেখেই। তারপর পিছু ফিরতেই দেখলো যাকে তিনি সুপ্রিয়র হর্তাকর্তাবিধাতা অর্থাৎ বড়সায়েব। অর্থাৎ মিস্টার মিটার। তাঁকে দেখে সুপ্রিয় কাঁপা কাঁপা কথা আবার বলে,—ও, আপনি আমাকে ডেকেছেন!

—কথা আছে তোমার সঙ্গে। অপেক্ষা করতে হবে দু-চার মিনিট।

অফিস-কর্তা মিস্টার মিটার কথা বলতে বলতে নিজের কামরার দুয়োর ঠেলে খুলে ফেললেন। চোখে ভেসে উঠলো ঘরের উজ্জ্বল আলো। সেক্রেটারিয়েট টেবল। ঘূর্ণায়মান কেদারা। সুপ্রিয়র চোখে যেন একটা পিঁজরাপোল। যেন একটা খাঁচা। কি বলতে যায় সুপ্রিয় প্রতিবাদের ভাষায়, কিন্তু বলতে পারে না সাহসভরে। তার মুখে শুধু স্তব্ধতা। চোখে নিস্পৃহ দৃষ্টি। ঘরের যেন চুম্বক আকর্ষণে সুপ্রিয় ঘরের মধ্যে এসে পড়ে। চোখের ইশারায়

দিনের শেষে ফটো ঃ বীথি সরকার

মিষ্টার মিটার একখানি শূন্য চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। সুপ্রিয়র হাতে ধরিয়ে দিলেন প্রায় দিস্তাখানেক কাগজ। কি কারণে যেন কলিং-বেল টিপে ধরলেন সজোরে। বাজিয়ে চললেন এক নাগাড়ে।

বেয়ারা দুয়োর খুলে দেখা দিতেই বললেন,—দো পেয়ালা কফি। জলদি চাই।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যেন এক। পাতার পর পাতা ওলটায় সুপ্রিয়। স্বেচ্ছায় সে কিছুই করছে না কিন্তু। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেন চোখ বুলিয়ে চলেছে পাতায় পাতায়। নামের পর নাম প্রতি পাতায়। ওজন আর মূল্যমান লাইনের পর লাইন। তালিকার শেষ নেই যেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য।

—ধানবাদের ব্রাঞ্চ অফিস থেকে লিখিত রিপোর্ট এসেছে আজ। মিষ্টার মিটার বললেন একটা পেন্সিল দাঁতে কামড়ে। বললেন,—সুপ্রিয়, তোমাকে একটু সময় দিতে হবে। রিপোর্ট দেখে আমাকে বাৎলে দাও মাসের পর মাস কেন আমি হাজার হাজার টাকা ঘাটতি দিয়ে যাচ্ছি? লাভ হবে না কেন?

সুপ্রিয় জানে না কতক্ষণ সময় উৎরে গেছে পাতার পর পাতা চোখ বুলাতে। হয়তো বেশ কিছুক্ষণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা যেন শেষ হয় না রিপোর্টের।

—আমার ধারণায় ব্রাঞ্চ অফিস মালের বিলি বন্দোবস্তে তেমন নজর দিচ্ছে না। হাতে স্টক থেকে যাচ্ছে মাসের পর মাস। স্টক জমে ওঠা মানেই টাকা আর রোল করছে না।

—ঠিকই বলেছো তুমি।

পেন্সিল নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন মিষ্টার মিটার।

—তবে আমি এখন যাই?

বলতে ইচ্ছা হয় সজোরে ঘর কাঁপিয়ে, কিন্তু বলতে পারলো না সুপ্রিয়। তার শ্বাস আটকে যায় যেন। কান্নার সুরে সোচ্চারে বলতে চায় সে। টেবলের ঘড়ি দেখা যায় না। মিষ্টার মিটারের দিকে যেন তাকিয়ে আছে টেবল-ঘড়ি। কল্পনায়, মানস চোখে ঘড়ি দেখতে পায় সুপ্রিয়। জানে বেশ কিছুক্ষণ, আরও এগিয়ে গেছে সময়। কেন না সময় অপেক্ষা মানে না কারও। সময় নিত্য বহমান। অফিস-কর্তার হাতের উঁচানো পেন্সিলটি যেন একখানি ছুরির মত ধরা দেয় সুপ্রিয়র চোখে। মনে হয়, যেন ঐ ছুরি তার বুকে বিঁধিয়ে দিলেন মনিব। বড় বেশী বেদনাবোধ করছে সুপ্রিয়। বিয়োগ বিচ্ছেদের আশঙ্কায়। চিরবিরহের ভয়ে।

—তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিও। কথার সুর নামিয়ে গুরুতর বলার ভঙ্গীতে মিষ্টার মিটার বললেন। একটু থেমে আবার বললেন,—তুমি মাস কয়েক ব্রাঞ্চ অফিসে চলে যাও।

—আপনার দয়া স্যার। আপনি যেমন বলবেন।

—এখনই ঠিক পাকা কথা দিচ্ছি না কত টাকা ইনক্রিমেন্ট দিতে পারবো।

—না স্যার, এখনই কে পাকা কথা চাইছে আপনার কাছে! আপনার যা অভিরুচি হয়।

প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ এখন নন্দিতাকে দূরে, আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে চলেছে। কেমন যেন এক শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করে সুপ্রিয়। জ্বরজ্বর ভাব। সে যেন এই মুহূর্তে আবিষ্কার করেছে, নন্দিতা আর এখন তার জন্য অপেক্ষা করবে না। হয়তো নন্দিতা এতক্ষণে ব্যর্থ মনে ক্ষুব্ধ মনে ফিরে গেছে। আর কেনই বা অপেক্ষায় থাকবে প্রতীক্ষায় থাকবে নন্দিতার মত পরমাসুন্দরী মেয়ে। একেই তো সুপ্রিয়কে আদপে চেনেই না নন্দিতা। আরও হয়তো কত কে আছে নন্দিতার, যারা তার দর্শনপ্রার্থী। তারা হয়তো অনেক বেশী প্রিয়পাত্র।

—ব্রাঞ্চ অফিসের মাসে মাসে ঘাটতি তোমাকে বন্ধ করতে হবে সুপ্রিয়। আমি তোমাকেই পাঠাবো।

—আপনি যা বলবেন তাই করবো আমি।

সুপ্রিয়র কথা যেন নিস্তেজ। যেন এক নির্জীব কথা বলছে দুর্বল কণ্ঠে।

—বলাবলি নয় আর। আমি ফাইনালি বলে দিলাম। যে কোনদিন তুমি স্টার্ট করতে পারো ফর ধানবাদ।

সে আর অপেক্ষা করবে না। সুপ্রিয় ভাবলো মনে মনে। কলকাতার মত কুখ্যাত শহরের রাস্তার ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করবে তেমন মেয়ে নয় নন্দিতা।

ঘরে নীরবতা। বেয়ারা দুই পেয়ালা কফি বসিয়ে দিয়ে গেল নিঃশব্দে। পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছে। ঘরের নৈঃশব্দ যেন অসহ্য ঠেকছে সুপ্রিয়র।

—ভালই হবে তুমি ধানবাদে গেলে।

কথা বলতে বলতে কফির পেয়ালা মুখে তুললেন মিষ্টার মিটার।

—হ্যাঁ, আমিও সেখানে খুশীমনে যাবো। আপনি যখন বলেছেন।

—দেখো সুপ্রিয়, আমার ইচ্ছা হয় অফিসের প্রত্যেকটি কর্মচারীর সঙ্গে আমি মেলামেশা করি। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হই। কিন্তু বাড়ীতে যদি থাকেন গৃহিণী অপেক্ষায় বসে, কি করতে পারি আমি!

কথার শেষে আবার পেয়ালা তুললেন মুখে। কয়েক চুমুক পান করলেন পর পর। বললেন,—জানো না তো, মেয়েরা অপেক্ষায় থাকতে হলে কি ভীষণ চটে যায়! বিয়ে হোক, সবই জানতে পারবে একদিন।

প্রায় ছটা বাজলো।

রাস্তা লম্বমান। চওড়া। রাজপথে মিছিল বেরিয়েছে যেন। ধাতব শোভাযাত্রা ঠিক। মোটর, ভ্যান, লরী, বাসের দূরপ্রসারী পংক্তি। যাচ্ছে আর আসছে। ট্যাক্সির ভেতর থেকে দুই পাশে লক্ষ্য করে সুপ্রিয়। দোকানের শো-কেসে; অফিসগৃহের দুয়োর-শীর্ষে দেখতে পাওয়া যায় হরেক-রকমের দেওয়াল-ঘড়ি। চলন্ত মেয়েদের হাতে দেখা যায় পাথরখচা হাত-ঘড়ির ঔজ্জ্বল্য। নন্দিতা নিশ্চয়ই আর অপেক্ষায় থাকবে না। নন্দিতা হয়তো কেন অবশ্যই চলে গেছে কখন। রূপবতী সুন্দরী মেয়ে। সে কখনও প্রতীক্ষায় থাকতে পারে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী! কখনও নয়।

—একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে না?

অধৈর্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলে সুপ্রিয়। তার কথার সুর যেন অস্পষ্ট। কথা বলতেও যেন কষ্ট।

সুমুখে দুস্তর বাধা। মোটরগাড়ীর সারি, যেন শেষ নেই। পিপীলিকার সারি চলেছে যেন লাইন বেঁধে। কোথায় শুরু আর কোথায় যে শেষ, কে জানে!

—তাড়াতাড়ি যাবো কোথা দিয়ে সার! দেখতেই তো পাচ্ছেন। ট্যাক্সির ডানা থাকলে উড়ে যেতে পারতুম।

গাড়ীর চালক বললে গাড়ীর হর্ণ বাজাতে বাজাতে। শম্বুকগতিতে গাড়ী এগিয়ে চলেছে।

এই তো জীবন! পদে পদে বাধা আর বিপত্তি। ঠিক এই মুহূর্তে জীবন যেন বিষময় লাগছে সুপ্রিয়র। আধ ঘন্টার বেশী দেরী হয়ে গেছে। অনেকটা সময়। আকস্মিক কোন একটা অস্বাভাবিক কান্ড না ঘটলে আর দেখা হবে না নন্দিতার সংগে। বার বার মনে পড়ছে সেই সুন্দর মুখ-কান্তি। নন্দিতার দীর্ঘ আর আয়ত আঁখি-যুগল। তার কোমল আর ঠান্ডা হাতের স্পর্শ। নন্দিতার পোশাক-পরিচ্ছদ। সব-সুন্দর। নন্দিতার কণ্ঠের কথা যেন সুপ্রিয়র কানে গুঞ্জন তুলছে। মনে পড়ে তার, নন্দিতার নাম-ঠিকানাও সে জানে না। কি আশ্চর্য!

রাস্তার গাড়ী পা পা এগিয়ে চলেছে শিশুর মত পদক্ষেপে।

শহরের ঘড়িগুলিতে সময়ের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। আগামী কালের দিকে এক বাঁধাধরা ছন্দে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে।

আর একবার দুই চোখ মেলে এধার-সেধার দেখতে থাকলো সুপ্রিয়। চতুর্দিক থেকে উপহাসের অট্টহাসি ভেসে আসছে যেন। স্বপ্ন সার্থক হ'ল না সুপ্রিয়র। হঠাৎ নিজেকে মনে হয়, সে যেন সুপ্রিয় নয়, অন্য কেউ। নিজের অস্তিত্ব যেন ভুলে যেতে থাকে আতংক আর আশংকায়। ছ'টা যখন বেজে গেছে তখন আর নন্দিতার মত লাবণ্যময়ী মেয়ে আর অপেক্ষা করতে পারে না। অসম্ভব কি সম্ভব হ'তে পারে!

চলন্ত ট্যাক্সি থেকে রাস্তায় প্রায় লাফিয়ে পড়লো সুপ্রিয়। ট্যাক্সির মিটার দেখে সে তার আগেই গাড়ীর সামনের আসনে ফেলে দিয়েছে দু'খানি এক টাকার নোট। হয়তো ভাড়া কিছু বেশী দিয়ে দিয়েছে। ফেরতের পয়সা নেওয়ার সময় পায় না। ফুটপাতের জনতার ভিড় ঠেলে সুপ্রিয় যেন দৌড়তে শুরু করে। সকলকেই দেখছে যেন সে। কিন্তু চোখে শূন্য চাউনি। অন্ধের চোখ যেন। ট্যাক্সির ড্রাই-ভারকে ব'লে যায়,—চলে যাবেন না যেন। একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখুনি আসছি জানবেন।

—দেখবেন মশাই খুব বেশী দেরী করবেন না।

গাড়ীর চালক গাড়ীর ব্রেক কষতে কষতে বললে। গাড়ী ভিড়িয়ে দিয়েছে সে রাস্তার ধারে, ফুটপাতের গায়ে।

ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে নন্দিতা।

চার চোখের দৃষ্টি বিনিময়ের সংগে সংগে চার চোখে যেন হীরার দ্যুতি ঠিকরে তোলে।

ফর্সা আর নিটোল হাতখানি এগিয়ে ধরে নন্দিতা।

ট্যাক্সি আবার যাত্রা শুরু করে ঈষৎ গর্জন তুলে।

পিছন-দেখার এক টুকরো আয়না চালকের সমুখে। সেই আয়নায় প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব দেখতে পায় ট্যাক্সিচালক। দেখতে পাওয়া যায় দু'জন যাত্রীকে। সুপ্রিয় আর নন্দিতাকে। একটি ছেলের পাশে একটি সুন্দরী মেয়ে—যার জোড়া দেখতে পাওয়া যায় না। নন্দিতার চুলের বাহার চোখে পড়ে চালকের। নন্দিতার হাল-ফ্যাশনের জামা আর শাড়ী।

দু'জনের হাতে হাত। মুখের কাছে মুখ।

দু'জনের হাতে হাত.....

চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় গাড়ীর চালক। সে দেখতে পেয়েছে মেয়েটির উন্মুখ মুখ। হয়তো হাসি ফুটবে এই মুহূর্তে। হয়তো সে কিছু বলতে চায় গোপন কথা। হয়তো চুমু খাওয়াতে চায় সুখের আনন্দে। হতবুদ্ধির মত চালক যেন বিব্রত বোধ করছে দেখে দেখে। সে জানে, মানে বুঝছে একটা গোপনতম কিছু চলছে এখন। একটা কিছু অসাধারণ ঘটনা। অচেনা অজানাদের দেখবার বা জানবার কোন অধিকারই নেই।

ট্যাক্সির চালক ভাবতে পারে না কি ঘটছে। ট্যাক্সির গতি সহসা বৃদ্ধি পায়। দ্রুততম বেগে গাড়ী চালিয়ে দেয় সে।

বিদ্যুত গতিতে গাড়ী ছুটছে। সুপ্রিয় একটি শ্বাস ফেললে সশব্দে। একটি দীর্ঘ-শ্বাস। নন্দিতার ফর্সা কপালে যেন শ্বাসের উষ্ণতা লাগে। আরও নিকটে সরে যায় নন্দিতা। শুনতে পায়, সুপ্রিয়র বুকের দুরু দুরু স্পন্দন। নন্দিতা ফিসফিসিয়ে বললে,—সময় অপেক্ষা করে না, কিন্তু মেয়েরা অপেক্ষায় থাকে।

সুপ্রিয়র মুখে খুশীর প্রসন্ন হাসি। বাহুর বাঁধনে বেঁধে রেখেছে নন্দিতাকে। গাড়ী ছুটছে ঝড়ের বেগে। রেড রোডের চকচকে প্রশস্ত পথ ধ'রে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। পিছনের গাড়ী থেকে হেড-লাইটের আলো প'ড়েছে জোরালো। দেখা যায় দু'টিতে এক তখন। মুখোমুখি।

মধু পান করছে যেন মৌমাছি। তাজা আর টাটকা ফুলের মিষ্টি মধু।

ছুটন্ত এক যান্ত্রিক গাড়ীর গহ্বরে এখন যেন স্বর্গ সৃষ্টি হয়েছে। দু'হৃদয়ের মিলন-বাসর। অভিসারের নিভৃত নিকুঞ্জ।

নন্দিতার মুখে আত্মদানের খুশী খুশী হাসি। মিলনের মায়াজালে সে তখন বন্দিনী।

ছেলে বাঁচলো না। পর পর দু'বার সিজারিয়ান হলো, কিন্তু দু'বারই বিফল চেষ্টা।

ডাক্তার নিয়োগী হতাশ ভাবে বল্লেন, মেডিক্যাল সায়েন্স নিয়ে আমাদের কারবার, ভাই ভাগ্য বলে কোনো কিছুকে মানা আমাদের সম্ভব নয়। তাহলেও হিন্দুর ছেলে তো বটেই, সেই সংস্কার থেকেই বলছি, মিঃ মল্লিক, আপনার ও আপনার স্ত্রীর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, সন্তান-সুখ বোধহয় আপনাদের কপালে নেই! নইলে পর পর দু'বারের চেষ্টাই এভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল এবং তাও আবার ডেলিভারির পর!

প্রশান্তর কানে ডাক্তারের কোনো কথাই ঢুকছিল না। ডাক্তার চলে গেলেন।

বাচ্চাটা মারা গেছে, এ খবর কি মন্দিরা এতক্ষণে পেয়েছে?—কেবিনে ঢুকে এ প্রশ্ন মনে এলেও কাউকে জিজ্ঞেস করার মতো সাহস নেই প্রশান্তর। কারণ কেবিনে তখন চোখ বুজে মরার মতো পড়েছিল মন্দিরা—একজন নার্স তার সেবা করছিল।

অনেকক্ষণ বাদে একবার চোখ মেলে চাইল মন্দিরা। পরক্ষণেই আবার সে চোখ বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তের সেই দৃষ্টি লক্ষ্য করেই প্রশান্তর মনে হলো, শিশুর মৃত্যুর খবর মন্দিরা পেয়ে গেছে। না হলে শত কষ্ট সত্ত্বেও তার দিকে একটিবার অন্তত ভালোভাবে তাকাতো, একটু তৃপ্তির হাসি ওর মুখে ফুটে উঠত প্রশান্তকে দেখতে পেয়ে।

টুলের ওপর মুখ নামিয়ে বসে থেকে থেকে প্রশান্ত হঠাৎ একবার উঠে এল মন্দিরার মাথার দিকে। মাথায় হাত রাখল তার আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল।

একটু আগেই নার্স বেশ টেনে চুল বেঁধে দিয়েছিল মন্দিরার, কিন্তু পাখার হাওয়ায় দু'টো একটা চুল বারে বারেই এসে উড়ে পড়ছিল মুখের ওপর। সেই নিস্তেজ, ক্লান্ত আর করুণ মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নিজেকে আর সামলাতে পারছিল না প্রশান্ত।

মন্দিরা, খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?

প্রশান্তর প্রশ্ন কানে যেতেই মন্দিরার চোখের পাতা জোড়া যেন একটু কেঁপে উঠল। তার পরেই দু'চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে এল জল। নার্স এগিয়ে এসে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে গেল। মন্দিরা একবার তাকিয়ে দেখল। নার্স ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে ইসারা করল কোনো কথা না বলতে।

চোখ না খুলেই নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল মন্দিরা। বালিশ ভিজে গেল সে কান্নায়।

প্রশান্তর মনে হলো, এর চেয়ে মন্দিরা ডাক ছেড়ে জোরে জোরে কাঁদুক। এই নিঃশব্দ কান্না প্রশান্তকে যেন বেদনায় ভেঙে চুরমার করে ফেলতে থাকে। সে আর এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না।

আর ঠিক সেই সময়েই প্রশান্তর মা, দু'বোন আর ছোট ভাই হাসপাতালে এসে উপস্থিত। এসেই দুঃসংবাদে সবাই সচকিত।

কেবিনে বসেই মা তাঁর মনের খেদ প্রকাশ করতে শুরু করে দিলেন। কপালে করাঘাত করে বল্লেন, একেই বলে কপাল! একটি মাত্র বৌ—পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, দু' দুবার ছেলে হতে গিয়ে ছেলে হারালো। কী অদৃষ্ট! আমার সুখের সংসারে এ কী অশান্তি!

প্রশান্ত মাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো। বল্লে, এখানে বেশি কথা বলো না মা, ওর অবস্থা এখনো খুবই খারাপ। এত কথা-বার্তায় ওর হয়তো ক্ষতি হবে।

তুই থাম। কোথায় কতটুকু কি বলতে হয় না হয় সে আমি জানি, আমায় শেখাতে হবে না।—এক ধমকে মা থামিয়ে দিলেন ছেলেকে।

কিন্তু প্রশান্ত থামলেও মা থামলেন না। এদিকে মন্দিরার চোখের জলেরও আর বিরাম নেই। মায়েরও সেদিনের বিলাপ এর পর ক্রমে ক্রমে প্রলাপেই গিয়ে পরিণত হলো।

নাতির মুখ দেখা আর আমার অদৃষ্টে নেই। বহুজন্মের পাপের ফল আমাকে ভুগতেই হবে। আমি জানি নরকের দরজা আমার জন্যে খোলাই রয়েছে।—এমনি সব আপশোষের কথা হামেসাই শোনা যায়

প্রশান্তর মা'র মুখে। এবং তার জন্যে অনেক লোকের সমবেদনাও তাঁর জোটে।

কিন্তু মা না হতে পারার ব্যথা সে কি বড়ো কম মন্দিরার? সেই যে পর পর দু'বারের দুটো কঠিন আঘাত, তার পরেও অনেকগুলো বছর কেটে গেল। এর মধ্যে মন্দিরার আর কোনো সন্তান সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। অন্তত মন্দিরা তাই মনে করে। আশা নিয়েই সে বেঁচে আছে, আশা নিয়েই সে বেঁচে থাকতে চায়।

ডাক্তারদের মতে মন্দিরার পেটে আর একবার মাত্র অস্ত্রোপচার করা চলতে পারে অর্থাৎ সন্তান হবার আশা সে আর মাত্র একটিবারই করতে পারে। সেই সুন্দর আশাকে মন্দিরা নির্মূল করে দিতে চায় না।

স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসবের কোনো সম্ভাবনাই নাকি নেই মন্দিরার। সে কথা সে জেনেছে। এবং সে কথা সে জানে বলেই এ ব্যাপারে সে একেবারে নীরব হয়ে গেছে।

সংসার। এই সংসার নিয়েই মন্দিরা মত্ত। ভোর থেকে রাত এগারোটা অবধি সংসারের চাকা ঘোরানোই তার কাজ। সন্তান না থাক তাতে কি, শ্বশুর-শাশুড়ী আছেন, আছেন দিদিমা-পিসীমা, দেওর-ননদেরা—সেবা পাবার লোকের অভাব নেই। কিন্তু সেবাতেই কি সব সময় সকলকে খুশি রাখা সম্ভব? স্বামী মোটা মাইনের চাকরি করেন সরকারী আফিসে এবং সংসারেও মোটা টাকাই ঢালেন। তাই রক্ষে, তা' না হলে আরো কী যে কপালে ছিল ভগবানই জানেন। অথচ রূপে-গুণে মন্দিরাকে আর পাঁচটা মেয়ের তুলনায় ভালোই বলা যেতে পারে। চেহারা সুশ্রী, রং ফর্সা, গড়ন মাঝারি। লেখাপড়ার দিক থেকেও সে কোনো অংশেই খাটো নয়। তবে দুঃখের এই, ইংরজীতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েও এম-এ-টা আর তার পড়া হয়নি। ভাগ্যে বি-এ পরীক্ষাটা সে বিয়ের আগেই দিয়েছিল, তা' না হলে হয়তো তাতেও বাধা পড়তো।

মন্দিরার এম-এ পড়া হয়নি অনুমতি পাওয়া যায়নি বলে। পড়ার সুযোগ পেলে তার মতো মেয়ের ইংরেজীতে এম-এ পাশ করা মোটেই কঠিন হতো না। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার প্রস্তাব করতেই শাশুড়ী বল্লেন, যথেষ্ট হয়েছে, ছেলের সমান বিদ্যে হয়ে আর কাজ নেই।

তারপর থেকে সেই যে শুরু হয়েছে হাতাবেড়ি দিয়ে রান্না, পান সাজা, ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করা, লোকজনকে খাওয়ানো-দাওয়ানো এবং সংসারের আর সব খুঁটি-নাটি দেখা—তার আর বিরাম নেই।

প্রশান্ত ছোটবেলা থেকেই বাপ-মা'র ওপর বড্ড বেশি অনুরক্ত। অনেকের চোখেই সেটা দুর্বলতা বলেই ধরা পড়তো। বড়ো হয়েও সে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি প্রশান্ত। স্ত্রীর কষ্টটা তার খুবই গায়ে লাগত সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও সে বেশি কষ্ট পেত তার কোনো কথায় বা কাজে বাবা-মা আঘাত পাবেন এই ভেবে।

সংসারের চেহারাটা ক্রমশই যেন কেমন হয়ে চলেছে, প্রশান্তর মনে এই চিন্তাটা এসে সময় সময় জুড়ে বসে। মন্দিরা অবশ্য কোনো অভিযোগ করার মেয়ে নয়। তা' হলেও প্রশান্তও তো অন্ধ নয়—তার স্ত্রীর অভাব কিসের, তার দুঃখ-বেদনা কোথায়, এ কি আর সে জানে না? সবই জানে। কিন্তু বাপ-মা, ভাই-বোনের মনে আঘাত দিয়ে কোনো প্রতিকারের কথাই যে সে ভাবতে পারে না। তাই প্রতিকারহীন পথেই সংসারের রথ এগিয়ে চলে।

মন্দিরার নিজেরই বা আর কী করার আছে? ছোটবেলা থেকে সে এমন একটা গণ্ডীর ভেতরে বড়ো হয়ে উঠেছে যেখানে সহজ ছিল সব কিছু। পড়াশুনো নিয়ে দিন তার ভালোই কেটেছে। কিন্তু বিয়ের পর সে তার স্বামীকে মনের যত কাছে পেল ততই দূরে মনে হতে লাগল স্বামীর মা ও ভাই-বোনদের। একালের লেখাপড়া জানা মেয়েদের প্রতি শাশুড়ীশ্রেণীর এখনো অবজ্ঞা-মিশ্রিত ভাব রয়েছে, মন্দিরা সেটা জানত। কিন্তু সেজন্যে তত দুঃখ ছিল না তার, সে দুঃখ পেত একালের মানুষ হয়ে জন্মেও এবং লেখাপড়া শিখেও সেকালের মনকে আঁকড়ে-থাকা দুই ননদের ব্যবহারে।

শাশুড়ী তাঁর নিজের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে মোটেই বিরূপ ছিলেন না, যত আপত্তি অপ্রসন্নতা পরের ঘরের মেয়ের বেলায়। মন্দিরার এম-এ পড়ার পথে সুধাময়ীই মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্বশুরের এতটুকু অমত ছিল না তাতে। কিন্তু কে না জানে সংসারে শ্বশুরদের অবস্থা কত অসহায়, শাশুড়ী-দের ইচ্ছেই সেখানে প্রবল। এই ব্যাপারেও সুধাময়ীর অমতের কাছে বিজয়লালকে একেবারে চুপ করে যেতে হয়েছিল। তবে শিক্ষিতা ননদদের কাছ থেকেও যে সে সমর্থন পাবে না, এ কখনো ভাবতে পারেনি মন্দিরা। সেখানেই তার বড়ো দুঃখ। তবু যে সে সকলের মনোরঞ্জনে কোথাও কোনো-দিন এতটুকু কসুর করেনি সেটাই আশ্চর্য।

সুধাময়ী সত্যি সত্যি ভেবেছিলেন, পড়তে বাধা পাওয়ায় বনেদি ঘরের একেলে মেয়ে মন্দিরা হয়তো ভীষণ রকমের একটা হট্টগোল বাঁধিয়ে বসবে। কিন্তু তার যখন কোনো লক্ষণই দেখা গেল না তখন সবাইকেই অবাক হতে হলো।

বাস্তবিক পক্ষে একটু ভয়ে ভয়েই সুধাময়ী অনেক রাতে ছেলের ঘরের দিকে দু'তিনবার কান পেতেছিলেন। না, উত্তেজনার বা অভিমানের কোনো কথাই তাঁর কানে আসেনি। বরং পরদিন সকালবেলা ঠিক সময়েই বৌ তাঁর জলখাবারের থালাটি নিয়ে দিব্যি হাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরার মনের নাগাল কিছুতেই যেন পান না সুধাময়ী। কাজেকর্মে একেবারে নিখুঁত, কোথাও এতটুকু দোষ ধরবার উপায় রাখে না মেয়েটা। শেষ পর্যন্ত এতদিন বাদে একটা দোষ আবিষ্কার করা গেল। দোষের মতো দোষই বটে!

মন্দিরা মা হতে পারল না। বিয়ের পর পাঁচ-ছয় বছর কেটে গেল তবুও না। দু'-দু'বার মা হয়েও সে সুখ থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হলো। কোনো মেয়ের জীবনে এর চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে?

বিয়ের পর থেকে এতগুলো বছর ধরে অনেক নির্যাতন, অনেক দুঃসহ কথার শরাঘাত সহ্য করেছে মন্দিরা। ক্রমে ক্রমে সবই তার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। এবং এও সে ধরে নিয়েছে সন্তানধারণে অক্ষমতার জন্যে অন্য কেউ নয়, সে নিজেই দোষী, সে জন্যে দায়ী তার দৈহিক পঙ্গুতা। কাজেই শ্বশুর-শাশুড়ীকে যে নাতির মুখ দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে সে অপরাধের ষোল আনাই তো তার। তাইতো নিজে মা হতে না পারার দুঃখ যে কি তা' আর সে তেমন আলাদা করে ভেবে দেখার সময় পায়নি। বিশেষ করে তার শাশুড়ীর দুঃখেই সে মরমে মরে রয়েছে।

প্রশান্তদের বাড়িতে প্রায় বিরুদ্ধ পরি-বেশের মধ্যেই এতগুলো বছর কেটে গেল মন্দিরার জীবনের, কিন্তু তার স্বভাবের বা আচরণের পরিবর্তন এতটুকু হলো না, সেও কম আশ্চর্যের কথা নয়। চেহারা তার আরো সুন্দর হয়েছে, তবে দিন দিন যেন একটু বেশিই ভারি হয়ে পড়ছে।

মন্দিরাকে তাই কাছে টেনে নিয়ে, প্রায়ই প্রশান্ত বলে, চলো না, কিছুদিনের জন্যে আমরা বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। বাড়িতে থেকে থেকে তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ!

স্বামীর কথায় হাসে মন্দিরা। তারপর বলে, হবে, বাড়িতে আরেকটা কউ আসুক আগে, আমি তার হাতে সংসারের সব ভার দিয়ে তোমার সংগে নিশ্চিন্তে বেড়াতে বেরোব।

উত্তরে প্রশান্ত বলে, তবেই হয়েছে।

কেন হবে না? —মন্দিরা স্নান সেরে এসে নিজের ঘরেই শাড়িটা ঘুরিয়ে পরতে পরতে জবাব দেয়। বলে, নতুন বৌ যে আসবে সেও তো একটি মেয়ে। আর সেও নিশ্চয়ই সংসার করতেই চাইবে। সংসারের দায় দায়িত্ব না নিয়ে কি আর সংসার করা চলে?

আচ্ছা, দেখাই যাক। —স্ত্রীর কথার উত্তরে আর কথা বাড়াতে চায় না প্রশান্ত। নেহাৎ নির্লিপ্তভাবেই ছোট্ট এই জবাবটুকু দিয়ে চুপ করে যায় সে।

আরও বেশ কিছুকাল পরের কথা।

প্রশান্তর ভাই সুকান্ত শীগ্গিরই পশ্চিম জার্মানী থেকে ফিরছে। প্রশান্তই অনেক ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি করে ছোট ভাইকে পাঠিয়েছিল জার্মানীতে। উচ্চশিক্ষা শেষ করে চার বছর পর সুকান্ত দেশে আসছে খবর এসেছে। সে খবরে বাড়ির সবাই উল্লসিত, তবে সুধাময়ী আনন্দে একেবারে গদগদ।

ছেলে মানুষের মতো মানুষ হয়ে আসছে, সুকান্ত তাঁর দশজনের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে চলবে—এমনি ভাবনায় কোন মা-ইবা না গর্বে-গৌরবে ফেটে পড়েন? সুধাময়ীরও সেই অবস্থাই দাঁড়িয়েছে। তবে তাঁর একটি বাড়তি চিন্তা হয়েছে। সে হলো, সুকান্তর জন্যে আগে থেকেই মনের

মতো একটি ফুটফুটে বৌ পছন্দ করে রাখতে হবে। বৌ-এর গড়ন-পেটন খুব ভালো করে দেখে নিতে হবে, আশ-পাশের লোকজনদের কাছে থেকে মেয়েটির ভালো-মন্দ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে হবে। একবারের শিক্ষায় সুধাময়ীর এই সতর্কতা, আগের মতো যেন আর না হয়।

লেখাপড়া অত বরং নাই বা হলো, বউ চাই সুন্দরী, গড়ন-পেটনে মজবুত আর ব্যবহারে ভালো।

এ কথা শুনে বড় মেয়ে মাধবী বল্লে, কী যে তুমি বলো মা! মেজদা বিদেশ থেকে অত বড় ডিগ্রি নিয়ে আসছেন আর বৌদি বুঝি কম লেখাপড়া জানা হলে চলে? শুনলাম তুমি নাকি তোমার ঘোষালদির ওপর মেজদার বৌ খোঁজার ভার দিয়েছ? ওসব সেকেলে লোকের পছন্দে চলবে না, আগেই বলে দিচ্ছি।

ঠিক বলেছিস দিদি, ঠিক বলেছিস! —ছোট মেয়ে কমলা মাধবীকে পুরো সমর্থন জানায়।

মেয়েদের এই সমালোচনায়ও মা বিরক্ত হলেন না। বরং বল্লেন, তা তোরা যা ভালো বুঝিস তাই হবে। আমার তো এখন তিন-কাল গিয়ে এক কাল। তবে আমার আবার কপাল খারাপ, তাই ভয়।

সুকান্ত আসবার দিন সাত আগে এক-খানা চিঠি সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির সুকান্তর পুরনো বন্ধু অপরেশ।

বেশ খুশি খুশি মুখ। সামনে দিয়ে মন্দিরাকে চলে যেতে দেখে অপরেশ বল্লে, বৌদি শুনুন, মাসীমা কোথায়? শুভ খবর আছে, মাসীমাকে শীগ্‌গির মিষ্টি নিয়ে আসতে বলুন।

সুখবরের বিষম নেশা। একটু জানলে আরো জানবার জন্যে আকুলতা আসবেই। বিস্তারিত না জানা অবধি সে আগ্রহের নিবৃত্তি নেই।

"চলো না, কিছুদিনের জন্যে আমরা বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।"

অপরেশের হাঁক শুনে সুধাময়ী ছোটে এলেনই, এদিক সেদিক থেকে মাধবী, কমলা এবং ছোটছেলে জয়ন্তও এসে জড়ো হয়ে গেল সেখানে। শুভ খবরটা কি তা জানবার জন্যে সবাই অস্থির।

এই দেখুন মাসীমা সুকান্তর চিঠি। আজই পেলাম। —বলে পকেট থেকে বার করে চিঠিখানা তুলে ধরে অপরেশ। তারপরে আবার বলে, সুকান্ত একেবারে বৌ নিয়েই আসছে জার্মানী থেকে, আর ওদের সঙ্গেই আসছে আপনার বংশের প্রথম নাতি—পাঁচ মাসের শিশু।

কমলা একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায় মাধবীর দিকে। অপরেশদা কি সত্যি কথা বলছেন না তামাসা করছেন তাদের সঙ্গে, মনে তার সেই প্রশ্ন। শুধু তার নয়, তাদের সকলেরই। সকলেরই মুখগুলো যেন লম্বা হয়ে গেছে অপরেশের কথা শুনে। সবাই নির্বাক।

শুনুন মাসীমা, আরো কথা বলবার আছে। —একটু দম নিয়ে অপরেশ আবার বলতে শুরু করে।

হ্যাঁ, সুকান্ত লিখেছে, ওরা এসে প্রথমে হোটেলেই উঠবে, তারপরে ধীরে-সুস্থে পছন্দ মতো একটা ফ্ল্যাট ঠিক করে নেবে। আপনাদের ওর বিয়ের কথা, ছেলে হওয়ার কথা ও লজ্জায় জানাতে পারেনি। কিন্তু এ আর এমন লজ্জার কি, বলুন তো মাসীমা! আজকাল কি আর সেদিন আছে? তাছাড়া জার্মান মেয়েদের তো খুব সুনাম!

শুনাম না ছাই! —মাধবী একটা মুখ ঝামটা দিয়ে সরে পড়ে সেখান থেকে। তার মনটা বিষিয়ে উঠেছে অপরেশদার কথা-বার্তায়। সে সটান নিজের ঘরে চলে গেল। কমলাও বলতে বলতে চলে গেল, মেজদা তাহলে বাড়িতেই আসবেন না, ভিন্ন থাকবেন! এই কথাটুকু বলতে গিয়ে কমলার গলাটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

সুধাময়ীর মাথার মধ্যে তখন বিশ্ব-সংসার পাক খাচ্ছে। চোখের সামনে যেন তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর এত-দিনের সাজানো সংসার তছনছ হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, তাঁর পায়ের তলায় কোনো মাটি নেই, তিনি এখুনি পড়ে যাবেন। তাড়াতাড়ি তিনি দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফেল্লেন তাঁর পাশেই নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়ানো মন্দিরাকে।

শাশুড়ীর অসহায় অবস্থা দেখে মন্দিরাও দু'হাতে তাঁকে শক্ত করে ধরে রাখলো। সুধাময়ী বড়বৌয়ের বুকের ওপর মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে কোনো রকমে বল্লেন, চলো মা, তোমার ঘরেই আমাকে একটু শুইয়ে দেবে চলো।

বিকেলে আফিস থেকে ফিরে এসে প্রশান্ত দেখলে সারা বাড়িময় কেমন একটা অস্বাভা-বিক স্তব্ধতা। সেও অবাক হয়ে গেল।

# প্রবেশ ও প্রস্থান

সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র

রাও যেদিন প্রথম আসে সেদিনকার কথাটা আমার মনে আছে পরিষ্কার। সামনেই বসেছিলাম, অলসভাবে কিছুটা সমুদ্র আর কিছুটা পাশের টেবিলের খেলা দেখছিলাম। কাজ কিছুই নেই। সকালের জলযোগ হজম হয়ে এসেছে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের এখনও ঢের দেরি—সুযোগ-সুবিধা মতো কোন খাবারওলা ডেকে কিছু খেয়ে নেওয়া যায় কিনা—তখন একমাত্র সেই চিন্তা। ঠিক সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতেই অর্থাৎ বেলা দশটা নাগাদ একটি রিক্সা থেকে এসে নামলেন ভদ্রলোক।

কালো কষ্টি পাথরের মতো রং—কিন্তু লম্বা-চওড়া বেশ দশাসই চেহারা। বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। দামী ট্রাউজার আর টেরিলিনের শার্ট—আর্য কৌলীন্য ঘোষণা করছে যদিচ একটি হাওয়াই-জাহাজ-মার্কা হাতে-ঝোলানো ব্যাগ ছাড়া সঙ্গে কোন মালপত্র দেখলাম না। ভদ্রলোক যে অবাঙ্গালী সেটা তাঁর দিকে চাইলেই বোঝা যায়—কিন্তু তিনি এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাঙলাতেই প্রশ্ন করলেন, 'দাদা, অফিস ঘরটা কোথায়?'

বাঙলা ভালই বলছেন কিন্তু বাঁকা টানটা যায় নি। টানটা দক্ষিণ ভারতীয় ঘেঁষা; অর্থাৎ হায়দ্রাবাদ কি মহীশূর কি মাদ্রাজের দিকে কোথাও বাড়ি হবে—দীর্ঘ দিন বাঙলা দেশে কিম্বা বাঙালীর সাহচর্যে থেকে এত ভাল বাঙলা শিখেছেন।

আমি উত্তর দেবার আগেই আমাদের লাউঞ্জের পিছনে অফিস ঘরটা নজরে পড়ে গেল তাঁর, 'ও পেয়ে গেছি, থ্যাংক্ ইউ অল দি সেম'—বলে সেই দিকে এগোচ্ছেন, এমন সময় সাক্ষাৎ মিঃ ঘোষালই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে দেখিয়ে বললাম, 'ইনিই এখানকার ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার—এঁর সঙ্গেই কথা বলতে পারেন।'

ভদ্রলোক যেন একটা লাফ দিয়ে নেচে উঠলেন একবার, 'হ্যাল্লো হ্যাল্লো হ্যালো—আপনিই মিঃ জয়দেব ঘোষাল! ও আপনার এত কথা শুনেছি আপনার বন্ধু মহাদেব সরকারের মুখে যে আমিও আপনার বন্ধু বনে গেছি ধরে নিতে পারেন।...যাক—এ সময় যে আপনার দেখা পাব তা ভাবিনি, মহাদেববাবু বলেন এটা আপনার বাজার করার সময়।'

ততক্ষণে মিঃ ঘোষালের দুটি হাতই ভদ্রলোকের প্রায় বজ্রমুষ্টির মধ্যে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু মিঃ ঘোষাল খুশী। মহাদেববাবু তাঁর দীর্ঘকালের বন্ধু, যখন এই হোটেলের নিজস্ব চারতলা বাড়ি হয় নি—তখন থেকেই।

তিনি বললেন, 'ঠিকই বলেছে মহাদেব, আমি এইমাত্র ফিরছি বাজার থেকে। ট্রেনটা এসে গেল দেখেই আরও হুটোপাটি ক'রে ফিরলাম।...আপনি মহাদেব সরকার—মানে আমাদের বাঁকুড়ার মাষ্টারমশাইয়ের কথা বলছেন তো—?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—আবার কে! ঐ যিনি রেল ইস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন আগে!'

'আমিও তাই ভেবেছি, নইলে আমার সম্বন্ধে এত কথা আর বলবে কে! তা আসুন আসুন—আপনার আর মাল কৈ? সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি?—অন্য গাড়িতে!'

'কেউ না, কেউ না। স্রেফ একা। মাল আর নেই ঘোষালদা। কাল রাত্রে বেঞ্চের তলায় রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম স্যুট-কেশটা—সকালে উঠে দেখি আমার কোন্ বন্ধুর দরকার পড়েছিল তাতে, নিয়ে নেমে গেছেন। স্লীপারে যে আবার এ সব উৎপাত হবে তা ভাবিনি। ভাগ্যিস এই ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়েছিলাম—নইলে বোধ হয় এটাও যেত। এটা গেলেই চমৎকার হ'ত একেবারে, ভিক্ষে করতে করতে ফিরতে হ'ত—এইতেই এথি-টেথি সব ছিল, মায় টিকিট পর্যন্ত!'

ঈষৎ কি একটু সংশয়ের মেঘ দেখা দিল জয়দেব ঘোষালের প্রসন্ন মুখাকাশে?

দিলেও সেটা ও ভদ্রলোকের লক্ষ্য করার মতো নয়। মিঃ ঘোষালও যথাসম্ভব স্মিত মুখভাব বজায় রেখে বললেন, 'তা আপনার বিছানা? সেটাও কি চোরে নিল্ নাকি?'

'না না—গুড হেভেন্স্! বিছানা তো আনি নি। বিছানা লাগে নাকি? মিঃ

সরকারের মুখে আপনার হোটেলের যা প্রশংসা শুনেছি তাতে মনে হয়েছে—আপনার হোটেল ফার্স্ট ক্লাস মানে প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে। তা-মানে ওদেশে, বা এমন কি আমাদের বোম্বে সাইডেও তো কোন ভাল হোটেলে বিছানা লাগে না—আমি তাই অভ্যেস—। তা অসুবিধে হয় এখানে কিনে নেব। কিনতে পাওয়া যায় না?'

'না, না, সে কিছু না। আছে, সব রকম ব্যবস্থাই আছে আমাদের এখানে। সাহেব-সুবোও তো থাকে অনেকে অনেক সময়, ওদিকে জায়গা না পেলেই নেক্সট্ বেস্ট আমার এই গরীবখানা। কাজেই কিছু কিছু রাখতে হয় বই কি। আমি এমনিই জিজ্ঞেস করছিলুম। এখানে যাঁরা আসেন সবাই তো নিয়েই আসেন কিনা—। তা মহাদেববাবুর সঙ্গে আপনার কী সূত্রে—?'

'ও এই ভ্রমণ সূত্রেই। ও'রও খুব বেড়ানোর নেশা তো। গতবার সামারে উনি গিয়েছিলেন গোপালপুরে, সেখানেই প্রথম আলাপ হয় — আবার পুজোর সময় বোম্বেতে। বোম্বেতে উনি আমারই গেস্ট ছিলেন কিনা। হোটেলে উঠতে চেয়েছিলেন আমি উঠতে দিইনি। অত বড় ফ্ল্যাট পড়ে আছে আমার, মিছিমিছি হোটেলে যাবেন কেন?'

গত বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে মহাদেববাবু যে গোপালপুর গিয়েছিলেন এবং পুজোর ছুটিতে বোম্বে—তা জয়দেব ঘোষালও জানে না। এখন জানলেন। মনে মনে হিসেব ক'রে নিলেন তখনই, সরকার কতগুলি টাকা বাঁচিয়েছে এই হঠাৎ-কুড়িয়ে-পাওয়া বন্ধুর দৌলতে। বোম্বের মাঝারী কোন হোটেলে উঠলেও দৈনিক কুড়িটি টাকা দিতে হ'ত। এতও পারে সরকার অপরের ঘাড় ভাঙগতে!

'চলুন, তাহ'লে। এবার একটা ঘরটর দেখিয়ে দিন—'

ভদ্রলোক মৃদু কণ্ঠে মনে করিয়ে দেন কর্তব্যটা।

অন্যমনস্ক মিঃ ঘোষাল অপ্রতিভ হয়ে হাঁকডাক শুরু ক'রে দেন, 'ও বংশী, কোথায় গেলি রে। এ লক্ষণ্অ চণ্ড় আস এইঠি, চণ্ড়।'

'কোথায় দিচ্ছেন আমাকে মিঃ ঘোষাল?'

'ওপরে? দোতলায় দিই? না কি আপনি তেতালা প্রেফার করবেন?'

'আই'ড প্রেফার গ্রাউণ্ড ফ্লোর। আপনারা এখানেই থাকবেন তো সারাদিন, ল্যাউঞ্জে এসে বসতে পারব—গল্পেসল্পে কেটে যাবে। আমি আবার মানুষের সঙ্গে দুটো কথা না বলে থাকতে পারি না।'

'সে—তা বেশ তো, এই পাশেই সঞ্জীব-বাবুর ঘরেই একটা বেড খালি রয়েছে—' মিঃ ঘোষাল আমাকে দেখিয়ে দিলেন, 'অবিশ্যি সিঙ্গল সীট একতলা দোতলায় কোথাও খালি নেই। এখানে ঘর নিতে গেলে তেতালায় উঠতে হবে অন্তত!'

'নেই মাংতা সিঙ্গল সীট। এই দাদার সঙ্গে থাকব তো? সে তো আমার সৌভাগ্য, অবশ্য যদি ও'র অসুবিধা না হয়। ও'র সঙ্গে আমি এখানে ঢুকে প্রথমে কথা বলেছি, তাতেই মনে হচ্ছে এটা ভগবানের নির্দেশ। চলুন ও'র ঘরেই যাই!'

বলতে বলতেই এগোলেন তিনি। কারণ ঘরের দিগ্‌নির্দেশটা তিনি মিঃ ঘোষালের দৃষ্টির লক্ষ্য থেকেই ধরে নিয়েছিলেন। আমরাও এগোলুম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। ভালই হ'ল—একা তো থাকতে পারতুম না, কেউ না কেউ এসে বসতই জাঁকিয়ে। অনিশ্চিতের চেয়ে নিশ্চিত ভাল। এ লোকটি থাকলে ভালই কাটবে। লোকটির এই সামান্য কথাবার্তাতেই বুঝতে পেরেছি যে, ভদ্রলোক দিলখোলা ধরনের আমুদে মানুষ।

ঘর দেখিয়ে মিঃ ঘোষাল বললেন, 'আপনি কাপড় জামা ছাড়ুন, আমি বিছানা একটা পেতে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। ব্যাগের মধ্যে কিছু কাপড় জামা আছে তো?' মিঃ ঘোষাল একটু দ্বিধার সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন।

'আছে আছে, ডোন্ট্ ওয়ারী! আর একটা শার্ট আছে, গেঞ্জি রুমাল আণ্ডার-ভেস্ট সবই আছে—মায় রাত্রে শোবার পাজামাও, নেই কেবল এক্সট্রা ট্রাউজার। তা কী আর করা যাবে বলুন—এইতেই চালিয়ে নেব এখন যেমন ক'রে হোক। এ ট্রাউজার-গুলোর এই একটা সুবিধা আছে বুঝছেন না—দাম একটু বেশী নেয় বটে কাপড়-গুলোর—কিন্তু প্রেস মানে আয়রনিং লাগে না—শুধু একটু গুঁড়ো সাবান জলে ডুবিয়ে নিলেই হ'ল—'

মিঃ ঘোষাল বোধ করি বংশীর খোঁজেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ভদ্রলোক পিছন থেকে ডাকলেন, 'দাঁড়ান ঘোষালদা, প্লীজ, এক মিনিট। এইটে একটু রেখে দেবেন আপনার সেফ-এ?'

ব্যাগের নিচে হাত গলিয়ে টেনে বার করলেন একখানি চৌকো মজবুত গোছের মোটা খাম; মুখ আঁটা, তাতে তিন-চার জায়গায় গালা-করা। বেশ পুরু-শুরু ভারী চেহারা খামখানার—অর্থাৎ ভেতরে কোন দামী কাগজপত্র কি এক গোছা নোট আছে। তবে আকৃতি দেখে নোট বলেই মনে হয়।

মিঃ ঘোষাল এতে অভ্যস্তই আছেন—তবে সাধারণত তিনি গুনেগেঁথে রসিদ দিয়ে জমা রাখেন খদ্দেরদের টাকা। তিনি শীলকরা খাম দেখে একটু বিপন্ন মুখে বললেন, 'তা এতে—মানে কী আছে, মানে কত কী তা না জানলে—'

'নাই বা জানালেন দাদা। শীলকরা তো আছেই, আমি তো আপনাকে চুরির অপবাদ দিতে পারব না—তার ওপর আমার এই দাদা সাক্ষী রইলেন। আর আমি রসিদও চাইছি না, যেমন আছে সিন্দুক খুলে এক পাশে ফেলে রেখে দিন। ধরে নিন বাজে কাগজ।...সেই যাবার দিন আবার খোঁজ করব—তার আগে নয়। তার আগে আর দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

মিঃ ঘোষাল নিশ্চিন্ত হয়ে খামখানা নিয়ে চলে গেলেন।

হোটেলে কোন মক্কেল এসে যখন ম্যানেজারের লোহার সিন্দুকে টাকা জমা রাখে তখন ম্যানেজার যে কী রকম নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা বোধ করেন তা সেই সময় ঘোষালদার মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যেত। তাঁর মুখে একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছিল তখন।

এর পর ভদ্রলোকের সঙ্গে দ্রুত আলাপ জমে উঠল। নাম বললেন শ্রীকান্ত রাও, মূলত ও'রা মারাঠীই—কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরে অন্ধ্রে থাকায় এইটেই ও'দের বাসভূমি হয়ে পড়েছে, আর তাঁর গাত্রবর্ণও নাকি সেই জন্যই এত ঘনকৃষ্ণ। তবে তিনি নিজে এখন কর্মোপলক্ষে সর্বত্রই ঘোরেন! কলকাতাতে পড়াশুনো করেছেন, বছর কয়েক আসানসোলের কাছে কোন্ কলিয়ারীতেও চাকরি করেছিলেন—সুতরাং বাংলা ভাষা মাতৃভাষার মতোই হয়ে গেছে প্রায়। সম্প্রতি বছর দুই বোম্বেতে ছিলেন, এখন বোধ হয় বদলি হয়ে নাগপুরে এসে থাকতে হবে।

'কী কাজ করেন আপনি?' সসংকোচে এবং সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করি।

'আমি?...ও, সে খুব একটা গালভারী নাম আছে আমার চাকরীর। আমি হলুম ওআন অফ দ্য রিজিওনাল মাইয়াবোলাস মার্কেটিং অফিসার। এত দিন ছিলাম ওয়েস্টার্ণ রিজিয়নে এবার সেন্ট্রাল রিজিয়নে বদলি করল।...ভালই হ'ল দাদা, অতি লক্ষ্মীছাড়া দেশ ঐ আপনাদের বোম্বাই। একে তো শরীর ভাল থাকে না একটুও, তার ওপর সবচেয়ে অসহ্য মানুষগুলো। কেউ মানুষ নয় দাদা, সব যেন দানোয় পাওয়া কী এক চীজ, দিন-রাত ধান্দায় ঘুরছে শুধু—ধান্দা আর ধান্দা। টাকা ছাড়া ওদের কোন চিন্তা নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই জীবনে—'

রাও শুধু যে অতঃপর আমার সঙ্গেই জমিয়ে নিলেন তাই নয়, পোশাক ছেড়ে একটা পাজামা পরে সিগারেট ধরিয়ে সেই যে লাউঞ্জে এসে বসলেন দেখতে দেখতে নিচেরতলা ওপরেরতলা মিলিয়ে অন্তত কুড়িটি লোককে আটকে ফেললেন সেখানে। সিগারেট শুধু নিজেই খাচ্ছেন না—দুহাতে বিলোচ্ছেন সবাইকে, বেশ দামী সিগারেট। সুতরাং সেখানে না জমবে কে! কিছুক্ষণ পরে দেখি আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মিঃ ঘোষালও সেখানে এসে কখন জমে গেছেন।

সেদিন আমাদের কারুরই সমুদ্রস্নানে যাওয়া হ'ল না। তা না হোক, সে ক্ষতি-পূরণ ভাল রকমই ক'রে দিলেন মিঃ রাও। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে খেতে হঠাৎ জয়দেব ঘোষালকে প্রশ্ন করলেন শ্রীকান্ত, 'আজ আপনাদের রাত্রের মেনু কি মিঃ ঘোষাল?'

'রাত্রে?...এই সাধারণত যা হয়—ডাল ভাজা ভেজিটেবলস—একটা মাছ আর একটা মাংসের প্রিপেয়ারেশন। আজ বোধ

হয় কোর্মা করার কথা আছে।...কেন বলুন তো?'

'বলছিলুম কি—জাস্ট এ সাজেস্‌শান্—একটু রামপাখীর ব্যবস্থা করা যায় না?'

'ওটা—মিঃ রাও, আমরা সপ্তাহে একদিন দিই। শনিবারে শুধু। তার চেয়ে বেশী পোষায় না।'

'আচ্ছা আমি যদি কিছু সাবসিডীর ব্যবস্থা করি—? প্লীজ ঘোষালদা, এটা আমার বড়মনষী ভাববেন না। জাস্ট একটা খেয়াল। এতগুলি ভদ্রলোকের সামান্য সেবাতেও যদি আসতে পারি। আপনি এই ত্রিশটা টাকা রাখুন। মাংসতে তো খরচা হ'তই, তার সঙ্গে এইটে যোগ করলে মুরগী হবে না? না হয় আর কিছু দেব। একটু দেখুন—।'

হাতের মধ্যে নোট কখানা গুঁজে দেন মিঃ রাও।

ঘোষালদা ঈষৎ লজ্জিত, ঈষৎ বিব্রত ও চিন্তিত মুখে বললেন, 'না, তার জন্যে নয়—লক্ষ্মণটা বোধ হয় এতক্ষণে মাংস আনতে বেরিয়ে গেছে।...দেখি আবার হরিকে পাঠাই সাইকেলে ক'রে ধারণ করতে। কেনা হয়ে গেলে কিন্তু মুশ্‌কিল হবে মিঃ রাও, তা আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি।'

'কুছ্ পরোয়া নেই — সে ক্ষেত্রেও আনবেন। অল্প ক'রে—না হয় দু রকমই হবে। কী যেন বলে না মিত্তিরদা,—কী, অধিকন্তু না কি—?'

'অধিকন্তু ন দোষায়? হেসে ফেলে জবাবই দিই।

'ঠিক ঠিক। অধিকন্তু ন দোষায়। আপনি সেই ব্যবস্থাই করুন বরং।'

এই হোটেলের বর্তমান এই কটি বাসিন্দার চিত্ত জয় করার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। বলতে গেলে সেই মুহূর্ত থেকেই মিঃ রাও আমাদের মুকুটহীন রাজা বনে গেলেন। কিন্তু তবু তাঁর জয়রথ সেইখানেই থামল না। দেখতে দেখতে শুধু যে আমাদের হোটেলে তাই নয়—তাঁর খ্যাতি আশপাশের হোটেলেও ছড়িয়ে পড়ল। তাঁরা ভিড় ক'রে ক'রে রাজসন্দর্শনে আসতে শুরু করলেন। কেউ কেউ রাস্তা থেকেই কৌতূহলী চোখে দেখে নিয়ে চলে যেতেন—কেউ বা সাহস ক'রে আমাদের কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়তেন। অবশ্য সাহসীরা চিরদিনই পুরস্কৃত হয়—যাঁরা ভরসা ক'রে ভেতরে আসতেন তাঁরা সকলেই প্রসাদ পেয়ে তৃপ্ত হয়ে ফিরতেন। কারও কোন ক্ষোভের কারণ থাকত না।

প্রসাদ ছাড়া আর কি।

শুধু কি সিগারেট, বোঝা বোঝা খাবারও উজাড় হয়ে যেতে লাগল মিঃ রাওর কৃপায়।

সেটাও শুধু হয়েছিল সেই প্রথমদিন থেকেই।

মিঃ রাও সমুদ্রের ধারে এসেছেন বটে কিন্তু দেখা গেল তিনি সমুদ্রস্নান বা সমুদ্রের ধারে বেড়ানোয় বিশ্বাসী নন। দুপুর ও রাত্রির ঘুমের সময় ছাড়া অষ্ট প্রহরই প্রায় তিনি সামনের লাউঞ্জে বসে থাকতেন ও উপস্থিত ভদ্রবৃন্দের সঙ্গে আড্ডা দিতেন।

সেদিনও সন্ধ্যার কিছু আগে একটা খাবারওয়ালা তার বাঁকের দুধারে তিন-চারটি ক'রে এলুমিনিয়ামের ডেকচি সাজিয়ে এসে পড়েছিল। আর যায় কোথায়! মিঃ রাও যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর। 'কী আছে, খোলো খোলো। সিঙ্গাড়া? রসগোল্লা,, ছানার জিলিপী। অল রাইট—দিতে থাকো এঁদের সবাইকে।'

'...না দাদা, সে হবে না। আমি হাতজোড় করছি, গরীব ভাইয়ের অফায়। প্লীজ প্লীজ। জাস্ট দুটো মিষ্টি—কিচ্ছু হবে না এখানে একটু মিষ্টি খেলে। চলুক দুটো—'

উপস্থিত সব কজনকে তো বটেই, অফিসে গিয়ে মিঃ ঘোষাল আর তাঁর হিসাব-রক্ষক মাইতিবাবুকেও দিয়ে এলেন। মিঃ ঘোষালের কোয়ার্টারটা একটু ভেতর দিকে, লোক দিয়ে সেখানেও পাঠিয়ে দিলেন। মায় বংশী হরি লক্ষ্মণ চতুর্ভুজের দলও কেউ বাদ গেল না। দেখতে দেখতে খাবারওলার বাঁক খালি হয়ে গেল, সে মহানন্দে তেরো টাকা কত নয়া পয়সা গুণে নিয়ে খালি পাত্র বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

তারপর দিন থেকে ওদের ভিড় বেড়ে গেল। মিঃ রাও উদারভাবে সকলকার কাছ থেকেই কিছু কিছু কিনতে লাগলেন, কারুর কাছ থেকে পাঁচ টাকা কারুর কাছ থেকে চার টাকা। আমরা বিব্রত হয়ে উঠলাম, মিঃ ঘোষালেরও সঙ্কোচের অবধি রইল না—কিন্তু কে কার কড়ি ধারে! অনুনয় অনুরোধ তিরস্কার—কিছুই তিনি শুনতে চাইতেন না। শেষে মিঃ ঘোষাল কৃত্রিম কোপে বললেন, 'এরকম করলে আমি কিন্তু আপনার সব টাকা-কড়ি বাজেয়াপ্ত ক'রে নেব—কেড়ে বিগড়ে নিয়ে জমা ক'রে রাখব ক্যাশে—তা বলে দিচ্ছি।'

দুই হাতে নিজের কান নিজে মলে রাওসাহেবও কৃত্রিম অনুতাপের কণ্ঠে বললেন, 'কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি না দাদা, এক্সকিউজ মি। তা, আপনি যা বলছেন সে অবস্থার আর দেরি নেই। এবার দিতে গেলে আপনার কাছেই হাত পাততে হবে। আপনি কিন্তু দেবেন না দাদা, সেই যাবার দিনের আগে। নইলে ফতুর হয়ে যাব হয়ত—ফেরবার গাড়িভাড়াটাও থাকবে না!'

কিন্তু মুখে যাই বলুন—তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল হাতে নিশ্চয় কারণ যা ছিল তার ওপর আমার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধার ক'রে নিয়ে সতেরোখানা সিনেমার টিকিট কাটা হয়ে গেল। সিট আর ছিল না, নইলে আরও কাটতেন বোধ হয়—এক্ষেত্রে সতেরোখানাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। মনটা বিষম খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল মিঃ রাওর, কাকে ফেলে কাকে নেবেন—এই সমস্যায়। শেষ পর্যন্ত সপরিবার মিঃ ঘোষাল এবং নিচের তলার যে কজন আছি আমরা তাঁদের মধ্যেই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ রাখা হ'ল। তাও আটত্রিশ আর উনত্রিশ নম্বরে যে পরিবারটি এসেছেন তাঁদের সকলকারই শরীর খারাপ, তাঁরা রাত জেগে ছবি দেখতে যেতে রাজী হলেন না, তাই কোন মতে কুলিয়ে গেল। নইলে শেষ পর্যন্ত হয়ত আড়াই টাকায় টিকিট কেটেও সবাইকে নিয়ে যেতেন মিঃ রাও।...টাকা ফুরোল তাই বলে আতিথ্যর হাত গুটোবেন এমন মানুষ নন ভদ্রলোক। তিনি খাবারওলাদের পরিষ্কার বলে দিলেন, প্যাখো বাবারা, আমার হাতে যা নগদ টাকা ছিল ফুরিয়েছে, এখন যা আছে ঘোষালদার লোহার সিন্দুকে, ও আমি যাবার আগে বার করব না। ঘোষালদাও দেবেন না। আমি এখনও দশবারোদিন আছি, যদি চাও—এই কদিন একটা হিসেব রেখে মাল দিয়ে যাও, সেই শেষ দিন এসে টাকা নিয়ে যেয়ো—না চাও তো গুড্ বাই, কোন দরকার নেই খাবারের, তোমরা অন্য মশাইদের দিয়ে যেতে পারো।'

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের

| | | | |
|---|---|---|---|
| দুরন্ত দস্যু | ৬·০০ | পেত্‌নীদহের হীরা | ৪·৫০ |
| চীনের চক্র | ৪·০০ | কালির ভীমের কাণ্ড | ৩·০০ |
| গুপ্ত ঘাতক | ২·০০ | দ্বীপান্তরের আসামী | ২·৫০ |
| মৃত্যু সঙ্কট | ২·৫০ | | |
| মরণ ফাঁদ | ২·০০ | ডাক্তার সাটিরা | ০৩·৭ |

রহস্যলহরীর রোমাঞ্চ কাহিনী বাংলা-সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক ও তাঁর সহকারী স্মিথের দুঃসাহসিক অভিযান শেষ পৃষ্ঠা অবধি রুদ্ধনিঃশ্বাসে আকর্ষণ করে।

ক্যালকাটা পাবলিশার্স : ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

সাথী ফটো : সুকুমার রায়

'শুভ যাই' যে অবশ্য দুচারজন করল না তা নয়, কিন্তু বেশির ভাগই খাতার বন্দোবস্তে রাজী হয়ে গেল। না হবেই বা কেন, লোকটা এই দু-তিনদিন নির্বিচারে মাল কিনেছে এবং নির্বিচারে দাম দিয়েছে, কোন হিসাবপত্রের ঝামেলায় না গিয়ে। যারা এতদিন ধরে এই বহু তীর্থযাত্রী-অধ্যুষিত স্থানে ব্যবসা করছে তাদের মানুষ না চেনবার কথা নয়। এ শ্রেণীর মক্কেলকে হাত চেনে—অনায়াসে, চাই কি সতেরো টাকা পাওনা হলে উনিশ টাকা চেয়ে নিতে পারবে এদের কাছ থেকে—একবার যোগটাও 'ঠিক' দিয়ে দেখবার কষ্ট স্বীকার করবে না এরা।

সুতরাং মিষ্টি বিলোনের হুল্লোড় অন্যাহতই রইল। মিষ্টি আর সিগারেট দুইই। কারণ সিগারেটটা ঘোষালদার স্টোরেই বিক্রী হয়—সেটা নগদ দাম দিয়ে কেনবার কথাই ওঠে না। শুধু সিনেমা দেখানো বা মাংস কেনার হাতটাই কিছু সংযত করতে হয়েছে। আরও একদিন মুরগীর কথা তুলতে গিয়েছিলেন কিন্তু ঘোষালদা রাজী হননি। আমাকে আড়ালে বলেছেন, 'লোকটা দেখছি সত্যি-সত্যিই সর্বস্বান্ত হয়ে এখান থেকে যাবে। শুরু করেছে কি!'

আমি উত্তর দিয়েছি, 'বিয়ে-থা করেনি, কেউ কোথাও নেই—বেপরোয়া জীবন, বুঝলেন না! ছমাস কাজ করে হাতে যা জমে কোথাও এসে লবাবী করে উড়িয়ে যায়—সেই টাইপ, ও আমি খুব চিনে নিয়েছি!'

দিন দশেক কাটবার পর একদিন একটা টেলিগ্রাম হাতে করে এসে ঘোষালদা খবর দিলেন, 'আপনার বন্ধু যে কাল সকালে এসে পড়ছেন মিঃ রাও!'

একটু বোধ হয় অনামনস্ক হয়েই চা খাচ্ছিলেন রাও সাহেব, হাতটা কেঁপে চা চলকে পড়ে গেল খানিকটা। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করেই উজ্জ্বল সস্মিত মুখে প্রশ্ন করলেন, 'আমার বন্ধু? ও, দেয়ার অর সো মেনি—তা ইনি কে?'

'মানে আমাদের দুজনেরই বন্ধু—মহাদেব সরকার!'

'হুর্‌রে! মহাদেববাবু আসছেন! থ্রু চিয়ার্স ফর দা ওল্ড বয়!.....কিন্তু এলেনই সেই, আর কটা দিন আগে আসতে পারলেন না' তবু দুটো চারটে দিন এতসঙ্গে হৈ-হল্লা করে কাটানো যেতো!'

'আসবার তো কথাই ছিল না। নানা ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলেন—হঠাৎ বোধ হয় কিছু মুসকিল আসান হয়েছে, তাই বেরিয়ে পড়ছেন। মাত্র ছদিন থাকবেন তাও লিখেছেন! এ কটা দিন তো একসঙ্গে থাকতে পারবেনই—' ঘোষালদা বলেন।

'তাই বা কই আর হচ্ছে, আমি তো পরশুই রওনা দিচ্ছি!' রাও সাহেব একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠেই উত্তর দেন।

'পরশু যাচ্ছেন, সে কি?'

আমরা সকলেই চমকে উঠলাম।

'হ্যাঁ—আর থাকা যাবে না।' ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে যেন কৈফিয়তের সুরেই বলেন মিঃ রাও।

'তা আপনি তো কই রিজার্ভেশানেরও কোন ব্যবস্থা করেন নি, আমি তো আপনাকে সেদিন কথাটা মনে করিয়েই দিলাম তবু—' একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করি। এখানে ওটা এক প্রবল সমস্যা।

'আমিও তো আপনাকে তখনই বলেছি—এখানে আমার এক বন্ধু আছে সে সব ঠিক করে দেবে। একটা তো রাত—খড়্গপুর পর্যন্ত, ও হয়েই যাবে এক রকম করে।'

কথাটা সেইখানেই চাপা পড়ে গেল। কারণ খাবারওয়ালারা ইতিমধ্যেই দলে দলে আসতে সুরু করেছে—তাদের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এবং গরীব মানুষকে দয়া করার জন্য কাতর অনুনয়—প্রায় একনিঃশ্বাসে একসঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে। সেই কোলাহলে ও খাওয়ার হুল্লোড়ে কথাটা মনে রইল না কারুরই।.....

পরের দিন সকালের চা খাওয়া শেষ হতেই রাও সাহেব বললেন, 'চল্লিশটা টাকা দেবেন মিত্তিরদা, একবার স্টেশনটা ঘুরে আসি দেখি সত্যিই—স্টুপিডটা কী করল। যদি করে থাকে কোন ব্যবস্থা তো টিকিটটা কেটে একেবারে সব পাকা করে আসাই ভাল।.....আমি আর এখন আমার ভাঁড়ারে হাত দিতে চাইছি না—বুঝলেন না, ও খাম খুললেই কী যে এলোপাতাড়ি খরচ করে ফেলব, তারপর হয়ত কালকের হিসেব মীট্ করতে চক্ষুস্থির হয়ে পড়বে। ডাকাত-বেটারা যে কে কত লিখে রেখেছে আমার নামে তা কে জানে!'

'তা লিখে থাকে তো ভালই! আপনার

ঐ রকম কিছু আক্কেল সেলামী দেওয়াই উচিত!' আমি হেসে বলি।

'তাতেই কি আক্কেল হবে দাদা ভেবেছেন? না কি, ও রকম সিচুয়েশনে এই প্রথম পড়ব মনে করছেন?.....সব রকম হয়ে গেছে—তবু কি জানেন দাদা, স্বভাবটা বদলাতে চায় না কিছুতেই—ঐ যে কী বলে না সংস্কৃতে কী যেন, অঙ্গার কী একটা—? মানে কয়লা শতবার ধুলেও তা কালোই থাকে। সেই রকম আর কি!' হা-হা করে হেসে ওঠেন নিজেই।

টাকা বার করতে গিয়ে দেখলাম ব্যাগে খান দুই মাত্র দশ টাকার নোট পড়ে আছে—বাকী সব একশ' টাকার। সেই কথাই বললুম তাঁকে, 'একশ' টাকার একটা নোটই নিয়ে যান—ভাংগানো হয়ে যাবে!'

'তারপর—? ঐ ভিড়ের মধ্যে যদি কোন বন্ধু দয়া করে পকেট হালকা করে দেন—তখন? কে গচ্ছা দেবে মশাই! না-না, বরং ঐ কুড়ি টাকাই দিন, যদি আর কারুর কাছ থেকে গোটা পনেরো টাকা পাই তো দেখি—'

'হ্যাঁ, আপনাকে সব খুচরো বার করে দিয়ে আমি অচল হয়ে বসে থাকি আর কি!' আমি ধমকও দিই একটু, 'এতই যা অসাবধান হবেন কেন? ছেলেমানুষ তো নন—যে কথায় কথায় গচ্ছা দিতে হবে?'

মিঃ রাও দমবার পাত্র নন, বললেন, 'দিন নিচ্ছি—কিন্তু উইদাউট প্রেজুডিস্, খোয়া গেলে আমি জানি না। .....আরে দাদা, অসাবধান না হলেও গচ্ছা দিতে হয় অনেক সময়—বরাতে লোকসান থাকলে কেউ ঠেকাতে পারে না। ... তা এতই যখন দিলেন, খুচরো আট আনা পয়সাও দিন, রিক্সা ভাড়া। আমার পকেট আজ একেবারে নেহরুজীর পকেট—একটি কানা-কড়িও নেই।'

টাকা-পয়সা গুছিয়ে নিয়ে হাসতে-হাসতেই চলে গেলেন মিঃ রাও। ব্রেকফাস্ট খেয়ে যেতে বললাম কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। বললেন, 'আটটায় বুকিং খোলে এখানে, তার আগে না পৌঁছতে পারলে মুস্কিল। উইন্‌ডো খোলবার আগে ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে—নইলে ব্যাটারা বড় চেঁচামেচি করে। .....ঘোষালদার ব্রেকফাস্ট তো আটটার আগে বেরোবে না—কী লাভ এখন থেকে হাঁ করে বসে থেকে। ফিরে এসে বরং দেখা যাবে—'

কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে তিনি পারলেন না। সম্ভবত যতটা সহজ হবে ভেবেছিলেন রিজার্ভেশান পাওয়া—ততটা হয়নি। .....কথাটা ভেবে আমি একটা 'নৈর্ব্যক্তিক' রকম আনন্দই বোধ করতে লাগলাম। বেশ হয়েছে, বড্ড নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন বন্ধুর ওপর বরাত দিয়ে! ঠিক হয়েছে! সার্ভড্ হিম রাইট!

আসলে আমার রিজার্ভেশানের জন্য মাত্র তিনদিন আগেই একটি লোককে তিন টাকা পারিশ্রমিক দিতে হয়েছিল—সে অনাজাতা ভুলতে পারি নি।

রাও এসে পৌঁছবার আগেই কিন্তু কলকাতার গাড়ি এসে গেল এবং ঘোষালদার বন্ধু সেই বিখ্যাত মহাদেব সরকারও এসে হাজির হলেন। ফরসা একহারা চেহারা, ছোট্ট একটু ফ্রেঞ্চকাট ধরনের দাড়ি আছে, কোটের ওপর কোঁচানো চাদর ব্যবহার করেন—সরল প্রকৃতির মানুষ তা মুখের হাসিটি দেখলেই টের পাওয়া যায়।

ঘোষালদা সকলরকে অভ্যর্থনা করলেন মহাদেববাবুকে। মালপত্র চাকরকে দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে সেইখানেই চা পানের ব্যবস্থা করে দিলেন। বললেন, 'মহাদেবদার আমার দিনেরাতে কুড়ি কাপ চা খাওয়া অভ্যেস, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে তর সইবে না।


"শ্রদ্ধাবান হ', বীর্যবান হ', আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর পরহিতায় জীবনপাত কর—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ" —স্বামী বিবেকানন্দ।

**স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম শতবার্ষিকী**

গত ২০শে জানুয়ারী, ১৯৬৩ খৃঃ, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান কর্তৃক উদ্বোধিত।

——সমাপ্তি-উৎসব——

- শোভাযাত্রা—১৫ই ডিসেম্বর।
- ছাত্র সম্মেলন—১৬ই হইতে ১৮ই ডিসেম্বর।
- একমাসব্যাপী প্রদর্শনী—২০শে ডিসেম্বর হইতে।
- সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন—২৩শে ডিসেম্বর হইতে।
- সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন—২৫শে হইতে ২৮শে ডিসেম্বর।
- এক সপ্তাহব্যাপী ধর্মমহাসভা—৩০শে ডিসেম্বর হইতে।

স্থান—পার্কসার্কাস ময়দান, কলিকাতা।

**শতবার্ষিকী প্রকাশন**

- ছোটদের বিবেকানন্দ ৫০ নঃ পঃ
- স্বামী বিবেকানন্দ ১·০০ টাঃ
- দিব্যসঙ্গীত ( স্বরলিপিসহ ১০১টি গীত ) ৮·০০ টাঃ
- বিবেকানন্দ লীলাগীতি ১·০০ টাঃ
- যুগাচার্য বিবেকানন্দ (যন্ত্রস্থ) ২·৫০ টাঃ
- শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র) (যন্ত্রস্থ) ৫০ নঃ পঃ
- Swami Vivekananda Memorial Volume (যন্ত্রস্থ) ৩০·০০ টাঃ
- Pictorial Album (যন্ত্রস্থ)

**স্বামীজীর ছবি ও বাণী সম্বলিত ব্যাজ**

- মূল্য—২৫ নঃ পঃ, ৩৭ নঃ পঃ ও ৫০ নঃ পঃ।

**স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিযুক্ত বিভিন্ন মূল্যের (৫, ৩ ও ১) শতবার্ষিকী কুপন**

- সকল প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কেই পাওয়া যায়।
- শতবার্ষিকী তহবিলে ৫০০ টাঃ বা তদূর্ধ্ব দান করিলে সাধারণ কমিটির পৃষ্ঠপোষক বলিয়া গণ্য হইবেন।
- সভ্য-চাঁদা—২০ টাঃ ও তদূর্ধ্ব; একই পরিবারে দুইজন একত্র সভ্য হইলে ৩০ টাঃ ও তদূর্ধ্ব। ছাত্র ও নিম্ন আয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য চাঁদা ১০ টাঃ মাত্র।
- শতবার্ষিকী সার্থক রূপায়নে ছোট বড় সকল দানই সাদরে গৃহীত হইবে। উহা আয়কর মুক্ত।

অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :—

কলিকাতা অফিস : ১৬৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, ফোন : ২৪-৪৫৪৬

হেড অফিস : বেলুড় মঠ (হাওড়া), ফোন : ৬৬-২৩৯১

ষ্টেশন থেকে এইটুকু আসতেই গলা শুকিয়ে গেছে বোধ হয়।'

প্রাথমিক সম্ভাষণাদি পরিচয়ের পালা শেষ হতে মিঃ ঘোষাল বললেন, 'একটি গ্রেট সারপ্রাইজ কিন্তু আপনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করে আছে মহাদেব দা—আপনার এক অতি প্রিয়বন্ধু এখানে এসে আছেন কদিন। প্রিয় বলছি এই জন্যে যে, তার কাছে তো আমার হাড়হদ্দ সব কিছু গল্প করেছেন বসে বসে—!'

'সে কি! সে আবার কে? .....যোগীন? মানে যোগীন ভটচায আমাদের—তমলুকের?'

'না না যোগীন ভট্টাযের আমি চিঠি পেয়েছি সে এবার গেছে কাশীতে—তার শ্বশুরবাড়ি। এ হলেন মিঃ রাও!'

'রাও? .....কে রাও? কৈ কোন রাও বলে আমার এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই তো!' মহাদেববাবু অবাক হয়ে যান, ভ্রু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করেন প্রাণপণে।

'আছে বৈ কি। নইলে এত কথা সে আপনার সম্বন্ধে বলবে কোথা থেকে! মনে করে দেখুন। গত বছরে এই সামার ভেকেশনে গোপালপুরে আলাপ হয়েছিল মনে নেই—? বেশ বলিষ্ঠ গোছের চেহারা, লম্বা-চওড়া—খুব ভালো বাংলা বলে। ভাল করে লক্ষ্য না করলে বোঝাই যায় না তেলেগু টান—'

'ও, রেড্ডি বলো। রাও বলছ কেন। হনুমন্ত রেড্ডী। কোথায় সে জোচ্চোরটা—লোফার হামবাগ বদমাইশ!! তাকে পেলে তো বাঁচি—দেখিয়ে দিই একবার মজাটা!'

মহাদেববাবু বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

'কই, রেড্ডি তো নয়—রাও বলেই তো নাম লিখিয়েছে।' বলতে বলতেই কিন্তু মিঃ ঘোষালের যেন মুখ শুকিয়ে ওঠে একটু, 'আপনি বোধহয় চিনতে পারছেন না ঠিক। খুব দশাসই চেহারা আর খুব কালো, এই বাঁ চোখের নিচেটায় একটা কাটা দাগ আছে—বেশ গভীর গোছের, হয়ত ফোড়াটোড়া—'

'ব্যস ব্যস আর বলতে হবে না। তাহলে ও কোনটাই ওর আসল নাম নয়। আমাকে বলেছিল রেড্ডী। ব্যাটা মহা ঠগবাজ, আর কী ডেয়ারিং—বোম্বাইতে হোটেলের ম্যানেজারকে ঠকিয়ে আমার টাকা থেকে দুশ' টাকা বার করে নিয়েছিল গত পুজোর সময়—'

'সে কি, তবে যে বললে আপনি বোম্বাইতে ওর গেষ্ট হয়ে ছিলেন!'

'হ্যাঁ আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই—আমি ওর গেষ্ট হয়ে থাকব। ঐ ব্যাটাই তো—যেন গন্ধ পেয়ে পেয়ে এসে খুঁজে বার করল।'

আমারও মুখ শুকিয়ে উঠেছে ততক্ষণে। বুকের মধ্যেটায় কেমন যেন ছিম ছিম বোধ হচ্ছে। সেদিনের পাঁচ, পরে আর একদিন মন্দিরে দুই, আজকের এক শ' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। একুনে—

জয়দেববাবুর ললাটে—সেই উদ্দাম ঝোড়ো সমুদ্রের বাতাসেও—বড় বড় ফোঁটায় ঘাম ফুটে উঠেছে তখন।

'সে কি? মানে—ব্যাপারটা কী ঠিক বুঝতে পারছি না তো', অতিকষ্টে বলেন মিঃ ঘোষাল।

'ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু! তোমাদেরও ঠকিয়ে গেল নাকি এরই মধ্যে? গেল কোথায় বেটা? তবে যে বলছিলে ধরে রেখেছি—?'

ক্রমশ সবই শোনা গেল। গতবার মহাদেববাবু গিয়ে গোপালপুরে যে মেমসাহেবের

"রাও? .....কে রাও?"

হোটেলে উঠেছিলেন, সেই হোটেলেই ছিল রেড্ডী বা রাও (মহাদেববাবুর বিশ্বাস আসলে ও বাঙ্গালীই, ঐ রকম একটা টান অভ্যাস করেছে লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে)—এমনি বেপরোয়া, খরচপত্র সম্বন্ধে এমনি উদাসীন। লোককে খাইয়ে উপহার দিয়ে মুগ্ধ করে ফেলেছিল। সে মুগ্ধ ভক্তদের দলে মহাদেববাবুও ছিলেন। কিন্তু নাটকের শেষ অঙ্কের অভিনয়টা তিনি দেখে আসতে পারেন নি—কারণ যতদিন তাঁর থাকার কথা ছিল তার বহু আগেই চলে আসতে হয়েছিল মহাদেববাবুকে, ভাইঝির খুব অসুখ এই 'তার' পেয়ে মাত্র পাঁচদিন থেকেই চলে আসেন। তারপর একেবারে দেখা হয় পুজোর সময় বোম্বেতে। উনি গিয়ে নিরিবিলি গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার কাছে একটা মাঝারি হোটেলে ছিলেন, বিশ্রাম নিতেই গিয়েছিলেন, তাই কারও সঙ্গে বিশেষ দেখাসাক্ষাৎও করেন নি। ঐ রেড্ডী একদিন পথে এসে ধরল ও'কে। প্রথমটা তো মহাদেববাবু ঠিক চিনতেও পারেন নি—পরে ওর ঐ হৈ-চৈ চেঁচামেচিতে মনে পড়ে গেল। এমন ফুর্তিবাজ আমুদে আর গায়েপড়া লোককে ঝেড়ে ফেলা শক্ত, আর কেনই বা ফেলবেন। বিদেশে এমন একটা লোককে পেলে ভালই লাগে।

দেখতে দেখতে—বলতে গেলে একদিনের

মধ্যে—লোকটা যেন পরমাত্মীয় হয়ে উঠল। অবশ্য প্রথম দিকটা খরচও সে করেছে, তা তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। খুব খানিকটা ট্যাক্সিতে করে ঘুরিয়ে, নাজুএ নিয়ে গিয়ে খাইয়ে একদিনেই প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ টাকা খরচ করেছে সে। এ-ছাড়া হোটেলে যখন আসত—এটা ওটা জিনিস-পত্রও নিয়ে আসত। একদিন জোর করে রাত্রের শো সিনেমায় নিয়ে গেল—সেও টিকিট গাড়িভাড়ায় সরবতে প্রায় বারো-চোদ্দ টাকা খরচ করলে। এর পর তার অবস্থা এবং মতলব, কোনটা সম্বন্ধেই কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। মহাদেববাবুরও ছিল না।

দুটি লোকে যদি দিনেরাতের অনেকখানি সময় একত্র থাকে তো—ইচ্ছে না থাকলেও অনেক কথা কওয়া হয়ে যায়। সেই সময়ই বোধহয় জয়দেব ঘোষালের প্রথম দিকের সেই সামান্য হোটেল থেকে এখনকার চারতলা হোটেল এবং তাঁর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক—সবই গল্প করে থাকবেন। আর গল্প করেছিলেন ম্যানেজারের কাছে—তাঁর আটশ চল্লিশটি টাকা খামে করে গচ্ছিত রাখার ইতিহাসটা। খুব হাল্কাভাবেই বলেছিলেন রেন্ডী শুনে আবার মনে করে রাখবে তা ভাবেন নি।

পরের দিন তিনি যখন তাঁর ভাগ্নের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন খার-এ, বিকেলে রেন্ডী এসে হোটেলের ম্যানেজারকে বলেছে যে, আংকল সরকার (আংকল আংকলস করত সে তাঁকে) ক্রফোর্ড মার্কেটে গিয়ে একগাদা বেড কভার আর শাড়ি কিনে ফেলেছেন—শ'দুই টাকার দরকার। ম্যানেজারের আলমারীতে যে টাকা গচ্ছিত আছে তা থেকে চেয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন।

স্বভাবতই ম্যানেজার ওর ঐ ছেঁদো কথায় টাকা দিতে চাননি। কিন্তু তার জন্য রেন্ডী প্রস্তুত ছিল। কোন্ পুরনো রেজেস্ট্রী খামে আট শ' একচল্লিশ টাকা রেখেছেন মহাদেববাবু, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে মায় খামে কার ঠিকানা লেখা আছে এবং কে 'সেন্ডর' তা পর্যন্ত বলে বলল, 'এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো তিনিই পাঠিয়েছেন?'

বিশ্বাস হয়েছিল ম্যানেজারের, তিনি গুনে দিয়েছিলেন। টাকা নিয়ে যাবার সময় কী মনে করে একটা দামী কলম সে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল ম্যানেজারের কাছে, বলে-ছিল—আংকল-এর সঙ্গে যখন আসবে তখন নিয়ে যাবে। বাজারে এ কলম নিয়ে ঘোরা ঠিক নয়। ম্যানেজার তাতে আরও আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

মহাদেববাবু ফিরে এসে সব শুনে অবাক। তবু তিনি তখনও অতটা অবিশ্বাস করতে পারেন নি। একটা বড় প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল—জোচ্চোরই যদি হবে তবে অমন ভাল কলমটা ফেলে যাবে কেন?

কিন্তু দু-তিন দিন যখন কেটে গেল ওর টিকি দেখতে পাওয়া গেল না—তখন আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। খোঁজ-খবর করতেই হ'ল। তবে তখন আর কোথায় খোঁজ পাবেন? আহাম্মুকিটা আরও বেশী করে ধরা পড়ল তখনই—লোকটা কোথায় থাকে, কী ঠিকানা, কিছুই ভাল করে খোঁজ করেন নি তিনি। আঁধেরীতে কোথায় একটা নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে—এই কথাই বলেছিল। অনেক দূর বলেই মহাদেববাবুর যাওয়া ঘটে ওঠেনি সেটা দেখতে। এখন মনে পড়ল যে সে ঠিকানাটাও তিনি জেনে নেন নি।

আইনত হোটেলের ম্যানেজার ও-টাকা দিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখ-চোখের অবস্থা দেখে মহাদেববাবুর মায়া হ'ল। তাছাড়া ওকে তিনিই নিয়ে এসেছেন। এই কদিন খুব আদিখ্যেতাও করেছেন—সুতরাং নৈতিক দায়িত্ব একটা তাঁর থেকে যায় বৈকি! তিনি সেই দায়িত্বের ফলশ্রুতি হিসেবে ঐ লোকসানটা নিজেই মেনে নিয়েছিলেন।

তবে একেবারে হাল ছাড়েন নি। গোপালপুরে মিসেস ওয়েস্ট মুরকে চিঠি লিখেছিলেন—যদি কোন পাত্তা পাওয়া যায়। তাইতেই জানতে পেরেছেন যে লোকটা জাত-জোচ্চোর। সেখানেও নাকি ঐ এক ইতিহাস। মিসেস ওয়েস্ট মুরের জামাই থাকে শিলং-এ, তার নাম করে এসেই জমিয়ে বসেছিল, আগে কিছু টাকা য়্যাডভান্সও দিতে গিয়েছিল কিন্তু জামাইয়ের সঙ্গে এমন গাঢ় অন্তরঙ্গতার পরিচয় পেয়েছিলেন মিসেস ওয়েস্ট মুর ওর কোন কোন কথা-বার্তায় যে চক্ষুলজ্জার খাতিরে হাত পেতে সে য়্যাডভান্সের টাকাটা নিতে পারেন নি। তারপর ঐ রকম দিলদরিয়া মেজাজ আর দুহাতে টাকা ওড়ানোতে তিনিও ভুলে গিয়েছিলেন, অন্তত কোন সন্দেহ মনে দেখা দেয়নি। তারপর এক বন্ধুকে বহরমপুর থেকে আনতে যাবার নাম করে হোটেলের গাড়ি চেপেই হাওয়া হয়েছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে অন্য দু-তিনজন বোর্ডারের টাকা—তা প্রায় শ' দুইতিন হবে। এ ছাড়া যে বিপুল ঋণের বোঝা রেখে গেছে এখানে তাও ভয়াবহ। মিসেস ওয়েস্ট মুর সব খবর দিয়ে বিশেষ অনুনয় করে লিখেছেন মহাদেববাবুকে যে, যদি দৈবাৎ উনি কোন খবর পেয়ে যান তো যেন অতি অবশ্য মিসেস ওয়েস্ট মুরকে জানান। তিনি তাহলে চির-কৃতজ্ঞ থাকবেন!

কী আছে তা তো জানা কথাই—তবু মিঃ ঘোষাল সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখে খামখানা খুলে ফেললেন গালা ভেঙে। নোটের আকারেই কাটা খানকতক সাদা কাগজ—শুধু একটাতে লেখা 'মাপ করবেন দাদা, এটাকে যদি পারেন তো ঋণ বলে মনে করবেন। যদি কোনদিন পারি কিছু একটা হিল্লে লাগাতে তো সুদসুদ্ধ শোধ ক'রে দেব। গ্রহ বিরূপ, কিছুতেই কিছু হয় না, অথচ ভগবান মেজাজখানা এমন দিয়েছেন যে নবাবী না ক'রে থাকতে পারি না। কিন্তু ভুলিনি কিছুই, যা নিয়েছি সব মনে আছে, যদি দিন পাই তো সবই শোধ করব। নমস্কার—'

চুপ ক'রে থাকা ছাড়া উপায় নেই। সিয়ান ঠকলে বাপকেও জানায় না। আর জানিয়ে বা আপসোস ক'রেই বা লাভ কি, সকলে সমবেদনা জানাবার ছলে মজা দেখে যাবে দ'লে দলে এসে। সুতরাং চুপ ক'রেই রইলাম, একশ সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সার হিসাবটাই শুধু মনে মনে খচ্ করতে লাগল মধ্যে-মধ্যেই।

পরের দিন সন্ধ্যায় বসে হঠাৎ ঘোষাল-দাই কথাটা তুললেন, বললেন, 'দেখুন আমারও অনেক টাকা নিয়ে গেছে, খাওয়া থাকার চার্জ ছাড়াও বাড়তি অন্তত পঞ্চাশটি টাকা বিল হবে—কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে—লোকটা ঠিক জোচ্চোর নয়। কে জানে কেন—কাল থেকে যত তোলাপাড়া করছি মনে মনে, ওকে ঠিক জাত-জোচ্চোরের দলে ফেলতে মন চাইছে না। কোথায় একটা কি আছে ওর মধ্যে—'

'তা ঠিক!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মহাদেববাবু, 'হিউম্যান কোয়ালিটিজ যে ছেলেটার মধ্যে বিস্তর, ভোরি ভোরি লাভেবল্। যদি এসব না ক'রে সৎ পথে উন্নতি করার চেষ্টা করত—!'

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বাইরে, তার মধ্যে সমুদ্রের ঢেউগুলো দীর্ঘ আঁকাবাঁকা রহিরেখার সৃষ্টি করে আবিরাম ভেঙে ভেঙে পড়ছে, উদ্দাম ঝোড়ো বাতাসে লেগেছে বাদলের সুর—ফলে সমুদ্রগুঞ্জন হয়ে এসেছে জনবিরল। হাওয়ার সঙ্গে তীক্ষ্ণ সূচীমুখ বালুকণা এসে গায়ে বিঁধছে—তাই হাওয়ার আশা ত্যাগ ক'রে ভ্রমণবিলাসীর দল গৃহাগত হয়েছে বহুক্ষণ। আজ এ লাউঞ্জের আড্ডা জমেনি, বস্তুত রাও অন্তর্হিত হবার ফলে কাল থেকেই সে আড্ডা ভেঙে গেছে। আমরা তিনটি প্রাণী শুধু ভাবছি বসে বসে কোন্ ফন্দীতে কোথায় কাকে ঠকাচ্ছে, অথবা নিজেই ঠকছে নিজের কাছে।.....ভাবছি ঠিক এই মুহূর্তটিতে সে কোথায়, হয়ত মাদ্রাজে কি ওয়াল্টেয়ারে কি কোদাইকানালের কোন হোটেলে গিয়ে উঠেছে, রাস্তায় পরিচিত অসংখ্য লোকের কথার টুকরো নিজের আশ্চর্য মেধায় বিধৃত ক'রে নিয়ে গিয়ে বিশ্বাসের বনিয়াদ পাকা করেছে সেখানেও, সেখানেও এমনি কোন লাউঞ্জে বসে দামী সিগারেট, ভাল খাবার এবং দিলখোলা হাসি বিলিয়ে যাচ্ছে। নিজের জীবনটা উড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে দু হাতে।.....

চিত্রাঙ্কন শিখিবার বই
কে আর্টস্ ড্রইং বুক
ধারাবাহিক খন্ডে প্রকাশিত
আঞ্জেলো পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি-৯

৫৫-৪৩৬২
দি সুপরিচিত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
বেঙ্গল ডেকরেটর
২২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-৬

# চলতি বাজার

## বিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গত রাজশেখর বসু যখন 'চলন্তিকা' প্রকাশ করেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা ভাষায় এমন একখানি অভিধান রচনা করা,—যার মধ্যে আমাদের প্রচলিত ও প্রয়োজনীয় সমস্ত কথার শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অর্থ এবং ব্যবহার পাওয়া যাবে। কিন্তু 'চলন্তিকা' পদটি যে দুটি অর্থ বহন করতে পারে, সে কথা অনেক সময়ে আমরা খেয়াল করে দেখি না। যখন যে জিনিষটা চলতি, তাকেই বলি চলন্তিকা। এ একটা অর্থ। আর যখন ব্যাঙ্গের সুরে বলি, তখন কথাটার মানে দাঁড়ায় মেকি। অর্থাৎ চলবার নয়, তবু চলছে, চলে যাচ্ছে বা চালানো হচ্ছে।

সাহিত্যের বিষয়বস্তুর অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে এই চলন্তিকা, বিশেষ করে, আত্মচরিত-জাতীয় রচনা। নিত্য প্রবহমান জীবনের মধ্যে বসে আপনার জীবনকে যাচাই করে দেখা,—এও চলন্তিকার একটি রূপ। আমাদের সাহিত্যে এইরকম চলন্তিকার নমুনা খুব বেশি না হলেও নিতান্ত কম নয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে স্মৃতিসাহিত্য রচনা করে গেছেন, তার মূল্য স্থায়ী। বাঙলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির এক একখানি দলিল বলাও চলে। তার পর রাসসুন্দরী, কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, শরৎকুমারী চৌধুরী থেকে শুরু করে প্রমথ চৌধুরী ও উপেন্দ্র গাঙ্গুলি মশায় তাঁদের সময়কার অনেক চমৎকার ঘটনা ও মানুষ নিয়ে আত্মপ্রসঙ্গ লিখেছেন। আধুনিক কালে, হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর চোখে-দেখা মানুষদের নিয়ে আর পবিত্র গাঙ্গুলি 'চলমান' জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্রব ও অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। অচিন্ত্যকুমারও 'কল্লোল যুগ' লিখলেন স্থির ও নির্মেঘ স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে। আরও অনেকে লিখেছেন, যেমন তারাশঙ্কর, সজনীকান্ত এবং পরিমল গোস্বামী। সম্প্রতি লিখছেন গোপাল হালদার, 'রূপনারায়ণের কূলে'। এর পর আরও কেউ-কেউ লিখবেন, এবং হয়তো আমারও তুচ্ছ জীবন-অভিজ্ঞতার সেই প্রচ্ছন্ন সাধনা একদিন ধরা পড়তে পারে।

বিদেশী সাহিত্যেও একাধিক শিল্পী, কবি, ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক,—এমন কি পুস্তকব্যবসায়ী মানুষও এ ধরণের লেখা লিখেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পাঠকচিত্তে পরলোক-তত্ত্বের পরই হ'লো 'চলমান' জীবনের আসন,—তা সে ডায়েরি হোক অথবা আত্মচরিত হোক। এই জাতীয় রচনার জনপ্রিয়তা নিঃসংশয়। তবে যিনি খাঁটি চলন্তিকা লিখতে পারেন, উপরন্তু ঠিক-ঠিক জায়গায় টীকা-ভাষ্য করতে জানেন, তাঁর মন ও চোখ দুটি পদার্থকেই যে সজীব ও সজাগ রাখতে হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মোটের ওপর, আমাদের সাহিত্যিকরা বড়ই সজ্জন। সব কিছুই সোনার চক্ষে দেখেন! সাহিত্যের মধু আস্বাদ করে যান, কিন্তু বড় একটা হুল ফোটান না। বোধ হয়, বন্ধুবিচ্ছেদ তথা সমালোচনার ভয়ে। দু-একজন নিন্দুক আছেন বটে, তবে তাঁরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ—এই রক্ষা।

কিন্তু আনুষঙ্গিক সাহিত্যের কথা থাক। চলন্তিকার প্রতি মৃদু শ্লেষ করবার অধিকার অন্ততঃ সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই আছে এবং থাকবে। যখন যে জিনিষটা চলতি, সেটা বোঝা, এবং বুঝে ফেলে ঠিকমত আঁকড়ে ধরার নামই হলো রিয়ালিজম। সাঁতার কাটতে গেলে হাত-পা ভেরে যাবার আশঙ্কা। তাই বিনা আয়াসে স্রোতে গা ভাসানোর আর্ট শিখলেই চলন্তিকা হওয়া যায়। তাতে যদি আন্তরিক ভদ্রতা, শিক্ষা ও রুচিবোধের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে, বিবেকের দ্বন্দ্বকে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়, তাতে কিছু আসে যায় না। লোক-সানের চেয়ে লাভের আশাই বেশি। কারণ যাঁরা ব্যস্তবপন্থী, তাঁরা চলন্তিকায় আস্থাবান্। আদর্শ নিয়ে অকারণ মাথাব্যথায় তাঁরা অভ্যস্ত নন। কেন না, মনখানি তাঁদের ষোল আনা পড়ে আছে, এবং নজরও আবদ্ধ রয়েছে, সামনের বর্তমানে অথবা ঈপ্সিত অদূর ভবিষ্যতে।

লোকে বলে, উপায় নেই। এ রকমটি না করলে ভদ্রলোকত টিঁকে থাকা চলে না। বাজারে যে জিনিষটা চলছে, যে বস্তুর যখন যা রেওয়াজ, সেই অনুসারে মানুষকেও চলতে হয় এবং আত্মসমর্পণ করতে হয়। তবু এই চলন্তিকার গড্ডালিকা-স্রোতে গা ভাসিয়ে চলাটাকে আপনারা কেউ-কেউ হয়তো বরদাস্ত করতে পারেন না। তাতে হয়তো আপনাদের ব্যক্তিত্ব-জ্ঞান, মর্যাদাবোধ আহত হয়, ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু ভেবে দেখুন—এতে সুবিধা কত, আরাম কত। আর 'ক্যারেক্টার', 'ক্যারেক্টার অ্যাফেয়ার্স' এবং নদীর ও ফ্যাশনের ক্যারেক্ট —এদের ব্যুৎপত্তিটা কী!

আপনাকে বেশি পরিশ্রম করে অহেতুক আত্মক্ষয় করতে হবে না, জীবনীশক্তিরও অপচয় করতে হবে না। 'ন্যূনতম বাধা'র নীতিটি অনুসরণ করে চলুন, দেখবেন বিশেষ কিছু না করেই স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে গন্তব্যে গিয়ে ঠেকে গেছেন শেষ পর্যন্ত। যাঁদের বয়স কম, তাঁরা গায়ের জোর এবং মনের জোর ফলানোর পক্ষপাতী। কেননা, সহনশীলতার ফলে যে নির্বিকার মনোভাবের জন্ম হতে পারে, তা তাঁদের নেই। কিন্তু আপনার-আমার বয়স বাড়ছে, উৎসাহ কমছে। স্বাস্থ্য ভাঙছে এবং টাকার জোর কমছে। ঘরে গঞ্জনা আর বাহিরে লাঞ্ছনা আপনার শত গুণপনাকে অগ্রাহ্য করে' কেবল আপনার সাংসারিক এবং সামাজিক অযোগ্যতাই প্রমাণ করে। কোনও রকম ঝামেলা ও মানসিক উৎপাত সহ্য করবার মতন উদ্যম অথবা প্রবৃত্তি যখন ফুরিয়ে আসে, তখন আপনারা কি করবেন অথবা করতে বলেন?

ফুটবল ম্যাচে অথবা সিনেমার টিকিট কাটতে গিয়ে একদা যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, কাউকে চিমটি কেটে, কাউকে বা কনুই কিংবা হাঁটুর গুঁতো মেরে, কিংবা বুদ্ধি থাকলে পিছন থেকে পাঁজরের ওপর সুড়সুড়ি দিয়ে, সামনের মানুষকে ঠেলে পাশে কাটিয়ে যেমন অনিবার্য গতিতে অগ্রসর হতেন, সেইটে একবার করে' দেখুন। নয়তো নিশ্চেষ্ট ভাবে জনস্রোতের খাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। টিকিট-ঘরের কাঠের খাঁচার সামনে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন অভাবিতভাবে। সেই রকম আরও সবাই যেভাবে জগতে চলছে, বেশ দু' পয়সা গুছিয়ে নিচ্ছে এবং সুবিধা পেলে সুনামটুকুও কুড়িয়ে নিচ্ছে, সেইমত আমরাও যদি চলতে শিখি, দেখব আমাদেরও আর ঠকতে হবে না। কথাটা নেহাৎ হালকা নয়, হাসি-ঠাট্টায় উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। সীরিয়স্‌লি ভেবে দেখুন—কোন জিনিষটা চলে তা নয়, কোনটা বরং চলে না, সেইটে!

প্রথমে ধরুন—মেকি সিকি। একে তো রৌপ্যবর্জিত, বাজনার বালাই নেই। মাটিতে ফেললে সব মুদ্রাই এক আওয়াজ ছাড়ে। তার ওপর পানওয়ালার দোকানের মতন চুম্বক থাকে না পকেটে। কাজেই বাজারে আলুর দোকান আর র‍্যাশনের দোকান থেকে থলি ও কার্ড দুটোই খালাস করে যখন ভাবছেন দিগ্‌বিজয়ের পর্ব শেষ হলো, তখন সেই নিশ্চিন্ততার অসতর্ক লগ্নে মেকি মুদ্রাটি এসে ঢুকলো আপনার পকেটে। এবং সেই যে ঢুকলো রক্তগত শনির মতন, তারপর থেকে আর ছাড়ান নেই। তারপর কত চেষ্টাই করলেন কিন্তু কোথাও গছাতে পারলেন না। প্রকাশ্য আলোয়, আবছায়ায়, আধো-অন্ধকারে

# দেহ ও মন

সুমথনাথ ঘোষ

এবার পুজোয় এক কাণ্ড করে বসলো শ্রাবণী। মায়ের জন্যে সরাসরি বেনারস থেকে কেবল একশো টাকা দামের দুধে গরদের থান নয়, সেই সঙ্গে আবার একখানা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের কাতান সিল্কের চাদরও কিনে আনলো।

অপিসের সহকর্মী অমরেশবাবু এক মাসের ছুটি নিয়ে পুজোর দু'হপ্তা আগেই কাশীতে চলে যাচ্ছিলেন শুনে শ্রাবণী তাড়াতাড়ি ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে, দু'খানা দশ টাকার নোট তাঁর হাতে গুঁজে দিলে। লক্ষ্মীদিদা, ছোটবোনের এ উপকারটুকু করতেই হবে। আমার অনেকদিনের সাধ মাকে কাশী থেকে কিনে দেবো। এতদিন সুযোগ পাইনি। ভালই হলো। ঠিক সময়ে আজ আপনাকে পেয়েছি। তাছাড়া আমি ওসব ভালমন্দ কিছুই চিনি না। আপনি এসব ব্যাপারে ঘুঘু। বলে একটু স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে দিলে অমরেশবাবুর মুখের ওপর।

বস্তুতঃকি অমরেশবাবু কাপড়-চোপড় খুব ভাল বোঝেন। কি রেশমী, কি পশমী আর কি সুতীর। অপিসের বাবুদের ও'র ওপর অগাধ বিশ্বাস। শুধু বিয়ে-থার ব্যাপারে নয়, একটা গায়ের কাপড়, কি গরমের কোট, কিংবা কোন বেশী দামের শাড়ী কিনতে হলে, সকলেই তাই ছোটে এই অমরেশবাবুর কাছে। অভিজাত বংশের ছেলে। এককালে ওঁদের অবস্থা নাকি খুই ভাল ছিল। এখন কিছু না থাকলেও নজরটা যায়নি। কোনটা খাঁটি আর কোনটা ভেজাল—কেবলমাত্র দু'টো আঙ্গুলে কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে ঘষেই তিনি তা বলে দেন, তা একেবারে ধ্রুব বলে সকলে মেনে নেয়।

তবে ও'র মনটা একটু উঁচু সুরে বাঁধা। সস্তার, কমদামের জিনিস কিনতে চান না। বলেন, ভাই মিছিমিছি মনকে আঁখি ঠেরে লাভ নেই। এই বাজারে কুড়ি-পঁচিশ টাকায় যে আসল সিল্কের শাড়ী জন্মাতে পারে না যদিও আমরা সকলে তা জানি, তবু আশা করি যে দোকানদার একেবারে 'আসলী-চীজ'টা কেবল বার করে দেবে আমাকে।

তাই টাকাটা দেবার সময় শ্রাবণী বললে, দেড়শো টাকা আমার বাজেট, তবে দু'দশ টাকা আরো বে
হয় নেবেন।
বলবো?
তবে জি
অন্ততঃ
এইচ
পুরার মধ্যে বি
ত দোকান থেকে কিনি না—পাঞ্জা
কাছে চলে যাই সেখানে তাঁতে বোনা
যা, তাই থেকে বেছে ভাল জিনিস নিয়ে
আসি।

ওঃ তাহলে ত কথাই নেই! কণ্ঠের উচ্ছ্বাস যেন চেপে রাখতে পারে না শ্রাবণী।

[redacted] থেকে দোকানী
[redacted]টির জন্যে
[redacted] তাদের
[redacted] গভীর
[redacted] ঠাং
[redacted] বলে
[redacted] ফেরং
[redacted] তায় মেকি-পনা
[redacted] সরাই সরল মানুষকে প্রতারিত
[redacted] নিয়তই, এ সম্পর্কে গভীর আক্ষেপ
সকলকে শুনিয়ে আর একটি সচল মুদ্রা
যেন অনেক খোঁজাখুঁজির পর পার্স থেকে
কষ্ট করে বের করে দিতে হয়। এখন প্রশ্ন
হচ্ছে—মেকি সিকিটা যায় কোথায়?
আপনি ওটাকে দেরাজের এক কোণে
ফেলে রাখবেন, একেবারে ফেলে দেবেন
না নিশ্চয়ই। তারপর কোনও শুভ লগ্নে
'অনেস্ট অ্যাটেম্পট' করতে গিয়ে দেখা গেল,
অবশেষে সেটি 'লাউ-গড়গড় বুড়ীর' মতই
নানা বিপত্তি কাটিয়ে গড়গড়িয়ে কারেন্সি
অফিসের শেষ নিশানায় কেমন করে যেন
পৌঁছে গিয়েছে। কি জানেন আসলে টাকা-
কড়ির নিজস্ব 'ভাল্যু' কিছুই নয়। সৎ
সংসর্গে বাস করে সরকারের দেওয়া একটা
ছাপ নিয়ে জনসাধারণের কাছে এক ধরণের
কৃত্রিম মূল্য অর্জন করে মাত্র। এটা
নিতান্তই মন-গড়া মূল্য, যান্ত্রিক কেরামতির
সামাজিক দান।

তারপর ধরুন, মেকি ছেলে। বাজারে
কি তার কাটতির কিছু অভাব আছে?
যাঁরা স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা অধ্যাপনা
করেন, তাঁরা কথাটার সত্যাসত্য বিচার করে
দেবেন। কিসে মেকি, কার দোষে মেকি হয়ে
পড়ল, সে আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। তবে
চোখের সামনে নিতাই দেখতে পাচ্ছি নানা
ধরণের মেকি যুবক। দেহে শক্তি নেই,
কিন্তু অদ্ভুত মুখের জোর। ঘরে খাদ্যাভাব,
তনু-মন ক্ষীণ। কিন্তু মাথায় লম্বা ধরণের
ব্যাক-ব্রাশ চুলের ঝাঁকা অথবা মুড়িয়ে-চুল
ছাঁটা। পরণে কিম্ভূতকিমাকার রংচঙে
ঘাটো কুর্তা ও ফ্যাশনেবল চোঙা পাতলুন।
কিছু না পড়েও অনেকেই 'কালচার্ড'।
চায়ের দোকানে ফুটবল ও ক্রিকেট
পলিটিকস এবং খেলোয়াড়দের সর্বাধুনিক
সংবাদ, ফিল্ম আর্টিস্টদের জীবন, জীনিকা
ও আয় সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্যগুলি নখ-
দর্পণে। রাজনীতি-চর্চায় বহু ছেলেই
আশ্চর্য সূক্ষ্মবুদ্ধি। আর ইতিহাস-জ্ঞান
তেমন কিছু না থাকলেও যাবতীয় 'ইজম'
আর সমাজতন্ত্রবাদের সাড়ম্বর আলোচনায়
কোনও বাধা নেই। এদিকে বাড়ীর আর্থিক
অবস্থা যদি অসচ্ছল হয়, তাহলেও
ষ্টেশনারি এবং দরজির দোকানে কিছু না
কিছু দেনা থাকবেই। কারণ কোনও
জিনিষই আজকাল ভারে কাটে না, কাটে
ধারে।

অতএব ধার থাকা চাই, নইলে ভদ্র-
লোকই হওয়া যায় না। মগজে ধার না
থাকলেও মুখের দাপট চাই। কলেজের
ছেলে হলে তো কথাই নেই। অধ্যাপকদের
বিদ্যা-বুদ্ধি, কলেজ য়ুনিয়ন আর সহ-
পাঠিনীদের বেশভূষা-চর্চায় বন্ধুমহলকে
চমকিত করা যায়। আর শারদীয় 'সোশ্যাল'
কিংবা সরস্বতী পুজোয় নাম-করা রেডিও-
আর্টিস্টদের এনে ফেলে তহবিল না
মিলিয়েও মরসুম মাৎ করা চলে। আর
কিছু না হোক, বারোয়ারী মণ্ডপে ভাড়াটে
লাউডস্পীকারে মিশ্র-বেসুরো গীতি
চলন্তিকা।

আর যে ছেলেটির একটিও মেয়ে-বন্ধু
নেই, যারা কফি-হাউসে বসে ক্লাশ ফাঁকি
দেয় না, ম্যাটিনীতে মেট্রোয় 'কিউ' দেয় না,
উপরন্তু পরীক্ষা দূরে জেনেও যারা
লাইব্রেরীতে গতায়াত করে, তারা তো
প্রাগৈতিহাসিক জীব! অতএব আধা হাতের
সিল্ক হাওয়াই আর ট্রাউজার্স-মোড়া যেসব
সব-জান্তা চীজ্ দেখা যায় খেলার মাঠে,
সিনেমা হল-এ, সভা-সমিতিতে, কিংবা
কলেজের বিতর্ক-আসরে, তাদের মেকি বলি
কোন্ সাহসে? বর্তমানের তথা, ভবিষ্যতের
ভরসা তা এরাই। পল্লীর ও সমাজের এরাই
তো 'অরেক্‌ল্' এবং 'পনীটফ'!

তাহলে মোটামুটি দেখছি, বর্তমানে
যেটা চলছে অথবা শীঘ্রই চালু হবার
সম্ভাবনা এবং আশা আছে, সেটিকে সুবিধা-
মত আয়ত্ত করে কাজে লাগানোই হচ্ছে
বাস্তব-বোধের তথা শুভবুদ্ধির পরিচয়।
একটা মন-গড়া আদর্শ একটা প্রিয় সংস্কার
কিংবা পুরাতন সত্যের পিছনে দৌড়ান
আলেয়া ধরবার মতই হাস্যকর মূঢ়তা।
তাই সাহিত্যে, রাজনীতিতে, শিক্ষায় ও
সামাজিক আচরণে—প্রায় সর্বত্রই এই ধরণের
রিয়ালিজ্‌মের কারবার এবং জয়-জয়কার।
আর যেসব লেখক, কূটনীতিজ্ঞ, সংসারী
গৃহস্থ এবং শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি আদর্শের
বালাই ঘুচিয়ে প্র্যাকটিক্যাল হতে শেখেন
আর কায়দামাফিক ঝোপ বুঝে কোপ
মারতে পারেন, তাঁরাই জীবনে ও জগতে
প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন। যিনি যত কৌশলী,
তিনি ততই সার্থক।

এক কথায়—যাঁর যত কেলেঙ্কারি, তাঁর
ততই কৃতিত্ব!


সুদৃশ্য ও মজবুত
ষ্টীল ফার্ণিচার

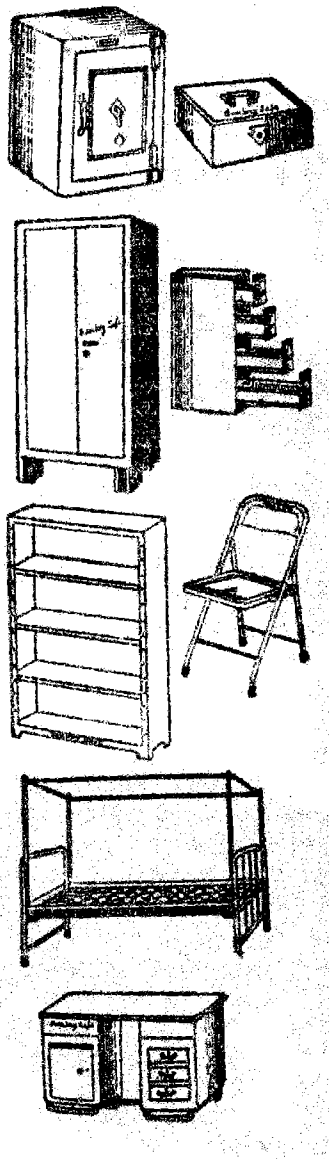

ব্যাঙ্ক সেফ এণ্ড ষ্টীল
ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৫৬, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিঃ-১
ফোন ঃ ২২-১১৪১
অনুমোদিত ডীলার
ইউনিভার্সাল মার্কেণ্টাইল কর্পোরেশন
২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১

নিজের 'সিট'এ ফিরে এসে যত কাজ করতে যায়, ঘুরেফিরে মায়ের সেই কথাটা তার কানে যেন বাজে। ফি বছর পুজো এলেই একবার করে মা সেই অতি পুরনো গল্পের পুনরাবৃত্তি করবেই করবে। আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে অতীতের কাহিনী স্মরণ করতে করতে এক সময় ওরি ফাঁকে বলবে, জানিস, তোর বাবা বলেছিল কাশী থেকে বেনারসী শাড়ী কিনে এনে দেবে। কোলকাতার দোকানে নাকি সব ভেজাল। আসল জিনিস পাওয়াই যায় না। জেনেশুনে পয়সা দিয়ে ঠকার চেয়ে, না পরা ভাল। তা এমনি আমার পোড়াকপাল যে তারও যেমন কোনদিন কাশী যাওয়া হলো না। আমারও তেমনি জন্মের মত শাড়ী পরা ঘুচে গেল!

বাবার অবস্থা যে খুবই খারাপ ছিল, তা জানে শ্রাবণী। সামান্য মাইনের কেরানী তাও মাড়োয়ারীর গদিতে। কি দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাদের দিন কেটেছে কলকাতার এঁদোপড়া গলির, সবচেয়ে সস্তার একখানা ঘরে থেকে দু'বেলা দু'মুঠো ভাতও সকলের মুখে সবদিন জোগাতে পারেন নি তিনি। তবু যে মাকে বেনারসী পরাবার কল্পনা করেছিলেন, এইজন্যে সে মনে মনে বাবাকে ধন্যবাদ দিতো।

অমরেশবাবুকে যে বেনারস থেকে শাড়ী ও চাদর কিনে পাঠাতে বলেছে শ্রাবণী, মাকে তা জানতে দেয়নি। তাঁর হাতে জিনিসটা তুলে দিয়ে একেবারে চমক লাগিয়ে দেবে বলে গোপন রেখেছিল।

ষষ্টীর ঠিক আগের দিন। খাওয়া-দাওয়া সেরে অপিস যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল শ্রাবণী। ড্রেসিং-টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের গোড়াটা শক্ত করে বেঁধে, কালো ফিতেটা দাঁতে কামড়ে ধরে চিরুনি দিয়ে চুলটা টেনে টেনে লম্বা করছে, এমন সময় পিওনের গলা শুনলে, দিদিমণি ভি-পি আছে। প্রসাধন ফেলে ছুটে এলো শ্রাবণী। আষ্টেপৃষ্ঠে কাপড়ের সেলাই করা একটা প্যাকেট, তার ওপর অসংখ্য গালার শীল ও নিজের নাম-ঠিকানা বড় বড় হরফে লেখা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। পিওন বললে, একশো পঁয়তিরিশ রুপিয়া দিজীয়ে দিদিমণি!

এই যে দিই, বলে ভেতরে ঢুকতেই মা বলে উঠলেন, ওটা কি রে? অতবড় বাণ্ডিল?

কিছু নয়! বলে মাকে বললে, আমার চুলের হাত, তুমি আলমারীটা থেকে একশো পঁয়তিরিশটা টাকা বার করে ওর হাতে দাও?

একশো পঁয়তিরিশ টাকা! ওমা এত টাকা ওকে দিবি কেন?

বলছি মা। আগে ওকে বিদেয় করো ত?

পিওনকে যতক্ষণে টাকাটা বার করে গুনে দিচ্ছিলেন, তার ভেতরেই শ্রাবণী ছুরি দিয়ে সেলাই কেটে প্যাকেটটা খুলে ফেললে। তারপর মায়ের হাতে সেই দু'টো জিনিস তুলে দিয়ে বললে, এবার পুজোয় যে তিন মাসের বোনাস পেয়েছিলুম তাই থেকে তোমাকে এটা কিনে দিলুম মা! এ আমার পুজোর প্রণামী। বলে মাকে নমস্কার করলে।

ওমা, এই এত টাকা খরচ করে মিছিমিছি তোকে কে কিনতে বলেছিল।

জগৎ পারাবারের তীরে ফটো : পার্থসারথি

শ্রাবণী বলে, আমার অপিসের এক ভদ্রলোক কাশী গিয়েছেন, তাঁকে কিনতে দিয়েছিলুম। সেখানকার আসল বেনারসী। সবসুদ্ধ দেড়শো টাকা লেগেছে।

এ্যাঁ! তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে শ্রাবি? এই সাতকাঁড়ি টাকা দিয়ে আমায় কে কিনে দিতে বলেছিল।

গাঢ় হয়ে আসে শ্রাবণীর গলা। তোমার স্বামী যা পারেনি, ছেলে যা পারেনি, তোমার বিধবা মেয়ে যদি তাই করে থাকে মা, তাহলে কি সে অপরাধ করেছে! না, যাকে একদিন নুন খাইয়ে মারতে চেয়েছিলে, গলার কাঁটা, আপদ-বালাই ভাবতে, সে-ই মেয়ে যদি তাই আজ নিজে উপার্জন করে তোমার বহুকালের ইচ্ছা পূর্ণ করেছে বলে, ওই কথা বলছো মা! তবু তোমাকে বেনারসী শাড়ী পরাতে পারলুম না, এ দুঃখ আমার মলেও যাবে না মা!

তাই বুঝি বাপ-ভাই তুলে এত খোঁটা, এত গঞ্জনা দিচ্ছিস?

বড় জ্বালা মা। সে সব দিনের কথা ভুলতে পারি না। আজো যেন কানে বাজছে। তুমি মা হয়ে, নিজে মেয়েছেলে হয়ে কোন প্রাণে ওকথাগুলো মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে মা।

ওরে, দুঃখের জ্বালায় ওইসব কথা মুখ দিয়ে বেরোয়! নইলে কি মা কখনো স্বেচ্ছায় বলতে পারে! এত লেখাপড়া শিখেছিস এত টাকা রোজগার করছিস আর এটা বুঝিস না? মেয়েছেলে হয়ে গরীবের ঘরে জন্মানো যে কত বড় অভিশাপ কোনদিন যেন তা কাউকে, এমনকি শত্রুকেও না বুঝতে হয়!

শ্রাবণী এবার জ্বলে ওঠে রাগে। বলে সেইজন্যে বুঝি চোদ্দ বছরে পড়বার আগেই আমার বয়েসটা আঠারো করে খুঁজে খুঁজে একটা তিন ডবল বয়সের পাত্রের গলায় বেঁধে দিয়েছিলে! এতই যদি গলগ্রহ মনে হয়েছিল, যদি দুমুঠো খেতে দিতে এত কষ্ট হচ্ছিল, তো কোন অনাথ আশ্রমে দিলে পারতে মা? ফ্রি স্কুলে পড়ছিলুম, থার্ড ক্লাশেও উঠেছিলুম। কেন আমার লেখা-পড়াটা এইভাবে ঘুচিয়ে দিয়েছিলে। আরো দু চার বছর পরে যদি বিয়েটা দিতে তাহলে, চোখের সামনে হয়ত ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মরে যেতো না, তোমার জামাইকেও হয়তো অকালে হারাতে হতো না! বস্তীর মধ্যে শেয়াল-কুকুরের মত, জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো, আট আটটা বছর যে কি করে কেটেছিল মা, তা যদি জানতে! উঃ। বলে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সস্নেহে মেয়ের চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে মা বলেন, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে মা! চুপ কর।

ফুঁপিয়ে ওঠে শ্রাবণী মায়ের বুকের মধ্যে, একে তুমি মঙ্গল বল? যখন টাকার দরকার ছিল, একটা পয়সার জন্যে ভিখিরির মত দোরে দোরে ঘুরেছি, আত্মীয়স্বজনের কাছে হাত পেতেও পাইনি .....অথচ আজ যখন টাকার অভাব নেই, তখন.....

চুপ কর মা!

আচ্ছা ভেবে দেখ তো, যদি এখনো সেই আগের অবস্থায় থাকতিস তাহলে কি হতো? তাই বলছি, ভগবান ওই দারিদ্র্য থেকে মিহিরকে তুলে নিয়ে তাকে মুক্তি দিয়েছেন, সে শান্তি পেয়েছে স্বর্গে গেছে। নইলে আজ যে তুই বি-এ পাশ করে সর্টহ্যান্ড শিখে অপিসে চাকরী করছিস, মাসে মাসে সাড়ে চারশো টাকা ঘরে তুলছিস, তা কি সম্ভব হতো?

চুপ করে থেকে জবাব দেয় শ্রাবণী, সেদিন তোমার জামাই চোখ বুজলো, সেই-দিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, যে টাকার জন্যে স্বামী-পুত্তুরকে খাওয়াতে পারলুম না, চোখের সামনে তাদের অকাল-মৃত্যু দেখতে হলো, সে-ই টাকা রোজগার করবো যেমন করে হোক্। তারপর লোকের বাড়ী বাধুনীর চাকরী করে কি কষ্টে লেখাপড়া শিখেছি, তা তো তুমি সব জানো মা.....

জানি বলেই ত বলছি মা, এও ভগবানের আশীর্বাদ! তিনি বোধহয় চান না যে তোর মত মেয়ে চিরজীবন ওই অভাব-দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন কাটায়। তাই তোর পথের কাঁটা সব দূর করে এমনিভাবে রাস্তা পরিষ্কার করে রেখেছেন!

তখনো ফোঁপাচ্ছিল শ্রাবণী।

কণ্ঠে সহানুভূতি ঢেলে তিনি আবার শুরু করলেন, কি বা বয়েস তোর, বুড়ো বুড়ো মিনসে যারা অপিসে চাকরী করে চুল পাকালে তারা ক'জন তোর মত সাড়ে চারশো টাকা রোজগার করে শুনি? সামনে তোর সারা জীবন পড়ে রয়েছে, তাই বলি ভোগ করে নে যতদিন পারিস্ মা! মহা-প্রাণীকে কষ্ট দিলে ভগবান খুশী হন না কখনো!

মা ঠিক কি বলতে চান, বুঝতে পারে না শ্রাবণী! নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে।

তিনি আপন মনে বলে চলেন, বুড়ো ধিঙ্গী মেয়েগুলো কচি খুকি সেজে সব ঘুরে বেড়াচ্ছে—আইবুড়ো নাম তাদের এখনো খণ্ডায়নি—খোঁজ নিয়ে দেখগে, তাদের বয়েস তোর চেয়েও বেশী! তিরিশ-একতিরিশ বছর যে তোর বয়েস হয়েছে না বললে, কেউ কি চেহারা দেখে বুঝতে পারে? খুব বেশী হলে একুশ-বাইশ, মনে হয়। তাই বলছি কি, এবার একটা বিয়ে কর। জীবনটাকে ভোগ কর মা।

মা যে এত ভণিতা করে এই কথাটা তাকে বলতে চায়, ধারণা করতে পারেনি শ্রাবণী! তাই শিউরে উঠলো। বললে, ছিঃ। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মায়ের দিক থেকে।

কেন ছিঃ? আজকাল ত কত বিধবা মেয়ে আবার বিয়ে-থা করে কেমন সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসারধর্ম করছে! তবে এত রোজগার-পত্তর করছিস কিসের জন্যে! ভাল ভাল শাড়ী যা কিনে দিয়েছি, একটাও ত অপ্পো দিস না। বললেই শুনিয়ে দিস্, অফিসে চাকরী করতে এত সেজেগুজে গেলে পাঁচজনে কি ভাববে?

ঠিক-ই ত! শ্রাবণী তার পূর্বের মতকে আরো দৃঢ়কণ্ঠে সমর্থন করে।

হাঁ, যত বুঝি তোর বেলা লোকে মনে করবে! কেন এই যে রাস্তা দিয়ে দলে দলে সব মেয়েরা সেজেগুজে মুখে রঙ করে অপিসে চাকরী করতে যায়, কৈ তাদের ত তোর মত মনে হয় না?

তারা যে কুমারী মেয়ে মা। ভুলে যেয়ো না। তাদের মনে অন্য আশা যে লুকিয়ে থাকে।

মা বলেন, তা না হয় মানলুম। কিন্তু বিয়ে-হওয়া মেয়েরাই বা কম যায় কৈ? তাদের সাজ-গোজের বহর দেখলে মনে হয় যেন শ্বশুরবাড়ী চলেছে।

ওই সাজ-গোজের সঙ্গে তাদের স্বামীর মান-মর্যাদা জড়িত মা. এটা কেন বুঝতে পারো না? তাছাড়া তাদের স্বামী যদি ওইরকম পছন্দ করেন, তাতে কার কি বলার আছে?

ক্ষুব্ধ স্বরে মা বলেন, হাঁ, যত কিছু বলার, সব তোর জন্যে না?

শ্রাবণী আর কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অপিসে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে।

মা বলেন, জানিস সেদিনে ছকুর মার সঙ্গে ওদের বাড়ীউলি ব্যারিষ্টার অনুকুল-বাবুর স্ত্রী বেড়াতে এসেছিলেন, তোর ঘরে ঢুকে সাজানো-গোজানো দেখে বললেন, বাঃ কি সুন্দর রুচি আপনার মেয়ের? কার্পেট, সোফা, কাউচ থেকে বিছানার বেড্-কভার জানলা-দরজার ওই নেটের পর্দা—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটি জিনিসের প্রশংসা করলেন।

এইটেই আমি চেয়েছিলুম মা! শ্রাবণীর কণ্ঠে একটা চাপা গর্জন ওঠে। আমরা যে মানুষ, শিক্ষায়, দীক্ষায় রুচিতে কারো চেয়ে নীচে না, সেটাই আমি প্রমাণ করতে চাই মা! গরীব বলে সকলের হেনস্থার, অবজ্ঞার বস্তু নয়! জোর করে একটা মেয়েকে গরীব দুঃখীর সঙ্গে বিয়ে দিলেই সে যদি নেমে যায়, সমাজের চোখে ত সে অপরাধ কার? অথচ যে ধনী আত্মীয়রা দাঁড়িয়ে থেকে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা যদি সেদিন কিছু অর্থসাহায্য করতেন তাহলে আমার স্বামী-পুত্রের জীবনটা হয়ত রক্ষা হতো। আর আমিও সে ঋণ হয়ত শোধ করে দিতে পারতুম মা। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। পাছে দেখা হলে টাকা ধার চাই বলে, দেখা পর্যন্ত করতেন না! কিছু ভুলিনি মা। সব এই বুকে গেঁথা আছে।

বলে নীরবে চোখের কোল আঁচলের প্রান্ত দিয়ে মুছে শ্রাবণী চাপাগলায় বললে, জানো মা, মাসের শেষে যখন সাড়ে চারশো টাকার করকরে নতুন নোটগুলো নিয়ে ভ্যানিটী ব্যাগে পুরি তখন আগে মনে পড়ে সেই রুগ্ন ছেলেটার মুখখানা, তারপর তোমার জামাইয়ের অনশনক্লিষ্ট শুকনো উপবাসী চেহারা। গরীব বলে কত তাকে তিরস্কার করেছি; বিয়ে করে একটা মেয়ের জীবন এই-ভাবে নষ্ট করার কি অধিকার আছে, বলে কত গালাগাল করেছি। সব মনে পড়ে যায় মা! অথচ তোমার ভাইয়ের কিসের অভাব। অত-বড় লোহার কারখানায় কত লোক কাজ করছে, যদি একটা চাকরী তাকে দিতো, তাহলে আমার জীবন আজ অন্যরকম হয়ে যেতো মা! তুমি কত বলেছো, আমি কত সেধেছি কিন্তু সেই এক কথা, আমার আর লোক নেবার ক্ষমতা নেই। কর্মচারী যা আছে তাদেরি ছাঁটাই করতে হবে!

চুপ কর মা। যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর দুঃখ করে কি লাভ। ভগবান তোর মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। টাকা চেয়েছিলি, তিনি টাকা দিয়েছেন। যথেষ্ট দিয়েছেন। তাই বলছি, ভোগ কর মা! জীবনের কোন সাধ-আহ্লাদই ত তোর মেটেনি, এইবার সেগুলো মিটিয়ে নে!

আয়নার মধ্যে হঠাৎ নিজের চোখ দুটো দেখে নিজেই শিউরে উঠলো শ্রাবণী। কখন জল শুকিয়ে গিয়ে সেখানে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে শুরু হয়েছে! ভাল করে নিজের মুখটা দেখলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। তারপর মনে মনে বললে, বাঃ চোখ দুটো ত তার এখন আরো ভাল দেখাচ্ছে!

বিজয়ার প্রণাম করতে গেল শ্রাবণী মামার বাড়ী পাইকপাড়ায়। যাবার সময় ভীমনাগের দোকান থেকে দশ টাকার সন্দেশ বাক্সয় করে নিয়ে গেল ট্যাক্সি থামিয়ে। পুজোর সময় কখনই মামারা কলকাতায়

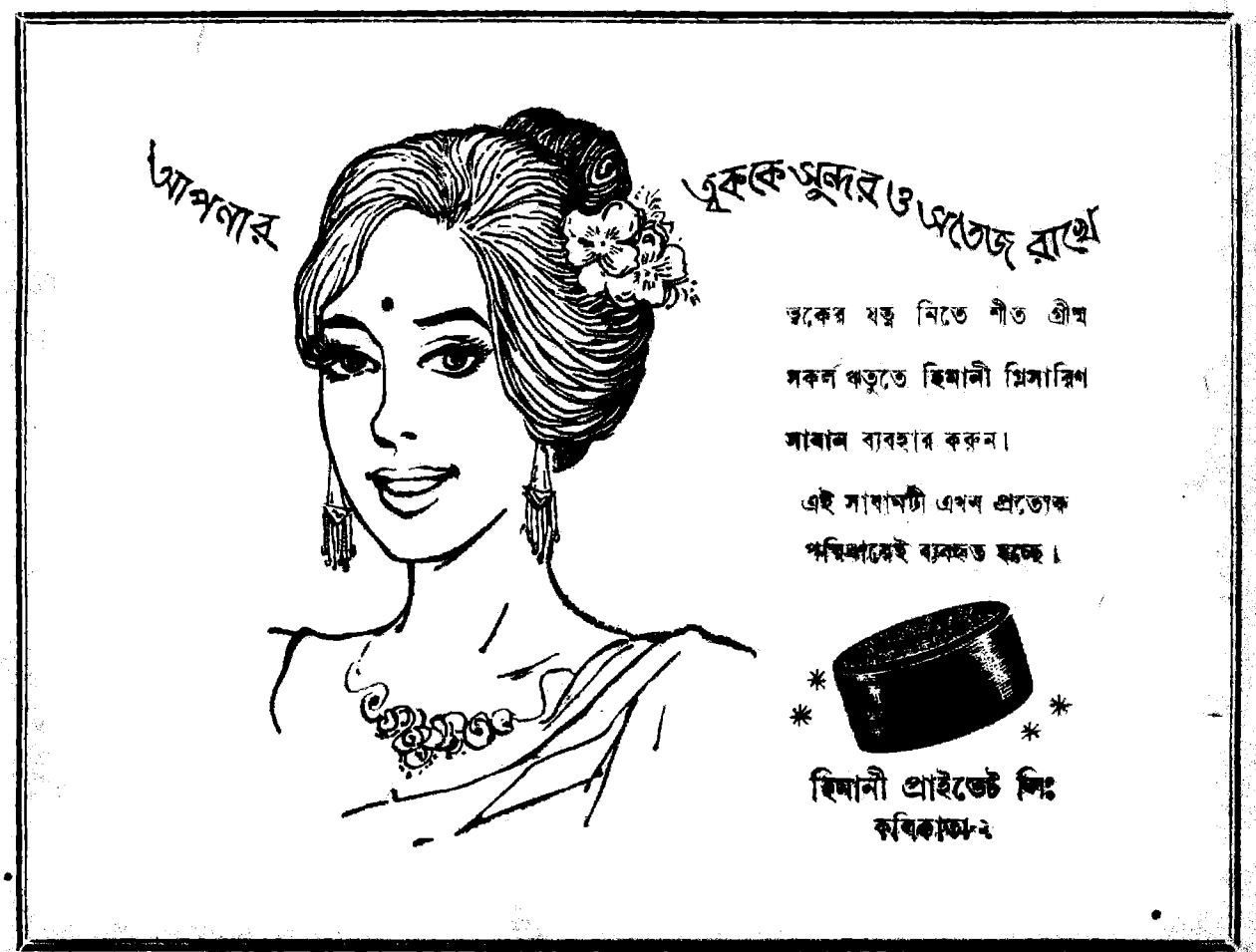

থাকেন না। বিদেশে বেড়াতে যান। বোধহয় পাঁচ ছ' বছর পরে এই প্রথম কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাননি।

মামিমাকে প্রণাম করতেই তিনি আগে সেই কথাটা শুনিয়ে দিলেন। বললেন, এবার ত কাশ্মীর যাবো সব ঠিক, প্লেনে সিট্ রিজার্ভ করা—ওখানের হোটেলে টাকা পাঠিয়ে ঘর নেওয়া, ছোট ছেলেটা হঠাৎ এমন সর্দি-জ্বর বাঁধিয়ে বসলো যে তিন দিন যেতে না যেতেই নিউমোনিয়া। এক মাস ভুগে সবে তিন দিন হলো পথ্যি করেছে। কাশ্মীর ঠাণ্ডা জায়গা, ডাক্তার বারণ করছেন যেতে, তাই এবার সব বন্ধ দিলুম। তোমার মামাকে বলছিলুম, তুমি আর আমি না হয় চলে যাই, ছেলে-মেয়েরা থাক। তা উনি রাজী নন্। বলেন, আনন্দ ত ওদের। ওরা-ই যদি না যায়, ত আমাদের কি হবে গিয়ে।

মামিকে প্রণাম করে ওপরে মামার ঘরে শ্রাবণী যখন উঠে গেল, তখন তার মায়ের কাপড়ের দিকে তাকিয়ে ওর মামিমা মন্তব্য করলেন, বাবা ঠাকুরঝি যে খুব জমকালো শাড়ী পড়েছো দেখছি।

হাঁ, ভাই—এটা এবার মেয়ে কাশী থেকে আনিয়ে দিয়েছে। এই কাপড় আর চাদরের দাম দেড়শো টাকা।

বাবা, দেড়শো টাকা নিয়েছে, এই সাদা সিল্কের শাড়ী ও চাদরে?

হাঁ ভাই, একেবারে খাস বেনারস থেকে আনা—সাচ্চা জিনিস!

হাত দিয়ে একবার কাপড়টা পরীক্ষা করে বললেন তিনি, তুমি যাই বলো ঠাকুরঝি তোমাকে ঠকিয়েছে। এর দাম খুব বেশী হলে পঞ্চাশ। কেননা, গত বছর আমার ছোট বোন কাশী থেকে ঠিক এই রকমের একখানা শাড়ী কিনে এনেছে—শুধু এটা খান, আর তাতে একটু সরু পাড় আছে, এই যা তফাৎ। তার দাম পড়েছে পঞ্চান্ন টাকা।

কি জানি ভাই। আমি অতশত বুঝি না। ওর অফিসের এক বাবু কাশী থেকে কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ওঃ তাই বলো। বুঝেছি! অফিসের বাবুই হোক্ আর যেই হোক্, সে কিছু না রেখে কেন তোমার জন্যে কষ্ট করতে যাবে! আর বলতে হবে না।

ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করছিল। বালিগঞ্জ প্লেস্ থেকে টানা ট্যাক্সি করে ওরা গিয়েছে শুনে বেশ একটু চমকে উঠলো শ্রাবণীর মামা-মামিরা। তাঁরা নিজেরা চোখে চোখে নিঃশব্দে যেন কি বলাবলি করলেন।

তারপর ওরা যখন বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে, তখন স্পষ্ট শ্রাবণী শুনলো ওর মামিমা মামাকে বলছেন, তোমার ছোটবোন পয়সা দেখাতে এসেছিল আমাদের। মেয়ে চাকরী করছে, সাড়ে চারশো টাকা মাইনে পায়, মাকে দেড়শো টাকা দিয়ে কাপড়-চাদর কিনে দিয়েছে। এর পরে মামা কি বললেন তার কানে গেল না। ওরা সদর দরজায় নেমে এসেছিল।

শ্রাবণী মাকে কিছু বললে না। মনে মনে শুধু খুশী হলো। হাঁ, সে এটাই চেয়েছিল তার পয়সা হয়েছে, এই কথাটা যে মামিমা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন, এতেই সে যেন চরিতার্থ।

ট্যাক্সিতে বসে, মা বললে, জানলি বৌদি বলছিল, এই কাপড়টার নাকি দাম খুব বেশী হলে পঞ্চাশ—তোকে ঠকিয়েছে!

এবার খিল-খিল করে হেসে উঠলো শ্রাবণী!

হাসছিস যে?

তার মানে আমাদের টাকা এত হয়েছে যে পঞ্চাশ টাকার জিনিসটা একশো টাকা দিয়ে কিনতে পারি, এই ত? বলে আরো একটু হাসলো। বিজয়িনীর হাসি।

সেই অগ্রহায়ণ মাসের তিন তারিখে শ্রাবণীর বড়মামার ছোটমেয়ের বিয়ে। মামিমা নিজে নেমন্তন্ন করতে এলেন প্রকাণ্ড একটা বুইক্ চড়ে। শ্রাবণী তখন অপিসে। ওর মা খাতির করে ওপরে বসালো। বললে, কি সৌভাগ্য আমার যে, তোমার পায়ের ধুলো পড়লো আজ গরীবের বাড়ী।

শ্রাবণীর ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন তিনি, বললেন, পলির বিয়ে, তাই নেমন্তন্ন করতে এলুম। তোমার দাদা বলে দিয়েছে, সকাল থেকে মেয়েকে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু ঠাকুরঝি।

দেখি! শ্রাবণী আবার ছুটি পেলে হয়। আমার ইচ্ছায় ত হবে না!

কেন ছুটি পাবে না? ওর যদি যাবার ইচ্ছে থাকে ঠিকই পাবে। নিজের মামাতো বোনের বিয়ে বললে, ছুটি দেবে না, আমি ত' বিশ্বাস করি না।

যতক্ষণ কথা বলছিলেন, ততক্ষণ তাঁর চোখদুটো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেই সুসজ্জিত ঘরটার সমস্ত জিনিসের ওপর। যেন সব দৃষ্টির ফলকে চিরে চিরে দেখছিলেন, বাবা, তোমার মেয়ের শখ ত দেখছি খুব ঠাকুরঝি! বলে গলা থেকে একরকম মধুমিশ্রিত বিষ ঢেলে দিয়ে তারপর উঠে পড়লেন। ভারী দেহটা নিয়ে শেষ সিঁড়িতে পৌঁছে আবার বললেন, বিধবা ভায় ছেলেমানুষ, তার এত শখ দেখলে লোকে কিন্তু ভাল বলবে না ঠাকুরঝি!

কি করবো ভাই। এইসব নিয়ে যদি ভুলে থাকে, মনে শান্তি পায় ত পাক্!

না-না। হাজার হোক মেয়েছেলে! কথায় বলে "মেয়েমানুষ দশ হাত কাপড়ে ল্যাংটা।" ওসব প্রশ্রয় দেওয়া তোমার উচিত হয়নি! আমি হক্ কথা বলবো। আমরা না হয় আপনার লোক কিছু মনে করলুম না, কিন্তু পরে শুনবে কেন?

সেদিন ছুটি হয়তো পেতো, কিন্তু ইচ্ছা করেই শ্রাবণী নিলে না। শুনতে মামাতো বোন কিন্তু পরপর বললেও বেশী বলা হয়। কোন সম্পর্কই ত তাঁরা রাখেননি এতকাল ওদের সঙ্গে। গরীব বলে চিরদিন ঘৃণার দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। হঠাৎ যে মামিমা নিজে বাড়ী বয়ে নেমন্তন্ন করতে এলেন কেন—সেটিই আজ শ্রাবণীর কাছে বিস্ময়। ছেলে-মেয়ে কাউকে পাঠালেই ত পারতেন।

ভাবতে ভাবতে সহসা তার মাথায় গেল একটা চিন্তা। হয়ত মার কথাটা সেদিন বিশ্বাস হয়নি। তাই নিজের চোখে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। সত্যি সত্যি ওদের অবস্থা কতখানি ফিরেছে!

তাই শ্রাবণীও একটা মূল্যবান উপহার কিনে নিয়ে মাকে সঙ্গে করে সন্ধ্যাবেলায় বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। তখনো নিমন্ত্রিতের ভিড় শুরু হয়েনি। আপনা-আপনি আত্মীয়-স্বজন ও অন্তরঙ্গদের সবে আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে।

আড়াই শো টাকা দিয়ে শ্রাবণী গোপনে বড়বাবুর স্যাকরার কাছ থেকে একটা গিনি-সোনার চিক কিনেছিল। সূক্ষ্ম সোনার কাজের ওপর পান্না, চুনি ও মুক্তো সেট্ করা।

শ্রাবণী নিজে হাতে সেটা মামাতো বোনকে উপহার দিলে। মা-ই শিখিয়ে দিয়েছিল, তোর ছোট বোন হয়, তুই হাতে করে দিলে ভাল দেখাবে। প্রথমে শ্রাবণী রাজী হয়নি। পরে কি মনে করে বললে, আচ্ছা।

আজকের দিনে খাঁটি সোনার জিনিস আবার তা এমন সুন্দর কাজ-করা পেলে কোথায়! দাম ত বড় কম নয়। বেশ ভারী। আর সাচ্চা সব মুক্তো ও পাথরগুলো।

এই নিয়ে তখন মেয়ে-মহলে রীতি-মতো আলোচনা শুরু হয়ে গেল। মামিমা অলংকারটা হাতে করে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে মুখটা বিকৃত করে বললেন, এটা একটু আলাদা রেখেদিগে যা। মেয়ের যা


নগদ ও সহজ কিস্তিতে

এইচ, এম, ভি

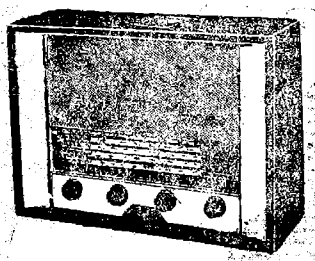

মডেল নং ৫৭৬১

এইচ, এম, ভি, রেডিও, রেডিওগ্রাম, সেরপা, কমেট, এডমিরেল্ট—২, ট্রানজিসটর রেডিও, রেকর্ড ইত্যাদি সহজ কিস্তিতে আমাদের নিকট পাইবেন।

অন্যান্য রেডিও আমরা বিক্রয় করি।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্

৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩

ফোনঃ ২৪-৪৭৯৩।

আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই।

ঢং-ঢ্যাং বাড়িতে দেখে এসেছি, তা আর মুখে বলার নয়। কে বলবে যে বিধবার ঘর!

চাপা গলায় কে একজন বলে উঠলো, তবে শুনেছি যে মেয়ে খুব ভাল চাকরী করে—অনেক টাকা নাকি মাইনে পায়।

হাঁ-হাঁ তুমি রাখো দেখি! অনেক টাকা মাইনে দেবার আর তারা লোক পেলে না! মেয়ে আমার কি রাইচাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার যে ওকে ডেকে দিতে গেল! বলে একটু থেমে মামিমা বললেন, আজকালকার দিনে মেয়েরা অপিসে যা মাইনে পায়, অপিসের বড়সাহেবদের নজরে পড়ে গেলে তার দুডবল উপরি আসে। বুঝলে না। উনি তাই সেদিন সব শুনে বলছিলেন। নইলে ঘরদোর সাজানোর বহর যদি দেখো! বড়লোকদের হার মানিয়ে দেয়। বলি এত টাকা আসে কোথা থেকে! ছ্যাঃ! ভাবতে গেলে ঘেন্না করে।

কে একজন ফোড়ন কাটলো, তা বড় বড় লোককে ঘরে এনে বসাতে গেলে তেমনি আসবাবপত্তর দরকার বৈকি? কি বলিস রে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উঠলো। যে ঘরে মেয়েকে সাজিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, সেখানেই ছিল মেয়েদের সবচেয়ে ভিড়। চারিদিকে গোল হয়ে ঘিরে বসেছিল সবাই পালিকে। নিমন্ত্রিত যারা আসছিল ওই ঘরে বসছিল।

শ্রাবণী এদের মধ্যে বসে যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। একটু পরেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাকে খুঁজতে যাচ্ছিল ভেতরে। হঠাৎ একটা ঘরের কাছে আসতেই মামিমা ও তাঁর বোধহয় বাপের বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তার সম্বন্ধে যে আলোচনা হচ্ছিল, তাই শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কে আবার ওরি মধ্যে থেকে ফোড়ন কাটলো, তা বিয়ে দিলেই ত পারে বাপু। আজকাল ত হামেশাই হচ্ছে এরকম?

হাঁ। ওই বিধবা মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে কার ঘাড়ে গেছে? আর জ্বালাসনি তুই। বলে মামিমা গলায় একপ্রকার সুর টানলেন।

শ্রাবণীর দুটো কানে যেন কে গলিত সীসা ঢেলে দিলে। পায়ের তলায় যেন কি কাঁপছিল। মনে হচ্ছে বুঝি ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। আশেপাশে যেদিকে তাকায় দেখে সব ঘুরছে। দুলছে। এখনি বুঝি ভেঙ্গে পড়বে বাড়ীঘর সব তার মাথায়। ছুটতে গিয়ে দেখে, পারছে না। অতি কষ্টে দেওয়াল ধরে ধরে সে আবার ফিরে এলো সেই ঘরে, যেখানে বধূবেশে বসে আছে পালি। একটু পরই মাকে দরজার কাছে দেখে সে বেরিয়ে এলো। বললে, মা শিগ্‌গির চলো! আমার শরীরটা কেমন করছে, বলতে পারছি না!

সে কি রে! এখনি চলে গেলে ওরা কি মনে করবে।

তুমি তাহলে থাকো মা। ওদের পৌঁছে দিতে বলো কাউকে। আমি চলে যাই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

না-না। তোর শরীর খারাপ, একলা এতটা পথ যাবি, সে কি হয়? আমি বিধবা মানুষ, আমিই বা এখানে থেকে কি করবো! আমি বৌদিকে একবার বলে চলে আসছি। আসল কাজ ত হয়ে গেছে। জামাই পরে দেখলেই একদিন হবে'খন।

সারা পথ মাথাটা টিপে ধরে ট্যাক্সিতে চোখ বুজিয়ে রইলো শ্রাবণী। মায়ের সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বললে না। মামিমার সেই কণ্ঠস্বর। সেই বক্রোক্তি যেন তার কানের মধ্যে তখনো তেমনি বাজছে: 'বিয়ে করবে ওই বিধবা মেয়েকে...কার ঘাড়ে গেছে...তুমিও যেমন!'

শুধু একথা নয়, আবার তার সম্বন্ধে যে কুৎসিত চিত্র অন্যদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, সেকথা ভাবতেও ঘৃণা হয়। নেহাত বিয়েবাড়ী, আত্মীয়স্বজন চারিদিকে, নইলে এর জবাব মামিমাকে ভাল করেই দিতে পারতো শ্রাবণী! অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়েছে। আবার মামারও নাকি এতে সমর্থন আছে! ছিঃ!

যতদিন যায়, এ অপমানের জ্বালা কিছুতেই ভুলতে পারে না শ্রাবণী। দুষ্ট ক্ষতের মত ভেতরে ভেতরে যেন একটা আক্রোশ জন্মাতে থাকে মামিমার ওপর, মামার ওপর, আত্মীয়স্বজন সকলের ওপর।

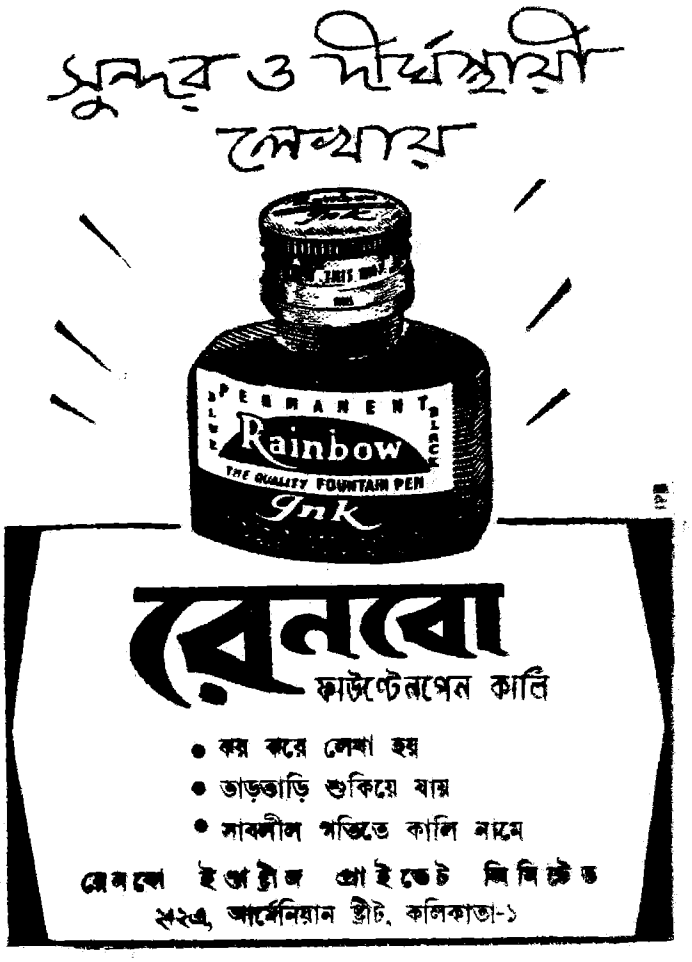

সবচেয়ে মামিমার ওপর। কি করে প্রতিশোধ নেবে তাই ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে, এক একটা রাত্রি বিনিদ্র কেটে যায়। মেয়েকে ছটফট করতে দেখে মা প্রশ্ন করেন, কি হয়েছে রে, শরীর খারাপ করছে?

না। কিছু নয়। বলে পাশ ফিরে শোয় শ্রাবণী কিন্তু সারারাত তার চোখ দুটো অন্ধকারে হিংস্র শার্দুলের মত যে জ্বলতে থাকে। মেয়ের মনের খবর কিছুই জানতে পারেন না মা যদিও তারি পাশে শুয়ে থাকেন।

কয়েকদিন এইরকম ভাব দেখে শেষে একদিন গভীর রাত্রে মা প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁরে কি কষ্ট হচ্ছে বল, কাল সকালেই তোকে নিয়ে যাবো ডাক্তারের কাছে! আমি ত ভালো বুঝছি না।

শ্রাবণী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর হঠাৎ যেন মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করতে করতে বলে ফেললে, আমি বিয়ে করবো মা। সব ঠিক করে ফেলেছি! তুমি আয়োজন করো।

সে ত খুব ভাল কথা রে। আমি ত কবে থেকে তোকে বলছি মা। ভোগ করে নে জীবনটাকে। এমনি করে আত্মপীড়ন করা পাপ!

চুপ করো মা! ওসব কথা থাক! সামনের মাঘের দু তারিখে ভাল দিন আছে। তুমি চিঠি ছাপিয়ে সবাইকে নেমন্তন্ন করে এসো। মামার বাড়ীর যেন কেউ বাদ না যায়। খুব ঘটা করতে হবে কিন্তু! মনে রেখো।

হাঁ মা, তোমার মনের কোন সাধ অপূর্ণ রাখবো না আমি। ভগবান যে তোমায় সুমতি দিয়েছেন, তার জন্যে আমি কালই কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসবো।

রমেন মল্লিক। সুন্দর পুরুষোচিত চেহারা। এম-এ পাশ। ভদ্র মার্জিত রুচিসম্পন্ন যুবক। মাইনেও ভাল পায়। শ্রাবণীর চেয়ে বয়স কিছু কম হলেও বহুদিন থেকে তার নজর শ্রাবণীর ওপর। জরুরী চিঠি টাইপ করতে দিতে এসে, তার আঙুলটা একটু স্পর্শ করার লোভ সামলাতে পারে না। তার চোখের স্থিরও গভীর দৃষ্টিতে বহুদিন শ্রাবণী দেখেছে তার কাঙাল মনের প্রতিচ্ছবি। কোনদিন তাকে আমল দেয়নি।

"একি, শ্রাবণী তুমি কাঁদছো?"

ওর ঠাণ্ডা নীরস দৃষ্টি দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বার বার। কাজেই তাকে পাওয়া আদৌ কঠিন হলো না।

বর দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল মামিমা ও মামার বাড়ীর সকলে। এমন সুশিক্ষিত সুন্দর চেহারার ছেলে কি দেখে বিয়ে করতে রাজী হলো শ্রাবণীর মত মেয়েকে, কে জানে! দামী বেনারসী ও গহনায় ফুলের মালায় সাজিয়ে ছিল শ্রাবণীকে। রাণীর মত দেখাচ্ছিল তাকে রমেনের পাশে। খুব ছেলেমানুষ দেখাচ্ছিল শ্রাবণীকে তার বয়সের তুলনায়।

মামার বাড়ীর সকলে সকাল-সকাল চলে গেল। বিয়ে পর্যন্ত কেউই রইলো না।

শ্রাবণী শুধু মামিমাকে হাত দুটো ধরে অনুরোধ করলে, আপনি চলে গেলে লোকে কি মনে করবে? আমাদের পরিচয় দেবার মত আপনজন বলতে আপনি ছাড়া আর কে আছে।

কি জানি, কি মনে হলো! হঠাৎ মামিমার চোখ দুটো স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। আচ্ছা, বিয়েটা হয়ে গেলে, যাবো তাহলে। বিয়েটা ছিল গোধূলি লগ্নে, পাছে দেরী হবে, এই ওজুহাতে চলে যায় মামারবাড়ীর সব। তাই এ ব্যবস্থা শ্রাবণী নিজেই করেছিল। যেন তার বিষয়টা সে কেবলমাত্র দেখাতে চায় তার এই মামিমাকে।

মামিমা বর-কনেকে বাসর ঘরে বসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু কিছু খেলেন না। শ্রাবণীর মা অনেক অনুরোধ করলে, বৌদি, একটা সন্দেশ অন্ততঃ খাও নইলে যে আমার মেয়ের অকল্যাণ হবে ভাই!

মনে মনে বললেন, বিধবার বিয়ে, তার আবার কল্যাণ অকল্যাণ! এতো বিয়ে নয়—নিকে! কিন্তু মুখে বললেন, আচ্ছা দাও একটা সন্দেশ। বলে ডিস থেকে একটা সন্দেশ নিয়ে গালে ফেলে চলে গেলেন।

সারারাত বাসরটা গান-বাজনা করে কেটে গেল। পরের দিন কালরাত্রি। একটা সম্পূর্ণ আলাদা ঘরে রাত কাটালে শ্রাবণী। রমেনের মুখ দেখলে না। মুখ দেখলে নাকি স্বামী-স্ত্রী সুখী হয় না। শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় মেয়ের কানে বার বার করে ওই একটি কথা বলে দিয়েছিল শ্রাবণীর মা।

শ্রাবণীও মনে প্রাণে সেটা মেনে চলেছিল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রে সবাই যখন শুতে চলে গেল কোলাহল-মুখরিত বাড়ীটা যেন নিমেষে জনহীন শূন্য বলে মনে হতে লাগল, তখন কাঁপতে লাগল শ্রাবণীর বুকের ভেতরটা। শয্যার প্রান্তে বসে কাঁদতে লাগল সে। দু'চোখ বেয়ে নীরবে যেন শ্রাবণের ধারা বইতে লাগল।

একি, শ্রাবণী তুমি কাঁদছো? কি হয়েছে বলো লক্ষ্মীটি! বলে রমেন যেমন তার বাঁ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিতে গেল, শ্রাবণী হাতটা সরিয়ে নিলে।

ব্যাপার কি? ভ্রূকুঞ্চিত করে সরে গেল রমেন।

আমায় ক্ষমা করো। আমি ভুল করেছি। আমি কিছুতেই পারছি না মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তার সেই অনশনক্লিষ্ট মুখখানা যেন চোখের সামনে ভাসছে! কত তিরস্কার করেছি দারিদ্র্যের জন্যে। কত গালাগাল দিয়েছি। সব মনে পড়ছে। আমি তাকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না। আমার সব মনটা জুড়ে রয়েছে সে। তোমার স্থান সেখানে হবে না—না—না—না। বলে ডুকরে কেঁদে রমেনের পায়ের ওপর আছড়ে পড়লো শ্রাবণী। আমায় ক্ষমা করো। আমার দুর্বলতা মার্জনা করো। তুমি শিক্ষিত ভদ্র, তোমাকে আর বেশী কি বলবো! তুমি আমার মন চাও না দেহ চাও? বলো? বলো?

রমেন কি বলবে বুঝতে পারে না। শুধু পাথরের মত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে। আর তেমনি ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে শ্রাবণী তার পায়ের ওপর মাথা রেখে।

# মাদুলী

প্রতিভা কুমারী সান্যাল

ভাগ্যবিধাতা বোধ হয় গণনা ক'রে দেখেছিলেন, শোভনার মতো মেয়ের হাতে বামাপদকে যদি গছানো না যায়, তাহলে ভবিষ্যতে দুজনের মধ্যে একজনের দুঃখ-দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। তবে কিনা সেই বিধাতা প্রকাশ্যভাবে কারও অকল্যাণ চাইছেন,—এর প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি! সম্ভবত সেই ভরসাতেই, হাতীবাগানের টোলের পণ্ডিতরা উত্তমরূপে উভয় পক্ষের ঠিকুজি-কোষ্ঠি বিচার ক'রে বছর আষ্টেক আগে বলেছিলেন, এ বিয়ে হ'ল রাজযোটক!

সেই বিয়ের ফলাফলস্বরূপ বছর ছয়েকের একটি মেয়ে এবং চার বছরের একটি ছেলে। ছেলেটা বড়ই কাঁদুনে, এবং সেই এক বছর বয়স থেকে এই কাঁদুনে স্বভাবটি তাকে পেয়ে রয়েছে। বহু চেষ্টা করেও শোভনা ওকে দুরস্ত করতে পারেনি। মেয়েটা থাকে মামার বাড়িতে।

একটু কোলেই নাওনা বাপু? সেই আপিস থেকে ফিরেছি,—কাঁদছে তখন থেকে। ছেলেটার ওপর বড্ড অযত্ন তোমার!

টুলের ওপর দাঁড়িয়ে নতুন ঘরখানার দেয়ালে শোভনা পেরেক পুঁতছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল, সারাদিন কাঁদছে, সমস্তক্ষণ বায়না,—তুমিই কেন যাওনা ওকে নিয়ে একটু বাইরে? নতুন বাড়িতে একটু নিঃশ্বেস ফেলার তার সময় নেই!

বামাপদ চৌকির ওপরে বসেই রইল, নড়ল না এতটুকু। শুধু বলল, কী ছিরি তোমার ঘর সাজাবার! মেয়েমানুষের বুদ্ধি এমনি হয়! ওখানে ছবি টাঙাচ্ছ,—মশারির দড়ি বাঁধবে তাহলে কোন্ পেরেকে? বৌবাজারে থাকতেই না বলেছিলুম, পুরনো খাটখানা বেচো না?

শোভনা পেরেকের ওপর কাটারির ফলাটা ঠুকতে ঠুকতে বলল, মুখেও উচ্চারণ করো না সেই খাটের কথা! তোমার বাপ-পিতামো ওই খাটে শুয়ে স্বর্গে গেছেন, বুড়ি ঠাকুমা মরেছেন ওই খাটে, আর তোমার মা যদি সে-বছর কাশীলাভ না করতেন, তাহলে তাঁর কপালেও থাকত ওই খাট! ওখাট এবাড়িতে আর ঢুকতে দেবো?

ছেলেটা বায়না ধ'রে কাঁদছিল।—

বামাপদ বলল, কিচ্ছু জানো না, শুধু মেয়েলি তর্ক। ওখানা ছিল আসল শেগুনের খাট একশ' বছর আগেকার। ও কি পাওয়া যায় আজকাল? শুধু কি খাট? কাঁঠাল কাঠের বাক্সটাও অমনি খয়রাতি ক'রে এলে!

শোভনা রাগ ক'রে বলল, যাক, পুরনো বালাই সব যাক। নতুন বাড়িতে এলুম, এখানে সব নতুন জিনিস আনব। আগে থামাও দেখি ছেলেটাকে? সেই থেকে শুধু তর্কই করছ!

নতুন বাড়ি? একে তুমি বাড়ি বল? দেড়খানা ত' ঘর! না আছে পাঁচিল, না রান্নাঘর!—বামাপদ বলল, তখন না বলেছিলুম?

কী বলেছিলে শুনি?—শোভনা মুখ ফেরালো।

কেন, হাতীবাগানের ওদিকে দু'খানা ঘর নিয়ে থাকলে এ সব ঝঞ্ঝাট কি হত? ভাড়াবাড়িতে থাকো, মাস-মাস টাকা ফেলে দাও। ল্যাঠা চুকে গেল!

ঘরভাড়া করার চেয়ে একি ভাল হয়নি? নিজের বাড়ির সম্মান নেই?—বাঁকা চোখে শোভনা বলল।

সম্মান এখন ধুয়ে খাও!—বামাপদ গরগর ক'রে বলল, কী আছে এখানে? না বাজার-হাট, না মুদি-মনোহারী! একখানা পানের দোকান পর্যন্ত হয়নি। রাতে-ভিতে অসুখ করলে একটা ডাক্তার নেই!

টুল থেকে নামল শোভনা। বলল, চার-পাঁচটা গেরস্থ এখানে এসেছে, তাদের চলছে কেমন করে? ওরাও ত' আপিস-ফেরতা বাজার করে আনে। ইষ্টিশানের কাছে দেখে এলে ত' মুদির দোকান। মাঝে মাঝে মাছ বিক্রি করতে আসে। চলবে না কেন শুনি? বউবাজারে চিরকাল কাটিয়ে আর বুঝি নতুন জীবন ভাবতে পার না?

সেখানে সব পেতুম হাতের কাছে!

সেইজন্যেই ত' এত আলস্য তোমার!—শোভনা বলল, না আছে সাহস, না কোমরের জোর। কষ্টকরা শেখোনি, পরিশ্রম কা'কে বলে জান না। সবাই মিলে যোগান দিয়েছে,—নিজের ক্ষমতা কিছু দেখাওনি! চাকরিটাও জুটিয়েছিলে পিসেমশায়ের উমেদারি ক'রে। নিজের যোগ্যতায় পাওনি।

বামাপদ বলল, বেশ ত, সাউথ্‌ড়ি ক'রে এসে এই বন-বাদাড়ে জায়গা কিনেছ, এবার দেখাওনা কেমন কোমরের জোর! দেখিনা তোমার যোগ্যতাটা কেমন?

শোভনা হাসল,—আচ্ছা বল ত, এ বাড়ির কোন্ কাজটা তুমি করেছ? রাজ-মিস্তিরি কে খাটিয়েছে? বালতি-বালতি জল এনে ইঁট ভিজিয়েছে কে? সিমেন্ট-পারমিট কে যোগাড় করেছিল? জানলা-কপাটে কে রংয়ের পোঁচড়া টেনেছিল?

বামাপদ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যে পুরুষ-মানুষ, বিয়ের আগে কি জানতুম?

আমি কি জানতুম তুমি মেয়েমানুষের হদ্দ?—শোভনা সহাস্যে বলল, শুধু সব কাজের পেছনে টিকটিক করতে জানো! তার চেয়ে কাজ খুঁজে নাওগে দিকি? পাঁচিল না থাকে কাঁটা কেটে বেড়া দাওগে। যদি পার ফুলগাছের গোড়ায় মাটি দাও। দোহাই তোমার, ঘরের চৌকি ছেড়ে বাইরে বেরোও! আলো-হাওয়ার মাঝখানে যাও। তিন কাঠা জায়গা কম নয়,—নিজের মাটিকে ভালবাসতে শেখো!

বামাপদ বলল, হুঁ, আমি তখনই জানতুম!

কি জানতে?

জানতুম আমাকে একলা পেয়ে তুমি খাটিয়ে মারবে! এই ভয়েই আমি ভাইদের সঙ্গে আলাদা হ'তে চাইনি!

শোভনা বলল, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট যে তোমাদের ঘর-বাড়ি সব ভেঙ্গে দিল? তাদের কাছে গিয়ে বলতে পারনি যে, আমরা একেলে পঞ্চপাণ্ডব!

ছেলেটা বায়না ধ'রে সেই অবধি কাঁদছিল। শোভনা বাইরে গিয়ে স্বামীর জন্য চায়ের জল চড়িয়ে দিল। ঝাঁটা দিয়ে ঘর-বারান্দা পরিষ্কার করল। উঠোনের টিউব-ওয়েল থেকে খাবার জল ধ'রে আনল। তারপর সন্ধ্যাবেলাকার রান্নার জন্য কয়লা ভেঙ্গে রেখে মসলা পিষতে বসল। তর্ক করবার সময় নেই তার।

ঘরের চৌকি থেকে উঠে বামাপদ বারান্দায় এসে জায়গা নিল। বলল, এখন দেখছি যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই! আলাদা ঘরকন্না পাতলে তোমার মন-মেজাজ যে এমনি হবে, এ আমি ঠিকই জানতুম। বড়-বৌদি ঠিকই বলেছিলেন!

তাহলে বড়বৌদির আঁচল ধ'রেই থাক গে? ছেলেটাকেও সঙ্গে নিয়ে যেয়ো! তোমার পুরনো বংশের আদুরে দুলাল!—শোভনা তাড়াতাড়ি মসলা বাটা শেষ ক'রে কেটলির গরম জলে চা ভিজিয়ে দিল। পরে বলল, ভাবলুম আপিস-ফেরতা মাছ-আনাজ কিছু আনবে! এবেলা রান্না করি কি দিয়ে বল দিকি?

বামাপদ বলল, এখন মজাটি বোঝ! থাকো পেটে কিল মেরে! সকালবেলা না বলে গেলুম, স্মৃতিরত্নদের ওখান থেকে বাতের মাদুলি আনতে যাব? সে কি সোজা রাস্তা? কয়লাঘাটের আপিস থেকে বেরিয়ে সেই তোমার জেলেটোলা!

কিন্তু তুমি ত' হাঁটবার মানুষ নয়?

শোনো কথা!—বামাপদ বলল, হাঁটা একেবারে বারণ! স্মৃতিরত্ন ব'লে দিয়েছেন, আপিস থেকে সোজা বাড়ি, বাড়ি থেকে সোজা আপিস। এক পা যদি এদিক-ওদিক গিয়েছ, মাদুলির কোনও ফল ফলবে না। হাঁটতে একেবারে মানা।

গরম চায়ের পেয়ালা স্বামীর সামনে রেখে শোভনা বলল, ছেলের গায়ে তিনটে, আর তোমার সাতটা,—আর ক'টা মাদুলি ঝোলাবে সর্বাঙ্গে শুনি? লোকের সামনে দাঁড়াবে কেমন ক'রে?

চায়ে চুমুক দিয়ে বামাপদ বলল, এঃ চিনি হয়নি যে?

ওতেই হবে। আমার মাসকাবারি ছ'সের চিনি। একটু একটু কম খাও।

হুঁ, এ আমি জানতুম! এইজন্যেই বড়বৌদি ছাড়া আর কা'রো হাতের চা আমি খেতুম না!

শোভনা বলল, বেশ ত, আপিস-ফেরতা গিয়ে বড়বৌদির কোলে ব'সে মিষ্টি-মিষ্টি চা খেয়ে এসো!—শোভনা রাগ ক'রে উঠে গেল।

পিছন থেকে বামাপদ বলল, যা আন্দাজ করেছিলুম, ঠিক তাই। তোমার মেজাজ-মর্জির জন্যেই আমাকে আরেকটা মাদুলি ধারণ করতে হবে!

ছেলেটা তখনও ঘ্যান ঘ্যান করছিল।—

ঘরের ভিতর থেকে গুছিয়ে শাড়িখানা জড়িয়ে চটিজুতো পায়ে দিয়ে শোভনা বেরিয়ে এল। বলল, দয়া ক'রে দেখো, দরজা খোলা রইল। আমি আসছি এক্ষুনি।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নিজের মনেই বামাপদ বলল, আমাকে লোকে দৈণ বলে কি সাধে? কে না জানে স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলি আমি? চার ভাই মিলে অমন সুখের সংসার,—দিলুম এক কথায় ভেঙ্গে! আমার না ছিল খাটা-খাটুনি, না মাথাব্যথা। বাপ-পিতামোর সম্পত্তি,—পরম নিশ্চিন্ত। দুখানা ঘর নিয়ে ছিলুম, ওতেই কেটে যেত জীবনটা। দশটা-পাঁচটা আপিস,—চোখ বুজে দিন কেটেছে। এক তিল সমস্যা ছিল না।

দরজার কাছে গিয়ে থমকিয়ে দাঁড়িয়েছিল শোভনা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে হাসছিল। এবার বলল, এখন বড্ড গায়ে লাগছে, না?

কেন লাগবে না?—রাগ করল বামাপদ,—আসলে তুমিই চেয়েছিলে স্বাধীনতা, আমি হলুম তার উপকরণ! ভাই-ভাইয়ের সংসারে কার না ঝগড়াঝাঁটি হয়? তাই বলে একেবারে কাটান্-ছেঁড়ান্ ক'রে এলে? তার চেয়ে না হয় পায়ে ধ'রে মিটমাট ক'রে থাকতুম?

শোভনা বলল, পায়ে ধ'রে থাকতেই বা যাবে কেন? তুমি কি কোনও অন্যায় করেছিলে? তার চেয়ে এই ত' ভাল! ঠাঁই-ঠাঁই থাকো, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখো। কেউ কারও কড়ি ধারে না, কারও সঙ্গে কা'রোর স্বার্থ নিয়ে কথা ওঠে না। নিজে আনবে, নিজের বাড়িতে বসে খাবে!

বামাপদ বলল, এসব তোমার কথার কথা! আসলে তুমিই সব পুরনো ব্যবস্থাকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছ। কথায়-কথায় তোমার নতুন কিছু চাই। বৌবাজারের বাড়িতে তুমি হাত-পা ছড়াতে পাওনি, তাই তোমার রাগ ছিল। ভাসুর-মামাশ্বশুরে ঠানদিদি-ঠাকুমা—এদের ফাঁস থেকে তুমি পালাতে চেয়েছিলে। আমি তখনই বলেছিলুম, দ্যাখো, গৃহশুদ্ধি করুক পরো, সব ঠিক হয়ে যাবে! কথাটা তোমার কানেই ঢুকল না। এখন নাও, এই বনবাঁদাড়, হু হু করছে চারদিক, —সাপ-ব্যাঙ-শেয়াল ঘুরছে পায়ে-পায়ে,—এখন ঠ্যালা সামলাও? আমি কিন্তু বলে রাখছি, দোকান-বাজার যাচ্ছ যাও, আমি অন্ধকারে এই ছেলেকে নিয়ে একলা থাকতে পারব না! চারদিক খাঁ খাঁ করছে!

শোভনা স্বামীর দিকে তাকিয়ে আরেকবার হাসল, তারপর বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে সে হনহন ক'রে চলে গেল মাঠের প্রান্তটা ছাড়িয়ে রাস্তাটার দিকে।

বোধহয় মাইল খানেক হবে। মাঝখানে পড়ে মস্ত এক লোহার কারখানার পাঁচিল,—সেই পাঁচিল বহুদূর পর্যন্ত লম্বা। সন্ধ্যার সময় এদিকটা একটু জনবিরল। রাস্তাঘাটে আলো এখনও হয়নি, তবে কথাবার্তা চলছে। এই পাঁচিলের পাশের দীর্ঘপথটা ছাড়িয়ে গেলে তবে ষ্টেশনের আলো প্রথম চোখে পড়ে। আজ অবশ্য শুক্ল-পক্ষের একটু ঝাপসা আলো ছিল।

দোকান-বাজার করাটা সম্প্রতি শোভনার একপ্রকার অভ্যাস হয়ে গেছে। নতুন বাড়ি আর নতুন ঘরকন্না পাতবার দায়িত্বটা যখন তারই একার, তখন তাকেই এসব নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তা হোক, এতে আনন্দ আছে তার। দরদস্তুর, খরচপত্র, এসব তার নিজের মুঠোর মধ্যেই থাকুক। সে খুঁজে-পেতে গয়লা ঠিক করেছে, ঘুঁটে কয়লা সে এখন বাড়িতে বসেই পায়। ধোবাকে সেই ধ'রে এনেছে ওই ঘুঁটেওয়ালির সাহায্যে। আরও মাস তিনেক কাটলে ঠিকা-ঝি একজনকে রাখার কথা সে হয়ত ভাবতে পারবে।

ঝোলাটা শোভনার হাতেই ছিল। একেকটি ক'রে সে কেনাকাটা আরম্ভ ক'রে দিল। ষ্টেশনের ধারের বাজারটা খুবই ছোট। কিন্তু মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে শোভনা তার ছোটখাটো কেনাকাটাগুলো সব গুছিয়ে কিনে নিল। অধিকাংশই খাদ্যসামগ্রী। একখানা সাবান। মাখন এক কৌটো,—কিন্তু দাম বেড়েছে আরও দু আনা। ডিমের দর আগুন। বিস্কুট ছোট একখানি তিন নয়া! শোভনা ওরই মধ্যে যা পারল, কাল সকালের জন্য আনাজপত্র নিল। ছেলেটার জন্য কৈ, কি মাগুর,—কিন্তু ছ'টাকার কম কিলো নেই! নোনা ইলিশ ভালবাসে বামাপদ,—কিন্তু তাও সাড়ে তিন টাকা। চুনো-চিংড়ির দুর্গন্ধে কাছে যাবার যো নেই। শোভনা যা পারল ঘুরে ঘুরে দেখেশুনে কিনল।

হঠাৎ কে যেন ডাকল পিছন থেকে, আপনি যে সন্ধ্যেবেলা বাজারে?

মুখ ফিরালো শোভনা। তারপর হাসি-মুখে বলল, এই যে? কবে এলেন, বিনয়-বাবু? আপনার বাড়ির সামনে দিয়েই এলুম। ভাল আছেন?

সৌম্যদর্শন যুবকটি জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ দুপুরের বম্বে মেল-এ এসেছি। আপনাদের খবর ভাল? ওরে গোবিন্দ, দিদির হাত থেকে ঝোলাটা নে।

না না, এমন কিছু ভারি হয়নি, আমিই পারব।

তা হোক, দিন্ ওর হাতে।

গোবিন্দ হাসিমুখে শোভনার ঝোলাটা হাতে নিল। বিনয় বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার মালপত্র একেবারে তছনছ করা ছিল। আপনার হাত না পড়লে কিছুতেই গোছগাছ হত না। সব আমি শুনেছি গোবিন্দর মুখে। নিজের ঘরদোর গুছিয়ে আপনি সময় পেলেন কখন?

শোভনা বলল, ও আর কতটুকু! আমার হাতে আরেকটু সময় থাকলে আপনাদের

নতুন বাড়ি সব ভাল করে গুছিয়ে দিতুম। এই ত, একটু আগে দেখে এলুম, আপনার বাড়িতে তালাবন্ধ। গোবিন্দকে না দেখে ভাবলুম, কোথায় গেল! এবার বলুন, নতুন বাড়িতে কবে আসছেন?

বিনয় হাসিমুখে বলল, এই শিগগিরই—বোধহয় মাস দুয়েকের মধ্যে। রান্নাঘরটা হয়ে গেছে, এখন বাকি বাথরুম আর পাঁচিল। যত তাড়াতাড়ি পারি কাজ সারছি।

শোভনা বলল, ঘরের মেঝে মোজাইক করবেন যে বললেন?

ওটা একটু দেরি হবে। সকলের আগে দরকার ইলেকট্রিক। আপনার বাড়ির নর্দমাটা কোন্‌দিকে দিলেন?

হাসিমুখে শোভনা বলল, উঠোনই এখনও হয়নি তা নর্দমা!

গোবিন্দ বলল, দিদিমণি, আপনি যদি গরু রাখার চালা করতে চান আমাকে বলবেন, আমি ঘরামির কাজ জানি।

আচ্ছা ভাই, দুচার মাস যাক্‌ তখন বলব।

বিনয় বলল, আপনার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ। আজ এখানে এসে দেখি, আপনার কল্যাণে আমার চারটে ঘরই ফিটফাট। আপনি ঠিকই জানেন, কোথায় কোন্‌টি ঠিকই মানাবে! আপনার চোখ কিছু এড়ায় না!

চোখ নয়, মন। শোভনা খুব হেসে উঠল।

নিশ্চয়ই। মনের আনন্দই ত গুছিয়ে তোলে। বিনয় বলল, আপনি নিজের বাড়ি নিজে দাঁড়িয়ে করালেন,—দেখলুম ত। তখনই চেয়ে-চেয়ে দেখতুম, কী শক্তি আর সাধ্য আপনার! একসঙ্গেই ত' পাশাপাশি বাড়ি আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু আপনার কাজ কত এগিয়ে গেল!

শোভনা কৌতুক ক'রে বলল, দেখবেন, আমার স্বামীর সামনে যেন অত সুখ্যাতি আমার করবেন না!

কেন? এর কোনটা ত' মিথ্যে নয়? তিনি ত' আনন্দই পাবেন আমার কথায়।

শোভনা তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গটা পালটিয়ে দিয়ে বলল, ভালই হ'ল, এখন থেকে আপনার মতন ডাক্তার একজন হাতের কাছে পাওয়া যাবে। ডাক্তার-বদ্যি কাছে থাকলে আমার স্বামী খুব খুশী হন। আপনার চেম্বার হচ্ছে কোথায়?

বিনয় বলল, সেটা এখনও ঠিক হয়নি। তবে মনে হচ্ছে সকাল দশটা পর্যন্ত এখানে থাকব। কলকাতায় যদি চেম্বার ক'রে উঠতে পারি তবে সাড়ে দশটা থেকে একটা, আর ওদিকে বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা।

শোভনা বলল, তা হলে এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করবেন?

নত মুখে বিনয় বলল, বোধ হয় সেটা সম্ভব হবে না। প্র্যাকটিস যদি জমে ওঠে, হয়ত গাড়ি একখানা রাখতে হবে।

শোভনা আর কিছু বলল না। বিনয়-বাবুরা যে অবস্থাপন্ন সেটি তার স্বাস্থ্য-শ্রীর সজীবতায় প্রকাশ। তা ছাড়া ওদের জায়গা-জমির পরিমাণ শোভনাদের চেয়ে অনেকেরও বেশি। ওরা চাকর-বাকরের আলাদা ঘর করবে। এর মধ্যেই গ্যারাজ তৈরি হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে শোভনাদের তুলনাই হয় না। শোভনারা স্বরূপবিত্ত।

আচ্ছা, তাহলে এবার যাওয়া যাক?

হ্যাঁ, চলুন। ওই যা—শোভনা থমকিয়ে দাঁড়াল। বিমর্ষ মুখে বলল, কেরোসিনের বোতলটা আনতে ভুলে গেছি। আপনাদের ওই টিন দেখে মনে প'ড়ে গেল! যাঃ—

এই যে? কবে এলেন বিনয়বাবু?

ব্যস্ত হবেন না। বিনয় বলল, আপনি একা কতই বা সামলাবেন! তা ছাড়া স্বামী আপনার অসুস্থ,—ছেলেটিরও স্বাস্থ্য ভাল নয়! ভুল অমন হয়েই থাকে। ওরে গোবিন্দ, তুই বাড়ি গিয়ে ও'র হ্যারিকেনগুলোয় তেল ভ'রে দিয়ে আসবি,—গিয়েই দিবি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কিচ্ছু আমায় বলতে হবে না—গোবিন্দ জবাব দিল।

চলতে চলতে শোভনা বলল, কিন্তু ওতে আমার হিসেব থাকবে না, বিনয়বাবু। তার চেয়ে বোতলটাই ভ'রে দিয়ে আসবে!

ওঃ—বিনয় পথের মাঝখানে হেসে উঠল,—আপনি বুঝি ফেরৎ দেবার কথা ভাবছেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। শোভনা বলল, নৈলে উনি যে রাগ করবেন!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছিল। একই পথ দিয়ে তিনজনে হাঁটতে গেলে পৃথকভাবে আগে-পিছে যাওয়াটা একটু দৃষ্টিকটু। সুতরাং শোভনাকে সঙ্গে সঙ্গেই চলতে হ'ল। কিন্তু একসময়ে বিনয় নিজের মনেই আবার হাসল! বলল, কেরোসিন না হয় ফেরৎ দিলেন, কিন্তু তাহলে আমাকে গিয়ে আপনাদের ঘরদোরও যে গুছিয়ে দিয়ে আসতে হয়?

শোভনা বাঁকা চোখে তাকাল। বলল, এবার আপনার উদ্দেশ্য বুঝলুম। আপনার ঘরদোরের একটু কাজ ক'রে দিয়েছি, তাই আমার বকশিস,—ওই কেরোসিন! বেশ, ওই বকশিসই আমাকে দেবেন, নিজের মাথায় ঢেলে দেশলাই জেলে দেবো!

দুজনের হাসিতে পথ মুখরিত হল। কি ভাগ্যি, গোবিন্দ শোনেনি কথাগুলো। সে আসছিল পিছনে পিছনে।

কারখানার পাঁচিলের পাশ দিয়ে সেই জনবিরল পথ ধ'রে ওরা ফিরছিল। পথে আলো নেই, কিন্তু শুক্লপক্ষের ছমছমে ছায়ালোকে খুব অসুবিধাও ছিল না। উভয়ের মধ্যে একটি আড়ষ্টতা আছে বৈকি। বিনয়ের পারিবারিক পরিচয় কিছুই শোভনার জানা নেই, এবং জানবার কারণও কিছু ঘটেনি। উভয়ের নতুন বাড়ির মাঝখানে হয়ত আন্দাজ পঁচিশ গজের ব্যবধান মাত্র। যাতায়াতের কালে শোভনা ওদের রাজমিস্তিরিদের কাজ দেখে যায় মাত্র। একদিন দুপুরের দিকে গোবিন্দ এসে একখানা চিঠি পড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেইদিন শোভনা প্রথম জানল, বিনয়রা এলাহাবাদের লোক। এ বাড়ি তৈরি হচ্ছে ঠিকাদারের হাতে। গোবিন্দ এখানে পাহারায় থাকে। তবে মাঝখানে আসবাবপত্র যেদিন এসে পৌঁছল,

সেদিন ওই গোবিন্দই এসে শোভনার সাহায্য চেয়েছিল। এর বেশি কিছু নয়। বিনয়ের সঙ্গে এই নিয়ে বোধ হয় শোভনার দিন তিনেকের দেখা-সাক্ষাৎ। সে কবে আসে, কতদিন থাকে, কবেই বা চলে যায়—এটির সম্বন্ধে শোভনা কৌতূহলও প্রকাশ করেনি। তার বিশ্বাস, রামাচরণ এসব পছন্দ করবে না।

ষ্টেশনের দিকে যাবার সময় এক মাইল পথ ছিল দীর্ঘ। কিন্তু ফিরবার সময় সে-পথ ফুরিয়ে গেল যেন কখন। একসময় বিনয় বলল, আপনি বাড়ি যান, গোবিন্দকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আচ্ছা— শোভনা গোবিন্দর হাত থেকে ঝোলাটা নিয়ে হনহনিয়ে বাড়ির দিকে গেল।

বাড়িতে এখনও চৌহদ্দির পাঁচিল হয়নি, সুতরাং বাইরের দিকে দরজার কথাই ওঠে না। শোভনা সোজা সেই ঘোলাটে জ্যোৎস্নার আলোয় পথ চিনে নিয়ে উঠে এলো বারান্দায়। তারপর কড়া নাড়ল।

ভিতর থেকে রামাপদ সাড়া দিল, কে?

আমি। দোরটা খোল।

বোধহয় রামাপদ খুব ভাল ক'রে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর বুঝতে পারেনি, সুতরাং আরেকবার সাড়া দিল, কে তুমি?

বিরক্ত হয়ে শোভনা জবাব দিল, আঃ শুনতে পাও না বুঝি? বলছি যে আমি? তোমার বিয়ে-করা বৌ!

দরজাটা তৎক্ষণাৎ খুলল। বুঝতে পারা গেল ভিতর থেকে রামাপদ কান পেতে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর নির্ভুলভাবে শুনে তবে দরজাটা বিশ্বাস ক'রে খুলেছে। প্রথমেই সে বলল, এত দেরি যে?

এ কি, এখনও আলোটাও জ্বালতে পারনি? সব যে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার!

আলো জ্বালব?—রামাপদ বলল, কার এমন বুকের পাটা যে, বারান্দায় বেরিয়ে দেশলাই খুঁজবে? এই এতবড় শেয়াল এসে দাঁড়িয়েছিল ওই উঠোনে! ওদিকে অন্ধকার, এ ঘরে ছেলেটা কাঁদছে, ওখানে শেয়াল দাঁড়িয়ে! আমি কি জানতুম এত দেরি হবে তোমার? তুমি যাবার আগে আলোটা জেবলে রেখে যে ত পারলে না?

তর্ক বাড়াতে শোভনার রুচি ছিল না। সে যখন গেছে তখনও রৌদ্রের আভা ছিল। দেশলাই সে সামনেই রেখে গেছে উনুনের পাশে। হাতের কাছে হারিকেন। থাকগে। শোভনা চক্ষের পলকে দুটো আলোই জ্বালল এবং হারিকেনের তলানি থেকে একটু কেরোসিন দুখানা ঘুঁটের ওপর ঢেলে নিয়ে উনুন ধরাতে বসল। না, এ ঘর, এ সংসার, এ কচকাঁচ তার একটুও ভাল লাগছে না। সে অন্য কিছু চেয়েছিল।

এমন সময় বাইরে গলার সাড়া পেয়ে শোভনা বলল, এসো গোবিন্দ। বোতলটা দিচ্ছি, তুমি ভাই এটা ভরে দিয়ে যাও।

আমি বিনয় গোবিন্দ নয়!

শোভনা উঠে এসে বলল, ও আপনি? আপনি কেন এলেন কষ্ট ক'রে? আসুন, আসুন—ওই যে উনি। হ্যাঁগো, তুমি এঁকে চিনলে? ইনিই বিনয়বাবু। ওই সামনের বাড়িটা এঁরই। সেই যে এঁর কথা তোমায় সেদিন বলেছিলুম?

রামাপদ নমস্কার বিনিময় করে বলল, আসুন, আসুন, কিন্তু—কোথায় যে বসাই! আহা হা, মাটিতে বসলেন যে? না না, সে হবে না, ঘরে উঠে আসুন—

হাসিমুখে বিনয় বলল, তা হোক, এই বেশ বসেছি। ভারি খুশী হলুম আপনাকে দেখে রামাপদবাবু। কাল রবিবার,—কাল সকালে চায়ের আসরে বসা যাক্। তারপর দুপুরে আমার ওখানে আপনাদের নেমন্তন্ন।

রামাপদ বলল, বেশ ত, এ আনন্দের কথা। তবে আমি নতুন একটা মাদুলি ধারণ করেছি কিনা—

মাদুলি!—বিনয় স্পষ্ট ক'রে তাকাল।

আজ্ঞে হ্যাঁ, মাদুলি। এই মাদুলির জোরেই ত' সন্ধ্যেবেলা আজ বেঁচে গেলুম, বিনয়বাবু!

বিনয় সকৌতুকে তাকাল। ততক্ষণে ঘর থেকে একখানা আসন এনে শোভনা বলল, বিনয়বাবু, আসন নিয়ে বসুন, এক্ষুনি চা দিচ্ছি। হ্যাঁ গো, শোনো, উনি কিন্তু ডাক্তার, জান ত? তোমার মাদুলির কথা একটু ভেবে-চিন্তে বলো!

বলো কি তুমি? বাঘা শিয়াল এসে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সামনে?—রামাপদ বলল, স্রেফ মাদুলির জন্যে বাপ-বেটার ফাঁড়া কেটে গেল! তবে সবদিক রক্ষে হতে পারল কোথায়? তেশূন্যের হাওয়া লেগে গেল ছেলেটার গায়ে! ওই দেখুন, কেঁদে-কেঁদে একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিনয় একবার তাকাল শোভনার দিকে। সেই চাহনি অথবা দৃষ্টিবিনিময়ের মধ্যে সুস্পষ্ট বক্তব্য কিছু নেই, কিন্তু সেই দৃষ্টির সঙ্গে মন যেন অনেক কিছু উপলব্ধি ক'রে নেয়।

শোভনা বলল, বিনয়বাবু, মাদুলিতে যাদের একান্ত বিশ্বাস, তাদের কিন্তু উপকারও হয়। মাদুলির মনোভাব নিয়ে জন্মালে তবেই মাদুলি কাজে লাগে। উনি গোটা দশেক জোড়া মাদুলি ধারণ ক'রে আছেন। কিন্তু ওঁর বিশ্বাস, উনি ঠকেননি!

হাসিমুখে বিনয় বলল, আপনি ঠকেছেন?

আমি?—সেই হারিকেনের আলোর দিকে তাকিয়ে শোভনা খিলখিল করে হেসে উঠল, —উনিই আমার মাদুলি! আট বছর হ'ল ওই মাদুলিটি ধারণ করেছি। ঠকলুম কি জিতলুম আজও বুঝিনি!

উচ্চকণ্ঠে বিনয় হেসে উঠল। শোভনা বলল, বসুন, চায়ের জল ফুটেছে।—এই বলে সে উনুনের দিকে গেল। তার হাতে-পায়ে যেন উৎসাহের জোয়ার এসেছে।

রামাপদ বলল, আপনার কি মনে হয়, এদিককার উন্নতি কি শিগগির হবে? ইলেকট্রিক কবে আসবে বলুন ত?

লেখালেখি ত' চলছে! মাপজোপও চলছে অনেকদিন।

আমরা মশাই বৌবাজারের লোক। কাঁচা নর্দমা, ঘাসের উঠোন, পচা পুকুর, ডুমুর গাছ,—এসব কখনো দেখিনি! ছোটবেলায় চিড়িয়াখানায় শেয়াল দেখে ছিলুম, আর এই দেখলুম আজকে। বন-বাঁদাড়, ধানক্ষেত, লাউমাচা,—এসব চোখেও পড়েনি কোনদিন! সত্যি বলতে কি, কলকাতার কাছাকাছি যে এসব জায়গা আছে, এর খবরই রাখিনি কোনদিন। উনি ওঁর এক মামাকে ধ'রে এই জায়গাটুকু কিনেছিলেন বছর দুই আগে। বাড়িও করলেন নিজে কোমর বেঁধে। আমরা মশাই কলকাতার মাঝখানে মানুষ!

সেখানেই কি আপনাদের নিজের বাড়ি?

হ্যাঁ, মশাই। সাতপুরুষের বাস!—রামাপদ বলল, আমাদেরই বাপ-পিতামোর সামনে কলিকাতার পত্তন! ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট যদি না ভেঙ্গে দিত বাড়িখানা, তা হলে আরও তিনপুরুষ ওই বৌবাজারেই কাটত! মুস্কিল কি হ'ল জানেন, আমার ঠাকুরদাদার তিন বিয়ে, আমার বাবার দুই! ঠাকুরদাদারা ছিলেন আট ভাই, কিন্তু তাঁর তিন ঘর মিলিয়ে তেরোটি ছেলেমেয়ে। আবার আমার বাবার শুধু ছেলেই হল নয়টি! সব মিলিয়ে জ্ঞাতগোষ্ঠির সংসার।

ওধার থেকে সহাস্যে শোভনা বলল, আইনকানুনের কড়াকড়ি না থাকলে উনিও আরও দুএকটি সংসার করতেন, বিনয়বাবু!

রামাপদ বলল, ওই শুনুন। এঁরা নাকি এদেশেরই মেয়ে, এই জলহাওয়াতেই মানুষ! কিন্তু কেমন ক'রে যে এঁরা নাস্তিক হলেন, কিছুতেই জানা গেল না! আরে, সংসার কি আমি করতুম নিজের গরজে? কুলীন হবার কত জ্বালা তা কি জানে কেউ?

বিনয় অবাক হয়ে আগাগোড়া শুনছিল। এমন সময় একটি থালার উপরে সাজিয়ে শোভনা নিয়ে এল দুই পেয়ালা চা আর কয়েকখানি বিস্কুট। থালাটি ওঁদের সামনে রেখে সে আবার চট ক'রে গিয়ে তার কেরোসিনের বোতলটি এনে বিনয়ের টিন থেকে ঠুলির সাহায্যে তেল ঢেলে নিল। রামাপদ বলল, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলুম না। উনি টিন আনলেন, তুমি তেল ঢেলে নিলে,—এ কেমন হল?

শোভনা বলল, ওঁর সঙ্গে ষ্টেশনের বাজারে আমার দেখা। উনি তেল কিনলেন দেখে আমার মনে পড়ে গেল, বোতল সঙ্গে নিইনি। আজ কিন্তু আপনাকে পয়সা দিচ্ছিনে, বিনয়বাবু। ওটা গোবিন্দের হাতে দিয়ে দেবো।

সহাস্যে বিনয় বলল, এত বড় দেনা রেখে রাত্রে ঘুম হবে আপনার?

হাসল শোভনা,—দেনাশোধ করেও যদি ঘুম না হয়, বিনয়বাবু?

রামাপদ এবং বিনয়ের চা-বিস্কুট খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বিনয় মুখ থেকে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলল, তা হলে বুঝব আপনার গায়েও তেশূন্যের হাওয়া লেগেছে,—মাদুলি আপনারও দরকার!

ওরা দুজনেই যখন হাসল, রামাপদর পক্ষে চুপ ক'রে থাকা চলে না। সুতরাং সেও হাসল। বিনয় এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি যাই। আপনাদের কত বিরক্ত ক'রে গেলুম। গোবিন্দ বেচারি একা পারে না, ওকে একটু যুগিয়ে দিতে হয়। আচ্ছা, নমস্কার—

শোভনা বলল, আমি কিন্তু আপনার মিস্তিরিদের দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেবো, বিনয়বাবু।

বেশ ত, আপনার যখন ইচ্ছে—

শোভনা আলোটা নিয়ে বিনয়ের পিছু পিছু গেল। বিনয় পিছনে তাকাল না একবারও,—বোধ হয় ভালই করল। শোভনা চুপ

ক'রে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল, বিনয় গিয়ে ঢুকল তার বাড়ির দরজায়।

সে-রাত্রে অহেতুক কান্না কেঁদেছিল শোভনা বামাপদকে লুকিয়ে।

(দুই)

ছেলেটা সকাল থেকেই কান্না নিয়েছিল। কেন জানিনে, যতদিন থেকে এ বাড়িতে তারা এসেছে, ছেলেটা ততদিন ধরে কাঁদছে। ঘ্যানঘেনে তার কান্না অসহ্য হয়ে উঠেছে। যে কোনও একটা বায়না সে ধরেই আছে! এক এক সময় বিশ্বের সমস্ত ঘৃণা ও অসন্তোষ যেন শোভনাকে পেয়ে বসে।

ভাত নামিয়ে শোভনা উনুনে ডাল চাড়িয়েছিল। একে একে নুন, তেজপাতা ও হলুদ এলুমিনিয়মের হাঁড়িতে ফেলে দিয়ে সে চায়ের বাসনগুলো ধুয়ে গুছিয়ে রাখল। তারপর ভিজা কাপড়খানা রৌদ্রে মেলে দিতে-দিতে সে বলল, কেঁদো না আদু, লক্ষ্মী-সোনা,—বিস্কুট আরেকখানা নেবে? বিস্কুট? আচ্ছা, আচ্ছা—একটুখানি আমসত্ত্ব দিচ্ছি—কেমন? কেঁদো না সোনা, লক্ষ্মীটি—

শোভনা ওকে ভুলিয়ে রাখতে গেলে ও যেন আরও রেগে হাত-পা ছোড়ে। আমসত্ত্ব এনে দিতেই আদু সেটা ছুড়ে উঠোনে ফেলে দিল। বিস্কুট এনে দিল শোভনা, আদু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। আরেক বাটি দুধ এনে ধরল, আদু তাই দেখে চেঁচিয়ে উঠল আরও জোরে। অবশেষে যখন শোভনা তাকে একপ্রকার জোর ক'রে কোলে নিয়ে ভোলাতে চাইল, তখন সে হাত-পা ছুড়ে চেঁচাতে লাগল, আমি থাকব না তোমার কাছে—

কেন থাকবে না সোনামণি, আমি যে তোমার মা?

আমি বাবার কাছে যাব—! আদু এত ছটফট করতে লাগল যে, শোভনা তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে বাধ্য হল।

হাতের কাজ পড়ে রয়েছে অনেক। একটু সরষে বাটা, আদা ছেঁচে নেওয়া, বামাপদর জুতো ঝেড়ে রাখা, ডাল নামিয়ে শুক্তো চাপানো, ঘরদোরের কাজ,—সব বাকি। শোভনা সর্বাগ্রে গিয়ে বামাপদর স্নানের জল ধরল টিউবওয়েল থেকে। তেল-সাবান-মাজন সব রাখল হাতের কাছে। বালতির জলে গামছা চাপা দিল—কাকে না মুখ দেয়। তারই মধ্যে খপ ক'রে সে ধুয়ে নিল থালা-গেলাস। তারপর ছুটে এসে ব'সে গেল ডাল সাঁতলাতে।

হাঁড়িটা নামাতে না নামাতেই এসে পৌঁছল বামাপদ বাজারের থলি হাতে নিয়ে। কপালে তার ঘাম, অতএব মুখখানা গম্ভীর। থলিটা একপ্রকার ছুড়ে দিয়ে সে বারান্দায় বসে পড়ল। শোভনা হাতপাখা এনে বাতাস দিতে লাগল। উঁচু দিকে চোখ তুলে বামাপদ বলল, যেতে-আসতে দু'মাইল, তা জান?

হাসিমুখে শোভনা বলল, কষ্ট একটু হবেই ত!

একটু? এরপর আবার ওই এক মাইল ভেঙে ষ্টেশনে যাওয়া! ফেরার পথে আবার এক মাইল! একখানা সাইকেল-রিক্স নেই কোথাও! তুমি বলছ কষ্ট! বেঘোরে-খোওয়ারে জীবনটা যাবে, দেখে নিও।

আদু এসে বামাপদর গলা জড়াল। আবদার ধ'রে বলল, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে আপিস যাবো—বাবা—

পৌনে আটটা বাজে। সাড়ে নটার ট্রেনে বামাপদ আপিস যায়। হাতপাখা রেখে শোভনা গিয়ে ডাল সাঁতলালো, তারপর উনুনে চারটি কয়লা দিয়ে বসে গেল পার্সে মাছ কুটতে। ওই সঙ্গে ভাজাভুজি আর ঝোলের আনাজপত্র। রান্না মোটামুটি। বামাপদর নতুন মাদুলির পক্ষে শাক-অম্বল খাওয়া নিষেধ। বলা বাহুল্য, স্বামীর পক্ষে যেটি মানা, শোভনার নিজের পক্ষেও সেটি নিষিদ্ধ। দই এবাড়িতে ঢোকে না। মাংস, পেঁয়াজ, ইলিশ—ছুঁতে নেই!

বিনয়বাবুর কল্যাণে, রাজমিস্তিরিদের কাজ চলছিল বাড়িতে। তারা একে একে এসে পাঁচিল বানানোর আয়োজন করতে লাগল। আজ খিড়কি দরজার দিকটা গাঁথবে। আরেকখানা ঘর ঢালাই হবে দিন আষ্টেকের মধ্যে। শোভনা সেইদিকে একবার তাকিয়ে আগে মাছ ভাজতে ব'সে গেল।

ছেলেটা আবার আবদার ধরল। মাছ ভেজে ঝোল চড়িয়ে শোভনা বলল, তোমার সঙ্গে আদুকেও খেতে দেবো, বুঝেছ? ওকে দুটি খাইয়ে শান্ত ক'রে তুমি আপিস যেয়ো। আমার কথা কিছুতে শোনে না।

বটে?—বামাপদ বলল, তার চেয়ে তুমিই আপিস যাওনা কেন? আমি ওকে নিয়ে থাকি সারাদিন!

এক ঝলক হাসল শোভনা। বলল, তা হয়ত করব একদিন। রোজগার করা ত' ভালই। সেদিন থেকে আর ভাবব না কিছু।

আমি জানতুম, বেশ জানতুম আস্তে আস্তে এইসব লক্ষণ তোমার দেখা দেবে! মনে মনে তুমি কী চাও, একি আমার জানতে বাকি আছে?

মাছের ঝোলে মশলা দিয়ে এবার শোভনা খুব হেসে উঠল। বলল, আচ্ছা, বলো ত' মনে-মনে আমি ঠিক কি চাই?

বামাপদ বিরক্তভাবে চুপ ক'রে রইল। শোভনা বলল, একটু ভয়ে ভয়েই বলি, আজ আপিস থেকে ফিরে রাজমিস্তিরিদের হিসেবটা নিয়ে তুমি একবারটি বসবে, লক্ষ্মীটি!

আমি? তবেই তোমার বাড়ি হয়েছে!—বামাপদ বলল, এবার ডেকে পাঠাও না কেন তোমার সেই মামাকে—যাঁকে ধরে এই জমি কিনেছিলে? হিসেব-টিসেব আমি পারব না, বাপু। তিনপুরুষে আমি মিস্তিরি খাটাইনি। তোমার বাড়ি তুমি বোঝগে।

শোভনা এবার একটু বিমর্ষ হল। বলল, আমি সবই পারি। তবে ছেলেটা কাঁদে, বায়না নেয়,—তাই বলছিলুম—!

বামাপদ বলল, তবু মেয়েটাকে ফেলে রেখেছ মামার বাড়িতে—তাতেই এই! এরপর আর দু'চারটি যখন হবে, তখন আমাকে চাকর বানাবে বল?

কী বললে?—খুন্তি থামিয়ে শোভনা মুখ ফিরিয়ে বামাপদর দিকে তাকাল। পোড়া কয়লার একটা স্ফুলিঙ্গ তার চোখে ফুটল।


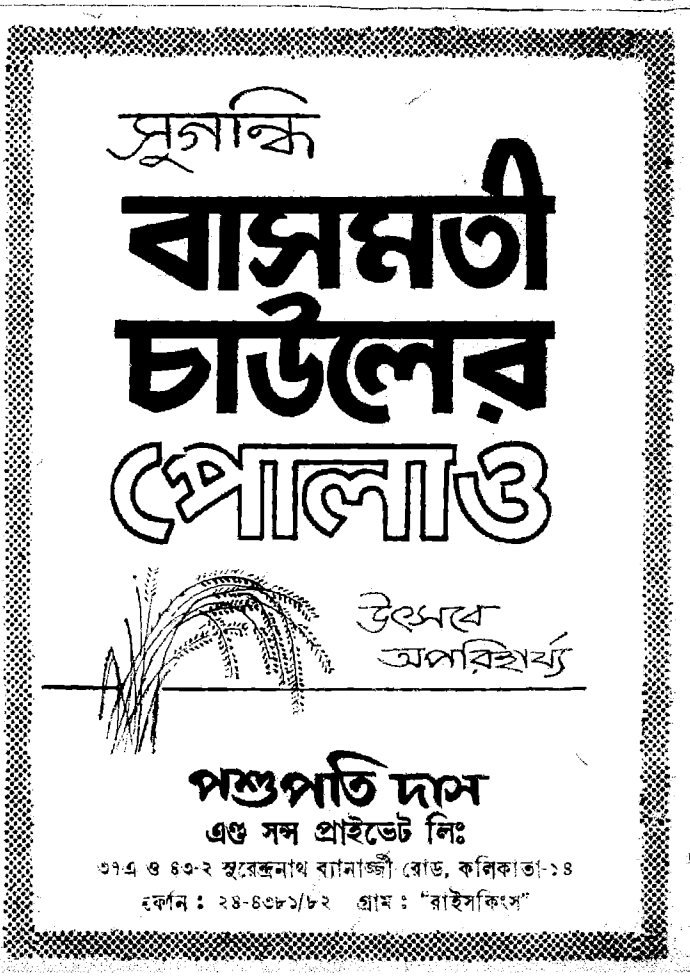

আমি জানতুম, ঠিক জানতুম—তুমি আমাদের বংশের বাড়-বাড়ন্ত চাও না—রাগে গরগর ক'রে বামাপদ উঠে গেল স্নান করতে। এমন সময়ে গোবিন্দ এসে উঠোনে দাঁড়াল দুটো ডাব হাতে নিয়ে। বলল, দিদিমণি, ডুটোর দাম নিল আট আনা। এই নিন্ বাকি আধুলিটা। যখন যা দরকার আমাকে বলবেন, এনে দেবো।

ডাক্তারবাবুর চিঠি পেয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি শিগগিরই আবার আসছেন। আমি যাই দিদিমণি—

এসো।—বলল শোভনা উঠে এসে ডাব এবং আধুলিটি তুলে নিল। তারপর ঘরে এসে মেঝেটা পরিষ্কার করে স্বামীর জন্য আসন পেতে ঠাঁই করে দিল। বামাপদ তখন তেলমাখা শেষ ক'রে মাথায় জল ঢালছে। টাইম-পিস ঘড়িতে আটটা পঁচিশ। বাস্তবিক, একটা মানুষের পক্ষে অতদূর থেকে বাজার-হাট সেরে আবার ওই অতদূর গিয়ে ট্রেন ধরা একটু গায়ে লাগে বৈকি। টাট্‌কা মাছের জন্যই যেটুকু অসুবিধা, নচেৎ আনাজ-তরকারি আগেভাগে এনে রাখা যেতো। একজন রাতদিনের ঝি কিংবা চাকর না রাখলেই চলবে না। খাওয়া-পরা-মাইনে যা হোক ক'রে দেওয়া যায়, কিন্তু শুতে দেবার জায়গা কই?

বামাপদ মাথায় চিরুনি বুলিয়ে এসে ছেলেটাকে নিয়ে খেতে বসল। কিন্তু আদু খাবে না, সে বাবার সঙ্গে আপিস যাবে! কাঁদতে গিয়ে হঠাৎ মেঝের উপর সে গেলাসের জল উল্‌টিয়ে দিল। বামাপদর পাত থেকে আলুভাতে আর পটল ভাজা নিয়ে সে ছত্রখান করল! স্নেহান্ধ পিতা এই দুরন্তপনা গ্রাহ্য না ক'রে ছেলেকে আদর ক'রে বারম্বার খাওয়াবার চেষ্টা পাচ্ছিল। পরে বলল, আর কিছু নয়, দেখতে পাচ্ছি ওর পেটের গোলমাল বলেই মেজাজ তিরিক্ষে। রোজ একটা ক'রে ডাব খাওয়ালে পেটটা সারবে।

শান্ত কঠিন কণ্ঠে শোভনা বলল, পেটের গোলযোগ ওর নেই। আর ওই সঙ্গে যেটা নেই, সেটা হল শাসন!

শাসন?—বামাপদ মুখ তুলল,—চার বছরের ছেলেকে? সেবার যে পেঁচোয় পেয়েছিল,—ঝাড়ফুঁক ক'রে সারালুম না? শাসন অমনি করলেই হ'ল? আমাকে দশ বছর বয়স অবধি পেঁচোয় পেয়েছিল, তা জান?

মাছের ঝোলের বাটি আনবার জন্য শোভনা উঠে যাবার আগে বলল, পেঁচোয় তোমাদের দু'জনকে বোধ হয় এখনো পেয়ে রয়েছে!

কি জানি, হতেও পারে! তার ওপর তুমি আবার করতে গেলে বাড়ির ওপরে উঠোন। আমি তখনই বলেছিলুম, খোলা জায়গা ছোট ছেলের পক্ষে ভয়ানক খারাপ। আমাদের বৌবাজারের বাড়ি ছিল নিরেট বাক্সর মতন,—কোনও ভয় ছিল না। শুধু সন্ধ্যেবেলায় ছাদে উঠলে মাঝে মাঝে তেঁতুলের হাওয়া লেগে যেতো।

শোভনা চুপ ক'রে রইল। এসব কথায় অনুপ্রাণিত হওয়া দূরে থাক্, ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় তার মন ভ'রে উঠল।

প্রত্যেকদিন আপিস যাবার সময় যে সমস্যাটি দেখা দেয় আজও তার ব্যতিক্রম হল না। আহারাদি সেরে জামাকাপড় পরে যতই বামাপদ বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, ঠিক তত পরিমাণেই আদুর কান্না ও চিৎকার বাড়ছিল। এ ছেলে বৌবাজারের সেই পুরনো বংশের, এর রক্তের ধারার মধ্যে রয়ে গেছে সেই সেকালের পেঁচো,—রাশি রাশি মাদুলি ছাড়া যাকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন। এ ছেলে বাইরেটা দেখতে চায় না, গাছপালা, ঝোপঝাড় আলো-হাওয়া—এসব দেখলে ভয় পায়। কঠিন আক্রোশে দপদপ করছিল শোভনার দুই চোখ—পিতা ও পুত্র দুজনেরই প্রতি।

আদু ককিয়ে ডুকরে চেঁচিয়ে ছটফট করে বাপের জামাটা ধ'রে যখন ঝুলোঝুলি করতে লাগল, শোভনা তাকে টেনে না নিয়ে আর পারল না। বামাপদ রাগারাগি করে বলল, এই জন্যে বরাবর তোমাকে বলে এসেছি, দেখো, নতুন বাড়ি বা নতুন জায়গা আমাদের পক্ষে সইবে না। আমি কি জানিনে, আদু কাঁদছে কেন অমন ক'রে? ওর একেবারেই ভাল লাগছে না এখানে। ও ভয় পাচ্ছে এই খোলা-মেলা জায়গায়। ওর জন্ম ইলেকট্রিক আলোয়, কেরোসিন ও জানে না। ও কাঁদছে ওর সেই সংঠাকুমা আর বিন্দিপিসির জন্যে। যারা ওকে নিয়ে থাকত।

শোভনা বলল, আমি কি ওর কেউ না?

না, কেউ না! আমাদের পুরনো বংশে মায়ের দাম নেই!—বামাপদ বলল, মায়ের কোল আমরা চিনলুম কবে? আমাদের কালে মা মানে ত' রান্নাঘরের ঝি! আদু কি মানুষ হয়েছে তোমার কাছে? ও চেনে ওর সেই বুড়িঠাকরুণকে, সেই মিলিমাসি আর রাঙ্গাজেঠির কোল— তোমাকে ও কেন চিনবে বল?

কাপড়ের কোঁচটা ঝলিয়ে বামাপদ ডার্বি জুতোর ফিতেটা বেঁধে নিল। ধুতির সঙ্গে ওই জুতো যে আজকাল কেউ পরে না, এটি আজও বামাপদর কানে ওঠেনি। গলাবন্ধ ছিটের কোটের ওপর শাদা উড়ুনিখানা পাকিয়ে নিল, কেননা এই ছাঁদের পোশাকটি তার পৈতৃক।

পথে বেরোবার আগে কচকচি করতে নেই! শোভনা যেমন করেই হোক, আদুকে থামাবার চেষ্টা পাচ্ছিল। বামাপদ বলল, আমি সেই-জন্যেই বলছিলুম ছেলেকে যদি সুস্থ করে তুলতে চাও, তবে এখনও সময় আছে! এ বাড়ি ভাড়া দাও, এসব উঞ্ছ জায়গা ত্যাগ কর। এর চেয়ে চলো মুচিপাড়ার কোথাও দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে উঠে যাই। রাঙ্গা-জেঠিকে এনে রাখব, আদুর জন্যে আর কিছু ভাবতেই হবে না!

শোভনা আর থাকতে পারল না। বলল, তুমি কি বলতে চাও, আবার আমি সেই কেউটে-গোখরোর গর্তে গিয়ে ঢুকব?

কিন্তু ছেলেটার জীবন? আমার কল্যাণ?

শোভনা কঠোর দৃষ্টিতে আদুর দিকে চেয়ে রইল, জবাব দিল না।

বামাপদ বারান্দা থেকে নামল। তারপর বলল, হুঁ, এ আমি জানতুম! আমি তখনই বলেছিলুম, গঙ্গাঠাকুমাকে, মালদা জেলার মেয়ে আনছ ঘরে, কিন্তু সাবধান! আজ তারই ফল ফলতে বসেছে!

বামাপদ হনহন ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণ ধ'রে মেঝের উপর গড়াগড়ি দিয়ে আদু ফুঁপিয়ে ডুকরিয়ে কাঁদছিল, এবার উঠে ছুটল বাপের পিছনে পিছনে। শোভনা তাকে ধরল না,—দেখাই যাক না কী হয়! সে ঘরের জানলা দিয়ে ছেলেটার দিকে চেয়ে রইল। এক সময় দেখল, রাজমিস্তিরি-দের জনৈক সহকারী ছুটতে ছুটতে গিয়ে অনেক দূর থেকে ছেলেটাকে তুলে আনল।

রান্নাবান্নার কিছু এখনও বাকি। বাসন মাজা ধোওয়া-পাকলা আছে। সাবান কাচা একটিও হয়নি। ঘরের কাজ ফেলে রাখলে কে করবে? ছেলেটাকে স্নান করানো খাওয়ানো মস্ত সমস্যা। রাজমিস্তিরির কাজ দেখা দরকার। জল টানতে হবে টিউবওয়েল থেকে। শেলাইতে হাত না দিলে আর চলছে না। অনেক কাজ শোভনার।

ছেলেটা ঠিক তেমনি ক'রে বারান্দায় প'ড়ে প'ড়ে কাঁদছিল। শোভনা বলল, লক্ষ্মী সোনা কেঁদো না। আচ্ছা দাঁড়া, এবার ডাব কেটে দিচ্ছি, কেমন? ডাব খাবে, দুদু খাবে, ভাতু খাবে—কেমন?

কাটারিখানা নিয়ে এসে শোভনা ডাব কাটতে বসতেই আদু যেন আরও ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচাল। বুঝতে পারা যাচ্ছে, জননীর স্নেহ, সমাদর, যত্ন, সেবা—কোনটাই তার প্রিয় নয়। জননী তার কাছে ঘৃণ্য!

কেন, বেশ ত' মিষ্টি ডাব? একটু খেয়ে নাও, লক্ষ্মী ছেলে?

চিৎকার করল আদু,—না, না, খাবো না—ফেলে দেবো। কেন বাবার সঙ্গে যেতে দিলে না—খাবো না—

হাসছিল শোভনা। অন্যমনস্কে ডাবটা সে কাটছিল এতক্ষণ। এবার দেখল কাটারিখানা নতুন, বেশ ধারালো! আস্তে আস্তে সে ডাব কাটছে, ঈষৎ আত্মবিস্মৃত, কিন্তু লক্ষ্য করছিল সে আদুকে। কাটারিখানার বাঁটটা বেশ মজবুত, ফলাটা ঝকঝক করছিল! শোভনা হাসছিল অন্যমনস্ক আদুর দিকে চেয়ে। জননীর প্রতি বিজাতীয় একটা ক্রুর ঘৃণা আদুর চোখে দেখা যাচ্ছিল। শোভনা কাটারিখানা হাতে নিয়ে ফালফ্যাল ক'রে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। ডাব কাটতে সে ভুলে যাচ্ছিল। কেন ডাব কাটছিল তার মনে নেই। না, কেউ নেই এদিকে, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না,—সে পরীক্ষা করছিল কাটারির শাণিত ফলাটা! কী যেন সে ভাবছিল এতক্ষণ! না, কেউ কোথাও থেকে তাকে এখনও সন্দেহ করেনি; এতক্ষণ কী যেন তাকে পেয়ে বসেছিল!

হঠাৎ চোখ পড়ল আদুর দিকে। আদু আর কাঁদছে না, একটুও নড়ছে না! সহসা থেমে গেছে তার কান্না! স্তব্ধ আতঙ্কিত চক্ষে সে শোভনাকে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল।

কাটারিখানা সরিয়ে রেখে শোভনা তাড়া-তাড়ি উঠে ঘরে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল এবং অপরিসীম ক্লান্তিতে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজলো!

# দুই লেখকের স্ত্রী

**ভবানী মুখোপাধ্যায়**

পঞ্চাশ বছর বয়স থেকেই টলস্টয়ের পারিবারিক জীবনে চিড় খেয়েছিল। টলস্টয় ধীরে ধীরে সংসার থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। যে-টলস্টয়ের স্ত্রী সাতবার War and Peace কপি করেছেন, তিনিই শেষে বলতে বাধ্য হলেন—"তেরটা ছেলেমেয়ে নিয়ে ধর্মনিষ্ঠ স্বামীর বুজরুকি আর আমার সয় না।"

টলস্টয় বলেছেন—'যাকে ভালোবাসা যায় তাকেই বিয়ে করাটা ঠিক নয়।'

সম্ভবতঃ গৃহী টলস্টয় এবং ঋষি টলস্টয় এই দ্বৈতসত্তার সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে চলা কাউন্টেস সোফিয়া টলস্টয়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

গৃহত্যাগের পূর্বমুহূর্তে টলস্টয় লিখেছেন—

"আমার সঙ্গে আটচল্লিশ বছর সংসার করেছ। তোমার নিষ্কলঙ্ক জীবনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমার ওপর যা অন্যায় করেছি, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, আর তোমার সকল ত্রুটিও আমি ক্ষমা করলাম।"

স্বামীর গৃহত্যাগের সংবাদ পেয়ে সোফিয়া উন্মাদিনীর মত জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

Married to Tolstoy গ্রন্থে লেডী সিনথিয়া এ্যাসকুইথ বলেছেন—

"She was a great woman in her own right and that was one cause of the trouble. An adoring, completely compliant nonentity, might have lived in peace with Tolstoy."

সোফিয়া বৃদ্ধ টলস্টয়ের শরীরের তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর মাঝে মাঝে স্মৃতি-ভ্রংশ হত. টলস্টয়-জায়া সাহায্য করতেন স্বামীকে। লেভ টলস্টয় আর স্ত্রীর সম্পর্ক যেভাবে আলোচিত হয়েছে এত বেশী আলোচনা আর কোনো লেখকের দাম্পত্য-জীবন নিয়ে হয়েছে বলে মনে হয় না।

টলস্টয়ের স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রীকে কেউ কেউ SHREW বা ব্যাপিকা পর্যন্ত বলেছেন। এমন কি টলস্টয়ের নাকি স্ত্রীর উৎপীড়নেই মাথা খারাপ হয়ে গিছল একথাও অনেকে বলেছেন।

বার্নাড শ এক জায়গায় বলেছেন :

"He would not own property or copyrights; but he could make them to his wife and children and live in their country house at Yasnaya Polyana, and their house at Moscow very comfortably, only occasionally easing his conscience by making things as difficult as possible."

বার্নাড শ'র এই উক্তিটিও অনুদার। সোফিয়া মনে করতেন যে, তাঁর স্বামী যে ভাবাদর্শ প্রচারে ব্রতী দেশ এখনও তার জন্য প্রস্তুত হয়নি। আর সেই ভাবধারা তাঁর স্ত্রী-পুত্রের প্রতি প্রয়োগ করাটা অনুচিত। স্বামীর আন্তরিকতায় কোনো-দিন স্ত্রী সন্দেহ করেন নি।

অনেক স্ত্রী স্বামীর মদ্যপানে আপত্তি করেন, তার কারণ এ নয় যে, স্বামীকে তাঁরা ভালোবাসেন না, টলস্টয়ের স্ত্রীও স্বামীর সৃজনশীল প্রতিভায় যাতে চিড় না খায় সেদিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রেখেছিলেন। 'War and Peace'-এর লেখক যদি ক্রমশঃ মনের দিক থেকে অনড় এবং অচল হয়ে পড়েন তার চেয়ে ক্ষতিকর আর কি হতে পারে? সোফিয়ার শিল্পরীতি ও শিল্পাদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান ছিল উঁচু পর্দায় বাঁধা।

সোফিয়ার যখন সতের বছর বয়স তখন Childhood গ্রন্থের লেখক চৌত্রিশ বছর বয়সের লেভ টলস্টয়ের তিনি প্রেমে পড়েন। এই কালের কথা তিনি ডায়েরীতে লিখেছেন, প্রস্তাব শুনেই তাঁর "Heart began to throb violently —and lost all sense of time and reality".

টলস্টয়-প্রেরিত প্রস্তাবটি তিনি বার বার পাঠ করেছেন। আর লেভ নিকোলেংকা (সোফিয়ার আদরের ডাক নাম) তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

"Incredible happiness! No one has had or will have such happiness — She is so incredibly good, so pure and harmonius. Something tortures me, — the jealousy for the man who could be fully her equal, I am not."

অবশ্য এ সবই তরুণ-তরুণীর মনের আবেগ বলা চলে।

সতের বছরের সোফিয়া মস্কো শহর ছেড়ে যাসনায়া পোলায়ানার গ্রামে স্বামীর ঘর করতে এলেন অনেক আশা আর আনন্দ মনে নিয়ে। কাউন্ট লেখা-পড়ায় ব্যস্ত, কে তাঁর জমিদারী দেখে, সেদিকে তাঁর মন নেই। তরুণী বধূ গৃহ-সংস্কার নিয়ে পড়লেন। অবহেলিত উদ্যান সংস্কার করা হল, বাড়ি-ঘর মেরামত করা হল, সবই সোফিয়া করলেন। কাউন্ট সব সময় লেখেন আর যে সময় লেখেন না তখন তিনি চাষী-মজুরদের নিয়ে ব্যস্ত। তারপর টলস্টয়ের খ্যাতি বৃদ্ধি হতে স্ত্রীর অনেক কর্ম বেড়ে গেল। গরীব চাষীরা টলস্টয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলে সোফিয়া তাদের সমাদর করতেন, আপ্যায়ন করতেন।

টলস্টয়ের পাণ্ডুলিপি অতিশয় কদর্য, স্ত্রীকে সেইগুলি সুন্দর এবং পরিষ্কার করে কপি করতে হত। একবার নয়, বার-বার। যতদিন না টলস্টয়ের শিষ্য চার্ট-কোভের এই দাম্পত্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছে, ততকাল এই ছিল সোফিয়ার কাজ। চার্টকোভ আবির্ভূত হওয়ার পর জ্বালা অনেক বেড়েছে।

কাউন্ট যখন তাঁর গ্রন্থস্বত্ব ত্যাগ করলেন, তখন তেরটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সোফিয়া বিপদে পড়লেন। তিনি বলেছেন—'বাড়িতে লোকজন গিজগিজ করছে, ছেলে-মেয়ে, গভর্নেস, শিক্ষক, চাকর, কুকুরে বাড়ি ভর্তি। প্রতিদিন সরু টেবিলটায় অন্ততঃ চোদ্দ জন খেতে বসে। ছোট ঘর, সেই ঘরে দুটি পিওনো, একটা দাবা খেলার টেবল। প্রতিবেশী, যাত্রী, এবং ভিক্ষুক নিয়তই আসছে, আর বিরাম-বিহীন অতিথিসমাগম ও অবস্থিতি লেগেই আছে।"

এর পর টলস্টয় কিষাণের পোষাক পরে, ভারী বুট পায়ে, দাড়ি-শোভিত শরীর নিয়ে যখন চলাফেরা করতে শুরু করলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়-ফেরৎ সোফিয়া কিঞ্চিৎ আহত হলেন। একদিন একটা বল-নৃত্যের আসরে একটা নতুন টুপি পরে যাচ্ছিলেন সোফিয়া, স্বামী মন্তব্য করলেন—"love of flummery" বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পোষাক বাহুল্যের অর্থ — "going naked."

আরো বিপদ বাধল, উভয়ে উভয়ের ডায়েরী পড়তেন। পারস্পরিক চুক্তি ছিল সেই রকম। এই ডায়েরীতে টলস্টয়ের যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল দিনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে কিষাণ-রমণীর রূপ-লাবণ্য এবং দৈহিক আকর্ষণের বিস্তারিত বিবরণ ছিল। পরে "The Kreutzer Sonata" উপন্যাসে এই চরিত্রের প্রতিফলন করেছেন টলস্টয়। এই ঘটনাটি সোফিয়ার মনে ঈর্ষা সৃষ্টি করেছিল। টলস্টয়ের দেহাসক্তির প্রবল আবেগ লক্ষ্য করে সোফিয়া বুঝেছিলেন যে, টলস্টয় তাঁর অধ্যাত্মজীবনের কিছুই উপলব্ধি করেন না। সারাজীবন টলস্টয় লিখেছেন মেয়েরা আবেগে পরিচালিত হয়, তারা শুধু সন্তানধারণের যোগ্য।

টলস্টয়ের নির্দেশ ছিল সন্তানদের পালন করতে হবে বুকের দুধ দিয়ে, বাজারের দুধ তারা পান করবে না। একবার শারীরিক অক্ষমতার জন্য ছেলেদের জন্য 'দুধ-মা' নিয়োগ করার পর টলস্টয় মন্তব্য করেন—নিজের দৈহিক আকৃতিটা বজায় রাখার দিকেই তোমার লক্ষ্য, ছেলেদের কল্যাণ তোমার কাম্য নয়।

টলস্টয়ের প্রথমে নাস্তিক, পরে একেবারে রক্ষণশীল গোঁড়ামতের চার্চের প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাসী, পরে আবার সম্পূর্ণ অবিশ্বাস, আবার পরে খৃষ্টের উপদেশ পাঠ ইত্যাদি বিপরীতধর্মী আচরণ সোফিয়া বুঝতে পারতেন না, তিনি লিখেছেন—

"জানি না, কিভাবে এই নিয়ত পরি-বর্তনশীল মতবাদের সঙ্গে আপনাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারব। তাঁর কাছে যা একনিষ্ঠ ঈশ্বরানুসন্ধান, আমার পক্ষে তার

ক্রুদ্ধ অনুকরণ, শুধু আমার নয়, সমগ্র পরিবারের পক্ষে ক্ষতিকর।"

অধ্যাত্মবিবর্তনের মুখে টলস্টয় একদিন স্ত্রীর সঙ্গও পরিত্যাগ করলেন। সোফিয়া লিখছেন ডায়েরীতে—

"For the first time he has run away from me and is spending the night in his study. We quarrelled over mere trifles. I blamed him for not troubling about the children, for not helping me to nurse Ilya, who is ill or to make jackets to children. The fact is he is growing cold towards me and our children."

এর পর লিখেছেন—"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে নাও। লোভের প্রেমে বঞ্চিত হয়ে জীবনধারণ করা বৃথা।"

কিন্তু টলস্টয় তখন সংস্কার-পাগল। বিবাহ সেইকালে টলস্টয়ের মতে "লাইসেন্স-প্রাপ্ত বেশ্যাবৃত্তি" মাত্র। গ্রন্থাবলীতে স্ত্রীর সম্পর্কে অনেক অন্তরঙ্গ ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর ডায়েরীতে বলেছেন—"বিবাহের পরই আমার ডায়েরী ওকে পড়তে দিলাম। আমার অতীত জীবন জানুক। অন্য লোকের কাছে শোনার চেয়ে ভালো। সেই ডায়েরী পাঠে ওর আতঙ্ক, বিতৃষ্ণা এবং অস্বস্তি আজো আমার স্মরণে আছে। আমি দেখেছি ও আমাকে ত্যাগ করতেও চেয়েছে। কিন্তু কেন ত্যাগ করেনি, কে জানে?"

দীর্ঘকাল সুখে বিবাহিত জীবন কাটানোর পর স্বামী যদি মন্তব্য করেন—'কেন আমাকে ত্যাগ করেনি, কে জানে?' কোন্ স্ত্রী তাতে বেদনাবোধ না করবেন।

সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনের যে একঘেয়েমি আছে, টলস্টয় সেই একঘেয়েমির জ্বালায় ভুগেছেন মনে হয়। কারণ, তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—

"In me there often raged a terrible hatred of her. Sometimes I watched her pouring out tea, swinging her legs, lifting a spoon to her mouth, and I hated her for those things as though they were the worse possible crimes."

স্ত্রীর প্রতি এই ধরণের ঘৃণা যখন মানুষের মনে জাগে, তখন আর কি থাকে! বিবাহিত জীবনের এই বিপরীত রূপ কার অন্তরে বেদনা না জাগিয়ে তোলে। সোফিয়ার কাছে তাই এসব "hideous picture of married life" বলে মনে হয়েছে। কোনো সেন্টিমেন্টের বালাই নেই, রোমান্স বিদূরিত, স্নেহ নেই, প্রেম নেই, অংশীদারী মনোভাব নেই, পারস্পরিক স্মৃতির ঐশ্বর্য নিয়ে আনন্দ করার অবসর নেই।

সোফিয়া ভালোবাসেন আর্ট ও সৌন্দর্য। টলস্টয় মনে করেন, সৌন্দর্য ঈশ্বরের দান নয়, তা এসেছে শয়তানের কাছ থেকে।

একবার সন্ধ্যার একটি সুরে পিওনোর বাজাতে বাজাতে হঠাৎ উঠে পড়লেন—'Ah! the animal!' এই কথা বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। তানিয়েভ নামক জনৈক বিখ্যাত পিওনোবাদককে শ্রদ্ধা করতেন সোফিয়া, পিওনো বাজাতেও ভালোবাসতেন। সোফিয়ার মনে হল টলস্টয় সেই সঙ্গীত-প্রীতিকে অবজ্ঞা করছেন। সোফিয়ার মনে হল—

He has lived only with his body and his love has been only physical love. This side of life is dying and with it the need for being together."

টলস্টয় তাঁর জীবনীকার এবং অনুবাদক আইলমার মাডকে লিখেছেন—"I feel with every nerve of my body the truth of the words that a man and his wife are not two separate beings, but one."

এই যদি জ্ঞান, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এত ভুল বোঝাবুঝি কেন, এত কলহ কেন। যখনই টলস্টয়ের অসুখ করেছে, স্ত্রী কল্যাণীবেশে শুশ্রূষা করেছেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এইভাবে কেটেছে।

আটাশে অক্টোবর যখন স্বামীকে আর ঘরে পাওয়া গেল না, তখন সোফিয়া জলে ঝাঁপ দিতে গেলেন, ধরে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার পর জানলা দিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তারপর স্বামীর সন্ধানে বেরোলেন। স্বামীকে পেলেন, তাঁর কাছে তাঁকে যেতে দেওয়া হল না। অষ্টাপোভার রেলস্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় শায়িত মৃত্যুপথযাত্রী টলস্টয়ের যে কণ্ঠস্বর তাঁর কানে পৌঁছেছিল, তা অতি বিচিত্র—

"To seek always to seek."

গোর্কী বলেছেন, "আমি সোফিয়া-টলস্টয়ের প্রতি অনুকূল নই, তাই আমি তাঁর সম্পর্কে এতটুকু অতিরঞ্জন না করে বলতে পারি যে, যাঁরা তাঁর স্বামীর কাছে আসতেন, তিনি তাঁদের মশা, মাছি, কীট, পতঙ্গের মত জ্ঞান করতেন। আর সত্যি তাই, এই মহৎ লেখকের কাছে দিনরাত যেন মাছির মত তাঁরা ভন্‌ভন্ করতেন।"

গভীর তুষারমণ্ডিত টলস্টয়ের কবরে গিয়ে সোফিয়া উন্মাদিনীর মত কাঁদতেন—"—এই কি তিনি! এই কি আমার প্রিয়তম লেভচকা মাটির নীচে।" এই ভেবে কেঁদে কেঁদে তাঁর বুকে তীব্র বেদনা হত, তখন তাঁকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। টলস্টয়ের স্ত্রী সোফিয়া স্বামীকে যে নিঃসন্দেহে ভালোবাসতেন, একথা তাঁর জীবনেই প্রমাণিত।

॥ দুই ॥

জর্জ বার্নাড শ শ্রীমতী সার্লেটট টাউনসেন্ডের প্রেমে পড়েছিলেন বিচিত্রভাবে। বিয়েট্রিস ওয়েব Our Partnership গ্রন্থে লিখেছেন—

"সার্লোট মেয়েটি বেশ রোম্যান্টিক। নিজেকে সে সিনিক্যাল মনে করে। সে একাধারে সোস্যালিস্ট ও র‍্যাডিক্যাল। সমষ্টিবাদ যে সে বেশ বোঝে তা নয়, আসলে সে প্রকৃতিতে বিপ্লবী। তার মধ্যে উচ্চাসিকতা বা গোঁড়ামি নেই। ইতিমধ্যেই সে সব পদ্ধতি ও প্রকরণ গিলে খেয়েছে, কিন্তু নিজের একটা মতবাদ স্থির করতে পারেনি।... আমি ভেবেছিলাম যে, গ্রেহাম ওয়ালেসের সঙ্গে ওর মানাবে, কিন্তু তার সঙ্গে ওর বনল না। কয়েকদিনের ভেতর সে বার্নাড শ'র নিত্যসহচরী হয়ে উঠল।"

বার্নাড শ সেই সময় You Never Can Tell লিখে শেষ করেছেন। সাইকেলের টিউবের ফুটো সারছেন আর সার্লোটের সঙ্গে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করছেন বা পায়ে হাঁটছেন।

এইভাবেই দুজনের মধ্যে গভীর প্রেম সঞ্চারিত হল। বার্নাড শ এই সময় একটি চিঠিতে এলেন টেরিকে লিখেছেন— "ও কিন্তু আমাকে প্রকৃত ভালোবাসে না। আসলে ও অতিচতুরা। তার এই স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার মূল্য ও বোঝে। বাঁধাধরা পদ্ধতির জীবন নিয়ে মার মৃত্যুকাল পর্যন্ত ও বিশেষ দুর্ভোগ ভোগ করেছে। সবকিছু জানার পূর্বে বিবাহের শৃঙ্খলে জীবনটা বাঁধা অতিশয় মূর্খতা। কয়েক বছর আগে প্রেমের ব্যাপারে সে আঘাত পেয়েছে। (The Story of San Michele রচয়িতা AXEL MUNTHE-র সঙ্গে সার্লোটের প্রথম প্রেম হয়, পরে বিচ্ছেদ ঘটে)। সেই আঘাতে সে জর্জরিত হয়। তারপর হাতে পড়ল আমার Quintessence of Ibsenism"—তার মধ্যে পেল জীবনবেদ, মুক্তি, সিদ্ধি, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি। তারও অনেক পরে দেখলো গ্রন্থকারকে। তুমি তো জানো, পত্রলেখক হিসাবে সেই ব্যক্তিটি সহনীয়। শুধু তাই নয়, বাইসিকেল নিয়ে ভ্রমণেও সহনীয় সহচর। পল্লীপথে ভ্রমণের আর সঙ্গী কই! মেয়েটির আমাকে ভালো লেগেছে, প্রকৃতিতে সে ছলনাময়ী নয় যে বিপরীত ভান করবে। আমিও তার অনুরাগী হয়ে পড়েছি।"

এর কিছুকাল পরেই বার্নাড শ'র শরীর হঠাৎ ভেঙে পড়ল। জুতোর ফিতা খুব টান করে বাঁধার জন্য পায়ে ঘা হয়। পায়ের ঘা পরীক্ষা করে দেখা গেল 'নেক্রসিস অব বোন্' বা অস্থিক্ষয় রোগ হয়েছে। আঠারো মাস বার্নাড শ' ক্রাচেস ধরে চলাফেরা করেছেন।

এলেন এই কথা জেনে বললেন—"তুমি এখনই পি, টি-কে জানাও, সে এসে নিয়ে যাক, দেখাশোনা করুক।"

সার্লোট নিজেই এলেন। এখনই তাঁকে পল্লীভবনে নিয়ে যেতে চান। বার্নাড শ' বললেন—"তোমার সেবাব্রতের সাধু উদ্দেশ্য কেউ বুঝবে না। তোমার বাড়ি যদি যেতে হয়, তাহলে সোজা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে বিবাহের নোটিশ পেশ কর।" ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন দুজনের বিবাহ হয়ে গেল। দুজনেরই বয়স তখন চল্লিশের কাছে।

দীর্ঘকাল স্বামীকে নজরে রেখে, তাঁর সকল কর্মে উৎসাহ দিয়ে ১৯৪৩-এর ১৯ই

সেপ্টেম্বর সার্লোটের মৃত্যু হল। সেই বছর এ্যায়টের বাসা ছেড়ে লণ্ডনে এসেছিলেন। সার্লোট বড় অলৌকিক ভয় পেতে লাগলেন। কে যেন শয্যার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর একদিন তাঁকে বড় সুন্দর মনে হল। সন্ধ্যার দিকে তাঁকে ঘরে রেখে শ' একটু বেড়াতে গেলেন।

পরদিন ভোরে এসে দাসী দেখে সার্লোট পড়ে আছেন, হাতে ঘড়িটা ধরা আছে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। সমাধিকালে হ্যাণ্ডেলের লারগো সুরে ধ্বনিত হল—"I know that my Redeemer Liveth."

বার্নাড শ' বাহু প্রসারিত করে আবেগভরে গানটি গাইলেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর জর্জ বার্নাড শ কতকগুলি গোপন চিঠিপত্র পেলেন। এর অস্তিত্ব তাঁর জানা ছিল না। তার অনেকগুলি পড়ে ফেললেন বার্নাড শ, তারপর বললেন—

"I lived with Charlotte for forty years, and I see now that there was a great deal about her that I did not know. It has been a shock".

স্বামী নিজেই যখন স্ত্রীর বিষয়ে অনেক কিছু জানতেন না, তখন অপরে আর কি জানবে। সম্প্রতি জ্যানেট ডানবার নামক জনৈক মহিলা লিখিত "Mrs. G B S" নামক গ্রন্থে অনেক নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বোঝা যায় যে, সার্লোট বার্নাড শ'কে জায়া অপেক্ষা জননীর মত ভালোবাসলেও আসলে তিনি যাঁকে আত্মনিবেদন করেছিলেন তাঁর নাম টি, ই, লরেন্স। 'লরেন্স অব এ্যারাবিয়া' নামে যিনি অধিক খ্যাত। একজন মহৎ ও বিখ্যাত ব্যক্তির স্ত্রীর পটভূমি হিসাবে তিনি সুখে ও স্বস্তিতে আছেন এই ভাব দেখিয়েছেন। বহিরঙ্গে যিনি শ্রীমতী বার্নাড শ, যিনি বার্নাড শ'র সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে দৃষ্টি রেখেছেন, শরীর খারাপ হলে সেবা করছেন, সকল মতামত ধীর ভাবে শুনেছেন, গৃহস্বামিনী হিসাবে চমৎকার। আসলে তাঁর প্রকৃতি কিন্তু ভিন্ন ধরণের।

জ্যানেট ডানবার সার্লোটের গোপন পত্রাবলী ঘেঁটে অনেক গবেষণা করে তথ্যাবলী সংগ্রহ করেছেন। সমসাময়িকদের কাছে কথাবার্তা বলে কিছু জেনেছেন। তাঁর এই জটিল চরিত্র দেখে যে প্রশ্ন মনে জাগে তা এই যে, কেন তিনি বার্নাড শ'কে বিয়ে করেন। আর শ'ই বা তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হন। বিবাহ সম্পর্কে সার্লোটের মনে চাপা আতঙ্ক ছিল, কিন্তু তারুণ্যের জন্য তাঁর রূপলাবণ্যের অনেক যোগ্য পরিণয়প্রার্থী তাঁর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়তে রাজী ছিলেন। সার্লোটের নাকি এই আকর্ষণের কারণ She had perfectly normal instincts, she was often torn by the most appalling conflicts. স্বাধীন ও মুক্ত থাকার তাঁর বাসনা ছিল তাঁর। এল্লেন মনখু এবং লরেন্সের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের দ্বারা বোঝা যায় যে, বিদগ্ধ এবং বিখ্যাত মানুষের ভালোবাসা অর্জনের শক্তি তাঁর চরিত্রে ছিল।

শ এবং সার্লোট দুজনেই বিবাহ-পদ্ধতি সম্পর্কে ঘোরতর বিরূপ মত পোষণ করতেন। দুজনেই অবিবাহিত থাকবেন স্থির করেন। বিবাহকালে উভয়ের বয়স চল্লিশের কোঠায়। আবার শেষজীবনে বার্নাড শ বলেছেন, যদি জীবনে সার্লোটের না আবির্ভাব হত, তাহলে আমি হয়ত অবিবাহিত থাকতাম। কারণ সার্লোট একমাত্র রমণী যাঁকে বিয়ে করা যায়। সার্লোট এবং শ'র বিবাহ নিছক 'প্লেটনিক' (দেহাতীত) কিনা তা বলা কঠিন। কারণ বিবাহের পূর্ব থেকে উভয়ের মধ্যে শারীরিক সংযোগ ছিল (they were on terms of physical affection) আর সার্লোট যে অক্ষত কৌমার্য নিয়ে দেহত্যাগ করেছেন, তা মনে হয় না। বার্নাড শ অতিশয় বিবেচক এবং সংবেদনশীল মানুষ ছিলেন। সার্লোটের যৌন বিষয় সম্পর্কে অভিমত তিনি জানতেন এবং বুঝতেন। মানুষ হিসাবে বার্নাড শ ছিলেন পরিপূর্ণভাবে স্বাভাবিক, আর মতবাদ আঁকড়ে থাকলেও সার্লোট যে স্বাভাবিক চরিত্রের রমণী এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। বার্নাড শ তাঁর বৈদগ্ধ্যের পরিমণ্ডলে বাস করতেন, তাঁর সকল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃজনশীল ক্ষমতায় ব্যয়িত হত। আশ্চর্য মননশক্তির অধিকারী বার্নাড শ যে জগতে বাস করতেন তা তাঁর নিজস্ব। সার্লোট সন্তান কামনা না করলেও প্রেমে যে তাঁর অনীহা ছিল তা বোঝা যায় না। টলস্টয়কে বিবাহ করে সোফিয়ার যে দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন বার্নাড শ। বয়স বাড়ার সঙ্গে দুজনের অন্তরঙ্গতা নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। সার্লোট ছিলেন ধনী রমণী। সোফিয়াকে কিন্তু নিরন্তর অর্থচিন্তায় দিন কাটাতে হয়েছে। বিপ্লবী অন্তর নিয়ে সার্লোট সর্বদা 'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোনোখানে—' ঘুরে বেড়াতে চেয়েছেন। বার্নাড শ মাঝে মাঝে ক্ষেপে যেতেন এই ভ্রাম্যমাণা রমণীর ভ্রমণে আগ্রহ দেখে। সার্লোট আয়ার্লাণ্ডকে ভালোবাসতেন। আর স্বয়ং ধর্মশীলা না হলেও অধ্যাত্ম ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন। জেরাল্ড হাউকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

I have been more or less studying all this since before I gave you the little GITA, and I soon found out all you say about its demanding everything. At first one thinks it means a quarter of an hour a day, and soon one finds it means all one's life and being and loyalty, then soon one realizes that that is not enough. There was a time when, if I had been free, I would have given up everything else for it. But I was not free."

দুজন মানুষকে সার্লোট বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, একজন গ্রহণ করেছেন যত দান ততটুকু করতে পারেন নি, তিনি এ্যাকসেল মনখু, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আরবের লরেন্স। এই লরেন্সও তাঁর মতই নিঃসঙ্গ। তিনি প্রকৃতিতে কঠোর ও স্বাধীন। সার্লোট তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—

"He was an in expressibly complicated person. In a sense he was tragically sincere" — সার্লোটের জীবনে এই নাকি Strongest Contact, বার্নাড শ চল্লিশ বছর সার্লোটকে নিয়ে ঘর করেও তাই তাঁর গোপন পত্রাবলী পড়ে আহত হয়ে বলে উঠেছিলেন— "It has been a shock!" ১৯৪৪-এর ১৮ই মে এ্যায়টে এলিনর ও'কেনেলকে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বার্নাড শ বলেন—

"It takes a long time for two people to get to know each other; and from a Diary I discovered lately, and some letters which she wrote to T.E. LAWRENCE, I realise that there were many parts of her character that even I did not know, for she *poured out her soul to Lawrence.*"

স্ত্রীলোকের চরিত্র ঈশ্বরও জানতে পারেন না। এ কথাই আবার প্রমাণিত হল।


গ্রন্থজগতের নূতন বই !!

সাধক সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি

**অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ**

(১ম) ॥ ৮·৫০ ॥

**অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ**

(২য়) ॥ ৮·০০ ॥

যুগান্তর সৃষ্টিকারী কয়েকটি রচনা

শ্রীপান্থের

**বিচিত্র মানবী** [ রম্যরচনা ] ॥ ৫·০০ ॥

মায়া বসুর

**সূর্যশিখা** [ উপন্যাস ] ॥ ৩·৫০ ॥

শৈলেশ দের

**রাঙা মাটির পাহাড়ে**

[ উপন্যাস ] ॥ ৩·৫০ ॥

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

**সমুদ্র নয় মন** ॥ ৩·০০ ॥

কয়েকটি কিশোর উপন্যাস ও গল্প

শিবরাম চক্রবর্তীর

**দাদু-নাতির দৌড়** ॥ ২·২৫ ॥

পরিমল গোস্বামীর

**রোল নং ২০৫** ॥ ২·৫০ ॥

লীলা মজুমদারের

**বাঘের চোখ** ॥ ২·৫০ ॥

হেনরী টমাসের

**চার্লস স্টেইনমেজ** ॥ ২·০০ ॥

মণি গঙ্গোপাধ্যায়ের

**ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ** ॥ ২·৭৫ ॥

গ্রন্থম্ : ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৬

# বাবা

বনফুল

প্রভুরাম চক্রবর্তী প্রবল-প্রতাপ জমিদার ছিলেন। তাঁহার জমিদারিতে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত কি না তাহা জানা নাই, কিন্তু এ কথাটা সুবিদিত ছিল যে হিন্দু-মুসলমান দুই দলই তাঁহার জমিদারিতে শান্ত হইয়া থাকিত। টুঁ শব্দ করিবার উপায় ছিল না। কোথাও টুঁ শব্দ হইলে বজ্রগর্জনে তিনি তাহা থামাইয়া দিতেন। শুধু হিন্দু-মুসলমান ব্যাপারেই নয়, সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত ছিল। প্রভুরাম নিজের একমাত্র সন্তান প্রণতির যখন বিবাহ দিলেন তখন সম্ভ্রংশ এবং কৌলীন্যের উপরই নজর দিয়াছিলেন বেশী। সেই জন্য অনেক দেখিয়া শেষে একটি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারেই তিনি জামাতা-নির্বাচন করিলেন। জামাতা বিদ্বান এবং শিক্ষক। জামাতার পিতা ছিলেন সেকালের সদরালা। প্রচুর যৌতুক এবং স্বর্ণালঙ্কার-সহ কন্যাটিকে তিনি বরেনের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেকালের নগদ কুড়ি হাজার টাকা পণ এবং একশত ভরি গহনা একালের লক্ষাধিক টাকারও বেশী। সদরালা সুরেন্দ্রনাথ এবং তৎপত্নী রোহিণীবালা আহ্লাদে আটখানা হইলেন। তাঁহাদের আর একটা বড় আশাও অবশ্য নেপথ্যে রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছিল। প্রণতি যখন প্রভুরামের একমাত্র সন্তান তখন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অত বড় জমিদারিটাও তাঁহাদের হাতে নিঃসন্দেহে আসিয়া যাইবে। এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা পুত্রবধূ প্রণতিকে সাধ্যাতিরিক্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল মানুষ অঙ্ক কষিয়া যাহা ঠিক করে অনেক সময় বিধাতার বিধানের সহিত তাহার হুবহু মিল হয় না। দুইটি ঘটনার দ্বারা এ সত্য প্রমাণিত হইল। প্রভুরাম চক্রবর্তী হঠাৎ একদিন মাথার শির ছিঁড়িয়া মারা গেলেন। দেখা গেল তিনি একটি উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এক ট্রাস্টির হস্তে সমর্পণ করিয়া নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যেন সম্পত্তির সমস্ত আয় হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-নিবারণ-কল্পে খরচ হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও মর্মান্তিক। প্রণতির স্বামী বরেন সহসা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল। তাহার চাকরি তো গেলই, তাহার চিকিৎসার জন্য সাংসারিক ব্যয়ও বাড়িতে লাগিল। সদরালা মহাশয় একদিন হিসাব করিয়া দেখিলেন সর্বসাকুল্যে তাঁহার বর্তমান মাসিক আয় মাত্র আড়াইশত টাকা। পুত্রের বিবাহে পণস্বরূপ যে কুড়ি হাজার টাকা পাইয়াছিলেন তাহা দিয়া কলিকাতায় একটুকরা জমি কিনিয়াছেন। আশা ছিল জমিদারিটা পাইলে বাড়ি করাইবেন। কিন্তু সে আশা মরীচিকার মতো শূন্যে মিলাইয়া গেল।

প্রণতির শাশুড়ি কিন্তু ইহার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করিলেন প্রণতিকে। তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন বউটা অপয়া। সমস্ত দুর্ঘটনার জন্য সে-ই দায়ী। স্ত্রীর নিকট বার-বার শুনিয়া শুনিয়া সদরালা সুরেন্দ্রনাথেরও এই বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। তাঁহারও মনে হইল বউটাই অলক্ষ্মী। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন বউটা আসিবার পর হইতেই বাড়িতে আরও নানা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পুরাতন বুড়ি দাইটা হঠাৎ মরিয়া গেল। ব্যাঙ্কের যে সদাশয় কর্মচারীটি নির্বিবাদে তাঁহার পেন্‌সনের টাকাগুলি ব্যাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া দিত সে-ও হঠাৎ বদলি হইয়া গেল। কোথাও কিছু নাই আচমকা একটা ঝড় উঠিয়া পুরাতন নিমগাছের একটা ডাল ভাঙিয়া দিল। বাড়ির গাইটা বেশ দুধ দিতেছিল হঠাৎ সে দুধ একেবারে কমাইয়া দিয়াছে। তাঁহার একমাত্র বন্ধু একচক্ষু জিতু ভট্‌চাজও বলিলেন, 'ভায়া তোমার বউমাটির লক্ষণ ভাল দেখছি না। সাবধান হও'।

'কি করে' সাবধান হব?'—সদরালা ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

'আমাকে একজন তান্ত্রিক সাধক বলেছিলেন বাড়িতে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হলে তাকে অবহেলা করবে, যত্ন কোরো না। তাহলে কিছুদিন পরে সে নিজেই চলে যাবে'।

সদরালা খবরটি গৃহিণীকে দিলেন। গৃহিণী সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "বেশ—"। শুনিলে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না কিন্তু ইহার পর হইতেই প্রণতির আহারে এবং কাপড়েচোপড়ে যাহা প্রকটিত হইল তাহা অত্যন্তই বেদনাদায়ক। প্রণতি আগে সকালবেলা কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন পরোটা, কোনদিন বা দু'একটা সন্দেশ খাইত —এখন তাহার জন্য বরাদ্দ হইল শুকনো মুড়ি। দাই চাকর যে মোটা চালের ভাত খাইত প্রণতির জন্যও সেই ব্যবস্থা হইল। তরকারির সংখ্যাও মাত্র একটি। তাহার মিহি শাড়িগুলি যখন ছিঁড়িয়া গেল তখন তাহার পরিবর্তে আসিল শস্তা মোটা জ্যালজেলে মিলের শাড়ি। শৌখিন সাবান তেল মাখা অভ্যাস ছিল, সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপে অলক্ষ্মী-বিতাড়ন পর্ব চলিতে লাগিল। হয়তো প্রণতি না মরা পর্যন্ত চলিতেই থাকিত, কিন্তু একদিন একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়া গেল।

সদরালা খাইতে বসিয়াছিলেন। যদিও মাছমাংসের তেমন সমারোহ ছিল না তবু শাকসবজির তরিতরকারি কয়েকটা ছিল। ভাজা, সুক্তো, চচ্চড়ি, পোস্ত, আলুপটলের দম, ডাল, অম্বল, দইও ছিল। সদরালা খাওয়া আরম্ভ করিবেন, এমন সময় ঠাস-ঠাস করিয়া তাঁহার দুই গালে কে যেন প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল। তাহার পর শোনা গেল

কে যেন ঘরের ছাদ হইতে বলিতেছে, "আমার মেয়েকে অনাহারে রেখে তুমি পঞ্চ-ব্যঞ্জন দিয়ে খেতে বসেছ, লজ্জা করে না তোমার শুয়ার কি বাচ্ছা। ঠেঙিয়ে লাস করে' দেব তোমাকে আজ। আমি প্রভুরাম চক্রবর্তী, মরেছি কিন্তু মুক্তি পাইনি। কাল থেকে তোমার বাসায় এসেছি, আমার মেয়ের অবস্থা দেখে রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি করছে আমার। শিগ্‌গির তাকে ভালো খেতে দাও, ভালো কাপড় পরতে চাও, তা নাহলে খুন করে' ফেলব সকলকে—"

যে অদৃশ্য হস্ত সদরালাকে চড় মারিয়াছিল সেই অদৃশ্য হস্ত তাঁহার ভাতের থালাকে শূন্যে তুলিয়া শানে আছড়াইয়া দিল। ঝন-ঝন করিয়া ফাটিয়া গেল কাঁসার থালাখানা, ভাত-তরকারি ছিটকাইয়া পড়িল চতুর্দিকে।

"ঠেঙিয়ে লাস করে দেব সকলকে—" গৃহিণী পাখা হাতে কর্তাকে খাওয়াইতে বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার বাত-গ্রস্ত কোমরে অদৃশ্য পায়ের লাথি খাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

নিদারুণ ব্যাপার! মুক্তকচ্ছ সদরালা উঠানে বাহির হইয়া আসিলেন। শুনিতে পাইলেন গৃহিণী আর্তনাদ করিতেছেন—"আর মেরো না, আর মেরো না ছেড়ে দাও গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

কিন্তু পা কোথা! পা যে দেখা যায় না। প্রভুরাম চক্রবর্তীর হুঙ্কার শোনা গেল।

"শিগ্‌গির আমার মেয়েকে মিহি শাড়ি পরিয়ে পঞ্চ-ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খেতে দাও, তা নাহলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করব আমি"।

"দিচ্ছি, দিচ্ছি, এখনি দিচ্ছি। আর মেরো না। কোমরটা ভেঙে গেছে—"

গৃহিণী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। বাহিরের বারান্দায় প্রণতিও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। গৃহিণী তাহাকে বলিলেন, "আমার ওই তাঁতের কাপড়টা তাড়াতাড়ি পরে নাও। চল তোমাকে খেতে দিচ্ছি। উঃ, এ-কি কাণ্ড!"

মিহি তাঁতের শাড়ি পরিয়া প্রণতি আহার করিল।

সদরালা ও তাঁহার গৃহিণী রোহিণীবালা অতঃপর যাহা করিলেন তাহা হাস্যকর, কিন্তু ইহা না করিয়াও উপায় ছিল না। তাঁহারা উভয়ে গলবস্ত্র হইয়া ছাতের দিকে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "বেয়াই, আমাদের বড় ক্ষিধে পেয়েছে, এবার খাব? আর কখনও তোমার মেয়ের অযত্ন আমরা করব না। আমাদের মাপ কর—"

শূন্য হইতে উত্তর আসিল—"খাও। আর আমারও খাবার ব্যবস্থা কর। আমার ভাত বেড়ে তোমাদের তুলসীতলায় রেখে এস, সেখান থেকেই আমি খেতে পারব"।

গৃহিণী তাড়াতাড়ি একথালা ভাত ও সব রকম তরকারি তুলসীতলায় সাজাইয়া দিলেন।

"ওই কটি ভাতে আমার কি হবে? আমি একসের চালের ভাত খাই—"

"আর তো ভাত নেই। তাহলে চড়িয়ে দিই—"

"দাও—"

কিছুক্ষণ পরে একসের চালের ভাত ও তদুপযুক্ত তরিতরকারি তুলসীতলায় রাখা হইল। নিমেষের মধ্যে তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। থালি থালা ও বাটিগুলি পড়িয়া রহিল কেবল।

আহারান্তে প্রভুরাম চক্রবর্তী জ্ঞাপন করিলেন, "আমি এখন এইখানেই থাকব ঠিক করেছি। নিয়মিত আমার খাবার জলখাবারের ব্যবস্থা করবেন"।

শুনিয়া সদরালা-দম্পতীর চক্ষু স্থির হইয়া গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শেষে তাহারা তাঁহাদের বন্ধু কানা জিতু ভট্‌চাজের শরণাপন্ন হইলেন। বাধ্য হইয়াই হইলেন, কথাটা বাহিরে প্রচার হোক এ ইচ্ছা তাঁহাদের মোটেই ছিল না।

কানা চক্রবর্তী পরামর্শ দিলেন—ওঝা ডাকা হোক। একটি ভাল ওঝার ঠিকানাও বলিয়া দিলেন তিনি। তাহার সহিত চুক্তি হইল ভূত বিদায় করিতে

...টিকি ধরিয়া টানিতে টানিতে...

পারিলে তাহাকে নগদ পঞ্চাশ টাকা এক এক জোড়া তাঁতের ধুতি দিতে হইবে। তাছাড়া এক সের তেজপাতা চাই। তেজপাতাটা পোড়াইতে হইবে। তেজপাতা পোড়ার ধোঁয়ায় ভূত না কি পালায়। নির্দিষ্ট দিনে ওঝা আসিয়া নিজের চতুর্দিকে সিঁদুর দিয়া একটা গণ্ডি দিল এবং তাহার মধ্যে বসিয়া তেজপাতা পোড়াইতে পোড়াইতে মন্ত্র পড়িতে লাগিল। ফল যাহা হইল তাহা অতি ভয়ঙ্কর। ওঝার নাকের উপর প্রভুরাম চক্রবর্তী একটি ঘুসি মারিলেন এবং তাহার টিকি ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে আনিয়া উঠানের উপর এক আছাড় দিলেন। ওঝা উঠিয়াই চোঁ চা দৌড় দিল, আর পিছু ফিরিয়া চাহিল না পর্যন্ত। পরদিন তাহার এক পত্র আসিল—'উনি সামান্য ভূত নন। উনি দুর্ধর্ষ একগুঁয়ে দানব। আমি উহাকে ঘাঁটাইতে পারিব না। ক্ষমা করিবেন।' পরদিন প্রভুরামের নূতন আদেশও জারি হইল।

"রোজ রোজ শাক-পাতা খাওয়াচ্ছেন কেন। চালটাও খুব মোটা। আজ পেশোয়ারি চালের ভাত এবং মাংসের কোর্মা খাব। ডাল ভালো ঘি মাছ কিনে আনবেন।"

সদরালা করজোড়ে উত্তর দিলেন, "বেয়াই, আমি বড় গরীব হয়ে পড়েছি। মাছ মাংস খাবার পয়সা নেই। যে চাল কিনছি তারই মণ সাইত্রিশ টাকা। এর চেয়ে বেশী দাম দিয়ে চাল কি করে' কিনব? ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে—"

"ও সব কিছু শুনতে চাই না। স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে' ফেলুন। আমি যে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলাম সে টাকা কোথা?"

"তা দিয়ে কলকাতায় একটু করো জমি কিনেছি—"

"বিক্রি করে' ফেলুন জমি। মোটকথা কাল থেকে ওই খাবার চাই"।

সত্যই সদরালা গৃহিণীর কিছু অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, প্রভুরামের ফরমাস অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া চলিতে লাগিল। মাছ মাংস পোলাও কালিয়া দই মিষ্টি ক্ষীর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সাজাইয়া তাঁহারা তুলসীতলায় প্রত্যহ প্রভুরামকে ভোগ দিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, না দিলে তাঁহাদের জীবন সংশয়। দুর্ধর্ষ দানবের মায়া-দয়া নাই।

একদিন গভীর রাত্রে সকলে যখন গভীর নিদ্রামগ্ন তখন প্রণতি বাহিরের ঘরে আসিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া ডাকিল, "বাবা—"

"কি—"

"তুমি আর আমাদের কষ্ট দিও না। তুমি এবার এদের রেহাই দাও, শ্বশুর-শাশুড়ির কষ্ট আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে—"

"তোর জন্যেই তো এত সব করছি—ওরা তোকে যে অবস্থায় রেখেছিল—"

"সেই অবস্থাতেই আমি সুখী ছিলাম বাবা। এই আমার অদৃষ্ট, তুমি আর কি করবে। এখন তুমি যা করছ তাতে আমি ভালো খেতে পরতে পারছি বটে, কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। তুমি অমন কোরো না"

"তুই বলছিস আমি চলে যাব?"

"তাই যাও"

দুম করিয়া একটা শব্দ হইল। ছাতের খানিকটা ফাটিয়া উড়িয়া গেল। প্রণতি সেই ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইল আকাশের একটি উজ্জ্বল তারা তাহার দিকে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিতেছে।

শব্দ শুনিয়া সদরালা ও তাঁহার পত্নীও আলু-থালু বেশে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন।

"কিসের শব্দ হল বৌমা?"

"বাবা চলে' গেলেন"।

"কি করে' বুঝলে?"

"ওই যে দেখুন না"।

নক্ষত্রটি তখনও সকৌতুকে হাসিতেছিল।

# একটি শাপগ্রস্ত ঐতিহাসিক হীরকের কাহিনী

বিশু মুখোপাধ্যায়

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। সে কারণ, যা অতিপ্রাকৃত বা অতিমানবীয় এমন অলৌকিক ঘটনা বিজ্ঞানের এলাকার বাইরে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের যুক্তিনিষ্ঠায় আস্থাশীল হয়েও, সময় সময় এমন সব ঘটনার সম্মুখীন হয়, যা তার বিচারবুদ্ধিকে জড়িমার মধ্যে ফেলে বিভ্রান্ত করে—বৈজ্ঞানিকের নির্দেশিত পথে সে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। এমনি বিভ্রান্তকর অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন প্রত্যক্ষ বস্তু বা ঘটনার সংগে তার অন্তরালবর্তী কারণটিকে সে কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারে না। যখন সকল যুক্তি ও বিশ্লেষণ এক দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে ঢাকা পড়ে যায়। আমাদের দেশের ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, ভেল্কিবাজি প্রভৃতি যা অতি প্রাচীনকাল থেকে কুসংস্কাররূপে আজও বেঁচে আছে, তার মূলে আছে—রহস্যকে আমরা পুরো-পুরি আমাদের চেতনা থেকে বিদূরিত করতে পারিনি। তাই এখনও পর্যন্ত আমরা মন্ত্র-পূত বস্তুর শক্তিতে সহজে অনাস্থা প্রকাশ করতে পারি না।

কিন্তু সত্যই কি এ কুসংস্কার? সংসারে কি অলৌকিক ঘটনার স্থান নেই? মনে হয়, এ-সম্বন্ধে মানুষ কোনদিনই একটি সুস্পষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে না। কারণ, একের ইচ্ছাশক্তি যে বস্তু বা ব্যক্তির উপর আরোপ ক'রে বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায়, এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

এখানে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে এমনই একটি অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনা আপনা-দের কাছে উপস্থিত করছি উপর্যুক্ত বক্তব্যের পরিপোষক হিসাবে। ঘটনাটি হচ্ছে একটি হীরকের রহস্যজনক কাহিনী এবং এই কাহিনীর উপলক্ষ্য হচ্ছেন বিখ্যাত ফরাসী রত্নবণিক ও পর্যটক জাঁ বাপিস্ত টাভার্নিয়ার, যিনি শাহানশাহ্ আক-বরের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন। ইনি একটি মন্দিরে রাম-সীতা বিগ্রহের দেহাভরণে একটি বিরাট অত্যুজ্জ্বল হীরক-খণ্ড দেখে এতই মুগ্ধ হন যে, সেটিকে অপহরণ করার জন্য বদ্ধপরিকর হন। সম্রাটের সংগে কথাপ্রসংগে এই হীরকের সম্বন্ধে যখন কথা ওঠে, তখন মোগলসম্রাট আকবর তাঁকে এই বিগ্রহের অঙ্গসজ্জা সম্বন্ধে যে অলৌকিক তথ্য পরিবেশন করেন, তা হচ্ছে—"যদি বিগ্রহের অঙ্গাভরণ অশুচি হস্তে স্পৃষ্ট হয়, তাহ'লে দুষ্কৃতকারী ভয়ং-কর অভিশাপে অভিশপ্ত হবে এবং এই অভিশাপের ক্রিয়া বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হবে।" হতভাগ্য টাভার্নিয়ার পূর্বাহ্নে সম্রাটের নিকট এই তথ্যটি জেনেও তাঁর কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে না পেরে এই হীরক-খণ্ডটি কৌশলে আত্মসাৎ করেন। ফলে, কেবলমাত্র যে তাঁর নিজের জীবন ও পরিবার-বর্গই অভিশাপের অমোঘ শাস্তি ভোগ করেছিল তা নয়—এমন কি যে-কেউ এই হীরকের সংস্পর্শে এসেছিল, তাকেই চরম দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। কত যে অলৌ-কিক ঘটনা এই হীরকটিকে উপলক্ষ্য করে ঘটেছিল তার ইয়ত্তা নেই। এই কাহিনীটি সেই সকল রহস্যময় ও বিস্ময়কর বিবরণে পূর্ণ।

প্রায় দু' হাজার বৎসর পূর্বে বর্মার এক মন্দিরে অবস্থিত রাম-সীতা বিগ্রহ এমন একটি হীরকখণ্ডের দ্বারা শোভিত ছিল, যার ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণের তুলনা হয় না! কথিত আছে, অতি প্রাচীনকালে রাজকুমারী ব্রিস্‌বন এর অধিকারী হয়ে বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ পর্যন্ত এই হীরকের অলৌকিক কাহিনীগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় করা দুরূহ। কিন্তু ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে এর যে সুসংবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় এবং টাভার্নিয়ারের স্বলিখিত বিবরণ এই হীরকটির উপর যে আলোকপাত করে, তা'তে কবির সেই কথাটিই শুধু স্মৃতির মধ্যে ভেসে ওঠে—'ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে, ক'টা কেনর জবাব দেয়।' ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই হীরকটি 'হোপ ডায়মণ্ড' নামে পরিচিত।

এই হীরকখণ্ডের রোমাঞ্চকর ঘটনার পূর্ব থেকেই টাভার্নিয়ার মণিমুক্তার বিশেষজ্ঞরূপে খ্যাত ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করে নানা তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল তাঁর জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য। ফলে, পর্যটক হিসাবে তাঁর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এমনি পর্যটনের মাধ্যমে তিনি নানা দেশের নানা অদ্ভুত মণি-মাণিক্য সংগ্রহও করেছিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর খ্যাতি এতই বিস্তারলাভ করেছিল যে, সম্রাট চতুর্দশ লুই তাঁকে নিজের দরবারে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই থেকে রাজ-পরিবারের মূল্যবান রত্নসমূহ সরবরাহ করাই ছিল তাঁর কাজ।

টাভার্নিয়ারের খ্যাতি এতই ব্যাপক হয়ে পড়েছিল এবং তাঁর নামের এমনি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল যে, ভারতে তাঁর পদার্পণের সংবাদে দিল্লীর রাজপ্রাসাদে তাঁকে আমন্ত্রিত করে আনা হয়েছিল এবং বলা বাহুল্য, এখানে রাজকীয় সম্মানে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। এই সম্মানের একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, তাঁকে এমন স্থানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যেখানে ইতিপূর্বে কোন বিদেশীর যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি—তা হচ্ছে, হিমালয় প্রদেশে অবস্থিত সম্রাটের খনি-অঞ্চল। এখানে সহস্র সহস্র ক্রীতদাস অবিরাম রত্ন-আহরণের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকত।

এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে সম্রাটের সংগে একত্রে বেশ কয়েক দিনের পথ অতিক্রম করে টাভার্নিয়ার একদিন যখন ঐ খনি-অঞ্চলে উপস্থিত হলেন, তখন সেখানকার দৃশ্যে তাঁর বিস্ময়ের আর অবধি রইল না! এত বিচিত্র ও বিপুল মণি-মুক্তার একত্র সমাবেশ জীবনে আর কখনও দেখেন নি তিনি। তাছাড়া, কত বিচিত্র তাদের রঙ, কত বিভিন্ন তাদের আকার, কি বিস্ময়কর তাদের সৌন্দর্য—টাভার্নিয়ারের কাছে এ-দৃশ্য স্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। কিন্তু সম্রাটের নিকটে তিনি যখন শুনলেন যে, তাঁর অধিকৃত এই মণিময় অঞ্চলের কোন মণিই সেই মণির সমকক্ষ হতে পারে না, যার কথা তিনি জানেন, তখন টাভার্নিয়ারের বিস্ময় আরও শতগুণ বৃদ্ধি পেল।

এই মণির ইতিবৃত্ত যা সম্রাটের জানা ছিল, তা তিনি বিশদভাবে টাভার্নিয়ারের কাছে ব্যক্ত করলেন।

—"কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে—হয়ত দু'হাজার বছর পূর্ব থেকেই বর্মা দেশের এক মন্দিরে রাম-সীতার একটি যুগল-মূর্তি আছে। এই মূর্তিটির বক্ষ ও কণ্ঠদেশে বহু বিচিত্র মণি-মুক্তার সমাবেশের মধ্যে এমন একটি হীরকখণ্ড আছে যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এমনই বিস্ময়কর তার জ্যোতি—এমনই বিচিত্র তার বর্ণচ্ছটা! শোনা যায়, বর্মার রাজকুমারী ব্রিস্‌বন এটি পরিধান করে বিক্ষুব্ধ জনতার দ্বারা নিহত হন। এমন এক অজ্ঞাত শক্তি এর মধ্যে নিহিত ছিল তার জন্য রাজকুমারীকে প্রাণ-বিসর্জন দিতে হয়।"

সম্রাটের নিকট এই হীরকখণ্ডের কথা শুনে রত্নবণিকের মনে তা পাবার জন্য এমনই বাসনা জাগল যে, তিনি কিছু-দিনের মধ্যেই সেই দেশের পথে যাত্রা করলেন। পথের দুর্গমতা তাঁর লোভকে দমন করতে পারল না। অবশেষে একদিন টাভার্নিয়ার তাঁর অভিলষিত স্থানে এসে পৌঁছলেন। এখানেও তাঁর নামের খ্যাতি তাঁকে সম্মানিত অতিথিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করলে। যে মন্দিরে কখনও কোন বিদেশীর পদার্পণ ঘটেনি, সেখানে তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করলেন। ধূর্ত টাভার্নিয়ার স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মন্দিরে প্রবেশ করেই বিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাংগে প্রণিপাত করলেন। তারপর নিবিষ্টচিত্তে সমস্ত বিগ্রহটি পরীক্ষা করে দেখলেন বিচক্ষণতার সংগে। এরপর থেকে প্রতিদিন সকাল, দুপুর, রাত্রি তিনি বিগ্রহটি পরিদর্শন করার জন্য মন্দিরে যেতে লাগলেন। প্রতিবারই তিনি কিছু না কিছু অর্ঘ্য নিবেদন করতেন সেখানে। তাঁর নিকট অল্পমূল্যের যেসকল মণি-মুক্তা ছিল,

**লক্ষ্যভেদ**

বীথি সরকার

গরম গরম !

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

সেগুলিই তিনি অর্ঘ্য-স্বরূপ প্রদান করতে লাগলেন দেবতাকে। মন্দিরের যাজকেরা অতিথির এই ভক্তি ও বদান্যতায় খুবই প্রীত এবং অভিভূত হয়ে পড়লেন। এই-ভাবে চারদিন কেটে গেল।

তার পরের দিনটি ছিল ঘোর অমাবস্যার রাত্রি। মন্দিরের পাহারায় কোন রক্ষী ছিল না, তাই টাভার্নিয়ারের হাতীর দল ও তাঁর লোকজনের উপস্থিতি কারুর নজরে পড়েনি। একে অমানিশার অন্ধকার, তায় পাহারার অভাব। টাভার্নিয়ার বিনা বাধায় তাঁর উদ্দেশ্য সফল করলেন। সেইদিন রাত্রেই বিগ্রহের গললগ্ন সুদীর্ঘকালের মহামূল্য মণিটি অপহৃত হল,—চতুর রত্নলোভী বিদেশী পর্যটকের লোভের ইন্ধন হিসাবে।

পরদিন প্রত্যুষেই চুরির কথা জানাজানি হয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেল চতুর্দিকে। কিন্তু কে এই গর্হিত কাজ করতে পারে! মন্দিরের পুরোহিতদের মধ্যে এই নিয়ে ভীষণ জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত একটি সূত্র আবিষ্কৃত হ'ল। দেখা গেল, সেই রাত্রে মন্দিরের আশেপাশে যে-সব ভিখারী নিদ্রিত ছিল, তারা সব বন্ধ অবস্থায় ছটফট করছে। তাদের বন্ধন খুলে দিতে তারা বলল যে, একদল বিদেশী গত রাত্রে এখানে এসে তাদের এই অবস্থা করে গেছে। কিন্তু টাভার্নিয়ার বা তাঁর দলের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। তারা তখন তাদের উদ্দেশ্য সফল ক'রে বেমালুম নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে!

এই ঘটনায় মন্দিরের পুরোহিতরা মর্মান্তিক শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। বিগ্রহের সম্মুখে অবিরাম তাঁরা এই প্রার্থনা করতে লাগলেন, যেন দুষ্কৃতকারীদের উপর দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হয় এবং এই কৃতকর্মের ফল যেন অনিবার্যভাবেই ভোগ করতে হয় তাদের।

যত শীঘ্র সম্ভব টাভার্নিয়ার ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর এই বিজয়-অভিযান চতুর্দিকে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। সম্রাট লুই এই অভিনব অত্যাশ্চর্য হীরকখণ্ডর সংবাদ পেয়ে টাভার্নিয়ারকে তখুনি তলব করে পাঠালেন। টাভার্নিয়ারের এটি মোটেই বিক্রি করার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সম্রাট লুই এটিকে হস্তগত করার জন্য এমনই জিদ ধরলেন এবং এত বিপুল অর্থের প্রলোভন দেখালেন যে, টাভার্নিয়ার সেটিকে আর না বিক্রয় ক'রে পারলেন না। বিক্রয়ের আরও একটি কারণ হ'ল, তাঁর পুত্র ঋণের দায়ে তাঁর সমূহ সম্পত্তি বাঁধা দিয়েছিল। এই সংবাদটি পেয়ে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন এবং হীরকখণ্ডটি বিক্রয় করাই সমীচীন মনে করলেন।

সম্রাট এই হীরকটির সৌন্দর্যে এতই মুগ্ধ হলেন যে তাঁর সংগ্রহশালার অসংখ্য মণি-মুক্তার আর কোনটিই তাঁকে এতটা আনন্দ দিতে পারল না। তাঁর বেশ-ভূষার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করল এই মণিটি।

কিন্তু অচিরেই মণিটির অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পেতে লাগল। সম্রাট যাঁকেই এটি ব্যবহার করতে দিলেন, তাঁরই কোন-না-কোন রকম বিপদ ঘটতে লাগল। মাদাম দ্য ম'তেস্‌পাঁ এটি ব্যবহার করার পরই সম্রাটের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে বিরাগের পাত্রী হয়ে ওঠেন। অর্থমন্ত্রী নিকোলাস ফোঁকে এটি পরিধান করার পর সম্রাটের এমনই অপ্রিয় হয়ে ওঠেন যে, তাঁকে কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হয় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তারপর ফ্রান্সের রাজতন্ত্র বিদ্রোহের কবলে পড়ে কি-ভাবে ধ্বংস হ'ল, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেয়। এর পর কিছুকাল আর এই হীরকটির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শোনা যায়নি। শোনা যখন গেল, তখন হীরকটি নিখোঁজ। এটা হ'ল ১৭৯২ সালের কথা। তখন ফরাসী সম্রাটের মণি-মুক্তার বিরাট সংগ্রহশালাটি বিদ্রোহী সমিতির তত্ত্বাবধানে Grade Menble-এ রাখা ছিল। একদিন সন্ধান পাওয়া গেল, সেখান থেকে সঞ্চিত মণি-মুক্তা সব চুরি হয়ে গেছে।

এই দুঃসাহসিক চুরি ফ্রান্সের নব-প্রতিষ্ঠিত শাসক সমিতির মধ্যে এক বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলে। দেশে যত চোর-ডাকাত শ্রেণীর দুরাত্মা লোক ছিল, তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। তাদের মধ্যে একজন এই দুঃসাহসিক ডাকাতির ব্যাপারটি প্রকাশ করে দিলে। অপরাধীদের চরম দণ্ড-ভোগ করতে হ'ল—শুধু তাদের মধ্যে দু'জনের ফাঁসি না হয়ে কারাদণ্ড হয়েছিল এবং তারাও অতি অল্পকালের মধ্যেই জেলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু রাম-সীতা সম্পর্কীয় এই হীরকখণ্ডটির কোন হদিস পাওয়া গেল না। সেটি যে কোথায়—এ খবর কোন রকমেই প্রকাশ পেল না।

অবশ্য কিছুকাল পরে এই বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ বিশিষ্ট হীরকখণ্ডটির আবার খবর পাওয়া গেল। তখন তার ধ্বংসকারী ক্রিয়ার লীলাক্ষেত্র হ'ল—এম্যাস্টার্ডাম। ডাকাতি, চুরি, আত্মহত্যা, হত্যা সবকিছুই ঘটতে লাগল এটিকে উপলক্ষ ক'রে। কি

.....নিবিষ্ট চিত্তে সমস্ত বিগ্রহটি পরীক্ষা করে দেখলেন বিচক্ষণতার সঙ্গে।

রহস্যময় উপায়ে ফলস্ নামে এক হীরক-ব্যবসায়ীর হাতে এটি এসে পৌঁছেছিল, সে-সংবাদ কেউ জানে না। এ ব্যাপারে শুধু এটুকই প্রকাশ পেল যে, একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি এটি তাঁকে দিয়েছিল সংস্কারসাধন করার জন্য। মাসের পর মাস ফলস্ বিপুল পরিশ্রম ক'রে যেদিন সংস্কারের কাজটি শেষ ক'রে এর মালিককে ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, ঠিক সেই দিনেই তাঁর এক আঠারো বৎসর বয়স্ক পুরোমাত্রায় অসৎচরিত্র পুত্র—সেটি চুরি করে নেয়। তারপর সেটি বিক্রি ক'রে সেই লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটি যে-অর্থ পায়, তাতে তার কুকর্মগুলি বেশ কিছুদিন নির্বিঘ্নেই সমাপ্ত হয় এবং যেদিন সে সমস্ত অর্থ এইভাবে অপব্যয় করে রিক্ত হয়ে যায়,

সেদিন আত্মহত্যা ক'রে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

এক ফরাসী যুবক, নাম ফ্রান্সিস বোলিয়ে' হীরকটিকে অতি অল্প মূল্যেই ঐ লম্পট ছেলেটির কাছ থেকে কিনে নেয় এবং এই হীরক ফ্রান্সে বেচা যুক্তিযুক্ত নয় ভেবে সে লণ্ডনে যাওয়াই স্থির করে। কিন্তু লণ্ডনে যাবার মত অর্থ তার না থাকায়, সে অতি গোপনে প্যারিসের এক স্বর্ণকারকে দিয়ে এটির এক খণ্ড কেটে তার মারফতই বিক্রি করায় এবং লাভের টাকা দু'জনে ভাগ করে নেয়। বিলেতে গিয়ে সে হীরকটিকে তার পায়ের জুতোর মধ্যে লুকিয়ে রেখে নিজের জীবিকাঅর্জন করার জন্য লণ্ডনের রাস্তায় ঝাড়ুদারের কাজ করতে থাকে।

কিন্তু এই সামান্য উপার্জনে গ্রাসাচ্ছাদন চালান তার পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ায়, সে মরিয়া হয়ে হীরকটি বেচার জন্যে ডানিয়েল এলিয়াসন নামে এক ইহুদি স্বর্ণবিক্রেতার কাছে যায়। উক্ত স্বর্ণবিক্রেতা যুবকের একান্ত অনুরোধে এটা নিজের কাছে রাখতে রাজী হয় এই শর্তে যে, সে চিন্তা করে দেখবে, এটি নেবে কিনা এবং নেওয়া সাব্যস্ত হ'লে সে তাকে ভাল দামই দেবে। লোকটি মোটেই অসৎ ছিল না, সে কারণ সে এটি নেওয়া স্থির করে পরদিন যুবকের বাসায় গিয়ে দেখে, যুবক মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে—অনশনই হয়েছে তার মৃত্যুর কারণ।

এখানে বলা প্রয়োজন, ফ্রান্সের সংগ্রহশালা থেকে হীরকটি চুরি যাবার পর থেকে দু'বার এটিকে খণ্ডিত করা হয়েছিল। প্যারিসের স্বর্ণকার খুব সামান্য অংশই কেটেছিল, এবং বিখ্যাত বৃটিশ মণিকার মিঃ স্কিটার-এর নিকট বিক্রি করেছিল; এর চেয়েও বেশ বড় একটি খণ্ড ডিউক অব বার্নস্‌উইক-এর নিকট বিক্রিত হয়েছিল, আর বাকী বৃহৎ অংশটিই ইহুদি স্বর্ণবিক্রেতার হাতে এসে পড়েছিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বৃহৎ অংশটি ডানিয়েলের নিকটেই ছিল এবং সেই মিঃ থমাস হেনরী হোপকে আঠারো হাজার পাউণ্ডে এটি বিক্রি করেছিল—বিশেষজ্ঞদের মতে যার ন্যায্য মূল্য তিরিশ হাজার পাউণ্ড। এই সময় থেকে এই হীরকখণ্ডটি 'হোপ ডায়মণ্ড' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অল্পকালের মধ্যেই মিঃ হোপের মৃত্যু হওয়ায়, পরোক্ষ উত্তরাধিকারী হিসাবে এই শাপগ্রস্ত হীরকের মালিক হন লর্ড ফ্রান্সিস হোপ এবং এই সময় থেকেই হীরকটির ভৌতিক কাণ্ড অধিকতরভাবে প্রকট হয়। একটি বছর সম্পূর্ণ হতে না হতে, তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে চরম দুর্দশায় উপনীত হন। মে ইওয়ে নামে যে অভিনেত্রীকে তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেছিলেন, ১৯০২ সালে তাকে তিনি পরপুরুষাসক্ত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতঃপর হীরকটিকেও তিনি বিক্রি করে ফেলেন ঋণের দায়ে বিপর্যস্ত হয়ে।

লর্ড হোপের জীবনের দুর্গতির কাহিনী থেকেই এই অত্যাশ্চর্য হীরকের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কাহিনী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

দেখতে-দেখতে শতাধিক বর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু এই হীরকটির ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার বেগ এতটুকুও হ্রাস পায় না। ১৯০৮ সালেও সে-সব তেমনি ঘটতে থাকে যেমন একশত বৎসর পূর্বে ঘটেছিল। এবার এই হীরকটি যাঁর হাতে এসে পড়েছিল, তিনি হচ্ছেন প্রিন্স কানিটোভস্কি। ইনি ছিলেন রাশিয়ার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ধনকুবের। মাদামোয়াজেল লদ্‌নু নাম্নী এক মণ্ডাভিনেত্রীর রূপে রাজকুমার একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। আর শুধু তিনিই নন্—প্যারিসের পথেঘাটে এঁর রূপের আকর্ষণের কাহিনী সর্বজন-পরিচিত ছিল। একদিন তিনি এই অভিনেত্রীটিকে এটি ধারণ করার জন্য দেন, এবং অভিনেত্রী সেটি ধারণ করে পাদপ্রদীপের সম্মুখে আবির্ভূত হন। কণ্ঠলগ্ন মণিটির অত্যাশ্চর্য জেল্লা ও রূপসী লাদ্‌নুর দেহসৌন্দর্য—এই দুইয়ের সমন্বয়ে সেদিন মঞ্চোপরি যে মোহ সৃষ্টি হয়েছিল তার তুলনা হয় না। কিন্তু অকস্মাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে যায়। রাজকুমার দর্শকদের মধ্যে থেকে তাঁর পিস্তল বের ক'রে অভিনেত্রীর প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন—এবং একটা করুণ আর্তনাদ করে মাদামোয়াজেল লাদ্‌নু তৎক্ষণাৎ মঞ্চের উপরেই লুটিয়ে পড়েন। এই ঘটনারই দুদিন পরে, রাজকুমার প্রকাশ্য রাজপথে অজ্ঞাত আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ যখন তাঁর মণি-বিক্রেতার নিকট পৌঁছায়, তখন তিনিও মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেন—কারণ রাজকুমারের নিকট তাঁর তখনও প্রচুর অর্থ বাকী ছিল হীরকটির বিক্রয় বাবদ।

এর পর এই ভীতিপ্রদ অথচ মহামূল্য হীরকটির সন্ধান পাওয়া যায় তুরস্কে। সুলতান আবদুল হামিদ এটি এক গ্রীক মণিকারের নকট হ'তে ক্রয় করেন। যেদিন এই বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়, সেদিন এই মণি-বিক্রেতা সপরিবারে গাড়ি উল্টে অপঘাতে মারা যায়। আর এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই তুরস্কে যুব-আন্দোলনের বন্যায় সর্বত্র যে বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তাতে সুলতান শুধু সিংহাসনচ্যুতই হন না—প্রাণও হারান।

এরপর এই হীরকটি সম্বন্ধে কিছুকাল আর বিশেষ কিছু শোনা যায় না। কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাতে এর সন্ধান পাওয়া যায় এক হীরক-ব্যবসায়ীর নিকট। এই হীরক-ব্যবসায়ী মিসেস এডওয়ার্ড বি ম্যাকলিন নাম্নী এক মহিলাকে এটি বিক্রয় করেছিল। কিন্তু এটিকে উপলক্ষ করে অচিরেই মিসেস ম্যাকলিন হীরক-ব্যবসায়ীর সঙ্গে এক দীর্ঘকালব্যাপী মকদ্দমায় জড়িত হয়ে পড়েন।

এই মকদ্দমার একমাত্র কারণ হ'ল হীরক বিক্রয়ের অদ্ভুত একটি শর্ত। হীরকটির নানা বিপজ্জনক ক্রিয়াকলাপের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে শর্ত হয়েছিল যে, যে-দামে বিক্রয় সিদ্ধ আছে—মোট বাহান্ন হাজার পাউণ্ড, তা ক্রেতা দিতে বাধ্য থাকবেন, যদি হীরকটি খরিদ করার পর তাঁর কোন বিপদ না ঘটে। কিন্তু কোন বিপদ যদি ঘটে, তাহলে হীরকটি তিনি বিক্রেতাকে ফেরত দেবেন এবং বিক্রেতা উক্ত মূল্য বিনা দ্বিধায় ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু বেশী বিলম্ব হ'ল না বিপদের অপেক্ষা করতে। একদিন তাঁর এক-মাত্র পুত্র—যে তার জননীর বিপুল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী; সে পরিচারিকার নিকট হতে ছুটে পালাতে গিয়ে একটি মোটরগাড়ির চাকায় একেবারে পিষে গেল!

এই ঘটনার পর বর্তমানে এই হীরকটি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই শোনা যায়নি। কিন্তু সত্যিই কি এর রহস্যময় ভৌতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে?—ভবিষ্যৎই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম।

আজ বিজ্ঞানের এই নব নব আবিষ্কারের যুগে একটি হীরকের এই ভয়ংকর অলৌকিক শক্তির কথা মন যেন বিশ্বাস করতে চায় না—কিন্তু বিশ্বাস না করেই বা উপায় কি! কারণ, এই যে-সব কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে, এর একটিও তো কাল্পনিক বা আজগুবি নয়।

তবে?...

ফোন ঃ ৩৩-৯০৫৪

বড় বাজারের আধুনিক রুচিসম্মত

তাঁত, সিল্ক ও মিল বস্ত্রের

বিচিত্র সম্ভারে

ব্যানার্জি ব্রাদার্স

২২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

# কমপ্লিমেন্টারী

## সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অফিসে একটা হিসাব লইয়া হিমসিম খাইয়াও তার হদিশ মেলে নাই—তাঁবের কেরাণীদের ধমক দিয়া বলিয়াছেন, কাল সব মিলিয়ে দেওয়া চাই—সকালে ফার্স্ট থিং, আমাকে সব বুঝিয়ে দেবে...

এই বলিয়া নৃসিংহ বড়বাবু বাড়ী ফিরিলেন, ফিরিয়া দোতলায় উঠিলেন। উঠিবামাত্র গৃহিণী শচীবালা বলিলেন, বকবে না বলো...আজ মস্ত লোকসান করেছি!

মেজাজ এখনো ঝাঁঝে ভরিয়া আছে,—তপ্ত কড়ায় তেলের মতো। গৃহিণীর একথা...লোকসান...সে যেন তেলে বেগুন পড়িল। কর্তা বলিলেন, খেটে-খুটে আসচি বারবার বলছি, খারাপ খবর যদি কিছু থাকে জলটল খেয়ে জিরুবার পরে, একটু সইয়ে-সইয়ে বলতে হয়। তা নয়, মানুষ বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতেই একবারে দুম্-পটকা।

গৃহিণী বলিলেন, কিন্তু অবশ্য শোন না... এমন কিছু মারাত্মক—

কথা শেষ হইল না। কর্তা বলিলেন, বুঝেছি কিছু ভেঙেছো নিশ্চয়ই, না হয় নতুন বামুনটা চুরিচামারি করে চম্পট দেছে!

গৃহিণী বললেন,—না গো না, তা নয়।

কর্তা বলিলেন,—থাক! তা নয় যদি, তো যা হয়েছে, আমি শুনবো না শুনতে চাই না। ঘরে বসে দুদণ্ড নিশ্বাস ফেলবো তা কারো সহ্য হবে না! সব ভাবে অফিসে চেয়ারে বসে মজা করি, হুঃ।

কর্তা অফিসের পোশাক ছাড়িতে লাগিলেন।

গৃহিণী বলিলেন,—সব সময়ে মেজাজ যেন আগুন। কোন সময়ে সুখদুঃখের কথা বলবো, বলতে পারে?

—থাক আর বলতে হবে না। কর্তা হাঁকিয়া বলিলেন—নারান...

বেয়ারা নারান ছিল ঘরের বাহিরে। কর্তার সাড়া দোতলায় উঠিয়াছে—এখন মনিবের ডাকে তাঁর সামনে উদয় হইল।

কর্তা বলিলেন—সে প্যাকেট দিয়েছিস সতীশবাবুর বাড়ী?

সবিনয়ে নারান বলিল—আজ্ঞে।

কর্তা বলিলেন—আচ্ছা ডাকে চিঠিটিঠি কিছু এসেছে?

নারাণ বলিল,—না।

কর্তা চুপ করিলেন...ললাটে ভ্রূকুটি রেখা...তিনি গিয়া বাথরুমে ঢুকিলেন। গৃহিণী দাঁড়াইলেন ভিতর বারান্দায়।

তারপর জলখাবার। কর্তা আসিয়া লুচি তরকারী হালুয়া ভোজন করিলেন— চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

গৃহিণী বসিয়া নিঃশব্দে দেখিলেন।

চায়ের শেষে একটু আরাম। কর্তা চাহিলেন গৃহিণীর পানে; বলিলেন— কেউ এসেছিল?

গৃহিণী বলিলেন,—ও বাড়ীর মেনকাদিদি এসেছিলেন।

ও—তা তিনি এলেন কি উদ্দেশ্যে? —মেনকাদিদির দ্যাওর থিয়েটার করে.....আমি বলেছিলুম একদিন আমাদের পাশ দিন কথানা মেনকাদি দেখে আসি—কতকাল যে থিয়েটার দেখিনি।

সেই পাশ দিতে এসেছিলেন?

হ্যাঁ

দিয়ে গেছেন?

দিয়েছে।

সন্ধ্যার ফুরফুরে বাতাস...চমৎকার লাগিতেছিল।

কর্তা বলিলেন, যাবে?

গৃহিণী বলিলেন,—আজকের পাশ।

—তা বেশ তো, কে বলেছে, আজ থিয়েটার দেখবো না।

মনে প্রতিশোধের বাসনা জাগিল। গৃহিণী বলিলেন, থাকগে...আমার শখের জন্য তোমার জিরুনো শেষ হবে না।

কর্তা বলিলেন,—না, না। জিরুবার জন্য কত ঘণ্টা সময়ের দরকার? আমি খুব জিরিয়েছি। তোমার মেনকাদি মানুষটি তো

ভাল। আমি ভাবতুম যে উনি আসেন তোমার কাছে চা ধার করতে...চিনি ধার করতে।

গৃহিণীর চোখে কুটিল কটাক্ষ... বলিলেন, কবে ও তোমার চা-চিনি চেয়েছে?

কর্তা বলিলেন,—না চাইলেই ভালো তবে কিনা পাড়ার লোক—তারা যা সদ্ভাব রাখে, সে তো ঐ পাবার প্রত্যাশায়। তা যখন পাশ দিয়ে গেছে তখন তোমার যেতে আপত্তি কিসের শুনি।

—থিয়েটার সাতটায় আরম্ভ।

ও...তা, এখন বোধহয় ছটা বেজে গেছে। অফিস থেকে আসবামাত্র বলা উচিত ছিল।

গৃহিণী বলিলেন, বলতে দিলে কই? যে গোরা মেজাজ নিয়ে বাড়ী ঢুকলে, যেন

"বলতে দিলে কই? যে গোরা মেজাজ নিয়ে বাড়ী ঢুকলে, যেন বোমা"

বোমা। লোকসান শুনেই তুমি যেন মারতে এলে।

কর্তা বলিলেন,—এমন ভালো খবর ছিল, এ খবরটা বাড়ী ঢোকামাত্র দিলে না কেন?

—পাশের কথা তখন মনে ছিল না ভুলে গিয়েছিলুম।

কর্তা বলিলেন—মেয়েমানুষের এই দোষ। ভালো কথা ভুলে যাবে। আমি এত কাজ করি...অফিসের কত দায়িত্ব আমার কাছে... কিন্তু কোনদিন এতটুকু ভুল করি না। নারায়ণকে বলো এখুনি ট্যাক্সি ডেকে আনুক। ট্যাক্সি না হলে সময়ে পৌঁছুতে পারব না।

—বেশ।

গৃহিণী উঠিতেছিলেন—কর্তা বলিলেন, পাশখানা দেখি কোন্ থিয়েটারে।

গৃহিণী পাশ আনিয়া দিলেন। দেখিয়া কর্তা বলিলেন, বেশ, ট্যাক্সির জন্য নারানকে বলে দাও—আর দেরী করা নয়, তুমি তৈরী হয়ে নাও, আমি তৈরী হই।

দুজনে বেশভূষায় সাজিয়া তৈয়ারী হইলেন...নারান ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিয়াছে। ঘড়ির দিকে চাহিয়া কর্তা বলিলেন,—ইঃ পৌনে আটটা। এসো, এসো—

ট্যাক্সিতে বসিয়া ড্রাইভারকে কর্তা বলিলেন, জোরসে যাবে—ঠিক সময়ে যদি পৌঁছে দিতে পারো তাহলে চার আনা এক্স্ট্রা দেবো...মীটারের ভাড়ার উপর!

ট্যাক্সি ছুটিল...চার আনার লোভে ড্রাইভার র‍্যাশ ড্রাইভিঙের জরিমানার তোয়াক্কা রাখিল না।

থিয়েটারের সামনে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া ভাড়া এবং বকশিশ দিয়া কর্তা আসিলেন টিকিটঘরের সামনে...

পাশে সীটের নম্বর লিখিয়া ষ্ট্যাম্পের মঞ্জুরনামার জন্য। গৃহিণী আসিলেন পিছনে ...ল্যাংবোটের মতো।

কর্তা জামার পকেট হাত পুরিলেন পাশের জন্য...এ পকেট, ও পকেট.. তারপর তাঁর ভ্রূ হইল কুঞ্চিত। তিনি নিস্পন্দ...যেন নাড়ীর স্পন্দন নামিয়া গিয়াছে।

গৃহিণী বলিলেন—কি হলো?

কর্তা বলিলেন—সর্বনাশ করেছি। আসবার সময় পাশখানা টেবিলের উপরে রেখে এসেছি। ...উপায়?

গৃহিণী একেবারে এতটুকু...ভিতরে অ্যালার্ম বাজিল...পানসিগরেটের দোকান ছুঁইয়া দর্শকের ছুটোছুটি ধাক্কাধাক্কি। তাঁরা বলিতেছিলেন—এমন শেল বিশ বছরের মধ্যে হয়নি।

কর্তার বুকে যেন সাইরেন বাজিতেছে—তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই খুব ভালো শেল...

এতদূরে এসে ফিরে যাব? দুখানা টিকিট কিনে ফেলি। এসেছি যখন, কি বলো?

গৃহিণী কোনো জবাব দিলেন না...তাঁর চোখ যেন কাঁচের ভাটা।

টিকিটঘরের সামনে আসিয়া কর্তা বলিলেন,

—দুখানা টিকিট—

সঙ্গে সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিলেন।

টিকিটঘরের বাবু বলিল—আজ্ঞে, দুটাকা চার আনার সীট একটিও খালি নেই।

কর্তার মাথায় খুন চাপিল। বলিলেন—কুচ পরোয়া নেই। সাড়ে তিনটাকার টিকিট দুটো। দুখানা টিকিট, সেই সঙ্গে নগদ তিন টাকা। ফেরত লইয়া কর্তা আসিলেন গৃহিণীর কাছে। বলিলেন,—এসো.. চটপট।

দুজনে ঢুকিলেন অডিটোরিয়ামে...ড্রপ তুলিয়া শেল শুরু.. পাতলা ন্যাকড়ার গায়ে ফুল-পাতা আঁকা, তার সামনে পাখা আঁটা ত্রিশজন সখী পরী সাজিয়া নাচ-গান ধরিয়া দিয়াছে।

থিয়েটার ভাঙিলে বাড়ী...

ঘরে ঢুকিয়া কর্তা সুইচ টিপিলেন... আলো জ্বলিল না। বলিলেন,—কি হলো আবার? ফিউজ?

গৃহিণী ছিলেন পিছনে...বলিলেন, না, ঐ কথাই তো বলছিলুম, বালবগুলো কালি-ঝুল হয়েছে দেখে খুলে নিয়ে সাফ করছিলুম, দুটো গেল নষ্ট হয়ে...লোকসান নয়?

"সর্বনাশ করেছি.....উপায়?"

কর্তা বলিলেন—কি দরকার ছিল সাফ করবার? দিব্যি জ্বলছিল! ...এখন অনর্থক এই লোকসান! দুটো বাল্বের দাম এখন সোনার দামের মতো। হুঁ...খেটে রোজগার করতে হয় না তো...বুঝবে কি টাকার দাম।

গৃহিণী কোনো কথা বলিলেন না।

পরের দিন সকালবেলা।

বাহিরের ঘরে একরাশ বন্ধুবান্ধব।

কর্তা হিসাব লিখিতেছিলেন। লেখা শেষ হইলে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন—ব্যাপার কি? এত বড় নিশ্বাস?

কর্তা বলিলেন—বেশ কিছু হয়েছে! দুগ্রহ!

—তার মানে?

—মানে, ফ্রী পাশে থিয়েটার দেখা! গৃহিণীর থিয়েটার দেখবার শখ! পাশ পেয়েছিলেন! পাশ রইলো ঘরে—দুখানা টিকিটে পড়ে গেল সাত টাকা, ট্যাক্সি-ভাড়া গেল চার টাকা চার আনা! তার ওপর প্রোগ্রাম কেনা, পান, লিমনেড...বারো টাকা একদমে খরচ হয়ে গেল! হুঁ—পাশের মাথায় মারো ঝাড়ু।

রাখালদাস মল্লিক এণ্ড কোং
রেজিস্টার্ড টাটা-ইস্কো ও হিন্দুস্থান ষ্টীল ডিলার্স
• প্রসিদ্ধ লৌহ ও ইস্পাত ব্যবসায়ী
ডি/১৪, জগন্নাথ ঘাট, কলি—৭ ফোন : ৩৩-১৬৮৫ * ৬৭-২২২৫

# কলেজ স্ট্রীট

## সুধীরচন্দ্র সরকার

গত পঞ্চাশ বৎসরের (১৯১৩-৬৩) বাংলা সাহিত্যের সর্বদিকের ইতিহাস বহু বিচিত্র। নানা সাহিত্যিকের উত্থান, পুস্তক-প্রকাশনের বিচিত্র গতি—এইসব নিয়ে একটা এলোমেলো ইতিহাস লেখা যেতে পারে। একসঙ্গে বহু সাহিত্যিকের আগমন, পুস্তক-প্রকাশনের উন্মেষ, পত্র-পত্রিকার বিস্তৃতি; তারপর দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ও স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার মধ্যে, কত যে বিচিত্র কাহিনী সাহিত্য-জগতে জড়িয়ে আছে তার কোন আভাসই আজকাল পাওয়া যায় না। সেই সময়কার নাট্য-জগতের ইতিহাসকেও উপেক্ষা করা যায় না। কারণ সাহিত্য-গঠনের ইতিহাসে তাদের স্থান কম নয়। এই সময় গিরিশচন্দ্র বা অমৃতলালের প্রতিভা ম্লান হয়ে এসেছে; বাংলার থিয়েটার নূতনভাবে প্রদীপ্ত হবার আগে যেন অস্তমিত হয়ে আসছে। শিশিরকুমার প্রভৃতি নব-নাট্য প্রতিভার যুগ তখন আগতপ্রায়। কবিদের মধ্যে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন —অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। উপন্যাস ও গল্প লেখকদের মধ্যে তখন অবশ্য সর্বপ্রথমে আছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প তখন মাসিকপত্রের বিশেষ আকর্ষণীয় জিনিস ছিল। অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবীও তখন উপন্যাস-লেখিকা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর স্থান অর্জন করেছেন। তাছাড়া আছেন, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারু-বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এইসময়ে সাহিত্যের পথপ্রদর্শক হিসাবে একমাত্র 'প্রবাসীই' শ্রেষ্ঠ মাসিক ছিল। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে প্রবাসী বাংলা সাময়িক সাহিত্যের মানদণ্ডরূপে পরিগণিত হোল। এরপরে ছিল 'ভারতী' ও 'ভারতবর্ষ'। অবশ্য সমাজপতি মহাশয়ের 'সাহিত্য'ও তখন বেশ উচ্চমানে অবস্থিত।

এই সময় আমরা কয়েকজন তরুণ যুবক সাহিত্যক্ষেত্রে সবেমাত্র আনাগোনা শুরু করছি। মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা বড় সাহিত্যিক হব। এইরূপ একটা স্বপ্নময় মন নিয়ে আমরা সকলে একসঙ্গে জোট বেঁধেছি। এঁদের মধ্যে কয়েকজন তো বেশ বড় সাহিত্যিকই হয়েছেন, যেমন হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবীর), নরেন্দ্র দেব, অমল হোম চারু রায় (চিত্রশিল্পী), প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। কলেজের পড়া শেষ হয় নাই, এর মধ্যে সবাই মিলে এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হয়ে পড়লাম। তাছাড়া, প্রত্যেক সাহিত্যসভা বা আসরে যাওয়া, পত্রপত্রিকার আপিসে ঘোরাফেরা করা, বড় বড় সাহিত্যিকদের সান্নিধ্য লাভ করা নেশার মত আমাদের পেয়ে বসেছিল।

কলেজের পড়াশোনা নষ্ট করে সাহিত্যের তর্ক-বিতর্ক—আর সাহিত্যিক আড্ডায় যাওয়া আমাদের যেন সেই সময়ে একটা প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল।

১৯১৩ সালের মাঝামাঝির সময়ের কথা বলছি। একদিন দুপুরে বেলায় সুবোধ বালকের মত বই হাতে রিপণ কলেজে চলেছি। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে চলতে চলতে মোড় ফেরবার সময় রাস্তার কাছে একটা একতলা ছাপাখানা থেকে ডাক এল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় আমাকে অনুরোধ করলেন, প্রুফ দেখার কাজে তাঁকে একটু সাহায্য করতে। কয়েক ঘন্টা ধরে প্রুফ দেখে তিনি এখন ক্লান্ত। ছোট ছোট সুন্দর অক্ষরে লেখা কপি। হাতের লেখা খুব পরিষ্কার—বেশ ঝকঝকে ও তকতকে। কপি ধরা তো দূরের কথা, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই লেখা পড়ে যেতে লাগলাম। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, রেঙ্গুণের একজন অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত লেখকের লেখা গল্প—রামের সুমতি। লেখকের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেদিন আর অবশ্য কলেজ যাওয়া হোল না। পরপর তিনটি গল্প, যেমন রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে ও পথ নির্দেশ যমুনাতে প্রকাশিত হওয়ার পর শরৎচন্দ্রের খ্যাতি চারদিকে ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আমরা কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু মিলে সকলকেই এই গল্পগুলো সবাই কে পড়ে ও শুনিয়ে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা প্রচার করতে শুরু করে দিলাম। ইতিপূর্বে 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' প্রকাশিত হয়েছে। 'বিরাজ বৌ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র ধূমকেতুর মত বাংলা সাহিত্যজগতে উদয় হলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের হঠাৎ আবির্ভাব ও দ্রুত বিস্তৃতি একটা অভাবনীয় ঘটনা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎবাবু ছাড়া কোন সাহিত্যিকের এত দ্রুত সম্মানলাভ হয়েছে কিনা তা বলা যায় না। অবশ্য কয়েক বৎসর আগে বেনামীতে শরৎবাবু কিছু কিছু লিখেছিলেন বটে, যেমন 'ভারতী'তে তাঁর নামহীন 'বড়দিদি' বেরিয়েছিল, কিন্তু সোজা-সুজিভাবে হঠাৎ সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হয় যমুনায়।

যমুনাতে নিয়মিতভাবে শরৎচন্দ্রের লেখা বেরুতে আরম্ভ করল। কিছুদিন পরে 'ভারতবর্ষের' উদয় হোল। প্রাচীন বন্ধুত্বের সূত্রে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগসূত্র এই সময় স্থাপিত হোল। যমুনার হিতাকাঙ্ক্ষীরা এই কারণে একটু শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। দোটানায় পড়ে শরৎবাবু কোন-দিকে ঝিড়বেন—তাই আমাদের চিন্তার বস্তু হোল। সর্বসাধারণে ঘোষিত হয়েছিল, ভারতবর্ষ প্রকাশিত হবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সম্পাদনায়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার পূর্বেই তিনি পরলোকগমন করলেন; তাঁর পরিবর্তে সম্পাদক হলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। সেই সময় শোনা গিয়েছিল, শরৎবাবুর অসমাপ্ত অর্ধেক-লেখা উপন্যাস 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডু-লিপিটা দ্বিজেন্দ্রলালকে দেখতে দেওয়া হয়েছিল—ভারতবর্ষে যদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই উপন্যাস অনুমোদন করলেন না। এই উপন্যাস নাকি অশ্লীলতাদুষ্ট। এই অসমাপ্ত উপন্যাসটি তখন ধারাবাহিকরূপে 'যমুনায়' বেরুতে শুরু করল।

এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করার দরকার মনে করছি। সেটা হচ্ছে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। মনে পড়ে, সেটা মে কি জুন মাস; প্রখর রৌদ্র তাপের মধ্যে আমরা কয়েকজন সাহিত্যিক-বন্ধু কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের দোতলায় 'যমুনা'-আপিসে সমস্ত দরজা ও জানালা বন্ধ করে বসে আছি। নিজেদের মধ্যে তখন পরনিন্দা ও পরচর্চা চলছে, আর চলছে তেলেভাজা খাওয়া। যমুনা প্রকাশের ক্রমেই দেরী হয়ে পড়ছে, ঠিক সময় রেঙ্গুণ থেকে 'চরিত্রহীনের' কপি আসছে না। শরৎবাবু কপি পাঠাতে প্রতি মাসে দেরী করছিলেন। আমি তখন একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। এই নিয়ে তখন আমরা অনুযোগ বলছিলাম—শরৎচন্দ্র নিশ্চয় 'চরিত্রহীন', তাই চরিত্রহীনের কপি পাঠাতে এতো দেরী! অবশ্য এটা ঠাট্টাচ্ছলেই বলা। যমুনা-আপিসের প্রবেশ-দরজা কখন খুলেছে ও বন্ধ হয়েছে, আমরা কেউ টের পাইনি। একটি অপরিচিত লোক ঘরে নিঃশব্দে প্রবেশ করে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তা নজরেই আমাদের পড়েনি। নিতান্ত সাধারণ চেহারা। মাথার চুল এলোমেলো, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, পায়ে চটি, সঙ্গে একটি দেশী কুকুর। অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে এই অপরিচিত ব্যক্তি বললেন—শরৎচন্দ্র চরিত্রহীন নন, তাঁর হাতেই চরিত্রহীনের কপি —যমুনা-সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করবার জন্য

তিনি এখানে এসেছেন। এই আকস্মিকভাবে শরৎবাবুকে দেখে আমরা তো হতভম্ব ও বিস্মিত হয়ে গেলাম। আমার লজ্জারও অন্ত ছিল না। আমি যা রূঢ়কথা বলেছি, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলাম। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়ের কাহিনী। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ভালবাসা ও স্নেহ সমভাবে আমি পেয়ে এসেছি।

মধ্যের কয়েক বৎসর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার আন্তরিকতার একটু ভাটা পড়েছিল। তার দুইটি প্রধান কারণ ছিল—প্রথম কারণ, শরৎবাবুর ছয়টি বই প্রকাশ করবার পর আমি যা মনে করেছিলাম, তার মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়ে অন্যত্র চলে যায়; দ্বিতীয়ত, শরৎচন্দ্রের খ্যাতি ও সম্মান এত শীঘ্র ও দ্রুত প্রচারিত হোল, যে নূতন নূতন ভক্ত ও অনুরক্তরা তাঁর চারপাশে ভিড় করে জমে থাকতো; আমাদের কয়েকজন সর্বপ্রথম অনুরক্তরা আর স্থান পেল না।

হিন্দুস্থান মার্কেণ্টাইল
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড হেড অফিস :
১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা-১
শাখা :
২১০এ, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলি-৭
লক্ষ্মীগঞ্জ - চন্দননগর
কাণপুর, দিল্লী ও বম্বে
মূলধন ... ২ কোটি টাকা
লিখিত মূলধন ... ১ কোটি টাকা
আদায়ী মূলধন ... ৫০ লক্ষ টাকা
সকল রকম
ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়
এম এল জালান — চেয়ারম্যান
বি এস মজুমদার — প্রধান অধ্যক্ষ

এইবারে আর এক পর্বের কথা। এখন যমুনা ও ভারতবর্ষ—এই দুটো পত্রিকার মধ্যে শরৎবাবুর লেখা নিয়ে একটু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হোল। অবশ্য এই ক্ষেত্রে যমুনাকে ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎপদ হতে হোল। এই গোলযোগের মধ্যে আমিও অন্যরকমে জড়িয়ে পড়লাম। সাহিত্যিক-বন্ধুরা সকলেই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, শরৎবাবুর যে কয়টি লেখা কাগজে বেরিয়েছে, তা আমাকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে হবে। এই ব্যাপারে আমাকে কয়েকটি বাধার সম্মুখীন হতে হোল। প্রথমতঃ আমরা তো মাত্র তখন আইনের বইয়ের প্রকাশক; বাংলা বইয়ের কোন ধার ধারি না। শরৎবাবুর বই ছেপে ক্ষতিগ্রস্ত হবো কিনা তাই ভাবছি। তাছাড়া অন্য প্রকাশকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও বইগুলির উপর ছিল; এই বই সম্বন্ধে তাঁরা একরকম নিশ্চিন্তই ছিলেন। এই দুই বিভিন্ন বাধার মধ্যে আবার অন্য বাধা এলো—রেঙ্গুণে শরৎচন্দ্রের আসন্ন প্রত্যাবর্তন। নানারকম বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আমার সুযোগ এসে উপস্থিত হোল। অন্য প্রকাশকের কলিকাতায় অনুপস্থিতির সুযোগে বই প্রকাশের পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে—আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা, বিশেষ করে যমুনা-সম্পাদক এইমত প্রকাশ করলেন।

সেই সময় আমাদের কোন আত্মীয়ের গৃহে বিবাহের অনুষ্ঠান ছিল। বিবাহ ব্যাপার চুকে গেলে বিবাহের অঙ্গস্বরূপ ষ্টার থিয়েটারে একটা অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই অভিনয় দেখবার জন্য শরৎবাবুকে নিমন্ত্রণ করা হোল। রাত দুটোর সময় অভিনয়-শেষে শরৎবাবু শেষে রাত্রিটুকু আমাদের বাড়ীতেই কাটিয়ে দিলেন। ভোরবেলায় পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থা মত ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হলে শরৎবাবুর হাতে কিছু অগ্রিম টাকা দিয়ে তাঁর ছয়খানা বই—চন্দ্রনাথ, নারীর মূল্য, পরিণীতা, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল ও চরিত্রহীন প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করার বই পাওয়া গেল। অবশ্য এটা কেউ ভাববেন না যে undue influence প্রয়োগ করে আমরা এই কাজ সম্পন্ন করেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, ছয় শত টাকা দুই তিন খেপে অগ্রিম দিয়ে তারপর পুস্তক-বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয়েছিল। আজকালের দিনে শরৎবাবুর মত লেখকদের পক্ষে এই টাকা খুব সামান্য বলেই মনে হবে। সাহিত্যের বাজারে কেনা-বেচায় আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি—আজকের দিনে প্রথম শ্রেণীর লেখকদের টাকার অঙ্ক দেখলে সকলেই অবাক হয়ে যাবেন। সেই সময়ে শুনতে পেয়েছিলাম, শরৎবাবু তাঁর তিনটি বিখ্যাত গল্পের কপিরাইট নামমাত্র টাকায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। শরৎবাবু তাঁর প্রথম লেখক-জীবনে 'সিনেমা রাইট' দিয়ে গল্পের জন্য যৎসামান্য টাকা পেতেন, সকলেই এ খবর জানেন।

এই ছয়খানি বইয়ের প্রথম সংস্করণের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকাশকের হাতে এই বইগুলি চলে গেল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার সংযোগ এই-সব কারণে ক্ষীণ হলেও যোগসূত্র একেবারে ছিঁড়ে যায়নি। তাই সেই সময়ে যখন 'বসুমতী'তে তাঁর একখানা উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তখন এই বইখানা প্রকাশের জন্য তাঁকে এক হাজার টাকা অগ্রিম দেই। কিন্তু, জানি না কি কারণে এই উপন্যাসের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আমিও শরৎবাবুর কাছ হতে এই টাকা ফেরৎ পেলাম। শরৎবাবু তখন প্রতিশ্রুতি দিলেন, আর একখানা উপন্যাস প্রকাশনার ভার আমার উপর দেবেন। বেশ কিছুদিন পরে 'বঙ্গবাণী'তে শরৎবাবুর 'পথের দাবী' বেরুতে আরম্ভ করলো। পূর্ব কথামত শরৎবাবু এই বই প্রকাশ করবার ভার আমার উপর দিলেন, এবং তাঁকে আবার এক হাজার টাকা অগ্রিম দিলাম। সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে 'পথের দাবী' বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হোল। এই উপন্যাস প্রকাশের ইতিহাস অনেকেরই বোধহয় মনে আছে। একে শরৎবাবুর লেখা, তার উপর রাজনৈতিক উপন্যাস। সব্যসাচী ও ভারতীর কাহিনী সেই স্বদেশী যুগে, বোমা ও গুপ্তহত্যার যুগে, বোমার মত ফেটে পড়লো। বিদেশী সরকারের কোপ এই বইয়ের উপর একেবারেই তখন আসন্ন—এটা সকলেই অনুভব করেছিলেন। আমাকেই এই বই প্রকাশ করতে হবে—আমার মত ভীরু স্বভাব লোকের পক্ষে এই জিনিসটা ভীতি সঞ্চার করলো। বইখানা তন্ন-তন্ন করে পড়ে শরৎবাবুকে জানিয়ে দিলাম, মধ্যে মধ্যে দুই একটা লাইন বাদ দিলে বই প্রকাশ করা আমার পক্ষে সহজ হয়। শরৎবাবু আমাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন, বই থেকে একটা লাইনও তিনি বাদ দেবেন না। তখন বঙ্গবাণীর কর্তৃপক্ষরা 'পথের দাবী' প্রকাশ করলেন। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পথের দাবীর কপিগুলো বিদেশী সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিল। বইয়ের দাম ছিল ৩-৫০ টাকা কিন্তু গুপ্তভাবে এই বইয়ের কেনাবেচা চলেছিল—সতেরো-আঠারো টাকাতেও গুপ্তভাবে তখন এই বই বিক্রী হয়েছিল—তা অনেকেই জানেন। ১৯৪৭ দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে 'পথের দাবী' বাধামুক্ত হয়ে আবার প্রকাশিত হোল। শরৎবাবুর মৃত্যুর অনেক পরে। এখন আমরাই এই বইয়ের প্রকাশক।

শরৎবাবুর মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা আবার ফিরে এল। তখন দক্ষিণ কলিকাতায় বাস করি, শরৎবাবুর বাড়ীর কাছেই। একদিন রাত্রে বাড়ীতে এসে শুনতে পেলাম, শরৎবাবুর কাছ হতে কড়া তাগাদা এসেছে, তাঁর সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার। এই তাগাদা নিয়ে এসেছেন শরৎবাবুর মাতুল সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

একদিন রাত্রি নয়টার সময় শরৎবাবুর কাছে আমি হাজির। তাঁর বাড়ীর একতলার বড় ঘরটায় বড় ইজি-চেয়ারে তিনি শায়িত; পাশে আলবোলা। আমি শরৎবাবুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, আর আমার পিছনে সুরেনবাবু। কয়েক বৎসর পরে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা। তাঁর চেহারা ও শরীর দেখে আমি বিস্মিত ও অবাক হলাম। তাঁর মৃত্যুপাণ্ডুর মুখ ও অত্যন্ত শুষ্ক চেহারা দেখে আমি যেন বেশী ভীত হয়ে বলে ফেললাম—শরৎবাবু,

আপনার এ কি চেহারা হয়েছে! হঠাৎ আমার পিঠে শরৎবাবুর অলক্ষিতে বেশ বড় রকমের একটা আঘাত পড়লো। তখন সঙ্গে সঙ্গে কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে বলতে হোল—আপনার চেহারা খারাপ হয়েছে, কিন্তু দেখে শরীর ভালই মনে হচ্ছে। সুরেনবাবু পরে দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন, শরীর খুব খারাপ বললে শরৎবাবুর মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তাই আমাকে সতর্ক করে দেওয়া।

অন্য বিষয় আলোচনার পর শরৎবাবু বললেন—অপারেশনের জন্য তাঁকে নার্সিং হোমে যেতে হবে। কুমুদশঙ্কর সব ব্যবস্থা করেছে। সেইজন্য এখন কিছু অর্থ দরকার। আমার কাছে তিনি এক হাজার টাকা চাইলেন। পরের দিন আমি এই টাকা দিয়ে আসি। নার্সিং হোম থেকে ফিরে এলে তিনি আমাকে একখানা বই দেবেন বল্লেন। এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। এর মাস-খানেকের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এর পরে রাজশেখরবাবুর কথা। যে সব বড় বড় সাহিত্যিকদের সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছি, তার মধ্যে রাজশেখরবাবু একজন। তিনিও শরৎবাবুর মত অল্পসময়ের মধ্যে যে রকম সাহিত্যিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, তা দুই-একজনের ভাগ্যেই ঘটেছে। এই স্বীকৃতি শরৎবাবুর মত তিনি বেশী বয়সে পান। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে তাঁর সমস্ত পুস্তক-প্রকাশনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে আমি সাহসী হয়েছি।

১৩৩২ সালে পার্শী বাগানের 'উৎকেন্দ্রে' মধ্যে মধ্যে যাতায়াত আরম্ভ করেছি। স্বর্গত বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে প্রথমে এখানে নিয়ে যান। চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন উৎকেন্দ্রের একজন প্রধান কর্ণধার। তাঁকে দিয়ে 'মৌচাকে'র কভার ও অন্যান্য ছবি আঁকাবার উদ্দেশ্যেই আমার প্রথম ওখানে যাওয়া। গড্ডালিকার প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী' লিঃ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যজগতে বেশ একটা বিস্ময় এনে দেয়। ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেই এই গড্ডালিকার প্রকাশক হন। কোন পেশাদার প্রকাশক এই বইয়ের প্রকাশক ছিল না। গড্ডালিকার প্রথম সংস্করণ বিক্রয়ের ভার আমার উপরেই পড়ল। প্রকাশক ও গ্রন্থকারের সম্বন্ধটা যে কত মধুর ও প্রীতিপূর্ণ হতে পারে তা যাঁরা পরশুরামের কাছে এই সূত্রে এসেছেন, তাঁরা ভাল করেই জানেন। অনেক সময় প্রকাশকরা লেখক বা গ্রন্থকারদের এত নিকটে এসে পড়তে হয় যে, তাঁরা যে দৃষ্টি দিয়ে গ্রন্থকারদের দেখবার সুযোগ পান তা সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সব সময় সম্ভবপর নয়। তাই তাঁর লেখার কথা বাদ দিয়ে অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে রাজশেখরবাবু সম্বন্ধে কিছু এখানে বলবো।

রাজশেখরবাবুর লেখা পাণ্ডুলিপি যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা তাঁর নির্ভুলতা ও পরিচ্ছন্নতা দেখে বিস্মিত হবেন। আজ-কালকার দিনে গ্রন্থকার বা লেখকদের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি দেখলে মনে হয়, হাতের লেখা যে একটা রীতিমত 'আর্ট' তা আমরা একেবারেই ভুলে গেছি। রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার তো খুবই

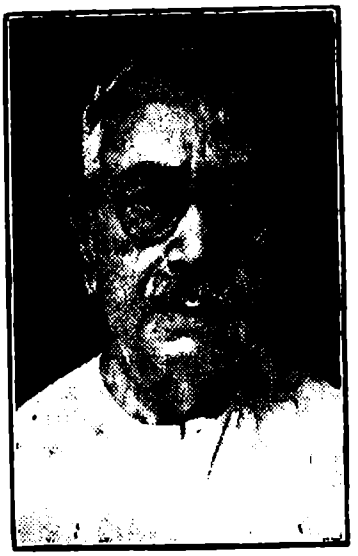

রাজশেখর বসু

ভাল। তারপর উল্লেখ করা যেতে পারে শরৎচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমার, অচিন্ত্যকুমার ইত্যাদি কয়েক জনের লেখা। রাজশেখর বসুর লেখাও পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার হিসাবে আদর্শ হাতের লেখা বলা যেতে পারে। তাঁর একখানা বইয়ের সমস্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে কাটছাঁট, পরিবর্তন, পরিবর্জন একেবারেই দেখা যায় না। হয়তো কোথাও সামান্য একটা কথা কাটতে হয়েছে, তাও আবার আমরা যেমন করে কাটি, সেভাবে নয়। সেই শব্দের উপর একটা ছোট কাগজ লাগিয়ে নূতন কথাটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক গল্পের বা পাণ্ডুলিপির শেষে লেখা আছে সমস্ত লেখার শব্দ-সংখ্যা। সমস্ত শব্দ-সংখ্যা, প্রতি লাইনের মাপ, প্রত্যেক পাতার লাইন-সংখ্যা, প্রত্যেক লাইনের শব্দের মধ্যে ফাঁকের মাপ—ইত্যাদি গুনে-গেঁথে রাজশেখরবাবু এমনভাবে নিজের কল্পিত নিখুঁত হিসাব করে দেন যে, বই ছাপতে গেলে দেখা যায়, তাঁর বই তাঁর হিসাবের চেয়ে এক চুল এদিক-ওদিক হয় নাই। এ বিষয়ে তাঁর নিজের হিসাব-প্রণালী কতটা সূক্ষ্ম ও অভিনব, তা দেখলে অবাক হতে হয়। প্রত্যেক বইয়ের মুদ্রণ-খরচ তিনি এমন চমৎকারভাবে প্রস্তুত করতেন যে, পুস্তক-প্রকাশের পরে দেখা যেত যে, অনেক সময় টাকা জানা পাই পর্যন্ত সঠিক হয়েছে। অথচ পুস্তক-মুদ্রণ ব্যাপারে যতটা ব্যয়সংক্ষেপ করা যায় সে বিষয়ে তিনি প্রকাশকদের সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করতেন। বইকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুশ্রী করবার জন্য যা দরকার তা তিনি নিজেই সব সময় চেষ্টা করতেন। অনেকেরই বোধ হয় জানা নাই, তাঁর প্রায় প্রত্যেক বইয়ের প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা তিনি নিজেই করে দিতেন, এমন কি প্রচ্ছদপটের একটা খসড়া এঁকে দিতেন। এদিকে তাঁর প্রুফ সংশোধন করা যাঁরা দেখেছেন, তাঁর পরিচ্ছন্নতা দেখে সবাই অবাক হয়েছেন। প্যারা যোগ করা নাই, এখান থেকে ওখানে লাইন টেনে আনা নাই, লাইন কেটে নূতন লাইন বসানো নাই, নানা রকম শব্দ বদলানো নাই। এমন নির্ভুল ও সুন্দরভাবে তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপি তৈরী করতেন।

রাজশেখরবাবুর জামাতা স্বর্গত অমরনাথ পালিতের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, আপনি এমন একজন গ্রন্থকারের সংস্পর্শে এলেন, যাঁর নিয়ম-অনুবর্তিতা আমাদের প্রত্যেকের আদর্শ হওয়া উচিত। তাঁর এই নিয়ম-অনুবর্তিতা ও সময়-নিষ্ঠার সম্বন্ধে অনেক কথা ও ঘটনা লেখা যায়। আমি যখন সর্বপ্রথম বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে প্রতি বৎসর সাহিত্যসমাজের অনুষ্ঠান করি, তখন এই বিষয়ে রাজশেখরবাবুর অকুণ্ঠ অনুমোদন পেয়েছিলাম। প্রতি বৎসরেই তিনি একটা না একটা প্রবন্ধ সেই সমাবেশে পাঠ করে সকলকে মুগ্ধ করতেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে হোল বাংলা সাহিত্যের একটা দিক যেন অন্ধকারে ঢেকে গেল।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি রাজশেখরবাবু এবং তাঁর মতো মহাপুরুষদের সংস্পর্শে এসে যে সব শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত লাভ করেছি সারাজীবনই তা আমাকে অনুপ্রাণিত করবে।

# হারিয়ে পাওয়ার গল্প

শেফালী চট্টোপাধ্যায়

পুজোর বাজনা বেজে উঠল আবার।

থেমে গেল কর্মরত কাশীনাথ। তার বিভ্রান্ত বিহ্বল চাহনির সঙ্গে পরিচিত কারখানার মালিক থেকে কুলী পর্যন্ত। একদিন নয়, এই দশ বছর ধরে তুহিনা ফ্যাক্টরীতে কাজ করছে সে। মাত্র এই চারদিন। ষষ্ঠী থেকে বিজয়া পর্যন্ত তার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখেন মালিক।

ষষ্ঠীর বাজনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় চলে যায় দায়িত্বপূর্ণ কাশীনাথ। সব ফেলে ছুটে যায় নিজের ঘরে।

ছোট টিনের বাক্সটা খুলে বার করে সে নতুন দুটো ছোট সিল্কের জামা, একটা বড় পুতুল, একজোড়া ছোট লাল জুতো, দুটো খেলনা। কাপড়ের কোণ দিয়ে সেগুলো পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখে পাশাপাশি। চোখ দুটোতে ভরাজল টল-টল করে তাকে ছাপিয়ে এগিয়ে আসে একটা অতীত স্মৃতি।

মিষ্টি একখানা মুখ যেন হাসছে ওর দিকে চেয়ে।

'কাশীনাথ।'

'কে, বড়বাবু?'—

বিপন্ন কাশীনাথ খোঁজে তার ওপর-ওয়ালাকে বসতে দেওয়ার একটা কিছু।

'না-না, ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। আমি এখানেই বসছি।' পাশে রাখা ছেঁড়া মাদুরটায় বসতে বসতে বড়বাবু বললেন, 'আমার একটা কথার উত্তর দেবে কাশীনাথ?'

'কি কথা বড়বাবু?'—ভয়জড়ান স্বর কাশীনাথের। 'কোনো অন্যায় করেছি?'

'না-না, অন্যায় করবে কেন?' বড়বাবু বললেন, 'আমি জানতে এসেছি, পুজোর বাজনা বেজে উঠলে তুমি এমন হয়ে যাও কেন?'

'কেন?' স্তব্ধ কাশীনাথের চোখের কোণে বড় দুফোঁটা জল কাঁপতে লাগল থরথরিয়ে। একটু বুঝি সামলে নিয়ে সে বললে, 'শুনবেন?' হঠাৎ হা-হা শব্দে হেসে উঠল কাশীনাথ। 'সবাই যে আমাকে পাগল বলে।' হাসির মধ্য দিয়ে কান্নার রূপান্তর হ'য়ে কথাগুলো বেরিয়ে এলো কাশীনাথের।

'শুনব বলেই তো এসেছি। বল বল।'

কথার মধ্যে কাশীনাথের হাতখানা কখন স্থান পেয়েছে সেই বড় পুতুলটার গায়ে। 'ঘর-সংসার সব আমার ছিল বড়বাবু'—বলতে আরম্ভ করলো কাশীনাথ। 'সেদিন কিন্তু সত্যিই আমি এমন ছিলাম না, শক্তি-সামর্থ্যে আমি ছিলাম গ্রামের সেরা। এক প্রেসে প্রুফ-রীডারের কাজ করতাম, জমি-জমাও ছিল কিছু। সংসারে বুড়ো মা আমার শক্তি-সামর্থ্যে অচল হলেন, বিয়ে দিলেন আমাকে গরীবের ঘরের এক সুন্দরী মেয়ে দেখে। আনন্দে দিশেহারা মা, শুভ-লক্ষ্মীকে বরণ করে ঘরে তুললেন যেদিন, ঠিক তার এক মাস পরে তিনি মারা গেলেন। আর সেইবারেই হল দেশ-বিভাগ। আমি শুভলক্ষ্মীকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম।'

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে কাশীনাথ বলে যেতে লাগল ঃ 'ছোট্ট একখানা ঘরে সংসার গুছিয়ে নিলে শুভলক্ষ্মী। সুগৃহিণী ছিল সে। আমি এক প্রেসে কাজ দেখে নিলাম। সারাদিনের পরিশ্রম শেষে ঘরে আসি। হাসিমুখে এসে সামনে দাঁড়ায় শুভলক্ষ্মী। সব কষ্ট ভুলে যাই আমি।... তারপর এল একটি মেয়ে।

'ঠিক মায়ের মত তার রূপ। কি টানা চোখ। ছোট্ট হাতের মুঠি দুটো দিয়ে আমার মুখ ধরে কামড়াতে যায়। তার সে কি হাসি! —বলতে বলতে হেসে ফেললো কাশীনাথ। 'সব ভুলে যাই বড়বাবু। ঐ ছোট ঘরে বসে সারা পৃথিবীর সুখ আমায় জড়িয়ে থাকে। ছুটির দিনের অপেক্ষায় থাকি সারা সপ্তাহ।

'খুকী হামাগুড়ি দিতে শিখল। শুভ-লক্ষ্মী বললে যে, ওর মুখে-ভাতে একটা ঘটা করবে। প্রেস থেকে টাকা কর্জ করলাম কিছু। নির্দিষ্ট দিনে নিমন্ত্রণ করলাম

মালিক-কর্মচারী সবাইকে। সে কি আনন্দ! ফুল-চন্দনে খুকী আমার যেন স্বর্গের দেব-কন্যা হয়ে গেছে। আর শুভলক্ষ্মী, কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

'এমনি সময়ে বড় গাড়ী করে কর্তা এলেন। আমার ডাকে খুকীকে কোলে নিয়ে শুভলক্ষ্মী এসে দাঁড়াল হাসিমুখে। ওকি? খুকীকে ত' দেখছেন না কর্তা, চেয়ে আছেন শুভলক্ষ্মীর দিকে। তাঁর হাতের হারছড়াটা ঝুলে আছে—দুলছে লকেটটা। বাবু বলে সহজভাবে ডাকতে গিয়েও বুঝি কঠিন শোনাল আমার গলাটা।

'ওঃ!'—চমকে উঠে খুকীর গলায় হারটা পরিয়ে দিয়ে সহজ হয়ে বসলেন বাবু।

'তাঁর আর আমার, মালিক-কর্মচারীর সম্পর্ক কোথায় যেন উড়ে গেল মুহূর্তে। যশোদা প্রেসের একমাত্র কর্তা সেইদিন থেকে হলেন আমার বন্ধু।

'দিন যায়। সহকর্মীরা কত টিটকারী দেয়, কান দিই না। আমার মাইনে বাড়ল। বাসা পাল্টালে হালচাল গেল বদলে। কর্তার গাড়ীতে করে সারা শহর দেখে বেড়াতে লাগল শুভলক্ষ্মী, খুকীকে নিয়ে আমি ঘরে বসে খেলা করি।

'বাবা বলে খিল খিল করে হাসে খুকী, তাকে বুকে জড়িয়ে থাকি। তার কোঁকড়া রেশমের মত চুলগুলোর ঠাণ্ডা স্পর্শে ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় আমার বুকের জ্বালা।

শুভলক্ষ্মী আর কর্তার সম্পর্কটা বড় যেন দুঃসহ হয়ে ওঠে ক্রমে। অথচ চাকরির খাতিরে সব সয়ে থাকতে হয়। দেশ নেই, ঘর নেই, চাকরি গেলে উপায় কি?

শুভলক্ষ্মী হাসে। বলে, তোমার যেমন হয়েছে অকারণ রাগ। মনে রেখো আমি তোমার বউ।'

'অনেক কথা, অনেক আদব-কায়দা তখন শিখেছে শুভলক্ষ্মী। আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'কর্তা বলেছেন আমায় সিনেমায় নামিয়ে দেবেন।'

'সিনেমায়?' চমকে উঠি আমি।

'হ্যাঁ গো', সে বলে, 'অনেক অনেক টাকা আসবে, বড়লোক হব, বাড়ী-গাড়ী সব হবে।'

'কোন কথা বলিনি, শুধু চেয়ে দেখেছি আর ভেবেছি, এই কি সেই একহাত ঘোমটা-দেওয়া শুভলক্ষ্মী? এর পর সে অনেক কথা, আর নাই-বা শুনলেন।' একটু থেমে বুঝি নিজেকে সামলে নিল কাশীনাথ। তারপর বলল, 'খুকীর বয়স হল দু' বছর। আধো আধো সুরে কত কথা বলে সে। পুজো এলো। পুজোয় কি নেবে খুকী? —জিজ্ঞাসা করলাম একদিন।'

সে বলল, 'বড় পুতুল, জামা, জুতো খেলনা.....।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, স-ব আমি এনে দেব।' হয়ত আমার কথা বুঝলে সে। অন্যদিনের মত তাই গলা জড়িয়ে আজ আর বললে না, যেতে দেব না। সহজেই ছেড়ে দিল। খুকীর ফরমাস মত জিনিস কিনতে বেরোলাম। 'বা-রে' পথে নেমে চেয়ে দেখি জানলায় দাঁড়িয়ে খুকী হাসছে। দোকানে গিয়ে খুকীর ফরমাসমত সব জিনিস কিনলাম। এক পরিচিত দোকানে সব রেখে বিপরীত দিকের এক দোকানে যাচ্ছিলাম শুভলক্ষ্মীর জন্যে একখানা শাড়ি কিনতে। চোখের সামনে দেখছি খুকী আমার হাসতে হাসতে পুতুলটা কোলে তুলে নিলে, এই-যে খেলনা, জামা—! একি! চারদিক থেকে গেল গেল রব। আমি চমকে ছিটকে পড়ে গেলাম একটা চলন্ত লরীর ধাক্কায়। তারপর আর কিছু জানি না। জ্ঞান ফিরল যখন, তখন আমি হাসপাতালের এমার্জেন্সীর বেডে। ডাক্তার-বাবু বললেন, 'আঘাত সামান্য, আর দুদিন পরেই ছুটি পাবেন।' 'দুদিন? তবে ষষ্ঠীর দিন বাড়ী যাবো? আমার খুকী যে বসে আছে পথ চেয়ে। আর শুভলক্ষ্মী না জানি কত ব্যস্ত হয়েছে। একটি নেয়ারাকে ধরে ফোন করলাম কর্তাকে। তিনি জানিয়েছেন, শুভলক্ষ্মী আর খুকীকে নিয়ে বিকেলে আসবেন।

'সারা বিকেল আমার পথ-চাওয়া সার হল, কেউ এলো না। কি জানি ওদের কি বিপদ হল। ভাবনায় ছটফট করি আমি। কোনরকমে দুটো রাত কাটিয়ে সেদিন সকাল আটটায় হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলাম, মাথায় তখনও আমার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শরীরটা বড় যেন দুর্বল। তবুও আগে গিয়ে দোকান থেকে জিনিসগুলো নিয়ে রওনা হলাম বাড়ীর পথে।

কিন্তু একি? আমি এ কোথায় এলাম? বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ। নেই শুভলক্ষ্মী, নেই খুকী।'

এতক্ষণ পরে বড়বাবু প্রশ্ন করলেন, 'তোমারই খোঁজে গিয়েছিল নাকি?'

'না বড়বাবু'—ক্ষীণভাবে হাসল কাশীনাথ। 'পাশের ঘরের এক ভাড়াটে বললে, তার ভাই এসে নাকি বাপের বাড়ী নিয়ে গেছে।'

'বাপের বাড়ী? ভাই? কই, কেউ তো নেই ওর। বিধবা মায়ের একমাত্র মেয়ে। আর সেই মা-ও মারা গেছেন কবে। তাহলে ও গেল কোথায়? প্রথম গেলাম কর্তার বাড়ী, তারপর পরিচিত, অল্প-পরিচিত সকলের বাড়ী-বাড়ী, পথে, পার্কে, স্টেশনে-স্টেশনে। পেলাম না। হারিয়ে গেল ওরা। এই কলকাতার শহরে, এই ষষ্ঠীর দিনে কোথায় হারিয়ে গেল। শুভলক্ষ্মীর জন্যে ভাবিনি বাবু, ভাবি আমার খুকীর জন্যে। বাবাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেল সে? আমার খুকী!'

পুতুলটার উপর মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠল কাশীনাথ। জামা, জুতো, খেলনাগুলো জড়িয়ে রেখেছে দুহাতে।

বড়বাবু বললেন ধীরে ধীরে, 'কাগজে দিলে না কেন?'

চোখ-ভরা জল নিয়ে মাথা তুলল কাশীনাথ। বলল, 'কাগজে আর ইচ্ছে করেই দিইনি বড়বাবু। যা' হারিয়ে গেছে, তা হারিয়েই থাক। সেই হারাবার মধ্যে দিয়েই প্রতি বছর খুঁজে পাই আমার ছোট্ট খুকীকে। সংসারের সব ছেলে-মেয়েকেই আজ আমি খুকীর মতো ভালোবাসি।'


# উপনিষদ-সংকলন

(সম্পূর্ণ নূতন ধরণে শ্লোক-সংগ্রহ)

## বিবেকানন্দশতাব্দীজয়ন্তীগ্রন্থমালা

**কেবল জয়ন্তী বৎসরের জন্য প্রতি খণ্ডের দাম এক টাকা**

**প্রথম স্তবক** প্রধান প্রধান উপনিষদ থেকে সংগৃহীত ১৯৮টি শ্লোক ও তার সরলার্থ। তৎসহ স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কয়েকটি বাণী।

**তৃতীয় স্তবক** বিভিন্ন উপনিষদ থেকে ১৮৭টি শ্লোক ও তার বাংলা সরলার্থ। তৎসহ শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কয়েকটি উপদেশ। (দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবক ঐ হিন্দী সংস্করণ)

**রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস হোম**

পোঃ বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা) থেকে প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান

**উদ্বোধন কার্যালয়**
১ উদ্বোধন লেন, কলিঃ-৩

**অদ্বৈত আশ্রম**
৫ ডিহি এণ্টালি রোড, কলিঃ-১৪

এবং কলিকাতার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

# পাগল

অনন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, বর্ণ—এরা কখনো কখনো ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে স্মরণের আবরণ উন্মোচন করে দেয়—বিস্মৃত অতীত অকস্মাৎ পরিপূর্ণ সুষমায় পরিপূর্ণ বেদনায় সামনে এসে দাঁড়ায়।

স্টীমারের বাঁশীর শব্দ শুনলে ডালহৌসীর চারতলার অফিসে বসে কপোতাক্ষর ঢলঢল ভরা নদী চোখের উপর ভেসে ওঠে—সারেঙের ঘণ্টাধ্বনি কানে আসে—খালাসীরা তক্তার সিঁড়িখানা তুলে নিচ্ছে দেখতে পাই—পাড়ের উপর তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে অনেকে—হঠাৎ.....

না, প্রথম থেকেই বলি।

সময়টা খারাপই যাচ্ছিল—লোকে বলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডিপ্রেসন চলছে। টিউশনির তোলা এবং এক সরকারী অফিসের একটা ঠিকে কাজ করতে করতে যখন যত্রতত্র দরখাস্ত ছাড়ছিলুম তখন একজায়গায় এসে ভাগ্যক্রমে নোঙ্গর ধরল। কো-অপারেটিভ ইনেস্‌পেক্টর। সবাই বললে—'সাবাস ছোকরা, এই বাজারে কাষ্ট হিন্দু হয়ে এমনি একটা চাকরী...' মুখে উৎসাহের ভাব রাখলেও মনে মনে একেবারে চুপসে গেলুম। কোলকাতার উপকণ্ঠে নিজের গ্রাম ছাড়া শহরের বাইরে তখনো যাইনি—কিন্তু আমায় যেতে হবে খুলনার এক ছোট গ্রামে—কোলকাতা থেকে ট্রেনে খুলনা—তারপর স্টীমার, একমাত্র বোটানিক্যাল বাগানে পারাপার হওয়া ছাড়া স্টীমারে আর চড়িনি। সময়ও চমৎকার—ভরা বর্ষা।

স্টেশন থেকে যখন ভাই-বন্ধু ও প্রিয়-পরিজনরা বিদায় নিলে তখনো মুখে হাসবার চেষ্টা করেছি—তারপর টালার বেতারকেন্দ্রের লাল আলো তিনটে যখন আড়ালে চলে গেল তখন দুচোখ ফেটে জল এলো—মনে হল স্বার্থান্ধ পরিবার আমাকে যেন গলাধাক্কা দিয়ে কোলকাতা থেকে বার করে দিলে।

রেল থেকে স্টীমার—স্টীমার থেকে রায়ের ঘাটে পৌঁছোলুম পরেরদিন সকাল সাড়ে এগারোটায়। বর্ষার অসোয়াস্তিকর নিরানন্দময় পরিবেশ মনটাকে আরো দমিয়ে দিল। তারপর ঘন বাঁশঝাড় ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বর্ষার কাদা ডিঙিয়ে যখন গ্রামের প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছালুম তখন চাকরী করার উৎসাহ প্রায় লোপ পেয়েছে।

ব্যাঙ্কেরই এক কর্মচারীকে প্রশ্ন করলুম—"ফেরবার স্টীমার কখন?"

—"আজ কোথায় স্টীমার?—আসার সময় দেখেননি—একটা পার হয়ে গেল—ওই, —ওই একখানা যায়, আর একখানা আসে—"

অর্থাৎ আজ যদি আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি—ধরাই যাক, যদি জোরে জ্বর আসে তাহলে কাল ১১টা পর্যন্ত ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া করবার কিছু নেই—। একটা নড়বড় টেবিলের ধারে বেত-ছেঁড়া চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়লুম।

চাকরী সংক্রান্ত মানুষগুলির সঙ্গে দু-একদিনের মধ্যে পরিচয় শেষ হয়ে গেছে। তারপর একটানা একঘেয়ে রুটিনবাঁধা কাজ। সকালে উঠে চা খেয়ে কমবাইন্ড হ্যান্ডকে সংসার খরচের টাকাপয়সা বুঝিয়ে দিই, তারপর আফিসের কাজ নিয়ে বসি—এগারটা বাজলেই স্টীমারের বাঁশী শুনব বলে উৎকর্ণ হয়ে উঠি—কোন একটা অছিলা করে স্টীমার ঘাটে গিয়ে দাঁড়াই—আপ-ডাউন দুখানা স্টীমার পার করে দিয়ে যেন একেবারে নিঃস্ব হয়ে বাসায় ফিরি—একস্ট্রা ডিপার্টমেন্টাল পোস্টমাস্টারের কাছে চিঠির জন্য লোক পাঠিয়ে চান করতে যাই।

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে খবরের কাগজ থেকে কোলকাতার ও তার আশপাশের খবর শুষে নেবার চেষ্টা করি—তারপর কাজ নিয়ে বসি। অনেকেই দেখা করতে আসেন—তাঁদের ম্যালেরিয়া-জীর্ণ চেহারা দেখে অস্বস্তি বোধ করি—তারপর এক ফাঁকে উঠে গিয়ে পোস্টাফিসের কুইনাইন সালফেটের বড়ি খেয়ে ফিরে আসি। এখানে দুজন মাত্র বিশিষ্ট বহিরাগত ভদ্রলোক—সাব-রেজিষ্ট্রার আর হাইস্কুলের হেডমাষ্টার—সাব-রেজিষ্ট্রারবাবু গানবাজনা আর থিয়েটার নিয়ে মসগুল, সেখানে পাত্তা পাওয়া শক্ত—হেডমাষ্টারমশাই-এর প্রথম দৃষ্টিতে রক্ত হিম হয়ে গেল—মনে হল আবার স্কুলজীবনে ফিরে বুঝি এলুম।

সেদিন রুটিনমাফিক ব্যাঙ্কের মিটিং-রুমে বসে খবরের কাগজখানা পড়ছিলুম এমন সময় ঠক্‌ঠক্‌ লাঠির শব্দে কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখি—এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। লাঠিটা বগলে রেখে হাত তুলে নমস্কার করছেন ঃ "নমস্কার, আপনি আমাদের নতুন ইনেস্‌পেক্টারবাবু।"

তাড়াতাড়ি প্রতিনমস্কার করে তাঁর দিকে চেয়ার বাড়িয়ে দিয়ে বসতে বললুম।

ভদ্রলোক সযত্নে লাঠিটা এক পাশে রেখে চেয়ারে বসে অল্প হেসে বললেন ঃ —"শুনলুম না কি আপনি বড় স্কলার।"

ভারী সুন্দর বৃদ্ধের চেহারা—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকটা মেলে—তেমনি সুডৌল নাক—সাদা সিল্কের মত বুক পর্যন্ত দাড়ী। সহজেই আকৃষ্ট হলুম। বললুম ঃ "আপনি ভুল শুনেছেন।"

—"আমি ভুল শুনব?"—সহসা অকারণ উচ্চহাস্যে ঘর ভরে উঠল। কয়েকদিনের নিরবচ্ছিন্ন মেঘের ফাঁক থেকে হঠাৎ সূর্যদেব দেখা দিলে আমরা যেমন উল্লসিত হয়ে উঠি—বৃদ্ধের অকারণ উচ্চহাসিতে আমি তেমনি উল্লসিত হয়ে উঠলুম।

—"যাক বাঁচলুম মশাই, এ গ্রামের লোক তাহলে হাসতে জানে।"

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বললেন —"উঁহুঁ—উঁহুঁ—একেবারেই না, একেবারে অরসিক—বেরসিকও বলতে পারেন।"

আরো কিছুক্ষণ সহজ আলাপের পর বৃদ্ধ বিদায় নিলেন—কোন স্বার্থের কথা—প্রয়োজনের কথা বললেন না,—শুধু বললেন, "মাঝে মাঝে কিন্তু আপনাকে জ্বালাতে আসব ইনেস্‌পেক্টরবাবু।"

—"আসবেন বইকি?" বাইরের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলুম।

ফিরতেই একাউনট্যান্টবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন—"কার সঙ্গে কথা বলছিলেন স্যার, ও যে পাগল।"

"পাগল!" যেন পিঠের উপর বিদ্যুৎ খেলুম।

হ্যাঁ—পাগলই। তারপর দেড় বছর বহু ভাবেই আমি তাঁকে দেখেছি—মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি আর বিবেচনা দিয়ে যেটুকু বোঝা যায়—সব মিলিয়ে আমিও গ্রামের আর সকলের সঙ্গে তাঁকে পাগল ভেবেছি।

পাগলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকুও সংগ্রহ করেছিলুম।

১৯৩০ সনের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের বন্যা যখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল তার একটা ঢেউ এসে এ গ্রামের তটেও আঘাত করেছিল। ছেলেরদল উৎসাহে বেরিয়ে পড়ল।—এই উৎসাহের ফলে কপোতাক্ষের লোনা জল থেকে কতটা নুন তৈরী হয়েছিল জানা যায়নি—কিন্তু অনেক মায়ের চোখের জল থেকে নুন ঝরেছিল এই রাজনৈতিক দুর্যোগে। বৃদ্ধের ছোট ছেলে অসীম এই সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছিল সকলের সঙ্গে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই ফিরে এসেছিল, আসেনি শুধু অসীম—কারাগারের মধ্যে যক্ষ্মা এসে তাকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছিল। আমি যখন ওখানে গিয়েছি তখন অতীত দিনের সেই সব বিস্মৃত কাহিনী নিয়ে কেউ আর রোমন্থন করে না তাস, দাবা, পাশা, গান-বাজনা, থিয়েটার, পরনিন্দা-পরচর্চা নিয়ে সবাই মহাব্যস্ত। কিন্তু সেদিনের সেই কাহিনীর মূর্ত সাক্ষী হয়ে যে লোকটি গ্রামের মধ্যে ঘুরতে লাগল—সে ওই পাগল।

পাগলকে নিয়ে ছেলেদের কৌতুকের অন্ত নেই, অনেক সময় বয়স্কদেরও। —কে তাকে একদিন বুঝিয়ে দিলে আমি নাকি মৃতদার, আমার একটিমাত্র কন্যাকে মামার বাড়ীতে রেখে মানুষ করছি।

একদিন সাবরেজিস্টারবাবুর বাসায় তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে গ্রামোফোন শুনছি এমন সময় বৃদ্ধের আবির্ভাব। বললেন : "হ্যাঁরে, তুই নাকি আমার দলে।"

বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

—"বলি, বৌটাকে ত এই বয়সেই খেয়েছিস —মেয়েটাকে কেন নিজের কাছে এনে রাখ না।"

গানটা ভাল লাগছে—কথা বাড়াতে চাই না—তাই বললুম—"আনব বইকি।" লক্ষ্য করলুম বৃদ্ধ ততক্ষণে তাঁর আপন মানসলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন—শূন্যদৃষ্টিতে ঘরের কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বলছেন : "আমারই বা কি রইল, বৌ গেল, মেয়েটা চোখের উপর শাঁখা সিঁদুর ঘুচিয়ে ফিরে এলো, অসীম....." আর কিছু স্পষ্ট শুনতে পেলুম না। তারপর কোনরকম সম্ভাষণ না করেই বিড়বিড় করে বকতে বকতে বেরিয়ে গেলেন।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনলুম বাইরের রাস্তার উপর বৃদ্ধের লাঠির শব্দ—আর "অসীম অসীম" বলে মর্মভেদী আর্তনাদ।

কত কাহিনীই বা বলব। একদিন লাঠি হাতে ঘরে চড়াও হয়ে বললেন—"তুই দাড়ী রাখিস্‌নি কেন?"

কাজ করছিলুম, তাই অন্যমনস্কভাবে বললুম—"দাড়ী আবার কি রাখব।"

"কি?—রাখবি না?" বলে উত্তেজিতভাবে লাঠি তুললেন মারবার জন্য।

লাঠিটা ধরে ফেলে বললুম—"রাখব রাখব—নিশ্চয়ই রাখব কিন্তু একদিনে ত আর গজাবে না।"

বৃদ্ধ মিটমিট্‌ করে হাসছেন। তারপর তাঁর কাপড়ের ভেতর থেকে অনেক কাগজে জড়ান একটা অমূল্য নথি বার করলেন, কোন একটা কলেজ পত্রিকার কিয়দংশ—'দাড়ীরহস্য' নামে একটি রসাত্মক বাঁকা লেখা—"এই নে পড়—"

আমি পড়তে লাগলুম—আর তিনি লাঠির উপর চিবুক রেখে মাথা দুলিয়ে তারিফ করতে লাগলেন।

কেমন করে জানি না—আমি তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন স্নেহের অংশ পেয়েছিলুম—প্রায়ই তিনি আমার কাছে আসতেন—হাতে কাজ ও মাথায় চিন্তা থাকলে কখনো কখনো যে বিরক্ত হয়নি তাও নয়—বৃদ্ধ ম্লানমুখে একটা চেয়ার দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন—তারপর লাঠিগাছা তুলে নিয়ে বিদায় নিতেন—"আর কোনদিন যদি তোকে বিরক্ত করতে আসি—তাহলে..." ক্ষমা চাইলেন হাতজোড় করে।

তাঁর বেদনাহত মুখের দিকে চেয়ে তাঁকে ফিরে ডাকবার খুব ইচ্ছে করত—কিন্তু তার দরকার হত না—কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেই ঘুরে আসতেন।

অনেক সময় গাছের কলা পেঁপে নিয়ে আসতেন—এবং আবদার ধরতেন সামনে বসে খেতে হবে। আপত্তি করলে কখনো চোখদুটো ছলছল করে উঠত—কখনো বা উগ্রমূর্তি ধরতেন।

আমার বদলির খবর এসেছে।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের মেয়েদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম—তাদের পিকনিকের ব্যবস্থা করে দোবো। তাই একদিন স্কুলের ছুটি করিয়ে ওদের উৎসবের আয়োজন করে দিলুম—সন্ধ্যাবেলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গল্প বলছি—এমন সময় পাগলের লাঠি ঠকঠকানি শোনা গেল। ছেলেমেয়েরা দৌড়ে ঘরের মধ্যে পালিয়ে গেল—আমায় বললে—"পালিয়ে এসো কাকাবাবু।"

বৃদ্ধ ততক্ষণে এসে হাজির হয়েছেন—"কি গো ইনেস্‌পেক্টর, ওপাড়া থেকে শুনে এলুম—তুমি নাকি আজ বাচ্ছাদের খুব খাইয়েছ—"

অবিশ্বাস কি বিদ্রূপ বুঝতে পারলুম না।

—"কেন, ভাল করিনি দাদু"—শেষের দিকে তাঁকে এই নামেই ডাকতুম।

—"ভাল—ভাল—খুব ভাল—" এগিয়ে এসে তাঁর হিমশীতল হাত দিয়ে আমার হাতখানা মুঠো করে ধরে বললেন—"মাইরি বলছি ভাই, আমার চেয়ে খুশী কেউ হয়নি—কিন্তু তুই নাকি চলে যাবি?"


**বক্সী ব্রাদার্স**

সর্বপ্রকার লৌহ বিক্রেতা

১৮, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলি-(৭)

ফোন : ৩৩-৭৫৮৮

**শ্যামদাস নন্দী এণ্ড সন্স**

প্রসিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ী

রেজিঃ ষ্টকিষ্ট

টাটা, ইস্কো ও হিন্দুস্থান ষ্টীল

ফোন : ৩৩-২০৭৮

ডি/২৭, জগন্নাথ ঘাট, কলিঃ-(৭)

**'রূপা'র বই**

উপন্যাস

| | |
|---|---|
| **ঢেকে আমার তৃষ্ণা**—বাণী রায় | ৬·০০ |
| **এক যে ছিল রাজা**—দীপক চৌধুরী | ৫·০০ |
| **বাতাসী বিবি**—অজিতকৃষ্ণ বসু [অ, কৃ, ব] | ৪·০০ |
| **অস্তগামী সূর্য**—ওসামু দাজাই<br>অনুবাদ : কল্পনা রায় | ৪·৫০ |
| **শেষ গ্রীষ্ম**—বরিস পাস্টেরনাক<br>অনুবাদ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ৩·০০ |
| **সোনা লিসা**—আলেকজাণ্ডার লারনেট-হলেনিয়া<br>অনুবাদ : বাণী রায় | ২·৫০ |
| **অপমানিত ও লাঞ্ছিত**—ডস্টয়েভস্কি<br>অনুবাদ : সমরেশ খাসনবিশ<br>সম্পাদনা : গোপাল হালদার | ৮·০০ |

রূপা

**রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী**

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

"বদলির চাকরী—চলে ত একদিন যেতেই হবে—" ভুল করে বুঝি দিতে গেলুম।

বৃদ্ধ গর্জে উঠলেন। হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—"কখনই না—যা দেখি কেমন করে যেতে পারিস—" বলেই হাতটা ছেড়ে দিয়ে সজোরে আমাকে দুহাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীম আলিঙ্গনের মত সেই মর্মান্তিক আলিঙ্গনে হাঁফিয়ে উঠলুম।

"—ছাড়ুন ছাড়ুন, কি ছেলেমানুষের মত করছেন—"

—"না—না, ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না—অসীম চলে গেছে, অনন্ত চলে যাবে—এ কিছুতেই হবে না—ধরে রাখব, বেঁধে রাখব—প্রেম দিয়ে বেঁধে রাখব—কি—ছু—তে—ই—ছাড়ব না।"

বৃদ্ধ আর্তচিৎকারে হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

আশ্চর্য! পাগলের কান্নায় সেদিন সুস্থ লোকের চোখে জল এসে গেল। তাঁর পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললুম—"চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি—আমি কোথাও যাব না।" বৃদ্ধকে তাঁর বাড়ীর দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলুম।

সেই রাত্রেই রাস্তার উপর বৃদ্ধের লাঠির ঠক্‌ঠক্ শুনতে পেলুম—আর সেই মর্মভেদী চিৎকার "রমা শাখা সিঁদুর ঘুচিয়ে এসেছে—অসীম চলে গেছে—অনন্তও চলে যাচ্ছে—ওরে তোরা ধরে রাখ—বেঁধে রাখ—পালালো—পালালো—" তারপরই কান্নায় তাঁর গলা ভেঙ্গে এলো—"পারলি না তোরা পারলি না—চলে গেলো, চলে গেল—দুরো দুরো—"

দু তিনবার আমার জানালার পাশে তাঁর পায়ের শব্দ পেলুম—অতি সন্তর্পণে চলার শব্দ। ফিসফিস করে বলছেন—"ঘুমোচ্ছে—ঘুমোচ্ছে—চলে গেলেই হল! প্রেম দিয়ে বেঁধে রাখব।" তারপর বিচিত্র এক হাসির শব্দ—নিরালা ঘরে সেই হাসির শব্দে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

তার পরের তিনদিন আর বৃদ্ধকে কোথাও দেখা গেল না—শুধু আশেপাশের গ্রাম থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, বৃদ্ধ নাকি একেবারে ক্ষেপে গেছেন। কার বাগান ভেঙেছেন, কার ছেলেকে ধরে খুব মেরেছেন—কাকে গালাগালি করেছেন। চতুর্থ দিনে আসার সময় তাঁদেরই পরিবারের একজনকে বললুম—"চলে যাচ্ছি, আপনাদের ব্যাপারে কথা বলা বোধ হয় শোভন নয়, তবু অনুরোধ করে যাই, শোকে তাপে ওঁর মাথাটা ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই—আপনাদের সকলের স্নেহ যত্ন পেলে ঠিক হয়ে যাবে।"

স্টীমারঘাটে গ্রামের ছোট বড় অনেকেই বিদায় দিতে এসেছেন। তাঁদের সকলের কাছ থেকে একে একে বিদায় নিচ্ছি—এমন সময় লাঠির শব্দে পিছনে ফিরে দেখলুম—"পাগল।" তাঁর সমস্ত চেহারায় এক নির্মম রুক্ষতা—কাপড় জামা জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে—ছোপ ছোপ রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। আমার দিকে তাঁর ভাষাহীন উদাস চোখ মেলে বললেন—"কি রে, পালিয়ে যাচ্ছিলি—ভেবেছিলি বুঝি আমি জানতে পারব না।" আমরা সকলেই শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। তবু কণ্ঠস্বরে অভিমান মিশিয়ে বললুম—"আজ তিনদিন ধরে আপনাকে কত খুঁজছি দাদু—আপনায় যদি দেখা পাই।"

বৃদ্ধ এক ধরনের বীভৎস হাসি হেসে বললেন—খুঁজছ,—আমি কিছু বুঝি না না—?—আমি পাগল?"

—"ছি দাদু, যাবার সময় রাগ করতে আছে কি—আমাকে আশীর্বাদ করুন।" বলে মাথাটা নিচু করলুম।

অপূর্ব মমতায় বৃদ্ধের ভাষাহীন ঘোলাটে চোখদুটো স্নিগ্ধ হয়ে এলো—বৃদ্ধ-কণ্ঠে বললেন—"তাহলে তুই সত্যিই চললি।"

"আবার আসব দাদু—"

স্টীমার এসে ঘাটে ভিড়েছে। স্টীমারে উঠে ডেক-চেয়ারটায় বসে মনে হল—প্রথম যেদিন আসি সেদিনের কথা। সেদিনের বিবর্ণ অবসন্ন গ্রামখানা ছেড়ে যেতে আজ আর ইচ্ছে করছে না, জলে চোখদুটো বারবার ঝাপসা হয়ে উঠছে। স্টীমারের বাঁশী বেজে উঠল—সারেঙ্গের ঘন্টা বাজল—তক্তার সিঁড়িখানা তুলে নিলে খালাসীরা। সবাই হাত তুলে অভিনন্দন জানালে—আমিও প্রত্যাভিনন্দন জানালুম। হঠাৎ পাগলের চিৎকারে চমকে উঠলুম। "জয় অনন্ত মহারাজকি জয়—হিফ হিফ হুররে!" তারপর স্টীমার ঘাটের তেঁতুলতলায় পা ছড়িয়ে বসে পাগল হো হো করে একটানা হাসি হাসতে লাগলেন—স্টীমারের চাকার শব্দ ডুবিয়ে সে শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত আমার কানে এসেছিল—সে কথাটা আমি আজও ভুলতে পারিনি।

the finest
SHAVING COMBINATION

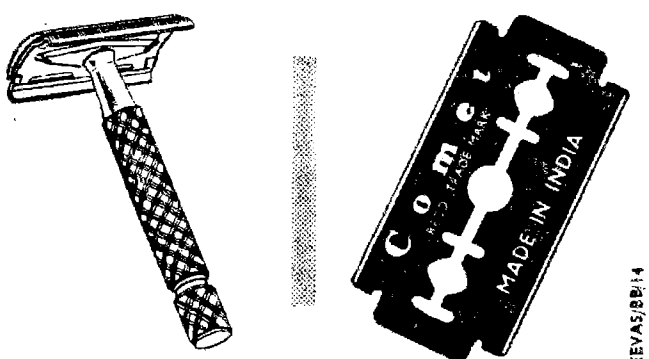


BEEYAS/BB/14

Comet
SAFETY RAZOR & BLADE
কমেট সেফটি রেজর ও কমেট ব্লেড পরিস্কার ও নিখুঁত দাড়ি কামাইবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।
বানুভাই এণ্ড ব্রাদার্স। ৮৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা-১

# ধূমপান

পশুপতি ভট্টাচার্য

আমাদের পাড়ার '—' বাবু একজন সর্বজনবিদিত ব্যক্তি। সকল রকম জনকল্যাণের কাজে তাঁকে সর্বদাই ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায়। ব্যস্তভাবে সর্বক্ষণই তিনি ঘোরাঘুরি করেন একটি চুরুট মুখে নিয়ে। তাঁর মুখে চুরুট নেই, এমন কখনই দেখা যায় না। বোধ হয় খাবার ও শোবার সময় ব্যতীত অন্য সকল সময়েই তাঁর মুখে থাকে জ্বলন্ত চুরুট, আর হাতে থাকে দেশলাই, নিভে গেলেই আবার ধরান। আমরা কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করছিলাম যে সেই '—' বাবু ক্রমশ যেন রোগা হয়ে যাচ্ছেন। একদিন দেখলাম তিনি গলায় কম্ফর্টার জড়িয়েছেন। কিছুদিন পরেই শুনলাম তাঁর গলায় ব্যথা, ক্যান্সার হাসপাতালে পরীক্ষা করে জানা গেল, তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়েছে। সেখানে তাঁকে ভর্তি করা হলো, তিন মাস যাবৎ সেখানে রেখে এক্সরে চিকিৎসা করা হলো। এখন তিনি আরোগ্য হয়ে ফিরে এসেছেন। আজকাল চুরুট আর তাঁর মুখে একবারও দেখা যায় না। কেউ প্রশ্ন করলে বলেন, ওর মতো বিষ আর দুনিয়াতে নেই। তিনি নিজে তো ওটা ছেড়েই দিয়েছেন, আর যাকেই স্মোক করতে দেখেন তাকেই বলেন, এই বিষাক্ত নেশা ছেড়ে দিতে।

বিষাক্ত, বিশেষত সিগারেট যা আজকাল সর্বজনপ্রিয়, তাই সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী। এ কথা এতই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে বর্তমানে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সিগারেট খাওয়া সাধারণ জনগণকে ছেড়ে দিতে বলা হচ্ছে, এবং এমন কি আইনের দ্বারাও নানাভাবে তা নিষিদ্ধ করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। ইংলণ্ডের ডাক্তারি রয়্যাল কলেজ থেকে সাধারণভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে "সিগারেট খাওয়া ক্যানসার রোগের একটি বিশিষ্ট হেতু"। ডেনমার্কে ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, স্কুল-কলেজে ও লাইব্রেরিতে ধূমপান করা নিষিদ্ধ, আর ষোল বছরের নিম্নবয়স্ক ছেলেদের ধূমপান করা দণ্ডনীয়। এমন কি সেখানকার সংবাদপত্রগুলিতেও সিগারেটের বিজ্ঞাপন খুব কমই প্রকাশিত হয়। আমেরিকাতেও প্রচার করা হচ্ছে যে ধূমপানের ফলে কেবল ক্যান্সারই নয়, ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষ্মা, হার্টের দোষ এবং পেটে আলসারও জন্মাতে পারে। সাধারণের মধ্যে সর্বত্রই এর অপকারিতার কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে। জগতে ধূমপানের বিরুদ্ধে অভিযান ইতিপূর্বে এমন কখনই হয়নি।

বর্তমানে সিগারেটের এমন নিন্দাপ্রচারের কারণ কি? সিগারেট সম্বন্ধে আজকাল রীতিমত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং এই সম্পর্কে নানারূপ গবেষণার কাজ বড়ো বড়ো চিকিৎসাবিজ্ঞানীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাতে অনেক কথাই নির্ভুলরূপে প্রমাণিত হয়েছে, যা সকলের পক্ষেই জেনে রাখা উচিত।

তামাকের মধ্যে যে বিষ থাকে তার নাম নিকোটিন। বিষ অর্থে এমন জিনিস যা অল্পমাত্রাতে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলে তার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে। নিকোটিনের মৃত্যুমাত্রা কতটা? পরীক্ষায় জানা গেছে যে, কেউ যদি দৈনিক এক প্যাকেট (২০টা) সিগারেট পান করে, তাহলে তার ধোঁয়া থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে মোট ৪০০ মিলিগ্রাম মাত্রার নিকোটিন নিয়ে যদি তা জলে গুলে কাউকে ইনজেকশন দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে। সিগারেট খেলে এটা ধোঁয়া হয়ে অল্পে অল্পে ফুসফুসের মধ্যে ঢোকে এবং তার কতক আবার বেরিয়ে আসে বলেই অবশ্য অতটা বিষক্রিয়া তার হতে পারে না। কিন্তু বিষ তো বটেই, অতএব তার ক্রিয়া কিছু হবেই। সেটা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় যারা নিকোটিন ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়, অর্থাৎ যারা কখনো সিগারেট খায়নি তারা প্রথম সিগারেট খেতে শুরু করলে। যারা এ বিষয়ে আনাড়ী তারা সিগারেট খেতে শুরু করলেই প্রথম প্রথম তাদের শরীরে দেখা দেবে বিবমিষা, মাথা ঘোরা, প্রচুর ঘর্মোদ্রেক, ঝাপ্‌সা দৃষ্টি ও উদরাময়ের লক্ষণ। অতঃপর সিগারেট খাওয়া অভ্যাস হয়ে এলে এগুলি তখন ক্রমশ কমে যাবে।

সিগারেট প্রভৃতির ভিতরকার তামাক পুড়ে তার থেকে যে গাঁজলা বেরোয়, যাকে বলে tobacco tar, যার হলদে দাগ লাগে হাতের আঙুলে, অ্যাশট্রেতে ও হোল্ডারে, তাও বিষাক্ত। কণ্ঠের, ফুসফুসের ও পেটের ভিতরকার ঝিল্লীগাত্রে ঐ জিনিসের ছোপ লেগে লেগে তার দ্বারাও নানা রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

সিগারেটের দ্বারা কি কি অনিষ্ট হতে পারে? তার একটি বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে, যথা—(১) হৃদস্পন্দন দ্রুত করে। (২) রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। (৩) করোনারি রোগের সৃষ্টি করে, যেহেতু করোনারি ধমনীর ভিতরকার রক্তস্রোত শ্লথ হয়ে আসে। (৪) হার্টের দোষ হয় এবং বুকে একরকম কষ্ট হয়, তাকে বলে টোব্যাকো অ্যাঞ্জাইনা। (৫) হাত-পা অপেক্ষাকৃত অসাড় হয়। (৬) পেটে অম্লবৃদ্ধি ঘটে ও তার থেকে গ্যাস্ট্রিক আলসার হতে পারে। (৭) গলায় একরূপ শুকনো খক্‌খক্‌ করা কাশি হয়, যাকে বলে স্মোকার্স কফ। (৮) গলার মধ্যে ঘা হতে পারে ও পরে ক্যান্সার হতে পারে। (৯) পুনঃ পুনঃ সর্দিকাশির আক্রমণ, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও টি-বি হতে পারে। (১০) ফুসফুসের ক্যানসার হতে পারে। (১১) অতিরিক্ত ধূমপানে এমন কি তিরিশ বৎসর বয়সেই যৌনতেজ ও প্রজনন-শক্তি হ্রাস পায়। (১২) শরীরের মধ্যে গৃহীত বি-ভিটামিন ও সি-ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়। বিশেষত ভিটামিন বি-১২ ও সি-এর অভাবে ঐরূপ ঘটে। পরীক্ষায় জানা গেছে যে একটি কমলা-লেবু খেলে যতটা সি-ভিটামিন আমরা পাই, একটি মাত্র সিগারেট খেলে তার সবটুকুই নষ্ট হয়।

ষোলো বছরের নিম্নবয়স্ক ছাত্র যারা সিগারেট খেতে অভ্যস্ত, তাদের মধ্যে অনুসন্ধান নিয়ে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই প্রায় মাথা ধরে, অনেকের মধ্যে অক্ষুধা হতে দেখা যায়, কেউ কেউ চোখে কম দেখে ও কানে কম শোনে, আর প্রায়ই তারা কাশিতে ভোগে। আর তাদের মধ্যে স্নায়ুদৌর্বল্য প্রায়ই দেখা যায়।

আলসার রোগীদের মধ্যে দেখা গেছে যে সিগারেট খাওয়া ত্যাগ করলে তাদের পেটের ব্যথা শীঘ্রই কমে যায়, আবার সিগারেট খেতে শুরু করলেই সেই ব্যথা পুনরায় দেখা দেয়। ব্লাড্‌প্রেসার রোগীদের মধ্যে দেখা গেছে যে সিগারেট ত্যাগ করলে তারা অনেকটা সুস্থ থাকে, রোগের লক্ষণগুলি অনেক কমে। আর হার্টের রোগীদের মধ্যেও সিগারেট ত্যাগ করায় যথেষ্ট সফল পাওয়া গেছে।

যেখানে এতটাই অনিষ্টের ও জীবনহানির সম্ভাবনা, সেখানে এমন জিনিস ত্যাগ করাই দরকার। জিনিসটা যে লোভনীয় আর আপাতঃ আরামপ্রদ তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কয়েক টান সিগারেটের ধোঁয়াতে শরীরটা তখনকার মতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

পাহাড়ের কোলে

ফটো : শিবানী চট্টোপাধ্যায়

সেইজন্য বিশেষত যাঁরা রীতিমত অভ্যাস করে ফেলেছেন, তাঁদের পক্ষে সিগারেট না-খেয়ে স্থির থাকতে পারা খুবই কঠিন। বলা যত সহজ করা তত নয়। যাঁরা লেখক, তাঁরা সিগারেট না টেনে লিখতেই পারবেন না, কর্মীরা এক ফাঁকে সিগারেট না টেনে কোনো কাজই করতে পারবেন না। তাঁরা বললেন সিগারেট ছাড়া বাঁচাই অসম্ভব।

কিন্তু অন্তর থেকে ইচ্ছা করলে কী না করা যায়! —বাবু এক কথায় চুরুট ত্যাগ করেছেন জন্মের মতো। আরো অনেকেরই কথা আমরা জানি যাঁরা এক কথায় সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ বা ছেড়েছেন বাজি রেখে। একজনকে জানি, তিনি হরদম সিগারেট খেতেন, সিগারেটের প্যাকেট সর্বদা তাঁর হাতে হাতে ফিরতো। একদিন এই নিয়ে তর্ক ওঠায় তাঁর বন্ধু বললে, তুই যদি সিগারেট ছাড়তে পারিস তাহলে আমি ৫০০৲ টাকা বাজি হারবো। তিনি তৎক্ষণাৎ হাত থেকে প্যাকেট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর থেকে আর কখনই সিগারেট খাননি। এমনি ঝোঁকের মাথায় অবশ্যই এ নেশা ত্যাগ করা যায়। আরো করা যায় খরচ বাড়ছে দেখে। একজনকে জানি যিনি গোল্ডফ্লেক ছাড়া কিছু খেতেন না, একদিন অন্তর এক টিন ছিল তাঁর বরাদ্দ। এই সিগারেটের দাম ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে অনেক বেড়ে গেল। একদিন তাঁর ছেলে এসে তাঁকে বললে,—বাবা, মাসে পঁচাত্তর টাকা তোমার সিগারেট খরচ হচ্ছে, এটা কি কমানো যায় না? তিনি সেদিন থেকে একেবারেই সিগারেট ত্যাগ করলেন। এবং তিনি বলেন যে সেই থেকে তাঁর স্বাস্থ্যও অনেক ভালো হয়েছে।

সিগারেট একেবারে পরিত্যাগ করতে না পারলেও তার মাত্রা কমানোর নানাবিধ উপায় আছে। অবশ্য কমাবো বললেই কমানো যায় না, দুই চারদিনের জন্য কমিয়ে দিলেও অনামনস্ক ক্রমশ আবার বেড়েই যায়। বিশেষত যাঁরা চেইন-স্মোকার, অর্থাৎ একটার থেকে অন্যটা ক্রমাগতই ধরাচ্ছেন, তাঁদের পক্ষে কমানো খুবই কঠিন। প্রত্যহ আমি চল্লিশটা খাই, তার বদলে দশটা খাবো, এমন প্রতিজ্ঞা অনেকেই রাখতে পারেন না। তার বদলে ধূমপানের একটা সময় নির্ধারণ করে নিলে তা খুবই কাজের হতে পারে। যেমন মনে করুন, আমি স্থির করলাম যে, সকালে চা-খাবার পরে একটিমাত্র সিগারেট খেয়ে তারপর বেলা বারোটা পর্যন্ত আর একটিও খাবো না; বেলা বারোটার পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেমন খুশি তেমনি খাবো, তাতে কোনো বাধা থাকবে না, কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত আর একটিও খাব না। এইভাবে সময় ভাগ করে নিয়ে চলতে থাকলে তখন দেখা যাবে যে আমি খানিকটা সময় সিগারেট না-খেয়েও কাটাতে পারছি। এতেই নিজের উপর আস্থা বাড়বে এবং ক্রমশ সময়টা বাড়িয়ে এই নেশার মাত্রা অনেক কমিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। তাছাড়া ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শরীরযন্ত্র নিকোটিনের বিষ-ক্রিয়া হতে মুক্ত থাকায় তাতেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাবে।

সিগারেট খাওয়া একেবারে ছাড়তে না পারেন, তার মাত্রাটা অন্ততপক্ষে যথেষ্ট কমিয়ে ফেলুন। তাতে অর্থেরও সাশ্রয় হবে, স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে, আর আরামও অনুভব করবেন। অনবরত সিগারেট খেতে থাকলে কি তেমন আরাম পাওয়া যায়? তার পরিবর্তে অনেক সময়ের ব্যবধানে বিশেষ প্রয়োজনের বা বিশেষ অবসরের সময় একটি সিগারেট ধরালে তাতে আরামটি ভালোভাবে উপভোগ করা যায়। সকালে বিকালে চায়ের পরে দুবার এবং আহারাদির পরে দুবার, এবং আরো কোনো বিশেষ সময়ে একবার—দৈনিক এই পাঁচবার মাত্র ধূমপান করবো, তার বেশী নয়, এ-সংকল্প অনায়াসেই করা যেতে পারে।

সিগারেটের বদলে চুরুট কিংবা বিড়ি খাওয়া ভালো, এমন কথা কেউ কেউ বলে, কিন্তু সে কথার বিশেষ মূল্য নেই। সবই তো সেই তামাক, সবের মধ্যেই রয়েছে সেই নিকোটিন। তবে আমাদের দেশে গড়গড়ায় বা হুঁকায় তামাক খাওয়ার যে রীতি আছে তা অনেকটা নিরাপদ, তামাকের ধোঁয়াটা জলের ভিতর দিয়ে ধুয়ে আসার কারণে। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা এই চমৎকার ব্যবস্থাটি তাঁদের সহজাত বোধের দ্বারাই আবিষ্কার করেছিলেন। সিগারেট ছেড়ে গড়গড়া ধরা বরং ভালো।

দোক্তা খাওয়া, জর্দা খাওয়া, নস্য নেওয়া সবই অনিষ্টকারী তাতে সন্দেহ নেই। সব-গুলির সম্বন্ধেই ঐ এক কথা, অল্পমাত্রায় ততটা অনিষ্ট না হতে পারে, কিন্তু মাত্রাধিক্য হলেই অনিষ্ট ঘটবে।

সেই কথাই আমাদের বক্তব্য। যিনি ধূমপান অভ্যাস করেছেন তাঁকে তা একেবারে পরিত্যাগ করতে আমরা বলছি না। কিন্তু মাত্রা কমিয়ে দিন, ধূমপানের কিছু অদল-বদল করুন। বাড়িতে যখন থাকেন, তখনও সিগারেট না টেনে তার বদলে হুঁকোতে বা গড়গড়াতে তামাক খান। গড়গড়াতে জল ফিরিয়ে তামাক সেজে খাওয়া হয়তো একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু ওর মধ্যে একটা খানদানী আভিজাত্য আছে। রবীন্দ্রনাথ কখনো ধূমপান করতেন না, কিন্তু তিনিও তামাক খাওয়ার আভি-জাত্য নিয়ে লিখেছেন—"এ যেন অম্বুরি তামাকের হালকা ধোঁওয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে—নিকোটিনের বাজে নেই, আছে গোলাপজলের স্নিগ্ধ গন্ধ।"

# প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

সবাক চিত্র বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-জগতের শুধু বিস্ময় নয়—বিপ্লবও উপস্থিত করলো। সে সময় বাংলাদেশে একমাত্র ম্যাডান কোম্পানি স্টুডিও ক'রে নির্বাক ছবি করত। তাছাড়া বাঙালীদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় কখনো কখনো কয়েকজনে মিলে নির্বাক ছবিও করতেন বটে কিন্তু ছবি হিসাবে সেগুলো যাই হোক না কেন, ব্যবসা হিসাবে তাদের একটাও টেকতে পারেনি। সশব্দে সবাক ছবি উপস্থিত হ'তে বাংলাদেশে সত্যিকারের চলচ্চিত্রের ব্যবসা শুরু হয়। কিন্তু এখানে আমি সেসব কথা আলোচনা করছি না।

চলচ্চিত্রশিল্পের একটা বড় দিক অভিনেতা-সংগ্রহ। আমরা সেসময়ে অভিনেতা সংগ্রহ করতুম সাধারণত রঙ্গমঞ্চ থেকে। রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয় অভিনেতাকেই প্রায়ই নায়ক করা হতো। অভিনেত্রী অবশ্য রঙ্গমঞ্চ থেকে সংগ্রহ করা হতো না, তবে রঙ্গমঞ্চ যেখান থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ করতো আমাদেরও অভিনেত্রী-সংগ্রহের চেষ্টা সেইখানেই করতে হতো। অভিনেত্রী-সংগ্রহ করবার জন্যে আমাদের লোক থাকত। তারা প্রতিদিন নানা জায়গা থেকে অনেক রকম মেয়ের সন্ধান এনে দিত; আর সন্ধ্যের পরে আমরা জনকয়েক মিলে দেখতে যেতুম। রাত্রি এগারোটা-বারোটা অবধি সেখানে ঘুরে বাড়ী ফিরতুম।

এই প্রসঙ্গে এই রকম কাজে লিপ্ত থাকাকালে কয়েকটি মেয়ের সম্পর্কে আসতে হয়েছিল। সে সব দিনের কথা মনে হওয়ায় অনেকগুলি মুখ মনশ্চক্ষুর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে; কিন্তু আপাতত তাদের অধিকাংশকেই বাদ দিতে হচ্ছে। আমি মাত্র চারটি মেয়ের কথা লিপিবদ্ধ করছি।

আগেই বলেছি মেয়েদের সন্ধান নিয়ে আসবার জন্য আমাদের লোক নিযুক্ত ছিল। একদিন একটি মেয়ের সন্ধান পেয়ে সেখানে আমরা তিন-চারজনে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

সবাক চিত্র আসার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি নতুন সমস্যা এসে জুটেছিল। এ পাড়ায় নায়িকার সন্ধান না পেলে ফিরিঙ্গি মেয়েদের জোগাড় করবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাদের দিয়ে বাঙালী মেয়ের ভূমিকা অভিনয় করানো ছিল কঠিন। মুখ-চোখ ও অঙ্গসৌষ্ঠব সাধারণত তাদের ভালোই হতো কিন্তু তারা বাঙালী মেয়েদের ঢঙে চলতে পারত না। সবাক ছবিতে ফিরিঙ্গি মেয়েদের কাজ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ এ ক্ষেত্রে শুধু ঠোঁট নাড়লেই চলবে না—কথাও বলতে হবে। শুধু কথা নয়, কণ্ঠস্বরটি মিষ্ট হওয়াও দরকার। আর গান গাইতে পারলে তো কথাই নেই; কেননা তখনকার দিনে ডায়রেক্ট গান তোলা হোত, প্লে-ব্যাক রিসর্টেমের প্রচলন হয়নি।

যাইহোক, এখন আরম্ভ করা যাক।

একদিন সন্ধান পেলুম—একটি সুশ্রী মেয়ে আছে, সে সিনেমায় নামতে রাজী। একদিন দেখতে চললুম; সঙ্গে চলল কয়েকজন বন্ধু—তারাও এই কাজেরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

আমাদের সংবাদদাতা লোকটিও সঙ্গে ছিল। ওপাড়ার একটি বাড়ীর দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের বসিয়ে রেখে লোকটি গেল তাদের ডাকতে। ঘরের আসবাবপত্র দেখে মনে হলো তারা অবস্থা-পন্ন লোক।

কিছুক্ষণ পরে একটি বর্ষীয়সী মহিলা এলেন। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকেই দরজার দিকে মুখ বাড়িয়ে বাইরে কাকে ডাকলেন—ঊষা, এদিকে আয়। এত লজ্জা তো ছবি করবি কি করে?

সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল জড়োসড়ো হয়ে। এক ঝলকেই দেখে নেওয়া গেল মেয়েটি বেশ সুশ্রী এবং লম্বা দোহারা চেহারা। মেয়ের মা বসতে বসতে আমাদের বললেন—ওর সিনেমা করবার ভারি শখ। বলে—এসব পেশায় আমার মন নেই। আমি বলি—সিনেমা করবি যদি তো কর—

এক নিঃশ্বাসে এতখানি বলে ফেলে তিনি বললেন—হ্যাঁ বাবা, শুনেছি সাংঘাতিক সাংঘাতিক আলো মুখের ওপর ফেলা হয়, তাতে চুল পুড়ে যায়, চামড়া কালো হয়ে যায়, চোখ নষ্ট হয়ে যায়—

আমরা তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে বললুম—না না, ওসব কিছুই হয় না। এসব কথা কোত্থেকে শুনলেন?

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলুম। সে সিনেমা করতে খুব রাজি—আমরা যা শেখাব, যা করতে বলব—তাই সে করবে। কথাবার্তা একরকম পাকাই হয়ে গেল। আর একদিন এসে পাওনা-কড়ির কথা ঠিক করা যাবে বলে আমরা সেদিনকার মত উঠলুম। ঊষাকে দেখে আমাদের সকলেরই পছন্দ হয়েছিল। তার মুখশ্রী সুন্দর, চোখদুটি টানাটানা, অঙ্গসৌষ্ঠবও ভালো। যদি অভিনয় ভালো করতে পারে তবে সে যে ভবিষ্যতে নাম করতে পারবে এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত হলুম। শুনলুম সে গানও গাইতে পারে। দেনাপাওনার কথাও ক্রমে ঠিক হয়ে গেল। আজকের তুলনায় তা অতি নগণ্য বললেও চলে। আজকালকার বড় অভিনেত্রীরা একটা ছবিতে একদিনে যা রোজগার করে এ তাও নয় বললেই হয়।

যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের রিহার্শ্যাল শুরু হলো। আজকের দিনে রিহার্শ্যাল জিনিসটা বোধহয় উঠেই গেছে; কারণ ভদ্রঘরের লেখাপড়া-জানা মেয়েরা এ লাইনে এসেছেন; কিন্তু তখনকার দিনে তো আর তা ছিল না। আমরা যেখান থেকে যেসব অভিনেত্রী সংগ্রহ করতুম, তাদের উচ্চারণ ছিল অত্যন্ত খারাপ। আকাশকে তারা বলতো আগাস। তাছাড়া ক'এর জায়গায় খ এবং র ও ড় এর বিপর্যয় তো ছিলই। অবশ্য ওটা এখনও আছে; আর সঙ্গগুণে বোধহয় সাথে কথার মত ওটা চলেই গেল।

যাই হোক, রিহার্শ্যাল তো শুরু হয়ে গেল। ঊষা বেশ মন দিয়েই কাজ করতে লাগল। সে গানও শিখতে লাগল। বাড়ীতে যে সময়টুকু থাকে তারই মধ্যে গলাও সাধে। যখন কাজ না থাকে তখন একলা বসে বিড়বিড় করে নিজের ভূমিকা আবৃত্তি

করে। যে সময়টা অন্য মেয়েরা আড্ডা দিয়ে কাটায় সে সময় সে নিজের ভূমিকা আবৃত্তি করে। একদিন সেইরকম করতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি হচ্ছে ঊষা?

সে বললে—নিজেকে তৈরি করছি বাবা। কোনোরকমে একবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে এ পাড়া পর্যন্ত ছেড়ে দেবো আমি—তা মা যাই বলুন।


॥ শারদোৎসবের উল্লেখযোগ্য বই ॥

মৈত্রেয়ী দেবীর

**মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ॥ ৭·৫০ ॥**

**বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ ॥ ৭·৫০ ॥**

বাণী রায়ের

**মধু জীবনীর নূতন ব্যাখ্যা ॥ ৭·০০ ॥**

পরিমল গোস্বামীর

**স্মৃতিচিত্রণ ॥ ৭·০০ ॥**

ডেল কার্নেগীর

**প্রতিপত্তি ও বন্ধু লাভ ॥ ৪·৫০ ॥**

— উপন্যাস —

**দত্তকন্যা** ধনঞ্জয় বৈরাগী ॥ ৭·০০ ॥
**এক মুঠো আকাশ** ঐ ॥ ৫·০০ ॥
**মধুরাই** (৪র্থ সং) ঐ ॥ ২·৫০ ॥
**জিম্ বোসের কাহিনী** বাণী রায় ॥ ৩·০০ ॥
**লাল সন্ধ্যা** বিভূতি গুপ্ত ॥ ৬·০০ ॥
**মনে যদি ফুটলো ফুলুম** প্রতিভা বসু ॥ ৪·৫০ ॥

— নাটক ও একাঙ্কিকা —

**এক মুঠো আকাশ** ধনঞ্জয় বৈরাগী ॥ ২·০০ ॥
**আর হবে না দেরী** ঐ ॥ ২·৫০ ॥
**এক পেয়ালা কফি** (২য় সং) ঐ ॥ ২·৫০ ॥
**ফেরারী ফৌজ** উৎপল দত্ত ॥ ২·৫০ ॥
**নতুন তারা** (একাঙ্ক) অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ॥ ৩·২৫ ॥

— গল্প —

**শ্রেষ্ঠ গল্প চারু বন্দ্যোপাধ্যায়** ॥ ৫·০০ ॥
**স্বনির্বাচিত গল্প** সজনীকান্ত দাস ॥ ৫·০০ ॥

**গ্রন্থম্** ॥ ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।


এইরকম চলেছে দু'-এক দিনের মধ্যেই স্যুটিং আরম্ভ হবে তার ব্যবস্থা হচ্ছে এমন সময় একদিন ঊষা কামাই করে বসল। সেদিন তো কেটে গেল। পরের দিনও সে এলো না দেখে আমরা তো শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। সামনেই স্যুটিং। তাকে নিয়ে কাজ আরম্ভ হবে—এমন উৎসাহী সে! অথচ এই সময়েই কামাই করে বসল! সন্ধান ক'রে জানতে পারা গেল তার জ্বর হয়েছে।

অগত্যা অন্য দৃশ্য নেবার ব্যবস্থা হলো। দৃশ্য নিয়ে কাজ আরম্ভও হয়ে গেল। চার-পাঁচ দিন সেই ঝোঁকে কেটেও গেল—কিন্তু ঊষার দেখা নেই। একদিন রাত্তিরে কয়েকজন মিলে ঊষার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখি সে বিছানায় শুয়ে আছে। এই ক'দিনের জ্বরেই অত্যন্ত কাহিল হ'য়ে পড়েছে। তার মাকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—এখনও কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। অথচ সমানে জ্বর হয়ে চলেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম—একশ' তিনের ওপরে জ্বর হবে। জ্বর দেখবার জন্য বাড়ীতে একটা থার্মোমিটারও নেই। তার মাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললুম—জ্বরটা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না, আপনি একখানি কোনো ডাক্তার ডেকে এনে দেখান।

আমাদের কথা শুনে তার মা তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। আমরা বললুম—কান্নাকাটি করে কিছু হবে না, একখানি মেয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

ঊষা সেই অবস্থাতেই আমাদের বললে—এই দু'-এক দিনের মধ্যেই জ্বরটা ছেড়ে গেলেই আমি গিয়ে পার্ট করব।

তার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা না বলে আমরা চলে এলুম।

এদিকে ছবি তোলার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ঊষার ছিল প্রধানা ভূমিকা'র পার্ট। তাকে বাদ দিয়ে আর কতদিনই বা কাজ চলে। পনেরো-বিশ দিন তার জন্যে অপেক্ষা করে থেকে আমরা আর একটি মেয়ে জোগাড় করে তাকে তালিম দিতে লাগলুম। তখনও মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা ছিল যে এর মধ্যে ঊষা যদি ভালো হয়ে ওঠে তবে তাকে দিয়েই কাজ শুরু করাবো।

আমাদের লোক হপ্তার মধ্যে দু'বার করে গিয়ে তার খোঁজ নিয়ে আসে; কিন্তু প্রতিবারই শুনি তার অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। আমরা নতুন মেয়েটিকে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলুম। কাজের চাপে কিছুকাল ঊষার সন্ধানই নিতে পারিনি। একদিন শুনলুম তাকে ইনজেকসন দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন বাদে শোনা গেল তার দু'টি চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছে

এক রাত্রে আমরা কয়েকজন তাকে দেখতে গেলুম। দেখলুম তার হাত-পা-গুলি প্যাঁকাটির মতন সরু হয়ে গিয়েছে। চোখে একজোড়া কালো চশমা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে আর সেই ঊষা বলে চেনাই যায় না। তার মা আমাদের দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। আধপাগলার মত যা তা বলতে লাগলো। মেয়ের রোগের চিকিৎসায় সে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছে তবুও তার রোগ সারছে না। ঊষা সেইরকম স্থির হ'য়ে বিছানায় পড়ে রইলো—একটা কথাও বললে না। দেখলুম চশমার ফাঁক দিয়ে গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। দৃষ্টিহীনার চোখের অশ্রু আর সহ্য করা সম্ভব হলো না। তার মাকে আশ্বাস দিয়ে এলুম সে শীগ্‌গিরই ভালো হয়ে উঠবে।

দিনকতক বাদে আমাদের লোক এসে জানালো—ঊষা মারা গিয়েছে। রাত্রিবেলা মৃত্যু কখন এসে তাকে চুপেচুপে ডেকে নিয়ে গিয়েছে—কেউ জানতেও পারেনি।

আর একটি মেয়ের কথা।

তার নাম ছিল চপলা। চপলা তো চপলাই। আমরা তাকে ডাকিনি—সে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে স্টুডিও দেখতে এসে-ছিলো। রিহার্শ্যাল দেখতে দেখতে বোধহয় তার অভিনয় করবার শখ হলো। তার বান্ধবী আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—আমার সঙ্গের ঐ মেয়েটি ছবিতে নামতে চায়।

তাকে বললুম—নামতে চাইলেই তো হবে না, অভিনয় করতে পারবে?

সে বললে—তা বলতে পারিনি, তবে চমৎকার গান গায়।

রিহার্শ্যাল হয়ে যাবার পর মেয়েটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি কি ছবিতে কাজ করতে চাও?

সে এক গাল হেসে বললে—হ্যাঁ।

বললুম—দেখ, এ কাজে ভয়ানক পরিশ্রম, দিনরাত খাটতে হয়। পারবে তুমি?

মেয়েটি সলজ্জভাবে ঘাড় নেড়ে জানালো—পারবো।

মুখ চোখ নাক তার খুব ভালো না হলেও চলনসই। প্রধানা নায়িকার ভূমিকা না হলেও অন্য পার্টে চলে যেতে পারে। মেয়েটি বেশ লম্বা, আর বেশ সপ্রতিভ। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—শুনেছি তুমি গান গাইতে পারো?

সে বললে—সামান্য।

হারমোনিয়ামটা এগিয়ে দিয়ে বললুম—একটা গান গাও দেখি।

মেয়েটি বললে—কাল এসে শোনাবো।

একসময় তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি যে ছবিতে নামতে চাও—তা তোমার মা-বাপ কি অন্য কোনো অভিভাবক রাজি

টাকপড়া, পাকাচুল ও চুল ওঠায় অব্যর্থ ফলপ্রদ

**ডাঃ নরেন আবিষ্কৃত**

**এ্যান্টি-বল্ড-হেয়ার অয়েল**

**ব্যবহার করুন**

**কিং এণ্ড কোং**

১৮/১এ, মহারাজা গান্ধী রোড, কলি ঃ—৭
৬৯, আমহার্স্ট মুখার্জী রোড, কলি ঃ—২৬
১২, ব্রাবুর্ণ স্ট্রীট, কলি ঃ—১৩

GRACE

দেয়ালে গোটা তিন-চার ব্রোমাইড ফোটো ঝুলছে। আমাকে বসিয়ে সে আর একটা ঘরে গেলো। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনলুম সে বলছে—লজ্জা কি? ডেকে নিয়ে এসে আবার লজ্জা কি?

আমার লোকটি আবার আমি যে ঘরে বসেছিলুম সেই ঘরে এসে ঢুকলো। তার পেছন পেছন আর একজনও ঢুকলো। যে ঢুকলো তার চেহারার কিছু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি।

বলাবাহুল্য যে ঢুকলো সে স্ত্রীলোক। দীর্ঘাঙ্গী, বয়স বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। টকটকে গৌর তার রঙ, মুখাবয়ব সুশ্রী। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারলুম—এ ফুল এদেশে বড়-একটা জন্মায় না। এক-খানি চক্‌চকে লাল শাড়ি সে পড়েছে—অঙ্গে ঘষা লাল রঙের কাঁচলি, বেণীবন্ধনে টকটকে লাল একটা গোলাপফুল গোঁজা। আমাকে ছোট্ট একটি নমস্কার করে আমার সামনেই বসে পড়ল। আমাকে যে লোকটি নিয়ে এসেছিলো সেই তার হয়ে বললে—ও সিনেমা করতে চায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি সিনেমায় কাজ করবে?

সে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে—হাঁ, বাবুজি।

জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি?

সে বললে—গুলাব।

—তোমরা কি মুসলমান?

—না না, আমরা হিন্দু।

আমি বললুম—এদেশে মুসলমান মেয়েদের নাম হয় গুলাব—তাই তো শুনেছি।

সে বললে—আমার নাম ছিল সরোজ। আমি যাঁর আশ্রয়ে আছি তিনি সে নাম বদলে গুলাব রেখেছেন।

আমি লক্ষ্য করেছিলুম এদেশে হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ কেউই ভালো হিন্দী বা উর্দু বলতে পারে না—উচ্চারণের কথা তো না-বলাই ভালো! কিন্তু এ মেয়েটি দেখলুম প্রায় শুদ্ধ উর্দু বলতে পারে—উচ্চারণও সুন্দর। প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—এ কার ফোটো?

সে বললে—আমার বাবার।

—আর এই দুটি?

—আমার দুই দাদার।

জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় তাঁরা?

সে বললে—কালাপানি।

—আর তোমার বাবা?

—বাবার ফাঁসি হয়ে গেছে।

মনে মনে ভাবলুম—এতো এক সিনেমা-রাজ্যে এসে পড়েছি।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি করেছিলেন তিনি?

গুলাব বলতে লাগল তারা আগে যে শহরে থাকতো সেখানে কয়েকটা কাপড়ের কল ছিল। তাছাড়া সুতোর কল চিনির কলও ছিল। এই কলে তার বাবা ও দাদারা চাকরি করতেন। তাঁরা বেশ বড় চাকুরেই ছিলেন। তাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিলো। সমাজে তারা ধনী বলেই বিবেচিত হতো। ছেলেবেলা তাদের মা মারা গিয়েছিলেন।

মার কথা বলতে বলতে গোলাপের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। সে বললে—আমি মা-বাবার একমাত্র মেয়ে ছিলুম, খুব আদরেই মানুষ হয়েছিলুম। কিছুদিন আগে এইসব কলের শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের লাগল গণ্ডগোল। বাবাকে শ্রমিকরা তাদের নেতা করে মালিকদের কাছে পাঠালো। মালিকেরা কিন্তু শ্রমিকদের কোনো কথাই শুনলো না। এইসব নিয়ে ধর্মঘট, হাঙ্গামাহুজ্জোত চলতে লাগলো। ক্রমে অন্যান্য কলের শ্রমিকেরাও একজোট হয়ে পড়লো। পুলিশ গুলি চালালে। শেষকালে একদিন শ্রমিকেরা চিনির কলের দুতিন জন সাহেবকে হত্যা করল। মিলিটারি এলো। তারা শ্রমিকদের গোলমাল ঠাণ্ডা করে দিলে। সন্ধ্যাবেলায় পুলিশে আমার বাবা ও ভায়েদের ধরে নিয়ে গেল। বিচারে বাবা, দুই ভাই ও আরো কয়েকজনের ফাঁসির হুকুম হলো। বোম্বাইয়ে আপীল করে আমার দাদারা ফাঁসি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে দণ্ডিত হলো। কিন্তু বাবা ও আরো দুজনের ফাঁসির হুকুম বহাল রইলো। আমার বয়স তখন চোদ্দ-পনেরো বছর। আত্মীয়স্বজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা ভয়ে আমাদের দিকে এগোলেন না। আমি এখন যে লোকের আশ্রয়ে আছি সে ছিল আমার দাদাদের বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই এরা আমাদের বাড়ীতে আসতো। এদের পরিবার ছিলো নামজাদা ধনী পরিবার।

গুলাব একটু থামলো। তারপর চোখ মুছে বলতে লাগলো—প্রথম প্রথম এ আমার ওপর বেশ ভদ্র ব্যবহার করতো; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্বরূপমূর্তি প্রকাশ হলো। দুর্দান্ত মাতাল—তার ওপর নিয়মিত ভাবে আমাকে নির্দয়ভাবে প্রতিদিনই প্রহার করতো। দিনরাত সন্দেহ পাছে আমি অন্য-লোকের কাছে চলে যাই। শেষপর্যন্ত সন্দেহের জ্বালায় সেখান থেকে নিয়ে এসে এইখানে রেখে দিয়েছে। আর ঐ যে ঝিটা—ও সমস্ত খবর ওকে দেয়। আজকাল ও সপ্তাহের মধ্যে দুদিন কি তিনদিন আসে, আর আমায় মারধোর করে। আপনি আপনাদের স্টুডিওতে আমার একটা কাজ ঠিক করে দেবেন? আর—

এই অবধি বলে গুলাব থামলো। আমি বললুম—আর কি?

এবার সে বেশ স্পষ্ট করেই বললে—আর এই লোকটির কবল থেকে আমি উদ্ধার পেতে চাই। আপনি আমায় আশ্রয় দিন।

আমি বললুম—দেখ, স্টুডিওতে চেষ্টা-চরিত্র করে একটা কাজ হয়তো জোগাড় করে দিতে পারি কিন্তু আমি তোমায় আশ্রয় কি ক'রে দেবো? আমি যে নিজেই আশ্রয়হীন। দুদিনের জন্যে এখানে এসেছি, এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার আমায় উড়তে হবে অন্য কোনো আশ্রয়ের সন্ধানে।

মেয়েটি কোনো কথা না বলে ঘাড় নিচু করে রইলো। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললুম—ভালো করে যদি অভিনয় করা শিখতে পারো তাহলে তুমিই আমাকে আশ্রয় দিতে পারো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি একটা কিছু হয়েই যাক।

পরের দিন স্টুডিওতে গিয়ে কর্তাদের কাছে গুলাবের কথা বললাম। তাঁরা তেমন-ভাবে কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। তিন-চার দিন এমনি কেটে গেল। এদিকে রোজই গুলাব খবর চেয়ে পাঠায়—আমার কি হলো?

শেষকালে একদিন তাকে নিয়ে স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলুম। ব্যস্—যেমনি তাকে দেখে কর্তারা তখুনি মাইনে ঠিক করে ফেললেন। একটা ছবিতে সে পার্ট পর্যন্ত পেয়ে গেল। কর্তাদের অনেকেই তার পেছু পেছু ঘুরতে লাগলেন। যাই হোক, সামলে-সুমলে আমি তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনলুম এবং অনন্যমনা হ'য়ে কাজ করতে উপদেশ দিলুম।

কিন্তু দুদিন না যেতে যেতেই শুনলুম—তার সেই রক্ষক লোকজন নিয়ে এসে মার-ধোর ক'রে তাকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানে না।

এবার আর-একটি মেয়ের কথা বলে বক্তব্য শেষ করবো।

সন্ধান পাওয়া গেলো—বৌবাজার অঞ্চলে একটি মেয়ে এসেছে—সবেমাত্র বাড়ী থেকে পালানো। অতীব সুন্দরী, হয়তো চেষ্টা করলে তাকে ছবিতে নামানো যেতে পারে।

সন্ধান নিয়ে একদিন আমরা তিন বন্ধুতে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলুম। খোঁজ ক'রে তার ঘরে গিয়ে দেখলুম—মেয়েটি মেজেতে বসে আছে। আমরা যেতেই সে উঠে এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে—কাকে খুঁজছেন?

—আমরা আপনাকেই খুঁজছি।

অতি ভদ্র ও বিনীতভাবে সে বললে—আসুন।

ঘরের মধ্যে কোনো আসবাবপত্র নেই। মেজেতে একটি মাদুর বিছোনো। একধারে চাবুস্-এর একটা মাঝারি গোছের সিন্দুক

সেকাল ও একালের ছন্দ নিয়ম ও কবিতার নাম জানতে হলে পাঠ করুন।

**ছন্দসূত্র প্রবেশিকা**

প্রথম খণ্ড ১·৫০, অম্বিকা দাস

ছাপ্পান্ন প্রকার বিভিন্ন ছন্দের মূল প্রকৃতি বিশ্লেষণে ও প্রসিদ্ধ কবিদের কাব্য হ'তে প্রচুর উদাহরণ সমন্বয়ে কবিতা, লেখা ও শেখার বই। প্রাপ্তিস্থান—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণ-ওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাণীমন্দির, ২৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও হাওড়া, বার্তা কার্যালয়, ৩৭৪, জি, টি রোড (নর্থ), সালিখা, হাওড়া।

ঝক্‌ঝক্‌ করছে! তখনকার দিনেও সে সিল্কটার দাম অন্তত পাঁচশ' টাকা।

মেয়েটির আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখলুম —প্রায় কনুই অবধি গয়নায় ঢাকা। ওপর হাতেও বেশ মোটা দু'গাছি অনন্ত, গলায় মোটা নেকলেস। সাধারণত এসব মেয়েরা এতো গয়না পরে থাকে না।

মেয়েটির চেহারা লম্বা, দোহারা গড়ন, রঙ উজ্জ্বল গৌর। প্রথম দৃষ্টিতে তেমন বোঝা যায় না কিন্তু দেখতে দেখতে বোঝা যায় সে রীতিমত সুন্দরী।

আমাদের সামনে এসেই সে বসলো। তার কথাবার্তার মধ্যে পূর্ববঙ্গের টান রয়েছে এবং চ-বর্গটি একেবারে বিকৃত। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি নতুন বেরিয়ে এসেছ?

সে বললে—ঠিক নতুন নয়, প্রায় বছর খানেক হ'তে চলল।

—কোন দেশে তোমার বাড়ী?

সে বললে—আমার বাড়ী পূর্ববঙ্গে। কিন্তু এই পর্যন্ত জেনেই খুশী থাকুন কারণ কোন জায়গায় দেশ বা বাপের নাম কি—এসব জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর পাবেন না।

দেখলুম মেয়েটি বেশ সরল। একটুখানি আলাপের পরেই আমাদের সঙ্গে বেশ সরল-ভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলুম—এ জীবন কেমন লাগছে?

সে হেসে উঠল। বললে—এ জীবনের জন্যে তো বেরিয়ে আসিনি। তবে এ রকম ব্যাপারে সব ক্ষেত্রেই যা হয় আমার বেলাতেও তাই-ই হয়েছে। আমাকে যে বার করে নিয়ে এসেছিল কিছুদিন পরে সে পলায়ন করেছে। এখন প্রতিদিন মৃত্যু হচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি সিনেমা করবে?

সে বললে—সিনেমা কি আমার দ্বারা হবে?

তারপর একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে —এই জীবন থেকে বাঁচবার জন্যে আমি সব কিছু করতে রাজি আছি।

আমি বললুম—তাহ'লে তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, আমি তোমাকে এ জীবন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবো।

সে হেসে বললে—বলেন কি? এই বাড়ীর বাড়ীওয়ালা যে একজন নামজাদা গুণ্ডা এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোক। তারা সর্বদা আমাকে চোখে চোখে রেখেছে। মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন অত্যাচার করে যে পাঁচ-সাত দিন আর উঠতে পারি না।

আমি বললুম—তুমি যদি এই পঙ্ক থেকে উদ্ধার পেতে চাও—তাহলে ওসব গুণ্ডাফুণ্ডা—সব ঠিক করে দেবো। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।

সে সময় বাংলাদেশে Women's Protection League নামে একটি সংস্থা ছিল। নারীহরণ, নারীধর্ষণ এবং নারীদের উপর নানান অত্যাচার তখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারীদের খুঁজে দুর্বৃত্তদের কবল থেকে উদ্ধার করা এবং অপরাধীদের সাজা দেওয়া ছিল এই সংস্থার প্রধান কাজ। বাংলাদেশের —বিশেষ করে কলকাতার অনেক প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তি এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সংস্থার কর্মীরা ছিলেন অবৈতনিক। দু'চারজন অতিদরিদ্র অথচ উৎসাহী কর্মী-যুবক শুধু সামান্য কিছু বেতন পেতেন। আমার পিতা ছিলেন এই সংস্থার অর্গানাইজিং সেক্রেটারি অর্থাৎ সংঘটন-সম্পাদক। তিনি মফস্বলে কখনো ফকির, কখনো দরবেশ, কখনো সাধু, কখনো বা ব্রাহ্মণ ভিখারী—এইসব ছদ্মবেশে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। ঘুরে ঘুরে অপহৃতা নারীদের সন্ধান করতেন এবং দুর্বৃত্তদের ধরে এনে সাজা দেবার ব্যবস্থা করতেন। ব্যবহারজীবীরাও বিনা পয়সায় এই সংস্থার হয়ে কাজ করতেন। পুলিশ ছিলো এদের হাতধরা। আমার পিতাকে হত্যা করবার শাসানি দিয়ে অনেক চিঠি আসতো। এমনকি তাঁকে সাবধান করাবার জন্যে আমাদের কাছেও চিঠি আসতো। আমার ভরসা ছিল—তাঁর কানে একবার এই মেয়েটির কথা তুলে দিলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু অভিনেত্রীর সন্ধানে হাড়কাটা গলিতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছি—একথা বাবাকে বলবার সাহস আমার ছিল না। আমাদের বাড়ীতে বাবার দু'টি-তিনটি চেলা থাকতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে মফস্বলে যেতো। তাদের মধ্যে একজনকে আমি এই মেয়েটির কথা বললুম এবং এ বিষয়ে বাবাকেও জানাতে বললুম।

দিন দু'য়েক বাদে লোকটি বাবাকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে এসে বললে—ঐ মেয়েটি পূর্ববঙ্গের কোনো শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। বিবাহের পরেও সে ধনী পিতৃগৃহে বাস করছিলো। এই ফাঁকে আর একটি যুবকের সঙ্গে তার প্রণয় জন্মায়। সেই যুবকটি তাকে ফুসলিয়ে বার করে নিয়ে যায়। কন্যার পিতা Women's Protection League-এ খবর দেওয়ায় এরা খোঁজ করে কলকাতাতেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে এ মেয়েটি হাকিমকে বলে যে সে স্বেচ্ছায় উক্ত যুবকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। এরপরে আদালতে কিংবা League-এর কিছুই করবার নেই।

লোকটি এই সঙ্গে আমায় জানিয়ে দিলে—মেয়েটি দেখতে যাই হোক আসলে সে অত্যন্ত বদমাইস। আপনাকে কর্তা জানাতে বলেছেন যে আপনি কোনোক্রমে ওর ত্রিসীমানায় যাবেন না।

এরপরে আমার আর কি করবার আছে! আমি ও-সম্বন্ধে আর কিছুই করিনি।

মাস তিনেক বাদে বৌবাজার অঞ্চলে এক জায়গায় নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম। ফিরতি মুখে একবার সেই মেয়েটির সন্ধান নিয়ে জানলুম—যে মাসখানেক আগে কে বা কারা তাকে হত্যা করে তার সমস্ত গহনা নিয়ে চলে গিয়েছে।

এরপর এ বিষয়ে আর আমি কোনো সন্ধান করিনি।


**এ, পি-র কতকগুলি ভাল ভাল বই**

**উপন্যাস:—**

বিমল কর ॥ **কেরাণীপাড়ার কাব্য** ॥ ৬·০০

গুণময় মান্না ॥ **জুনাপুর স্টীল** ॥

[দুই খণ্ডে] পূর্বখণ্ড ১০·০০

উত্তর খণ্ড ৯·০০

নিহাররঞ্জন গুপ্ত

॥ **রাণী সংবাদ** ॥ ৩·৫০

দীপক চৌধুরী ॥ **মনের মধ্যে জন** ॥

৫·০০

অবধূত ॥ **মিঠু গন্ধক মূর্ছনা** ॥ ৪·০০

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ **প্রতিবিম্ব** ॥ ২·০০

অতিন বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ **সমুদ্র পাখির কান্না** ॥ ৩·০০

বিজনকৃষ্ণ রায় ॥ **মৃগতৃষ্ণা** ॥ ২·৫০

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস:—

রামপদ মুখোপাধ্যায়

॥ **প্রথম পদক্ষেপ** ॥ ৩·৫০

ছোটদের কয়েকটি ভাল ভাল বই—

মৌমাছি ॥ **কড়ের পালক** ॥ ৩·০০

বুদ্ধদেব বসু ॥

**জ্ঞান থেকে অজ্ঞান** ॥ ১·৬০

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোঃ ॥

**আবিষ্কারের কথা** ॥ ১·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **নিশুতিপুরী** ॥ ১·৬০

প্রবোধকুমার সান্যাল ॥

**রঙিন রূপকথা** ॥ ১·৬০

প্রসূন পাল ॥ **গল্প বলি শোন** ॥ ১·৫০

**এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স**

এ-৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিঃ-১২



বেনারসী, শাল, আলোয়ান, গেঞ্জি, মোজা, সোয়েটার, সার্টিং, সুটিং, সর্বপ্রকার বস্ত্র ও পোষাকের জন্য

**রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল**

**প্রাইভেট লিমিটেড**

বড়বাজার ঃঃ কলিকাতা ঃঃ ফোন: ৩৩-২৩০৩

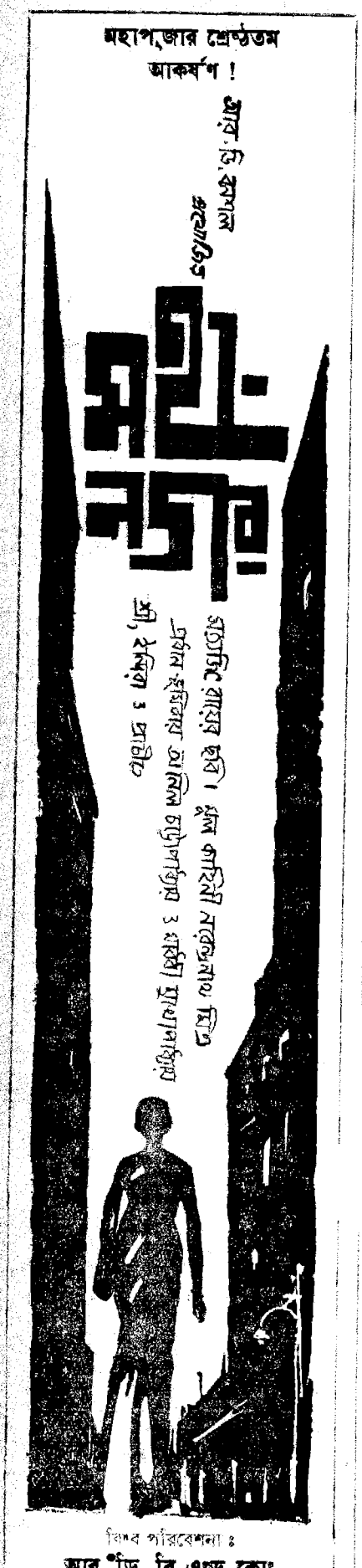



# আগামী দিনের বাঙলা ছবি

**নির্মলকুমার ঘোষ** (এন-কে-জি)

গত তিরিশ বছর ধরে বাংলা সবাক্ ছবি তৈরী হয়ে আসছে। নির্বাক ছবি হিসেবে ধরলে বাংলা ছবির বয়স আরো বেশী। কিন্তু বাংলা ছবি দীর্ঘকাল ধরে কোন্ পথ বেয়ে, কোন্ পথ ছেড়ে কোন্ পথে নতুন পা ফেলে ক্রমান্বয়ে চলেছে, ভবিষ্যতেই বা কোন্ পথের সন্ধান করবে বলে অনুমান করা যায়?

এই আলোচনা সম্যকভাবে করতে গেলে নির্বাক ছবিকে বাদ দিয়ে সবাক্ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করাই সুবিধে। কারণ তার মুখে ভাষা আসবার পরই বাংলা ছবি ঠিক, পরিপূর্ণভাবে চিত্রনাটকের গণ্ডীর মধ্যে উপনীত হল বলে মনে হল। নির্বাক যুগের ছবিকে শুধু সচল ভাবের মূক অভিব্যক্তি হিসেবেই দর্শক গ্রহণ করতো। তার বাক্‌হীনতার জন্য কেমন যেন একটা অর্ধ-স্ফুট ও অসম্পূর্ণ বোধ হত সেই যুগের ছবিকে। যেদিন তার ভাবের ও ভাষার সংযোগ মণিকাঞ্চন ঘটালো সেদিন এই অব্যক্ততার ত্রুটি তার কেটে গেল। একই সঙ্গে ছবি ও ভাষার সুষ্ঠু মিলন দেখে ও শুনে সত্যিকারের রস নিবিড় করে উপভোগ করবার সুযোগ এল। মঞ্চনাটক দেখে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যাচ্ছিল সবাক্ চিত্রে সেই আনন্দ ও তৃপ্তির স্বাদও নতুনতর আকারের ও পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যেতে লাগলো। সবাক্ চিত্র এলো মঞ্চের প্রভাব নিয়ে, তারই নতুন প্রতিযোগীর রূপ নিয়ে।

কিন্তু বাংলা দেশে (যেমন আমেরিকা ও ইংলন্ডেও) মঞ্চের আকর্ষণ এই নতুন আবির্ভাবের যুগেও এমন গভীর ও প্রবল ছিল যে, মঞ্চকে সবাক্ চিত্র ঠিক পুরোপুরি আঘাত করতে পারল না। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চ শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধিকানন্দ, দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু, নরেশ মিত্র, চারুশীলা, কৃষ্ণভামিনী, নীহারবালা প্রভৃতি শক্তিমান ও শক্তিময়ী নটনটীর আবির্ভাবে ধন্য হয়েছিল। বাংলার দর্শকসমাজ মঞ্চের ওপর এঁদের অপরূপ অভিনয়-সৌষ্ঠব থেকে মুখ ফিরিয়ে নতুন একটা আঙ্গিকে নতুন বিনোদনমাধ্যমের দিকে একান্তরূপে মন দিতে যেন রাজী হল না। সেটা ছিল সীতা, কর্ণার্জুন, আলমগীর, চিরকুমার সভার যুগ। বাংলার মঞ্চাভিনেতা-অভিনেত্রীরা অসামান্য নাট্যকুশলতা দিয়ে দর্শকচিত্তকে তখন ভরিয়ে তুলেছিল। বাঙালী দর্শকসমাজ তাই এদিকে যে অন্য একটা নতুন কলাবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল তার দিকে তেমন একটা সোৎসাহ দৃষ্টি দিল না।

কিন্তু মঞ্চের যে গৌরবময় যুগ স্বর্ণরেখায় দেখা দিয়েছিল শিশিরকুমারের অবিসংবাদী নেতৃত্বে তার জন্য চলচ্চিত্র গতি-হীন, রুদ্ধপ্রয়াস হয়ে পড়ে থাকলো না। চলচ্চিত্রেও সৃজনী প্রতিভার নেতৃত্বের প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। নির্বাক যুগের ছবির প্রথম প্রয়াসের কুহেলীটা কেটে এসেছিল এই সময়। প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত চিত্র-পরিচালকেরা তখন সবাক্ চিত্র তুলতে আরম্ভ করেছিলেন। নিউ থিয়েটার্স ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছিল। সেখানে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নীতীন বসু, দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রভৃতি যোগ দিয়েছিলেন। ঠিক এই সময়ের পূর্বেই মূক ছবি "অপরাধীতে" বড়ুয়ারই প্রযোজনায় দেবকী বসু পরিচালনায় এমন একটা সরস নবীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন যে, বাংলার রসিকসমাজ বুঝলেন, সিনেমাও এক অভিনব রস-শিল্প। সুন্দর ও সার্থকভাবে সেও ভিন্ন পথে শিল্পের গঙ্গায় অবগাহন করতে পারে। প্রয়োজন হল তাই চিন্তাশীল ও চিত্র-কলাকুশলী পরিচালকের। দু'একজন যাঁরা এলেন, তাঁদের দিয়েই নিউ থিয়েটার্সের প্রথম যুগে কয়েকখানি মোটামুটি উপভোগ্য ছবি তৈরী করা হল। কিন্তু সত্যিকারের ভাল ছবি বলতে কি বোঝায় তার পরিচয় তখনও পাওয়া হয়নি।

এই আনন্দলোকের পরিচয় পাওয়া গেল দেবকী বসু ও প্রমথেশ বড়ুয়ার দুখানি ছবির মধ্য দিয়ে। "চন্ডীদাস" ও "দেবদাস" এই দুখানা ছবি। বাংলা ছবি আজ যে জগৎ-সভায় আসন লাভ করেছে সে উৎকর্ষের বীজ খুঁজতে হলে ইতিহাসের চশমা পরে এই দুখানা ছবির মধ্যেই দৃষ্টি ফেরাতে হবে। এই দুখানা ছবি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী প্রকাশের দিক দিয়ে আনল নতুন এক শিল্পসৌন্দর্যের দ্যোতনা। চন্ডীদাসে দেবকীবাবু নরনারীর প্রেমের অন্তরের রূপকে এমন এক কাব্যিক মাধুর্য দিয়ে অভিব্যক্তি দিলেন যে, দর্শক-সমাজের মনে সেটা এক অশ্রুতপূর্ব রসের স্বর্গ রচনা করল।

দেবদাস ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমাণ করলেন যে, চলচ্চিত্র তার স্বকীয় রূপ ও রসের সাহায্যে এমন একটি নাট্যমাধ্যম হতে পারে যার মধ্যে জীবনের পরম সত্য-গুলি প্রেমের গূঢ়তম সুরটি সহজভাবে রূপায়িত হতে পারে। এদিক দিয়ে বিচার

করলে 'দেবদাস' একখানি চিরন্তন ছবি। অত সুদীর্ঘ অতীতের আবহে মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যথাকে এমন এক চির-নূতন রূপ কেমন করে দিয়েছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। "চন্ডীদাস" বা "দেবদাস" শুধু ছবি নয়, এই দুটি ছবি বাংলা চলচ্চিত্রের ছবির যুগনির্দেশক। এই দুখানি ছবির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার চলচ্চিত্রের কুণ্ঠিত কৈশোরের সমাপ্তি হল। এর পর বাংলা ছবি যৌবনের সজীবতা ও লাবণ্য নিয়ে নতুন পথযাত্রা শুরু করলো। অতীতের অস্পষ্টতা, আড়ষ্টতা ও অস্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়ে উঠে বাংলা ছবি হ'ল সৃষ্টি-উন্মুখ। আত্মনিশ্চিত একটি নতুন সৃষ্টির পুলকে সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

এর পরবর্তী পঁচিশ বছরের একটানা গতিচ্ছন্দকে ঠিক বলতে গেলে বড়ুয়া-দেবকী বসুর যুগ বলে অভিহিত করতে হয়। এঁদের দুজনের ঠিক সমসাময়িক নীতীন বসুর দানও বাংলার চলচ্চিত্রের স্মরণে রাখবার মত। তবে চিন্তার মূল্যায়ন, জীবনের সত্যসমূহের প্রতিফলন, কাব্যসৌন্দর্য প্রভৃতি গুণ-সম্পন্নতার দিক দিয়ে বিচার করলে বড়ুয়া ও বসু অনন্যসাধারণ। এঁরা প্রকৃত যুগসঞ্চালক। এঁদেরই যুগে অবশ্য আরো পাঁচ-সাত জন পরিচালক নাম করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ ঠিক অসামান্য হয়ে বিরাজ করতে পারেননি। তাই দীর্ঘস্থায়ী খ্যাতিলাভও কারো ভাগ্যে হয়ে ওঠেনি। নীতীন বসু যান্ত্রিক কৌশলকে এত সুন্দরভাবে ছবিতে প্রয়োগ করেছিলেন যে, নিউ থিয়েটার্সের ছবির ফোটোগ্রাফির ও আঙ্গিকের উন্নত-মানের কথা সর্বত্র স্বীকৃতিলাভ করলো। নীতীন বসু কয়েকখানা খুব ভাল ছবি করলেন কিন্তু যে-অন্তর্লীন রসের সহজতা ও কাব্যাশ্রয়ী প্রকাশভঙ্গী থাকলে ছবির আকর্ষণ ও আবেদন দুর্বার হয়ে ওঠে নীতীন বসু আগাগোড়া তার পরিচয় দিতে পারেননি।

এর পর সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' এল পরবর্তী নবীন যুগের প্রবর্তক হয়ে, যে যুগের আলো এখনো আমাদের পথ দেখাচ্ছে। বড়ুয়া, দেবকী বসুর কথা বাদ দিয়ে নীতীন বসু, হেমচন্দ্র, ফণী মজুমদার, নীরেন লাহিড়ী, সুশীল মজুমদার, শৈলজানন্দ প্রভৃতি পরিচালকেরা ছবিকে মোটামুটি নাট্যধর্মী, আবেগসম্পন্ন করবার চেষ্টার ওপরই জোর দিতেন। আঙ্গিকের ঔৎকর্ষের কথা এঁরা ভোলেননি কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ছবি যে সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক নতুন আকার ও প্রকৃতি নিয়ে দেখা দিল, তার সঙ্গে পূর্ববর্তী যুগের চিত্রকারদের শিল্প-শৈলীর অদ্ভুত পার্থক্য দেখা গেল। সত্যজিৎ রায়ের ছবি এলো অঙ্কনকলার গভীর অনুভূতি ও সূক্ষ্ম প্রকৃতি নিয়ে—ধীরে, সুস্থে, প্রতিটি আবেগ, দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিত্ব বা ভাববস্তুকে দেখিয়ে তার গূঢ় তথ্যটি দর্শকের মনের তারে ব্যঞ্জনাময় করে তোলা। দুর্বার গতি ও নাটকীয়তা দিয়ে মানুষের অনুভূতিকে দ্রুতসঞ্চারী করে চিত্রের উপপাদ্যকে সুবেশ ও অতিরেখায়িত করে তোলা রায় পছন্দ করেন না, একথা বুঝতে দেরী হল না। মানুষের মনের সহজাত আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, সহানুভূতি প্রভৃতিকে তিনি জাগিয়ে তুলতে চাইলেন ছোট ছোট, সুন্দর ভাবের ও রসাভাসের শান্ত স্ফুটনের মধ্য দিয়ে। "পথের পাঁচালি", "অপরাজিত" ও "অপুর সংসার" এদিক থেকে তাঁকে খুব সাহায্য করলো। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপু-কাহিনীর মধ্যে এমন একটি সহজ, সরল, ধীর ছন্দ কিন্তু নিবিড় সুর আছে যা সত্যজিৎবাবু বিচিত্র সৃষ্টিভঙ্গী ও শৈলীর পক্ষে খুব সহায়ক হল। মনে হল বিভূতি-বাবুর অপুর রূপায়ণের জন্য যেন সত্যজিৎ-বাবুরই প্রয়োজন ছিল! এর পরে তিনি অনেকগুলি ছবি করেছেন কিন্তু "তিনকন্যা" ও "অভিযান" ছাড়া কোনখানি বক্স-অফিসের দিক থেকে ততোখানি সার্থক হয়নি, যতো হয়েছে অপু-চিত্রগুলি। 'তিনকন্যা'-য় তিনি অনন্যসাধারণ কাহিনীর সাহায্য পেয়েছেন। 'অভিযান' ছবিতে কিন্তু তিনি, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বেশ একটু সরে এসেছেন। এই ছবিখানি হয়েছে দ্রুতগতি, নাট্যমনা ও বাক্যপ্রধান। নিঃসন্দেহে বলা যায় সত্যজিৎ-বাবু একটা নতুনতর প্রকাশভঙ্গীর সার্থক


শুভমুক্তি আসন্ন!

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষে.....

॥ সেবক চিত্রপ্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দ নিবেদন ॥

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

॥ প্রযোজনা ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কাহিনী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥
পরিচালনা সুধু বসু ॥ সংগীত অনিল বাগচী ॥
॥ রূপ-সজ্জায় ধনঞ্জয় ॥ সন্ধ্যা ॥ প্রতিমা ॥
॥ অধীর বাগচী ॥ ঘুর্ণায়মান বাউল ॥
ছঃ অমরেশ দাস ॥ গুরুদাস ব্যানার্জী ॥ জহর গাঙ্গুলী ॥
॥ বিপিন গুপ্ত ॥ নিহির ভট্টাচার্য ॥ মলিনা দেবী ॥

শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে গঠন পথে

আর. বি. ফিল্মস্-এর

চারণ কবি মুকুন্দদাস

॥ পরিবেশনা ঃ ভরতারিণী পিকচার্স ॥

প্রয়োগ করেছেন এই ছবিতে। তিনি পূর্বাভ্যস্ত পথ অক্লেশে ত্যাগ করেছেন কিনা সেটা অবশ্য বোঝা যাবে তাঁর আগামী "মহানগর" ছবিতে।

সত্যজিৎ রায়ের অনুবর্তী যুগ এখনও চলছে বললে মিথ্যে বলা হবে না। রায়ের অসামান্য সাফল্য দেখেই অবশ্য একদল লোক তাঁরই অনুরূপ ভঙ্গীতে চিত্ররসসৃষ্টির চেষ্টা করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'যার কর্ম্ম তারেই সাজে।' অনেকগুলি প্রচেষ্টাই তাই শুধুমাত্র অনুকৃতির রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। দুই-একটি ক্ষেত্রে ছাড়া এই নতুন গোষ্ঠী নিজেদের বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কোন পরিচয় দিতে পারেননি। একথা কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাবের কিছু পরেই কয়েকজন পরিচালক অনুকরণের আশ্রয় না নিয়েও রায়ের স্টাইলকে অবলম্বন করেও সৃষ্টিধর্মী চিন্তার পরিচয় দিলেন। বোধ হয় একই স্টাইলের ছবি ভিন্ন ভিন্ন লোকের করার প্রচেষ্টাকে দর্শকের খুব ভালো লাগলো না। তাই তাঁরা জনপ্রিয়তার দিক থেকে খুব সার্থক হলেন না। নদী ছেড়ে উপনদীর রসধারায় তাঁরা আপ্লুত হতে পারলেন না।

কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ছবিই তো কালোত্তীর্ণ রসের ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়! হয়তো অনেকের আজ মনে হচ্ছে পুরাতন পদ্ধতি ও সত্যজিৎ রায়-আশ্রয়ী নতুন পদ্ধতি এই দুধারার সাহায্যে আমাদের ভবিষ্যৎ ছবির অনুশীলন করতে হবে। এর বাইরে আর অন্য পদ্ধতি বুঝি নেই। কিন্তু সমকালীন ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় দুই-একটি তরুণ পরিচালক কিন্তু দৃঢ়ভাবে ও স্বাধীন মনোবৃত্তি নিয়ে নতুন পথের সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন এবং এঁদের অনুসন্ধিৎসা বহুজনের প্রশংসাও পেয়েছে। কাঁচের স্বর্গ, ছায়াসূর্য, এমন কি শেষ প্রহর ও আরো দু-একখানা ছবির আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নিছক অনুকৃতি যে কাউকে প্রকৃত রসধর্মী করে তুলতে পারে না, বহুতের নাগাল দিতে পারে না এটা কিছুসংখ্যক লোক নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছেন। ছায়াসূর্য ছবিতে এমন একটি তারুণ্যের আভাস পাওয়া গেছে যেটা ভবিষ্যতের বাংলা ছবির সৌকর্য সম্বন্ধে নিশ্চিত আশা জাগিয়ে তোলে। ছায়াসূর্য বা কাঁচের স্বর্গ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের গুণে উজ্জ্বল। এদের মধ্যে কারো প্রদর্শিত পথে হাঁটার এমন ইঙ্গিতের বিন্দুও ছিল না। এদিক থেকে এঁরা নমস্য।

এ ছাড়া বর্তমানে যে সব ছবি হচ্ছে তার মধ্যে মোটামুটি দু শ্রেণীর ছবিই দেখা যাচ্ছে। এক পুরাতন পথের যাত্রী গার্হস্থ্য ছবি, যার পটভূমিকা মুখ্যতঃ পল্লীগ্রাম। গার্হস্থ্য আদর্শের নিরাপদ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই ছবিগুলি মফস্বল অঞ্চলে ভাল চলে। কলকাতাতেও এর খরিদ্দারের সংখ্যা নগণ্য নয়। অবশ্য যে ছবিগুলি মফস্বলে একচেটিয়া চলতো—যেমন পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক ছবি—সেগুলি আজকাল প্রায় তোলা হচ্ছে না বললেই হয়। এর দ্বারাও একটা জিনিস সূচিত হচ্ছে—বাংলার দর্শকের শিক্ষার ও রুচির মানের ক্রমোন্নতি। আর বাকী ছবিগুলিতে দেখা যাচ্ছে পুরাতন পদ্ধতির মধ্যে নব-বাস্তবতার (neo-realism) খাদ। এদের পরিচালকেরা বোধ হয় ভাবছেন এই মিশ্র পদ্ধতিতে পুরাতন ও নূতনপন্থী উভয়কেই খুশী করা যাবে। এখন কিছুদিন বোধ হয় আমাদের এই জাতীয় ছবি বেশী দেখতে হবে কারণ অধিকাংশ পরিচালকের প্রবণতা এখন যেন এই দিকেই।

আগামী দিনের বাংলা ছবি ঠিক কেমন রূপ নিয়ে দেখা দেবে সেটা সুনিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া এখন অসম্ভব। সত্যজিৎ রায়ের প্রভাবে রূপায়িত চিত্রশিল্প না নূতনত্বের দীপ্তিতে ঝলমল কোন তীর্থঙ্করের সৃষ্টির বেদনামুখর অভিনব প্রেরণার মধুক্ষরণ?

এর উত্তর দেবেন আগামীকালের চিত্রকারেরা, আজকের দিনের শিল্পের উত্তরসাধকেরা।

উত্তর ফাল্গুনী চিত্রের একটি মুহূর্তে সুচিত্রা সেন

# চিত্রচর্চা

ঋত্বিক ঘটক

দিন কয়েক আগে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু তাঁর তৈরী একটি ছবি দেখার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেন। ছবিটি দেখার পরে তিনি আমার সঙ্গে এক আলোচনাতে মগ্ন হয়ে যান। বিষয়টা ঠিক তাঁর ছবি ছিল না,—ছবির মধ্যের একটা ঘটনা ছিল বিষয়ের মূল আলোচ্য।

ঘটনাটি হচ্ছে এই রকম :—ছবিতে দুজন লোক আছে যাদের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তারা দুজনেই বন্ধু। তারপরে একটি মেয়ে আসে। মেয়েটি এই দুইজন লোকের মধ্যে একজনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়। তাতে অপর যে জন, তার কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না প্রথমে। একদিন এ মেয়েটি আর তার বন্ধু নৌকা-বিহারে বের হয়। যখন ফিরে আসে তখন হঠাৎ দ্বিতীয় লোকটির ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়। এবং ঘটনাটি কোনো প্রস্তুতি ব্যতিরেকে চরমে উঠে। অর্থাৎ মারামারি হয়।

আমার কাছে ঘটনাটি যুক্তিহীন মনে হয়েছিল। কারণ সাধারণ মানুষ ঐ দৃশ্য দেখার পরে ধরে নেবে যে দ্বিতীয় লোকটিও মেয়েটিকে ভালোবাসত এবং এ দুজনকে একত্রে দেখে হঠাৎ তার হিংসে হয়েছিল। অর্থাৎ, সেই "চিরন্তন ত্রিভুজ"-এর কথা। অথচ সাধারণ মানুষ দ্বিতীয় ব্যক্তিটির এই ব্যবহারের কোনো কারণই খুঁজে পাবে না। কারণ তার প্রস্তুতিই নেই।

আমার বন্ধুটি যিনি ছবিটা করেছিলেন, তিনি আমার কথার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, তিনি ইচ্ছা করেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটির ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত দেননি। তিনি চেয়েছিলেন, যার যা ইচ্ছে মানে করে নিক। যদি কেউ ভাবে, লোকটা প্রেমে পড়ে হিংসে করেছিল, তবে তাই ভাবুক। অন্য কেউ যদি ভাবে যে বন্ধুর জন্যে সে চিন্তিত হয়েছিল, তা হলে তাই ভাবুক। যদি ভাবে যে বন্ধু ও মেয়েটির প্রতিপত্তি আশপাশের লোকের কাছে খেলো হয়ে যাচ্ছে সেইজন্য মেয়েছিল, তাহলে তাই ভাবুক।

ছবির পরিচালক এই বিভিন্ন চিন্তার ধারাকে কোন একটা খাতে বইতে দিতে রাজি হন নি, এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

এই তর্কের টানে টানে একটা মূল কথা এসে পড়লো। সেটা হচ্ছে এই যে, এরকম একটা আভাস দিয়ে ছেড়ে দেওয়া, যার দশ রকম মানে হতে পারে, সঙ্গত কিনা।

এই সংবাদে আমি তাঁকে যা বলেছিলাম তার হয়তো আরও ব্যাপক ব্যবহার থাকতে পারে তাই কথাগুলোকে লিপিবদ্ধ করলাম।

আমার মনে হয়েছিল, আমার বন্ধুটি একটা জায়গায় ভুল করেছেন। সেটা দশ রকম দ্যোতনা প্রকাশের ইচ্ছের মধ্য দিয়ে নয়। এ ধরনের ট্রিটমেন্ট খুবই উচ্চস্তরের ছবির জন্ম দিয়েছে অতীতে এবং ভবিষ্যতেও দিতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে আরও গভীরে

'মহাতীর্থ কালীঘাট' চিত্রে গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য

যখনই কোন একটা ছবি (যদি অবশ্য সেটা সত্যিকারের চিন্তাশীল হয়) কোনো একটা বিশেষ রীতি বা পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরবে, তার সঙ্কেত দিয়ে যাবে তা প্রথম কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে। অর্থাৎ ছন্দ এবং সুরে গোড়াতেই বিন্যস্ত করবে।

কথাটাকে অন্য কিছু শিল্পের উপমা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি। যেমন ধরুন সংগীতে। আপনি কোন রাগ গাইবেন, সেটা একান্ত আপনারই বিবেচ্য। কিন্তু প্রথমেই বিস্তারের মধ্য দিয়ে রাগ-রূপটি আপনাকে তৈরী করে নিতে হবে। তখন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। তখন যদি কোন বিবাদী পর্দা লাগে তাহলে সুরও কেটে যায় এবং সমস্ত আবহাওয়াটা গোলমেলে হয়ে যায়। সংগীতরসিক মাত্রেই কথাটা বুঝতে পারবেন। যেখানে রাগ মিশ্র করা হয়, সেখানেও অপরাধী পর্দাকে চুরি করে করে ছুঁয়ে শ্রোতার কানকে কিভাবে তৈরী করতে হয়—সেটা আমার বন্ধু আলী আকবর বা রবিশংকরকে জিজ্ঞেসা করলেই জানা যাবে।

পাশ্চাত্য সংগীতে Scale, যেমন Bethoven-এর Violin in D Major বাজাতে বাজাতে যদি Bach-এর কোন একটা অনবদ্য FUGUE in F লাগে (তেমন বাতুল যদি কেউ থাকে তাহলে অবশ্য), সে ক্ষেত্রে ঘটনাটা যা দাঁড়াবে—আমাদের ভারতীয় মার্গসংগীতে রাগের অর্বাচীন মিশ্রণ তারই সঙ্গে তুলনীয় হবে। বা ধরুন চিত্রাঙ্কনের কথা। Leonardo da Vinchi-র কোন ক্যানভাসের এক অংশে যদি Picasso-র Su-realist period-এর কোন ছবির একটা অংশ কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়;—অথবা Brenghal -এর সেই perspective-প্রধান কোন অনবদ্য সৃষ্টির ঠিক মধ্যখানটিতে Vangogh-এর pastel-এর সেই SOWER-কে যদি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়,—তাহলে ঘটনাটা যেমন দাঁড়াবে সেই রকম।

আসল কথা হচ্ছে—Style। বাঙলায় কথাটাকে আমরা শৈলী বলি। শব্দটা অত্যন্ত

'অর্পালী' চিত্রে শর্মিলা ঠাকুর

খোঁড়া। Style-এর যে সম্পূর্ণ মনে বা দ্যোতনা, তার কোন প্রতিশব্দ বাংলায় নেই।

আমার বন্ধুকে আমি এই কথাই বলেছিলাম,—যে Style-ই আপনি ব্যবহার করুন না কেন, তার মধ্যে একটা consistency থাকা চাই। একটা একপর ভাব চাই। এমনকি, যেখানে আপনি পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদে বিভিন্ন Style বদলাবেন ঠিক করেছেন সেখানেও। আপনার Scale কোন note-এ হবে সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু আপনার Scale-এতেই আপনাকে স্থির থাকতে হবে। সেখানে কোন বাচালতা চলবে না। একটা শিল্পীর কাছে আর একজন শিল্পীর এর বেশী চাহিদা নেই।

ঐ ভদ্রলোকের ছবির গোড়াতেই যদি আমি তেমন কোন একটা চিত্রকলা দেখতাম, যাতে করে আমার মনে তার দ্যোতনা সম্পর্কে পাঁচ-দশ রকম মানে এসে দাঁড়াত এবং আমি যদি মনস্থির করতে না পারতাম, তাহলে হয়তো পরেরকার ঐ বিশেষ ঘটনাটি আমার কাছে খুব সহজভাবেই আসতো এবং তার ব্যাখ্যা পরিপূর্ণভাবে আমার সমগ্র অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারতাম।

কিন্তু বিচলিত হয়েছিলাম ঐ confusion of style ব্যাপারটিতে (শৈলীতে বিপর্যয়ে।)

আমার মনে হয়, ওটা একটা রসের ব্যাপার, অর্থাৎ আস্বাদনের, অর্থাৎ রুচি-বোধের।

ওটা বোধ হয় ভিতর থেকে আসে।

'বাদল' চিত্রে সন্ধ্যারাণী ও শঙ্কর

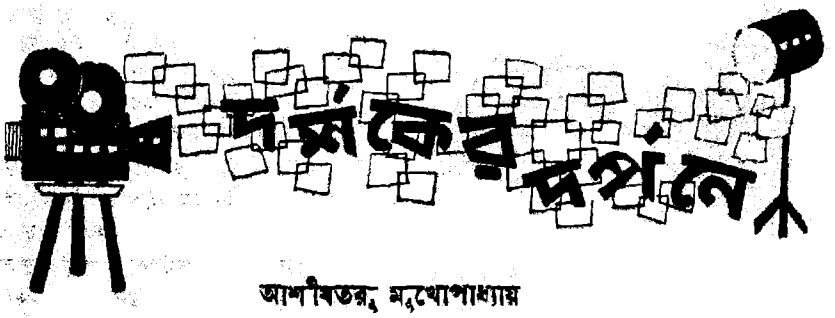


আশীষতরু মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ষাট বছর পূর্ণ হল। উনিশ শো তেষট্টি তাই স্মরণীয়। এই সার্থক পরিক্রমায় চলচ্চিত্র আজ শিল্পকলার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশেষ করে বাংলা চলচ্চিত্রের যে নিজস্ব আঙ্গিক, বক্তব্য এবং প্রত্যয়ের বলিষ্ঠ রূপ বিবর্তিত হচ্ছে তা অভিনন্দনযোগ্য। বিশ্বের চলচ্চিত্র জগতে একথা আজ স্বীকৃত। বাংলা ছবিতে এ ব্যতিক্রম সম্ভব হয়েছে শুধু দর্শকের মার্জিত রুচিবোধের জন্য। গতানুগতিকতার বাইরে দর্শকের মন দানা বেঁধেছে। যদিও এ অনুভূতির পরিমাণ নগণ্য তবু অদূরে অনেক আশার আভাস সম্প্রতি পেয়েছি দর্শক-সাক্ষাৎকারের একটি বিশেষ আলোচনা-চক্রে। সাক্ষাৎকারের প্রতিনিধি ছিলেন একজন স্নাতকোত্তর ছাত্র, তরুণ চাকুরে এবং চাকুরিজীবী একজন মহিলা। প্রশ্ন ছিল—

এক : কোন ছবি আপনার মনের মতো—বাংলা না হিন্দী? এবং কেন?

দুই : সব ছবি হয়তো দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। খবরের কাগজ থেকে আপনার দেখবার জন্যে ছবি বাছাই করেন কিভাবে? অর্থাৎ কি কি জিনিস বিশেষ কোনো ছবি দেখতে আপনার মনকে টানে?

তিন : 'মামুলি ছবি' এবং 'নতুন ধরণের ছবি'—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আপনার মতে কি?

চার : কোন ধরণের ছবি আপনার ভাল লাগে?

আলোচনা থেকে যে উত্তরগুলি পেয়েছি তা এবারে বলছি। স্নাতকোত্তর ছাত্রটির বক্তব্য—নিঃসন্দেহে বাংলা ছবি আমার মনের মতো। এ উত্তর প্রাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দিচ্ছি না, বলছি আমার বিচার-বিবেচনায় যা বলে তার থেকে। হিন্দী ছবিতে শালীনতা এবং সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির অভাব আছে। বেশীর ভাগ ছবিই হাল্কা নাচ-গানে ভরপুর। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমাকে একটু dogmatic বলা চলে। যে পরিচালকের পর পর কয়েকটি ছবি আমার ভাল লাগে নি তাঁর ছবি পরে নিজে থেকে দেখবার উৎসাহ থাকে না। সুরকার আর অভিনেতাও আমাকে কোন ছবি দেখতে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করেন। তৃতীয়টি, সাধারণ জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই যেমন উপন্যাস বা গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে না—তার জন্য যেমন বৈচিত্র্যের এবং বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন—ছবির বেলাও ঠিক তাই। নতুন ধরণের ছবিতে গল্প, প্রয়োগ-কলা ইত্যাদি বিষয়ে বৈচিত্র্য থাকে। মামুলি ছবিতে এ সবের নিতান্তই অভাব। 'প্রথম ভাগ'-এর 'গোপাল বড় সুবোধ বালক' আর এখনকার ছোটগল্পের যা তফাৎ 'মামুলি ছবি' আর 'নতুন ধরণের ছবি'রও অনেকটা সেই ধরণের তফাৎ। শেষ প্রশ্নের উত্তরে, যুগ এগিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে পা ফেলে চলবার চেষ্টা যে ছবির আছে সে ছবি। পরিষ্কার ছবি। নতুন ধরণের ছবি। অর্থাৎ experimental ছবির আমি ভক্ত।

তরুণ চাকুরের অভিমত—বাংলা ছবি ভাল লাগে তার কারণ বাংলা কাহিনী আমার মনকে টানে। কাহিনীকারের নাম, পরিচালকের নাম, সংগীত-পরিচালকের নাম যদি মনের মত হয় তাহলে সে ছবি দেখবার জন্য আমি ইচ্ছুক হই। যে ছবি শুধু অলীক কল্পনা ও সস্তা রোমান্সে দর্শকের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা, সেই ছবি আমার মতে 'মামুলি ধরণের ছবি'। আর যে ছবিতে আছে জীবনের বলিষ্ঠতা, বাস্তবতা ও সরলতা সেই ছবি 'নতুন ধরণের ছবি' মনে করি। সবশেষে বলতে পারি যে ছবির কাহিনীতে জীবনের গতি ও শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন পরিচালক সেই ছবি আমার খুব ভাল লাগে।

চাকুরে ভদ্রমহিলা বলেন—যে ছবিতে প্রাণের উচ্ছলতা আছে, সেই ছবি মনের মতো। বাংলা কিংবা হিন্দী নয়, ইংরেজীও হতে পারে। অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব থেকে কিছুটা relief পেতে চাই। মধ্যবিত্ত সংসারের স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে দশটা-পাঁচটার জীবনে বন্দী হয়ে পড়ি। প্রত্যহের এ গ্লানি দূর করতে মাঝে মাঝে ছবি দেখি। চোখের জল সইতে পারি না বলেই হাল্কা আর হাসির ছবি বেশী পছন্দ করি। বেশীর ভাগ ছবি আজকাল জনপ্রিয় উপন্যাস এবং গল্পের পটভূমিকায় নির্মিত হচ্ছে। নিয়মিত গল্প-উপন্যাস পড়ার বাতিক আছে। তাই প্রিয় কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হলে কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে ছবি বাছাই করি। 'মামুলি' বলতে খারাপ কিংবা গতানুগতিক বলবো কিনা জানি না, তবে 'নতুন ধরণের' ছবি সহজ এবং বোধগম্য হলে আমাকে নিশ্চয়ই খুশী করবে। রোমান্টিক এবং হাল্কা ছবি আমার ভাল লাগে। বাস্তবের সহজ-সরল পরিবেশে মিষ্টি রোমান্স ছবি আমার সবচেয়ে প্রিয়। যেমন এক কথায় মনে পড়ে পরিচালক মৃণাল সেন-এর 'পুনশ্চ' ছবি। বিশেষ করে নায়ক-নায়িকার মিষ্টি-মধুর সম্পর্কটুকু আমি আজও ভুলতে পারিনি। শুনেছি মেয়েরা করুণ রসের ভক্ত হয়। কিন্তু আমি চাই জীবনের গতির সঙ্গে মিলে যেতে। অকারণে দুঃখ দেখে যেন চোখের জল না ফেলি। সমাজের সবকিছু নিয়ে যে জীবন তার বাস্তব চিত্ররূপ দেখতে ভাল লাগে। কারণ চলচ্চিত্র যখন সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

প্রশ্নমালার আলোচনা থেকে আজকের চলচ্চিত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। দর্শকদের আপন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও প্রকাশ পায় এর মধ্যে। যদিও সরকারের তদন্ত কমিটি স্থাপনের ক্ষমতা আমাদের নেই কিন্তু এইসব মতামতগুলি যদি চলচ্চিত্রের মহৎ উদ্দেশ্যে কার্যকরী হয়, সেই কথা ভেবে পরিচালক মৃণাল সেনকে আমরা দর্শক-প্রতিনিধির প্রশ্নোত্তরের কথা জানাই। প্রশ্ন-উত্তরগুলি দেখে শ্রীসেন অতীব উৎসাহী হয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন ঘরোয়া এক সাক্ষাৎকারে। শ্রীসেনের সঙ্গে যে আলোচনা হয় তা থেকে সমকালীন চলচ্চিত্রের একটা বিশেষ রূপ পরিলক্ষিত হবে। প্রথমে পরিচালক শ্রীসেন দর্শকদের নিজস্ব মতামতের ওপর আলোচনা করেন। তিনি বলেন—

স্নাতকোত্তর ছাত্র ও চাকুরে যুবকের বক্তব্য মোটামুটি এক। কিন্তু ছাত্রের জবাবে বিশ্লেষণের আমেজ রয়েছে এবং তা অনেকখানি স্পষ্ট, বলিষ্ঠ এবং খানিকটা partisan-ও বটে। এবং partisan বলেই কিঞ্চিৎ উষ্মাও যেন রয়েছে ওঁর বক্তব্যে।

চাকুরে ভদ্রমহিলার জবাব অস্পষ্ট, অগভীর ও বেশ খানিকটা স্ববিরোধীও।

এবং আপাতদৃষ্টিতে ছাত্র ও চাকুরে যুবকের বিরোধী বক্তব্য পেশ করেছেন চাকুরে ভদ্রমহিলা।

কিন্তু একটু নজর করে হিসেব করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন (অন্তত আমি তাই বুঝেছি) যে, ভদ্রমহিলা নিজের বক্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট জোরালো বা emphatic নন। কিছু কুণ্ঠা, কিছু বা দ্বিধা এবং কিছুটা দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলার মতো ইঙ্গিত রয়েছে ওঁর উক্তিতে। যেন খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়েছেন প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হয়ে। এবং হয়তো বা স্নাতকোত্তর ছাত্রটির সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক হলে সহজেই হারস্বীকার করতে হোতো ওঁকে এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো ছাত্রের মতেই মত দিতেন। মনে প্রাণে বিশ্বাসও করে ফেলতেন ছাত্রের যুক্তিগুলো।

এক কথায় বলতে গেলে, স্বভাবতই ছাত্রটির উক্তি আমাকে উৎসাহিত করছে। কারণ তিনি জানেন যে তিনি কি পছন্দ করেন এবং স্পষ্ট করেই জানেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলবো যে চাকুরে ভদ্রমহিলার উক্তিও আমাকে তেমন বিব্রত করে না। কারণ ওঁর মতামত বাহ্যিক নজরে অস্পষ্ট ও দ্বিধাগ্রস্ত হলেও আমার বিশ্বাসে ওঁকে বিশ্বাসী করাতে হয়তো আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না, যেমন বিশেষ বেগ পেতে হোতো না দর্শনের ছাত্রটির—যদি অবশ্য তর্ক করার সুযোগ পেতেন তিনি। ভদ্রমহিলার উক্তি

থেকেই ও'র সম্পর্কে এই ধারণা আমার জন্মেছে। আমি আমার দলে বা মতে হয়তো ওঁকে ভেড়াতে পারবো একমাত্র ছবি করেই, ছাত্রটি যেমন পারবেন তর্ক করে।

ভেড়াতে পারবো কারণ ভদ্রমহিলা কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, আমার একখানা ছবি—'পুনশ্চ'—তাঁর পছন্দমতো হয়েছে। বিশেষ করে ভালো লেগেছে নায়ক-নায়িকার প্রাক-বৈবাহিক সম্পর্ক। ছবিতে রয়েছে—নায়ক স্বল্পবিত্ত চাকুরে, আর নায়িকা সবে চাকরীতে ঢুকেছে। এবং ছবির ঘটনা যা কিছু ঘটেছে সবটাই সীমাবদ্ধ কখনো দশটা-পাঁচটার দপ্তরখানার, কখনো বা রান্নাঘরে কুটনো কুটতে কুটতে অথবা খেতে বসে, আবার কখনো বাবার ঘরে অথবা নিজেদের শোবার ঘরে। এবং ট্রামে-বাসে অফিস থেকে ফেরবার পথে, গঙ্গার ঘাটে অথবা রেস্তোঁরাতে।

মজার ব্যাপার এই যে, ভদ্রমহিলা তাঁর এক নম্বর প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন—দশটা-পাঁচটার বন্দীত্বে হাঁপিয়ে ওঠেন তিনি। সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চান তিনি। তাই সিনেমা দেখতে যান মনটাকে হালকা করতে। এবং তার জন্যে প্রয়োজন হালকা হাসির ছবির। চাই relief.

অথচ 'পুনশ্চ' ভদ্রমহিলাকে খুশী করেছে। ও'রই স্বীকারোক্তি।

আসল ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। আসলে, বাস্তবতার নামে আমাদের দেশে বেশির ভাগ ছবি যা তৈরি হয়ে থাকে তাতে প্রায়ই দেখতে পাই জলের ভাগ অধিক। সেইসব ছবিতে রান্নাঘরও থাকে, ভাঁড়ার ঘরে চরিত্রের আনাগোনাও চলে বেশ, এবং কোথায়ও বা দপ্তরখানার কর্মব্যস্ততারও আন্দাজ পাই। কিন্তু পাই না জীবনের ইঙ্গিত। বেশির ভাগই বানানো, কল্পিত, মিথ্যে, ফাঁকি। খানিকটা দুঃখের প্যানপ্যানানি, খানিকটা অশিক্ষিত 'দর্শন' আর বাকিটা গ্যালারী-মুখীন বুলি কপচান। এবং শেষ পর্যন্ত একটা অসম্ভব বেয়াড়া ধরণের মিলনান্তক পরিণতি! একটি প্রাণান্তকর 'উজ্জ্বল দৃশ্য'!!

স্বভাবতই এই ছবি আমাদের চাকুরে ভদ্রমহিলাকে (যাঁর সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক অতিনিকট) সাময়িকভাবে দলে ভেড়ালেও শেষ পর্যন্ত টানতে পারে না। পীড়িতবোধ করেন তিনি এবং শেষ পর্যন্ত চার নম্বর প্রশ্নের জবাবে বলে বসেন, '(ছবি দেখতে গিয়ে) তেমন দুঃখ দেখে যেন চোখের জল না ফেলি।'

হালকা হাসির ছবি না হওয়া সত্ত্বেও 'পুনশ্চ' ও'র ভালো লেগেছে মনে করেন, হয়তো ঐ ছবিটার মধ্যে তিনি তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার চেহারা খুঁজে পেয়েছেন। অথবা নিজের অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে সামগ্রিকভাবে এক ধরণের বাস্তবতার খানিকটা আন্দাজ পেয়েছেন। দেখেছেন নায়কের সঙ্গে সিনেমা দেখায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকা সত্ত্বেও নায়িকাকে গুরুজনের নজরবন্দী হয়ে বাড়িমুখী ট্রামে ফিরতে

'রাধাকৃষ্ণ' চিত্রে প্রতিমা চক্রবর্তী

হয়েছে বাড়িতেই। দেখেছেন, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের কথা ভেবে চাকরী নিয়ে শেষ পর্যন্ত কিভাবে সে জড়িয়ে পড়েছে বাবার সংসারের আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে। দেখেছেন আর হয়তো মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন নিজের সঙ্গে অথবা পরিচিত আর কারো সঙ্গে—পরিচিত বাস্তবের সঙ্গে।

হয়তো খানিকটা আয়নায় নিজেকে দেখার মতো। দেখেছেন আর দেখতে হয়তো ভালোও লেগেছে নিজেকে। আর পারিপার্শ্বিককে।

'পুনশ্চ' ও'র ভালো লেগেছে জেনেই ভরসা পেয়ে এতোগুলো কথা বলে ফেললাম। বলে, নিজেকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলাম পাঠকের কাছে, এবং চাকরীজীবী ভদ্রমহিলাকেও বুঝতে প্রয়াস পেলাম।

ছবির কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিগত মতামত এড়ানো সম্ভব নয়—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে মতামত গড়ে ওঠে তাই। ছবির সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক আমাদের তাই হয়তো এড়ানো সম্ভব নয়।

তিন নম্বর প্রশ্নের জবাবে স্নাতকোত্তর ছাত্রটির একটি কথার উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, প্রথম ভাগের 'গোপাল বড় সুবোধ বালক'—শ্রেণীর গল্প নিতান্তই 'মামুলি'। অর্থাৎ তিনি বলতে চান (এবং আমিও তাই মনে করি) যে, যে-গল্পে, ঘটনায়, চরিত্রে রয়েছে শুধুই কালো এবং শুধুই সাদা, সাদায়-কালোয় মেশানো নয়—অর্থাৎ যে-চরিত্রে, ঘটনায়, গল্পে জটিলতা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, স্ববিরোধী ধারা নেই তা নেহাৎই 'মামুলি'। 'মামুলি' বলেই তিনি নাকচ করে দিচ্ছেন। এবং শুধু মামুলি বলেই নয়—নিশ্চয়ই অবাস্তব বলেও। জীবন-ভিত্তিক নয় বলেই।

এবং ছাত্রটির এই উক্তিটিকে একটু খুঁটিয়ে বিচার করলেই বুঝতে পারবো যে, এ-থেকেই ছবি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে একটা পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা সম্ভব, এবং সে-ক্ষেত্রে উপরোক্ত চারটি প্রশ্নের জবাব দিতেও বিশেষ অসুবিধে হবে না।

সবশেষে দাঁড়াচ্ছে এই ঃ

ক) দর্শকের মনের মতো ভালো ছবি করতে হলে চাই বাস্তবানুগ দৃষ্টি যা বাস্তবের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতম অনুরণনেরও হিসেব রাখে, যা চরিত্র, ঘটনা, পারিপার্শ্বিকের একেবারে ভেতরকার চেহারাগুলোকে তাদের দ্বন্দ্ব, সংঘাত বা বিরোধ সমেত তুলে ধরতে সাহায্য করবে—অর্থাৎ যে দৃষ্টি বাস্তবের বাহ্যিক রূপ দেখেই ক্ষান্ত নয়—যে-দৃষ্টি বাস্তবের ভেতর থেকে খুঁজে বার করবে তার মাধুর্য, তার রস, তার সম্ভাবনা এবং নিঃসন্দেহে তার গ্লানি।

খ) এবং সেই বাস্তবকে রূপ দিতে হবে ছবির বিশিষ্ট ঢঙে, ছবিরই একান্ত নিজস্ব কুশলতায়। কারণ শুধু তো বাস্তবকে সংবাদপত্রের কায়দায় হাজির করলেই চলবে না—তাকে হাজির করতে হবে 'সশরীরে'—তাকে রক্তমাংসে জীবন্ত ক'রে—ছবির টেক্‌নিকের কুশলী প্রয়োগে।

এবং সিনেমা নামক শিল্পের সুষ্ঠু প্রয়োগের মধ্য দিয়েই দর্শক এমন এক স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন যাকে স্নাতকোত্তর ছাত্রটি বলেছেন—'বৈচিত্র্য' বা সাধারণভাবে দর্শককুল বলে থাকেন—'নতুন ধরণের'।

**পুনশ্চ ঃ** একটা কথা। ভদ্রমহিলা বলছেন, নিয়মিত গল্প-উপন্যাস পড়ার বাতিক আছে তাঁর। অথচ তার আগেই আবার বলছেন, সংসারের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তিনি কিছু relief পেতে চান, হাসতে চান।

আমার জানতে ইচ্ছে করছে, ভদ্রমহিলা কটা কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু আর শিবরাম চক্রবর্তীর বই পড়েছেন আর কটাই বা ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ 'আধুনিক' লেখকদের গল্প-উপন্যাস পড়েছেন! আমি একরকম হলফ করেই বলতে পারি, প্রথমোক্ত লেখকেরা নিশ্চয়ই তাঁর তেমন প্রিয় নন যতোটা 'আধুনিক' লেখকেরা। এবং সেই প্রিয় 'আধুনিক' লেখকেরা ভদ্রমহিলাকে শুধুই হাসান একথা জানতে পারলে তাঁরা আত্মহত্যা করতে চাইবেন নাকি?

# সেন্সর ও ভারতীয় চলচ্চিত্র

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

সেন্সার কথাটি এসেছে ল্যাটিন *censere* থেকে, যার একটি অর্থ হচ্ছে মূল্য-নিরূপণ এবং কর-ধার্য করা। প্রাচীন-কালে রোমরাজ্যের দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে যিনি জনসংখ্যা গণনা করতেন এবং জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র এবং আচরণের ওপর খবরদারি করতেন, তাঁকেই বলা হ'ত সেন্সার। ক্রমে কথাটা সেই বিশেষ সরকারী কর্মচারী সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়, যিনি প্রতিটি পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত পুস্তকাদি এবং চলচ্চিত্র প্রভৃতি পরীক্ষা ক'রে সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হবার উপযোগী কিনা, তা' বিচার ক'রে দেখেন। যুদ্ধকালে যে পদস্থ কর্মচারী চিঠিপত্র, সংবাদাদির মধ্যে এমন কোনো আপত্তিকর কথা আছে কিনা, যা শত্রুপক্ষের কানে গেলে যুদ্ধপ্রচেষ্টার পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে ব'লে বিবেচনা করবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাঁকেও সেন্সার আখ্যা দেওয়া হয়।

যেদিন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করছে এবং রাষ্ট্রীয় শাসনকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, সেদিন থেকেই রাষ্ট্র এবং সমাজের কল্যাণেই সে তার জনসাধারণ-সম্পর্কিত আচরণে নিয়ন্ত্রণ বা সেন্সার-ব্যবস্থাকেও মেনে নিয়েছে। দেখা যায়, যখনই কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্র বা সমাজের প্রচলিত রীতি, ধর্মবিশ্বাস বা জন্ম, মৃত্যু, প্রাকৃতিক ঘটনা ইত্যাদি সংক্রান্ত সাধারণ বিশ্বাস ও ধারণার বিপরীত কিছু বলতে বা করতে প্রয়াস পেয়েছেন, তখনই রাষ্ট্র তাঁর আচরণের ওপর সেন্সার-ব্যবস্থা প্রয়োগ ক'রে তাঁকে নিরস্ত হ'তে বাধ্য করেছেন। ২১৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে চীনসম্রাট শীহোয়াংটি ধর্মগুরু কন্‌ফুসিয়স্‌-এর সমুদয় রচনাকে ভস্মীভূত করেছিলেন এই অজুহাতে যে, মানুষ বেশী জ্ঞানী হয়ে পড়লে সে সমাজের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে পড়ে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনোরকম অগ্রগতির বিরোধিতার ফলেই ইস্কিলাসকে এথেন্স থেকে বিতাড়িত হ'তে হয়েছিল, সক্রেটিসকে দেশের যুবশক্তিকে কলুষিত-কারীর অপবাদ মাথায় নিয়ে বিষপানে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, শেলী, কীটস্‌, মিলটন, জোলা, বালজাক প্রভৃতি মনীষী রাষ্ট্রের কাছ থেকে শাস্তি পেয়েছিলেন।

এই অবস্থাই আবহমানকাল ধ'রে চলে আসছে। আজ যে-কোনো দেশেই সাহিত্য, অঙ্কনশিল্প, নাটকাভিনয়, চলচ্চিত্র, বেতার-নাটক বা কথিকা, টেলিভিশান ইত্যাদি পদে পদে সেন্সার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সেন্সার-ব্যবস্থায় অবলম্বিত মান সম্বন্ধে একটা দুর্জ্ঞেয়তা বা দুর্বোধ্যতা যথারীতি বিরাজ করলেও এর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমাদের মনে কোনো দ্বিধা নেই, সেটা এমনই পরিষ্কার ঃ [illegible] যা চ'লে আসছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চল; আর গতানুগতিকতা বজায় রেখে না চলতে চাইলেই গোল্লায় যাও। রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র সৃষ্ট সেন্সার সর্বদেশে সর্বকালে জন-সাধারণকে কচি খোকা এবং নির্বোধ দুর্বলচিত্ত প্রাণী ব'লে মনে করে এবং সেই কারণে প্রচলিত রীতির বিরোধী কোনো শিল্পীর 'দুর্নীতিপূর্ণ' এবং 'বিপজ্জনক' প্রভাব থেকে রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। প্রচলিত সামাজিক নীতিজ্ঞানকে কিছুতেই কলুষিত হ'তে দেওয়া হবে না, এই হচ্ছে সেন্সারের সুকঠিন পণ।

সনাতন পন্থা বলে, একটি পরিবারের ভালোমন্দ বিবেচনা করবার একমাত্র অধিকার হচ্ছে বাবার; কাজেই পরিবারের সকলের হয়ে ভালো-মন্দ-সম্পর্কিত চিন্তাটা একমাত্র বাবাই করবেন। এই মান্ধাতা আমলের বাবাপনাই আমাদের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিগত, এমন কি আহার্য সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত

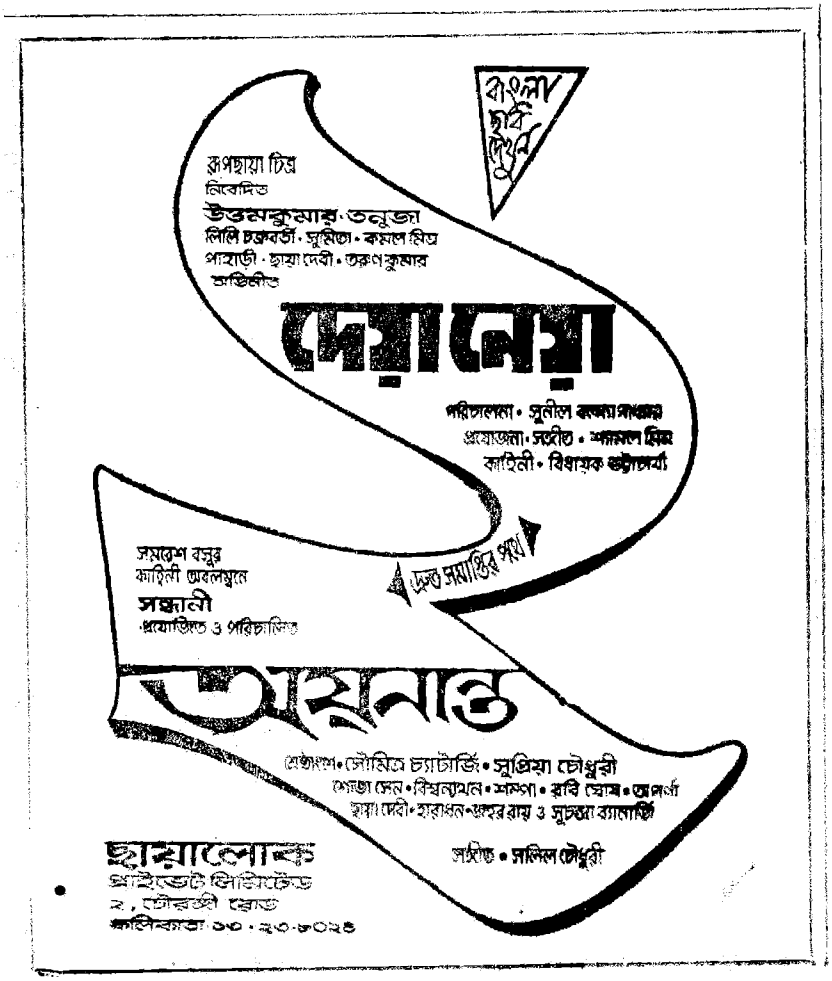

করছে। মদ্যপান কোরো না, যৌনসংক্রান্ত চলচ্চিত্র দেখো না, প্রণয়ের অভিব্যক্তি-সংবলিত প্রাচীরপত্র বর্জন কর, অর্থ-নৈতিক অসামঞ্জস্যের অপ্রীতিকর নিদর্শনকে সাহিত্য বা চলচ্চিত্রে স্থান দিও না ইত্যাদি 'নিষেধে'র বাণে আমরা জর্জরিত।

যাঁদের হাতে এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা তাঁরা ভুলে যান যে, মানুষ একটি সজীব পদার্থ; কোনো অজুহাতেই তার দেহমনকে বিধি-নিষেধের অক্টোপাস বাঁধনে বেঁধে স্থাণু ক'রে রাখা যায় না। মানুষ চলবেই। বেদের যুগ থেকে বৌদ্ধধর্মের যুগে এবং সেখান থেকে বাইবেলের যুগে এবং তার থেকে বিজ্ঞানের যুগে মানুষের উত্তরণকে বন্ধ ক'রে রাখা যায়নি। সমাজ নিত্য-পরিবর্তনশীল এবং সেই সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারাও। কাল যা সত্য ছিল, আজকের নবমূল্যায়নের ফলে তাই আজ মিথ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছে। বেগবান নদীকে বাঁধ দিয়ে রুদ্ধ করবার চেষ্টা করলে যেমন প্লাবন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই চিন্তার গতিকেও নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস সামাজিক বিস্ফোটকের সৃষ্টি করে। সৃষ্টিধর্মী শিল্পকে নিরাপদ পথে বিচরণ করতে বলার অর্থই হচ্ছে তাকে মৃত্যুবরণ করতে বলা; কারণ ঐ পথে বিচরণ করবার কথা মনে রাখতে গিয়ে তা' না হয় সৃষ্টিধর্মী এবং না হয় আর্ট।

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও সমান কথাই বলা যায়। সেন্সরের উদ্যত খড়্গের পানে তাকিয়ে আমাদের অধিকাংশ ছবি নির্মিত হয় ব'লে সেগুলি না হয় সৃষ্টিধর্মী, আর না হয় সত্যিকারের কোনো শিল্পবস্তু। মানুষকে সস্তার আনন্দ দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হবে, এই চিন্তা দ্বারা চালিত হয়ে যতটুকু 'নিরামিষ' যৌন-আবেদন সৃষ্টি করা সম্ভব, তাকেই সম্বল ক'রে আমাদের শতকরা নব্বইখানা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। কোনো শিল্পীকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা না দিলে তার সৃষ্টিপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সার্থকতা লাভ করতে পারে না, এই সহজ সত্য আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এবং তাঁদেরই সৃষ্ট সেন্সার-কর্তৃপক্ষ বেমালুম বিস্মৃত হন। তাই ওপরের চাকচিক্য এবং প্রমোদোপকরণ সত্ত্বেও আমাদের চলচ্চিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাস্তব, শূন্যগর্ভ এবং ভালো-মন্দ প্রভাববর্জিত হয়। জীবনকে তার সর্ববিধ ব্যঞ্জনাসম্পন্ন বাস্তব রূপে চিত্রায়িত করতে অধিকাংশ প্রযোজকই ভয় পান; কারণ, বহু অর্থব্যয় ক'রে—বেশ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ ক'রে ছবি তৈরী করার পর যদি সেই ছবি সেন্সারের ছাড়পত্র-লাভে বঞ্চিত হয়, তাহ'লে সবদিক দিয়েই ক্ষতি—অর্থ, শ্রম, সময় এবং প্রাণশক্তি, সবই বৃথা ব্যয়িত হবে। কাজেই জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন রূপকথার গল্প চিত্রায়িত করা ছাড়া অন্য উপায় কোথায়?

ভারতবর্ষ যতদিন বিদেশীর শাসনাধীন ছিল, ততদিন পর্যন্ত তবু সেন্সারের ধারাকে সহজেই বোঝা যেত। সে সময়ে রাজশক্তির অবমাননাকর বা আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজনা-সৃষ্টিকর কোনো দৃশ্য, বক্তৃতা বা রাজনৈতিক মতবাদ না থাকলেই কোনো চলচ্চিত্র সাধারণ্যে প্রদর্শনযোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'ত। অবশ্য রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও পরধর্মমতে আঘাত বা অশ্লীলতার অজুহাতে চলচ্চিত্রকে কখনও-সখনও নিষিদ্ধ করা হ'ত। সকলেই জানেন, বৃটীশ-আমলে চলচ্চিত্রের সেন্সার-কর্তৃপক্ষ ছিলেন পুলিশ-কমিশনার; অবশ্য কাজটা চালাতেন এই বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁরই অধীনে নিযুক্ত জনৈক কর্মচারী। কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পরেই ভারত সরকার সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি বিবাচক সংস্থা বা সেন্সার বোর্ড গঠিত করেন এবং সেই কেন্দ্রীয় বোর্ডের তিনটি আঞ্চলিক শাখা মারফত এই সেন্সারকার্য সমাধা করা হয়।

স্বাধীন ভারতে চলচ্চিত্রের সেন্সার-ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করেছে। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ, অশ্লীলতা এবং ধর্মমতে আঘাত-সম্পর্কিত বিধিনিষেধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রশ্ন। কাহিনীটি বা কাহিনীর কোনো বিশেষ অংশ বা সংলাপ ভারতীয় সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের বিরোধী, এ অজুহাতেও কোনো চলচ্চিত্রকে সমগ্রভাবে বা আংশিক-ভাবে প্রদর্শনের অযোগ্য রায় দেবার ব্যবস্থা আছে বর্তমান সেন্সারশিপ আইনে। ১৯৫১ সালের ১৭ই নভেম্বরের বিজ্ঞপ্তিতে সেণ্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সর্স বিবাচক সংস্থার সভ্যগণকে যে নির্দেশনামা দিয়েছেন, তার সাধারণ সূত্রেই আছে, নাটক এবং আনন্দবিতরণের প্রয়োজন ছাড়া ছবির মধ্যে জীবন-যাত্রার নির্ভুল মান রক্ষা করতে হবে (correct standards of life, subject only to the requirements of drama and entertainment, shall be presented). এ ছাড়া ভারতীয় রীতি-নীতি, ঐতিহ্য, প্রথা বা সংস্কৃতিকে দুষ্যভাবে প্রদর্শন করা আপত্তিকর ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে (showing Indian institutions, traditions, customs or culture in an odious manner may be objectionable). এই নির্দেশ দুটির নির্ভুল প্রয়োগ অত্যন্ত বাদানুবাদসাপেক্ষ। কারণ, কোনো বিবাচক সংস্থার যে-ক'জন সদস্য (কমপক্ষে তিনজনকে দেখতেই হয়) কোনো চলচ্চিত্রকে পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, জীবনযাত্রার মান,


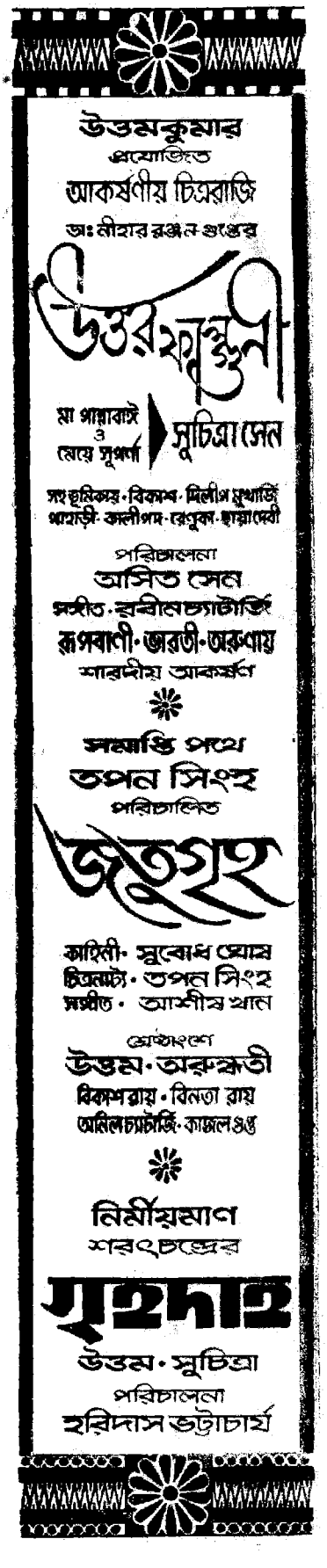

সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত ধারণা অনুযায়ীই রায় দেবেন এবং এই ধারণা কোনো দুজনের যে এক নয়, এ-কথা হলফ ক'রে বলতে পারা যায়। নৈতিক মান সম্পর্কেও একজন যে আর একজনের সঙ্গে কার্বন কপির মতো এক-মত, তাও কচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এক্ষেত্রে নিম্নপর্যায়ের নৈতিক মান বা low moral tone-এর অজুহাতে কোনো ছবির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা যে সদস্যবৃন্দের ব্যক্তিগত রুচির ওপর কত বেশী নির্ভরশীল, তা অনুমান করা কঠিন নয়। লোকসভার এস্টিমেটস্ কমিটির মতে 'উচ্চ বিচারকের পদমর্যাদাসম্পন্ন, সাধারণের চক্ষে বিশিষ্টভাবে শ্রদ্ধার পাত্র এবং গভীর সাংস্কৃতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই' সেন্সার রূপে নিযুক্ত হবার অধিকারী (The person should be of a high judicial status, commanding an eminent public position and possessing a depth of cultural background). ব্রিটিশ বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সার্স-এর সচিব মিঃ ওয়াটকিন্স বলেছেন, যে-ভদ্রলোকের চলচ্চিত্রের প্রতি অনুরক্তি আছে এবং সেন্সারশিপের প্রতি একটি সুস্থ বিরূপতা আছে, তিনিই সেন্সার হবার যোগ্যতম ব্যক্তি। সেন্সারশিপকে সকলেই একটি অপরিহার্য মন্দ ব্যবস্থা ব'লে থাকেন। এই মন্দ ব্যবস্থাকেই যতদূর সম্ভব সহনীয় ক'রে তুলতে পারা যায়, যদি বিবাচক সংস্থার সভ্যবৃন্দ একটু উদার এবং খোলা সহানুভূতিশীল মন নিয়ে যুক্তিপূর্ণভাবে তাঁদের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করেন। এবং এই শুভবুদ্ধির প্রয়োগ মাত্র তাঁদেরই কাছ থেকে আশা করা যায়, যাঁরা চলচ্চিত্রশিল্পকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন।

'ভীবনকাহিনী' চিত্রে সন্ধ্যা রয়

*

'একই অঙ্গে এত রূপ' চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

'কাঞ্চনকন্যা' চিত্রে কণিকা মজুমদার ও সুমিতা সান্যাল

# পর্দার অন্তরালে : নেপথ্য ভাষন

**ছায়াছবির জন্ম যাঁরা দেন, সেই সংগঠনকারীরা বলছেন...**

[কোনো চিত্রগৃহে যখন আমরা ছবি দেখতে যাই, তখন প্রথমেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঐ ছবির প্রযোজক ও অন্যান্য সংগঠনকারীদের এবং ভূমিকাগ্রহণকারী শিল্পীদের নাম। কিন্তু ছবির কাহিনী আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন শিল্পীদের আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখি, তখন তাদেরই সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে যাই এবং ছবির শেষে পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করি, অমুক আর্টিস্টটি খুব ভালো অভিনয় করেছে, এবং অমুক আর্টিস্ট তেমন সুবিধে করতে পারেনি। এই আলোচনার সময়ে আমাদের মনেই থাকে না, ছবির কাহিনী এবং সেই কাহিনী থেকে চলচ্চিত্রে রূপায়ণের উপযোগী চিত্রনাট্যটি চরিত্রচিত্রণ, নাটকীয় পরিস্থিতি রচনা, ক্রমবর্ধমান কৌতূহল বা সাস্‌পেন্সসৃষ্টি এবং নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের সাহায্যে চূড়ান্ত মুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স রচনা প্রভৃতি বিষয়ে উৎকৃষ্ট না হ'লে শিল্পীরা তাঁদের নাটনিপুণতা দেখাবার সুযোগ পাবেন কি ক'রে? তার ওপর সুযোগ্য পরিচালক না হ'লে কাগজের ওপর কালির অক্ষরে লিখিত চিত্রনাট্যটিকে রূপরসে সঞ্জীবিত ক'রে প্রতিটি দৃশ্যকে সেলুলয়েড বা ফিল্মে রূপান্তরিতই বা করবে কে?

পরিচালককে চিত্রনাট্যে বিধৃত কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে অকৃপণ সাহায্য করবার জন্যে যে দক্ষ আলোকচিত্রশিল্পী, শব্দ ও সঙ্গীতকে ফিল্মের ভিতর সার্থকভাবে ধরতে সক্ষম শব্দযন্ত্রী, ছবির ঘটনার অন্তর্বর্তী ভাবপ্রবাহ পরিচালকের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে উপযুক্ত আবহসঙ্গীত রচনা এবং কাহিনীর যথাযথ বিন্যাসে সহায়ক গানগুলিকে সুরসমৃদ্ধ করতে সক্ষম সঙ্গীত-পরিচালক, কাহিনীর গতি ও নাট্যধর্মকে হৃদয়ঙ্গমক্ষম সম্পাদক এবং কাহিনীর উপযোগী দৃশ্যপট রচনা ও বহিঃপ্রকৃতি নির্বাচন করবার ক্ষমতাধারী শিল্পনির্দেশক এবং সবশেষে বহু শ্রম ও অজস্র অর্থব্যয়ে গৃহীত চিত্র ও শব্দকে উপযুক্ত যন্ত্র নিয়ে পরিস্ফুটন করেন এবং তার থেকে চূড়ান্ত চিত্র মুদ্রিত করেন, এমন সার্থক রসায়নাগারিকের একান্ত প্রয়োজন, এ-কথাও আমরা সবসময়ে স্মরণে রাখি না।

আমরা তাই ছায়াছবির দশজন প্রথিতযশা সংগঠনকারীকে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা বা বিশেষ বক্তব্যের মাধ্যমে। এই আলোচনায় প্রযোজক হিসেবে যিনি যোগ দিয়েছেন, সুখের বিষয়, তিনি কেবল অন্তরালেই নন, পর্দার পটভূমিতেও আমাদের কাছে সুপরিচিত। —নান্দীকর]

## চরিত্রচিত্রণের ভার

ছায়াছবির হাটে আমার তো মনে হয় কাহিনীকারের ভূমিকা নেহাৎই ছায়ামাত্র। গল্পটি নির্বাচিত হওয়ার পর কাহিনীকারের আর ভূমিকা কোথায়?

ছবির প্রয়োজনে চিত্রনাট্যকার সে কাহিনীকে কাটতে পারেন ছিঁড়তে পারেন, দুমড়ে মুচড়ে চেহারার বদল ঘটাতে পারেন, ভেঙে গালাই করে নতুন ছাঁচে ঢালাই করতে পারেন, কাহিনীকারের আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না।

অবশ্য সব ক্ষেত্রেই এ রকম ঘটছে, বা ঘটে, বললে অন্যায় বলা হবে, কাহিনীকারের সঙ্গে পরামর্শ করেও চিত্রনাট্য লেখা হয় থাকে।

তবে অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনী বা কাহিনীকার উপেক্ষিত।

তেমন ক্ষেত্রে ছবি যতই আর্থিক সাফল্যমণ্ডিত হোক, কাহিনীকারের মনে কিছু অভিমান থেকেই যায়।

তা'ছাড়া যখন কোন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের পরিচিত গল্প, বা কোন বিশেষ সাহিত্য-মূল্য-সম্বলিত গল্প নির্বাচন করা হয়, তখন এটাই কি অনুমান করা সঙ্গত নয়, পাঠক-দর্শক সেই পরিচিত প্রিয় গল্পটিই দেখতে চায়। সে গল্পের অন্য রূপ দেখে খুশী হতে পারে না। ওটা অনেকটা আশা-ভঙ্গের মত লাগে। দর্শক হিসেবে এটা আমিও অনেক ক্ষেত্রে অনুভব করেছি। ছবির প্রয়োজনে কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিবর্জন করতেই হয়, কিন্তু মূল সুর বা মূল আবেদনটি নষ্ট হলে কষ্ট হয়। মনে হয় ওই গল্পটি নেওয়ার সার্থকতা তবে কোথায়? কাহিনীকার হিসেবেও দু' এক ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, অনেক পাঠক-দর্শক আমাকেই অভিযুক্ত করেছেন, 'এভাবে বদলাতে দিলেন কেন?'

উত্তর দিতে অসুবিধেয় পড়েছি এবং মনে হয়েছে মূল কাহিনীর বক্তব্য বা সুরকে অক্ষুণ্ণ রেখেও কি প্রযোজক এই আর্থিক সাফল্য লাভ করতে পারতেন না?

(না, এটা ঠিক অভিযোগ নয়, একটা আলোচনা মাত্র। এ আলোচনা যদি সামান্যতমও অপ্রিয় হয়ে থাকে, তার জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করছি।)

দু-একটি বাদে আমার বাকী যে গল্প ক'টি ছবি হয়েছে, তাতে আমি খুবই সন্তুষ্ট। বিশেষ করে 'অগ্নি-পরীক্ষা', 'নবজন্ম', 'ছায়াসূর্য'।

কোন্ ধরনের কাহিনীতে ছবির সাফল্য, এ প্রশ্নের উত্তর কিছু বছর আগে সহজেই দেওয়া যেত। কারণ তখন মোটামুটি মানবিক আবেদন-সম্বলিত ঘরোয়া চিত্র, অথবা আশা-আনন্দ দুঃখ-বেদনা-সম্বলিত বিরহ-মিলন কথাই ছিল ছবির প্রধান উপজীব্য।

এখন আর উত্তর সহজ নয়।

এখন বহুবিচিত্র চিত্রকাহিনী নিয়ে পরীক্ষা চলছে, ছবি তার বাঁধাধরা পথ ছাড়িয়ে দূর-দিগন্তের সন্ধানে ফিরছে।

তবু—যদি বলতেই হয়, তো বলা চলে দু' ধরনের ছবি দর্শক-মনকে স্পর্শ করে। এক হচ্ছে সচরাচর যা দেখছি, আর এক হচ্ছে —সচরাচর যা দেখছি না।

প্রথমটি—যে চেনা মানুষ, আর চেনা সমস্যা নিয়ে ঘর করছি, তার চিত্ররূপ সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে—অন্তরঙ্গতায় ধরা দেয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে চরিত্রপ্রধান। যেমন চরিত্র দেখছি না, দেখতে পাই না, তেমন একটি চরিত্র যদি ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়, দর্শক-মন একটি পরমপ্রাপ্তির আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ঘটনার অবাস্তবতা, পরিবেশের অস্বাভাবিকতাও উপেক্ষিত হতে পারে।

এই 'চরিত্র' আদর্শ চরিত্র হতে পারে, আবার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রহীন বাউণ্ডুলে বেপরোয়াও হতে পারে। সে যে ছকে-বাঁধা গণ্ডীর ঊর্ধ্বে এইটাই আকর্ষণীয়। বেপরোয়ামির মধ্যে একটা বিশালতা থাকে, যা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়। সমুদ্র লবণাক্ত তবু সে মহান। বিশাল বলেই মহান।

এই সমুদ্রের স্বাদ আছে 'জীবানন্দে দেবদাসে সতীশে'। তাই তারা চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল হয়েও বাঙালীর প্রাণের পুতুল।

অবশ্য এ সবই তুলনা মাত্র। সর্ববিধ ছবির সাফল্যই পরিচালনার উপর নির্ভরশীল, তা'ছাড়া আরো অনেক কিছুর উপরই। বস্তুতঃ ছবি জিনিসটা একটি সমষ্টিগত শিল্পকর্ম, কোনও একটি বিষয় নিয়ে বলা মানেই একাংশ মাত্র বলা। কাহিনীকার হিসেবে আমার বক্তব্য—কোন্ ধরনের কাহিনী সাফল্য লাভ করে—একথা বলা কঠিন। বহুবিচিত্র অনুভূতির তারে-বাঁধা মানব হৃদয়-যন্ত্রের কোনো একটি তারে সত্যিকার ঘা দিতে পারলেই সে কাহিনী উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

যদিও ছবির কাহিনীকার হিসেবে কিছু বলার অধিকার আমার আছে কিনা আমি জানি না। কারণ পুরো দশ বছর আগে ১৯৫৩ সালে আমার প্রথম গল্পের চিত্ররূপ 'যোগাবিয়োগ' (আজ প্রোডাকশান—অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়) হবার পর এপর্যন্ত আমার আর মাত্র ছটি গল্পের বাংলা চিত্ররূপ—(অগ্নি-পরীক্ষা' (অগ্রদূত), 'বলয়গ্রাস' (পিণাকী মুখোপাধ্যায়), 'কল্যাণী' (নীরেন লাহিড়ী), 'নবজন্ম' (দেবকী বসু), 'শশীবাবুর সংসার' (সুধীর মুখোপাধ্যায়), 'ছায়াসূর্য' (পার্থ-প্রতিম চৌধুরী) ও দুটি অ-বাংলা 'যোগ-

'স্বর্গ হতে বিদায়' চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

বিয়োগ' (তামিল), 'অগ্নিপরীক্ষা' (তামিল) ছবি পর্দায় প্রদর্শিত হয়েছে। আর একটি 'তা হলে' (গুরু বাগচী) প্রস্তুতির পথে।

অবশ্য একটি বাংলা ('ছাড়পত্র) (প্রভাত মুখোপাধ্যায়) ও কয়েকটি অ-বাংলা (ছাড়পত্র শশীবাবুর সংসার, যোগাযোগ (এ-ভি-এম) 'অগ্নিপরীক্ষা' (উত্তমকুমার। প্রস্তুতির অপেক্ষায় আছে, কিন্তু সেগুলি কবে হবে, অথবা শেষ পর্যন্ত সবগুলি হবে কিনা জানি না।

কাজেই আমার কাহিনীকার হিসেবে অভিজ্ঞতা মাত্র ওই ছ'-সাতটি গল্পের। তথাপি যে আমার কাছে এ প্রশ্ন করা হয়েছে এটা আমার পক্ষে যেমন গৌরবের, তেমনি বিস্ময়েরও। আমার বক্তব্য বলতে পাওয়ার জন্য আমি প্রশ্নকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ।

চলচ্চিত্র-জগতে যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ আমার হয়েছে, আমার বিশেষ সৌভাগ্যবশে তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমার ব্যবসায়িক সম্পর্ক গৌণ হয়ে গিয়ে প্রীতির স্নেহের ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দেবকী বসু মহাশয়ের শান্ত সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা আমাকে অভিভূত করে, পিণাকী মুখোপাধ্যায় তো আমার ছোট ভাইদের একজন। চলচ্চিত্র-জগতের আরো অনেকের কাছেই আমি স্নেহ-ঋণে ঋণী।

বাংলা চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হ'তে দেখি। আমি এ বিষয়ে খুব একটা কিছু ভেবে দেখিনি। তবে মনে হয়—এই বিজ্ঞানের উন্নতি ও চিন্তার অগ্রগতির যুগে 'ভবিষ্যৎ অন্ধকার' ভাববার কোনো হেতু নেই। বাইরের কোন বাধা বা আইনের কড়াকড়ির অসুবিধে নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠে উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই এগিয়ে যাবে সে।

আর একটি কথা—যেটা হয়তো এখানে অবান্তর, তবু বলার বাসনা সংবরণ করতে পারছি না। ভারতীয় ছবি আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করছে এটা আনন্দের কথা, তথাপি বিদেশে প্রেরণের সময় ছবি নির্বাচনের ব্যাপারে জাতীয় মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। বিদেশী গল্পানুগ কাহিনীগুলিও যেমন বর্জনীয়, তেমনি বর্জনীয় ভারতের দৈন্য-দুর্দশা অনাচার-কুসংস্কার ইত্যাদির স্পষ্ট উদ্ঘাটনযুক্ত কাহিনী।

**—আশাপূর্ণা দেবী**

## চিত্রনাট্য ও চিত্রনাট্যকারের দায়িত্ব

হলিউডের প্রখ্যাত প্রযোজক গোল্ডউইনকে এক চিত্র-সমালোচক প্রশ্ন করেছিলেন—"উৎকৃষ্ট চিত্র নির্মাণের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কি? প্রযোজক, পরিচালক


মুক্তি আসন্ন

কালিকা চিত্রম এর

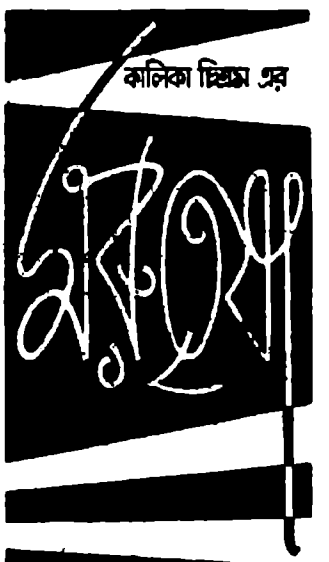

ভূমিকাংশে
সাবিত্রী ● অসিতবরণ ● সবিতা
তপতী ● পদ্মাদেবী ● রবীন ● নিতীশ
বিপিন গুপ্ত ● জহর রায় ● জয়শ্রী
প্রভৃতি

একমাত্র পরিবেশক
মহাজাতি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্স
৬১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট ● কলিকাতা-১৩

কণ্ঠসঙ্গীতে—
সন্ধ্যা ● সতীনাথ ● আলপনা ● গায়ত্রী
ও অন্নপূর্ণা নাগ ●

না অভিনেতা-অভিনেত্রী?" গোল্ডউইন উত্তর দিয়েছিলেন—"গল্প ও চিত্রনাট্য। ফল যেমন তার উৎসমুখের চেয়ে উচ্চে উঠতে পারে না, উত্তম চিত্রনাট্য—উত্তম পরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রী সৃষ্টি করে। চিত্র-নাট্য যদি দুর্বল হয়, তবে বড় বড় পরি-চালক বা অভিনেত্রী বা অভিনেতা দাও না কেন—বড় টাকাই খরচ কর না কেন—ছবি কিছুতেই ভাল হবে না।"

কথাটা খুবই সত্য। বাইজীর পক্ষে সারেঙ্গীদার যেমন, চিত্ররূপায়ণের পক্ষে চিত্রনাট্যকারও তেমনি। সারেঙ্গীবাদক বাইজীকে যেমন অনুসরণ করে, তেমনি তাঁকে আবার নেতৃত্বও করে—পরের সুর ও তাল দেখিয়ে দিয়ে। চিত্র-নাট্যকারের দায়িত্ব অনেকটা ঐ রকম।

সাধারণ লোকের ধারণা চিত্র-নাট্যকার বুঝি চিত্র-কাহিনীর নাট্যরূপ দেন—অর্থাৎ তার সংলাপই শুধু লেখেন। ওটা তাঁর অবলাকম নিশ্চয়ই—কারণ সংলাপই মঞ্চ-নাটকের মত চিত্রনাট্যের কথা-অংশের মূল উপাদান। কিন্তু তা ছাড়াও তাঁর আর একটি বড় কাজ হচ্ছে চিত্র-অংশকে পরিস্ফুটন করা, সংলাপের সাহায্যে এবং চিত্র-অংশের সঙ্গে সংলাপের মনোহর সমন্বয় সাধন করা।

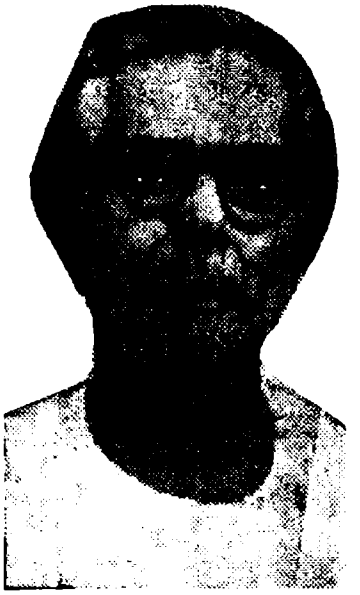

বাণীর সঙ্গে সুরের ও সুরের সঙ্গে বাণীর সার্থক মিলন ঘটানো যেমন সুর-কারের কৃতিত্বের পরিচয় তেমনি চিত্রের সঙ্গে তার সংলাপ-অংশের ও সংলাপ-অংশের সঙ্গে চিত্রের সার্থক মিলন ঘটানো —চিত্র-নাট্যকারের কৃতিত্বের পরিচয়।

এইখানে আর একটা কথা জানা দরকার যে, মঞ্চ-নাটকের সঙ্গে চিত্র-নাটকের প্রকৃতি-গত পার্থক্য আছে। মঞ্চশিল্প থেকে চলচ্চিত্রের শিল্পকলা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র--প্রখ্যাতনামা পরিচালক পুডফ্‌কিন্‌-এর এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়, চিত্রের আসল গতি বা মেজাজ হচ্ছে চিত্রের মূল কথা। মঞ্চ-নাটকে যে গতি আছে চরিত্র বিকাশের ও ড্রামাটিক ক্যাটাসট্রপিকে এগিয়ে আনার জন্য—তার মূল উপাদান দৃশ্যপট নয়.....সংলাপের সংঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকীয় চরিত্রের সংঘর্ষ। দৃশ্যপট সেখানে গৌণ। কিন্তু চিত্র-শিল্পে দৃশ্যের পর দৃশ্য সংযোগ করে এবং তার সঙ্গে ভাবপ্রকাশের জন্য—উপযুক্ত স্থানে সিম্বলিক সট্‌ ও ভিসুয়াল মেটাফার যোগ করে সেই সঙ্গে চিত্রানুগ সংলাপের সাহায্যে এগিয়ে আনতে হয় ঐ নাটকীয় সংঘাতকে। চিত্র-নাট্যকে এক কথায় বলা যেতে পারে চিত্রানুগ নাটক—যেখানে চিত্রই মুখ্য এবং সংলাপ অপেক্ষাকৃত গৌণ। এটা হচ্ছে তার দায়ভাগ। কারণ নির্বাক চিত্র থেকেই সবাক চিত্রের জন্ম।

প্রত্যেক শিল্পেরই একটা নিজস্ব শৈলী বা প্রকাশভঙ্গী আছে। আজকে চিত্রশিল্প শুধু একটা প্রকাণ্ড ব্যবসা-পর্যায়ে উন্নীত হয়নি; মানুষের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে শুদ্ধ শিল্পের সমস্ত গুণাবলী লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

চিত্রশিল্প একটা কম্পোজিট্‌ আর্ট, অর্থাৎ চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ, অভিনয়-মূকা-ভিনয়-নাচ-গান-আবহসঙ্গীত প্রভৃতি অজস্র শিল্পের সমন্বয় হয় চিত্রশিল্পে,—যেখানে আছে আর্ট এবং কাপেন্টির মনোহর সাক্ষাৎ। সার্থক চিত্র-নাট্যকারকে এ সমস্ত বিষয়ে অবহিত হয়ে তাঁর নৈপুণ্য প্রয়োগ করতে হয়।


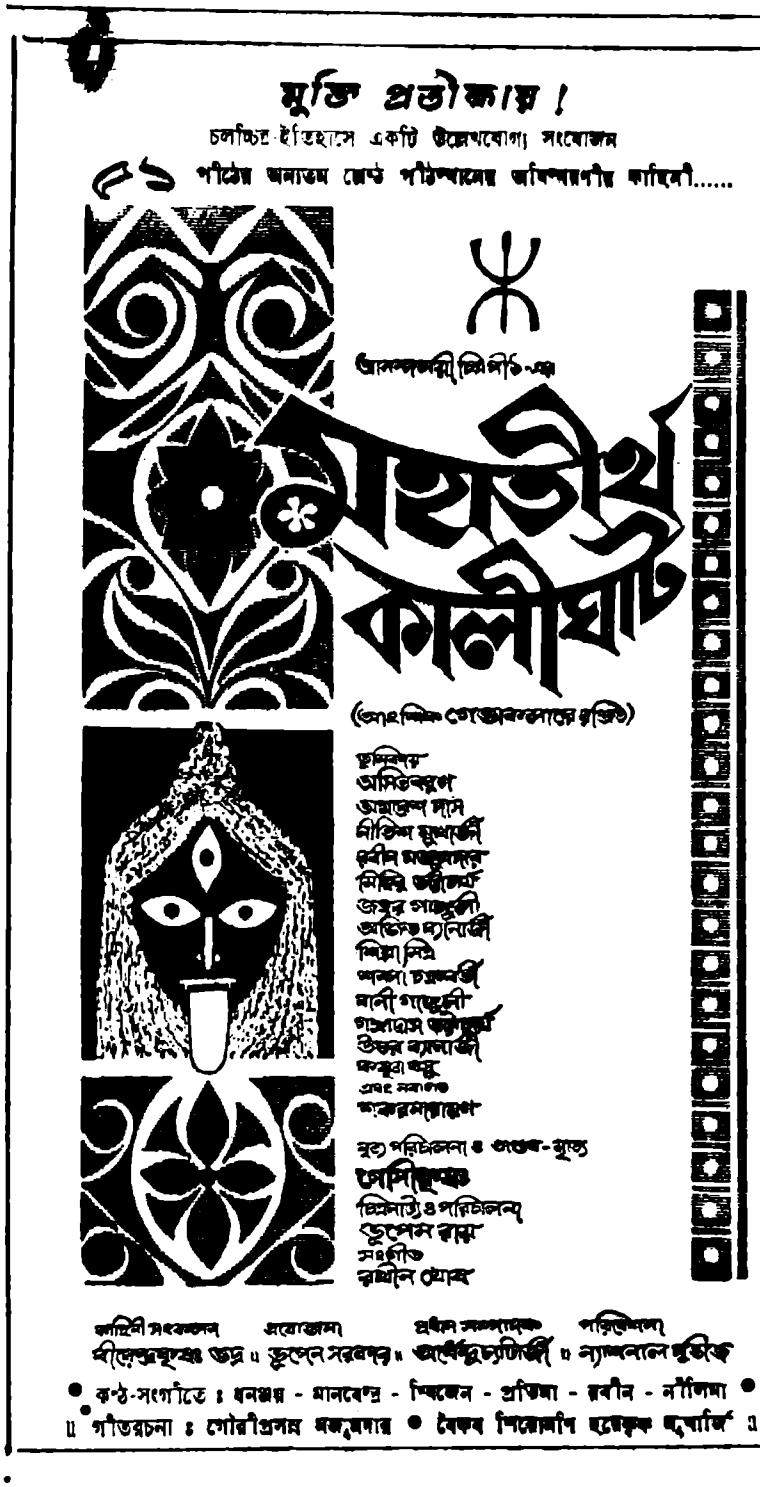

সার্থক চিত্রনাট্য তৈরী করতে হলে—চিত্রনাট্যকারকে ভাবতে হবে—চিত্রশিল্পের আঙ্গিকের দিক থেকে। কাহিনীতে যা ব্যক্ত হয়েছে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষর মধ্য দিয়ে, বলিষ্ঠ দৃশ্যের পর বলিষ্ঠ দৃশ্য যোগ করে তাই দেখাতে হবে চিত্রে প্রয়োজনমত সাবলীল সংলাপের সাহায্যে। চিত্রগ্রহণের মূল উপকরণ হচ্ছে ক্যামেরা যা অসাধ্যসাধনে পটীয়সী। দিগন্ত-প্রসারিত আয়ত দৃশ্যপট থেকে আরম্ভ করে মানসিকতার গভীরতম—গোপনতম ক্রিয়ামূলের চিত্র প্রকাশ করা তার সাধ্যের বাইরে নয়। শব্দগ্রহণ-যন্ত্রের নৈপুণ্যও অনুরূপ। চিত্র-নাট্যকারের অন্যতম কাজ—অযথা সংলাপের চাপে যথাযথ চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি না করা। এ-দায়িত্ব চিত্রনাট্যকারকে বহন করতে হবে সমান ভাবে পরিচালকের সঙ্গে।

প্রসিদ্ধ পরিচালক আইজেনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ওয়ার্ডস য়্যান্ড ইমেজেস'-এ বলেছেন শব্দের একটা অনুরূপ চিত্র আছে। শব্দচয়ন ব্যাপারে সার্থক চিত্রনাট্যকারকে সেই সকল শব্দই বেছে নিতে হবে—যা সেই বিশেষ ছবির পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।

অবশ্য সব সময় যে চিত্রনাট্যকার আদর্শের অনুরূপ কাজ করতে পারেন বা করার চেষ্টা করলেও তা গৃহীত হয় —তা নয়।

কোন ভাল উপন্যাসের সার্থক চিত্র-রূপের পরে চিত্রনাট্যকারকে শুনতে হয়—"ছবি তো ভালই হয়েছে—কিন্তু আমার বইয়ের তো কিছুই তেমন রাখেন নি।" অনেক সময় লাখ টাকা দামের নায়ক-নায়িকার কথামত চিত্র-নাট্যের পরিবর্তন করতে হয়—কারণ পাঁচ হাজার টাকা দামের কাহিনীর চিত্র-নাট্যকারের দাম খুব বেশী আড়াই হাজার টাকা মাত্র। আর পরিচালক পান নায়ক-নায়িকার অর্ধেক বা তারও কম, এবং প্রযোজকদের ধারণা লাখ টাকা দামের নায়ক-নায়িকারাই ঠিক। তাঁদের দামও যেমন বেশী এবং মোটা লাভও তাঁদের জন্যই হয়। অবশ্য বর্তমানে অন্তত একজনও পরিচালক আছেন—যিনি এই রীতি ভোলাচ্ছেন —তিনি সত্যজিৎ রায়।

এই প্রবন্ধ-লেখকের অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে একটির উল্লেখ করা হচ্ছে। আমার একটি বক্স-অফিস'-ধর্মা কাহিনী ও চিত্রনাট্য পরিচালক ও প্রযোজক খুব পছন্দ করলেন, প্রযোজক বললেন—ঐ বিশেষ চরিত্রে আমি অমুক অভিনেতাকে নেবো, তিনি খুব ভাল মৃত্যু-দৃশ্য অভিনয় করতে পারেন। কাজেই ঐ চরিত্রকে মেরে ফেলুন।" আমি বললাম, "কাহিনীতে কেউ মরে নি—কারণ তাদের মরবার দরকার নেই। জীবনে বিনা কারণেই মানুষ মরতে পারে কিন্তু সাহিত্যে তা হয় না, মরবার যথেষ্ট নাটকীয় কারণ না থাকলে কারো মৃত্যু ঘটে না।" তিনি জেদ করলেন, আমি বললাম, "এক কলমের খোঁচায় আমি তাকে মেরে ফেলতে পারি—তবে আমার গল্প মরে যাবার সম্ভাবনা আছে।" শেষে ঠিক হ'ল ঐ চরিত্র মরবে—আর আমি তাকে মেরে ফেলার মজুরী পাবো আরও পাঁচশ টাকা বেশী তাই-ই হ'ল, কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলব ঐ গোল্ডউইনের কথা। এক চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে গোল্ডউইনের মতান্তর হয়। চিত্র-নাট্যকার লিখেছেন—নায়িকা পঞ্চাশ হাজার ডলারের মালিক। গোল্ডউইন বললেন, "নায়িকাকে পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের মালিক করো"। চিত্রনাট্যকার রাজী হন না কিছুতেই —নানা যুক্তি দেখান তাঁর স্বপক্ষে। তখন গোল্ডউইন তাঁকে জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার গাড়ী কোন্‌টি? চিত্রনাট্যকার তাঁর গাড়ী দেখিয়ে দেন। গোল্ডউইন হেসে বলেন, 'ঐ পচা ফোর্ড' গাড়ীটা তোমার! আমার গাড়ী দেখ, ঐ বিরাট ক্যাডি। কাজেই আমার কথাই ঠিক আর তোমার কথা ভুল।" আমাদের দেশেও যিনি চেকে সই করেন—তিনি সম্ভ্রান্ত—আর যিনি যত বেশী মাইনে পান তাঁর কথা তত ঠিক! টাকার দাম দিয়ে বিচার হয় শিল্প-বুদ্ধি—আমেরিকার মত আমাদের দেশেও।

কাহিনী (নাটক বা উপন্যাস) এক আঙ্গিক অনুসরণ করে, চিত্র অনুসরণ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিককে। সাতাশ পাতার কাহিনী চিত্রে রূপান্তরিত হয়—মাত্র বার হাজার ফুটে। আবার চার পাতার কাহিনী থেকে ষোল হাজার ফুটের চিত্র হয়। হিমালয় বা সমুদ্র বর্ণনায় লেখক যেখানে ব্যয় করছেন পঞ্চাশ পাতা—মাত্র পঞ্চাশ

ফুটের প্যানারমিক শট্-এ চিত্রে অনেক সার্থক দৃশ্যায়ন হয় সেই পর্যন্ত বা সমুদ্রের। যে মানসিক দ্বন্দ্ব বর্ণনা করতে লেখকের লেগেছে পঞ্চাশ পাতা—চিত্রে গোটা কতক সিম্বলিক শট ও ভিস্যুয়াল মেটাফার ব্যবহার করে তার যথার্থ রূপ দেওয়া যায়। কাহিনীর যে সব ঘটনা ক্রমিকধারায় বলতে লেখকের লেগেছে পাঁচশ পাতা—আর পাঁচশ বছর,—মাত্র সত্বরই মিনিটে আর পাঁচশ' শট-এ চিত্রে তা বলা যায়, একটা ক্লোজ-আপ চরিত্রের যে সংঘাত ফুটিয়ে তুলতে পারে চিত্রে তা বর্ণনা করতে লেখকের লাগে অনেক পাতা। গল্প যেমন এক যে ছিল রাজা—না বলে যেখান-সেখান থেকে আরম্ভ করা যায়—চিত্রও তাই—তবে চিত্রের একটা ঘটনাক্রম থাকা চাই। নাটক একটা কঠিন নিয়মে বাঁধা। উপন্যাসের মত এক কাহিনী বলতে বলতে অন্য কাহিনীতে যাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা নাটকে আসতে পারে না। চিত্রনাট্যেরও ঐ রকম একটা কঠিন নিয়ম আছে—যা নাটকের মত না হলেও কখনও স্বেচ্ছাচারী নয়। এক কথায় উপন্যাসের ঘটনার প্রকাশ—বর্ণনার মাধ্যমে, নাটকের ঘটনার প্রকাশ সংলাপের মাধ্যমে আর চিত্রে প্রকাশ চিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে। নাটক আর চিত্রের আর একটি প্রধান পার্থক্য হচ্ছে—অভিনয়-ভঙ্গীর পার্থক্য। "ইন সিনেমা ইউ আর নট টু য়্যাক্ট, বাট টু বি"—এ উক্তি সর্বাংশে সত্য।

নাটকে, উপন্যাসে ও চিত্রে এক একটা গল্প বলা হয়। নাটকে গল্প-বলার রীতি একরকম, উপন্যাসে সম্পূর্ণ অন্যরকম। চিত্রে গল্প-বলার রীতি তার নিজস্ব। আঙ্গিক বা টেকনিক-এর বিভিন্নতার জন্যই এ-পার্থক্য। উত্তম উপন্যাস ও নাটকের উত্তম চিত্রনাট্য এর সাক্ষী দেবে। নাটকে স্থূল ও মোটা ঘটনার স্থান নেই—স্থান নেই অতি সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির। চিত্রে দুয়েরই প্রধান স্থান আছে। হাজার হাজার লোক নিয়ে যুদ্ধও দেখাতে পারে চিত্র—পারে এক নিমিষের একটি চাহনিকে বড় করে পর্দায় ফেলে গভীরতম অনুভবকে প্রকাশ করতে। সকল চিত্র-নাট্যকারের এ-বিষয় সজাগ দৃষ্টি ও সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

যেহেতু চিত্রনির্মাণে পরিচালকের স্থান সবচেয়ে উঁচুতে সেইহেতু চিত্র-নাট্যকারকে রচনা করতে হয় চিত্রনাট্য তাঁর সঙ্গে সহযোগিতায়। নাট্যকার-কাহিনীকার, এমন কী পরিচালকেরও একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে। কিন্তু চিত্র-নাট্যকারকে হতে হবে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ও বিশেষ ফ্যাড-বিরহিত, যখন যে বইয়ের চিত্রনাট্য করার দায়িত্ব যাঁর উপর আসবে—তখন তাঁকে সেই বইয়ের মূল বক্তব্যের মধ্যে ডুবে যেতে হবে। কিন্তু তবুও থাকবে তাঁর নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য। চিত্রনাট্যের সবচেয়ে বড় ত্রুটি চিত্রধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হওয়া।

একাধিক চিত্রনাট্যকারের দ্বারা একই ছবির চিত্রনাট্য করানোর রীতি পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেও তা কখনও কখনও হয়ে থাকে।

চিত্রনির্মাণ ব্যাপারে চিত্র-নাট্যকারের দায়িত্ব খুব বেশী হলেও তাঁর জীবন অনেক সময় খুব সুখের নয়—যদিও চিত্র-নির্মাণ টিমের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধির মাপ-কাঠিতে তিনি প্রায় সময়ই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং শ্রেষ্ঠ দরিদ্র। অমুক মানিবের চাকর তিনি—প্রযোজক-পরিচালক তো আছেনই—তার ওপর আছেন পরিচালকের সহকারীবৃন্দ—যাঁরা প্রায়ই সবজান্তা। চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ, পরিচালনা হচ্ছে 'এক্সপার্ট জব'। কিন্তু বহু লোকেরই ধারণা— তাঁরা চিত্রনাট্য বা গল্প-রচনা সম্বন্ধে এক্সপার্ট, ওটা এতো সহজ ব্যাপার! গল্প সকলেই বোঝে। সব চিত্রনাট্যকারকে প্রায়ই একটি কথা শুনতে হয়—"সবই হয়েছে, তবে ঠিক জমল না—বা গপ্ করে ধরল না।" "এই জায়গাটা আর একটু উঁচু করে তুলতে হবে"—কাহিনী ও উঁচু করবার কোন জ্ঞান না থাকলেও। "নায়ক এবং নায়িকার সংলাপ বলতে আটকে যাচ্ছে, তাই এ-সংলাপ বদলাতে হবে।" অনেক সময় উচ্চমূল্যের নায়িকারা পরিচালককে বলেন নিজের অক্ষমতা ঢাকার জন্য, "ও কথাগুলো ঠিক লাগছে না বা হচ্ছে না, বদলে দিন।" পরিচালকের পরিচালনায় বেচারা চিত্র-

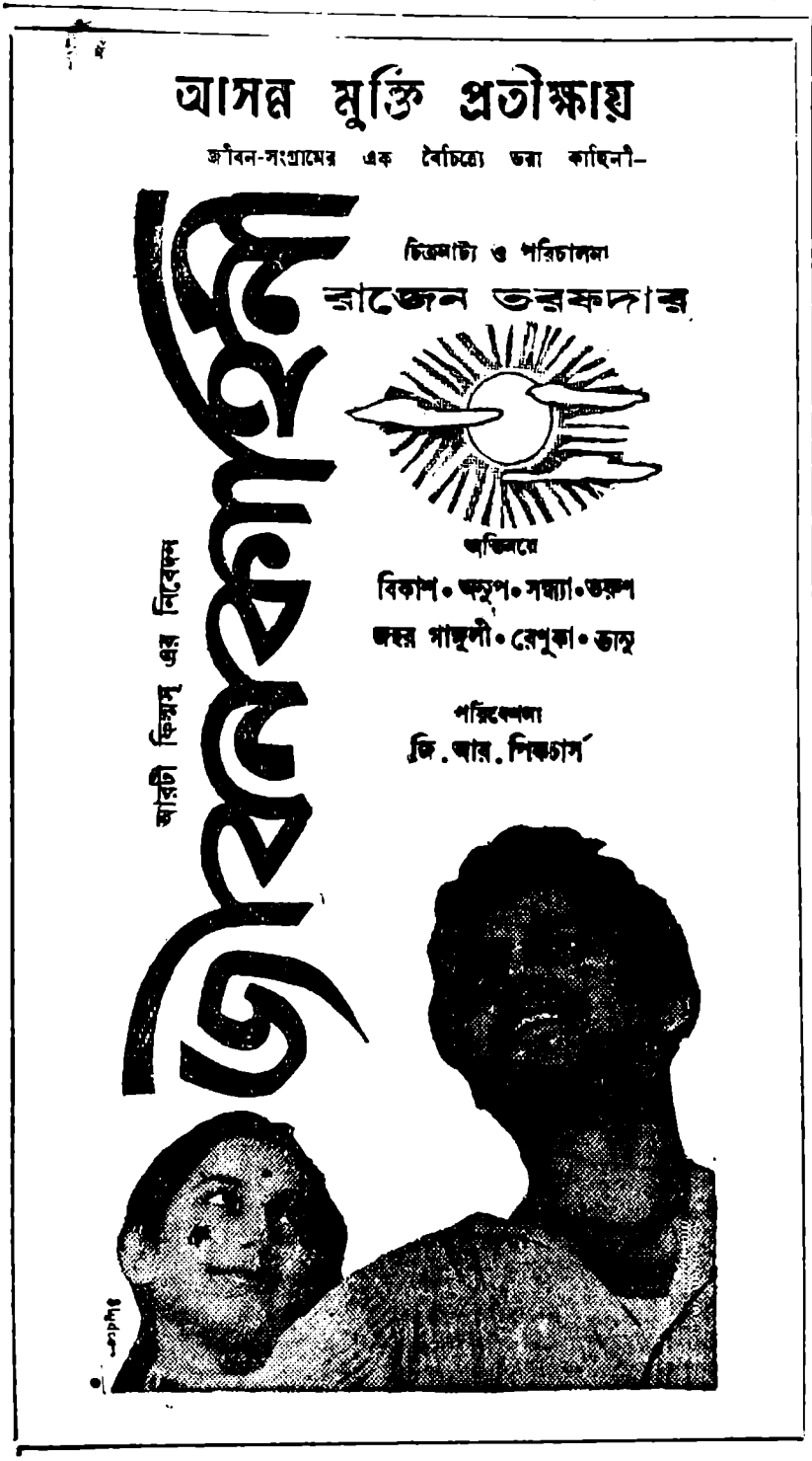

নাট্যকারকে বদলে দিতে হয়। কারণ লাখ টাকা দামের নায়িকাকে পরিচালক চটাতে সাহস করেন না। আর আড়াই হাজার টাকার চিত্রনাট্যকার তো তুচ্ছ।

এমন কজন খ্যাতিলোভী পরিচালক বাংলা দেশে আছেন যাঁরা চিত্রনাট্যকারের তৈরী চিত্রনাট্যের শট ভাগ করে জানিয়ে দেন চিত্রনাট্য ও পরিচালনা তাঁদেরই নিজের। বেচারী চিত্রনাট্যকার তাঁর সামান্য খ্যাতি থেকেও অনেক সময় বঞ্চিত হন। কারণ তাঁর দায়িত্ব গুরু হলেও অধিকার নেই বললেই চলে। রাজার নন্দিনী প্যারী—যা করিস তা শোভা পায়।

আমেরিকায় 'রাইটার্স গিল্ড' তৈরী করে চিত্র-লেখকেরা তাঁদের অধিকার বজায় রেখেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে তা এখনো হয়নি। কারণ ব্যবসা সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে কর্মীদের দাবীর প্রতিষ্ঠা হয় না।

চিত্রনাট্যকাররা যে সব সময় তাঁদের কাজের উপযোগী তাও না। একজন খ্যাতিমান লেখক হতে পারেন—কিন্তু চিত্রনাট্যকার হতে পারেন না, কারণ চিত্র ও চিত্রনাট্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ঐ সিনেমা দেখা পর্যন্ত। তার ওপরে চিত্রনির্মাণ ব্যাপারে একটা ম্যাড জিনিয়স থাকা যেমন থাকে চিত্রনাট্যকারের ও পরিচালকের;—যেটা সাধারণত লেখকদের মধ্যে অভাব;—সেটা হচ্ছে একটি অদ্ভুত স্বয়ংসিদ্ধ নাটকীয়তার জ্ঞান। স্বভাবসিদ্ধ পটুত্বে উপন্যাস বা গল্পলেখকের চেয়ে নাট্যকার অনেক সময় বেশী ভাগ চিত্রনাট্যকার হন।

চলচ্চিত্র শুদ্ধ শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত হলেও চিত্রনাট্য এখনও শুদ্ধ নাটকের সম্মান পায়নি, তার অনেক কারণের মধ্যে একটি কারণ ভারতীয় চিত্র-ব্যবসায় চিত্রনাট্যকার এখনও বেশীর ভাগ সময়—আজ্ঞাবহ বশংবদ হ্যাক মাত্র।

তবে বাংলা দেশের চিত্রশিল্পে আজ যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছে তাতে আশা করা যায় চলচ্চিত্রে অগণ্য কর্মীদের সঙ্গে চিত্রনাট্যকারও তাঁর উপযুক্ত স্থান ও মর্যাদা পাবেন। অলমতি বিস্তরণে।

—নিতাই ভট্টাচার্য

## পরিচালকের কাজ

ছাত্রাবস্থায় কোনো ভালো ছবি দেখলে একটা প্রশ্ন প্রায়ই মনে জাগত। প্রশ্নটি হোল—এই ভালো ছবির কোন কোন ভালো জিনিসটির জন্য পরিচালক দায়ী? ভালো অভিনেতা ভালো অভিনয় করবেন, এতে আর আশ্চর্য কী? ভালো ক্যামেরাম্যান তাঁর কাজ ভালোভাবেই জানেন, যেমন জানেন ভালো শিল্পনির্দেশক; এখানে পরিচালকের কারসাজি কোথায়? শব্দগ্রহণের উৎকর্ষের জন্যই বা পরিচালক কোন বাহবা নিতে পারেন? আর সম্পাদনা? তার জন্যে ত অভিজ্ঞ সম্পাদক রয়েইছেন। পরিচালকের কাছে তাঁর নতুন করে শেখার কিছু আছে কি?

আমি অনুমান করি আজও হয়ত অনেকের মনে এই ধরনের প্রশ্ন জাগে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে একক ভাবে এইসব কলাকুশলী যতই দক্ষ হ'ন না কেন, কোন একজন ব্যক্তিসম্পন্ন অধিনায়কের নির্দেশ না পেলে এঁদের বিভিন্নধর্মী প্রয়াসকে সুসংবদ্ধভাবে একত্র করে একটা ছবির কাজে প্রয়োগ করা অসম্ভব। উপরন্তু, কোন ছবির কাজের শেষে সমগ্র ছবির চেহারাটি কেমন দাঁড়াবে। তারই মানসকল্পিত রূপটি পর্দার প্রতিফলিত হোক, এই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

অভিনেতা যতই উঁচুদরের শিল্পী হন না কেন, কোন দৃশ্যে তাঁর অভিনয়ের মাত্রা কী হবে, সেটা বিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, যেহেতু সমগ্র ছবির কল্পনাটি তাঁর নয়, পরিচালকের। পরিচালক নিজে দক্ষ অভিনেতা না হলেও অভিনয়ের রীতি আকারে-ইঙ্গিতে প্রকাশ করার ক্ষমতা তাঁর থাকা চাই। অভিনয়ের দোষগুণও তাঁকে বিচার করতে হয়, এবং দোষ হলে সে-দোষ সংশোধনের উপায় জানতে হয়।

পরিচালকের দ্বিতীয় কাজ হ'ল, কোন্ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে একটি দৃশ্যকে

দেখতে হবে সেটা বিচার করা। দৃষ্টিকোণ নির্বাচনের ভুলে ভালো অভিনয়ও মাঠে মারা যেতে পারে, সুলিখিত নাটকীয় দৃশ্য পর্দায় নিষ্প্রাণ মনে হতে পারে। এইখানে ক্যামেরাম্যানকে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন এসে পড়ছে। ক্যামেরাযন্ত্রের ব্যবহার হাতে-মাতে না শিখলেও, ক্যামেরার দৌড় কত-খানি, তার বিভিন্ন লেন্সের কী ব্যবহার, কী বিশেষত্ব; ক্যামেরা এগোনো-পেছোনোর প্রয়োজন কখন, তার সার্থকতা কী—এইসব জানতে হবে।

শব্দযন্ত্রীর কাজও পরিচালকের নির্দেশের অপেক্ষা রাখে। শব্দগ্রহণের যান্ত্রিক সমস্যায় তাঁর কোন হাত নেই, তবে কোন দৃশ্যে কোন শব্দ কীভাবে ব্যবহার হবে সে-জ্ঞান পরিচালকের থাকা দরকার। স্টুডিওর কৃত্রিম পরিবেশে তোলা দৃশ্যকে আশ্চর্য বাস্তব ও বিশ্বাস্য করে তোলা যায় শব্দের ব্যবহারে।

সবশেষে সম্পাদনার কাজে পরিচালককে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়, কারণ সম্পাদনাই চলচ্চিত্রে গতি ও প্রাণসঞ্চার করে। অসংলগ্ন কতগুলি শট্ ও দৃশ্যকে কীভাবে পরপর জোড়া হবে তার মোটা-মুটি ইঙ্গিত চিত্রনাট্যেই দেওয়া থাকে। কিন্তু সব সময়ে সেসব ইঙ্গিত অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ না করে প্রয়োজন বুঝে কিছু

অদলবদল করতে হয়। পরিচালক সম্পাদকের পাশে থেকে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সেইসব পরিবর্তন করেন।

অভিনেতা, ক্যামেরাম্যান, শিল্পনির্দেশক মেকআপম্যান, সম্পাদক—এঁদের সকলকেই যেমন পরিচালক নির্দেশ দেন, তেমনি আবার সময় সময় এঁদের ব্যক্তিগত মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্য নিতেই কসুর করেন না। এই কারণেই শেষপর্যন্ত চলচ্চিত্র-রচনায় একটা যৌথশিল্পের দিক থেকেই যায়। তাই সব সময়েই কোন ছবি ভালো হলে তার জন্য বাহবা পরিচালকের সঙ্গে সঙ্গে কলা-কুশলীদেরও আংশিকভাবে প্রাপ্য।

**—সত্যজিৎ রায়**

## চলচ্চিত্রশিল্পী হতে চাই

চলচ্চিত্র-জগতে আমার প্রবেশের ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ধরণের বললেও অন্যায় হবে না। এদেশে সিনেমেটোগ্রাফী শেখবার জন্যে কোনো ভালো স্কুল না থাকায় ক্যামেরাম্যান যাঁরা হতে চান, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোনো না কোনো ক্যামেরা-ম্যানের সহকর্মী বা সহকারী হিসেবে জীবন আরম্ভ করেন। আমিও তাই করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু কোথাও কোনো সুযোগ পাইনি। এমনকি বিদেশে গিয়ে বিদ্যেটা আয়ত্ত করবার কথাও ভেবেছিলুম এবং যদি 'পথের পাঁচালী'র কাজে ব্রতী না হতুম, তাহলে হয়ত বিদেশের কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে সিনেমেটোগ্রাফী শিখেও আসতুম। আমাদের দেশে আজ অবশ্য সিনেমেটোগ্রাফী শেখবার সুবিধে হয়েছে; কিন্তু এই সুবিধে কি অসুবিধেরই সৃষ্টি করছে না, এ প্রশ্নও মনে জাগছে।

'অপরাজিত' চিত্রে নায়ক অপু ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

কারণ চিত্রজগতে যাঁরা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ক্যামেরাম্যান, তাঁদের সবাইকেও সর্বক্ষণের জন্যে নিযুক্ত রাখার ক্ষমতা আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্পজগতের নেই। কাজেই আরও নতুন ক্যামেরাম্যান সৃষ্টি হ'লে নতুনতর সমস্যার সৃষ্টি হয় না কি? কিন্তু এখানে সে আলোচনা অবান্তর।

ছেলেবেলা থেকেই হয় ক্যামেরাম্যান নয় আর্কিটেক্ট হবার বাসনা ছিল। কিন্তু আই-এসসি পাশ করবার পর একেবারে ঠিকই করে ফেললুম যে, চলচ্চিত্রের ক্যামেরাম্যানই হব। কিন্তু সুযোগ কোথায় শেখবার? অতএব বাবা-মা বললেন, বি-এসসিটা পড়; পড়তে পড়তে যদি কোনো সুযোগ এসে যায়, পড়া ছেড়ে দিলেই হবে। সুযোগ জুটেও গেল। বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক জাঁ রেণোয়া এলেন, 'রিভার' ছবি তুলতে। আমি তাঁর দলের ভারতীয় কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলুম; তাঁরা সোজা 'না' করে দিলেন। শেষে পরিচালক, প্রযোজক এবং ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে দেখা করলুম; তাঁরাও সমান উত্তর দিলেন—নতুন কোনো লোককে নেওয়া সম্ভব নয়। শেষে অনেক বলা-কওয়াতে তাঁরা আমাকে ছবিখানির স্যুটিং দেখবার সুযোগ দিতে রাজী হলেন। আমি এই সুযোগটুকু পেয়েই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলুম। বি-এসসি পড়ায় ইস্তফা দিয়ে আমি শিক্ষার্থী ছাত্রের মত 'রিভার' ছবির স্যুটিং আগাগোড়া দেখতে লাগলুম। অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে। তবে, সকলেই জানেন, ছবিটি রঙীন ছিল কাজেই ঐ রঙীন ফোটোগ্রাফীর যেটুকু কায়দা-কানুন দেখে দেখে শিখেছিলুম বলে মনে হয়েছিল, তা' কাজে লাগাবার সুযোগ আজও পাইনি।

সত্যজিৎ রায়ের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের অনেক দিনের পরিচয় থাকলেও সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না; শুধু জানতুম, তিনি বইয়ের প্রচ্ছদপটের একজন নামকরা ডিজাইনার এবং স্বনামধন্য সুকুমার রায়ের পুত্র। শুনলুম, তিনি একটা ছবি করবেন এবং এজন্যে প্রচুর পড়াশুনো করছেন। আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেলুম যে, তিনি পথের পাঁচালীর কাজ শুরু করলে আমাকে তাঁর ক্যামেরাম্যানের সহকারী হবার সুযোগ দেবেন। কিন্তু যাঁর এতে ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করবার কথা ছিল, তিনি বেশী দিন বেকার বসে থাকতে না পেরে বাংলাদেশের বাইরে চলে গেলেন। তাই যখন সত্যি সত্যিই 'পথের পাঁচালী' তোলবার ব্যবস্থা পাকা হ'ল, তখন সত্যজিৎবাবু আমাকে বললেন, তুমিই এর ক্যামেরার কাজ কর। এই প্রস্তাবটা আমার কাছে যেমন বিস্ময়কর তেমনই রোমহর্ষক মনে হয়েছিল; কারণ এর জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। মানিকদা (সত্যজিৎবাবু) বললেন, তুমি যখন স্থিরচিত্র এত ভালো তুলতে পার, তখন চলচ্চিত্রই তুলতে পারবে না কেন—এও ত স্থিরচিত্রেরই সমষ্টি (সিরিজ অব স্টীল পিকচার্স)। আমি তাঁর কথাতে রাজী হলাম; কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, তফাৎ আছে বৈকি। আমার জানা নেই, পৃথিবীতে এমন কোনো পরিচালক আছেন কিনা, যিনি তাঁর প্রথম ছবি পরিচালনা করতে গিয়ে এমন একজন আনাড়ী লোককে ক্যামেরাম্যান হিসেবে নিয়ে কাজ করেছেন। অবশ্য এ সম্পর্কে তাঁর বহু শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে তাঁকে সদুপদেশ শুনতে হয়েছিল; কিন্তু তিনি অবিচলিত থেকে তাতে কর্ণপাত করেননি। অবশ্য আমাকে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি বেশী সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, কি আমি ঐ দায়িত্বপালনে স্বীকৃতি দিয়ে বেশী সাহসের পরিচয় দিয়েছি, তা' আজও বুঝতে পারি না। প্রথম দিনের স্যুটিংয়ের 'রাশ' দেখবার আগে প্রেক্ষাগৃহের আলো যখন নিভে গেল, তখন সেই অন্ধকার কয়েকটি মুহূর্তে যে সাসপেন্স আমি অনুভব করেছিলুম, তা অবিস্মরণীয়। যাই হোক, কাজ তো চলল, কিন্তু তখন আমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছি। কারণ একজন ক্যামেরা-অ্যাসিস্ট্যান্টেরও যে-সব জিনিস জানা আছে, আমার তাও জানা ছিল না—প্রতিটি পদক্ষেপে সমস্ত জিনিস জানতে বুঝতে হয়েছে এবং নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হয়েছে। তবে এই কিছু না-জেনে কাজ করার মধ্যেও একটি উত্তেজনা ছিল, যে উত্তেজনা কোনো


শুভমুক্তি আসন্ন!

চরিত্র চিত্রণে
অসিতবরণ
শীলা পাল
অপর্ণা দেবী
কেতকী দত্ত
রেণুকা রায়
প্রতিমা চক্রবর্তী
শ্যামলাহা
বিভূ ভট্টাচার্য
সমরকুমার
শ্রীপতি চৌধুরী
মিন্টু চক্রবর্তী
রমা দাস
এবং
উত্তর ব্যানার্জী
নবাগতা
সন্ধিতা ময়নাবাঈ

কণ্ঠসঙ্গীতে
ধনঞ্জয়
মান্নাদে
সতীনাথ
পান্নালাল
প্রতিমা
উমাগুহা
শান্তুলী
মাধুরী

অরোরার সঙ্গীত-বাহন ভক্তি নিবেদন

রাধাকৃষ্ণ

পরিচালনা • অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী
সঙ্গীত • রবীন ঘোষ

চিত্রনাট্য-বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র • গীতরচনা • বৈষ্ণবশিরোমণি ভক্তেন্দুকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভালো সিনেমেটোগ্রাফী স্কুলে পড়ে কাজটা শিখে করলে কিছুতেই পেতুম না।

আমার অল্পদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, প্রযুক্তিবিদ্যা বা টেকনিক্যাল জ্ঞান ক্যামেরাম্যানের নিশ্চয়ই থাকা উচিত এবং ভালো যন্ত্রপাতি পেলে কাজ ভালো হয়; কিন্তু ভালো ক্যামেরাম্যান হতে গেলে এই দুটো জিনিস ছাড়াও যা দরকার, সে হচ্ছে টেস্ট বা রুচিবোধ। এই রুচিজ্ঞানের পার্থক্যই একই শিক্ষায় শিক্ষিত দুজন লোকের মধ্যে পার্থক্য ঘটায়; এইজন্যেই বাংলাদেশ—যেখানে যন্ত্রপাতি আদৌ প্রথম শ্রেণীর নয়, সেখান থেকেও ভালো ছবি বেরুনো সম্ভব, অথচ হলিউড থেকে অনেক বাজে ছবিও বেরোয়। আমার ধারণা এই রুচিবোধের পার্থক্যই ভালো বা খারাপ ক্যামেরাম্যানের সৃষ্টি করে। এই পার্থক্যের জন্যেই ফোটোগ্রাফীতে এত বিভিন্ন স্টাইল দেখতে পাওয়া যায়। কোনো ক্যামেরাম্যান হয়ত অমাবস্যার রাত্রিতেও নায়িকার মুখ কালো করতে নারাজ, আবার কেউ হয়ত মনে করেন যে, দিনের বেলাতেও নায়িকার

মুখ অনেকখানি না-দেখানো যেতে পারে মুড সৃষ্টি করবার জন্যে। গল্প যেটা চাইছে, পরিচালক যে মুড সৃষ্টি করতে চাইছেন, ক্যামেরাম্যানের কর্তব্য তাই সৃষ্টি করতে সাহায্য করা। ভালো পরিচালক মাত্রই যেমন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পরিচালনা করেন, তেমনই তিনি ক্যামেরাম্যান শব্দযন্ত্রী, সঙ্গীত-পরিচালক, শিল্প-নির্দেশক প্রভৃতি সকল কলাকুশলীকেই পরিচালনা করেন। গল্পের একটা বিশেষ দৃশ্যে পরিচালক যে মুড সৃষ্টি করতে চাইছেন, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান, শব্দযন্ত্রী, সঙ্গীত-পরিচালক, শিল্প-নির্দেশক প্রভৃতি সকলেরই তাঁদের বিভিন্ন রাস্তায় একযোগে সেই মুড সৃষ্টি করার দিকেই লক্ষ্য রাখবার চেষ্টা করা উচিত। সিনেমা হচ্ছে একটি যৌথ প্রচেষ্টা—এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিপূরক। সফল ফটোগ্রাফী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়কেও সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

আমি অনুভব করেছি, ফোটোগ্রাফীর সঙ্গে আবহসঙ্গীতের একটা নিকট-সম্পর্ক রয়েছে, অথচ দুঃখের বিষয় যে, এ দুটো কাজ একসঙ্গে করা হয় না বা করা যায় না। ক্যামেরাম্যান যখন স্যুটিং করছেন, যখন লাইটিং অর্থাৎ দৃশ্যকে সুসঙ্গতভাবে আলোকিত করছেন, তখন সেই বিশেষ দৃশ্যে আবহসঙ্গীত পরে কি হবে, সে-সম্বন্ধে তাঁর সঠিক কোনো ধারণা থাকে না; যদি থাকত, তাহলে বোধ হয়, তিনি তাঁর কাজ আরও উন্নত করতে পারতেন অর্থাৎ মুড-সৃষ্টির সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাঁর অবদান আরও সার্থক হতে পারত। ফোটোগ্রাফী হয়ত ভালোই হয়েছে। কিন্তু আবহসঙ্গীত যোগ করবার পর যখন ছবি দেখেছি, তখন অনেক সময়ই মনে হয়েছে যে, এত সুন্দর এবং এই ধরণের সঙ্গীত দেওয়া হবে জানলে ফোটোগ্রাফীটা হয়ত একটু অন্যরকমের হলে আরও ভালো হত। এমনকি মনে হয়েছে, পুরো স্টাইলটাই হয়ত ঠিক হয়নি। যা করলে ভালো হত, সেটা স্যুটিং-এর সময়ে করবার সাহস পাইনি। কিন্তু ছবি দেখে মনে হয়েছে সাহস পেলে ভালোই হত। দৃশ্যকে আলোকিত করবার সময়ে মনে হয়েছে যে একটি বিশেষ ধরণের আলোকরীতি গ্রহণ করলে হয়ত বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, ক্যামেরাম্যানের যে সংযম থাকা উচিত, তা হয়ত থাকবে না। কিন্তু পরে আবহসঙ্গীত সমেত ছবি দেখে মনে হয়েছে, করলে সংযম হারাতুম না। কোনো কোনো বিশেষ দৃশ্যের জন্যে যদি আবহসঙ্গীত আগে থাকতে তোলা সম্ভব হত, তাহলে তা ক্যামেরাম্যানকে অনেক সাহায্য করতে পারত বলেই আমার ধারণা।

অভিনয়ের ব্যাপারে আমরা যাকে ওভার-অ্যাক্টিং বলি, ফোটোগ্রাফীর ব্যাপারেও ঠিক সেইরকম আছে। এবং আমার রুচি বলে যে ক্যামেরাম্যানের এই বাড়াবাড়ি বা 'ওভার' ব্যাপারটা সম্পর্কে সতর্ক থাকাই উচিত। সবাইকে ছাপিয়ে তিনি যেন নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা না করেন। এমন অভিনয়ও হয়, যাতে দর্শক ভুলে যান যে, অভিনেতা কোনোরকম অভিনয় করছেন। এমন ফোটোগ্রাফীও দেখেছি, যাতে মনে হয়েছে যে, আমি সিনেমা দেখছি না। যেন আমি সেই জায়গাতেই রয়েছি। ক্যামেরাম্যান কোথাও নিজের প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছেন

না, অথচ নিজের দায়িত্ব তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করে যাচ্ছেন। যে-সব ছবি বাস্তব-ধর্মী হয়, সে-সব ছবিতে এই ধরণের ফোটোগ্রাফীর একান্ত প্রয়োজন।

তা বলে একথা বলছি না যে সব রকমের ছবিতেই এই ধরণের ফোটোগ্রাফী হওয়া উচিত। বিষয়বস্তুর চাহিদা-অনুযায়ী ফোটোগ্রাফীর স্টাইলেরও পরিবর্তন হওয়া দরকার। কলকাতা শহরের ওপর তোলা কোনো ছবির ফোটোগ্রাফীর স্টাইল তো আর রূপকথার রাজকুমারের গল্পের মতো হবে না।

আসলে চলচ্চিত্রের ফটোগ্রাফী সম্পর্কে শেষ কথা হচ্ছে, গল্পের বিশেষ চাহিদা-অনুযায়ী চিত্রগ্রহণ করা এবং এখানে ক্যামেরাম্যানের নিজস্ব রুচিই হচ্ছে বড়ো কথা।

—সুব্রত মিত্র

## বাংলা ছবিতে শব্দযুগের প্রবর্তন

আনুমানিক বত্রিশ বছর আগে, মুখর হয়ে উঠলো বাংলা ছবি—সংলাপে ও সঙ্গীতে। গড়ে উঠলো স্টুডিও ফ্লোর। চারিদিকে পড়ে গেল নূতনের সাড়া—আমদানি হ'ল নানারকমের বৈদ্যুতিক আলো ও শব্দগ্রহণের সরঞ্জাম। নির্বাক যুগে বাংলাদেশে ছবি তোলা হত দিনের আলোয় কারও বাগানবাড়ীতে বা গঙ্গার ধারে কয়েকটি Reflector ও একটি চলচ্চিত্র-গ্রাহক ক্যামেরার সাহায্যে। অদম্য উৎসাহী কয়েকজন যুবকের উদ্যম ও কোনও ধনীর অর্থ ছিল তাঁদের সম্বল। ছবি তোলা ছিল তাঁদের শখ বা নেশা। পেশা বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চলচ্চিত্র-শিল্প, বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হল, সবাক যুগের প্রারম্ভে। মঞ্চের ভাল ভাল নাটক ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাস রূপায়িত হ'ল প্রাণবন্ত চলচ্চিত্রে, ভাষা ও সঙ্গীতের মাধুর্য, দর্শকের কাছে পরিবেশন করল নূতন রসে। দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনন্দে দর্শক মোহিত হয়ে গেল।

কলা-কৌশলের নূতন শাখার বাহক ও ধারক হিসাবে শব্দ-ধারক বা শব্দ-যন্ত্রীরা শিল্পে-সংশ্লিষ্ট অভিনেতা, অভিনেত্রী বা পরিচালক সকলের কাছ থেকে সম্মান ও সহযোগিতা পেলেন। তখনকার দিনে শব্দ-গ্রহণ যন্ত্র আজকালকার তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট ছিল ও তার ক্ষমতাও ছিল অপেক্ষাকৃত সীমিত। সে সময়ে নায়ক-নায়িকা ও পরিচালকের সহযোগিতায় সুষ্ঠু শব্দ-গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। আগেকার কালের বেশীর ভাগ পরিচালক শব্দগ্রহণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। (লক্ষ্য করেছি প্রমথেশ বড়ুয়া বা মধু বসুর ছবিতে শব্দ-গ্রহণকালে নিজের শব্দগ্রহণের মান অনেক উন্নীত হয়েছে।) দুঃখের বিষয় আজকাল-কার বেশীর ভাগ পরিচালকের মধ্যে এই ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য শব্দযন্ত্রী যাঁরা পরিচালক হয়েছেন তাঁদের বাদ দিয়ে একথা বলছি।

নির্বাক যুগের অনেক অভিনেতাকে বিদায় নিতে হ'ল কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ ভাল না থাকায়। তাঁদের স্থান পূর্ণ হল মঞ্চের সুকণ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী দিয়ে। ভাল গান গাইতে পারলে সুদর্শন বা সুদর্শনা না হ'লেও নায়ক বা নায়িকা হিসাবে মনোনীত হলেন বহু মঞ্চশিল্পী। চলচ্চিত্রে প্রমটিঙ চলে না। মঞ্চাভিনেতাদের অনেকেই বিনা প্রম্পটিংয়ে অভিনয় করতে খুব অসুবিধায় পড়লেন। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে—প্রায় তিরিশ বৎসর আগে দেবকী বসুর পরিচালনায় নিউ থিয়েটার স্টুডিওতে একটি হিন্দী ছবি তোলা হচ্ছে —কোনও একজন অভিনেতা দু-তিন বার সংলাপ ভুলে যাচ্ছেন, ফলে বার বার সেই শট নিতে হল; চতুর্থবারে হঠাৎ সেই অভিনেতাটি পকেট থেকে এক টুকরা কাগজ বার করে দেখে তাঁর সংলাপ নির্ভুল বলে দিলেন; দেবকীবাবু ও উপস্থিত সকলে উচ্চৈঃস্বরে হো-হো করে হেসে উঠলেন, এমন কি পরিচালক স্বয়ং 'কাট' পর্যন্ত বলতে ভুলে গেলেন। তাঁদের হাসি কিছুটা রেকর্ড করে রেকর্ডিং ক্যামেরা থামিয়ে দিলাম।

আগেই বলেছি, তখনকার দিনের ছবিতে নায়িক-নায়িকা, ভিক্ষুক, বাউল সকলে নিজেই গান করতেন, গানের ডিরেক্ট রেকর্ডিং হত। বিরাট পিয়ানো, অর্গ্যান ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বহু কষ্টে মাঠে বা পুকুরের ধারে নিয়ে যাওয়া হ'ত এবং গানের সঙ্গে সঙ্গে ছবি তোলা হ'ত। পুকুরের ধারে ছবিসহ গান রেকর্ডিং হচ্ছে, দু'তিন বার

রিহার্সালের পর "টেক" হবে; পরিচালক স্টার্ট সাউণ্ড এণ্ড ক্যামেরা বললেন, অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল। হঠাৎ একটি গাধা চীৎকার করে উঠল; কাট্-কাট্ শব্দে ছবি তোলা বন্ধ হল। সাউণ্ড-ভ্যান থেকে নেমে বললাম, "রাইচাঁদ, আপনার আর্টিস্টের গলা আজ ভাল নেই"। বিখ্যাত সঙ্গীত-পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল বললেন, "কি বিপদে পড়েছি বলুন তো, বাণীবাবু!" এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া গেল প্লে-ব্যাক পদ্ধতির প্রবর্তনে। যতদূর মনে পড়ে, প্রায় পাঁচ-ছয় বছর পরে নীতীন বসু পরিচালিত "ভাগ্যচক্র" বা "ধূপ-ছায়া" ছবিতে বাংলা-দেশে তথা ভারতবর্ষে প্রথম প্লে-ব্যাক পদ্ধতিতে একটি কোরাস নৃত্য-সঙ্গীত তোলা হল। প্লে-ব্যাক পদ্ধতিতে গান ষ্টুডিওতে আগেই রেকর্ড করে নেওয়া হয়; পরে শব্দ-প্রক্ষেপক-যন্ত্রের সাহায্যে গানের ছবি তোলা হয়। অর্থাৎ অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে শুধু গানের সঙ্গে ঠোঁট নেড়ে যেতে হয়। এই পদ্ধতিতে গান রেকর্ডিং অনেক সহজ ও সুন্দর হল। প্লে-ব্যাক পদ্ধতির সবচেয়ে বড় লাভ হল সু-গায়ক বা গায়িকার গান সুশ্রী ও সুঅভিনেতার মুখে সমন্বিত করা সম্ভবপর হল। দর্শকের কর্ণ ও চক্ষু দুই-ই তৃপ্ত হল। অভিনয়-শিল্পীর গান গাওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও অসুবিধে ভোগ হয় না।

টকীর প্রথম যুগে ছবি তোলা ক্যামেরা থেকে প্রচুর শব্দ হত; অভিনেতাদের এই শব্দের চেয়ে জোরে কথা বলতে বাধ্য করতেন শব্দযন্ত্রীরা। ভাল মাইক-বুম বা মাইক্রোফোন ঝুলাবার দণ্ডের অভাবে তাঁরা অভিনেতাদের বেশী চলা-ফেরা বা মাইক থেকে বেশী মুখ ঘোরানোয় আপত্তি করতেন। এই সব বাধা-নিষেধের ফলে সবাক চিত্র হয়ে উঠলো মঞ্চ-ঘেঁষা। অল্পকালের মধ্যেই দর্শকদের মঞ্চ-ঘেঁষা ছবি দেখার উৎসাহ কমে গেল। তাঁরা নির্বাক যুগের বহির্দৃশ্য-সম্বলিত ছবির মত সবাক-চিত্র দেখতে চাইলেন। দর্শক-চাহিদা মেটাবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন যন্ত্র-নির্মাতা ও শব্দ-যন্ত্রীরা—শব্দহীন ক্যামেরা, ভাল মাইক-বুম ও বহির্দৃশ্য গ্রহণোপযোগী "পোর্টেবল সাউণ্ড রেকর্ডিং" যন্ত্র উদ্ভাবিত হল। খোলা জায়গায় সংলাপ তোলার সময় শিল্পীদের সংলাপের সঙ্গে কাকের ডাক বা মোটরগাড়ী ইত্যাদির যে সব অবাঞ্ছিত শব্দ মিশে যায় তা-ও ডাবিং পদ্ধতিতে দূর করা সম্ভব হল। সবাক যুগের প্রথম দিকে এই সব ব্যবস্থা ছিল না। শব্দ-গ্রহণের অসুবিধা দূর হওয়াতে সবাক-চিত্রও সত্যকার চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে দর্শক সম্মুখে উপস্থিত হল।

প্রেক্ষাগৃহে আমরা যে সংলাপ বা যে গান শুনি তা দিয়েই আমরা বিচার করি শব্দ-গ্রহণ ভাল কি মন্দ। "সিনেমা-সাউণ্ড প্রোজেক্টর"-এর দোষে বা প্রেক্ষাগৃহের আভ্যন্তরীণ গঠন-দোষে অনেক সময়ে সুষ্ঠুভাবে গৃহীত শব্দও খারাপ শোনায়। ফলে চিত্র-সমালোচকের বিরূপ মন্তব্য শব্দ-যন্ত্রীদের নীরবে সহ্য করতে হয়। শরৎচন্দ্রের "স্বামী" মুক্তি পেয়েছিল শহরের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে। বেশীর ভাগ কাগজে শব্দগ্রহণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল; কেবল একটি কাগজে শব্দগ্রহণের নিন্দা ঘোষিত হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জেনে-ছিলাম, চিত্র-সমালোচকদের মধ্যে একমাত্র নিন্দাকারী ব্যক্তিই উত্তর কলিকাতার কোনও প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি দেখেছিলেন; অপর সকলে দক্ষিণ কলিকাতার কোনও নূতন প্রেক্ষাগৃহে ঐ ছবিটি দেখেছেন। বুঝলাম, শব্দ-প্রক্ষেপণের দোষে শব্দ খারাপ শুনিয়েছে। বছরের শেষে দেখা গেল, অনেক পত্রিকার বিচারে আলোচ্য ছবির শব্দগ্রহণ শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। বেশীর ভাগ প্রেক্ষাগৃহে গদীআঁটা চেয়ার, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত "হল" ও আলোকমালায় সজ্জিত বহির্ভাগ দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু ছবির কলা-কৌশলের মূল হল চিত্র ও শব্দ; এ দুটি বিষয়ে প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা যদি আর একটু বেশী মনোযোগ দেন, তাহলে তাঁরা শিল্প-সংশ্লিষ্ট সকলের ধন্যবাদার্হ হবেন।

চলচ্চিত্র মুখ্যত দৃষ্টি-শ্রুতিবাহিত শিল্প। চলচ্চিত্রের শব্দ-বিভাগে রয়েছে সংলাপ, সঙ্গীত, আবহ-সঙ্গীত ও পারি-পার্শ্বিক ধ্বনি বা "এফেক্ট-সাউণ্ড"। এই সব কটির সুষ্ঠু সমন্বয়ে ছবির (mood) ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়। এগুলি সাধারণতঃ পৃথকভাবে গৃহীত হয় এবং পরে রি-রেকর্ডিং; বা শব্দ-পুনর্যোজনা-কালে একীভূত করা হয়। যিনি শব্দ-পুনর্যোজনা করেন, তাঁর কেবলমাত্র কলা-কৌশলের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, তাঁর ছবির নাটকীয় বা আবেগময় দৃশ্যের মর্ম-রসটিও দর্শককে নিবেদন করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন—অবশ্য এ বিষয়ে বিচক্ষণ পরি-চালক শব্দযন্ত্রীকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। গান রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রেও শুধু ভাল হলে চলবে না; শব্দযন্ত্রী সঙ্গীতজ্ঞ না হতে পারেন, কিন্তু তাঁর 'মিউজিক্যাল সেন্স' থাকা বাঞ্ছনীয়। অ-সুর শব্দযন্ত্রী দ্বারা মনোজ্ঞ সঙ্গীতগ্রহণ অসম্ভব। আবহ-সঙ্গীত গ্রহণ-কালে অভিজ্ঞ শব্দযন্ত্রী সঙ্গীত-পরি-

চালককে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন; যেমন ছবির কোনও বিশিষ্ট অংশের mood বা ভাবের সঙ্গে গৃহীত কোনো সঙ্গীত ঠিক মিল খাবে কিনা, তিনি বলে দিতে পারেন।

ছবিকে প্রাণবন্ত করতে ধ্বনি বা "এফেক্ট-সাউণ্ড"-এর দান যে কত বড়, তা বলে শেষ

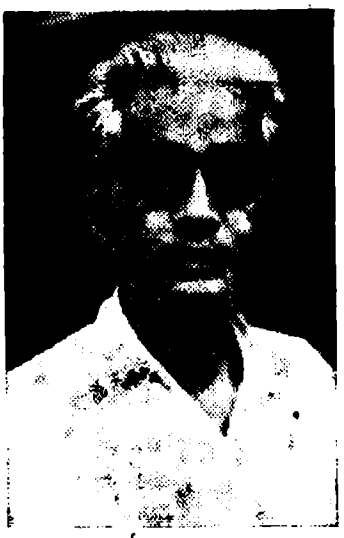

করা যায় না। ছবির ভাবপ্রকাশেও যথাযথ-ভাবে গৃহীত ধ্বনি খুব সাহায্য করে। যেমন জেলখানার সেলের মধ্যে তালা-দেওয়া গারদের মধ্যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একজন আসামী; সেখানে রক্ষীর ধীরগম্ভীর পদক্ষেপে বুটজুতার খট খট শব্দ যথেষ্ট ত্রাসের সৃষ্টি করবে। আবার ঐ একই কয়েদীর মুক্তির ক্ষণ যদি আসন্ন হয়, তখন রক্ষীর জুতার শব্দকে মৃদু রেখে তার হাতের চাবির রিনি-ঝিনি শব্দ কয়েদীর মনের ভাবটি আরও বেশী ফুটিয়ে তুলবে। 'ইলুশান' সৃষ্টি করতেও "এফেক্ট-সাউণ্ড" অত্যন্ত কার্যকর। স্টুডিওর অভ্যন্তরে একটি প্ল্যাটফরম ও ছোট গেটের পাশে টিকিট-কলেক্টর দাঁড়িয়ে—একটি রেলগাড়ী আসার শব্দ—থামার শব্দ— দণ্ডায়মান ইঞ্জিনের শব্দ—লোকের কোলাহল, মাল-বাহী কুলীসহ জনৈক যাত্রী গেটের দিকে এগিয়ে আসছে টিকেট হাতে করে—এমন সময়ে স্টেশনের ঘণ্টা, গার্ডের বাঁশী—ও ইঞ্জিনের হুইসেলের সঙ্গে গাড়ী ছাড়ার শব্দ শোনা গেল। ট্রেনটি দর্শককে না দেখালেও মনে হবে যাত্রীটি ট্রেনে করে এল। নির্জন রাত্রিতে ঝিঁঝির শব্দ ও বজ্রধ্বনিসহ ঝড়-বৃষ্টির শব্দ কেমনভাবে ছবিকে প্রাণবন্ত করে তোলে তা দর্শকরা প্রায়ই লক্ষ্য করেছেন।

বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পে সবাক চিত্রের সব-চেয়ে বড় দান হল বাংলাদেশে চলচ্চিত্র-ব্যবসার প্রসার লাভ। বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের প্রসার অনেকাংশে শব্দ-গ্রহণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। ভাষাহীন চলচ্চিত্রের আবেদন ছিল সর্বজনীন। বিদেশী নির্বাক চিত্র সকল দেশের দর্শকই উপভোগ করতেন। যখন ইংরাজী সংলাপ সহ বিদেশী চিত্র এদেশে এল, তখন এদেশের ইংরাজী-অনভিজ্ঞ দর্শক সে সব ছবি দেখে আনন্দ পেলেন না, এমন কি ইংরাজী-জানা অনেক লোকও ইংরাজী অ্যাকসেন্ট ভাল না জানায় ইংরাজী সংলাপ সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেন না। বোম্বাইয়ের হিন্দী, উর্দু ছবিও এই একই কারণে বাঙালী দর্শকের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হ'ল।

এই সুযোগে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বাংলা-দেশে একাধিক স্টুডিও গড়ে উঠল। বহু যুবক জীবিকার একটি নূতন পথ খুঁজে পেলেন। যিনি শখের যাত্রায় বেহালা বা ক্ল্যারিওনেট বাজাতেন এবং যাঁর ভবিষ্যতের আশা বাপ-কাকা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনিও স্টুডিওর সঙ্গীত-বিভাগে কাজ করে, নিজ সংসারের জন্য অর্থ রোজগার করতে লাগলেন। অনেক শিক্ষিত যুবকও নূতনের মোহে ও জীবিকার জন্য স্টুডিওতে যোগ দিলেন, বিশেষ করে শব্দযন্ত্রী হিসাবে।

সাত-আট বছর পার না হ'তেই সমস্যার পর সমস্যা এসে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পকে এমন ভারাক্রান্ত করে তুলল যে, নবাগত ঐ সব যুবক তাঁদের অতীত ভুলের জন্য অনুতাপ করতে লাগলেন। তাঁদের অবস্থা হল অভিমন্যুর চক্রব্যূহ ভেদের মত; বার হবার উপায় নেই, ভিতরেও মৃত্যু অনিবার্য।

নৈতিক অর্থে চলচ্চিত্র-শিল্প ব্যবসায়ের সত্তাকারের অংশীদার হলেন চিত্র-প্রযোজক, কলা-কুশলী (পরিচালকসহ), শিল্পী, চিত্র-পরিবেশক ও চিত্র-প্রদর্শক। এই ব্যবসায়ের প্রধান লভ্যাংশ ঘরে তোলেন চিত্র-প্রদর্শক অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহের মালিক। "হোল্ড-ওভার", "হাউস-প্রটেকশন", 'মিনিমাম গ্যারাণ্টি' প্রভৃতির দৌলতে চিত্র-প্রদর্শক নিশ্চিত-লাভের পথেই ব্যবসা চালাচ্ছেন।

চলচ্চিত্র-শিল্পের লভ্যাংশ যতদিন ন্যায়-সঙ্গতভাবে সকল বিভাগের মধ্যে বণ্টিত না হবে, ততদিন কলা-কুশলীর দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে না। বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্ট যদি আন্তরিক চেষ্টিত হন, তা'হলে হয়ত এর প্রতিকার হতে পারে। প্রয়োজনবোধে এই শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে সরকার যেন দ্বিধা না করেন।

—বাণী দত্ত

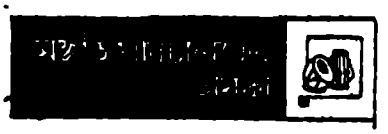

সঙ্গীত-পরিচালক রূপে আমার একুশ বছরের অভিজ্ঞতার জোরে আমি আজ বলতে পারি, যে আজকের দিনের সঙ্গীত-পরিচালক হচ্ছেন ছবির পরিচালকের ইচ্ছার অনুবর্তী।

কারণ আজ যে ছবিতে গান থাকে, সে হচ্ছে বেশীর ভাগ ফরমায়েসী—এখানে পরিচালক, প্রযোজক, পরিবেশক এমন কি প্রদর্শকের ইচ্ছাটাই বড়ো হয়ে উঠেছে এবং এঁদের ইচ্ছা মেনেই সঙ্গীত-পরিচালককে চলতে হয়। অবশ্য তাঁদের ইচ্ছা ও চাহিদার অনুগামী থেকেও নিজের সঙ্গীতের বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁকে অনেক সময়ে

জলন্ত বয়লার, জীবন্ত মেশিনের সঙ্গে জহর রায়, শোভা সেন, অনিল চ্যাটার্জী, মাধবী মুখার্জী, শেখর চ্যাটার্জী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, নীলিমা দাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় অরুণ রায়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন পাঁচ হাজার শ্রমিক।

কলকাতা
দিল্লী
ও সমস্ত দেশ
বোম্বাই
মাদ্রাজ

যে ছবির প্রতীক্ষায়
(তার পরিচালক উৎপল দত্ত
সঙ্গীত পরিচালনা রবিশংকর)
সে ছবি

# ঘুম ভাঙ্গার গান

বাজিমাত করতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, গায়ক-গায়িকার নির্বাচন আজকাল সঙ্গীত-পরিচালকের উপর ততটা নির্ভর করে না। আগেকার দিনে একখানা গান সিচুয়েশন-অনুযায়ী সুর হয়ে কার কণ্ঠে দিলে ভালো মানাবে এবং সে কতদিন অনুশীলনের পরে রেকর্ডিং করার উপযুক্ত হবে, সেটা সম্পূর্ণ-ভাবেই সঙ্গীত-পরিচালকের উপর নির্ভর করত। কিন্তু বর্তমানে সে প্রথার লোপ পেয়েছে। আজকের দিনে ছায়াছবির গান একজন সঙ্গীত-পরিচালককে অত্যন্ত স্বল্প সময়ে তৈরী করতে হয়, অত্যন্ত স্বল্প সময়ে শেখাতে হয়, অত্যন্ত স্বল্প সময়ে রেকর্ড করতে হয়। অর্থাৎ বক্স-অফিসওলা গাইয়েদের কোনোক্রমে খাপ খাইয়ে নেওয়াই আজকাল ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণে আজ বলা যেতে পারে, সঙ্গীত-পরিচালক ঠিকমত সুর করতে পারলেন কিনা, গাইয়ে ঠিকমত সুর আয়ত্ত করতে পারলেন কিনা, গানের রেকর্ডিং আরও ভালো হতে পারত কিনা,—তা বিচার করবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। এছাড়া দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আজকাল সঙ্গীতমনা এবং সঙ্গীতবোদ্ধা চিত্র-পরিচালকের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে। কিংবা মনে হয়, তাঁদের শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সময়ের অভাবে সঙ্গীত জিনিসটাকে আলাদা করে রেখে দেন বা ও নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। মনে হয়, সঙ্গীত-পরিচালকের ওপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও গুণগ্রাহিতা আজকাল যেন কমে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও যে আজকাল গান এত ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে, তার কারণও খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। যেখানে সঙ্গীত-পরিচালক নিজের কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সুরজ্ঞান কাজে লাগাবার সুযোগ পান; সেখানে তিনি আজও নিজের আসর জমাতে পারেন। উপরে লিখিত অসুবিধা সত্ত্বেও যে সঙ্গীত-পরিচালক অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে পারেন অর্থাৎ সিচুয়েশন-অনুযায়ী এবং গায়ক-গায়িকার মেজাজ ও বিশেষ রীতি-অনুযায়ী সুর তৈরী করে তাকে বাদ্যসঙ্গীত সহযোগে দর্শকের উপভোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করেন তিনিই সাফল্যলাভ করেন, অর্থাৎ আজ-কালকার অসুবিধা তাঁর নিত্যনতুন উদ্ভাবনী শক্তিকে বাড়িয়ে তুলেছে।

কিন্তু জনপ্রিয়তা অর্জনেই সঙ্গীত-পরিচালক সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না—তিনি দেখতে চান, তিনি কতখানি সৃষ্টিধর্মী—কতখানি তাঁর শক্তিকে তিনি কাজে লাগাবার সুযোগ পেলেন,—সেইখানে তিনি হিসাব মেলাতে পারেন তাঁর শিল্পী-মনের সঙ্গে। ফাঁকির সহজ হাততালি তাঁর পকেট ভরাতে পারে, কিন্তু মন ভরাতে পারে না নিশ্চয়ই।

দর্শকদের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় তাঁদের উপভোগের জন্যে। কিন্তু এই উপভোগ-স্পৃহার মানোন্নয়ন করার অবকাশ আছে। রাজনৈতিক নেতাদের মতো সঙ্গীত-পরিচালকেরও জনসাধারণের রুচি-উন্নয়নের মহৎ দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য এবং এই কর্তব্যপালনে তাঁকে সাহায্য করার দায়িত্ব চিত্র-পরিচালকের।

গানে সুর-যোজনাতেই সঙ্গীত-পরি-চালকের দায়িত্ব শেষ হয় না। তাঁকে তার থেকে গুরুতর কর্তব্য করতে হয় এবং শক্তির পরিচয় দিতে হয় আবহসঙ্গীত রচনায়।

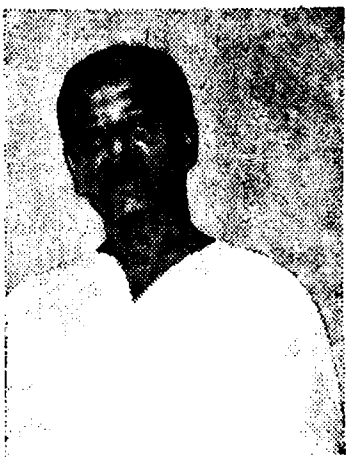

পরিচালকরা কাহিনীর সিচুয়েশান এবং সেই সিচুয়েশানে কতখানি সময় নেওয়া হয়েছে তা সঙ্গীত-পরিচালককে বুঝিতে দেন; কিন্তু যথার্থ আবহসঙ্গীত রচনা করতে হলে সঙ্গীত-পরিচালকের দৃশ্যগুলি চাক্ষুস দেখা দরকার মাত্র একবার নয়, বহুবার। তাহলেই দৃশ্যগুলির ভাব ও বক্তব্য তাঁর মনে ঠিকভাবে পরিস্ফুট হয় এবং তিনি দর্শক মনে প্রভাববিস্তারকারী আবহসঙ্গীতের সৃষ্টি করতে পারেন।

বাঙলা চলচ্চিত্রে সঙ্গীত-পরিচালকের ভূমিকা সেই কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

—রবীন চট্টোপাধ্যায়

## শিল্প নির্দেশকের মনের কথা

চলচ্চিত্র-প্রযোজনার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে শিল্প-নির্দেশনা নামে যে একটি বিভাগ আছে, সেকথা বর্তমানে জন-সাধারণকে নিশ্চয়ই নতুন ক'রে ব'লে দিতে হবে না। কিন্তু শিল্প-নির্দেশক অর্থে কেবল যে ইঞ্চি, ফুট মেপে, মিস্ত্রি, কুলি খাটিয়ে কতকগুলি ঘর-বাড়ী তৈরী করা নয়, তার পেছনে যে বেশ খানিকটা শিল্পবোধ বা শিল্পচেতনার প্রয়োজন আছে, সে কথা হয়তো অনেকেই মনে রাখেন না।

গল্প বা নাটকের সুষ্ঠু রূপ দিতে হলে যেমন সুঅভিনয়ের দরকার, তেমনি তাকে সজীব চেহারায় খাড়া করতে হলে স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী দৃশ্যপটেরও দরকার হয়। এই দৃশ্যপট ও সাজ-সজ্জার পূর্ণ দায়িত্ব শিল্পনির্দেশকেরই। যুগের চাহিদা-অনুযায়ী এবং নাটকের চরিত্র-অনুযায়ী ঘটনার অকুস্থান শিল্পনির্দেশককেই তৈরি করতে হয়। এর জন্য কোন যুগে কি ধরনের শিল্পের প্রাধান্য ছিল এবং কিরূপ সাজ-পোশাক হওয়া উচিত, এসব বিষয়ে তাঁর বিশদ জ্ঞান থাকা চাই। আজকাল কাহিনীর

বহির্দৃশ্যগুলি প্রধানতঃ বাইরেই তোলা হয়; তবু নাটকের এবং দৃশ্যগ্রহণের সুবিধার প্রয়োজনে এই বহির্দৃশ্যের অংশ-বিশেষ স্টুডিওর ভিতরেই গড়ে নেওয়া হয়।

আজকাল অনেকেরই মুখে বাস্তব-বাদিতার (realistic) কথা শুনে থাকি। কিন্তু বাস্তবের হুবহু নকল করাকেই শিল্পের চরম সার্থকতা বলা যায় না। বহুদিন আগে আমেরিকার ফিল্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম—"Director uses the camera not as an instrument of Photographic realism, but as an instrument of imaginative expression. Movie Film art instead of being realistic might be a possible reality and the mind of the audience could be brought into relation with the screen phychologically"

"শ্রদ্ধা, অনুরাগ, আকর্ষণ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ও সামঞ্জস্যের বোধ শিল্প-সৃষ্টির মূল কথা—সৃষ্টি হয় অনুরাগের পথে। অনুরাগ আগে; বিচার-বিশ্লেষণ পরে।" প্রকৃতির বাস্তব রূপ শিল্পীর মনে যে ভাব ও রস উদ্রিক্ত করে, সেই ভাব ও রস অন্যের মনে ধরিয়ে দেওয়াতেই শিল্প-সৃষ্টির সার্থকতা। শিল্পীর সাধনা তিনটি আধারকে ধ'রে: (১) স্বকীয়তা, (২) স্বভাব ও (৩) পরম্পরা। প্রথমেই স্বকীয়তা; স্বকীয়তা না থাকলে শিল্প হয় দুর্বল ও কৃত্রিম, ঐতিহ্যে অধিকার না থাকলে হয় স্থাণু ও কাঁচা; শিল্পীর নিজস্ব দান কিছু না থাকলে হয় প্রাণহীন। শিল্প শুধু স্বভাবসম্মত হ'লে হয় নকল মাত্র; শুধু পরম্পরায় দখল থাকলে হয় কারিগরি। নিছক বাস্তবকে রূপ দিলেই কোন উঁচুদরের শিল্প-সৃষ্টি হয় না। যেমন, সংবাদপত্রের বিশেষ কোন ঘটনা সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না; কিন্তু সংবাদপত্রের সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখক যখন তাঁর নিজের মনের রসমাধুর্য দিয়ে লেখেন, তখনই সেটা হয় সাহিত্য। তেমনই বাস্তবের পরিচিত চেহারার মধ্যে শিল্পীর মনের রস মিশিয়ে তাকে রসমধুর করে তোলাই শিল্পীর কাজ। তা বলে আমি বলছি না যে, সেটা বাস্তবকে অস্বীকার করে সৃষ্টি হবে। আমরা চোখের সামনে যা প্রতিনিয়ত দেখছি, তাকেই রূপ দিতে হবে—তবে তাকে নূতন করে দেখাতে হবে—এমনটি নেই—তবে হতে পারে—হলে মন্দ হয় না, এই-ভাবে। এই নূতন ক'রে দেখতে চাওয়াই ত মানুষের অন্তরের কামনা; এই নূতন করে দেখার মধ্য দিয়েই ত নূতন ধারার আগমন।

পরিচালকেরা শিল্পনির্দেশকদের কাছে অনেক সময় অনেক কিছু চান। কিন্তু বর্তমানে সেই চাহিদা-অনুযায়ী সময় ও অর্থ আমরা পাই না এবং সেইজন্য তাঁদের চাহিদা-অনুযায়ী সুষ্ঠু সৃষ্টি না হওয়ার দরুণ আমাদের ওপর অনেক সময়ে অকৃতিত্বের দোষারোপ এসে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে একটিমাত্র কথাই বলা যায়: দুই-পক্ষেরই কিছু আপোসরফা করা দরকার। বাংলা চলচ্চিত্রের সংকীর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে সামর্থ্য-অনুযায়ী যতটুকু পাওয়া সম্ভব, ততটুকুই চাওয়াটাই প্রকৃত বিচক্ষণতার পরিচয়। এমন কোন শিল্পী আছেন কিনা আমি জানি না, যিনি তাঁর নিজের কাজ ভাল হোক, এরূপ চান না। সৃষ্টির সুষ্ঠুতাই ত তাঁর কামা।

চলচ্চিত্র-শিল্পে নির্বাক যুগ থেকে আমি কাজ করে আসছি। তখনকার দিনে আর আজকালকার দিনে অনেক তফাৎ হয়ে গিয়েছে। তখন প্রথমতঃ সেটটি সম্পূর্ণ তৈরী হবার পর সুটিং প্রোগ্রাম রাখা হতো। এখন আর সে সুযোগ হয় না। তার প্রথম কারণ, অভিনয়-শিল্পীদের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সুটিং প্রোগ্রাম রাখা হয় এবং বইয়ের সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে গেছে। তাতেই আমরা সেট্ তৈরী করবার উপযুক্ত সময় অনেক সময়েই পাই না। তখনকার দিনে বেশীর ভাগ প্রযোজক স্টুডিওর মালিকেরাই হতেন এবং

সেইজন্য স্টুডিও-কর্মীরাও তাঁদের নিজের কাজ মনে করেই কাজ করতেন। বর্তমানে প্রযোজকরা ভাড়া হিসাবে স্টুডিওতে আসেন। তাই বর্তমান কাজে আর তখনকার দিনের কাজে পার্থক্য দেখা যায়—ভাড়া-বাড়ীতে বাস করা আর নিজের বাড়ীতে বাস করার মধ্যে যে পার্থক্য, অনেকটা সেই ধরনের। কিন্তু এত বাধা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত ধরনের কাজ হচ্ছে। ক্রমশঃ মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ছে এবং তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি। অভিজ্ঞ প্রযোজক ও পরিচালকদের যদি পূর্ণ সহানুভূতি পাওয়া যায়, তবে আশা করি শিল্পনির্দেশনার কাজের আরো উন্নতি হবে।

**সত্যেন রায়চৌধুরী**

## আমার জীবন এবং অভিজ্ঞতা

ছেলেবেলায় লেখাপড়া ভালো লাগত না। আট বছর বয়স যখন, তখন সোরাব মোদী তাঁর থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী নিয়ে আমাদের জব্বলপুরের বাড়ীতে দলবলসুদ্ধ ওঠেন। তাছাড়া যে সিনেমাতে ওঁরা শো করেন, সেটারও তত্ত্বাবধান করতেন আমার বাবা। আমি থিয়েটার দেখতে যেতুম; ছেলেবেলা

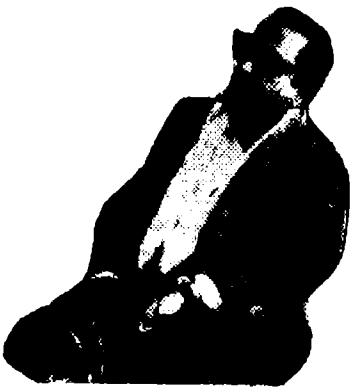

থেকে আমার নিজেরও অভিনয় করবার ঝোঁক ছিল। মাস দু-তিন ধ'রে জব্বলপুরের থিয়েটার শেষ ক'রে ওঁরা কাটনী চ'লে যান। বাবার কাছে বকুনি ও মার খেয়ে ঐ আট বছর বয়সেই আমি কাটনী পালাই এবং সোরাব মোদীকে অনুনয়-বিনয় ক'রে তাঁর থিয়েটারে যোগ দিই। প্রহ্লাদ, রোহিতাশ্ব প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করে প্রচুর নাম কিনি। ১৯৩৪ সালে সোরাব মোদী থিয়েটার বন্ধ ক'রে দিয়ে পুণাতে "হ্যামলেট"-এর হিন্দী সংস্করণ করেন; সেই ছবিতে আমি একজন নাচিয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। এর পরে উনি বোম্বাই শহরে মিনার্ভা ফিল্মস্-এর পত্তন করেন। সেখানেও তিনি আমাকে একজন আর্টিস্ট হিসেবে যোগ দেবার জন্যে তলব করেন। তখন আমি তাঁকে অনুরোধ করি, শিল্পীর কাজ ছাড়াও আমাকে কোনো হাতের কাজ অর্থাৎ টেকনিক্যাল কাজ শেখবার সুযোগ দিতে। তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ বলেন, পছন্দ-অনুযায়ী কাজ বেছে নিতে। আমি এক বছর ক্যামেরা, সাউন্ড এবং প্রোজেকসানের কাজ অল্প-বিস্তর শিখি; কিন্তু এ সব কাজে খুব মন বসাতে পারলুম না। তখন এডিটিংটা কেমন যেন আমাকে আকৃষ্ট করছিল; তাই এতেই আমি লেগে গেলুম। প্রথমে একখানি ছবিতে (সিলভার কিং) আমি আমি জে এস দিওয়াড়কর-এর কাছে হাতেখড়ি নিই। কিন্তু আমার প্রকৃত গুরু হন বসন্ত বোকার; এটা ১৯৩৬-৩৭ সালের কথা। ১৯৩৭-এই আমি স্বাধীনভাবে সম্পাদনার কাজ করি "ঘুংঘটওয়ালী"-তে। তারপর মিনার্ভা মুভীটোনে 'জেলর', 'পুকার', 'ডাইভোর্স' প্রভৃতি ছবির সম্পাদনা করি। মাইনে বাড়ানো নিয়ে মিঃ মোদীর সঙ্গে আমার মন-কষাকষি হয়; উনি নিজে মাইনেও বাড়াবেন না, আর অন্য কোথাও কাজও করতে দেবেন না; অবস্থা এমনই হয় যে, মিঃ সুলতানী নামে একজন প্রযোজকের "ভার্জিনিয়া" নামে একখানি ছবির সম্পাদনাকে অর্ধসমাপ্ত রেখে আমি কলকাতায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হই। সেটা ১৯৪০ সাল। কলকাতায় প্রথমে কাউকে চিনতুম না। শুনলুম, নিরঞ্জন পাল 'ব্রাহ্মণ-

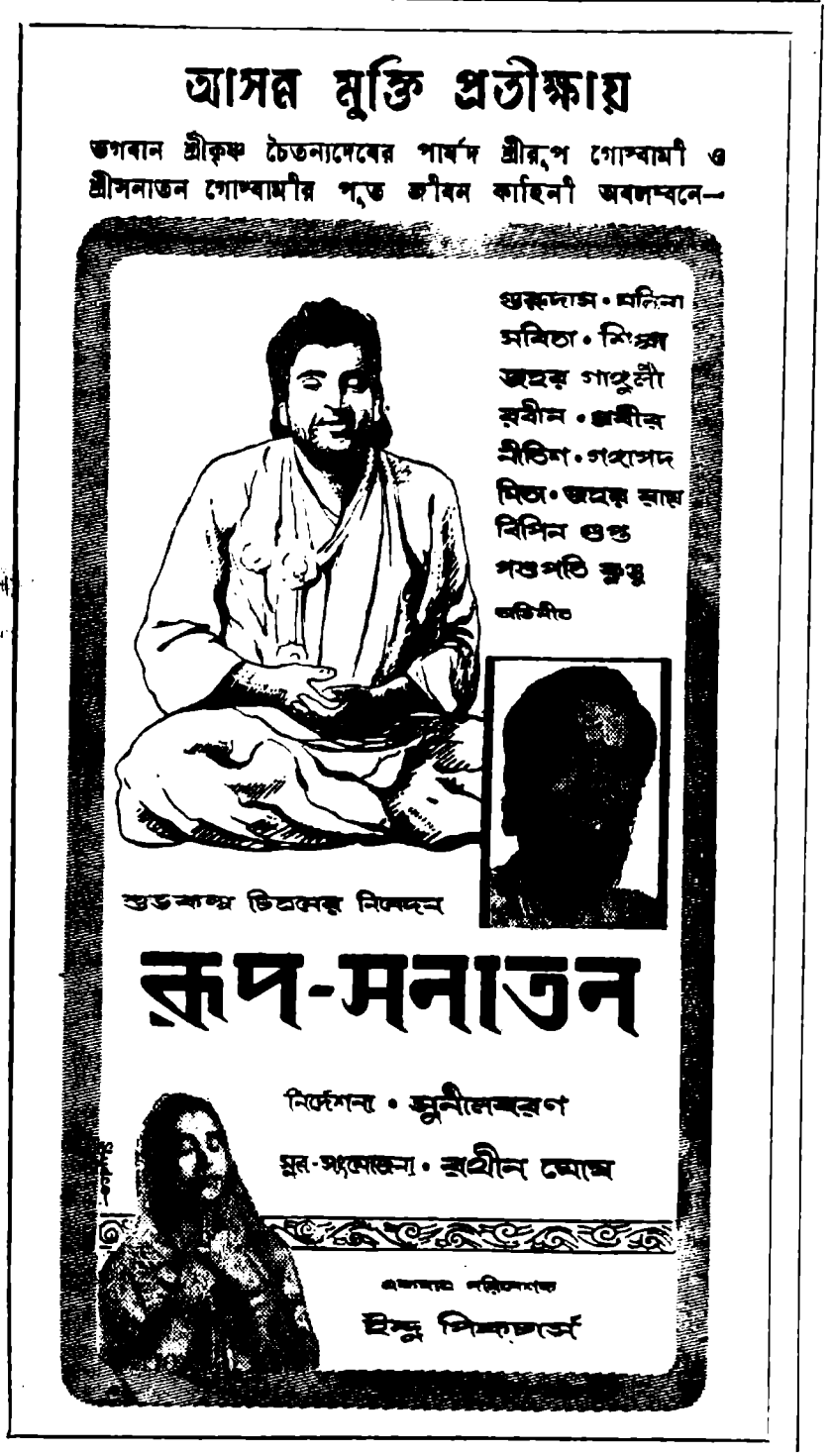

'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চিত্রের একটি দৃশ্যে পূরবীদাস বানার্জি ও অমরেশ দাস

'রূপসনাতন' চিত্রে নীতীশ মুখোপাধ্যায়

কন্যা তুলছেন; তাঁর সংগে বোম্বেতে আমার পরিচয় ছিল। তিনি আমাকে 'ব্রহ্মণ-কন্যার' সম্পাদনা ৫০০৲ টাকা পারিশ্রমিকে করবার জন্যে অনুরোধ করেন। কিন্তু বোম্বেতে তখন ২৫০০৲ টাকায় ছবির কণ্ট্রাক্ট হয়; তাই ঐ পারিশ্রমিক বাংলা দেশের পক্ষে প্রচুর হলেও আমার মনঃপূত হ'ল না। আমি মানসাটার ফিল্মচেকারের পদ নিই মাসে ৩০৲ টাকা মাইনেয়। পরে মিঃ ভৈদ-এর স্টান্ট ছবি 'অবলা'-তে মাসে ৭৫৲ টাকা মাইনেয় এক বছরের কণ্ট্রাক্টে সম্পাদক-রূপে নিযুক্ত হই। ঐ স্টান্ট ছবির ট্রেলর দেখে ফিল্ম কর্পোরেশনে আমায় "ভক্ত কবীর"-এর সম্পাদকের কাজ হয় মাসে ৪০০৲ টাকা পারিশ্রমিকে। হেমেন গুপ্ত পরিচালিত "অভিযান" আমার প্রথম বাংলা ছবি। আজ পর্যন্ত প্রায় আশী-নব্বই খানা বাংলা ছবির সম্পাদনা আমি করেছি।

বাংলা ছবির সম্পাদনা করতে গিয়ে দেখেছি, তাতে ভালো সাহিত্য ভালো নাটক এবং ভালো অভিনয় আছে; যেমন আগেকার আমার-করা হিন্দী ছবি 'জেলর', 'পুকার' প্রভৃতিতে ছিল। পুরোদমে রসসৃষ্টির চেষ্টা আছে বাংলা ছবিতে। আজকালকার বাংলা ছবি আর হিন্দী ছবির মধ্যে তফাৎ এই যে, কথা না বলেও বাংলা ছবি কি বলতে চাইছে, তা' বুঝিয়ে দেয়, আর হিন্দী ছবি কথা বলেও বোঝাতে পারে না কি বলতে চাইছে। সব বাংলা ছবির সম্পাদনা ক'রতে গিয়ে যে সমান সুযোগ-সুবিধে পেয়েছি, তা' বলতে পারব না, তবে যত খারাপ ছবিই হোক না কেন, যে-কোনও বাংলা ছবির কোথাও না কোথাও রস খুঁজে পাওয়া যায়ই যায়। ভালো সম্পাদনা হয়েছে—এ-কথা আলাদা ক'রে বলা যায় না; কারণ চিত্র-নাট্যকার, পরিচালক এবং সম্পাদক এই তিনজনের কাজ পরস্পরের সংগে অংগাংগী ভাবে জড়িত। যদি কোনো ছবি দেখে আলাদা ক'রে বলা সম্ভব হয় যে, এই ছবিতে সম্পাদকের কাজ ভালো হয়েছে, তাহ'লে ঐ তিনজনই—চিত্রনাট্যকার, পরিচালক এবং সম্পাদক একসংগে মারা পড়বেন বলেই আমার বিশ্বাস। একটি ওষুধ খাওয়ার ফলে

'দেশান্তরে' চিত্রে তরুণকুমার

'প্রতিমা' চিত্রে বসন্ত চৌধুরী ও সবিতা চ্যাটার্জি

একজন রোগী মারা গেল। এই জিনিসটা সোজাভাবে দেখানো যায়; আবার আগে রোগী মারা গেছে, এবং পরে ফ্ল্যাশব্যাকের সাহায্যে কেন মারা গেছে, তা দেখানো যেতে পারে। এখন এই ফ্লাশব্যাকটি চিত্রনাট্যকার বা পরিচালক কিংবা সম্পাদকের মস্তিষ্ক-প্রসূত, এ-কথা বাইরের লোক জানবেন কি ক'রে? কিংবা বলা হ'ল, সম্পাদনা বড্ড স্লো হয়েছে। কিন্তু কে বলবে, কতখানি ফুটেজ ফেলা দেওয়া সত্ত্বেও ঐ মন্থরত্ব রয়ে গেছে? কিংবা কোন্ একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা দর্শককে শোনাবার জন্যে কোনো জায়গা স্লো রাখতে বাধ্য হ'তে হয়েছে?

ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক প্রয়োগে সম্পাদকের যে অনেক কিছু করবার আছে এবং ছবি যে স্টারদের ওপর নির্ভর করে না, গল্প ও নাটকের ওপর নির্ভর করে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। ছবির কোন্ বিশেষ স্থানে একটি বিশেষ রস সৃষ্টি করতে হবে, এ-কথা সব পরিচালক ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে অজয় করের সঙ্গে কাজ ক'রে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি, এ-কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

আমার মনে হয়, পরিচালকের সত্যিকারের সহকারী হচ্ছেন ক্যামেরাম্যান এবং সম্পাদক। এই দু'জন সব সময়েই পরিচালককে সাহায্য করতে পারেন এবং করা উচিতও ছবির উৎকর্ষের জন্যে। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এই একাত্মভাবে কাজ করার প্রথা আমার চোখেই পড়ে না। অথচ বাংলা ছবিকে খুব উচ্চ পর্যায়ে তোলবার জন্যে এই সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন।

—অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

## আমার অভিজ্ঞতা

১৯৩৪—'৬৩। উনত্রিশটা বছর কাটিয়ে দিলাম রসায়নাগারিক হিসেবে—অন্ধকার ঘরে। এখন তাগিদ এসেছে, কিছু লেখো তোমার ঐ অন্ধকার ঘরের কথা—পাঠক-পাঠিকারা জানুন, শুনুন (অবশ্য যদি জানতে চান—শুনতে চান) তোমার ঐ উনত্রিশটা বছরের সুখ-দুঃখের ইতিহাস। কী চেয়েছিলে? কী পেয়েছিলে? কী পাচ্ছ, আর কী পাবার আশা রাখ! ভেবেছিলাম, এসব কথা অলিখিতই থাক, কারণ কথায় বলে "শতং বদ মা লিখ"। কিন্তু পারলাম না, প্রিয়-অপ্রিয় লেখার ভেতর হয়ত অনেক এসে যাবে, তবুও লিখতে বাধ্য হয়েছি, কারণ যিনি আমার এই স্বল্প অভিজ্ঞতার কথা লিখতে বলেছেন, তাঁর কাছে সহজে আমি "না" বলতে পারি না।

'৩৪ সালের কথা মনে পড়ে, শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর সেই "কালী ফিল্ম স্টুডিও"—যার লেবরেটরীতে ভর্তি হ'লাম ক্লাস ওয়ানের ছাত্র হিসেবে। মনে অদম্য উৎসাহ, উদ্দীপনা। প্রতিদিনের স্টুডিওতে তোলা নেগেটিভ-সাউন্ড, নেগেটিভ-পিকচার, পরের দিন লেবরেটরীতে ডেভেলপ হচ্ছে। বড় বড় ১০০ গ্যালন-এর ডেভেলপিং সলিউসনের ট্যাঙ্ক, "হাইপো" ট্যাঙ্ক, ওয়াসিং ট্যাঙ্ক। ফিল্ম জড়ানোর, ১০০ ফুট থেকে ১০০০ ফুটের র‍্যাক। ফিল্ম শুকোবার জন্যে বিরাট কাঠের লাটাই। নেগেটিভ ডেভেলপ হয়ে গেলে, এডিটিং রুমে এডিটর জুড়ে দিল; তারপর প্রিন্ট আর ডেভেলপ করে প্রজেক্টরে দেখে নেওয়া হ'ল সবকিছু ঠিক আছে কিনা। কি ভালই না লাগত! দৈহিক পরিশ্রম—পরিশ্রমই বলে মনে হত না। সব থেকে ভাল ছিল "টিম্ ওয়ার্ক"। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতামত জানতে চাইতেন। ক্যামেরাম্যান সব সময় জানতে চাইতেন ফটোগ্রাফীর কোথাও কোন ত্রুটী হ'য়েছে কিনা।

বোধ হয় কয়েক মাস এইভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে কাটবার পর, যখন লেবরেটরীর সব কাজ কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছি আর লেবরেটরীবিষয়ক বইও অনেকগুলি পড়েছি, তখন বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তাইত আমরা কোথায় আছি! যখন "অটোমেটিক ডেভেলপিং মেসিন" আবিষ্কার হয়ে কাজ চালু হয়ে গেছে তখনও আমরা র‍্যাক-আর ট্যাঙ্কে ফিল্ম ডেভেলপ করে মরছি! তবুও

এর মধ্যে একটু সান্ত্বনা ছিল, যখন কোন ছবি প্রেক্ষাগৃহে দেখানর পর কেউ বলত, "বাঃ ফটোগ্রাফী বেশ সুন্দর হয়েছে।" কিন্তু ঐ সান্ত্বনার মাত্রাটা খুব বেশী ছিল না; তার কারণ অত্যধিক বই পড়া, নব নব আবিষ্কারের কথা জানা, আর সেইসব কার্যক্ষেত্রে না-লাগাতে পারা।

এমনি করে যখন হৃদয়ের মধ্যে দুঃসহ ব্যাকুলতা অনুভব করছি, তখন একটা সুযোগ এসেও হারিয়ে গেল। শ্রীদেবকীকুমার বসুর "সোনার সংসার" ছবিটা হবে। স্টুডিওতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। গাঙ্গুলীমশায় ব্যস্ত, স্টুডিওর সকলে তটস্থ, দেবকীবাবু তাঁর দলবল আর "তারকা"দের নিয়ে ধ্যানস্থ। মনে ভাবলাম—এই ত সুবর্ণসুযোগ। গাঙ্গুলীমশায়ের কাছে মনের কথাটা পাড়তে বেশ কিছুদিন কেটে গেল; তবু একদিন বলেই ফেললাম—"বাইরের প্রায় সব লেবরেটরীতে ডেভেলপিং মেসিন হয়ে যাচ্ছে, আজ্ঞে, আমাদের এখানে একটা.....।" যতদূর মনে পড়ে, তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ওই কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—"দেখ ত, যে প্রিণ্টটার আজ প্রজেক্‌সান দেখব বলেছি সেটা হয়েছে কিনা।" আমি তাঁর "সোনার সংসার" নিয়ে ব্যস্ততার মানে অনা করে নিয়েছিলাম; জানতাম না তিনি শশব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। "সোনার সংসার" হ'ল না,—চলে গেল ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে। কিন্তু যদি এখানে হত', তাহলে সত্যি কালী ফিল্ম স্টুডিও সোনার সংসারের রূপ ধারণ করত।

কোডাক কোম্পানীর ডেভেলপিং মেসিনের সঙ্গে দেখা হ'ল ১৯৩৭—৩৮ সালে ওয়ালটেয়ারে অপ্সু সিনেটোনে। এক বছর, চাক্ষুস দেখে ও কাজ করে মন ভরেনি, কারণ পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলাম না। এরই মধ্যে লেবরেটরীর টেকনিক বহুদূর এগিয়ে গেছে অন্য দেশে,—বিশেষ করে আমেরিকায়। সোসাইটী অফ্ মোশান পিকচার ইঞ্জিনীয়ার্স মাসিক পত্রিকাটি পড়তাম; এর জন্যে বিশেষ করে একজনের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি হচ্ছেন স্বনামধন্য সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার শ্রীমধুসূদন শীল। শুধু কোলকাতায় থাকতেই নয়, যখন ওয়ালটেয়ারে আছি, তখনও প্রত্যেক মাসের পত্রিকাটি ডাকে পাঠাতে ভোলেন নি। তাই আমি মনের মধ্যে তাঁকেই গুরুর আসনে বসিয়ে রেখেছি। কোলকাতায় থাকতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উৎপাত করেছি, আলোচনায় মজিয়ে দিয়ে চুপ করে শুনেছি, আর বেগুনি-ফুলুরি ধ্বংস করেছি—বেশ মনে আছে।

ওয়ালটেয়ার থেকে কোলকাতায় ফেরার কয়েক মাসের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল—দ্বিতীয় মহাসমর। সব ওলটপালট হয়ে গেল। কোথায় সে কেমিক্যাল, কোথায় সে ফিল্ম। চারিদিকে হাহাকার। এই যুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যে আগের জীবনের সুখসুবিধেগুলিকে ঠিক উপলব্ধি করতে পারলাম। আগে দুঃখকেই মস্ত বড় করে দেখেছিলাম, সুখ মনে মোটেই স্থান পায়নি।

সুখ-দুঃখ, সুবিধে-অসুবিধের কথা বলতে গেলে, এইখানে লেবরেটরী ও ফিল্ম সম্বন্ধে কিছুটা সহজ ও সরল ভাষায় না

বলা, আমার বোধহয়, বক্তব্য ঠিক বোঝান যাবে না।

গোড়াতেই বলে রাখি, স্থিরচিত্রের সঙ্গে চলচ্চিত্রের লেবরেটরী টেকনিক্-এর আকাশপাতাল তফাৎ। বাহ্যত মনে হয়, এ আর এমন কি, ফিল্মের ইমালসান্-ডেভেলপিং সলিউসান, সবই ত এক রকমের, শুধু মেসিনে ডেভেলপ আর প্রিণ্ট হয় চলচ্চিত্র, আর হাতে স্থিরচিত্র—কিন্তু মোটেই তা নয়।

নিখুঁত ফটোগ্রাফী নির্ভর করে ফটোগ্রাফী নির্মাণকার্যে নিযুক্ত সমস্ত বিভাগের নিখুঁত কাজের ওপর—এটা খুবই স্বাভাবিক। চলচ্চিত্রের ফিল্ম যাঁরা তৈরী করেন, তাঁরাও আশা করেন তাঁদের ফিল্মের যথাযথ ব্যবহার ক্যামেরাম্যান ও লেবরেটরী করবেন। ফিল্মের ওপর কেমিক্যাল আছে, যেমন "সিলভার ব্রোমাইড্ আয়োডাইড্" ইত্যাদি, তেমনি ডেভেলপিং সলিউসানে কেমিক্যাল আছে যথা—মিটল-হাইড্রোকুইনন, সোডা-সালফাইট ইত্যাদি। এদের দুজনের নিখুঁত মিলনে গড়ে ওঠে ভাল ফটোগ্রাফী। কিন্তু এদের মিলন ঘটবার মধ্যমণি বা তৃতীয় ব্যক্তি হ'লেন ক্যামেরাম্যান। ক্যামেরাম্যান নিখুঁত কাজ করবেন, আর লেবরেটরী তার নিখুঁত ডেভেলপ আর প্রিণ্ট দেবেন—এইটাই কাম্য। শুধু লেবরেটরীর কথাই ধরা যাক্। নিখুঁত কাজ কি হ'লে দেওয়া যায়? (১) ফিল্ম যখন তৈরী হয়েছিল তখন তার যা চারিত্রিক গুণ ছিল—ব্যবহারের সময় ঠিক সেই জিনিসটা থাকা চাই। বিশেষ ধরণের ঠাণ্ডা ঘরে রাখলে, বেশ কয়েকমাস ফিল্ম ভাল থাকে। যুদ্ধের আগে ঐ রকম ঠাণ্ডা ঘরের জাহাজে করে ফিল্ম আসতো। যুদ্ধের সময় তা সম্ভব হয়নি। ফলে, "যে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে কাজ করে যাও"। (২) যুদ্ধের আগে কেমিক্যাল সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে হয়নি। ডেভেলপিং সলিউসানের কেমিক্যালগুলি ঠিক ঠিক গুণসম্পন্ন আছে কিনা,


# অম্বিকা নাট্য কোম্পানী

হেড অফিস—১১৭।১, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬

—: শারদীয়া অর্ঘ্য :—

অসংখ্য দর্শকবৃন্দের প্রশংসাধন্য

ব্রজেন বাবুর— **সতীর ঘাট** [চলিতেছে]

ব্রজেন বাবুর নূতন যুগান্তকারী ঐতিহাসিক নাটক

*** ঝান্সীর রাণী *** (দ্রুত প্রস্তুতির পথে)

—: অন্যান্য উচ্চ প্রশংসিত নাটকাবলী :—

**বাংলার বধূ * রামরাজ্য * ছিন্নতার**

**শয়তানের চর * খুনা-মিঁহর**

পরবর্তী আকর্ষণ—ব্রজেন বাবুর **"রাখীভাই"**

রূপায়ণে : অমিয় বোস ॥ বিমল লাহিড়ী ॥ নিতাই দাস ॥ অমরব্যানার্জী

শ্রীমতীছবিরায় ॥ আশা দাস ॥মিনতি রায় ॥ সন্ধ্যারাণী ॥ অনিল রাণী

বিষাণ রাণী ॥ আরও অন্যান্য খ্যাতনামা শিল্পিবৃন্দ ॥

বায়নার জন্য হেড অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিনীত :—শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস। ম্যানেজার।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

**বিচিত্র কাহিনী**

(৪র্থ সংস্করণ)

নবীন ও প্রবীণদের সমান আকর্ষণীয়

অজস্র চিত্র সম্বলিত

বিচিত্র গল্পগ্রন্থ। ... মূল্য : দুই টাকা।

লেখকের

নতুন বই

**আরও বিচিত্র কাহিনী**

বাহির হইয়াছে

অসংখ্য ছবিতে পরিপূর্ণ দাম তিন টাকা।

প্রকাশক :

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

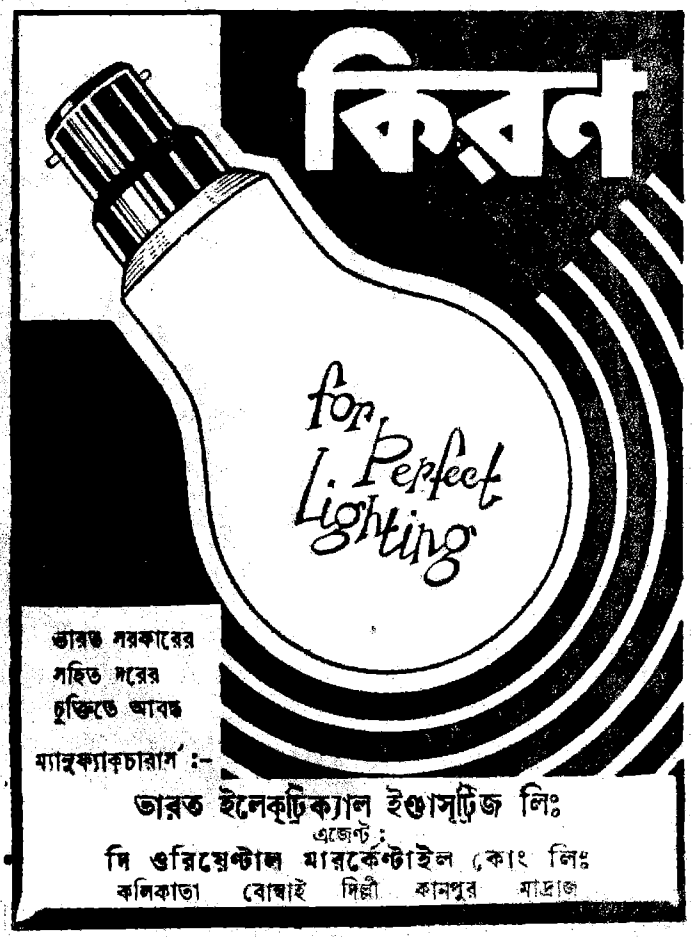


তা "টেস্ট" করে বা "এনালাইজ" করে দেখা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু তা করবার দরকার হ'ত না। ট্রেড্‌মার্ক মানেই চোখ-বুজে ব্যবহার করে যাও—সব ঠিক আছে। যুদ্ধের সময় ও পরে সব গোলমাল হ'য়ে গেল। ঠিক যেন মনে হল—"সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই"। (৩) লেবরেটরী প্রসেসিং টেক্‌নিক্‌—যা হওয়া উচিত ছিল, তা আমাদের হয়নি। লেবরেটরীতে প্রচুর জল দরকার হয়। ডেভেলপিং সলিউসানের জন্যে জল তৈরী করে নিতে হয়—তাতে থাকবে না, ক্যালসিয়াম-ম্যাগনিসিয়াম সল্ট, লোহা, তামা, চুন, সালফাইড্‌—এরা সকলেই নাকি ফিল্মের ভীষণ শত্রু—আর সব থেকে বড় শত্রু ধুলো-বালি। এমনভাবে "ফিল্টার" করতে হবে যাতে এরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রূপেও জলের ভেতর না থাকে। লেবরেটরীর জন্যে বাতাসও তৈরী করে নিতে হয়—ধুলোর কথা ঐ জলের মত। আর সব সময় ঘর ঠাণ্ডা রাখতে হবে; তবে ঘরগুলির ঠাণ্ডার ও আর্দ্রতার তারতম্য থাকে। ডেভেলপিং মেসিনে এক্‌স্‌পোজড ফিল্ম নিখুঁতভাবে ডেভেলপ করা সত্যি সবথেকে কঠিন কাজ। প্রত্যেক ফুট ফিল্মে ষোলটা করে ছবি অর্থাৎ হাজার ফুটে ষোল হাজার ফ্রেমের ছবি। এই ষোল হাজার ফ্রেমের প্রত্যেক ফ্রেম যখন এক এক করে ডেভেলপিং সলিউসানের ভেতর দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে যাবে, তারা যেন প্রত্যেকে ঐ ডেভেলপিং সলিউসানের কাছে এক রকম ব্যবহার পায়—তা দেখতে হবে। কারণ হাজার ফুটের প্রথম ফ্রেম যখন ডেভেলপিং সলিউসানে ঢোকে, তখন ডেভেলপিং সলিউসানের যা শক্তি ছিল, শেষ ফ্রেম যখন ঢুকছে, তখন তার সে শক্তি থাকছে না। তাই নতুন সলিউসান কাজ চলার মধ্যেই দিয়ে দিয়ে ঐ শক্তি বজায় রাখতে হবে। এইভাবে হাজার হাজার ফুট ফিল্ম ডেভেলপ হয়েও ডেভেলপিং সলিউসানের শক্তির ক্ষয়ও পূরণ হচ্ছে। সলিউসানের তাপমাত্রা এক জায়গায় রাখা—সলিউসানের মধ্যে দিয়ে ফিল্মের গতি-বেগ একরকম রাখা অবশ্য-কর্তব্য। ডেভেলপিং সলিউসানের থেকে ফিল্ম বেরিয়ে যাবার সময় খানিকটা করে সলিউসান অন্য ট্যাঙ্কে নিয়ে যায়; সেজন্যে নতুন সলিউসান দিয়ে "ভল্যুম্‌" ঠিক জায়গায় রাখতে হবে—ইত্যাদি। ডেভেলপিং রুম, যে ঘরে ফিল্ম ডেভেলপ হচ্ছে, সেখান থেকে দূরে—একটা কন্‌ট্রোল রুম থাকে, যেখান থেকে উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান করা হয়। কয়েকটা জিনিসের নাম—(১) টেম্পারেচার-রেকর্ডার কন্ট্রোল, (২) রেপ্লিনিসমেণ্ট ফ্লো রেকর্ডার কন্ট্রোলার (নতুন সলিউসান ট্যাঙ্ক কত যাচ্ছে)। (৩) রিমোট বাল্‌ব থারমোমিটার। (৪) রিমোট প্রেসার গেজেস্‌। (৫) রিমোট ডেপথ্‌ গেজেস্‌ (ট্যাঙ্ক-ভল্‌ইম দেখার যন্ত্র) ইত্যাদি।

লেবরেটরীর সাজ-সরঞ্জাম অনেক, তার মধ্যে অল্প কিছু জানান হ'ল—বিস্তারিত সব বইতে লেখা আছে। যা আছে, সব কি আমাদের দেশে করা যায়? আমি বলব যায়, এর মধ্যে কোনোটাই এটম্‌ বোমা বা হাই-

ভাজাক্তেন বেশী অধিকারের মত শক্ত নয়। কিন্তু কেন করা হয়নি বা করা হচ্ছে না—আমি জানি না। ভবিষ্যতে আদৌ হবে কি না—তাও জানি না।

তবুও, হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে, আর তাই নিয়ে মাঝে মাঝে লেবরেটরী থেকে যে ভাল কাজ বেরিয়েছে—বাহাদুরি বৈভি। বিদেশ থেকে কয়েকজন টেক্‌নিসিয়ান এসে আমাদের চিত্রশালার স্টুডিও, লেবরেটরী ও পর্দায় ছবি দেখে অবাক হয়েছেন—কি করে এই অবস্থার মধ্যে থেকে ভাল কাজ হ'তে পারে। তাঁরা ত জানেন না আমাদের উর্বর মস্তিষ্কের কথা। আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি কী প্রখর! লতাচ্ছিন্ন দশ হাত ধুতি ও বার হাত শাড়ী এমন ঘুরিয়ে পরতে পারি, যার একটা ফুটোও কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু কেট-প্যাণ্টের দেশে কি তা হবার উপায় আছে? তাই তাঁদের সব সময়ই নিখুঁত সাজে অসরে নামতেই হবে।

ভাল ফিল্ম, ভাল কেমিক্যাল—এ সবের কথা ভুলে গেছি। আমাদের দোষ, ত্রুটি আর সমস্যার অন্ত নেই। তবু এইসব দোষ-ত্রুটি সবার চোখের ওপর বড় ক'রে গিয়ে যাতে না পড়ে, তার চেষ্টা করেই চলেছি, জানি না কোথায় গিয়ে পৌঁছব!

—শৈলেন ঘোষাল

## আমার কথা

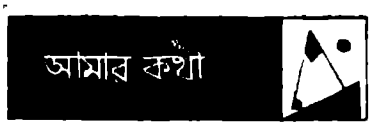

১৯২৬ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বাঙলা এবং হিন্দী মিলিয়ে আমি অন্ততঃ পঞ্চাশ-পঞ্চান্নখানা ছবিতে অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েছি। ম্যাডান থিয়েটারের নির্বাক ছবি

"জয়দেব"-এর রাধার ভূমিকায় পরলোকগত জ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আমার হাতেখড়ি। "জয়দেব" এবং "শঙ্করাচার্য" ছবি দু'টির পরেই সবাক যুগের আবির্ভাব হ'ল এবং আমার প্রথম সবাক ছবি হ'ল "জোরবরাত"। ম্যাডানে চারখানি সবাক ছবি করবার পরেই আমি রাধা ফিল্মসে যোগ দি এবং প্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনায় তোলা "শ্রীগৌরাঙ্গ" ছবিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে অভিনয় ক'রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সুনাম অর্জন করি। "মানময়ী গার্লস্ স্কুল"-এ নীহারিকার ভূমিকায় অভিনয়ের পর আমি নিউ থিয়েটার্সে আসি এবং এখানে আমার প্রথম ছবি হ'ল প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় তোলা "মুক্তি"। "বিদ্যাপতি" ছবিতে প্রথম আমি দেবকী বসুর অধীনে কাজ করবার সুযোগ পাই। "পরিচয়" হচ্ছে নিউ থিয়েটার্সে আমার শেষ ছবি। এরপর এম-পি প্রোডাকসন্স-এর অধীনে শ্রীবড়ুয়া পরিচালিত "শেষউত্তর" এবং সুশীল মজুমদার পরিচালিত "যোগাযোগ" ইত্যাদি হিন্দী ও বাঙলা মিলিয়ে দশখানি ছবিতে অবতীর্ণ হই। ১৯৪৭ সালে আমি আমেরিকা যাই এবং সেখান থেকে ফিরে এসে আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান "শ্রীমতী পিকচার্স"-এর পত্তন করি। "অনন্যা" থেকে শুরু ক'রে "শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি" পর্যন্ত দশখানি বাঙলা ছবির প্রযোজনা আমি করেছি। চলচ্চিত্রজগতে শিল্পী এবং প্রযোজক হিসেবে এই হচ্ছে আমার কাজের সংক্ষিপ্ত তালিকা।

**শিল্প-জীবন :**

প্রথম যখন চলচ্চিত্রে শিল্পী হিসেবে যোগ দিলাম, তখন কোনো কিছু বোঝবার মত বয়স বা মনের গভীরতা ছিল না। তখন আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থ উপার্জন। প্রথম যখন 'নামের' রস পেলাম, তখন আস্তে আস্তে মনে হতে লাগল—বাঃ, এর ত' আরও একটা দিক আছে। প্রথম দিকে, মনে হয়, শখ ক'রে কেউই আসেননি—অন্ততঃ চৌদ্দ আনা লোকই—অর্থের জন্যে সিনেমায় যোগ দিয়েছিলেন। পরে যখন নাম হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে অর্থও আসতে লাগল, তখন মনে নানারকম শখ এল—মনের চাহিদা অল্পে অল্পে পূরণ হ'তে লাগল। তখন মনে হতে লাগল, আরও বেশী নাম কিসে হয়; বাঙলা দেশের খুব নামকরা অভিনেত্রী কি ক'রে হতে পারি সেই চিন্তা এল। আবার যখন বাঙলা দেশে


নাট্যশাস্ত্র

নাট্য বিষয় মাসিক পত্রিকা

ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়

প্রতিসংখ্যা ৬০ নঃ পঃ ॥ বার্ষিক ৭·০০

কলিকাতা ১২

নাম হ'ল, তখন মনে হ'ল কি ক'রে সারা ভারতে নাম করতে পারি। এর জন্যে সাধন বলুন আর চেষ্টাই বলুন, কোনো কিছু করবার ত্রুটি রাখিনি।

বেশীর ভাগই আমাকে দেওয়া হত ছবির রোমান্টিক নায়িকার ভূমিকা। তাতে যে শুধু হাল্কা চটুল অভিনয়ের সুযোগ থাকত, তা' নয়; খুব গভীর বেদনাদায়ক দুঃখের দৃশ্যও ফোটাতে হ'ত। অভিনয় এবং গানের ভিতর দিয়ে আমি চরিত্রকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলবার চেষ্টা করতুম। তাছাড়া নানা ছাঁদের কেশবিন্যাস থেকে শুরু করে বিশেষ বিশেষ ডিজাইন দিয়ে কাপড়-গহনা ইত্যাদি গড়াতুম নিজেকে চরিত্রের উপযোগী সাজে সজ্জিত করবার জন্যে। চোখের চাউনিতে, অঙ্গভঙ্গীতে, হাসিতে আমি চটুলতার দৃশ্যগুলিকে জীবন্ত করবার চেষ্টা করতুম—এরই নাম নাকি যৌন-আবেদন বা গ্ল্যামারের সৃষ্টি! সে যুগের লোকেদের মুখে শুনেছি, আমিই নাকি বাঙলা চলচ্চিত্রে প্রথম গ্ল্যামার গার্ল! কিন্তু তখন নাইলনের যুগ ছিল না; তাই বহিরঙ্গ দিয়ে গ্ল্যামার সৃষ্টির কোনো প্রশ্নই ছিল না সেযুগে। যা-কিছু গ্ল্যামারের সৃষ্টি, তা' করতে হ'ত অভিনয়, গান এবং উপযোগী ভঙ্গীর মাধ্যমে। সে-গানও পরের গাওয়া গানের সঙ্গে ঠোঁট নাড়া নয়, ক্যামেরার সামনে ছবিতে অভিনয় করতে করতে সঙ্গীত-পরিচালকের নির্দেশ মতো গাওয়া এবং রেকর্ডিং-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার পরে নিজের গানের সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে চিত্ররূপ দেওয়া। যাই হোক, শিল্পী হিসাবে কতটা নাম পেয়েছিলাম, বা কতটা সাফল্যলাভ করেছিলাম, তার মাপকাঠি আমার কাছে নেই—সে জানেন তাঁরা যাঁরা আমার অভিনয় দেখেছেন, জানেন আপনারা (চিত্র-সমালোচকরা)।

গলা থাকলে মানুষ গান করে, কিন্তু সেই গানে যিনি কথা জুগিয়েছেন, যিনি সুর বসিয়েছেন, তাঁদের কথা গানের সাফল্যের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই উল্লেখ করতে হবে। আমার যেটুকু নাম হয়েছে, তাতে আমার নিজের হয়ত কিছুটা অংশ আছে; কিন্তু যে পরিচালক আমাকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন, যে ক্যামেরাম্যান আমার ছবি তুলেছেন, যিনি আমার মুখে আলো দিতে গিয়ে একটি বার্ণডোর (Burndoor) ব্যবহার ক'রে মুখের খানিকটা আলো কেটে দিয়ে মুখটিকে বেশী সুন্দর ক'রে দেখাতে চেয়েছেন, যিনি আমার সাজগোজ মেক-আপের ও চুলের বিন্যাসের তদারক করেছেন, তাঁরাও তো কম অংশীদার নন। বিয়ের কনেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তাঁরাই তো লোকের সামনে সুন্দর ক'রে বার করেছেন।

বোম্বের ডাক আমাকে প্রলুব্ধ করেনি কখনো; কারণ টাকার জন্যে আমি কখনও পাগল হইনি। ১৯৩৮ সালে একখানি ছবির জন্যে দু' লাখ টাকাও আমাকে দিতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি বাঙালী মেয়ে; বাঙলার শিল্পকে আমি ভালোবাসি। তা ছাড়া বাঙালী দেশ আমাকে অর্থ, ভালোবাসা, সম্মান দিয়েছে অফুরন্ত—আমার যোগ্যতার

কৃষ্ণকান্তের উইল নাটকে ভ্রমরের চরিত্রে সবিতা বসু

চেয়ে বেশী। তাই বাঙলা ছেড়ে যেতে কোনোদিন আমার মন চায়নি।

নাম হয়েছে, টাকা হয়েছে, গাড়ী হয়েছে, বাড়ী হয়েছে, সুখৈশ্বর্য হয়েছে; তারপরে মনে হয়েছে—এরপর কি? —এরপর আর কি আছে? তখন মনে এসেছে—সংসারের চিন্তা এবং তাই শেষ-পর্যন্ত সংসার করেছি। এবং ক্রমে শিল্পজীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে সংসারীই হয়ে উঠেছি।

**প্রযোজক-বেশে :**

যখন কতকগুলো বৈশিষ্ট্যহীন সাধারণ স্তরের ছবি ক'রে মনে বিরক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, তখনই প্রযোজক হবার কথা প্রথমে মনে আসে; মনে হয়, নিজের ইচ্ছামত কতকগুলো ভালো ছবি তৈরী করিনা কেন? শিল্পী হিসেবে ত অনেক দিন কাজ করেছি, এইবার মনের শিল্পানুভূতিকে একটু স্বাধীনতা দিইনা কেন? ভালো ভালো গল্প, সুন্দর চরিত্রের চিত্ররূপ দেবার বাসনাকেই এইভাবেই চরিতার্থ করবার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া নিজের বয়স ইত্যাদি অনুযায়ী ভূমিকা-গ্রহণের স্বাধীনতাও পেলুম। তাই ত রাজলক্ষ্মী না সেজে অন্নপূর্ণাদি সাজতে পেয়েছি।

প্রযোজক হিসেবে শ্রীমতী পিকচার্সের নামে যে-ছবি করেছি তা দর্শকদের কতখানি ভালো লেগেছে, তা' তাঁরাই জানেন। প্রযোজক হিসেবে অনেক সময় যখন ভেবেছি, একখানি খুব রুচিসম্পন্ন শিল্প-সম্মত ছবি জনসাধারণকে উপহার দিয়েছি, তখন হয়ত' দেখেছি, তাঁরা সে-ছবি গ্রহণ করলেন না। আবার পুরোনো ঢঙের, পুরোনো ভাবওলা ছবি, যা মনে হয়েছে অতিসাধারণ স্তরের, সেই ছবি হিট হয়েছে। অবাকবিস্ময়ে ভেবেছি, এমন কেন হয়? তাহ'লে কি দর্শকসাধারণের রুচির সঙ্গে আমাদের রুচির কোনো গরমিল আছে? এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাইনি।

'মরুতৃষ্ণা' চিত্রে অসিতবরণ ও সাবিতা বসু

'কালস্রোত' চিত্রে মঞ্জু দে

তবু রুচিহীন বা বিকৃতরুচির ছবি করতে পারিনি; মনে হয়েছে, শিল্পী হিসেবে যে-সুনামটুকু অর্জন করেছি, সেই পাথেয়টুকু যেন কখনও না হারাই। ছবির প্রযোজনা করতে গিয়ে আমি কলাকুশলী এবং শিল্পী-দের কাছ থেকে খুব ভালো ব্যবহার এবং সহযোগিতা পেয়েছি; এটিকে আমি আমার পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে করি। ১৯৬০ সালে "ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি" করবার পর আমি যদিও আর কোনো ছবির প্রযোজনা করিনি, তবু ইচ্ছে আছে, আরও কিছু ছবির কাজে আমি অদূরভবিষ্যতেই হাত দেব।

—কানন দেবী

"..... ওই কি মা? বাজেই মা! ঝিলিমিলি,
এই আমার ঢাকনী জন্মভূমি ওই হাসছী - শ্যামল-
রূপিনী অনন্ত রত্নপ্রসূ [illegible] কলনাদে নীরবে
সুসমস্তিত দশভুজা দশদিক্ দশদিকে প্রসারিত,
তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত;
পদতলে শত্রু বিমর্দিত বীরেন্দ্র কেশরী শত্রু
নিশীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি যখন দেখিবে না —
আজি দেখিবে না, কাল দেখিবে না - যতদিন তাহা
দেখিতে না পারিবে না হইবে ততদিন তোমার
দিগভুজা নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুনাশিনী
বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য —
রূপিনী, বামে বিদ্যা বিজ্ঞান সংযুক্তা, সঙ্গে
বলরূপী কার্তিকেয় কার্য্য সিদ্ধিরূপী গণেশ,
আমি সেই কাল লোকে সে দৃশ্য দেখিতে পাই, সেই
সুখনয়ী জগদ্ধাত্রী।"

আমি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাদৃষ্টিতে দেখা
সেই বঙ্গপ্রতিমা প্রায় শতবর্ষ পরে আজও
আমাদের সামনে জাগ্রত। দেশবাসীর
জীবন নিরাপদ নিষ্কণ্টক মধুময় হোক।

কে. জি. দাস প্রাইভেট লিমিটেড
রজোমোলাই-এর স্রষ্টা
কলিকাতা-বোম্বাই

JWTKCD 1212A

ক্রিকেটের তীর্থভূমি লর্ডস্ মাঠ। ইতিহাসের হাত ধরে ১৯২৮ সালের চাইছি। প্রাপ্তিযোগ আছে। ফিরে গিয়ে ফিরে পেতে চাই সেই মুহূর্তকটি ক্রিকেটের পরম অনিশ্চয়তার গৌরবময় ছায়াপাতে যা আকর্ষণীয় হয়ে আছে।

তাজা যৌবনের জীবন্ত ছোঁয়ায় মুহূর্তকটি ক্রিকেট-অনুরাগীদের মনের দিগন্তে রামধনু এঁকে রেখেছে। সেই বর্ণালী প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখ জুড়িয়েছে। মন ভরিয়েছে। তাই ফিরে ফিরে সেদিকে দৃষ্টি মেলতে আজও সাধ জাগে বারেবারে।

সেদিন লর্ডসের প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন, শ্যামল আঙিনায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইংলন্ডের বিখ্যাত কাউন্টি দল মিডলসেক্স আর সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল। আসর বড়, কিন্তু আয়োজন টেস্ট খেলার মতো বড়সড় নয়। তবু সেই উপলক্ষেই যা ঘটে গেল তার চেয়ে বড় কিছু ক্রিকেট মাঠে কখনো ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

সেদিনের সঙ্গে আজকের ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অনেক তফাৎ। দল হিসেবে তখনও তাঁদের অভিজাত ক্রিকেট-মহলে কল্‌কে জোটেনি। দলভুক্ত দু-একজনের নামডাক অবশ্য কিছু হয়েছে। কিন্তু সেরা খেলা টেস্ট ম্যাচের কষ্টিপাথরে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের কৌলীন্য যাচাই হতে তখনও বাকী।

দল হিসেবে কুলীনের মর্যাদা যার নেই, বিদেশ সফরে অর্থভাগ্যও তার প্রসন্ন নয়। অথচ বিদেশ-পরিক্রমায় আর্থিক সংগতির মূলধন হাতে না থাকলেও চলে না। ইংলন্ডে এসে প্রথম পর্বে তেমন হাঁকডাক তুলতে না পারায় আর্থিক অনটনের পাকে জড়িয়ে থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল তখন রীতিমতো দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত।

এমন দিনে তাদের খেলা মিডলসেক্সের সঙ্গে। পরের ম্যাচই প্রথম টেস্ট। মিডল-সেক্সের বিরুদ্ধে ভাল খেলে যদি রীতি-মতো সোরগোল তোলা যায় তবেই পরিত্রাণ। তবেই না টেস্ট-আসরে লোক উপচে পড়বে। ধাতুতি যাবে পুষিয়ে। নইলে কপালে যে কি আছে দলের কর্তারা ভেবেও তা কুলিয়ে উঠতে পারছেন না!

দলের সবচেয়ে নামী খেলোয়াড় 'কনি'। ভরসা একমাত্র তিনিই। ব্যাটে, বলে, ফিল্ডিংয়ে, সবকিছুতেই তাঁর পুরোপুরি হাত আছে। সেই হাতের নিদেনপক্ষে আধ-খানাও যদি তিনি লর্ডসের মাঠে মেলে ধরতে পারেন, তাহলেই যথেষ্ট। কিন্তু ভাগ্য এমনই অকরুণ যে 'কনির' হাতখানিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে তার পক্ষ থেকে বিন্দুমাত্র কসুর করা হলো না।

ঠিক আগের দিন খেলা ছিল সারে কাউন্টির সঙ্গে। 'কনি' একহাতেই লড়েছেন সে আসরে। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ষাট রাণ হাঁকিয়ে একা তিনিই সারের জয়লাভের পথ আগলে দাঁড়িয়েছেন।

কিন্তু সারের আক্রমণের মুখে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দাঁড়াতে গিয়ে 'কনি' যে কোন ফাঁকে নিজের পায়ের পেশীবন্ধনী ছিঁড়ে ফেলেছেন তা তিনি বুঝতে দেননি অপর কাউকেই। বুঝলো সবাই যখন খেলা শেষে বিছানায় এলিয়ে পড়া ছাড়া তাঁর আর অন্য উপায় রইলো না।

অবস্থা দেখে দলের কর্তাদের মাথায় হাত! তলব পড়লো চিকিৎসকের। তিনি এসেই, দেখেশুনে রায় দিলেন, 'না, এ অবস্থায় খেলা চলতে পারে না।'

মুষড়ে পড়লেন কর্তারা। 'কনি' নিজে একবার আমতা-আমতা করে বলে উঠলেন,

'কিন্তু আমাকে যে খেলতেই হবে। নইলে.....'

ধমকে উঠলেন বিজ্ঞ বদ্যি।

'রোগীকে সৎ পরামর্শ দেওয়াই আমার কাজ। আমি চিকিৎসক, শোনা না-শোনা আপনার দায়িত্ব।'

তবু 'কনি' বোঝাবার চেষ্টা করলেন,

'না খেললে আমাদের যে ভরাডুবি হয়ে যাবে!'

'হোক্, তবুও না।' সুর চড়িয়ে হন্-হনিয়ে বেরিয়ে গেলেন চিকিৎসক।

ব্যাপার দেখে কর্তারা নির্বাক! শুধু 'কনিই' দাঁতে দাঁত চেপে রইলেন শেষ চেষ্টা করে দেখার সংকল্পে।

রাতভোর গরম পানির থলি আর উগ্র মালিশের প্রলেপ 'কনির' আহত পা ছুঁয়ে রইলো। চোখের দুটি পাতা এক মুহূর্তও জুড়তে পারলেন না। তবুও কাক ডাকার লগ্নে 'কনি' জানালেন, লর্ডসে মিডলসেক্সের বিপক্ষে তিনি খেলবেনই!

পরের দৃশ্য লর্ডস মাঠে।

আঘাত উপেক্ষা করে, গত রাত্রের বিভীষিকা ভুলে 'কনি' যথারীতি ছুটে এসেই বোলিং আরম্ভ করে দিলেন। দুরন্ত গতি তাঁর বলের। আক্রমণের ধার তীক্ষ্ণ, শাণিত। দেখতে দেখতে 'কনির' কাছে মিডলসেক্সের এক ব্যাটসম্যান হার মানলেন। কিন্তু তারপর?

তারপরই পুরানো ব্যথাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগলেন

'কনি'। শুশ্রূষাকারীরা ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে গেলেন মাঠের বাইরে।

'কনি' রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। তাঁর ধারালো আক্রমণ অনুপস্থিত। মিডল-সেক্সের ব্যাটসম্যানদের আর পায় কে! গুনে গুনে অনেক রাণ জড়ো করলেন তাঁরা। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ কোণঠাসা হয়ে পড়লো। বিশেষতঃ তাদের ইনিংসের শুরুতে যখন পাঁচ-পাঁচজন সেরা ব্যাটসম্যান তাঁবুতে ফিরে গেলেন মাত্র ৭৯ রাণের মধ্যেই।

দলের সামনে বিপর্যয়। দেখে হাত গুটিয়ে থাকতে পারলেন না 'কনি'। পায়ের ব্যথাটা মালুম দিচ্ছে। তবুও না। মাঠে নামার ইচ্ছে ছিল না তাঁর। নামতে হলো অবস্থার চাপে। ব্যাট হাতে তিনি মাঠে ফিরলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে মাঠের ভোলও ফিরে গেল।

দর্শকেরা ভাবছিলেন, বিপর্যয়ের মুখে কোণঠাসা ভূমিকায় 'কনি' বুঝি জান্ বাঁচানোর চেষ্টায় উইকেটে তাঁর অস্তিত্বের শিকড় নামাতেই ব্যস্ত থাকবেন। ঠুক-ঠুক করে খেলবেন, যতোক্ষণ পারেন ততোক্ষণ। কিন্তু ওঁরা 'কনি'কে চিনতে পারেননি। ঠুক-ঠুকানিতে তাঁর চিরকালের অনিহা। মাঠে নেমেই তিনি একেবারে ভেল্কি দেখাতে শুরু করে দিলেন।

'কনির' সে চেহারার সামনে পড়ে সংযমের শাসানি সংকুচিত হয়ে পড়লো। হাতের ব্যাট ঘুরলো, ব্যাটের ঘায়ে বল ছুটলো। ব্যাট-বলের সংঘর্ষে ঠকাঠক শব্দে মুখরিত হয়ে উঠলো লর্ডসের প্রসারিত পরিবেশ। 'কনি'র দুরন্ত উগ্রতার তাপে মাঠকে মাঠ যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো।

'কনি' মাঠে নামার আগে মিডল-সেক্সের ফিল্ডসম্যানেরা উইকেটের কাছে হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার ক্রমশঃই সরে গেলেন সভয়ে বাউণ্ডারীর ধারে। সেখানেও নিস্তার নেই। 'কনি'র মার সেখানেও তাঁদের তাড়া করছে। ফিল্ডস-ম্যানদের হাত পাততে সাহসে কুলোয় না। বল থামাতে কুণ্ঠা জাগে।

দেখতে দেখতে 'কনি' মাত্র কুড়ি মিনিটে নিজের রাণ তুললেন পঞ্চাশ। এক ঘণ্টায় ছিয়াশী। আর সেই সাফল্যের সূত্রেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মোট সংগ্রহ জমা পড়লো ২৩০ এর ঘরে। যোঝবার মতো পাথেয় বটে!

তাজা রক্তের স্বাদে হিংস্র শার্দুল যেন ক্ষেপে উঠেছে। 'কনি'ও ভুলেছেন পায়ের আঘাত।

এবার মিডলসেক্সের দ্বিতীয় দফার ব্যাটিংয়ের পালা। পায়ে চোট। 'কনি' কি বল করবেন? ফুঃ! ও আবার চোট! 'কনি' নিজেই দলপতির কাছ থেকে নতুন বল চেয়ে নিলেন। আর সেই বল 'ছুঁড়ে' একে একে সাতজন ব্যাটসম্যানকে নিজেই ঘায়েল করে তুল্লেন।

এই মানুষটির নাকি পায়ের পেশীবন্ধনী ছিঁড়ে গিয়েছে। ছিয়াশী রাণ করার পর সাতান্ন রাণে সাতটি উইকেট (শেষের ছটি নামমাত্র এগারো রাণেই!) পাওয়ার দৃষ্টান্ত ছেড়ে দর্শকেরা আর তখন অন্যদিকে তাকাতে চাইছেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে তখন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ নেই। নেই প্রতিপক্ষ মিডল-সেক্সও। আছে সমগ্র চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওই একমাত্র 'কনি'ই। সবাই তখন পার্শ্ব-চরিত্রে। একনায়ক 'কনি'।

কিন্তু তখনও নাটকের পঞ্চমাঙ্কের উত্তেজনা সৃষ্টি হতে আরও কিছু অবশিষ্ট ছিল।

এবার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় দফার ব্যাটিং। চাকা ঘুরে গিয়েছে। ২৫৯ রাণ করতে পারলেই তারা এই খেলায় জিতবে। তবে জেতার আশা কম। কারণ সময় সামান্য।

এমন সময় ড্রেসিংরুমে অযাচিত এক তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব।

তৃতীয় পক্ষের নাম চার্লস্ ম্যাকারটনি। অস্ট্রেলিয়ার অবিস্মরণীয় খেলোয়াড় তিনি, ক্রিকেট-দুনিয়ায় যিনি 'গভর্ণর-জেনারেল' নামেই পরিচিত। টেষ্ট খেলায় ঝড়ের আগে রাণ তুলে মাত্র যে তিনজন ব্যাটসম্যান মধ্যাহ্ন ভোজনের আগেই ব্যক্তিগত রাণ-সংখ্যাকে একশর সীমার বাইরে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছেন, ম্যাকারটনি তাঁদেরই অন্যতম।

'গভর্ণর জেনারেল' এতোক্ষণ দর্শক আসনে ছিলেন। আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে এলেন ড্রেসিংরুমে। এসেই এসেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দলনায়ক নুনসকে মিনতি জানালেন,

'আপনি সবার আগে কনিকে ব্যাট করতে পাঠান। এ খেলায় আপনারা জিতবেনই।'

'না, না। তা কি করে হয়। কনি যে আহত!'

অধিনায়ক নুনসের দায়িত্বসচেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো।

'তা হোক্। দর্শকদের ভোলাতে কনি নিজের ব্যথাও ভুলবেন। দেখছেন না, আজকের দিনটিতে কনি শুধু সর্বংসহাই নন্, সর্বজয়ীও।' পেড়াপেড়ি করতে লাগলেন ম্যাকারটনি। দায় যেন তাঁরই!

তবু নুনস নারাজ, 'তা হয় না। দরকার না পড়লে কনি মাঠে নামবেন না।'

কি আর করেন ম্যাকারটনি। হাল ছেড়ে দিয়ে গেলেন নিজের জায়গায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর কথাই ফলুলো। দলের প্রয়োজনেই আবার 'কনিকে' মাঠে নামতে হলো।

দ্বিতীয় ইনিংসেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সংকট। পাঁচটি উইকেট গিয়েছে মাত্র একশ রাণের মধ্যে। অগত্যা ব্যাট হাতে মাঠে 'কনির' পুনরাবির্ভাব।

আবার এলেন তিনি। এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। সেই আগের ভূমিকাতেই।

যেখানে সংযমের প্রত্যাশা সেখানে 'কনি' অসংযত বেপরোয়া। দল যখন আঘাতে কোণঠাসা, আক্রমণে সংকুচিত, তখন 'কনি' প্রতি-আক্রমণে ভয়ংকর। হাতের ব্যাট ঘোরালেন, বল ছুটলো আগুনে গোলার মতো দুরন্ত গতি।

সে গতি কখনো নিম্নগামী, কখনো ঊর্ধ্বমুখী, আকাশছোঁয়া। বাউণ্ডারী, ওভার-বাউণ্ডারীর ছড়াছড়ি। রাণের আতস-বাজী যেন! মিডলসেক্সের অস্তিত্ব পুড়ে ছাই হয়ে গেলো এই এক ঘণ্টায়, যে প্রহরে


মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাবলী—ঃ প্রথম ভাগ

ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের বিস্তৃত ভূমিকা ও আলোচনা সহযোগে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনা সম্ভার। কাপড়ে বাঁধাই। পরিপাট্যে অনবদ্য। ১০·৫০

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস ঃ—

**তানিমা জাতক.....বাণী রায়**

প্রত্যেকখানা উপন্যাস ঘরে রাখবার উপহার দেবার ও লাইব্রেরীর জন্য

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

**রাত্রির সীমানা** ৫·০০

অশোক গুহ

**গোরা কালার হাট** ৮·৫০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

**কর্ণাট রাগ** ৪·০০

, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

**অন্যনয়ন** ৪·০০

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

**অ্যাকাসিডেণ্ট** ২·৫০

বিশ্বনাথ রায়

**চৌধুরী বাড়ী** ৪·০০

সংকর্ষণ রায়

**সংঘমিত্রা** ২·৫০

শিশিরকুমার দাশ

**সীমান্ত** ৩·০০

**প্রকাশের অপেক্ষায় ঃ—**

নীরঞ্জন চক্রবর্তী

**জীবনবেদ**

**গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড**

১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

অপরাজিত থেকে 'কনি' তুললেন নিজস্ব শত রাণ।

ওয়েষ্ট ইন্ডিজ জিতলো তিন উইকেটে ঠিক প্রথম টেষ্টের আগেই। জয়লাভে সচকিত হলেন ইংলন্ডের ক্রীড়ামহল। সেই সঙ্গে সফরকারী ওয়েষ্ট ইন্ডিজ দলের ভাগ্যাকাশে লক্ষ্মীর আশীর্বাদও নেমে এলো।

পরের দিন ইংলণ্ডের সাংবাদিককুল সমস্বরে রায় দিলেন।

মিডলসেক্স পরাজিত হয়েছে একজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কনি একাই একশো!'

একাই একশো! বহু প্রচলিত এই প্রবাদের মর্যাদা রাখায় 'কনি' যা করেছেন সত্যিই তার তুলনা নেই। একাধারে তিনি যেমন বেপরোয়া ব্যাটসম্যান, তেমনি মারাত্মক ফাষ্ট বোলার। আবার তেমনি সুদক্ষ ফিল্ডসম্যান, ক্রিকেট-ইতিহাসে যে দক্ষতার তুলনা নেই।

সারা জীবনের গড়ে তিনি প্রতি মিনিটে দুখানি করে রাণ করেছেন। ফাষ্ট বোলিংয়ের ছোবল তুলে বিপক্ষকে অসহায় বানিয়েছেন। আবার ক্ষণে ক্ষণে হাত বাড়িয়ে দুরূহ ক্যাচ ধরেছেন অপ্রত্যাশিতভাবে। সব মিলিয়ে 'কনি' ক্রিকেট মাঠের এক আকর্ষণীয় চরিত্র। এক বিস্ময়ও বটে!

ইয়র্কশায়ারের বিপক্ষে ঊনসত্তর রাণ করতে 'কনি'র আধঘণ্টাও সময় লাগেনি। ল্যাংকাশায়ার লীগে পঁয়তাল্লিশ করতে সাত মিনিটই যথেষ্ট! এবং কুইন্সল্যাণ্ডের আদিবাসী ফাষ্ট বোলার এডি গিলবার্টের বলে সর্বপ্রথম ওভার-বাউণ্ডারী হাঁকড়াতে 'কনির' সাহস ও দক্ষতায় টান পড়েনি।

আর এই গিলবার্ট যে কি ছিলেন তা কি সবাই জানেন! স্বয়ং সার ব্র্যাডম্যানের কথায়,

"আমার জীবনে এডি গিলবার্টের মতো জোরে বল করতে আমি কাউকে দেখিনি। একদিনের অভিজ্ঞতা শুনুন,

'গিলবার্টের বলে যেই ব্যাট ছুঁইয়েছি অমনি ব্যাটখানা হাত থেকে ছুটে পালিয়ে গেল অন্যত্র। তাঁর ফাষ্ট বোলিংয়ের কি প্রচণ্ড ধাক্কা! আর কোনো ফাষ্ট বোলার আমার হাতের ব্যাট কিন্তু সামান্য নড়াতে পারেন নি কোনোদিন!"

অথচ এই বলকেই 'কনি' দাঁড় টপকে মাঠের বাইরে পাঠিয়েছিলেন!

'কনি'র ফাষ্ট বোলিংয়ের মূল্যায়নে সার ব্র্যাডম্যানের অভিমত শোনা যাক :

'ও'র কথা না শোনালে ফাষ্ট বোলিং প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে ৪৫ রাণে উনি যেদিন ছটি উইকেট পান সেদিনই আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, জাত ফাষ্ট বোলারদের দলেও ও'র স্থান বেশ ওপরে।'

সময় সময় 'কনি'র ফাষ্ট বল লাফিয়ে, ছোবল তুলে, হুঙ্কারে ফুঁসিয়ে ব্যাটসম্যানদের সাহসের পুঁজি শূন্য করে দিতে পারতো। ১৯৩০ সালে লর্ডস টেষ্টে ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্যাটিস হেনড্রেন 'কনি'র বিপক্ষে ব্যাট করতে নেমেছিলেন মাথায় মজবুত শিরস্ত্রাণ চড়িয়ে। কপালে-কানে, পাঁজরে-উরুতে পুরু রবারের গদী এঁটে।

'কনি'র বাম্পারকে ভয় করতেন না এমন দুঃসাহসী ব্যাটসম্যান তাঁর কালে কম ছিলেন। আর এক দিনের কথা বলি!

দিল্লীতে সেদিন পাতিয়ালার মহারাজা বনাম বড়লাট লর্ড উইলিংডন দলের খেলা। দু'দলেই আছেন সেকালের ভারত-শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়েরা এবং বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ইংলণ্ডের জনকয়েক পেশাদার। 'কনি' উপস্থিত পাতিয়ালার পক্ষে।

পাতিয়ালার খেলা সাঙ্গ হলো দুশো রাণে। তারপর বড়লাটের দল যখন শ দেড়েক রাণ কুড়িয়ে নিয়েছে তখন তাদের হাতে আরও আটটি উইকেট অবশিষ্ট। একটু আগে এক জরুরী তার পেয়ে পাতিয়ালা-রাজ মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়ায় দলের নেতৃত্ব করছেন এক তরুণ রাজতনয়।

রাজকুমারের বয়স কম। মাথাভরা দুষ্টুমী বুদ্ধি। 'কনি'কে কাছে ডেকে তরুণ রাজতনয় বল্লেন,

'দু একটা বাম্পার ছাড়ুন না?'

প্রথমে রাজী হন নি। পরে রাজতনয়ের পেড়াপেড়িতে যখন 'কনি'র হাত থেকে বাম্পার সত্যিই ছাড়া পেলো তখন বড়লাটের দল প্রমাদ গুনলো।

বিখ্যাত ওয়াজির আলি সেঞ্চুরীর নাগালে

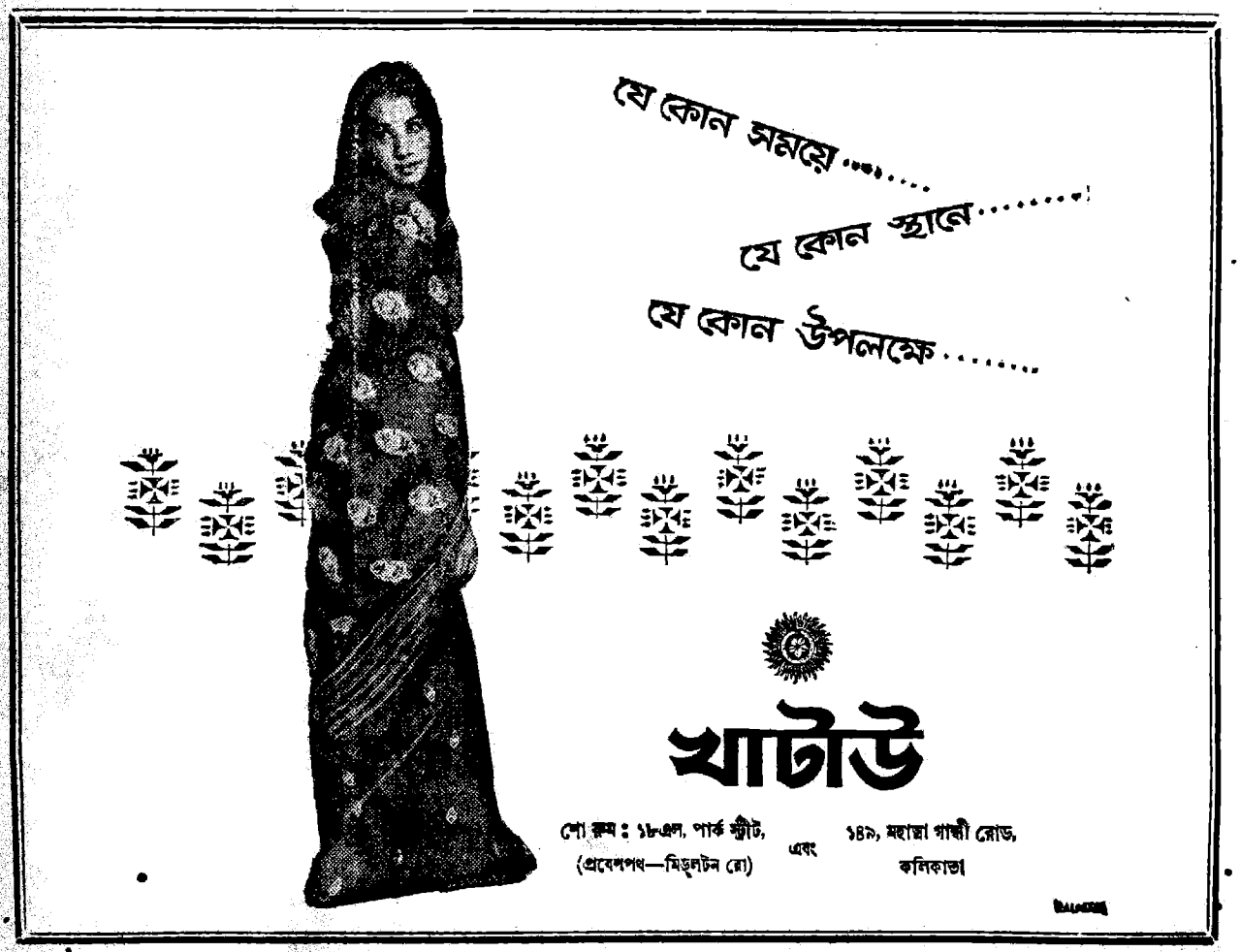

লিয়ারি কনস্টেনটাইন

এসে গিয়েছিলেন। 'কনি'র বাম্পার পত্রপাঠ তাঁকে ফিরিয়ে দিলো। দেখতে দেখতে আরও সাতজনকেও। শেষ পর্যন্ত সেই খেলায় 'কনি'র দল, পাতিয়ালা একাদশই জিতলো মাত্র তিন রাণের ব্যবধানে।

আর ফিল্ডিং? সে বিভাগে তো 'কনি' একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বীই!

শুধুমাত্র ফিল্ডিংয়ের মূল্যধনেই 'কনি' সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দলে জায়গা জুড়ে নিতে পারেন। মাঠের সব অঞ্চলেই তিনি মানান-সই। উইকেটের কাছে, মাঠের মাঝে এবং দূরে, সীমানার ধারে—সারা মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে থাকার অভূতপূর্ব নজীর গড়ে রেখেছেন এই একটি মানুষ 'কনি'। যা আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

সার জ্যাক হবস, ব্যাডম্যান, জেসফ হার্ভে, ওয়াসব্রুক ছিলেন সুদক্ষ কভার-ফিল্ডস-ম্যান। হ্যামণ্ড, চ্যাপম্যান, গ্রেগরি, মিলার, সি এস নাইডু, টনি লকেরা শিল্পে বা উইকেট-সংলগ্ন অঞ্চলের বিশারদ। কিন্তু উইকেটের কাছে ও দূরে সর্বত্রই 'কনি'র একই ভাব। কোনো ক্ষেত্রেই তিনি খাটো নন। ও'তপাতা শিকারীর মতো সচল ও সফল তিনি। এমন 'কমপ্লিট' ফিল্ডসম্যান আর দেখা যায়নি।

এতোটুকু ছেলে যখন 'কনি' তখন বাবা একখানি ছোট্ট ব্যাট উপহার দিয়ে বলেছিলেন, 'বল পেটাবার জন্যেই এই ব্যাট। দেখো, কথাটি ভুলো না যেন কোনোদিন।'

পিতৃ-উপদেশ 'কনি' ভোলেন নি সত্যিই। মাঠে নেমেছেন যখনই, তখনই কি ব্যাটে, কি বলে এবং কি ফিল্ডিংয়ের জৌলুসে তিনি তাঁর ভূমিকার প্রতিশ্রুতিক অস্তিত্বকে তুলে ধরেছেন সবার ওপরে।

এই ভূমিকার হাতছানিতে একটি মানুষকে দেখতে কাতারে কাতারে লোক জমতো ক্রিকেট মাঠে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'ড্র-কার্ড'—'কনি' ছিলেন নির্ভেজাল তাই।

তাঁকে দলে পেতে ইংলণ্ডে ল্যাংকাশায়ার লীগে এক সময় কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত তাঁর দর ওঠে যে অংকে সে অংকের আমন্ত্রণ অবিস্মরণীয় ডন ব্র্যাড-ম্যানের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়নি।

টেস্ট ক্রিকেটে সাফল্য এবং সাম্প্রতির পরি-সংখ্যানের খতিয়ানে 'কনি'র চেয়ে বড় খেলো-য়াড় অনেকেই। কিন্তু এমন প্রাণময় পুরুষের আবির্ভাব ক্রিকেট মাঠে ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

'কনি'র উপস্থিতিই বিবিধ-বিচিত্র প্রাণবন্ত ঘটনার প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতিতেই দর্শকেরা মাঠে আসতেন। আসতেন অঘটন-ঘটনপটু জীবন্ত চরিত্রের সন্ধানে। কনি'কে পেয়ে তাঁদের সব প্রত্যাশা মিটেছে। তাই তিনি সর্বকালের ক্রিকেট-অনুরাগীদের মাথার মণি!

জীবন্ত বলেই তিনি একজন সহজ, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। স্বীপমালা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ঢিলে-ঢালা প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়েছেন যিনি, যুগের কৃত্রিমতা, কেতাবী ঢঙটির আড়ষ্টতা, হিসেবকরা বোনিয়া বুদ্ধির বাঁধনে মাটির স্বাভাবিকতাকে তিনি বন্দী করে রাখতে চান নি। ব্যক্তিজীবনেও তিনি শ্বেতসম্প্রদায়ের অসুস্থ উন্নাসিকতাকে ধিক্কার জানিয়েছেন প্রতি পদে।

'কনি' খেলা ছেড়ে দিয়েছেন কবে, তবুও আজও তিনি ক্রিকেটের ছাত্রদের কাছে সাহস ও সুস্থতা, সহজ ও স্বাভাবিকতার দিক-চিহ্ন। তিনি অপরাজেয় যৌবনেরই প্রতীক।

'কনির' পোষাকী নাম লিয়ারি কনস্টেন-টাইন। অশ্বেতকায় লিয়ারি আজ বর্ণশ্বেত রাজদরবারে 'সার' খেতাবে অভিনন্দিত। উত্তরজীবনে স্বদেশে লোকপ্রিয় জননায়ক ও মন্ত্রী। খেলার মাঠের মতোই জীবন-খেলায়ও তিনি স্বদেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

তিনি সবাকার আদর্শ। তিনি অনু-সরণীয়ও।

পূজায় শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ
নিবেদিতা ধূপ
নারায়ণ প্রোডাক্টস
কলিকাতা—১

# কবেকার কলকাতা

কণাদ চৌধুরী

আজকের কলকাতা কল্লোলিনী। কলকাতা যাদের কাছে ভালবাসার ধন, কলকাতার এই কল্লোল তাঁদের কাছে ধর্ম-সঙ্গীতের মতই পবিত্র। পোড়ো শহর কলকাতা, কফি-হাউসের কলকাতা, মিছিলের কলকাতা, ইস্টবেঙ্গল - মোহনবাগানের কলকাতা—এই শহরবাসীর স্নায়ুতে সতত স্পন্দমান। সামান্য বৃষ্টি পড়লেই রাস্তায় অশালীন জল জমে, জীবিকার প্রয়োজনে ট্রামে-বাসের হ্যাণ্ডেলে জীবনমৃত্যু সঁপে আমরা অফিস যাই, নাগরিক জীবনের হাজার অসুবিধের কর্পোরেশনকে শাপ-শাপান্ত করি তবু বেশী মাইনের চাকরী পেলেও কলকাতা ছাড়তে চাই না। এমনকি কয়েক দিনের জন্যে চেঞ্জে গেলেও মনে হয় কি যেন একটা ভীষণ দরকারী জিনিস ফেলে এসেছি কলকাতায়। অথচ এই শহর কলকাতা নাকি 'আগাছা-শহর—চান্স ইরেকটেড সিটি'!

কলকাতা এখন কেমন জানি, কিন্তু আগে কেমন ছিল? এই ভিড়, নিত্য লালন ভেঙে পড়া, বঁধাকপির পাতাকীর্ণ বাজার, নানান মুখে নানান ভাষা—এসব কি একশ' বছর আগেও ছিল? প্রাচীনেরা বলেন, কলকাতা আগে অনেক ছিমছাম ছিল। এত বাড়িঘর, ভিড় কিছুই ছিল না। বাইরে বেরোলেই নাকে গাছের গন্ধ পাওয়া যেত, ঘন ঘন ফুটপাতে ঘাস উঠে পড়ত না, খাঁটি দুধের জন্যে ভোরের গোয়ালাকে পাহারা দিতে হত না; আর এ্যামিবাইসিস? ও ত যুদ্ধের পরের উপদ্রব মশাই! কালিদাসের কালে জন্মানোর খেদ মানুষের মজ্জাগত, আসলে কালিদাসের কাল কলকাতায় কদাপি ছিল কিনা সেটাই প্রধান বিচার্য।

আজ থেকে অন্ততঃ একশ বছর আগে সেই কবেকার কলকাতা কেমন ছিল তার কিছু কিছু বিবরণ কয়েকজন ইংরেজ লিখে গেছেন। তার একটি বিবরণ এই প্রসঙ্গে দেয়া যেতে পারে।

সিপাহী বিদ্রোহের কলকাতা, সন ১৮৫৭ ঃ

হুগলী নদীর নিজস্ব আকর্ষণ যথেষ্ট। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে জাহাজ এসে ভিড় করে হুগলী নদীর ঘাটে ঘাটে। অন্ততঃ দেড়শোটা জাহাজ আর পঞ্চাশটা স্টীমার সব সময়ে জাহাজঘাটায় বাঁধা থাকে। শহরের উত্তরে লবণ হ্রদের বিপুল বিস্তার। হুগলী নদী বরাবর কলকাতা সাত মাইল দীর্ঘ — চওড়ায় এক মাইল কিংবা কোথাও তার চেয়ে কিছু বেশী। কেন্দ্রস্থল থেকে শহরের পূর্ব এবং পশ্চিম সীমান্ত সমান দূরে দূরে চলে গেছে। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকটা বৃত্তাকার। শহরটি মোট আট বর্গ মাইল। কলকাতা সার্কুলার রোড দ্বারা সীমাবদ্ধ। তিনটে প্রধান রাস্তা উত্তর-দক্ষিণ বরাবর চলে গেছে শহরের ভেতর দিয়ে। ছোট ছোট রাস্তা এবং গলিগুলি এই তিনটে রাস্তাকে সমকোণে ছেদ করেছে। অধিকাংশ ইংরেজরা বাস করে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে। ইংরেজদের এই পাড়াটা গঙ্গার তীর ধরে প্রায় দেড় মাইল লম্বা প্রান্তরে অবস্থিত। এবং এই অঞ্চলের দৃশ্যাবলী নয়নাভিরাম। এরই ঠিক মাঝখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। গঙ্গার তীর-

**কবেকার কলকাতার খরচ** ৩-৩-১৭৯৫ তারিখে প্রকাশিত মূল্য-তালিকা

| কলকাতা থেকে | চিঠির ওজন ২½ তোলা | ২½ — ৩½ তোলা | ৩½ — ৪½ তোলা | ৪½ — ৫½ তোলা |
|---|---|---|---|---|
| | টাঃ আনা | টাঃ আনা | টাঃ আনা | টাঃ আনা |
| বেনারস | ০ — ৭ | ০ —১৪ | ১ — ৫ | ১ —১২ |
| পাটনা | ০ — ৫ | ০ —১০ | ০ —১৫ | ১ — ৪ |
| বাঙ্গাকপুর | ০ — ১ | ০ — ২ | ০ — ৩ | ০ — ৪ |
| রাজমহল | ০ — ৩ | ০ — ৬ | ০ — ৯ | ০ —১২ |
| মুঙ্গের | ০ — ৪ | ০ — ৮ | ০ —১২ | ১ — ০ |
| চট্টগ্রাম | ০ — ৬ | ০ —১২ | ১ — ২ | ১ — ৮ |
| মাদ্রাজ | ১ — ২½ | ২ — ৫ | ৩ — ৭½ | ৪ —১০ |
| হায়দ্রাবাদ | ০ —১২ | ১ — ৮ | ২ — ৪ | ৩ — ০ |
| পুণা | ১ — ৪ | ২ — ৮ | ৩ —১২ | ৫ — ৩ |
| বম্বে | ১ — ৯ | ৩ — ২ | ৪ —১১ | ৬ — ৪ |
| ঢাকা | ০ — ৩ | ০ — ৬ | ০ — ৯ | ০ —১২ |

বর্তী এই প্রান্তর বড় বড় গাছে ভর্তি, মধ্যে মধ্যে বড় বড় পুকুরও আছে। এই বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরের ধারে ধারে ইংরেজদের সাদা সাদা সুন্দর প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বড় বড় বারান্দাওলা ভেনিশীয়ান শার্সি দেয়া এই চকমিলানো বাড়িগুলির জন্যেই কলকাতার আরেক নাম "দি সিটি অফ প্যালেসেস"। হাইকোর্ট, টাউনহল, খাজাঞ্চীখানা এবং গভর্ণমেন্ট হাউস উত্তর-মুখে অবস্থিত। তার পূর্ব দিকে চৌরঙ্গী ঘেঁষে ইংরেজদের কিছু বাড়ি। টাউন হল এবং গভর্ণমেন্ট হাউসের পেছনে উকিলদের চেম্বার, নানা কোম্পানীর অফিস, সাহেবদের দোকান, লাইব্রেরী, পোস্টঅফিস এবং কাস্টটমস হাউস। একটা পুকুরের ধার ঘেঁষে এই সমস্ত বাড়ি। পুকুরটার নাম ডালহাউসী স্কোয়ার।

শহরের ছয়বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে কলকাতার আদি বাসিন্দাদের বসতি। একেবারে উত্তরপ্রান্ত থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ অবধি গঙ্গা-তীরবর্তী সাহেবপাড়ার পেছনদিকের বাঙালীদের পাড়া চলে গেছে। কিছুই নেই এইসব পাড়ায়। এই ইঁটের শহরের প্রায় বাড়িগুলিই সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায়। সৌন্দর্য এবং সুষমতার দিক দিয়ে বিচার করলে বেনারস কিংবা দিল্লীর ধারেকাছে দাঁড়াতে পারে না এই শহর। উত্তর ভারতের পাথুরে শহরগুলির কোনোটির সঙ্গে কলকাতা তুলনীয় না, এমন কি বম্বের চেয়েও কলকাতা শহর হিসেবে নিকৃষ্ট। ইংরেজ-নির্মিত কয়েকটি বড় রাস্তা ছাড়া শহরের সব রাস্তাঘাটই অসম্ভব সরু। বাসগৃহগুলির দেওয়াল

## কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট খেলা

কলকাতা যেমন ফুটবলের পীঠস্থান, তেমনি ক্রিকেটেরও। ইডেনের মাঠে ইংল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক পরাজয়ের পর স্বভাবতই ক্রিকেটের পাতায় কলকাতা একটি উজ্জ্বল নাম। কিন্তু কলকাতায় কবে প্রথম ক্রিকেট খেলা হয়েছিল? যতদূর জানা যায় কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট খেলা হয়েছিল ১৮০৪ সালের ১৮ই এবং ১৯শে জানুয়ারী তারিখে। খেলা হয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইটোনীয় সিভিল সারভেন্টসদের সঙ্গে কোম্পানীর কলকাতাবাসী অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে। জয়লাভ করেছিলেন ইটোনীয়ানরা, এক ইনিংসে এবং ১৫২ রাণে। ইটোনীয়ান করেছিলেন এক ইনিংসে ২৩২ রাণ এবং অপর পক্ষ করেছিলেন দু ইনিংসে মাত্র ৮০ রাণ।

এবং বারান্দাগুলো গলিতে সব সময়ের অন্ধকার ছায়া জমিয়ে রাখে। কলকাতার কুড়িটি বাজারে সর্বদাই ভিড়। বড়বাজারের অবস্থা শোচনীয়। সমস্ত বাজারটাই যে কোনো সময় ভিড়ের মাথায় ভেঙ্গে পড়তে পারে। উত্তর ভারতের সেরা বস্ত্রাদি এই বাজারে কেনাবেচা হয়। আফিমের বাজারে ভিড় করে লালপাগড়িপরা রাজপুত এবং বম্বের হিন্দুরা। রাস্তার প্রায় ওপরেই সার সার দোকান। কোনো দোকানে কাঁচ অথবা জানালা নেই। রাস্তার ধুলোবালি স্বচ্ছন্দে দোকানে ঢুকে পড়ে। এইসব দোকানে কাঁসাপিতলের বাসন, জুতো, কারুকার্য-খচিত টিনের লণ্ঠন, কাপড়, মাদুর,

## কবেকার কলকাতার জনসংখ্যা

| | | |
|---|---|---|
| ১৭১০ | | ১২০০ |
| ১৭৫২ | হলওয়েলের হিসেবে | ৪০৯০০০ |
| ১৭৮২ | ম্যাকিন্টোসের ,, | ৫০০০০০ |
| ১৭৮৯ | গ্র্যান্ড প্রীর ,, | ৬০০০০০ |
| ১৮০০ | পুলিশ কমিশনারের ,, | ৫০০০০০ |
| ১৮০২ | চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের ,, | ৬০০০০০ |
| ১৮১৪ | স্যার হাইডের ,, | ৭০০০০০ |
| ১৮১৫ | ইস্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার | ৫০০০০০ |
| ১৮২১ | এসেসরের হিসেবে | ২৩০৫০২ |
| ১৮৩১ | ক্যাপ্টেন স্টিলের ,, | ৪১১০০০ |
| ১৮৩৭ | ক্যাপ্টেন বার্চের ,, | ২৩০০০০ |
| ১৮৪০ | সীমসের ,, | ৩৬১০০০ |
| ১৮৫০ | চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের ,, | ৪১৩০০০ |
| ১৮৭২ | সেন্সাস | ৬৩৩০০০ |

বেতের চেয়ার, মাটির বাসন, বাঁশ খড় প্রভৃতি নানা ধরনের জিনিস সাজানো থাকে।

১৮৪৭ সালে তিনটে পৃথক হিসেবে কলকাতার জনসংখ্যা ছিল চার লক্ষ। এখন কলকাতার জনসংখ্যা বেড়ে পাঁচ লক্ষের মতন হয়েছে। শহরতলি আগের চেয়ে বিস্তৃত হয়েছে। কলকাতার সীমা থেকে এক মাইল পরিমিত স্থান ঘুরলে এই ষোলো বর্গ-মাইলের মধ্যে প্রায় দশটি ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছে। তাদের মোট জনসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। অতএব কলকাতা এবং তার শহরতলিকে ধরলে মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় আট লক্ষ। এই জনসংখ্যার ত্রিশ হাজার হচ্ছে ইংরেজ, জার্মান কিংবা আর্মেনীয়। ইউরোপীয় অধিবাসীদের জন্যে মোট সতেরোটি প্রটেস্টান্ট গির্জা। একটি আর্মেনিয় গির্জা, একটি গ্রীক, এবং ছটি রোমান ক্যাথলিক গির্জা আছে। শহরের অধিবাসীদের মধ্যে অন্তত সত্তর থেকে আশী হাজার লোক মুসলমান এবং চার লক্ষ হিন্দু। শহরতলি ধরলে হিন্দুর সংখ্যা আরো কুড়ি হাজার বৃদ্ধি পাবে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বাড়বে সামান্য কয়েক হাজার মাত্র। ১৮২২ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী কলকাতার জনসংখ্যা হল : খৃষ্টধর্মাবলম্বী—১৩,১৩৮, মুসলমান—৪৮,১৬২, হিন্দু—১১৮,২০৩ এবং চীনা—৪১৪ জন। অর্থাৎ মোট ১৭৯,৯১৭ জন।

এই হচ্ছে সেই কবেকার কলকাতা। ভেবে দেখতে গেলে সত্যি কি বদলেছে কলকাতা? সম্ভবত না। সংখ্যায় কিছু বাড়ি বেড়েছে, কিছু লোকসংখ্যা। হয়ত ট্রাম-রাস্তা হয়েছে, দোতলা বাস চলছে, বিজলী

সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য

কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে আশুফলপ্রদ, কুলকুচি ও মুখ ধোয়ার কার্যকরী। ঘর, মেঝে ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে অত্যাবশ্যক।

# এ্যানটল

৩৩, ১১০, ৩৫০ মিলি বোতলে ও ১.০ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

প্ল্যানেটারিয়মে আকাশ বন্দী, কিন্তু তাতেই কি একটা শহরের চরিত্র বদলায়?

বদলায় না, লণ্ডনের মত কলকাতাও তার নাগরিকদের হৃদয়ে চিরকাল একটি ধ্রুব স্থান হয়ে থাকবে।

## ভৌতিক কলকাতা

পুরোনো কলকাতার কতকগুলো প্রিয় ভূতের গল্প ছিল। কলকাতায় সেদিন সন্ধ্যে হলেই বালিগঞ্জের শেয়ালের ডাকে সাড়া দিতে ময়দানের শেয়ালরা গলা সাধত, বিউরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডের দু পাশের বড় বড় গাছের পাতায় হাওয়ার আক্রমণে ভয়ের শব্দ তৈরী হত। বেলোয়ারি নাচের আসর থেকে টমটমে বাড়ি ফিরতে ফিরতে 'নেটিভ ক্যালকাটায়' ভূত দেখতেন, ভয় পেতেন, দুর্দান্ত নীলকর-সাহেবরা। সিভিল সার্ভিসের ছোকরা সাহেবরা মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে ছায়াছায়া মতন কিছু-একটা দেখলেই পাংখাওয়ালাকে ঘরে আসবার জন্যে ডাকাডাকিও শুরু করতেন কখনো কখনো। পুরোনো কলকাতার ভূতের গল্প এঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ বিলেতের চিঠিতে, আত্মজীবনীতে অথবা ইংল্যাণ্ডে অবসর-জীবন যাপনকালে নাতি-নাত্নী অথবা বন্ধুবান্ধবদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। তবে সাহেব-বর্ণিত ভূতরা সকলেই প্রায়-সাহেব। নেটিভ ভূতদের নিয়ে গল্পগাছা করতে কলকাতার সাহেবরা হয়ত বিশেষ পছন্দ করতেন না, কিম্বা পছন্দ করলেও এ বিষয়ে 'মা লিখ' নীতিকেই তাঁরা কার্যকরী করেছিলেন।

পুরোনো কলকাতার বনেদী মহলকে সবচেয়ে বেশী ভয় দেখিয়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। কলকাতার বনেদী পাড়া আলীপুর প্রতি রাত্রে কাঁপতে কাঁপতে অশ্ব-ক্ষুরধ্বনি শুনত। নির্জন নিশীথে চার ঘোড়ার গাড়ি এসে থামত হেস্টিংস হাউসের সামনে। আলীপুরের বনেদী পাড়া জানে কেন থেমেছে গাড়িটা, কে নামল গাড়ি থেকে, কোন দৃশ্য অভিনীত হবে এখন হেস্টিংস-প্রাসাদের ঘরে ঘরে, অলিন্দে। নিশীথের আগন্তুক স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস। রোজ ঠিক একই সময় তিনি আসেন ঘোড়া ছুটিয়ে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে সমস্ত বাড়িটা তন্নতন্ন করে সেই হারিয়ে-যাওয়া কাঠের কালো বাক্সটা খোঁজেন। যতদিন কালো বাক্সটা পাওয়া যাবে না, হেস্টিংস আলিপুরে আসবেন, এমনি নিশীথে, আলিপুরকে এমনি তটস্থ করে। এই কাঠের কালো বাক্সের একটা ইতিহাস আছে। হেস্টিংস-এর প্রিয় বন্ধু এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী নেসবীট টমসন বিলেত থেকে হেস্টিংস-এর একটা চিঠি পান। চিঠির তারিখ ২১-৭-১৭৮৫। এই চিঠির উল্লেখ গ্লীগের হেস্টিংস-জীবনীতে আছে। এই চিঠিতে প্রাক্তন বড়লাট লিখছেন টমসনকে :

পুনর্বার নিতান্ত দুঃখের সহিত সেই বাক্সটির বিষয় উল্লেখ করিতেছি। এই বিষয় অদ্যাবধি তোমার অথবা লারকিন্স-এর নিকট হইতে কোনো সংবাদ পাইলাম না। বাক্সটির বিষয়ে আমার উৎকণ্ঠা তোমরা কেহই কল্পনা করিতে পারিতেছ না।

কলকাতার বনেদী পাড়া আলীপুর, প্রতি রাত্রে কাঁপতে কাঁপতে অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনত।

এই পত্রপ্রাপ্তির পর টমসন হয়ত যথাসাধ্যই চেষ্টা করেছিলেন বাক্সটা হদিশ করবার, কিন্তু বাক্সটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অবশেষে ১৭৮৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বরের ক্যালকাটা গেজেটে একটা বিজ্ঞপ্তি বেরুল :

Whereas an old black wood bureau, the property of Warren Hastings Esq. containing, amongst other things, two small miniature pictures and some private papers, was about the time of his departure from Bengal, either stolen from his house on the esplanade, or by mistake sold at the auction of his effects. This is to give notice that Mr. Larkins and Thomson will pay the sum of 2000 sicca rupees to any person who shall give them such information as shall enable

ত্বকের নিচে শীঘ্র শোধিত হইয়া কেশমূলে অবস্থিত অসংখ্য গ্রন্থি হইতে তৈলজাতীয় পদার্থ নিঃসরণে সহায়তা করে। এই পদার্থ অকাল-পক্কতা নিবারণ ও সবল কেশোদ্গমের জন্য অপরিহার্য। **সাইমিল রুমেলোকে** এই গুণসম্পন্ন করিয়াছে।

• **সাইমিল** যুক্ত একমাত্র কেশতৈল

them to recover the contents of the bureau.

কিন্তু দু হাজার সিক্কা টাকার দাবীদারের কখনো আবির্ভাব ঘটে নি, বাক্সটিও উদ্ধার হয়নি। বন্ধুদের অকর্মণ্যতায় বিরক্ত হয়ে হয়ত তাই হেস্টিংসকেই স্বয়ং আসতে হয় রোজ রাত্রে।

আবার গভর্ণর-জেনারেল থাকাকালে হেস্টিংস নিজেও একবার ভূতগ্রস্ত হয়েছিলেন। ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন ১৮৮০ সালে রেভারেণ্ড বি ডবল্যু স্যাভিল তাঁর 'এ্যাপারিশন' নামক একটি গ্রন্থে। কলকাতার সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে কাউন্সিল-কক্ষে বসেছিলেন গভর্ণর-জেনারেল হেস্টিংস। মিঃ সেক্সপীয়ার নামে জনৈক সদস্য হঠাৎ কথা বলতে বলতে মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে, আমার বাবা এখানে?" কাউন্সিলের সমস্ত সদস্যবৃন্দ অবাক হয়ে দেখলেন যে, একটি অচেনা মূর্তি, মাথায় অদ্ভুত ধরনের একটা টুপি পরে হলঘর দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে একেবারে মিলিয়ে গেল। অথচ পাশের ঘরে যেবোবার মত বহির্গমনের কোনো পথ ত দূরের কথা একটা জানলা পর্যন্ত ছিল না। সেই রহস্যময় আগন্তুকের মাথার টুপিটাও উপস্থিত সদস্যদের কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছিল। হেস্টিংস ঘটনাটির রহস্যে এতই বিচলিত হয়েছিলেন, যে ব্যাপারটি নথিভুক্ত করবার আদেশ দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। মহাফেজখানায় সেই নথিটি খুঁজলে বোধ হয় এখনো পাওয়া যেতে পারে। কিছুদিন পরে ইংল্যাণ্ড থেকে জাহাজে করে মিঃ সেক্সপীয়ারের বাবার মৃত্যুসংবাদ এল এবং সেই সঙ্গে এল এক নতুন ধরনের টুপির চালান। সেই প্রথম ভারতে "চিমনী-পট" টুপি প্রবাসী ইংরেজদের শিরোধার্য হল।

কিন্তু ভূত-দর্শন কেবল আমীর-ওমরাহের মধ্যেই সীমিত ছিল না সেকেলে কলকাতায়। মফস্বলের একজন নীলকর-সাহেবও চমকে ছিলেন ভূত দেখে। ঘটনাটি ঘটেছিল এখনকার ধর্মতলা স্ট্রীটে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পেছনে মেথডিস্ট চ্যাপেলের একটা ফ্ল্যাট-বাড়িতে।

বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন লিউম কুপার তাঁর স্ত্রীর জন্যে। কুপার ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে হাণ্টার কোম্পানীর হিসেবরক্ষক। বউবাজারে সেন্ট জেভিয়ার গির্জা তখন হয়নি। বউবাজার তখন সাহেবদের পক্ষে একেবারেই অনভিজাত পাড়া। কিন্তু হিসেবরক্ষকের চাকরী করে এর চেয়ে ভাল পাড়া জোটে নি কুপারের। তিনি সস্ত্রীক বাস করতেন এখানকার সেণ্ট জেভিয়ার গির্জার জমির ওপর অবস্থিত একটা বাড়িতে। দুর্ভাগ্যক্রমে চার বছরের ব্যবধানে এই বাড়িতে কুপারের কুড়ি বছর এবং পনেরো বছরের দুজন ছেলে মারা যায়। কুপারের স্ত্রী পাগল হয়ে যান এবং তাঁকে ভবানীপুরের উন্মাদাশ্রমে কিছুদিনের জন্যে রাখতে হয়। সুস্থ হবার পর মিসেস কুপার কিন্তু বউবাজারের সেই শোকাবহ বাড়িতে ফিরতে চাইলেন না। তাঁর জন্যে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পেছনে দু তলায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন কুপার। স্ত্রী বাস করতে লাগলেন ধর্মতলা স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে, কুপার তাঁর কাজের সুবিধের জন্যে বউবাজারের বাড়িতেই রয়ে গেলেন। প্রত্যেক দিন সকালে স্বামী গির্জায় প্রার্থনা সেরে, দৈনিক বাজার করে স্ত্রীর ফ্ল্যাটে আসতেন ঘোড়ার গাড়িতে। ১৮৪৫ সালের ৬ই মার্চও যথারীতি বাজার করে স্ত্রীর ফ্ল্যাটে ঢুকতেই একটি বীভৎস দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হল লিউস কুপারকে। দেখলেন মিসেস কুপার বারান্দায় মৃত পড়ে আছেন। গলায় গামছার ফাঁস দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। মিসেস কুপার যে আত্মরক্ষা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তার অজস্র প্রমাণ চারদিকে ছড়িয়ে। বাড়ির সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি দুর্বৃত্তরা নিয়ে গেছে। পুলিশের জোর তদন্ত হল, কিন্তু ধরা গেল না কাউকে।

ধর্মতলার এই বাড়িটা কিছুদিনের মধ্যেই ভূতুড়ে বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল। বেশ কিছুকাল খালিই পড়ে রইল বাড়িটা। মিসেস কুপারের হত্যাকাণ্ডের কয়েক বছর পরে দুজন নীলকর-সাহেব বাড়িটা কয়েক মাসের জন্যে ভাড়া নিলেন। কলকাতায় তাঁরা সদ্য এসেছেন ব্যবসাগত কাজে, কাজ শেষ হলেই আবার স্বস্থানে ফিরে যাবেন। তাঁরা বাড়িটার অখ্যাতির কথা কিছুই জানতেন না। একদিন বিকেলে একটি প্রমোদানুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল দুই বন্ধুর। কিন্তু একজনের হঠাৎ জ্বর হওয়ায় তিনি যেতে পারলেন না, অপর বন্ধুটি একাই গেলেন। হলঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন অসুস্থ নীলকর-সাহেব। পরদিন সকালে দুই বন্ধুর মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেল।

—কি হে কলকাতায় আসতে না আসতে মেয়ে জোটাতে শুরু করলে?

—মেয়ে? দ্বিতীয় বন্ধুর অবাক প্রশ্ন।

অবাক হচ্ছ যে! কালকে এক মহিলাকে নিয়ে রাত্রে বাড়িতে ঢোকো নি?

—ককখনো না। কালকে রাত্রে বোধ হয় তোমার জ্বর বেড়েছিল, বিকারের ঘোরে ছিলে। কিন্তু কি দেখেছিলে বল ত কালকে?

অসুস্থ সাহেব যেন বন্ধুর কথায় আরো অসুস্থ হতে আরম্ভ করলেন।

—বলো কি? আমি যে স্পষ্ট দেখলাম!

—আহা, কি দেখলে বলই না!

—জ্বরটা সত্যি আমার বাড়েনি তেমন। মানে রাত্রের দিকে ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়ে আর আসতে চাইছিল না, জেগেই শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম তোমার ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। একজন মেয়ে বেরোলো তোমার ঘর থেকে। হলঘরে আমার সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে মূর্তিটা বারান্দার দিকে চলে গেল। মেয়েটার পোশাকটা কেমন যেন ছেঁড়াখোঁড়া,

যেন খুব একচোট ধস্তাধস্তি করেছে কারো সঙ্গে। কিন্তু আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম, মেয়েলী মূর্তিটার গলায় একখণ্ড লম্বা কাপড় আঁটো ভাবে জড়ানো দেখে। মূর্তিটা বারান্দায় ওদিকে যেতেই আমি পেছন পেছন গিয়েছিলাম। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। বন্ধুটির বিবরণ শেষ হওয়ার পর বাড়ির চাকরদের ডেকে, তারা কালকে কাউকে নীচে নামতে দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হল। তারা কেউ কিছু দেখেনি জানাল এবং সেই সঙ্গে বাড়ির ইতিহাসটাও জানিয়ে দিল। আর একদিনও নীলকর-সাহেবরা সে বাড়িতে থাকেন নি; কিছুদিন পর বাড়িটাও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল।

বনেদী ভূতরা কিন্তু আলিপুর ছেড়ে নড়তে চাইত না। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ভূত ছাড়াও আলিপুর-পাড়ায় গা-ছম-ছম ভৌতিক কাহিনী সাহেবমহলে ভীষণ চলত। মিসেস ডি গ্ল্যাডিং এমনি একটা ভৌতিক কাহিনী বলেছেন। তবে মিসেস

একজন মেয়ে বেরোলো তোমার ঘর থেকে।

গ্ল্যাডিংএর ভূত চোখে দেখা নয়, কানে শোনা। মিসেস গ্ল্যাডিংএর বিবরণ ঃ

আমার স্বামী ১৯২৬ সালে আলীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আমরা ম্যাজিস্ট্রেট-হাউসে থাকতাম। ঔপন্যাসিক থ্যাকারের বাবা ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন এই বাড়িতেই থাকতেন। থ্যাকারের শিশুকালের কিছু অংশও এই বাড়িতে কেটেছে। বাড়িটা পুরোনো ধরনের। ভেতরে বিরাট লন, আম আর লিচুর বাগান। এতদিকে টালীর নালা আরেক দিকে আলীপুর জেলের উঁচু প্রাচীর—এই হচ্ছে বাড়িটার মোটামুটি সীমানা। একদিন রাত্রে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ বাড়ির একটা ঘর থেকে পিয়ানো বাজানার সুর শুনলাম। অথচ আমাদের বাড়িতেই পিয়ানো নেই, বেতারযন্ত্রও না। এর কিছুদিন পরে একজন মহিলা আমাদের বাড়িতে থাকতে এলেন। প্রথম দিন বিকেলে আমরা যখন চায়ের আসরে একত্রে হলাম মহিলাটি আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বল্লেন যে আমার পিয়ানো বাজানো তাঁকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। আমি তাঁকে সবিনয়ে জানাই যে এই বাড়িতেই পিয়ানো নেই। ১৯৩৯ সালে আমরা ইংল্যাণ্ডে চলে আসি। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে একদিন আমি এবং আমার স্বামী আমাদের পারিবারিক বন্ধু স্যার জেমস এবং লেডী ডোনাল্ডের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলাম। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও নানা কথা বলতে বলতে ডোনাল্ড-দম্পতির কাছ থেকে একটা গল্প শুনে চমকে উঠেছিলাম। স্যার জেমস প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় আলীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, এবং আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, সেই বাড়িতেই থাকতেন ওঁরা। লেডী ডোনাল্ডের মা সঙ্গীতনিপুণা মহিলা ছিলেন। তিনি একবার মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে এসেছিলেন বেড়াতে। সঙ্গে এনে-ছিলেন বিরাট একটা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো। অবসর পেলেই পিয়ানো বাজিয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দিতেন তিনি। যুদ্ধের পর ডোনাল্ড-দম্পতি এবং লেডী ডোনাল্ডের মা স্বদেশ অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু জাহাজ কোম্পানী অতবড় পিয়ানো কিছুতেই নিতে রাজী হয় নি। শেষপর্যন্ত পিয়ানোটা এদেশে ফেলেই চলে যান তাঁরা। লেডী ডোনাল্ডের মা পিয়ানোটার শোক সারা জীবনেও ভুলতে পারেননি, যতদিন বেঁচে ছিলেন ভারতবর্ষে ফেলে-আসা গ্র্যাণ্ড পিয়ানোটার জন্যে শোকপ্রকাশ করতেন।

তাঁদের কথা শেষ হওয়ার পর আমি, ম্যাজিস্ট্রেট-হাউসে আমার অভিজ্ঞতার কথা আস্তে আস্তে বল্লাম।


বাংলাসাহিত্যের সমৃদ্ধির ভাণ্ডারে
নবতম সংযোজন

আশাপূর্ণা দেবীর অতলান্তিক ৫৲ ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নতুন উপন্যাস হৃদয়ের রঙ ৪৲ ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক উপন্যাস পায়ে পায়ে প্রহর ২·৫০ ॥ বিশ্বনাথ রায়ের নবতম উপন্যাস বহ্নিকন্যা ২·৫০ ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প ৪৲ ॥ বিশ্বনাথ রায়ের নানারঙ ২·০০ ॥ আশাপূর্ণা দেবীর নতুন উপন্যাস ঃ জলছবি ॥

চতুষ্পর্ণার শারদীয়া সংখ্যায় ৪টি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন। সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ বিমল কর ॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ কবিতা সিংহ ॥ তাছাড়া বহু তরুণ ও প্রবীণ লেখকদের অবদানে সমৃদ্ধ ॥
॥ দাম মাত্র দুটাকা ॥

এডুকেশানাল এণ্টার প্রাইজার্স ॥ ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলি-৯

মডার্ন করেসপণ্ডেন্স কলেজ

সিটি অফিস ১ ঃ ১১৫, একডালিয়া রোড, কলিঃ-১৯ (বালিগঞ্জ ষ্টেশনের পাশে)। সিটি অফিস ২ ঃ (মর্ডান প্রিপারেটরী কলেজ) ১৯৬।১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিঃ-২৯। সিটি অফিস ৩ ঃ ২০এ, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিঃ-১২ (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের পাশে)

COMPLETE POSTAL COURSES FOR
M.A. IN ENGLISH, BENGALI, MODERN, ANCIENT & ISLAMIC HISTORY, POL. SCIENCE, PHILOSOPHY, MATHEMATICS (also M.Sc.) & ECONOMICS.
HONOURS in English, Bengali, History, Philosophy, Economics & Education.
M.COM. WITH ALL GROUPS: B.A. PASS, B.COM., PRE-UNIV.

বিনামূল্যে প্রসপেক্টাসের জন্য যে কোন সিটি অফিসে লিখুন

ডাকযোগে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা

## দুই সাহেবের বিবি

কবেকার কলকাতা অনেক দিন মনে রাখবে দুই সাহেবের বিবিকে। না মনে রেখে উপায় নেই কলকাতার, কলকাতা কৃতঘ্ন নয়। কবেকার কলকাতায় নিয়মিত টাকা আসত দুই সাহেবের বিবির কাছ থেকে। কলকাতার বিশপই মোট এক লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের ভরণ-পোষণের জন্যে। কলকাতার গরীবদের কথাও মনে ছিল বিবির, মনে ছিল কলকতার কিছু লোক দেনার দায়ে কারাগারের জন্য অপেক্ষমান। তাদের জন্যে এসেছিল মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা। কলকাতার এখনও বিবির সেই উইলটি আছে যার প্রতিটি লাইনই দানছত্র। শুধু কলকাতাই বা কেন, দুই সাহেবের বিবিকে মনে রাখবে, রোমের, ক্যাণ্টারবেরীর, বম্বের এবং মাদ্রাজের রোমান ক্যাথলিক সমাজ। তাঁর কাছ থেকে পোপ দেড় লক্ষ টাকা, ক্যাণ্টারবেরীর বিশপ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন দান-খয়রাতির জন্যে।

পরিচয়, দুই সাহেবের বিবি, নাম, বেগম সমরু, আসল কুমারী নাম, জেবুন্নিসা। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাঁর একটি নামই গ্রাহ্য—বেগম সমরু। বেগম সমরু জন্মেছিলেন অষ্টাদশ শতকে, পরলোকগমন করেছেন উনবিংশ শতকে। দীর্ঘ ছিয়াশী বৎসর যেন রূপকথার জীবনই যাপন করেছিলেন তিনি। দুই সাহেবের বিবি, বেগম সমরু ইতিহাসের এক অলৌকিক চরিত্র। ইংরেজদের বঙ্গ-বিজয়ের আগেই তৎকালীন ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের মধ্যমণি হতে পেরেছিলেন তিনি। ইউরোপীয়দের মধ্যে তাঁর পাণিপ্রার্থনায় প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না। মুঘল সম্রাটের তিনি ছিলেন প্রিয়তম কন্যা-প্রতিমা। এক সময়ে তিরিশ জন ইউরোপীয় সেনানায়ক ঈশ্বরের নামে শপথ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছেন। আবার ভাগ্যের হাতে হারতেও হয়েছে তাঁকে। নিজের সৈন্যবাহিনীর হাতেই বন্দী হয়ে সাত দিন অভুক্ত থাকতে হয়েছে যতদিন না তাঁর পূর্বপ্রণয়ী জর্জ টমাস এসে তাঁকে রক্ষা করেছেন। বিখ্যাত ইংরেজ

বেগম সমরু

অপূর্ব রান্না
আর বাড়ীর মতো
স্বাচ্ছন্দ্য

দিনযাপনের প্রতিটি মুহূর্ত পুরোপুরি উপভোগ করতে হলে

রাঁচী হোটেল
স্থান সংকুলানের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন
টেলিফোন নং রাঁচী ৪০

পুরী হোটেল
স্থান সংকুলানের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন টেলিফোন নং পুরী ৬৩

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

সেনাপতি লর্ড লেকের চুম্বন-কাহিনীর ইনিই ছিলেন নায়িকা। লর্ড লেক প্রকাশ্যে এই বেগম সমরুকেই মুখচুম্বন করতে গিয়ে দারুন বিব্রত হয়েছিলেন একদা। আবার উদ্ধারও পেয়েছিলেন বেগমের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। লেক বিদেশী শিষ্টাচারবশতই বেগমের সৈন্যবাহিনীর সামনেই তাদের কর্ত্রীর মুখচুম্বন করেছিলেন। দৃশ্যটি বেগমের মুসলমান সৈন্যরা ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু আসন্ন একটা বিপ্লবকে এক কথার ফুঁয়েই উড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিন বেগম। 'সাহেব পাদ্রীরা মেয়েদের এই ভাবেই আশীর্বাদ করে জানো না তোমরা?' আর কিছুই বলতে হয়নি সেদিন। আরো অনেক কিংবদন্তীর আলোয় বেগম সমরু উজ্জ্বল ছিলেন। তার সবটাই যে সত্যি এ প্রমাণও যেমন কেউ দাখিল করেনি, সেগুলি সবই মিথ্যে এ হলপও কাউকে করতে শোনা যায়নি। তবে এখান-ওখান থেকে কিছু প্রমাণ জড়ো করে বেগম সমরুর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। বেগম সমরুর বাবা ছিলেন দিল্লীবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত আরব। শাহ আলম যখন দিল্লীর তখতে বসেন বেগমের পিতা লতিফ আলি খাঁন তখন দিল্লীতেই ছিলেন। সতেরো বছর বয়সে দুই সাহেবের বিবির জীবনে প্রথম সাহেবের আগমন ঘটে। উইলিয়াম রেইনহার্ট ছিলেন এক দুর্দান্ত ভাগ্যান্বেষী। ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে রেইনহার্ট ভারতবর্ষে আসেন এবং কিছুকাল ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কাজ করেন। ১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভ যখন ফরাসী চন্দননগর অবরোধ করেন, রেইনহার্ট ফরাসীদের চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাংলার নবাবের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। ফরাসী সহকর্মীরা রাইনহার্টকে 'লে সমব্র' নামে ডাকতেন। রাইনহার্টের গোমড়া মুখ, রসকসহীন স্বভাবের জন্যেই এই নাম দিয়েছিলেন তাঁর ফরাসী বন্ধুরা। ফরাসী 'সমব্র' দেশী মুখে 'সমরু' হতে বেশী সময় নেয়নি।

ভাগ্যান্বেষী রাইনহার্ট ফরাসীদের যেমন প্রিয় ছিলেন, ইংরেজদের তেমনি ছিলেন ঘৃণার পাত্র। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের হয়ে প্রায়ই অস্ত্রধারণ করেছিলেন তিনি। এক সময় দিল্লী পর্যন্ত তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। রাইনহার্ট ১৭৬৩ সালে বিয়ে করেন জিবুন্নিসাকে এবং সেই থেকে জিবুন্নিসা 'বেগম সমরু'। কিন্তু পনেরো বছরের বেশী প্রথম সাহেবের সঙ্গে থাকতে পারেননি বেগম। ১৭৭৮ সালে রাইনহার্ট পরলোকগমন করেন। রাইনহার্ট স্বীয় কৃতিত্বে শিরধানা পরগণার বিপুল জায়গীর পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বেগম সমরুর হাতে আসে শিরধানা পরগণার জায়গীর। শুধু জমিদারীই না, ছোটখাটো একটি সৈন্যবাহিনীরও সর্বময়ী কর্ত্রী হন বেগম সমরু।

সমরু বেগমের শৈশব এখনো ইতিহাসের কুয়াশায়। বিশেষ কিছুই জানা যায় না তাঁর বাল্যকাল সম্বন্ধে। শুধু তাঁর ব্যর্থ-প্রণয়ী জর্জ টমাসের জীবন-স্মৃতি থেকে তাঁর রূপ এবং জীবনযাত্রার কিছু আভাস পাওয়া যায়। বেগম দেখতে ছোটখাটোই ছিলেন, মোটার দিকে একটু ঝোঁক ছিল। রঙ ফরসা, চোখ কালো এবং আকর্ণ-বিস্তৃত। সব সময়ে মহার্ঘ ভারতীয়

দৃশ্যটি বেগমের মুসলমান সৈন্যরা ভালো চোখে দেখেনি

পরিচ্ছদই পরতেন। পারসীক এবং উর্দু-ঘেঁষা হিন্দী অনর্গল বলতে পারতেন। এবং প্রণয়ী টমাসের মতে তাঁর কথা বলার ধরনে মাদকতা ছিল, দীপ্তি ছিল। বেগমের আলাপচারীতে যে কোনো শ্রোতাই বন্দী হতে ভালবাসত। শিরধানায় বেগমের দিন-যাপনের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন টমাস-সাহেব।

বেগমের বাসগৃহ ছিল প্রাকারবেষ্টিত সুরক্ষিত শহরের মত। তাঁর সুদৃঢ় প্রাসাদ মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো থাকত। ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় দুই প্রস্থ আসবাবপত্রের মিশ্রণে খারাপ লাগত না দেখতে। অতিথিবৎসলা বেগমের টেবিলে দেশী-বিদেশী নানা ধরনের জিনিস সাজানো থাকত। বিদেশী জিনিস জোগাড় হত কলকাতা থেকে। ভারতীয় রীতিনীতি বেগমের অনুচর-পরিচারিকারা কঠোর নিষ্ঠায় পালন করত। বেগম নিজে কখনো বাইরে বা দরবারে পর্দানসীন না হয়ে বেরোতেন না। তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীরা এলে ঢিকের ওপারে বসতেন। বেগম থাকতেন ওপারে। বেগম তাঁর সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের প্রায়ই ভোজে নিমন্ত্রণ করতেন, কিন্তু দেশী কর্মচারীদের সেই সান্ধ্যভোজের আসরে কখনো নিমন্ত্রণ হত না। কুড়ি থেকে তিরিশ জন ক্রিশ্চান পরিচারিকা নিমন্ত্রিতদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকত।

বেগম সমরু নিজে ক্রিশ্চান হয়েছিলেন প্রথম স্বামীর মৃত্যুর তিন বছর পর। আগ্রার ফাদার গ্রেগারিও বেগমকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। এই ফাদারই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দুই সাহেবের বিবির সঙ্গে দ্বিতীয় সাহেবের মিলনকে বিবাহ-সিদ্ধ করেন। এই দ্বিতীয় সাহেব হলেন ফরাসী, লে

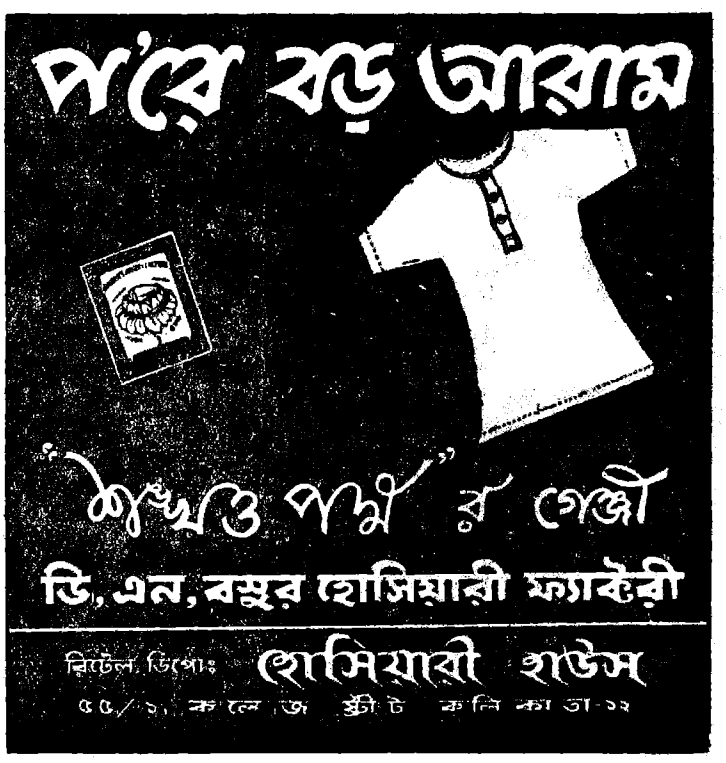

ভাসল্ট। সমরু-সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর সৈন্যবাহিনীও বেগমের কর্তৃত্বাধীনে আসে। এই সৈন্যবাহিনীর সৈন্যরা ছিল দেশী, অফিসাররা সকলেই ছিল সাহেব। যদিও নামেই সাহেব, শিক্ষাদীক্ষায় তারা দেশী সৈন্যদের মতই নিরক্ষর। কিন্তু এদের মধ্যে দুজন ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের লোক। প্রথমজন হলেন পূর্বকথিত জর্জ টমাস এবং দ্বিতীয়জন হলেন লে ভাসল্ট—বেগমের দ্বিতীয় স্বামী। টমাস ছিলেন বৃটিশ নৌ-বিভাগের জনৈক নাবিক, ১৭৮১ সালে তিনি ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন। তাঁর নিজের বিবরণী অনুযায়ী জানা যায় যে বেগমের সংস্পর্শে আসার পরই বেগম তাঁকে তাঁর সৈন্যবিভাগে একটা উচ্চপদ দেন এবং শেষপর্যন্ত তিনি বেগমের প্রধান আমতোর পদে উন্নীত হন। বেগমের দ্বিতীয় স্বামী ভাসল্ট ছিলেন খাঁটি ফরাসী ভদ্রলোক। টমাস এবং ভাসল্ট দুজনেই একসময়ে বেগমের প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু টমাস ব্যর্থ হলেন, যদিও তাঁর সম্বন্ধে বেগমের ধারণা চিরদিনই উঁচুই ছিল। ভাসল্ট বিবাহের প্রস্তাব করা মাত্র গৃহীত হল এবং গোপনে আগ্রায় তাঁদের বিয়েও হয়ে গেল। ব্যর্থ-প্রণয়ী টমাস বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীতে নাম লিখিয়ে সীমান্তে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় নায়কও কিন্তু বেগম সমরুর জীবন-নাট্যে খুব বেশী দিন ছিলেন না। এবং তাঁর শেষ পরিণতিও বিষাদ নাটকের শেষ অঙ্কেরই মতই। ভাসল্ট-এর অন্তিম পরিণতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরাও সকলে একমত নন। বিয়ের কয়েক বছর পর ভাসল্ট পরলোকগমন করেন। আর্চারের বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় যে, ভারতবর্ষে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন ভাসল্ট। বেগম সমরুর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছিলেন, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই টাকাপয়সা, মূল্যবান রত্নাদি নিয়ে ইয়োরোপে চলে যাবেন। ঠিক হল গোপনে সমস্ত অলংকার এবং অর্থ একত্রিত করা হবে এবং এক গভীর নিশীথে দুজনে হাতীর পিঠে চেপে প্রথমে ইংরেজ-শাসিত রাজ্যে চলে যাবেন। সেখান থেকে সাগরপারে। কিন্তু সাগরপারের দেশ আর দেখতে পারেননি ভাসল্ট। এই প্রসঙ্গে আর্চারের বিবরণ হল :

বেগম সমরু প্রথমে স্বামীর প্রস্তাবে রাজী হলেও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তিনি বুঝেছিলেন যে ভিনদেশে স্বামীর কাছে তাঁর কোনো আদরই থাকবে না। স্বভাবতঃই তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁর স্বামীর আসল লোভ তাঁর ধনরত্নের দিকেই। বিদেশে গিয়েই সমস্ত ধনরত্ন ভাসল্ট আত্মসাৎ করবেন। বেগম তাই ভাসল্টকে সরাবার জন্যে এক নিপুণ চাল চাললেন। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচরদের আদেশ দিলেন তারা যেন তাদের বন্ধুবান্ধবদের গোপনে তাঁদের ইয়োরোপ-যাত্রার পরিকল্পনাটা ফাঁস করে দেয় এবং নিজের লোকজনদের ছেড়ে তাঁর যে যাবার এতটুকু ইচ্ছে নেই তাও জানায়। সুখে-দুঃখে সারা জীবন বেগম সমরু তাঁর প্রজা-বৃন্দের পাশে থাকতে পারলেই কৃতার্থ হবেন—সাড়ম্বরে এই কথাটাও কানাকানি করতে বলা হল। বেগম সমরু এবং ভাসল্ট যাতে গোপনে পালাতে না পারেন, তার জন্যে বেগমেরই পরামর্শে একটা পরিকল্পনা করা হল। এদিকে স্বামীকে বেগম জানালেন যে, তাঁদের দেশত্যাগের ষড়যন্ত্র কি করে যেন সৈন্যবাহিনীর লোকেরা টের পেয়ে গেছে এবং তারা বাধা দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর। হয়ত তারা জোর করে বেগমকে আটক করবে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কথাও নিদারুণ আবেগে জানালেন বেগম যে যদি জোর করে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে তাঁকে আলাদা করা হয়, তবে আত্মহত্যা করে মারা যাবেন তিনি। ফরাসী সাহেব গলে গেলেন স্ত্রীর একনিষ্ঠ প্রেমে। তিনিও শপথ করলেন তাঁকেও যদি বলপূর্বক স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা করা হয়, তিনিও জীবন রাখবেন না। স্থির হল পালাবার সময় দুজনে দুটো পিস্তল নেবেন সঙ্গে এবং দরকার পড়লে আত্মবিনাশ করবেন। এক মধ্যরাত্রে তাঁরা যথারীতি রওনা হলেন। ভাসল্ট হাতীর পিঠে, বেগম সমরু পাল্কীতে। বেগমের পরিকল্পনা-অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে তাঁরা সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। বেগমের পাল্কী ঘিরে ফেলল তাঁরই সৈন্যরা। গোলমাল, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজের মধ্যে কে যেন ছুটে

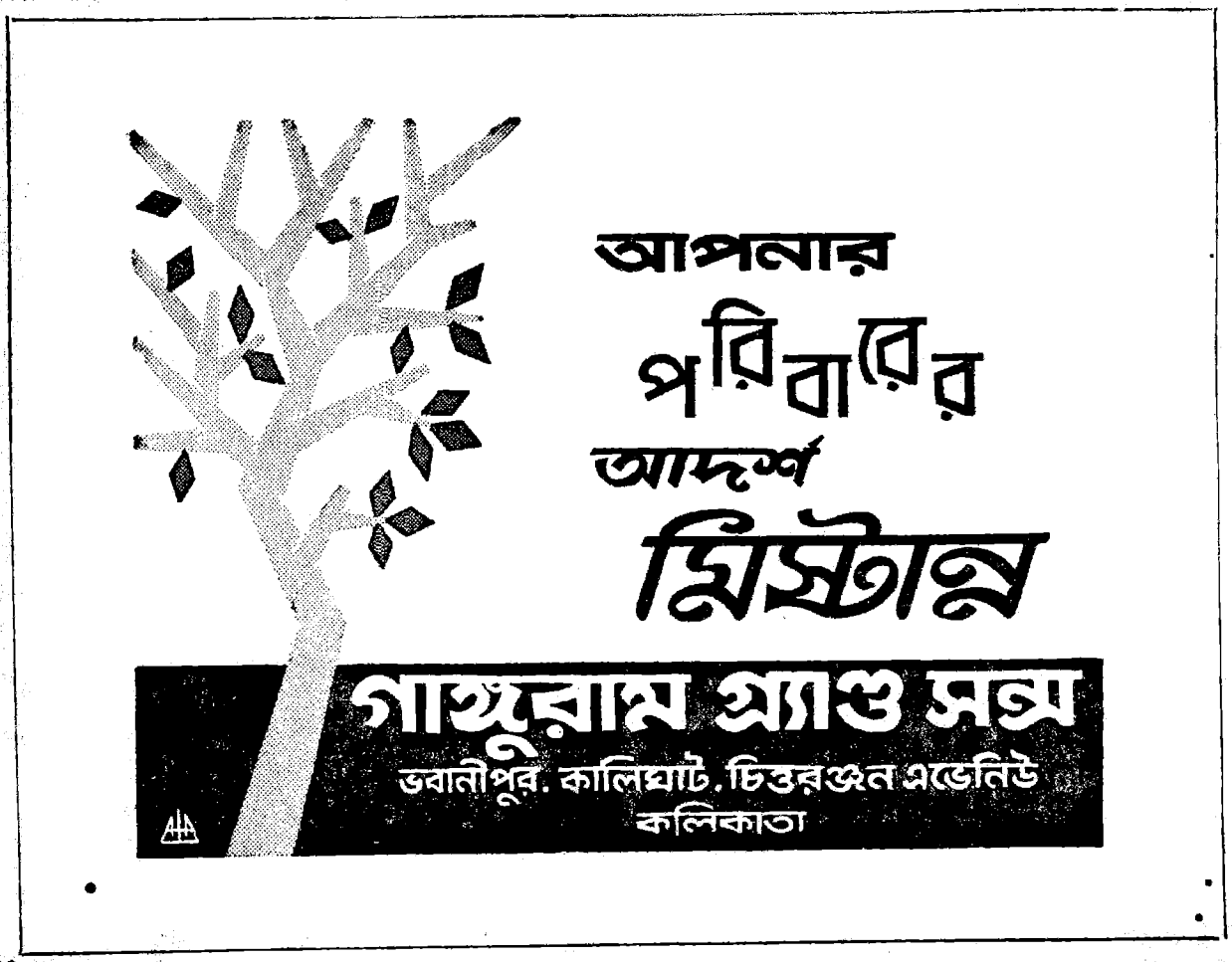

ভাসুল্টের কাছে এসে বলল যে বেগম সমরু পিস্তলের গুলীতে আত্মহত্যা করে মারা গেছেন। ভাসুল্ট পাগলের মতন বেগমের পাল্কীর কাছে ছুটে এলেন। বেগমের আত্মহত্যার প্রমাণ হিসেবে তাঁকে বেগমের রক্তাপ্লুত একটা বস্ত্রখণ্ড দেখানো হল। দুই সাহেবের বিবির শেষ সাহেব মাথায় পিস্তলের নল রেখে ঘোড়া টিপলেন, শেষ সাহেব তাঁর জীবন দিয়ে প্রমাণ করলেন ফরাসীরাও পত্নী-প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করতে জানে।

কিন্তু আর্চারের এই বিবরণের সঙ্গে কর্ণেল শ্লীম্যানের সাক্ষ্য একেবারে মেলে না। শ্লীম্যানের মতে বেগম সমরু এবং ভাসুল্ট বৃটিশ-শাসিত রাজ্যে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেছিলেন, বেগমের সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ার জন্যে। কিন্তু তাঁদের পলায়ন-পরিকল্পনা কি করে যেন সৈন্যবাহিনীর কিছু লোক জেনে ফেলে এবং তাঁদের দুজনকে বন্দী করতে ধাবিত হয়। এরপর শ্লীম্যানের বর্ণনা ঃ

ভাসুল্ট সৈন্যদের আগমনবার্তা আগে থেকেই টের পেয়ে যান। বেগমকে বলেন, মাঝরাতেই বেরিয়ে পড়তে যাতে সৈন্যরা তাঁদের নাগাল পাওয়ার আগেই বৃটিশ-শাসিত রাজ্যে পৌঁছে যেতে পারেন তাঁরা। যাত্রার প্রাক্কালে তাঁরা দুজনেই প্রতিজ্ঞা করলেন যে ধরা পড়লে দুজনেই আত্মহত্যা করবেন। পাল্কীতে বেগম একটা ছোরা নিয়ে উঠলেন। ভাসুল্টের কাছে ছিল দুটো পিস্তল, একটা তরোয়ার। পাল্কীর পাশে পাশে ঘোড়ার পিঠে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁরা যাচ্ছিলেন মীরাটের দিকে। শিরধানা

পাল্কীর পাশে পাশে ঘোড়ার পিঠে যাচ্ছিলেন তিনি।

থেকে তাঁরা সবে তিন মাইল এসেছেন, এমন সময় বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীকে পাল্কীর দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল। শেষবারের মতন সাহেব মনে করিয়ে দিলেন বিবিকে তাঁদের প্রতিজ্ঞার কথা। বিবি ডান হাতের ছোরা তুলে সাহেবকে দেখালেন। হ্যাঁ, মনে আছে তাঁর, সব ঠিক মনে আছে। ভাসুল্ট খাপ থেকে পিস্তলটা খুলে নিয়ে পাল্কী বাহকদের জোরে জোরে যেতে বললেন। কিন্তু ততক্ষণ সৈন্যরা খুব কাছ এসে পড়েছে। হঠাৎ এই সময় বেগমের পরিচারিকারা চীৎকার করে কেঁদে উঠল। ভাসুল্ট পাল্কীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন বেগমের বুকের কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বেগম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার চেষ্টা ঠিকই করেছিলেন। নিজের হাতেই নিজের বুকে ছোরা বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বুকের পাঁজরে লেগে ছোরা ভেতরে ঢুকতে পারেনি। দ্বিতীয় আঘাতের শক্তি বা সাহস আর অবশিষ্ট ছিল না বেগমের। ভাসুল্ট তৎক্ষণাৎ পিস্তলের গুলীতে আত্মহত্যা করেন।

বেগমের ব্যর্থ-প্রণয়ী জর্জ টমাস কিন্তু আরেক চিত্র দিয়েছেন ভাসুল্টের মৃত্যুর। তাঁর মতে ভাসুল্টকে বেগমের সৈন্যরাই মেরে ফেলেছিল, তিনি আত্মহত্যা করেন নি।

এ ভাসুল্টের মৃত্যুকাহিনীতে বেগম সমরুর ভূমিকা খল নায়িকাসুলভ দেখালেও সমস্ত বিষয়টিকে তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। ঐতিহাসিকরা অনেকেই বেগম সমরুকে নিষ্ঠুর প্রতারক ও স্বার্থান্বেষী হিসেবে চিত্রিত করলেও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের লোকদের কাছে বেগম সর্বদাই ছিলেন দয়ালু, সহৃদয়া এবং নিষ্ঠাবতী মহিলা। বেগমের ব্যর্থ-প্রণয়ী জর্জ টমাস বেগমের কাছ থেকে অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই পান নি, তবু তিনি শেষদিন পর্যন্ত বেগমের অনুরক্ত ছিলেন। তাঁরই হস্তক্ষেপে বেগম তাঁর বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীকে স্ববশে আনেন।

তাছাড়া বেগম সমরু যে কেমন লোক ছিলেন তার প্রগাঢ় সাক্ষী কবেকার কলকাতা। কলকাতায় রক্ষিত বেগম সমরুর দানপত্রই বলে দেবে আরব-কন্যা জিবুন-নিসা আরব-সুলভ বিরাট হৃদয়ের অধিকারিণী ছিলেন এবং জীবনও তিনি আরব্য রজনীর রাজকন্যাদের মতই যাপন করে গেছেন।

## কলকাতার গোলামখানা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্যাস্ত হয় না, এই প্রবাদটি একদা মনে রাখতে, বলতে এবং অপরকে শোনাতে ভালবাসতেন ইংরেজরা। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর সেই কবেকার কলকাতায় সভ্যতার সূর্যকে যে ইংরেজরাই বারবার ডুবিয়েছেন, একথা আজকের খুব কম ইংরেজই স্বীকার করবেন। কিন্তু সেকালের কিছু কিছু ইংরেজ অবশ্যই স্বীকার করেছিলেন। স্বীকার করেছিলেন অকপটে, যে সারা কলকাতা সেদিন এক বিরাট গোলামখানায় পর্যবসিত হয়েছিল। গঙ্গার বুকে নৌকোয় করে আরব বণিকরা কাতারে কাতারে গোলামদের ভাসিয়ে আনত, নীলামে চড়াত। আক্কা, বজবজে মগদের দাস-বোঝাই সামপান এসে ভিড়ত। দেশে দুর্ভিক্ষ হলেই কলকাতার গোলাম-ব্যাপারীরা ফেঁপে ফুলে উঠত, কারণ দুর্ভিক্ষের দরুন কলকাতায় শিশু-বিক্রীর মরশুম পড়ে যেত। ক্রীতদাসরা নৌকো বন্দী হয়ে আরব দেশের কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে চলে


BE SURE OF

KCC 's BEST

TRANSISTOR RADIOS

LOCAL

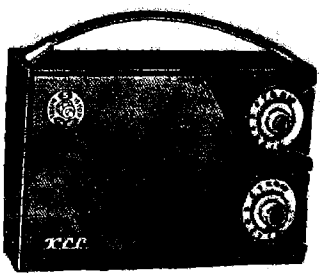

TR 435 Rs. 125/-
5 Transistor, 2 Diodes. + Local Taxes

MEDIUM WAVE

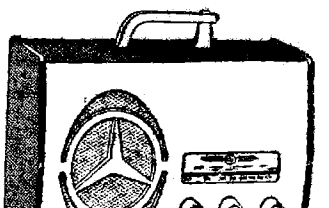

TR 475 Rs. 150/-
6 Transistor, 2 Diodes. + Local Taxes

4 MORE MODELS
LOCAL — ALL WAVE

(1) TR 421 (Local) Rs. 110/-
(2) TR 445 ( „ ) „ 135/-
(3) KT 82B (All Wave " 270/- (Including Ex-duty)
(4) KT 83BT (All Wave) „ 350/- (Including Ex-duty)

Local Taxes extra

ONE YEAR'S GUARANTEE

AVAILABLE ON EASY INSTALMENTS

Manufactured by

Kanchan Commercial Corporation

P36, Radhabazar Street (2nd floor) Calcutta-1
Phone — 22-8218

যেত রপ্তানী হয়ে, তার বদলে কলকাতায় চালান আসত আফ্রিকার কালো ক্রীতদাসরা। কবেকার কলকাতার সাহেববাজারে আফ্রিকার গোলামদের চলতি নাম ছিল 'কাফ্রি'। কলকাতায় কত ছিল তারা সংখ্যায়? তারা আদমসুমারীর যোগ্য ছিল না, কবেকার কলকাতা তাদের গুনে দেখেনি, তবে কয়েকজন মহাত্মা ইংরেজ তাদের কথা বলতে গিয়ে একটা মোটামুটি হিসেব দিয়েছেন। বম্বে, মাদ্রাজ এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সীতে মোট আশী লক্ষ দাসের কেনাবেচা হত বছরে। তার মধ্যে কলকাতা প্রেসিডেন্সী সংখ্যার দিক দিয়ে প্রথম। সমগ্র কলকাতার জনসংখ্যার প্রায় একঅষ্টমাংশই ছিল গোলাম। এবং এর সঙ্গে অর্ধদাসদের ধরলে, কলকাতার ষোলোর ছয়ভাগ নাগরিকই দাসকুলভব।

কলকাতা ১৭৭২ সাল থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত দাসানুদাস ছিল। এই একাত্তর বছর ধরে কলকাতা সিক্কা টাকায় মানুষ বেচেছে, অত্যাচারের আঙুলে কেনা মানুষদের গলা টিপে মেরেছে। ইয়োরোপে দাসব্যবসা মধ্যযুগে পর্তুগীজরা ফিরিয়ে এনেছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু ইতিহাসের পাতা শুধু পর্তুগীজদের কীর্তিতেই অত কালো হয়নি। দাস ব্যবসায়ে ইংরেজদের হাতও কম নিপুণ ছিল না। অ্যামেরিকার বিপ্লবকালীন সময়ে ইয়োরোপের বাজারে যত দাস আমদানি হত, তার অর্ধেক আসত বৃটিশ জাহাজে। অবশ্যই দাস-ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রথম সক্রিয় আন্দোলনও আরম্ভ হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। ইংল্যাণ্ডের কোয়েকাররা ১৬৭১ সালে মানুষ কেনাবেচার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন। সেই প্রতিবাদ আমেরিকায় প্রতিধ্বনিত হয় ১৬৯৬। অবশেষে টমাস ক্লার্কসন এবং উইলিয়াম উইলবারফোর্স নামক বৃটিশ পার্লামেণ্টের দুজন মানবপ্রেমিক সদস্যের আপ্রাণ চেষ্টায় ১৮০৭ সালে কমন্সসভায়

বিজ্ঞাপন

**WANTED :** Two coffrees who can play well on the French horn, and otherwise hardy and useful about a house relative to the business of consumce (khansamah) or that of a cook, they must not be fond of liquour. Any person or persons having such to dispose of will be treated with by applying to the printer.

**— Hickey's gazette**

দাস-ব্যবসার বিরুদ্ধে একটি বিল পাশ হয়। কিন্তু বিল পাশ হওয়ার পরও সমস্ত বৃটিশ কলোনীতে দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ হয় তার অনেক পরে ১৮৩৩ সালে। কিন্তু ভারতবর্ষের গোলামখানার দরজায় চাবি পড়েছে তারও দশ বছর পরে, ১৮৪৩ সালে।

কিন্তু উইলবারফোর্স-ক্লার্কসনের প্রচেষ্টাকে যতদিন পেরেছে এড়িয়ে গেছে কলকাতা। এমনকি ডেনমার্ক যখন প্রথম ১৭৯২ সালে আইন করে দাস-ব্যবসার গণেশ উল্টে দিল তখনও কলকাতার চৈতন্যদয় ঘটেনি, দাসীবাদীদের নিয়ে সে সেদিনও হুক্কা খেয়েছে, ব্যাভিচারে লিপ্ত থেকেছে। ডবলু এ্যাডামস সেকালের কলকাতায় গোলামখানার একটি তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। ভদ্রলোক কলকাতার আরমেনিতলায় জনৈক আর্মেনিয় বাড়িয়ালার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। পাড়াটাও ছিল আর্মেনিয়ানদের। সেই বাড়িটার একটা অংশ ছিল গোলামখানা। সেখানে দাসদের আটক রাখা হত। ঠিক বন্যজন্তুদের যেমন খাঁচায় আটক রাখা হয় গোলামখানার ঘরটি তার চেয়ে কোনো অংশে ভালো ছিল না। দরজায় ছিল বিরাট তালা, জানলায় ছিল শক্ত কাঠের শিক। শুধু আর্মেনিতলাই বা কেন, সারা কলকাতাই যে সেদিন একটি বিরাট গোলামখানা ছিল তার প্রমাণ অনেক ইংরেজ লেখকের লেখাতেই পাওয়া যায়। ক্যালকাটা জার্নালের ১৮২৩ সালে ১লা নভেম্বরের সংখ্যায় শ্রীল্যাণ্ডফোর্ড আরনট-সাহেব লিখছেন :

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল এই বিশাল রাজধানীতে আফ্রিকার দাসদের নিয়ে কেনাবেচা চলত গৃহপালিত জন্তুর মতই। সবচেয়ে বেশী দাম যে ক্রেতা দিতে পারত সেই মালিক হত এই দাসের। আমরা খবর পেয়েছি আরব জাহাজে দেড়শটি খোজা-দাসদের আমদানি করা হয়েছে এই বছর কলকাতার বাজারে। এইসব আরব জাহাজে করে আফ্রিকার পুরুষ-দাসদের আনা হয় কলকাতার বাজারে এবং পরিবর্তে মেয়েদের জাহাজ-বন্দী করে রপ্তানি করা হয় আরবদেশের বাজারে বেচার জন্যে। একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে এইসব হতভাগ্য দাসদের ওপর কি অমানুষিক অত্যাচার করা হয়ে থাকে। এক ভদ্রলোক জানাচ্ছেন যে সম্প্রতি দুশজন আফ্রিকান বালককে এদেশে

বিজ্ঞাপন

**TO BE SOLD** — A coffree boy, that understands the business of butler, kidmntgar and cooking. Price 400 Sicca rupees. Any gentleman wanting such a servant may see him and be informed of further particulars by applying to the printer.

**— Hickey's gazette**

এনে খোজা করার চেষ্টা হয়। এই দুশো-জনের মধ্যে একশ নব্বইজনই আনাড়ী অস্ত্রপ্রয়োগে মারা যায়।

ল্যাণ্ডফোর্ড-সাহেবের এই বিবরণটি তৎকালের সরকারী মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছিল। কিন্তু মুখরক্ষার জন্যে সরকারী তরফ থেকে প্রথমেই বিবৃতি দেওয়া হল যে ল্যাণ্ডফোর্ড-সাহেবের বিবরণ অতিরঞ্জিত। অবশ্য পরে সরকারবাহাদুর ব্যবসা-নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটা লোক-দেখানো বিধি-নিষেধ জারী করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু লোক-দেখানো আইন করে কলকাতায় গোলামখানাকে বন্ধ করা যায়নি সেদিন।

# জাতীয় পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণে

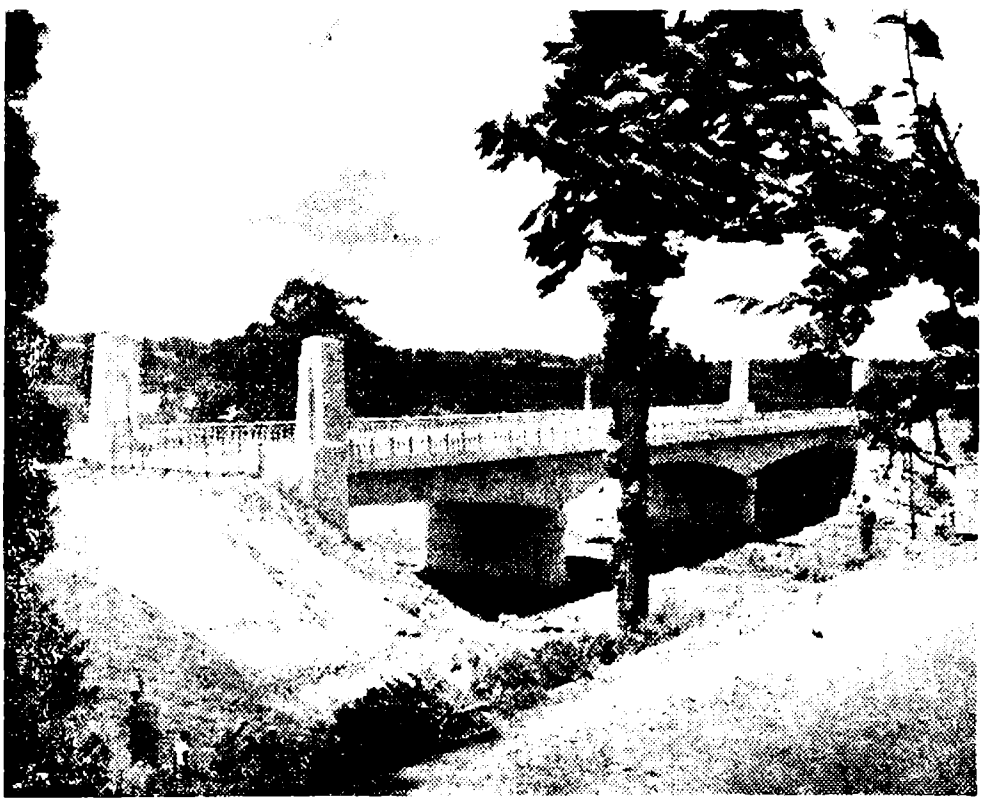

সিংহারণ ব্রিজ, জি. টি. রোড, আসানসোল


## চ্যাটার্জী ব্রাদার্স

বিল্ডার্স এণ্ড আরকিটেক্টস্

১৪এ, প্রতাপাদিত্য রোড,

কলিকাতা—২৬

ফোন ৪৬-৩৮১৯

...য় দিনের পর
...বেকার কলকাতায়
'কাফ্রি' দাসদের।
...ই হিকির গেজেটে
হিকির গেজেটের
...কে জানা যায় যে শুধু
..., যাজক-সম্প্রদায়ও দাসাধি-
...। দাসরা চার্চের সম্পত্তি
...ণ্য হত। ডাঃ বাস্টিড তাঁর
ফ্রম্ ওল্ড ক্যালকাটা' গ্রন্থে
...ঃ

...াস-ব্যবসায়ীরা শুধু যে কাফ্রিদের
...াবেচাই করত তা নয়, দাসবংশ বৃদ্ধির
জন্যেও তারা সচেষ্ট থাকত। দাসবংশ
বৃদ্ধির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কথা ডাঃ বাস্টিড
বিশদ লেখেননি বটে, কিন্তু অন্যান্য
ঐতিহাসিকরা তার বিবরণ দিয়েছেন।
ক্রীতদাসীর মালিকরা তাঁদের অধীনস্থ
দাসীদের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকদের
বিয়ে দিতেন। চার পাঁচ সিক্কা টাকার
বিনিময়ে লোকরা এইসব ক্রীতদাসীদের বিয়ে
করত এবং সন্তানোৎপাদন করেই বিদায়
নিত। এদের পেশাই ছিল ক্রীতদাসীদের
সন্তানার্থে বিবাহ করা। এদের 'বাইকার'
বলত লোকে এবং এই বিয়ের নাম ছিল
'পাদওয়া-সাদী'। কুলীন বিবাহের স্বামীদের
মতই বাইকার স্বামীরা বছরে তাদের একেক
স্ত্রীর কাছে একেকবার যেত এবং কিছু টাকা-
পয়সা নিয়ে আবার চলে যেত অন্য স্ত্রীর
কাছে। ক্রীতদাসীর মালিকরাই সানন্দে এদের
টাকা-পয়সা দিতেন, কারণ ক্রীতদাসীর
সন্তান হলে তার মালিক তাঁরাই হতেন।
সস্তায় দাসসংখ্যা বৃদ্ধি, একমাত্র এই
উপায়েই সম্ভব ছিল সেকালে। আরেকটি
কারণেও অবশ্য ক্রীতদাসীদের বিয়ে দেয়া
হত। মালিকদের জারজ সন্তানদের পিতৃ-
পরিচয়ের জন্যেও ক্রীতদাসীদের বিবাহের
প্রয়োজন হয়ে পড়ত।

কিন্তু এইসব ক্রীতদাসীরা মালিকদের
গোলামখানায় সস্তায় দাসসংখ্যা বৃদ্ধি
করলেও কলকাতায় এরাই ছিল সবচেয়ে
হতভাগ্য। ক্রীতদাসীদের ওপরে কেমন যেন
একটা পাশবিক ক্রোধ ছিল কলকাতার।
সামান্য কারণে এদের অমানুষিক নির্যাতন
সহ্য করতে হত। শারীরিক শাস্তি তো
ছিলই। মালিকদের যৌন বিকৃতির সমস্ত
গরলই এদের শীর্ণবস্ত্র শরীরে ধারণ করতে
হত। কবেকার কলকাতার অভিধান থেকে
'সহানুভূতি' শব্দটা যেন বিলুপ্ত হয়ে
গিয়েছিল ক্রীতদাসীদের প্রতি আচরণে।

বিজ্ঞাপন

**WANTED** by a gentleman now in Calcutta two very handsome African ladies of the true sable hue, by the vulgar commonly called Coffrees. They must not be younger than 14 years each not older than 20 to 25. They must be well grown girls of their age, straight limed and straight eyed and have rational use of all their faculties — the better of (if) a little squeamish. But beware of spot or blemish. They will be joined in the Holy Banns of Wedlock to two gentlemen of their own colour, caste and country. A dowry is not expected with them. As the master of these African gentlemen would not wish to have them disappointed, he hopes no ladies will apply but those who are really and truely spinsters.

— **Hickey's gazette**

[বিজ্ঞাপ্তির ভাষায় অশোভন ইঙ্গিতগুলি দ্রষ্টব্য]

এমনকি সাধারণ অপরাধীরাও যেটুকু মানবাধিকার ভোগ করত লেটুকু অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল তারা। বিশেষতঃ ক্রীতদাসীদের শাস্তি দেওয়ার প্রণালীগুলি যেমন অভিনব তেমনি পৈশাচিক। যে কোনো সামান্যতম অপরাধেই ক্রীতদাসীদের বাড়ির পুরুষ-দাসদের সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে অমানুষিক প্রহার করা হত। কিংবা আরেক ধরনের অভিনব প্রথা ছিল শাস্তি দেওয়ার। মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের সকালে 'অপরাধী' ক্রীতদাসীকে কুয়োর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হত। তারপরে তাকে নগ্ন করে কলসী কলসী কনকনে ঠাণ্ডা জল খুব তাড়াতাড়ি তার মাথায় ঢালা হত। যাতে নিঃশ্বাস নেবার পর্যন্ত অবকাশ না পায় সে। ফলে অনেক সময়েই দম বন্ধ হয়ে অথবা নিমোনিয়ায় মারা যেত ক্রীতদাসীটি। ১৮৩৭ সালের ৭ই জুলাই কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে জনৈকা আট বৎসর বয়স্কা ক্রীতদাসীর ওপর অত্যাচার মামলার একটি বীভৎস বর্ণনা দিয়েছেন এ স্টার্ক। একটি আট বছরের বালিকা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা বালিকাটিকে আদালতে মৃতপ্রায় অবস্থ আনা হয়েছিল। তার সমস্ত শরীর ক্ষ বিক্ষত, সাদা হাড় বেরিয়ে পড়ে থ্যাঁথলানো মাংসের ফাঁকে ফাঁকে। কাঁধে ত বড় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছিল জ্বলন্ত কয়ল চেপে ধরার ফলে, মাথায় ছিল তার বিরাট প্রহারের ফলে সৃষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে পুলিশ হাসপাতা স্থানান্তরের আদেশ দেন। পরদিন বালিকা মারা যায়। বালিকাটির মালিক জনৈক মুহ মহিলা। আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ক্রীতদা হত্যার অভিযোগ আনা হল। কিন্তু পর্যন্ত কিছুই হল না। মহিলাটি সসম্ম মুক্তি পেলেন। কবেকার কলকাতা ব ফেলেছিল মাছি, মশা ও ক্রীতদাসী হত কোনো শাস্তি নেই, হয়ত পাপও না।

কবেকার কলকাতায় ইস্ট ইণ্ডি কোম্পানীও কম লাভ করেননি মানুষ টাকার ওপর ট্যাক্সের দাঁত বসিয়ে। প্রতি দাসের কেনাবেচার জন্য কোম্পানী এ রেজিস্ট্রেশন ফি পেতেন। ১৭৫২ সা একটি হিসেবে পাওয়া যায় গোলামখি ইংরেজ কোম্পানীকে চার টাকা চার আ রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হত গোলামের ন ক্রেতাকে। ইংরেজের কান্ডারীতেই প্রকা গোলাম-সেলামী নেওয়া হত।

কলকাতার সাহেবী শুভবুদ্ধির প্র উদয় হয়েছিল ১৭৭৪ সালে। দাসদের ও অত্যাচারের কাহিনী চারদিকে এমন ছ পড়েছিল যে শেষ পর্যন্ত ফোর্ট উইলি থেকে একটি ফতোয়া জারী করতে কোম্প বাধ্য হলেন। কিন্তু ফতোয়ার কাগজী ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির মধ্যেই ফেলে দি ছিলেন তৎকালীন দাসাধিপতিরা। ১৭৮৯ সালে কোম্পানীকে এক 'প্রক্লেমশন' জারী করতে হল। এই ঘোষ আইনের তর্জনী শাসন ছিল। পুরস্ঘোষণা করা হয়েছিল এই অনুশাসনে। দ ব্যবসা করছেন বা দাস ক্রয়-বিক্রয় করে এমন লোকের যিনি সন্ধান দিতে পার তাঁকে একশ সিক্কা টাকা পুরস্কার দে হবে। এবং মুক্ত দাসকে দেওয়া হবে প সিক্কা টাকা। নদীবক্ষে দাস আমদানি করার জন্যে জাহাজের পাইলটদের ওপ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল। এই নিষে অমান্য করলে পাইলটদের লাইসেন্স বা করার হুমকিও ছিল কোম্পানীর আ

কিন্তু তবু ভারতবর্ষকে, কল কলকাতাকে ১৮৪৩ সালের এ্যাক্ট য আইন পাশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা ক হয়েছিল দাস-ব্যবসার সম্পূর্ণ বিলু জন্যে। অবশ্য কোনো কোনো পাঠক ১৮৪৩ সালকেও বিশ্বাস করতে চাইবেন তাঁরা হয়ত বলবেন ১৯৪৭ স ১৫ই আগস্টের আগে ভারতবর্ষের কলকাতার বিশাল গোলামখানাটির হয়নি।

* এই রচনায় কিছু তথ্য বেঙ্গল পাস্ট প্রেজেন্ট থেকে গৃহীত হয়েছে।

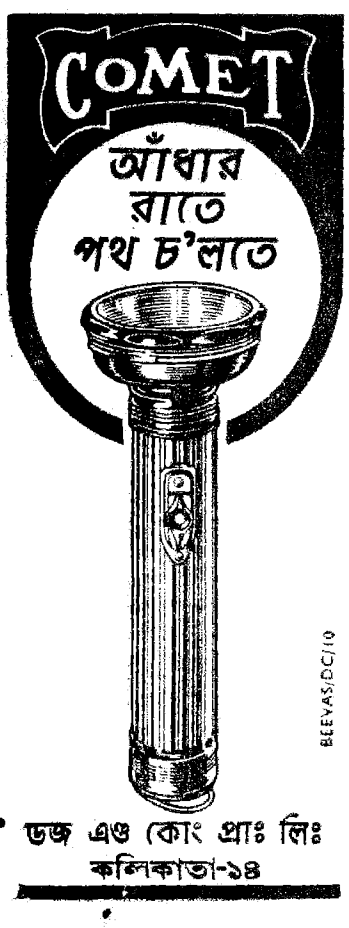

# একটি চরিত্রহীন গল্প

মিহির আচার্য

সকালে বাবুকে চা দিতে গিয়ে চাকর দরজা বন্ধ দেখল। দরজায় শব্দ ও বাবুর ঘুম ভাঙল না। তাকে জর রান্না তৈরি করতে হবে। তাই য়ে সে ফিরে গেল।

আহ্নিক সেরে মা এলেন ধূমায়িত কাপ নিয়ে।

রজা বন্ধ। কোনো সাড়া নেই। ভীষণ ছে বিমলেন্দু। রাত জেগে পড়া- করেছে বোধহয়। বউ বাপের বাড়ি কাল, তাই রাতজাগার অন্য কারণ না পেয়ে খুশি হলেন নিভাননী।

চা খেয়েও তো আবার ঘুমোতে । ঘুম ভেঙে বিছানায় চা খাওয়ার সে বিমলেন্দুর। নিভাননী কয়েকবার লেন। সাড়া পেলেন না। তারপর লার দিকে এগিয়ে গেলেন। জানালা এই গরমে। নিভাননী জানালা লেন। বন্ধ নয়, জানালাটা ভেজানো । পাল্লা দুটো খুলে দিতেই এক রাশ হাওয়া বেরিয়ে এল।

আর, নিভাননী দেখলেন ওর প্রকাণ্ড টা খাটের ওপর ঝুলছে। টেবিল আর টা উলটে পড়ে আছে মেঝেতে।

নিভাননী চিৎকার করতে গেলেন, লেন না। কাঁপতে লাগল শরীরটা, ার গরাদ ধরে তিনি পতনকে লেন।

এর পর চাকর এল। ছোটো ভাই লেন্দু এল। ওরাও জানালা দিয়ে দৃশ্যটা।

দরজা ভাঙতে হবে। কিন্তু কে ব। বাড়িঅলা ভাড়া দিয়েছে, দরজা ার অধিকার দেয়নি।

দরজা ভাঙা হল।

নিভাননী দেখলেন নতুন-কেনা দড়িটা ওর গলায় ঝুলছে। কুয়োর পচা বদলে কতদিন ওকে এক গাছা দড়ির বলেছেন তিনি। নিভাননী ভেবে- । অধ্যাপক মানুষ ভুল হয়ে যায় দড়ি আনতে। কিন্তু এখন বুঝতে পারলেন সত্যিই ও দড়ির কথা ভোলেনি। কে জানে কুয়োর জন্যেই ও হয়ত দড়ি আনছিল, পথে আসতে-আসতে মত বদলেছে। মত-বদলানোর অভ্যেস ছিল বিমলেন্দুর। মত করল সারাজীবন বিয়ে করবে না। তারপর নিভাননী যখন দুদিন বললেন মেয়েটার খবর। কমলা, রূপেগুণে লক্ষ্মী। তিন-দিনের দিন মত বদলাতে ওর দেরি হল না। তারপর বিয়ে করতে ওর তর সইল না। বোধহয় মত বদলাবার আগেই সে কাজটা করে ফেলতে চাইল। সত্যি বলতে কি ওর বিয়ের ব্যাপারে ওর এই উচ্ছ্বাস ভালো লাগেনি নিভাননীর। কেমন ব্যথা পেয়ে-ছিলেন। মনে মনে অসন্তোষ বোধ করেছিলেন অকৃতজ্ঞ ছেলের জন্যে। হবে না। স্বামী মারা যাবার পর ও'র প্রভিডেন্ট ফান্ড আর ইনসিওরেন্স ভেঙে কত আগলে হিসেব করে মানুষ করেছেন বিমলেন্দুকে। সব হিসেবের বাইরে যাবে বিমলেন্দু কে ভেবেছিল। তবে কি সেও নিজে নিজে একটা হিসেব করত। নিভাননীর মনে হল তাঁর সারাজীবনের বিশ্বাস নিয়ে তিনি সন্তানের কাছে হেরে গেছেন। বিমলেন্দু মাতৃগর্ভের অহংকারকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। অথচ কিশোরবেলা থেকে এই ছেলেকেই গড়েপিটে মানুষ করেছেন তিনি। একমাত্র অবলম্বন বলে দরকারের বাইরেও তাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। বিমলেন্দু সব ব্যাপারেই তাঁকে নির্ভর করত। আর ওর এই নির্ভরতা নিভাননীকে একেশ্বর দেবতার মতো সর্বগ্রাসী করে রেখেছিল। তিনি এই সংসারের কর্ত্রী, তাঁর ছেলে, তাঁর পুত্রবধূ—তাঁরই সংসার। ছেলে তাঁর, একমাত্র তাঁরই রক্তেমাংসে তৈরি, সেই দাবি এই বাড়ির প্রতিটি প্রাণীকে মানতে হবে। নিভাননীর মনে হল বিমলেন্দু এতদিন সেই দাবি মেনেছে, মানতে সে ভালোবেসেছে। বিয়ের পর ইদানীং সে কম কথা বলে, নানান কাজে ব্যস্ত থাকে, কী একটা গবেষণার কাজ সে শুরু করেছিল। বিয়ের পর ওর শরীর খারাপ হচ্ছিল, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকত সে। কিন্তু সবসময়েই কি পড়াশোনা করত। একেক দিন রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে ছেলের ঘরে ওদের দুজনের কথাবার্তা শুনতেন তিনি, হাসিকৌতুকও মেশানো ছিল তার মধ্যে। বউয়ের সঙ্গে গল্প করবে এটা অপরাধ নয়, কিন্তু পড়াশোনার ক্ষতি করে রাত জেগে শরীর নষ্ট করবে, এটা কাজের কথা নয়। ওরা দুজনেই ছেলে-মানুষ। মাঝে মাঝে ওদের সতর্ক করেছেন। তা ওদের ভালোর জন্যেই। নিভাননী বহু হিসেব করে ছেলেকে মানুষ করেছেন সে কথা ভুলবেন কি করে। বউমা তো পরের মেয়ে। তাঁর এই মনোযোগিতায় ওরা যে কেউ ভুল বোঝেনি তার প্রমাণ সংসার সুন্দরভাবে বয়ে চলেছে। বউমাকে পর্যন্ত তিনি হেঁসেলে ঢুকতে দেননি, চা বা জল-খাবার তৈরির প্রয়োজনেও তাকে কাছে ডেকেছেন কেউ বলতে পারবে না। একদিন বিকেলে বিমলেন্দু রেস্তোরাঁ থেকে কী একটা খাবার কিনে এনেছিল, নিভাননী

থকেছিলেন সেদিন। এসব কী প্রমাণ নয়, ওরা তাঁকে কতখানি মানত। আর, এখন মৃত্যু দিয়ে সে বুঝিয়ে গেল মার এই সদিচ্ছাগুলোকে বিমলেন্দু মানেনি। তবে কি বেঁচে থাকতে ওর ওপর তিনি অত্যাচার করেছেন। একটা বিবর্ণ ভয় নিভাননীকে স্তব্ধ করে দিল। কিন্তু...বিমলেন্দু, তাঁর ছেলে, তাঁর চোখের সামনে ঝুলছে ওর মৃত শরীর, তিনি কাঁদতে পারছেন না কেন। কি করে কাঁদবেন তিনি, ওর চেহারাটা তো মোটেই করুণ দেখাচ্ছে না। দাঁতের কামড়ে ঝুলে-পড়া ওর আধখানা জিভ, ঠেলে-বেরুনো চোখের মণি। ওকে কী বিশ্রী, কুৎসিত আর অশ্লীল দেখাচ্ছে। সারা জীবনের সঞ্চিত বিশ্বাসকে বিমলেন্দু দড়ির ফাঁসে ঝুলিয়ে দিয়ে ঠাট্টা করছে। এই ঠাট্টার সামনে কাঁদবেন কি করে তিনি।

নিখিলেন্দু এ-দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি। সে বাড়ি থেকে ছুটে পালিয়েছে। কিন্তু বউমা থাকলে ওকে এই দৃশ্য দেখিয়ে সান্ত্বনা পেতেন নিভাননী। মার থেকেও বড় আপনার হয়েছিল সে বিমলেন্দুর কাছে। বউমা থাকলে এ ঘটনা কি ঘটতে পারত। তবে কি বউমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল বিমলেন্দুর, কেন দু বছরের বিয়েতে ওদের সন্তান হল না। হাতের মুঠোয় বিশেষ কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না নিভাননী যার জন্যে ওর মৃত্যুটা জরুরি হতে পারে।

সিঁড়িতে পদশব্দ।

নিখিলেন্দু দাদার অধ্যাপক-বন্ধুদের ধরে নিয়ে এসেছে। পারিজাত আর বীরেশ্বর।

বীরেশ্বর ঘরে পা দিয়েই বললে, 'ইশ।'

ওর ছোট্ট অব্যয়ে কী একটা ব্যঞ্জনা ছিল, নিভাননী আরো জড়সড় হয়ে গেলেন। এই মুহূর্তে ওদের উপস্থিতি তিনি পছন্দ করেননি। তিনি ছেলের সঙ্গে একটু মনে মনে বোঝাপড়া করতে চাইছিলেন। কিন্তু...

'এমন কাজ ও কেন করল?' বীরেশ্বরের জিজ্ঞাসা যেন তীরের মতো বিঁধল নিভাননীর হৃদয়ে। ওরা কি তাঁকে সন্দেহ করছে।

নিখিলেন্দু দাঁড়িয়ে দাদার অধ্যাপক-সহকর্মীদের কথা শুনছে। দাদার মৃত্যুর সম্পর্কে এই সমালোচনা তাকে একটু-একটু করে সাহস জোগাচ্ছিল।

'আশ্চর্য—' বীরেশ্বরই বলে চলল : 'গতকালও সে কলেজ করেছে, আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বলেছে, কলেজের পরে ছাত্রদের টিউটোরিয়েল খাতা অ বসে দেখেছে। মনে হয়নি সে নিজের সম্পর্কে এমন একটি ভয়ংকর ি করেছে।'

পারিজাত বললে, 'ওর নিজে কোনো দুঃখ থাকতে পারে একদিনও জানতে পারিনি। ও অ সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারেনি, হয়তো ওর দুঃখ আমাদের বলে হতে পারত।'

বীরেশ্বর বললে, 'ওর শবের চেয়ে দ্যাখো, যেন একটা ব্যঙ্গ। ম ভবিষ্যতকে পর্যন্ত সে বিকৃত দিয়েছে। আমরা কত অসহায়, দু দড়ির ফাঁসটাও কেমন পাকা বানিয়েছে দ্যাখো পারিজাত, দক্ষ মতো মনে হচ্ছে ওকে।'

পারিজাত বললে, 'আমি পারছিনে কেমিস্ট্রির শিক্ষক হয়ে সে ফাঁসে মরবার মতো পুরনো অ কায়দাকে বেছে নিল কেন। ল থেকে মারাত্মক কোনো এসিড জোগ ওর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।'

নিখিলেন্দু দাদার বালিশের থেকে এক টুকরো চিঠি বের বীরেশ্বরের হাতে দিল।


এবার ৺পূজায় সিমেন্সের SIEMENS INDIA অনবদ্য ৪টি প্রীতি উপহার

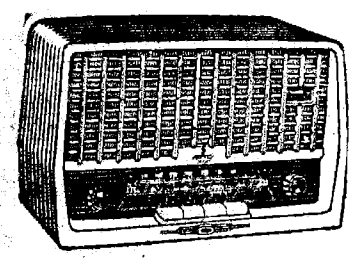

সুপার আর, এ-১০১
এসি ও এসি/ডিসি
৬ ভালব, ৩ ওয়েভ-ব্যান্ড
ট্রানজিস্টর মডেল

মূল্য ২৭০৲ ও স্থানীয় কর

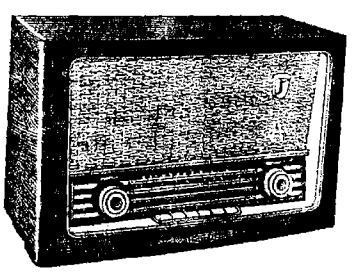

স্ট্যান্ডার্ড সু
৬৯১ ডরি
এসি ও এসি
৬ ভাল
৪ ওয়েভব্যা
৬টি পুশ বাট

মূল্য ৪১৫৲ ও স্থানীয় কর

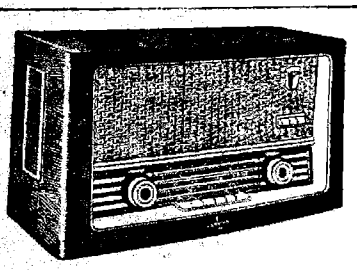

স্পেশাল সুপার
৬৯২ ডরিউ ও
এসি ও এসি/ডিসি
৬ ভালব, ৪ ওয়েভ-ব্যান্ড, ৬+৩ পুশ বাটন, ৩টি লাউড স্পীকার

মূল্য ৫৭৫৲ ও স্থানীয় কর

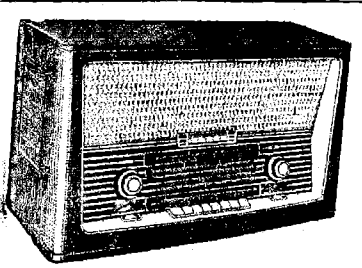

গ্র্যান্ড সুপ
৭৯০ ডরিউ (এ
৭ ভালব,
৬ ওয়েভব্যান্ড
৮+৫ পুশ
৫ লাউড স্প

মূল্য ৯৯৩·৩৩ ও স্থানীয় কর

আপনার নিকটবর্তী অনুমোদিত ডিলারের নিকট অনুসন্ধান করুন।
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও আন্দামানের পরিবেশক :

নান এণ্ড কোং

৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার, ৩২বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

বীরেশ্বর পড়ল : 'আমি স্বেচ্ছায় রণ করলাম।' তার নিজের নামটাও হাতে স্বাক্ষর করেছে বিমলেন্দু। ন্দুক ছাঁদের হরফ। অক্ষর কোথাও নি, ঝাপসা হয়নি। তার মানসিক ই পরিচায়ক। এই পত্র-রচনা এবং মা কত সময় ব্যয়িত হয়েছে। এই চিঠি-লেখার সঙ্গেই তার মৃত্যু-কে সে স্বাক্ষর করে গেছে। বীরেশ্বর স্তরগুলি কল্পনা করবার চেষ্টা টেবিলের ওপর চেয়ার, ফ্যানের সঙ্গে দড়ি লটকানো, দু-একবার দড়ির কার্যকুশলতাও অবশ্য পরীক্ষা । এই সকল কাজ সে নির্ভুল গে করে গেছে। এবং তারপর চিঠি লিখতে বসেছে। চিঠি লিখেও লতে পারে সে খোলা বারান্দার র নিচে একবার দাঁড়িয়েছিল কিনা। দাঁড়িয়ে একটি সিগারেটও সে । জল খাওয়ার তেষ্টা হওয়ারও নয়। সেই মুহূর্তগুলিতে ন্দু কী ভেবেছিল, কিছু ভেবেছিল অথবা ভাবনাগুলি লেপেপুঁছে ল! 'স্বচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলাম।' দটায় এই মুহূর্তে ভীষণ রাগ হল রর। ওই শব্দটায় কোথায় যেন লুকোনো আছে। কাব্য করে পরিবর্তে কী কথাটা ব্যবহার করতে বিমলেন্দু, এই মুহূর্তে মনে পড়ল শ্বরের। স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে পারে বিমলেন্দু, সে অধিকার তার একথা জানানোর বিশেষ তাৎপর্য দারতা! এ-সংসারের দুঃখ-কষ্ট-যদি সে ভাগ নাই নেবে তবে এ বন্ধে তার এই শূন্য কৃতজ্ঞতা-কী দাম আছে। কে চেয়েছে তার জল জবানবন্দী। মাত্র দু বছর হল করেছে, কমলা, তারি দূর-সম্পর্কের । স্ত্রীর অস্তিত্বের সামনে তার ল না, তাই ওকে বাপের বাড়িতে দিয়েছে। তার মানে একটা বাধ ছিল তার মনে। সে ভাবল না শীল সামাজিক জীব, তার নিজের কানো সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল মনে ছেলেদের পরীক্ষা, কলেজে স্টাফ এক্সিতেই কম, ছাত্ররা তার ত নির্ভর করে। আজই কলেজে যখন জানবে তাদের শ্রদ্ধেয় র কীর্তি, যখন মনে মনে যাচাই ই মানুষটি তাদের তরুণ হৃদয়ের শ্রদ্ধা প্রীতি নিয়ে এতদিন তাদের ভনয় করেছে, সেই শ্রদ্ধাহীন অসম্মানের কথা সে একবারও না কেন। তার মৃত্যু বারবার হবে, নোংরা কদর্যতায় চিত্রিত চ থাকতে যে দুঃখকে সে গোপন াইছিল মৃত্যুর পর এখন তা র শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হবে। হয়ে বিমলেন্দু সামাজিক কথা ভুলতে পারল কি করে!

বিবর্ণ হয়ে ওই ছেলে-ভীর চিন্তিত মুখ, নিরীক্ষণ করছিলেন। নিখিলেন্দু, তাঁর একমাত্র ছেলে, সে এই পরিস্থিতিতে দাদার বন্ধুদের ওপর নির্ভর করছে দেখে মৃত্যুর মতোই আর একবার অসহায় বোধ করলেন তিনি। ওকে কি ডাকবেন তিনি, ডেকে নেবেন কাছে।

নিভাননী চমকে উঠলেন বীরেশ্বরের কথায় : 'বিষয়টা কি বলুন তো? এ কদিন সে কী ভাবছিল, কী করছিল...'

নিভাননী বললেন, 'জানিনে।'

'বা, মা হয়ে আপনি ছেলেকে বোঝেননি।'

নিভাননী মৌন। ওরা তাঁর মাতৃত্ব সম্পর্কে কটাক্ষ করছে। বিমলেন্দু বেঁচে

নিভাননী চমকে উঠলেন

থাকলে, তিনি আবার ভাবলেন। কী আশ্চর্য, বিমলেন্দু বেঁচে ছিল বলেই তিনি মা ছিলেন। বিমলেন্দু নেই, তিনি এখন স্বাধীন একটি বর্ষিয়সী মহিলা, তাকে দুর্বল দেখে ওরা তাঁর সমালোচনা করতে উদ্যত। ওদের বাড়িতে কী মা নেই, মার সঙ্গে এরকম করেই কি ওরা ব্যবহার করে!

'ও তো আজকাল আমার সঙ্গে বেশি কথা বলত না।' নিভাননী তবু বললেন : 'কাল রাত করে ও বাড়িতে ফিরেছিল, আমি পুজোয় ব্যস্ত ছিলাম। তারপর ও খেতে এল, খেতে-খেতে অনেক গল্প করল, ছেলেবেলার কথা, রাত দশটা পর্যন্ত আমার ঘরে আমার কোলের কাছে শুয়ে রইল। আমি জোর করেই ওকে শুতে পাঠিয়ে দিলাম। ও কিছুতেই যেতে চাইছিল না...'

'তারপর?'

তারপর! নিভাননী আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ওরা আর কী বলতে চাইছে, কী জানতে পারলে ওরা আশ্বস্ত হয়!

'বউকে বাপের বাড়ি পাঠাল কে? আপনি?'

'আমি! আমি পাঠাব কেন! আমিই যে [illegible]। সীমাও যেতে


# হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

## আজও অদ্বিতীয়

প্রায় ৭০ বর্ষাধিক যাবৎ এই চিকিৎসা কেন্দ্র সমগ্র ভারত তথা ভারতের বাহিরে ধবল-কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত অসংখ্য রোগীর সেবায় সফলকাম হওয়ায় ইহার প্রসিদ্ধি আজ সর্বজনস্বীকৃত। যে কোন রোগী তাঁহাদের রোগ কুষ্ঠ বলিয়া সন্দেহ হইলেই পরীক্ষার জন্য এখানে আসিয়া রোগ দেখাইয়া যাইতে পারিবেন। ঔষধের মূল্য সম্বন্ধে ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সুবিবেচনা করিয়া প্রত্যেক রোগীকে রোগমুক্ত করিবার জন্য যত্ন লওয়া হইয়া থাকে।

শুধু ইহাই নহে, সংক্রামক রোগীর পক্ষে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাঁহার পরিবারস্থ অন্য কেহ যাহাতে রোগে আক্রান্ত না হন সে সম্বন্ধেও সতর্কতামূলক উপদেশাদি প্রদান করা হইয়া থাকে।

সংক্রামক ও অসংক্রামক, সর্বপ্রকার লক্ষণযুক্ত কঠিন কুষ্ঠরোগাদি, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি প্রতিকারের সুব্যবস্থার জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে পরামর্শ দেওয়া হয়।

## ধবল বা চর্মের সাদা দাগ

**(LEUCODERMA)**

এই রোগ এখন আর অসাধ্য নহে। শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ দ্রুত নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য 'হাওড়া কুষ্ঠ কুটীরের' নব আবিষ্কৃত সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। রোগ আরোগ্যের পর আর পুনঃ প্রকাশ হয় না।

# হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া

ফোন : ৬৭-২৩৫৯

শাখা :

৩৬নং মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড)

কলিকাতা-৯ (পূরবী সিনেমার পাশে)

চাইছিল না। ও জোর করে ওকে রেখে এল।'

'কোনো ঝগড়া হয়নি?'

'কই, আমি তো কিছু জানিনে।'

'তবে?'

পারিজাত বললে, 'ও'কে প্রশ্ন করা বৃথা। মানুষ আত্মহত্যা করে, তার একটা আপাত কারণ হয়তো খুঁজে বার করা যায়। কিন্তু আসল কারণটা কোনোদিনও জানতে পারা যায় না। আমার তো মনে হয় বিমলেন্দুও কারণটা জানত না।'

বীরেশ্বর বললে, 'সে কি রকম? একটা কাজ ঘটছে তার কারণ থাকবে না?'

পারিজাত বললে, 'কারণটা আর কিছু নয়। বিমলেন্দু ভীষণ দুর্বল।'

'দুর্বল।' বীরেশ্বর গম্ভীর হল। 'তাহলে বলছ আমরাও ওরই মতো একদিন আত্মহত্যা করতে পারি।'

'কে বলতে পারে।' পারিজাত উদাস হাসল।

বীরেশ্বর দৃঢ়গলায় বললে, 'আমি বীরেশ্বর বোস, পারি। জীবনটা একটা ইয়ারকি নয়। যত দুঃখ-কষ্ট থাক তাই বলে .....দ্যাখো পারিজাত, আমরা রোমান্টিক যুগ পেরিয়ে এসেছি। আজকের দিনে আত্মহত্যা একটা অ্যানাক্রনিজম্।'

নিভাননী অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। ওরা এত কোলাহল করছে কেন! ওরা কী ভুলে গেছে এখানে একটা মৃত মানুষ নীরব-অস্তিত্বে শোকের ছায়া বিছিয়ে রেখেছে! তিনি কী বলবেন ওদের আস্তে কথা বলতে! তাদের সহকর্মী, তাঁর আত্মজ, মৃতের প্রতি জীবিত মানুষকে সম্মান জানাতে হবে। সম্মান! কথাটায় চমকালেন তিনি। নিজের কাছে অনুভব গভীর হচ্ছে না কেন। কান্নার মতো সহজ বস্তুটিও নিভাননীর আয়ত্তে আসছে না। এ ক্ষতি তো তাঁর একার। কান্নায় ভেসে যেতে পারলে তিনি অনেক অবিশ্বাস সন্দেহের হাত থেকে বাঁচতে পারতেন। অন্তত ক্ষতির কথা ভেবেও তো তিনি কাঁদতে পারেন। কিন্তু কান্না আসছে না, বিমলেন্দুর কাজটা এমন হঠাৎ...। কিংবা নিভাননী আরো ফ্যাকাসে হলেন এবং নিজের সদা চিন্তায় এবার তাঁর গলা শুকিয়ে এল। না—তিনি প্রবলবেগে আপত্তি জানালেন : না। কখনোই না। তিনি নিজের সন্তানের মৃত্যুকামনা করেছেন, ভাবতেও পারেন না।

'থানায় খবর দেয়া হয়েছে?' পারিজাত জিগ্যেস করল।

নিখিলেন্দু বললে, 'চাকর গেছে।'

'তাহলে এসে পড়বে।'

বীরেশ্বর ঘরছিল ঘরময়। ওকে অশান্ত উত্তেজিত বিরক্ত দেখাচ্ছিল। অন্যমনস্কে সিগারেট বের করে নিভাননীর সামনেই সে ধূমপান করতে লাগল। নিভাননীর মনে হল এই ছেলেটি তাঁকে অপমান করছে। বিমলেন্দুর অভাব বোধ করলেন তিনি। বীরেশ্বর ওর টেবিল নাড়াচাড়া করছে, বই এলোমেলো করে দিচ্ছে। বিমলেন্দু অগোছাল ভাব পছন্দ করত না। ওর অনেক সে হাতে তুলে নিয়েছে। বি-এসসি করবার সময় নিভাননী এই কলম উপহার দিয়েছিলেন। ওর ওগুলো পড়ে যেমন আছে। বিমলেন্দু কোনো স্পর্শ করবে না। তাই ওগুলি তাঁর সঞ্চয়। এমন অনেক সঞ্চয় স্বামীর থেকে রাখতে হয়েছে। জ্যান্ত একটা মানুষ চেয়ে সঞ্চয় অনেক নিজস্ব, একান্ত। লেন্দু আর কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে সরে যেতে পারবে না, কেউ তাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

নিখিলেন্দু কি করবে বুঝতে পারে সে একবার বীরেশ্বর একবার পারিজাতের দিকে চোখ রাখছে। ওদের প্রতি আয়নায় সে দাদাকে দেখছে। তার দাদা, যার কথা বলতে তার বুক গর্বে আসে। দাদার চরিত্রে যে সুদূর ব্যর্থতা যার কাছে আসা যায় না অথচ কাছে ইচ্ছে করে, যে-দাদা তার কাছে দেবতার বিরাট, সেই দাদা সম্বন্ধে তার বন্ধুদের সে জানতে চায়। অন্তত যে ভয়-ভক্তি ভাব জড়িয়েছিল দাদার সম্বন্ধে তাকে অন্ধ পূজারীর মতো ধূপধুনো দিয়ে

। দাদা চিরকালই তার কাছে
আবেগ।
'দি আমাদের কাছে মন খুলতে
বীরেশ্বর বিড়বিড় করে বললে।
জাত বললে, 'আমরাও তো জানবার
রিনি।'
করে চেষ্টা করবো? আমরা তো
ঘর ভেতরে যেতে পারিনে।'
লেও কি হত?' পারিজাতের গলায়
'তোমার কি মনে হয় ওর আত্ম-
প্রবৃত্তি অনেককাল ধরে সে লালন
না, তা হতে পারে না, তা হলে
ই সে আত্মহত্যা করতে পারত না।
সিদ্ধান্ত একেবারে আকস্মিক।
ন্টের মতোই আকস্মিক।'
জানে।' বীরেশ্বর মাথা নাড়ল ঃ
তুমি আত্মার অবিনাশে বিশ্বাস
'দি আত্মার অস্তিত্ব থাকে, ভেবে
হলে অনুভূতিও থাকে এবং কে
রে বিমলেন্দুর আত্মা এই
র শবের চারপাশে ঘুরছে কিনা।
আমাদের আলোচনা শুনতে
তা সে তার ভুল বুঝতে পারছে।
াধনের উপায় নেই। এই কষ্টের
হয় আত্মা না থাকলেই ভালো

র সবচেয়ে বিশ্রী লাগছে—'
লে ঃ 'আমরা ওর বন্ধু, অথচ
বস্থায় আমরা কিছু করতে
আমার সব সময় ওর কথা মনে
র মতো ওর মুখ যেন আমার
র এঁটে রয়েছে। ও যে মরেছে
াস করতে পারছিনে। ভেবে
কালও সে হেসে হেসে কথা
াকাড়ি করে চা খেয়েছে, কলেজ-
খ-দুঃখে সমস্ত আন্দোলনে সে
গে থেকেছে—'
র বললে, 'তার চেয়েও বড় কথা
একটা নীতি ছিল, ভালোমন্দ
র ধারণা ছিল পরিষ্কার। ডিগ্রি
লেটা সেবার পরীক্ষায় নকল
ড়লে ও কারুর কথাতেও ওর
টো করল না। আমরা নিজেরাও
সব সময় নীতিকে শক্ত করে
। তবে ও নিজের জীবনে এমন
শ্রয় দিল কি করে।'
সকালের রোদ চাড়া দিয়ে
রর ভেতরে ভ্যাপসা গ্রীষ্ম।
বর হঠাৎ নিভাননীকে জিজ্ঞাসা
দের বিবাহিত জীবন কী সুখের

ী দম নিলেন। কিছু বললেন

কমলাকে যতদূর জানি ওর
মেয়ে...'
কী উত্তর দেবেন। অন্ধকারে
লেন। কমলা যদি ভালো
া আর কোনো প্রশ্ন থাকে
হটা তারই ওপর পাকা
কু জানে, কী খবর রাখে।
পর একা এই সংসারকে
লন্দুকে হিসেব করে মানুষ

PHILIPS
ফিলিপসের রেডিয়ো
কিনতে হ'লে
রজার্সে
আসুন
শুধু ফিলিপ্‌স-এর সব রকম 'মডেল' সব সময় পাওয়া যায় তাই নয়—ন্যায্য মূল্য ও ক্রেতাদের খুশি করার প্রচেষ্টাই আমাদের বৈশিষ্ট্য।
ফিলিপ্‌স ফিলেটা ডি লুক্স
মূল্য ঃ ৩৩৯৲
(স্থানীয় কর ছাড়া)
জি রজার্স অ্যাণ্ড কোং
ফিলিপ্‌স-এর প্রখ্যাত ডিলার
শো-রুম ঃ ১২, ডালহাউসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১। ২২-৫৪৭২
৪১, থিয়েটার রোড, কলিকাতা-১৭। ৪৪-৩১০৩
PRO/GR-2

আর, এম, চ্যাটার্জী আয়রণ ফাউণ্ড্রী প্রাঃ লিঃ
পরিবেশক—নারায়ণী হার্ডওয়ার স্টোর্স
রাজাকাটরা - বড়বাজার - কলিকাতা—৭ - ফোন—৩৩-৩৪৬৩

করেছেন। বিমলেন্দু সে সব জানত। তাই তাঁকে অবলম্বন করতে ও ভালোবাসত। অনেক বড় বয়স পর্যন্ত মা ছাড়া কিছু চেনেনি ও। ভালো মেয়ে কমলা তার কতটুকু জানে। বিমলেন্দু তা জানত, জেনেও ওর স্বভাবের অবিরোধী শান্তপ্রকৃতির সহনশীলতা ওকে শেষের দিকে আড়ষ্ট করে ফেলেছিল। সব কিছুকেই ও এড়াতে চাইত বড় রকমের একটা ঝড়কে নিবারণ করতে। নিভাননী এখন ভাবলেন : কমলা তাঁর ছেলেকে বুঝতে পারেনি, বুঝতে চায়নি। ও নিজস্ব একটা ঘর পেয়েছে, জানালা-দরজায় পুরু পরদা টেনে তার ঘরটাকে সে দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন করেছে। নিভাননীর মনে পড়ে না এই দুবছরে তিনি কবার ওর ঘরে পা দিয়েছেন। সাংসারিক জরুরি প্রয়োজনে দরকার হলেও বিমলেন্দুকে ওদের ঘর থেকে ডেকে নিতে পারেননি। পরদাগুলিই যে বাধা ছিল তা নয়। বিমলেন্দুর নিজের থেকেও কী একবার খবর নিতে হয় না! কলেজ থেকে ফিরে সে আজকাল মার সঙ্গে কথা বলবারও ফুরসত পেত না। ও যে বাড়িতে ফিরেছে বুঝতে পারতেন যখন বউমা খাবারঘর থেকে ওর চা জলখাবার ঘরে নিয়ে যেতে আসত। নিজের একটা সংসার রচনা করেছে বউমা, করবে না কেন।

নিখিলেন্দু বললে, 'বউদি যাবার সময় কাঁদছিলেন, না মা?'

'কাঁদছিলেন! কেন?' বীরেশ্বর ভাবিত হল।

নিভাননী বললেন, 'আমি বারণ করেছিলাম বউমাকে পাঠাতে। বউমাও যেতে চাননি। ও জোর করে—'

'জোর করে!'

নিভাননী কোনো উত্তর দিলেন না।

বীরেশ্বর বললে, 'তাহলে ও রাগ করেছিল।'

রাগ! নিভাননী অন্যমনস্কে উক্তি করলেন।

'কিছু হয়েছিল ওদের ভেতরে। কমলা কাঁদতে কাঁদতে গেছে।' বীরেশ্বর বললে, 'কমলার কাছে সব জানতে পারা যাবে।'

'কি জানতে পারা যাবে?' নিভাননী যেন ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন।

'সব, সব কিছু।' বীরেশ্বর স্থির গলায় জানাল : 'কমলা আমাকে সব বলবে। ও অনেক কথা বলেছে আমাকে। একবার বিমলেন্দু আমার সম্বন্ধে ওর কাছে মন্তব্য করেছিল : তোমার দাদা ভীষণ বাক্যবাগীশ। কমলা আমাকে সে কথা হাসতে-হাসতে বলেছিল। আরো বলেছিল : সেদিন ও তোমার সম্বন্ধে ধারণা বদলেছে বীরুদা, তুমি নাকি ভীষণ সৎ এবং হৃদয়বান। কমলা আমাকে সব বলবে।'

'কিন্তু কি নিয়ে ওদের ঝগড়া হল?' পারিজাত জানতে চাইল।

'বীরেশ্বরদা, এখনো থানা থেকে কেউ এল না।' নিখিলেন্দু নালিশ জানাল।

বীরেশ্বর বললে, 'আসবে।'

'ওরা দাদাকে নিয়ে কী করবে বীরেশ্বরদা?'

নিভাননী ডাকলেন : 'নিখিল এদিকে এসো।'

নিখিলেন্দু মার কাছে গেল না।

নিভাননী একটা যন্ত্রণা বোধ করতে লাগলেন। বিমলেন্দুর দেহটা অনেকক্ষণ ঝুলে আছে। চোখ-ঠেলে-ওঠা, কাটা জিভ এবং শক্ত-হয়ে-আসা শরীরটা। আর, সেই রুপোর মতো ধবধবে নতুন দড়িটা।

'দ্যাখো বীরুদা, একদিনেই দাদার গালে কি রকম দাড়ি বেড়েছে।' নিখিলেন্দু বললে।

বীরেশ্বর তাকাল ওর দিকে।

'মরা মানুষের দাড়ি বাড়ে, তাই না বীরুদা?'

'নিখিল এদিকে এসো।' নিভাননী আবার ডাকলেন।

'না।' নিখিলেন্দু দাদার মৃত্যুতে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

পুরনো বাড়ির বহুদিনের জং-ধরা দরজাটা খুলে ফেললে যেমন শব্দ হয় তেমন একটা জান্তব আনুনাসিক ধ্বনি শুনলেন নিভাননী। বুকভর্তি কাঁটা-ঝোপের তলায় দমবন্ধ-হয়ে-মরা দরজাটা এখন হাট করে খোলা। নিভাননী দুরন্ত বাতাসে হিহি কাঁপুনি বোধ করলেন।

পারিজাত বললে, 'ঝগড়া হলেই মরতে হবে তাহলে তো আমাদের রোজই মরতে হয়।'

বীরেশ্বর বললে, 'হয়তো এমন কিছু হয়েছিল যাতে বেঁচে-থাক করেছিল সে। কমলা সব জা

পারিজাত নিশ্চুপ।

বীরেশ্বর আবার বললে, পারে নিজের জন্যে নয়, সাধু কাজের জন্যে ওর ছিল।'

'সাধু কাজ!' পারিজাত

বীরেশ্বর বললে, 'না। করছি। একটা কাজ হয়েছে তো খুঁজে পেতে হবে।'

'কারণ না-বলে সান্ত্বনা' পারিজাত বললে।

বীরেশ্বর বললে, 'ও এক

পারিজাত বললে, 'ও পাইনে। এই তো কয়েক বছ করে বেরিয়েছে, কলেজের চ ইনক্রিমেন্ট পেয়ে চুকেছে, করে সে জীবন তৈরি করছি রিসার্চও চালিয়ে গেছে। তুমি এতদিনের এত যত্নের জীবনা হীন হয়ে যাবে! যেন এ খোঁচায় তার সমস্ত জীবনটা গেল।'

বীরেশ্বর জিগ্যেস কর খবর দেয়া হয়েছে?'

নিখিলেন্দু বললে, বাবুর দোকান থেকে বউদিকে দিয়েছি।'

'তাহলে ও এসে পড়ে বললে।

'বউদি এখনো কিছু জা শুধু বলেছি দাদা ভীষণ অ মানের গলায় বললে নিখিলেন্দ

বীরেশ্বর মোটা বেসুরো 'আমি কমলার সামনে দাঁড়াব

পারিজাত বললে, 'আমর দাঁড়িয়ে আছি।'

'ও যখন আমাকে প্রশ্ন একী হল!' বীরেশ্বরের গ 'যখন ও জিগ্যেস করবে দ কারুর ক্ষতি করিনি—আমার হল কেন?'

পারিজাত বললে, 'সংসারে না করলেও সর্বনাশ হয়। পা

নিখিলেন্দু চিৎকার করে থানার লোকেরা এসে পড়েছে ওদের নিয়ে আসি।' উত্তেজন জ্বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল

নিভাননী বিবর্ণ, শাদা। সামনে দেয়াল স্থির অনড় একটা বলতে চাইলেন তিনি, দীর্ঘ রোগাভোগে পরিত্রা মতো দেখালো তাঁকে।

বীরেশ্বর পদচারণা দাঁড়িয়ে।

পারিজাত অন্য দিকে কারুর দিকে তাকাতে পা ওরা দুজনে একই ধরণের পর থেকেই মানুষ একটা এগিয়ে চলেছে। সকলেই বা কাল দণ্ডগ্রহণ করতে

ওরা দেয়ালে পিঠ

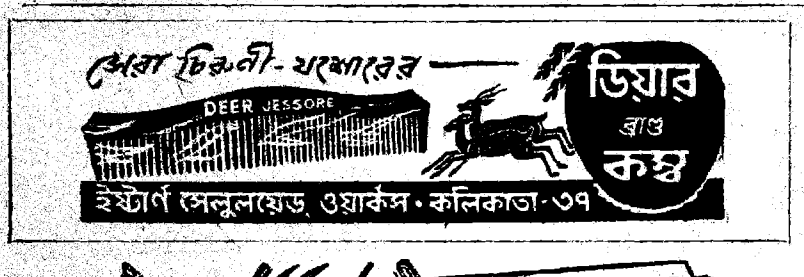

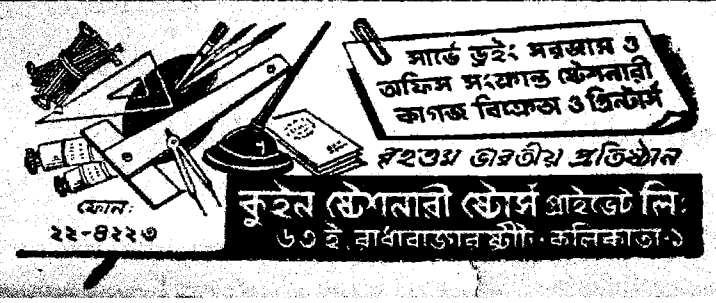

# এঁদের পেছনে দাঁড়ান

## সীমান্তের জওয়ান ভাইদের সহায়তায় এগিয়ে আসুন

আমাদের সীমান্তে এখনও আক্রমণের হুমকি। সেই হুমকির যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার জন্যই আজ যার যেমন ক্ষমতা তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে।

দেশরক্ষার খরচ মেটে, দেশবাসীর দেওয়া বহুরকমের ট্যাক্সের টাকা থেকেই। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যই প্রত্যেক নাগরিকের উচিত সরকারী ট্যাক্স তাড়াতাড়ি ও পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়া।

**আপনার ট্যাক্সের টাকাই দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি**

**পশ্চিম বঙ্গ সরকার**
দ্বারা প্রচারিত

ALPANA

# রমণীয় যুগে যুগে সাজসজ্জা

কবি বর্ণনা করতে চূড়ান্ত কালো কেশের মাঝে লীলাকমল রৈত হাতে না জানি কোন কাজে

যাঁদের সঙ্গে হয়নি দেখা সেসব বরাঙ্গনারা কেমন সাজতেন, কেমন চলতেন কেমন বলতেন জানবার জন্যে আজো হয়ত অনেকের মন কেমন করে। সেসব প্রাচীনারা

নটকী — অজন্তা

আজকের এই আধুনিক বিংশশতাব্দীদের তুলনায় কেমন ছিলেন সেই জানবার ইচ্ছা ছওয়াটা স্বাভাবিক।

প্রাচীনকালের হিন্দুরা পারমার্থিকের অন্বেষণে ঐহিককে বিসর্জন ত মোটেই দেননি বরং সে যুগের রমণীদের সাজসজ্জা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করলে এর বিপরীতটাই দেখতে পাই। কোন অপৌরুষেয় ধর্মেই দেহ এবং দেহের রূপকে অস্বীকার করা হয়নি। তাই রূপচর্চা প্রাচীনকাল থেকেই প্রায় একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অল্পদিন আগেও প্রাচীনারা বিকেল হলেই বাড়ীর বৌঝিদের নিয়ম করে সরময়দা মাখতে বসে যেতেন। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হল যে এই রূপচর্চা শুরু হত মেয়েদের বাল্যকাল থেকেই বিবাহের প্রস্তুতি হিসেবে।

কামসূত্র, অনঙ্গরঙ্গ প্রভৃতি বহু প্রাচীন পুস্তকে এই রূপচর্চার নানারকম বিধান, উপকরণ এবং তাদের প্রয়োগের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। চলাফেরা ওঠবসা এবং দেহভঙ্গিমাও উপেক্ষা করা হয়নি। ময়ূর, হংস প্রভৃতি পশু ভঙ্গী লক্ষ্য করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যের নির্দেশ হল সোজা এবং বসবার সময় সুষুম্না স্নায়ু মস্তক এবং সর্বশরীরে যেন এ গতির আভাস থাকে। অনিদ্রা সাবধান করা হয়েছে কারণ প্রচু রূপবৃদ্ধির সহায়ক। যকৃতের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে প্রচুর জলপান করতে বলেছেন। ছেন নিয়মিত এবং পরিমিত মাঝে মাঝে লঙ্ঘন। বাৎস্যায়ন "সূর্যালোক, মৃদুবায়ু, আহার, নিদ্রা প্রভৃতির ফলে সুস্থ শরীর গাত্রবর্ণ, নখ, দন্ত প্রভৃতির যত্ন দেওয়া কর্তব্য।"

গাত্রচর্মের উৎকর্ষের দি কাল থেকেই আমাদের দেশে ি ব্যোগ দেওয়া হত। তৈল এবং বি জাতীয় পদার্থ দিয়ে চর্ম পরিষ্ক ছিল রীতি। ময়দা, সর, ডালব তেল প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস মি মিশ্র মেখে ত্বকের কোমলতা ও বর্ধন করা হত এবং এর ফ রুক্ষ রোমাদিও দূর হত। অতি থেকেই এগুলি মাখিয়ে গাত্রবর্ণে এবং ত্বকের কোমলতা বৃদ্ধির দেওয়া হত। এছাড়া কমলাে শশা প্রভৃতির খোসা, বাদাম ব চলন এখনো আছে। প্রাচ কয়েকটি বিশেষ পুষ্পবৃক্ষের শ্বেতসার মিশিয়ে এই ধরণের ব্যবস্থা ছিল। 'অনঙ্গরঙ্গের' গ্র তিল, দুই প্রকার জিরে এবং সঙ্গে দুধে বেটে সপ্তাহকাল দিলে সবরকম দাগ উঠে গিয়ে মত শুভ্রতা ফুটে ওঠে।

গৌরবর্ণের দিকে ভারত চিরকাল। এদিক দিয়ে অ সচেতনতা নেহাৎ অল্প নয়। বাদাম-বাটা বর্ণগৌরব বৃ শোনা যায়। বেশী রৌদ্র না হয়ে যায় অতএব বিবাহে একটু অসূর্যম্পশ্যা হওয়া

ললাটে যাতে কোন সেজন্যে সদা প্রফুল্ল থ